যে কয়টা কল আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টার নাম উল্লেখ যোগ্য :—

১। পাটের দড়ি তৈরি করা কল।

২। ধান ভানা কল।

৩। শঙ্খ শিল্পের কল।

এই কল সম্বন্ধে "ব্যবসাও বানিজ্যে" ইতি পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে। এর দাম খুব কম অথচ এই রকম একটা কলের সাহায্যে একজন লোক অনায়াসেই দৈনিক ১০।১২ আনা রোজগার কর্ত্তে পারে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ঢেঁকিতে ধান ভানা হয়। কিন্তু যে কল আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটাই তিনটা ঢেঁকির সঙ্গে সমান কাজ কর্ত্তে পারে। অথচ এর দাম খুব অল্প।

ঢেকি অপেক্ষা কল ব্যবহারের আরও একটু সুবিধা এই যে ঢেকিতে ধান ভানতে হলে অন্ততঃ তিন জন লোকের দরকার, কিন্তু এই কল একজন লোকেই চালাতে পারে। আবার একটা কল তিনটা ঢেকির সমান। কাজেই একজন লোক ন' জনের কাজ করে।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ছাড়া বড় বড় সংসারেও এই কল ব্যবহার করার সার্থকতা আছে। একজন লোক এক ঘণ্টা কল চালিয়ে ৬ ছয় সের পরিষ্কার চাল তৈরী কর্ত্তে পারে।*

শাঁখ কাটা কল।

২১ সালের সেন্সাস থেকে দেখা গেছে যে বাংলায় প্রায় দশ হাজার লোক শঙ্খ শিল্পে নিযুক্ত আছে। শঙ্খ কাটা খুব কঠিন বলে এই কাজটা এতদিন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও বিরক্তি কর ছিল। বর্ত্তমানে এই যন্ত্রের আবিষ্কারে সেই অসুবিধা দূর হয়েছে।

"ব্যবসা ও বানিজ্যে" এসম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, কাজেই এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি না।

মাঝে মাঝে শুনতে পাই দেশে নাকি কাজের অভাব ঘটেছে। কিন্তু অভাব ত সত্যি সত্যি কাজের নয়—অভাব কাজ কর্ব্বার লোকের।

শত সহস্র ব্যবসায় পড়ে রয়েছে—তার দিকে দৃষ্টিপাত করে ক'জন? আসল কথা কায়িক পরিশ্রম কর্ত্তে আমরা নারাজ।

পৃথিবীর আর কোন দেশের লোকই কায়িক পরিশ্রম করাটাকে অপমানকর কাজ বলে মনে করে না। আর কোন দেশেই "মজুর" বা "মিস্ত্রী" কথাটা গাল নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ দেশের লোকের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত; এদেশের লোক একটু "ট" "ট" কর্ত্তে শিখলেই একেবারে লাট বনে যায়। তখন মিস্ত্রীর কাজটা তার কাছে নেহাইৎ ছোট লোকের কাজ বলেই গণ্য হয়।

এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হবে। শিক্ষিত যারা তাদের আবার পিছন ফিরে দাঁড়াবার দিন এসেছে। শিক্ষাকে বর্জ্জন কর্ত্তে বল্‌ছি না শিক্ষা বর্জ্জন করে কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায় কোন কালে বড় হতে পারে নি—বড় হয়েছে অর্জ্জন ক'রে।

কিন্তু শিক্ষা অর্জ্জন কল্লেই কি যথেষ্ট হল। অর্জিত বিদ্যা যদি কোন কাজেই না লাগান গেল তবে সে লেখা পড়া শেখার সার্থকতা কোথায়?

অন্যান্য দেশের অধিকাংশ লোকেই লেখাপড়া শেখে তাদের অবলম্বিত ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন কর্ব্বার উদ্দেশ্যে—আর এদেশে যারা লেখাপড়া শেখে তারা ভুলেও ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে

---

* এই সকল কলই আমরা অর্ডার পাইলেই সরবরাহ করিতে পারি।

ফিরে চায় না। অন্যান্য দেশের লোকের সঙ্গে এইখানেই বাঙালীর তফাৎ এবং বাঙালী যে শিল্প বাণিজ্যে আজও এত পেছিয়ে রয়েছে তার অসংখ্য কারণের মধ্যে উপরোক্ত কারণটাই অন্যতম।

বাংলার অধিকাংশ শিল্পই অশিক্ষিতের হাতে। কোন বিষয়ে উন্নতি কর্ত্তে হলে দৃষ্টির যে প্রসারতা এবং তীক্ষ্ণতা থাকার দরকার—তা তাদের নেই। বিশেষতঃ দুনিয়ার কোন খোঁজ খবরই তারা রাখে না—রাখবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নেই। ফলে—একজন কাঁসারীর অতিবৃদ্ধ প্র-পিতামহ যে উপায়ে এবং যে সমস্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে বাসন কোসন তৈরি কর্ত্ত—আজও তার বিন্দু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি। কামারের অবস্থাও ঠিক তাই। এতে যে ঐ ঐ শিল্পের শুধু যে উন্নতিই হচ্ছে না তাহা নয়—এমন কি প্রকারান্তরে তাদের অবনতি হচ্ছে বলতে হবে। কেননা এই বিশ্বসংসারে কোন জিনিসই ধীর স্থিরভাবে বসে নেই। জগতের মত জগতের সকল জিনিসই সদা চঞ্চল এবং পরিবর্ত্তনশীল।

এখানে দাঁড়ানর কোন অর্থ নেই। হয় আগিয়ে চলতে হবে, নয় পেছুতে হবে। তুমি যদি আগে পাছে কোন দিকেই না চলে দাঁড়িয়ে থাক তবু তোমাকে পেছিয়ে পড়তে হবে, আর সবাই তোমাকে ছাড়িয়ে আগিয়ে চলেছে বলে।

তাই বলি—দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। এগুতে হবে। পেছিয়ে যাবে কেন? এগুতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সঙের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হবে কি?

বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘাড়ে মস্ত বড় দায়িত্ব র'য়েছে; অশিক্ষিত শিল্পজীবীগণকে সঙ্ঘবদ্ধ কর্ব্বার ভার তাদের ওপর, শিল্পীগণকে নতুন পথ দেখাবার ভার - তাদের মগজে নতুন নতুন idea ঢুকিয়ে দেবার ভার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

বাঙালি! বীরের মত এ দায়িত্ব গ্রহণ কর। গ্রামের শিল্পীগণকে একত্রিত কর,—তাদের কর্ম্মপ্রণালী বাৎলে দাও;—শুধু দূর থেকে উপদেশ বর্ষণ করে নয়—তাদেরই মধ্যে তাদেরই একজন হ'য়ে তোমার মস্তিষ্ক শক্তি তাদের—কর্ম্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করুক। তোমার অর্জ্জিত বিদ্যা সর্ব্ববিষয়ে তাহাদিগকে পরিচালিত করুক, দেখবে বাংলার ধ্বংসাবশেষ পল্লীগুলি আবার সুখ সমৃদ্ধিতে মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে—বাংলার দেহে আবার এক নতুন প্রাণের খেলা আরম্ভ হয়েছে।

ভেজিটেবল প্রোডাক্ট।

বাজারে 'উদ্ভিজ্জ ঘৃত' বা ভেজিটেবল ঘি নামে যাহা চলিয়া যাইতেছে, তাহা যে আদৌ ঘৃত নহে, নানাপ্রকার তৈলবীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল মাত্র —তাহা আমরা গত বর্ষের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি। ইহার প্রচলনে দেশের মধ্য হইতে আসল গব্য ঘৃত উঠিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। দুগ্ধ এবং ঘৃতই যাহাদের প্রধান খাদ্য সেই হিন্দুর দেশে আজ টাকা ফেলিলেও খাঁটী ঘি কিনিতে পাওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ভেজিটেবল প্রোডাক্টের আমদানী হওয়ার ফলে ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের যে অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে তাহা, ক্রমে ক্রমে লোকে বুঝিতে পারিতেছে। গভর্ণমেণ্টও ক্রমে ক্রমে ইহার অনিষ্ট কারিতার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন; তাই জল্পনা কল্পনা চলিতেছে কেমন করিয়া ইহার কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করা যাইতে পারে।

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট একটা সহজ উপায় বলিয়াদিয়াছেন। উপায়টী যেমন সহজ তেমনই যুক্তি সঙ্গত কিন্তু তথাপি উহা ভারত গভর্ণমেণ্টের মনঃপুত হয় নাই; কেন? -তাহা এক ভারতের ভাগ্যবিধাতারাই বলিতে পারেন।

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন "বিদেশ হইতে যে ভেজিটেবল প্রোডাক্ট আমদানি হয় তাহা এমন একটী গাঢ় বর্ণবিশিষ্ট করিতে বাধ্য করা হউক যাহাতে উহা ঘির সহিত অতি সামান্য পরিমাণে মিশাইলেও একজন সাধারণ লোকের চক্ষেও ধরা পড়িতে পারে। ইহাতে কেহ আর ঘির সহিত যথেচ্ছ পরিমাণে ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ভেজাল দিয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থকে খাঁটী ঘি বলিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে না। যাঁহাদের ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হইবে তাঁহারা অনায়াসে রংকরা ভেজিটেবল প্রোডাক্ট কিনিতে পারিবেন।

ভারতগভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে উক্ত পন্থা অবলম্বন করা খুব যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না, কেননা,—

(১) ভেজিটেবল বিষাক্ত নহে; উহা আহার করিলে কোন উপকার না হইতে পারে কিন্তু কোন অপকারও হয় না। কিন্তু উহার সহিত কোন রং মিশাইলে উহা হয়ত বিষাক্ত হইয়া উঠিবে। সে ক্ষেত্রে উহা আহার করিলে স্বাস্থ্যের আরও অনিষ্ট ঘটীবার সম্ভাবনা।

(২) ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ঘৃত উৎপন্ন হয় তাহা চাহিদা অপেক্ষাও অনেক কম; কাজেই উহার Substitute রূপে ব্যবহার করা যায় এমন কিছুর প্রচলন না থাকিলে ঘির দাম এরূপ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইবে যে কেহই উহা কিনিতে পারিবে না।

(৩) ঘির সহিত চিরকালই ভেজাল দেওয়া হইত। তখন বরং নির্ব্বিচারে সকল প্রকার জীব-

জন্তুর চর্ব্বি মেশান হইত এখন বিশুদ্ধ ভেজিটেবল প্রোডাক্ট মেশান হয়; এই শুদ্ধাচারপরায়ন হিন্দুর দেশে ইহা ত আনন্দের কথা।

ভারত সরকারের উক্তিগুলি কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

"ভেজিটেবল প্রোডাক্ট বিষ নহে, উহা খাইলে শরীরের উপকার হয় না বটে কিন্তু অপকারও হয় না"—এই কথা ভারত সরকারের মুখে শুনিবার পূর্ব্বে আরও অনেকের মুখেই শুনিয়াছি; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত ঐ উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

লোকে খাদ্যাদি গ্রহণ করে কেন?—শরীর পুষ্টির জন্য। যে দ্রব্য আহার করিলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় তাহাই খাদ্য। যাহা আহার করিলে শরীরের পুষ্টি হয় না তাহা অখাদ্য এবং বিষবৎ পরিত্যজ্য। ঘাস খাইলে হয়ত সকল সময় শরীরের অনিষ্ট নাও ঘটিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া ঘাসকে কি খাদ্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিব?

যাহা খাইলে শরীরের উপকার হয় না তাহা খাইলেই অপকার হয়। শরীর দুর্ব্বল হইলে ডাক্তার উপদেশ দেন—ঘি, দুধ খাও। আপনি ঘি মনে করিয়া ভেজিটেবল প্রোডাক্ট আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে আপনার জীবনীশক্তি বাড়িবে কিরূপে? ফলতঃ আপনার শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং দুর্ব্বলতা নানা রোগের আকর বলিয়া ক্রমে ক্রমে আরও নানাবিধ রোগ আসিয়া দেখা দিবে।

তবে কেমন করিয়া বলিব ভেজিটেবল প্রোডাক্ট অনিষ্ট কর নহে?

যাহা হউক ভেজিটেবল প্রোডাক্ট প্রকারান্তরে অনিষ্টকর হইলেও উহা যে বিষাক্ত নহে তাহা না হয় ধরিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া উহার সহিত কোন নির্দোষ রং মিশাইলে উহা যে কেমন করিয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিবে তাহা ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বাস্তবিক ভারত সরকারের পক্ষে ঐরূপ যুক্তির অবতারণা করা যে কিরূপ হাস্যাস্পদ ব্যাপার তাহা হয়ত কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারেন নাই। রং মাত্রই কি বিষাক্ত? এই বিংশ শতাব্দীতে Vegetable colur এর অভাব আছে কি? আর প্রকৃতপক্ষে নানারূপ খাদ্যের সহিত নানাবিধ রংই কি আমরা প্রতিদিন উদরস্থ করিতেছি না? সরবৎ, মিঠাই প্রভৃতি রঞ্জিন করিবার জন্য প্রতিদিন যে সকল edible Vegetable colour খাদ্যের সহিত মিশানো হয় তাহা কি বিষাক্ত?—সমগ্র সভ্য জগতে এই সকল edible colour প্রতি নিয়ত খাদ্য দ্রব্যের সহিত, সরবৎ, চকোলেট, লজেঞ্চুস বনবন ইত্যাদি নানা শিশু খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করা হইতেছে। সুতরাং এদেশের Vegetable ঘিয়ে যাহাতে বিষাক্ত রং ব্যবহৃত না হয় গভর্ণমেণ্ট সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা ঘৃতের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী বলিয়া ইহার একটী সুলভ Substiute এর প্রয়োজন, নচেৎ মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়া যাইবে একথা যদি স্বীকার করি তথাপি ভেজিটেবল প্রোডাক্ট সেই Substiute হইবার যোগ্য কিনা তাহাই সর্ব্বাগ্রে ভাবিয়া দেখা উচিত।

চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া জানাইয়াছেন ভেজিটেবিলে ঘিয়ে কোন গুণই বর্ত্তমান নাই। কাজেই উহাকে ঘির Substitute রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

বরং বিশুদ্ধ নারিকেল তেলের খাদ্য হিসাবে একটা মূল্য আছে। অপর পক্ষে ভেজিটেবল যে কিসের বীজ হইতে নিষ্কাশিত তাহা জানিবার উপায় নাই;

এক্ষেত্রে ঘির Substitute রূপে যদি কিছু ব্যবহার করিতে হয় তবে বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। বস্তুত টাটা কোম্পানী যে "কোকোজেম" প্রস্তুত করিতেছেন বাজারের অবিশুদ্ধ ঘি বা ভেজিটেবল প্রোডাক্ট অপেক্ষা তাহা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।

ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ঘির Substitute রূপে ব্যবহার করা আপত্তিজনক হউক বা নাই হউক, উহা ঘির ভেজালরূপে ব্যবহার করার কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কেননা তাহা হইলে যাঁহারা যথোচিত মূল্য দিতে সক্ষম তাঁহারাও খাঁটি ঘি খাইতে পাইবেন না। ভেজিটেবল-প্রোডাক্টে রঙ্ মিশাইলে কাহারও কোন ক্ষতি নাই। যাঁহারা ভেজিটেবলই খাইতে চান তাঁহারা অনায়াসে উহা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ ভারত-সরকার বলিতেছেন ঘিয়ে চিরদিনই ভেজাল চলিয়া আসিতেছে—তখন চর্ব্বি ভেজাল দেওয়া হইত, বর্ত্তমানে না হয় ভেজিটেবল প্রোডাক্টই ভেজাল দেওয়া হইল; ইহাতে ক্ষতি কি ?

পূর্ব্বে যে ঘির সহিত প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বি ভেজাল দেওয়া হইত একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভেজিটেবলের প্রচলনে ঘিয়ে ভেজাল মেশান আরও সহজ সাধ্য হইয়াছে। কেননা—

১। ঘির সহিত চর্ব্বি মিশ্রিত করিলে এক-জন সাধারণ লোকও গন্ধ শুঁকিয়া অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু ভেজিটেবল প্রোডাক্ট—যথেষ্ট পরিমাণে মেশাইলেও অতি অভিজ্ঞব্যক্তিও কিছুতেই বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃত আগুণে চড়াইবা মাত্র দুর্গন্ধ বাহির হয়। ভেজিটেবল মিশাইলে কিন্তু কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই। এমন কি দশগুণ ভেজি-টেবলে যদি একগুণ খাঁটি ঘি মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলেও সমস্ত মিশ্রিত পদার্থটাকে খাঁটি ঘি বলিয়া চালাইয়া দেওয়া কিছুমাত্র কষ্টকর ব্যাপার নহে।

২। চর্ব্বি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে হিন্দু-দিগের সংস্কারে বাধে। সত্য বটে—অনেক মাড়োয়ারী লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ঘির সহিত চর্ব্বি মেশানর ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। কিন্তু সেই সকল দুর্লোভী মাড়োয়ারীরাও অতি সংগোপনে এই জঘন্য ব্যবসায় চালাইত; কারণ ধরা পড়িলে তাহাদের জাতিচ্যুতি এবং অন্যান্য সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। কোনও প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী এই ব্যাপারে ধরা পড়িয়া একলক্ষটাকা জরিমানা দিয়া এবং যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে পুনরায় সমাজে স্থান পাইয়াছিল।

একবার কোনও মাড়োয়ারী ঘিয়ের ব্যাপারীর সহিত এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হয়; আমি তাহাকে বলিলাম যে তোমরা ত নিত্য গঙ্গাস্নান কর, ফোঁটা কাট, মন্দিরে যাও, পূজাকর, নিরামিশ ভোজন কর, গোমাতার জন্য অনেক কিছু করিয়া থাক; অথচ ঘিয়ের সহিত নানা মৃত পশুর চর্ব্বি মিশাইয়া হিন্দুর জাতি, ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্য নাশ করিবার জন্য কেন এই জঘন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে? মাড়োয়ারী ব্যাপারী অম্লানবদনে হাঁসিয়া উত্তর করিল—"বাবুজী—ইস্‌মে কেয়া হ্যায়? ব্যাপার মে কুচ্ দোষ নেহি; হাম্‌তো ই'য়ে সব চীজ্ আপ্‌না নেই খাতা হ্যায়।" বলা বাহুল্য যাহাদের নীতি, ধর্ম্ম এবং ব্যবসায়ে সততার আদর্শ এইরূপ তাহাদের নিকট ধর্ম্মের কাহিনী—বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা—

কারণ "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। যাহা হউক ঘিয়ের সহিত চর্ব্বি মিশানোর কারবার দেশে চলিত থাকিলেও ঐরূপ লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের লোকে যাহাদের গৃহে ঘি তৈয়ারী হয়, তাহারা চর্ব্বি মিশাইতে সাহস করিত না। সাধারণতঃ চর্ব্বি মেশান হইত কলিকাতার মত সহরে বা সহরতলীতে।

কিন্তু ভেজিটেবল প্রোডাক্টের বিরুদ্ধে সেরূপ সংস্কার গত বাধা নাই। বরং উহা উদ্ভিজ্জ্য ঘৃত বলিয়া অনেকের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করে। আজকাল সুদূর মফঃস্বলেও গাড়ী গাড়ী ভেজিটেবল প্রোডাক্ট চালান যাইতেছে। যাহাদের বাড়ীতে ঘৃত তৈয়ারী হয় সেই সমস্ত গৃহস্থরাই আজকাল ঘৃতের সহিত ভেজিটেবল প্রোডাক্ট মিশাইতেছে বলিয়া সহস্র চেষ্টাতেও খাঁটি ঘি মিলিবার উপায় নাই।

এখন গভর্ণমেণ্টের আদেশে ভেজিটেবলের সহিত যদি কোন গাঢ় রঙ মিশাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা আর ঘৃতের সহিত ভেজাল দিবার উপায় থাকিবে না। কেননা মিশাইলেই রঙের জন্য ধরা পড়িবে।

এদেশে আজকাল যেরূপ বিরাটভাবে খাদ্য-দ্রব্যে ভেজাল মেশান হইতেছে দুনিয়ার কোন সভ্য দেশে সেরূপ সম্ভব কিনা সন্দেহের বিষয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে সহজে বিশেষ কিছুই করিতে চাহেন না।

কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই দেশবাসীর ভেজালের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। যাহা গভর্ণমেণ্ট স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া করিতে চাহেন না আমাদিগকে আন্দোলনের বলে তাহা করাইতে বাধ্য করিতে হইবে। দেশে যত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বা সাময়িক পত্রাদি আছে আমরা সকলকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

হোয়াইট অয়েল

ভেজিটেবল প্রোডাক্টের আমদানী হওয়ায় বাজার হইতে যেমন গব্য ও মহিষা ঘৃত অদৃশ্য হইয়াছে, হোয়াইট অয়েলের আমদানীর ফলেও সেইরূপ খাঁটি সরিষা ও নারিকেল তৈল পাইবার উপায় নাই। ইহার পূর্ব্বে যে সরিষার তৈলে কোন রূপ ভেজাল মেশান হইত না, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না, তবে হোয়াইট অয়েল আমদানী হওয়ায় ঐ ভেজাল মেশান কার্য্য এরূপ অধিক

পরিমাণে অথচ এরূপ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে যে সাধারণের পক্ষে উহা বুঝিতে পারা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।

তৈলে ভেজাল মেশানর ফলে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে দেশের জনসাধারণ বোধ হয় তাহা এখনও সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে ভেজালের বিরুদ্ধে আজিও জেহাদ ঘোষিত হয় নাই কেন? সংবাদপত্র মহলে কারণে অকারণে কত সামান্য জিনিষ লইয়া দিনের পর দিন আলোচনা আন্দোলন হইয়া থাকে; কৈ ভেজালের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লেখনী ধারণ করিতে কাহাকেও ত দেখিতে পাই না।

"দিন দিন আয়ুক্ষীণ
হীন বল দিন দিন"

বাঙ্গালী আমরা পলে পলে মৃত্যুর পানে ধাইয়া চলিয়াছি। সরকারী রিপোর্টে মৃত্যুর হার দেখিয়া, সরকারী গণনা হইতে পরমায়ুর অল্পতা দেখিয়া মাঝে মাঝে যখন আমাদের চমক ভাঙ্গিয়া যায় তখন সেই অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় কেহ গভর্ণমেণ্টকে কেহ স্বদেশবাসীকে নির্ব্বিচারে গালিগালাজ করতঃ আবার নিদ্রাদেবীর আরাধনার নিমিত্ত পরম নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিয়া শুই। এমন আপন ভোলা জাত কি ধরাপৃষ্ঠে বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

শুনিতে পাই আমাদের শাস্ত্র নাকি শরীরকেই ধর্ম্ম সাধনের প্রধান উপাদান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, আরও শুনিতে পাই আমাদের স্থায় ধর্ম্মপ্রাণ জাতি নাকি ধরাপৃষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে আমাদের শরীরের আজ এই দুর্দ্দশা কেন? সাধারণ বাঙ্গালী যুবকের চেহারা দেখিলে সত্য সত্যই অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার মনে শান্তি নাই, মুখে দীপ্তি নাই, দেহে শক্তি নাই, আর সবার বড় দুঃখ কোন কিছু খাইয়াও সে হজম করিতে পারে না।

বলিতে পার হোয়াইট অয়েলের বিষয় লিখিতে বসিয়া এত কথার অবতারণা করিতেছি কেন? সামান্য কথা বলিতে গিয়া অত ভনিতার প্রয়োজন কি?

ভণিতার প্রয়োজন এই যে এদেশের লোকের দৃষ্টি শক্তি সেরূপ প্রখর নহে। ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে সহস্রগুণ বড় করিয়া চ'খের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে তাহারা যে কিছুই দেখিতে পায় না।

ফলতঃ ব্যাপারটীকে সামান্য বলিয়া আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। স্বাস্থ্যই সম্পদ। সমস্ত জাতি যখন সেই স্বাস্থ্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হয় তখন তাহা জটিলতম সমস্যায় পরিণত হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বাংলা আজ সেই সমস্যার সম্মুখীন। শিক্ষিত বাঙ্গালী বুদ্ধিমানের স্থায় ইহার সমাধানের চেষ্টা না করিয়া যদি উপেক্ষার হাসিতে উড়াইয়া দিতে চায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাকে অনেক দুঃখই ভোগ করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু চিরদিনই কি সে এইরূপ হীনবল, ভগ্নস্বাস্থ্য ও অল্পায়ু ছিল। পঁচিশ বৎসর বয়সেই আজকাল লোকে বুড়া হইয়া পড়ে; কিন্তু এমন দিন ত ছিল যখন বাংলার পল্লীতে অশীতিপর বৃদ্ধের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল; একশত বৎসরের বুড়া বিনা চশমায় দেখিতে পাইত, বিনা লাঠিতে চলিতে পারিত, এমন কি দৌড়াদৌড়ি করিতেও তাহাদের কষ্ট বোধ হইত না। তবে আজ কেন এমন দশা হইল তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিবে না?

স্বাস্থ্যহানির অজস্র কারণ থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন অন্যতম।

কিন্তু ভেজাল খাদ্যের প্রচলনও নিতান্ত সামান্য কারণ নহে।

সাধারণ ভারতবাসীর দৈনিক গড়ে আয় ৴১০ পয়সা মাত্র। বাঙ্গালীর আয় ৵০ আনার বেশী হইবে না। অর্থাৎ আমরা দুইবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পাই না। একেই এই দারুন খাদ্যাভাব তাহার উপর যাহা খাইতে পাই তাহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও যদি বিশুদ্ধ হইত তাহা হইলেও ভাবনা ছিল না। কিন্তু গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় খাদ্যাভাবের উপর অখাদ্যের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ভেজালের বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রবল আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। বহুদিন হইতে আমরা প্রবন্ধ লিখিয়া এই দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে ঘিয়ের ভেজাল ও ভেজিটেবল প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তেলের ভেজাল হোয়াইট অয়েল সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে চাই।

হোয়াইট অয়েল জিনিসটা আর কিছুই নহে—উহা বর্ণ এবং গন্ধ হীন সস্তাদরের প্যারাফিন অয়েল বা কেরোসিন তেল মাত্র। উহা এরূপ স্বচ্ছ যে সরিষা বা নারিকেল তৈলের সহিত যে কোন মাত্রায় মিশ্রিত করিলেও ঐ ঐ তৈলের বর্ণের পরিবর্তন হয় না,এবং গন্ধের ও এরূপ কম পরিবর্তন হয় যে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে ধরা একরূপ অসম্ভব।

ইহাতে লোভী ব্যবসায়ীদিগের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। তাহারা অল্প মূল্যে টিন টিন হোয়াইট অয়েল ক্রয় করিয়া সরিসা ও নারিকেল তৈলের সহিত যথেচ্ছ পরিমাণ মিশ্রিত করতঃ ঐ মিশ্রিত তৈলকে খাঁটি সরিষা ও নারিকেল তৈল বলিয়া উচ্চ দরে বিক্রয় করিতেছে।

সাধারণ লোকের পক্ষে—আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য করা যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে বেশী বেশী পরিমাণে ঠকিতে হইতেছে; ইহার ফল বড়ই বিষময়। ভেজালের প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্য আজ চরমদশায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হোয়াইট অয়েল প্যারাফিন হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ উহা কেরোসীন জাতিয় তৈল; কেরোসীন পেটের পীড়া জন্মায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশুদ্ধ করিয়া চিকিৎসকগণ কেরোসীন জাতীয় তৈল হইতে ক্যালল প্রভৃতি নানাবিধ বিরেচক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও খুব সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে হোয়াইট অয়েল পেটে পড়িলে পেট ছাড়িয়া দিবার সমূহ সম্ভবনা। ঘটিতেছেও ঠিক তাহাই। আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রায়ই লোকের পেটের অসুখ করে।

ভেজিটেবল প্রোডাক্টের প্রবর্ত্তনে খাঁটি ঘি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। কিন্তু হোয়াইট অয়েলের আবির্ভাবে দেশের যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে তাহার বুঝি আর তুলনা নাই।

১। ঘৃত সদাসর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু তৈল ব্যবহৃত হয় সদাসর্ব্বদা; বিশেষতঃ বাঙালী আমরা ভাতে পোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত তরীতরকারীতে নিত্য দুই বেলা সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি।

২। ঘৃত অল্পপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু

তৈল ব্যবহৃত হয় প্রচুর পরিমাণে। কাজেই তৈলে কোন বিষাক্ত পদার্থ থাকিলে তাহা দ্বারা আমাদের অধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

৩। তৈল অপেক্ষা ঘৃতের মূল্য অধিক। ঘৃত কিনিবার সামার্থ্য সকলের নাই। কিন্তু ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেই অল্লাধিক তৈল ব্যবহার করে। এইজন্য ঘৃতে ভেজাল মিশাইলে যত লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে তৈলে ভেজাল মিশাইলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা।

সরিষার তৈল যে কেবল আহার্য্যরূপেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। আমরা উহা গায়ে মাখিয়া থাকি। তেলে জলে আমাদের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শরীর গঠিত। আয়ুর্ব্বেদের মতে খাঁটি সরিষার তৈলের রোগ দূরীকরণের ক্ষমতা অপরিসীম। হোয়াইট অয়েলের উল্লিখিত গুণ নাই। কাজেই সরিষার তৈলের পরিবর্ত্তে হোয়াইট অয়েল গায়ে মাখিয়া আমরা কিছুমাত্র উপকার পাই না।

সরিষা তৈলের মত নারিকেল তৈলের সহিতও প্রচুর পরিমাণে হোয়াইট অয়েল মেশান হয়। বঙ্গদেশে সরিষার তৈল যেরূপ আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীগণ সেইরূপ নারিকেল তৈল আহার করিয়া থাকে। কাজেই হোয়াইট অয়েলের শুভ আবির্ভাবে সমগ্র ভারতের স্বাস্থ্য ধ্বংস হইতে বসিয়াছে।

হোয়াইট অয়েল যেরূপ বর্ণহীন এবং গন্ধহীন সেইরূপ উহা যদি নির্গুণ বলিয়াও প্রমাণিত হয় অর্থাৎ ডাক্তারেরা যদি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে উহাতে কোন বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান নাই তাহা হইলেও আহার্য্য তৈলের সহিত হোয়াইট অয়েলের মিশ্রনের সমর্থন করা যায় না। কেননা কোন দ্রব্য বিষাক্ত না হইলেই তাহা খাদ্য হইয়া উঠে না। লোক খাদ্যাদি আহার করে তাহার Positive value র জন্য; যে দ্রব্যে যত অধিক পরিমাণ ভিটামিন থাকে সেই দ্রব্য তত পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সরিষা ও নারিকেল তৈলে খাদ্যপ্রাণ অর্থাৎ ভিটামিন বিদ্যমান। সেইজন্য দেহ রক্ষার জন্য ঐ দুই দ্রব্যের প্রয়োজন। কিন্তু হোয়াইট অয়েলে আদৌ ভিটামিন নাই। কাজেই উহা আহার করিলে খাদ্যের অভাব পূর্ণ হয় না।

ভিটামিনশূন্য দ্রব্য আহার করিয়া লাভ নাই। উহাতে পুষ্টিকর পদার্থ বিদ্যমান না থাকায় উহা ব্যবহারের ফলে শরীর স্বতঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এদিকে দুর্ব্বল শরীর নানা রোগের আকর। কাজেই হোয়াইট অয়েল বিষাক্ত না হইলেও প্রকারান্তরে উহা আমাদের অশেষ অনিষ্ট সাধন করে।

এখন দেখা যাউক কেমন করিয়া উহার হাত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতে পারি।

কলিকাতাস্থ ভারতীয় বনিক সভা ১৯২৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটী আবেদন করিয়া হোয়াইট অয়েল যে কিরূপ ব্যাপকভাবে আহার্য্য তৈলের সহিত ভেজাল দেওয়া হইতেছে সেই দিকে ভারত গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁহারা কয়েকটী প্রস্তাব করেন—

(১) আহার্য্য তৈলের সহিত ভেজাল দিবার উদ্দেশ্যে হোয়াইট অয়েলের আমদানী একেবারে রদ করা হউক।

(২) অন্য উদ্দেশ্যে উহার আমদানী করিতে হইলে আমদানী কারক যেন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে বিশেষ লাইসেন্স লইতে বাধ্য হয়।

(৩) লাইসেন্স অনুযায়ী যে যে হোয়াইট অয়েল আমদানী হইবে তাহার উপর এরূপ হারে

খুব বগান উচিত যে উহা কোন ও আহার্য্য তৈলের সহিত মিশ্রিত করা লাভ জনক হইবে না।

আমরা উল্লিখিত তিনটী প্রস্তাবেরই সমর্থন করি। সত্য বটে হোয়াইট অয়েলের আমদানী বন্ধ করিলে কিম্বা উহার উপর মাত্রাতিরিক্ত চড়া ডিউটী বসাইলে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত কারকদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে, কিন্তু কয়েক জন ব্যবসায়ীর সুবিধার দিকে চাহিয়া একটা জাতির স্বাস্থ্য বলি দেওয়া যায় না।

ভারতীয় বণিক সভা হোয়াইট অয়েল আমদানীর বিরুদ্ধে যেরূপ দৃঢ় ভাবে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, দেশের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য ঠিক তেমনই ভাবে নিজেদের মতামত গভর্ণমেণ্টের নিকট ব্যক্ত করা। জনমতের একটা মস্ত বড মূল্য আছে। যেমনতর গভর্ণমেণ্টই হউক না কেন জনমতকে কখনই চিরকাল উপেক্ষা করিতে পারে না। আন্দোলনের দ্বারা সেই জনমতকে সংহত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হয়।

আসল কথা চেষ্টা চাই। বাঁচিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বাঁচিবার অত্যুগ্র ইচ্ছা। এই ইচ্ছার অভাবেই আমরা মরিতে বসিয়াছি।

খাদ্যে ভেজাল মেশান হয় কিন্তু তাহার প্রতিবাদ হয় কৈ? সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠে কৈ? **না, কিছুতেই আমরা ভেজাল বিষ আহার করিয়া মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিব না।**

দেশে সাময়িক কাগজের অভাব নাই। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ হইতেই অজস্র কাগজ বাহির হইতেছে। সম্ভব, অসম্ভব কত বিবিধ ব্যাপারই ঐ সকল কাগজে আলোচিত হয়। ইহারা যদি সকলেই ভেজাল বিষের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আন্দোলন সুরু করিত, তাহা হইলে ভেজাল দ্রব্য সম্পূর্ণ রূপে নিরাকৃত হউক বা নাই হউক উহার প্রভাব যে বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

কোন স্বাধীন দেশেই খাদ্যের নামে অখাদ্য বিক্রয় করা চলে না। করিলে রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। সকল সভ্য দেশের গভর্ণমেণ্টই এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত জাগ্রত। আমাদের পরাধীন দেশের বিদেশী গভর্ণমেণ্ট অবশ্য এ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না; কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই দেশবাসীর দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট নিজ হইতে যাহা করিতে চাহেন না দেশবাসীর কর্ত্তব্য প্রবল জনমত গড়িয়া তুলিয়া গভর্ণমেণ্টকে সেই কাজ করিতে বাধ্য করা।

আইন প্রণয়ন করিয়া হোয়াইট অয়েলের আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিলে দেশের একটী মহদুপকার সাধিত হইবে। কেননা—তাহা হইলে আজকাল যেরূপ বিরাট ভাবে তৈলের সহিত ভেজাল মেশান হইতেছে সেরূপ ভাবে আর ভেজাল মেশান যাইবে না।

দেশবাসী ইচ্ছা করিলে কেবল একটী মাত্র উপায় অবলম্বন করিয়া খাঁটি খাদ্য দ্রব্য পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন; এবং আমাদের মনে হয় সে ব্যবস্থা অবলম্বন করা কিছুমাত্র দুরূহ নহে। সেই উপায়ের কথা—বারান্তরে আলোচিত হইবে।

লাক্ষার চাষ ও শেল্যাক্ প্রস্তুত প্রণালী

অতি ক্ষুদ্র এক প্রকার কীট আছে তাহাদের দেহ হইতে রস নির্গত হয়। এই রস তাহাদের দেহের চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া যায়। এই সব কীটের এই জমাট বাঁধা রসই হইল লাক্ষা। কীটের দেহের রস জমাট বাঁধিয়া একটি শক্ত আবরণের (Shell) মত হয়। ক্রমে কীটটি মরিয়া গেলে, এই শক্ত আবরণটি তাহার দেহ হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। এই শক্ত আবরণটিই হইল লাক্ষা। কি উপায়ে এই আবরণটি পৃথক করিয়া লওয়া হয় তাহা পরে বিবৃত হইবে।

শেল্যাক। Crude বা অপরিষ্কৃত লাক্ষার মধ্যে যে রঙীন পদার্থ ও অন্যান্য ময়লা জিনিস থাকে তাহা পরিষ্কার করিয়া যে মোমের মত নরম পদার্থ পাওয়া যায় তাহাই হইল শেলাক। দুইটি উপায়ে লাক্ষা পরিষ্কার করা হয়।

প্রথম উপায় লাক্ষা গরম করিয়া গলাইয়া পরিষ্কার করা।

দ্বিতীয় উপায় Solvent Process দ্বারা।

এই প্রবন্ধে আমরা লাক্ষা গলাইয়া শেলাক প্রস্তুত প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিব। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রণালী দ্বারাই শেলাক প্রস্তুত হয় এবং অল্প পরিমাণ শেলাক প্রস্তুতের পক্ষে এই প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শেলাক প্রস্তুতের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে লাক্ষাকে স্পিরিটে ভিজাইয়া রাখিয়া গলাইয়া ফেলা। তার পর তাহা ছাঁকিয়া লইয়া শেলাক প্রস্তুত করা হয়। বৃহৎ কারখানার পক্ষে এই প্রণালিটি ভাল। কিন্তু এই প্রণালী দ্বারা যে শেলাক প্রস্তুত হয় তাহা অপেক্ষা লাক্ষা গলাইয়া যে শেলাক হয় তাহাই উত্তম।

লাক্ষা কীট ছয় মাসের বেশী বাঁচে না; "কুসুম" ফুল, পলাশ, বাবলা, কথ বেল এবং অড়হর গাছের কচি ডালে লাক্ষা কীট বাসা বাঁধে; ইহারা এই সব গাছের রস পান করিয়া বাঁচে। এই রস কীটের দেহের মধ্যে গিয়া পরিবর্ত্তিত হয় এবং কিছুকাল পরে ইহার দেহ হইতে এই রস বাহির হইয়া জমাট বাঁধিয়া একটি শক্ত আবরণে পরিণত হয়। লাক্ষা কীট এই শক্ত আবরণের নীচে কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিবার পর মরিয়া যায়। ইহার বাচ্চা তখন বাহির হইয়া আরো কচি ডালে গিয়া বাসা বাঁধে এবং ঐ গাছের রস খাইয়া বাড়িতে থাকে। লাক্ষা কীটের দেহের উপরের এই শক্ত আবরণটি লইয়াই লাক্ষা ব্যবসায়ীদের কারবার। মৃত কীটের দেহের উপর হইতে এই শক্ত আবরণটি হয় চাঁচিয়া তুলিয়া লওয়া হয়, না হয় কীট সমেত ডাল গুলি কাটিয়া লওয়া হয়। তার পর এই সব ডাল হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়।

আমাদের এই বাংলা দেশে লাক্ষা উৎপন্নের জন্য কোনো যত্ন লওয়া হয়না, কিংবা এই ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য কোনো চেষ্টাও করা হয় না। লাক্ষা চাষের জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিলে ইহার পরিমাণ ও গুণের বা Qualityর কত উন্নতি হইতে পারিত! কিন্তু আমাদের দেশ সাধারণতঃ উর্ব্বরা বলিয়া জমিতে একটু আঁচড় কাটিয়া ধান ছড়াইয়া দিলেই যখন বৎসরের আহার্য্যের আর ভাবনা থাকে না, তখন পরিশ্রম করিয়া মাথা ঘামাইয়া কোনো কাজ করিবার কিংবা কোনো ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার স্পৃহা সাধারণতঃই আমাদের থাকে না। সহজেই যখন আহার্য্য জুটিয়া যায় তখন ঘরের কোণে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তার বেশী করিবার উদ্যম আর থাকে না। কাজেই এ দেশের লোক শ্রম বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে এবং যেমন তেমন করিয়া দুমুঠা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে।

একটু পরিশ্রম করিয়া লাক্ষা চাষের উন্নতি করিতে পারিলে লাক্ষা চাষীর ঘরে এখন যে টাকা আসে তদপেক্ষা দ্বিগুণ টাকা আসিতে পারে। এখন সাধারণতঃ আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের গৃহস্থের ঘরের কোনে যে ২ ৪টি কুল গাছ থাকে তাহাতে আপনা আপনি লাক্ষা কীটেরা বাসা বাঁধিয়া যে লাক্ষা উৎপন্ন করে তাহা দ্বারাই আমাদের দেশের লাক্ষার ব্যবসায় চলিতেছে। সাধারণ চাষী গৃহস্থ ধান ও পাটের চাষের প্রতি যতটা মনোযোগ দেয় তাহার সিকিও লাক্ষা উৎপন্নের দিকে দেয় না। এমন কি যে বৎসর লাক্ষার দাম বাড়িয়া যায় সে বৎসর ও ইহার প্রতি মন দেয় না; শুধু এইটুকু দেখে যে কেহ যেন গাছ হইতে লাক্ষা চুরী না করে।

সাধারণ গৃহস্থ ছাড়া বড় বড় জোতদার ও ধনী গৃহস্থের জমিতে লাক্ষা বাহী গাছের সংখ্যা বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব গাছ হইতে জমিদারেরা নিজেই লাক্ষা সংগ্রহ করে কিংবা "আধা" নিয়মে বড় বড় লাক্ষা ব্যবসায়ীদের কর্ম্মচারীরা লাক্ষা সংগ্রহ করে। কোন কোন স্থানে লাক্ষা উৎপন্ন করিতে যত ব্যয় হয় তাহা লাক্ষা ব্যবসায়ীদের লোকেরা বহন করে এবং যত দিন না লাক্ষা পুষ্ট হয় ততদিন ইহার তদারক করে। ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা উৎপন্ন লাক্ষার অর্দ্ধেক পায়; ইহাই হইল আধা নিয়ম; আমাদের দেশে যেমন ভাগে চাষ হয় ইহাও সেইরূপ।

এতদিন পর্য্যন্ত উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাক্ষা উৎপন্ন করিবার উপায় এ দেশের লোকের জানা ছিলনা। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে লাক্ষা ব্যবসায়ীরা উন্নততর প্রণালীতে লাক্ষা উৎপাদনের উপায় জানিতে পারিতেছে। ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

STICK LAC বা কাঠীগালা।

গাছ হইতে সংগৃহীত crude বা অপরিস্কৃত লাক্ষার মধ্যে অনেক ছোট ছোট গাছের ডাল পালা থাকে। এই ডাল পালা সমেত লাক্ষাকে Stick Lac বলে। লাক্ষার কোনো কোনো varietyর মধ্যে বেশী ডালপালা থাকে, কোনটির মধ্যে কম থাকে। কুসুম গাছে যে লাক্ষা জন্মে তাহার প্রতি মণের মধ্যে পাঁচ সের এইরূপ ডাল পালা থাকে। ডাল পালা হইতে লাক্ষা তুলিয়া লইবার পর সেই সব ডালপালা জ্বালাইয়া জল গরম করা হয় এবং কাপড়ের ব্যাগ গুলি পরিষ্কার করা হয়।

লাক্ষা উৎপাদনকারী চাষা লাক্ষা তৈয়ারী হইলে Stick Lac লইয়া গ্রামের হাটে গিয়া বেপারির নিকট তাহার মাল বিক্রয় করে। বেপারি আবার তাহার মাল আড়তদারের নিকট বিক্রয় করে।

Stick Lac বা কাঠী গালা।

আড়তদার হয় তাহার মাল কোনো শেলাক প্রস্তুত কারীর নিকট বিক্রয় করে, নতুবা কলিকাতায় গিয়া বিদেশে চালানকারী কোনো Stick Lacএর ব্যবসায়ীর নিকট তাহা বিক্রয় করে। বড় বড় লাক্ষা উৎপন্নকারীদের কমিশন এজেণ্ট হইয়াও আড়তদার তাহাদের মাল বিক্রয় করিয়া দেয়।

অনেক সময় আড়তদার কোনো বড় লাক্ষা ব্যবসায়ীর কলিকাতায় অবস্থিত firmএর সহিত সংশ্লিষ্ট মফঃস্বলের কোনো লাক্ষার কারবারীর নিকট Stick lac বিক্রয় করে। আবার অনেক সময় যে সবস্থানে লাক্ষা উৎপন্ন হয় সেই সব স্থানে অনেক বড় বড় লাক্ষা ব্যবসায়ীদের নিজেদের লোকই সর্ব্বদা থাকিয়া মাল বেচা কেনা করে।

লাক্ষার কারবারে Speculation বা ফট্‌কা খুব চলে। সাধারণতঃ আড়তদারেরা এবং বড় বড় লাক্ষা ব্যবসায়ীরা বাজার বুঝিয়া মাল গুদাম জাত করিয়া রাখে এবং দর বাড়িলে তাহা বাজারে বিক্রয় করে। গরীব গ্রাম্য চাষীদের হাতে টাকা থাকে না বলিয়া তাহারা মাল আটকাইয়া রাখিতে অসমর্থ হয়। মাল উৎপন্ন হইলেই তাহারা তখনি বেচিয়া ফেলে, কেন না তাহাদের নগদ টাকারই বেশী দরকার।

জার্ম্মানী আমেরিকা এবং অন্যান্যদেশে crude লাক্ষা এদেশ হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। এই সব দেশে Solvent প্রণালীতে শেলাক তৈয়ারী হয়। ভারতবর্ষে যত শেলাক প্রস্তুত হয় এই সবদেশে তাহা অপেক্ষা অনেকবেশী শেলাক এখন প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে ভারতবর্ষের শেলাক প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষের লাক্ষা ব্যবসায়ীরা আড়তদারদের নিকট হইতে crude লাক্ষা কিনিয়া শেলাক প্রস্তুত করে কেবল বিদেশে চালান দিবার জন্য ভারতবর্ষে খুব অল্পই শেলাক বিক্রয় হয়, কিন্তু

বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। শেলাক প্রস্তুতকারী নিজে কখনো বিদেশে শেলাক চালান দেয় না। সে শুধু crude লাক্ষা হইতে সমস্ত ময়লা এবং যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাহির করিয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সুদৃশ্য আকারে ইহাকে শেলাক ক্রেতার উপযোগী করিয়া রাখে।

যদিও ইহা একেবারে প্রমাণিত হয় নাই তবু সাধারণতঃ দেখা যায় যে যে প্রকার গাছে লাক্ষা কীটেরা বাসা বাঁধে, সেই গাছের প্রকৃতিগত গুণ অনুসারে তাহাদের লাক্ষার গুণেরও তারতম্য হয়। যদিও জলবায়ু এবং আবহাওয়ার তারতম্যের উপর লাক্ষার গুণের (Qualityর) তারতম্য কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে তথাপি দেখা গিয়াছে যে একই জাতীয় লাক্ষা কীট বিভিন্ন প্রকার গাছের রস পান করিয়া বিভিন্ন Qualityর লাক্ষা উৎপাদন করিতেছে।

লাক্ষা কীট পালন এবং পরিপোষণের জন্য খুব যত্ন লওয়া উচিত। যাঁহারা এ বিষয় সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা Agriculture and Forest Dept কর্তৃক প্রকাশিত লাক্ষা চাষ সম্বন্ধে পুস্তিকা সকল পাঠ করিতে পারেন। রাঁচি সহরে লাক্ষা সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার জন্য একটি পরীক্ষাগার আছে। ভারতবর্ষ হইতে যত শেলাক রপ্তানি হয় তাহার প্রতি মনের উপর চারি আনা ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া যে টাকা পাওয়া যায় তদ্দারা এই পরীক্ষাগারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

লাক্ষা বৎসরের মধ্যে দুইবার সংগ্রহ করা হয়। একবার গ্রীষ্মকালে, আর দ্বিতীয়বার শরৎকালে; কুসুম গাছের লাক্ষা ব্যতীত, অন্য সব রকম গাছের লাক্ষা একবার বৈশাখ এবং আর একবার কার্ত্তিক মাসে সংগ্রহ করা হয়। সময় অনুসারে বৈশাখে যে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয় তাহার নাম "বৈশাখী" এবং কার্ত্তিক মাসে যে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয় তাহার নাম "কেতকী"। "কুসুম" গাছের লাক্ষা জ্যৈষ্ঠ এবং অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রহ করা হয়। তাহাদের নাম "জ্যৈষ্ঠ এবং অঘানি।" শীতকালে "কুসুম" গাছের যে লাক্ষা সংগৃহীত হয় তাহাকে "নগেলি" কিংবা "কুসুমি" ও বলা হয়।

লাক্ষা কীট যে প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় সেই অনুসারে লাক্ষার Quality এবং পরিমাণেও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ বৃষ্টির জল প্রচুর পরিমাণে পাইয়া বৈশাখমাসে সব গাছই বেশ পুষ্ট ও সজীব হইয়া উঠে। সুতরাং বৈশাখী লাক্ষা কেতকী লাক্ষা অপেক্ষা গুণে উৎকৃষ্ট এবং পরিমাণেও প্রচুর হয় অন্য সব বিষয় সমান থাকিলে ইহা দেখা যায় যে কুসুম গাছ ব্যতীত অন্য সব গাছের বৈশাখী লাক্ষার মূল্য কেতকী লাক্ষা অপেক্ষা বেশী। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কুসুম গাছের গ্রীষ্মের লাক্ষা অপেক্ষা কুসুমী লাক্ষা সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। বৈশাখী লাক্ষা, কেতকী লাক্ষা অপেক্ষা যে সব গুণে শ্রেষ্ঠ তন্মধ্যে এই একটি গুণ দেখা যায় যে বৈশাখী লাক্ষার মধ্যে রঙের পরিমাণ কম। যে লাক্ষার মধ্যে রঙের পরিমাণ বেশী তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং তাহা হইতে যে শেলাক প্রস্তুত হয় তাহা পরিমাণেও বেশী হয় না।

Stick Lac ধুইয়া পরিষ্কার করিবার পর তাহা হইতে যে জল বাহির হয়, তাহা লাল রঙের। পূর্ব্বে নানা কাজের জন্য এই রঙ ব্যবহৃত হইত। বিশেষতঃ রেশম রঙ করিবার জন্য ইহা খুব ব্যবহৃত হইত। বস্তুতঃ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কেবল রঙেরই জন্য লাক্ষার চাষ হইত।

জাঁতায় কাঠীগালা পেষা হইতেছে।

ইহার উপরের কঠিন আবরণটি ফেলিয়া দেওয়া হইত। উন্নততর প্রণালীতে উৎকৃষ্ট রঙ তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হওয়ায় লাক্ষা হইতে রঙ তৈয়ারীর ব্যবসা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। তারপর লাক্ষার কঠিন আবরণটিই যে আসল জিনিস এবং অতিশয় মূল্যবান তাহা যদি আবিষ্কার না হইত তবে ভারতবর্ষ হইতে লাক্ষার চাষ ও ব্যবসায় একেবারে উঠিয়া যাইত।

গাছ হইতে লাক্ষা তুলিয়া ভাল করিয়া যদি ভাণ্ডার জাত করিয়া না রাখা হয়, তবে লাক্ষা খারাপ হইয়া যায়; যে সব লাক্ষাতে লাক্ষা কীট কিছু কিছু বর্ত্তমান থাকে সেই সব লাক্ষা যদি অল্প দিনের জন্ত ও গাদা করিয়া রাখা হয় তবে উহা শক্ত চাপ বাঁধিয়া বসিয়া যায়। এইরূপ শক্ত চাপ বাঁধা লাক্ষা হইতে ভাল শেলাক প্রস্তুত করা যায় না কারণ তাহাতে অনেক ধুলা ময়লা থাকিয়া যায়। এই সমস্ত চাপ বাঁধা লাক্ষা হইতে সাধারণ দেশী নিয়মে যে শেলাক প্রস্তুত হয়, তাহা নিম্ন শ্রেণীর। এই চাপ বাঁধা লাক্ষা হইতে ভাল শেলাক প্রস্তুত করিবার একটি উন্নত প্রণালী বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আলো বাতাস খেলে এমন একটি শুষ্ক, ঠাণ্ডা ঘরে লাক্ষা ভাণ্ডার জাত করিয়া রাখিলে তাহা বেশ ভাল থাকে। সিমেণ্ট করা মেজের উপর যদি রাখা হয় তবেত খুবই ভাল হয়। যদি মাটির মেজেতে রাখিতে হয় তবে ভাণ্ডার জাত করিবার কয়েক দিন আগে গোবর দিয়া ২।৩ দিন লেপিয়া শুকাইয়া রাখা উচিত। লাক্ষা মেজের উপর পাতলা করিয়া বিছাইয়া দিনে দুইবার উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেওয়া উচিত। স্থানের অভাবে যদি ঘন করিয়া লাক্ষা বিছাইয়া রাখিতে হয় তবে দিনের মধ্যে অনেকবার উল্‌টাইয়া দেওয়া দর-

কার। এইরূপে একমাস ধরিয়া লাক্ষা শুকাইয়া কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দেওয়া উচিত। লাক্ষা ভাণ্ডারজাত করিবার এই প্রণালী অবলম্বন না করিলে অতি শীঘ্রই লাক্ষার মধ্যে যে কীট অবশিষ্ট থাকে তাহা পচিয়া উঠে। কীটাযুক্ত পচা লাক্ষা শীঘ্র গলেনা এবং ইহার মধ্যে যে রঙ আছে তাহাও সহজে পৃথক করা যায় না।

লাক্ষা ভাণ্ডার জাত করিবার যে উন্নত প্রণালীর কথা এখানে বলা হইল, সেই প্রণালীতে লাক্ষা ভাণ্ডার জাত করিয়া অধিকদিন ফেলিয়া রাখিলেও ইহার শীঘ্র গলিয়া যাইবার গুণ নষ্ট হইয়া যায় এবং এইরূপ বেশী দিনের সঞ্চিত লাক্ষা হইতে কম পরিমাণে শেলাক পাওয়া যায়। Resin নামক নামক পদার্থ লাক্ষার সহিত মিশ্রিত করিলে ইহা শীঘ্রই গলিয়া যায়। সুতরাং লাক্ষা বেশী দিন ভাণ্ডার জাত করিয়া রাখিলে যে ইহার গলিবার গুণ নষ্ট হইয়া যায় তাহা Resin দ্বারা পূর্ণ হয়।

সাধারণতঃ বাজারে যে crude লাক্ষা আসে তাহার ওজন বাড়াইবার জন্ত তাহাতে নানা রকম ভেজাল মিশ্রিত থাকে। অনেক সময় Stick Lacএর সহিত গরম বালি মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া হয়। গরম বালি লাক্ষার উপরে দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকে। বাবলা গাছের ছাল ও লাক্ষার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। বাবলা গাছের ছাল মিহি করিয়া গুঁড়া করিলে stick lacএর মত রঙ হয়। সচরাচর জিউলি গাছের শুকনো আঠাও লাক্ষার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। মহুয়া বীজের গুঁড়া, চাউলের লাল গুড়া এবং খোলের গুড়াও লাক্ষার সহিত ভেজাল দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎকৃষ্ট শেলাক প্রস্তুত প্রণালী

বর্ত্তমান সময়ে Stick lac চূর্ণ করিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে, বলিতে কি ইহাতে শুধু নিকৃষ্ট জাতীয় সেলাকই উৎপন্ন হইতেছে। শুধু যে নিকৃষ্টতর কাঁচা জিনিষ হইতেই বর্ত্তমানে নিকৃষ্ট জাতীয় সেলাক উৎপন্ন হইতেছে, তাহা নহে; পরন্ত উৎকৃষ্ট উপাদান হইতেও নিকৃষ্ট সেলাক উৎপন্ন হইতেছে। বর্ত্তমানকালে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কারখানাতেই Stick lac সোজাসুজি কলে দিয়া চূর্ণীকৃত করা হয়। চূর্ণীকৃত মাল তারপর ৬—৮ নম্বর চালুনীর দ্বারা চালাইয়া লওয়া হয়। যেগুলি ভাল মত পেষা হয় না এবং বড় বড় থাকে বলিয়া ঐ নম্বর চালুনী দিয়া চালা যায় না, তাহা পুনরায় চূর্ণ করা হয়। তারপর ঐ সকলকে ধৌত করা হয় এবং ধৌত উপাদান সমূহ শুকাইয়া গেলে তাহা কলে ঝাড়িয়া এবং চূর্ণ করিয়া গুঁড়ায় পরিণত করা হয়। জনৈক বিশেষজ্ঞ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, Stick lac

গুঁড়া প্রেস্ড. ও ধৌত করার বর্ত্তমানে যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার কিছু অদল বদল করিলে কাঁচা উপাদান হইতেও উৎকৃষ্টতম সেলাক প্রস্তুত হইতে পারে। উৎকৃষ্টতর কাঁচা উপাদান হইতে "উৎকৃষ্টতম" (Superfine) সেলাক এবং মাঝামাঝি উপাদান হইতে মাঝামাঝি (Fine) সেলাক্ উৎপন্ন হইতে পারে। আর অতি নিকৃষ্ট উপাদান হইতে Fine ও Standard সেলাক উৎপন্ন হয়। কিন্তু T. N. জাতীয় সেলাক আদৌ উৎপন্ন হয় না; যদিই বা হয়, তাহা হইলেও মূল উপাদানের তুলনায় অতি কম পরিমাণে উৎপন্ন হইবে।

বস্তুতঃ T. N. নামধেয় সেলাক অতি নিকৃষ্ট জাতীয় হইলেও ভারতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কারখানা সমূহে ইহাই বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই T. N. নামধেয় সেলাকের প্রস্তুত প্রণালীর কথা লিপিবদ্ধ করা হইল না; কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট জাতীয় সেলাক কি ভাবে উৎপন্ন করা যায়, তাহাই বলা যাইতেছে। যদি নিম্ন লিখিত প্রাণালী অনুসারে সেলাক প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে Superfine, Fine ও Standard এই তিন প্রকারের সেলাক প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিবেন এবং যাহা বাতিল (Rejected) হইবে, তাহা হইতেও T, N. জাতীয় সেলাক উৎপন্ন হইবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে উন্নততর প্রণালীর কথা লিপিবদ্ধ হইতেছে, তদনুসারে কাজ করিলে প্রথমতঃ সেলাক প্রস্তুত কারীরা যে কম খরচায় অধিকতর লাভবান হইবেন, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে যদি তাঁহারা আশা-জনক লাভ না করিতেও পারেন, তাহা হইলেও ইউরোপ ও আমেরিকার সেলাক

হস্তচালিত কলে Stick Lac পেষা হইতেছে
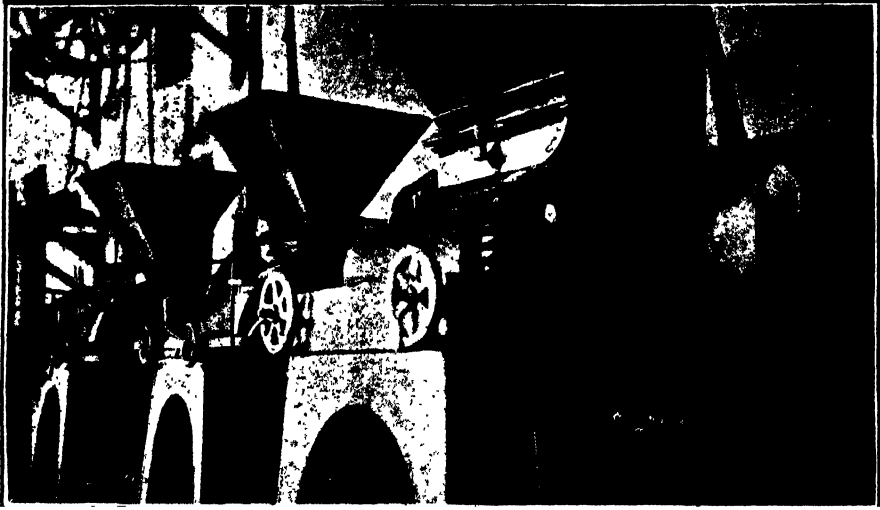
যন্ত্রচালিত কলে লাক্ষা পেষাই হইতেছে।

ব্যবসায়ীরা এদেশে পরিস্কৃত লাক্ষা সরবরাহ করিয়া যে একটা প্রবল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে তাঁহারা সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইবেন। দেশের পক্ষে ইহাও একটা কম লাভের কথা নহে। দেশের অর্থ দেশে রাখিবার দিক হইতে বিচার করিলে ইহার মূল্য নিতান্ত কম নহে।

ষ্টিক্ ল্যাকের প্রাথমিক পরীক্ষা :—

কোন কারখানায় Sticklac আমদানী হইবামাত্র তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে হইবে।

(১) উহা কোন্ জাতীয় Stick lac অর্থাৎ কুসুমী, কুল কিংবা পলাশ কি না?

(২) কি জাতীয় ফসল অর্থাৎ বৈশাখী বা কাটকী, জেঠাই বা নাগোলী কি না?

(৩) লাক্ষার অবস্থা কিরূপ অর্থাৎ ভিজা কিংবা আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক কিংবা চাপবাধা কি না?

(৪) কি পরিমাণে ভেজাল এবং কিসের দ্বারা ভেজাল।

উপরোক্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা বিশেষ দরকার। কেননা, কুসুমী জাতীয় লাক্ষা গালাইতে গেলে "কুল" জাতীয় লাক্ষা হইতে আলাহিদা ভাবে গলাইতে হয়; নতুবা উৎকৃষ্ট জাতীয় সেলাক উৎপন্ন হয় না। তবে যদি বাজারে মাঝামাঝি রকমের সেলাকের চাহিদা বেশী হয়, তাহা হইলে নানা রকমের উপাদান ইহার সহিত মিশাইতে পারা যায়। অন্যান্য ফসল সম্বন্ধেও এই কথা; যদি দেখা যায় যে, লাক্ষা ভিজা, তাহা হইলে গুদাম জাত করিবার পূর্ব্বে তাহা শুষ্ক করার প্রয়োজন; আর যদি ভেজালের মাত্রা খুব বেশী দেখা যায়, তাহা হইলে পরিস্কার করিবার সময় বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ সেই ভেজাল লাক্ষা স্বতন্ত্রভাবে গালাইতে হইবে। তাহা হইলে আর উৎকৃষ্ট সেলাক উৎপন্ন হইবার পক্ষে কোন গোলযোগ থাকিবে না।

বীমাসংগ্রহের ব্যবসায় সম্বন্ধে দুইচারি কথা।

বিনামূলধনে অর্থোপার্জ্জনের যতগুলি উপায় আছে তন্মধ্যে বীমাসংগ্রহের কাজ অন্যতম—এ কথা বহুবার বলা হইয়াছে। এই কাজের দ্বারা অনেকেই নিতান্ত সামান্য অবস্থা হইতে অতি অল্পদিনের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন এবং অন্নের অভাবে হাহাকার করার পরিবর্ত্তে বহুলোককে অন্নদান করিতে সমর্থ হইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। বীমা সংগ্রহের কাজ করিয়া মাসে মাসে দুই চারি হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন—এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

বীমার দালালিতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা রহিয়াছে বটে, কিন্তু সকলেই যে উহা দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন—এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। বরং তাহার উল্টাই সচরাচর দেখা যায়। মূলধনের প্রয়োজন হয় না বলিয়া প্রতি বৎসরই বহুসংখ্যক লোক এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। অন্ততঃ আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে বীমার কাজে আর মাথা গলাইবার জো নাই, বীমা

সংগ্রাহকের সংখ্যা নাকি এতই বাড়িয়া গিয়াছে; বলাবাহুল্য উল্লিখিত মন্তব্য ব্যর্থ দালালদের নিস্ফল হা হুতাশ মাত্র।

ভারতবর্ষে বীমার দালালের সংখ্যা অতিরিক্ত-রূপে বাড়িয়া যায় নাই। এমন কি অত্যধিক সংখ্যক ত দূরের কথা, আমাদের মনে হয়, যথেষ্ট সংখ্যক লোকও ঐ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে কিনা—সন্দেহের বিষয়। বিশেষতঃ তথাকথিত দালালের সংখ্যা বাড়িলেও চতুর কার্য্যক্ষম দালালের সংখ্যা যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় নাই একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

প্রথমেই দেখিতে হইবে বীমার দালালের চাহিদা কিরূপ, অর্থাৎ বীমার ক্ষেত্রের পরিসর কতখানি?

ভারতবর্ষকে একটী মহাদেশ বলিলেও চলে। এই বিপুলায়তন দেশে প্রায় ৩১ কোটী ৫৩ লক্ষ লোকের বাস, অথচ এখানে মাত্র ৫৭টী দেশী এবং ২৩টী বিদেশী বীমা কোম্পানী কাজ করিতেছে। গ্রেটবৃটেন ও আয়ার্লণ্ডের লোকসংখ্যা ৪ কোটী ২৮ লক্ষ মাত্র। এইখানে ৭৩টী জীবন বীমা কোম্পানী রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষ বীমার কারবারে কতখানি পশ্চাদ্‌পদ। অবশ্য গ্রেট-বৃটেনের তুলনায় ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্রদেশ; তথাপি একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ভারতে এই দরিদ্র অবস্থাতেও যতগুলি বীমা কোম্পানী গড়িয়া উঠা আবশ্যক তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যকও আজিও গড়িয়া উঠে নাই। এক্ষেত্রে চলতি বীমাকোম্পানী গুলিতে অতিরিক্ত কাজের ভিড় জমিয়া উঠাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাহাও যখন জমিয়া উঠিতেছে না তখন এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে অধিক সংখ্যক উপযুক্ত সংগ্রাহকের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

ভারতের লোক সাধারণতঃ দরিদ্র হইলেও এই বিশালায়তন দেশে ধনী এবং মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। অনেকেই ভুলিয়া যান যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকই বীমাকোম্পানীর প্রাণ। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই পল্লীগ্রামে বাস করে।

সহরে কয়জন লোকের বাস? বীমার দালালগণ সাধারণতঃ সহর ও সহরতলীর বাসিন্দা অথবা যাঁহারা কার্য্যব্যপদেশে সহর বা সহরতলীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের নিকট হইতেই—বীমা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু সহরের বাহিরেও বিশাল দেশ পড়িয়া আছে। সহরে যাতায়াত নাই, কিম্বা সহরের সহিত কাজ কারবার নাই এমন অসংখ্য সঙ্গতি সম্পন্ন লোক সুদূর পল্লী অঞ্চলে বসবাস করিয়া থাকেন। বীমার প্রয়োজনীয়তার কথা ইঁহাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে ইঁহাদিগের অনেকেই বীমা করিতে রাজী হইবেন। ইঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য অজস্র দালালের প্রয়োজন। সহর বা সহরতলীতে দালালে দালালে মাথা ঠোকাঠুকি করিতেছে দেখিয়া দেশে দালালাধিক্য হইয়াছে অনুমান করিলে ভুল হইবে। আসল কথা সহরে বীমা-সংগ্রাহকের অভাব নাই বটে, কিন্তু পল্লী অঞ্চলে বীমাসংগ্রাহকের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

দেশের লোক বীমা করিতে রাজী আছে কি না, তাহা দিয়া বীমার ক্ষেত্রের পরিসর মাপিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে দেশের লোকের বীমা করিবার সঙ্গতি ও প্রয়োজন আছে কিনা? প্রয়োজন ও সঙ্গতি থাকিলেই যথেষ্ট হইল, কেননা বাকী সমস্তই নির্ভর করে সংগ্রহকারীর কার্য্যক্ষমতার উপর।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াইয়েছে এই যে বীমাসংগ্রাহকের যদি এতই অভাব রহিয়াছে তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই কিছুদিন কাজ করিয়া প্রতিযোগিতায় না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসিতে বাধ্য হয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ দক্ষতার অভাব।

বীমার দালালি করিতে গেলে অর্থের পুঁজির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বীমা সংগ্রহের কাজটা নিতান্ত সহজ নহে। ইহাতে যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

বীমা করার ফলে লাভ যাহারই হউক না কেন এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বীমা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আধুনিক ধরণের বীমাপ্রণালী সম্পূর্ণ বিলাতী আমদানী। এ দেশের জনসাধারণের সহিত উহার বিশেষ পরিচয় নাই বলিয়া এ দেশের লোক পারতপক্ষে বীমা করিতে চাহে না। এই জন্য এদেশে বীমার বিস্তীর্ণক্ষেত্র পড়িয়া থাকিলেও অত্যন্ত দক্ষলোক ব্যতীত সংগ্রাহকের কাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না।

আমি এ কথা বলিতে চাহিনা যে কেবল কয়েকজন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই বীমার দালালিতে পসার করিতে পারিবে কিম্বা বীমার দালালিতে পসার করিতে গেলে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আসল কথা—এই যে এই লাইনে উন্নতি করিতে হইলে কতক গুলি বিষয় আয়ত্ব করা এবং কতকগুলি গুণের অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক। একটু চেষ্টা করিলে যে কোন সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই ঐগুলি আয়ত্ব করিতে পারেন। তথাপি যে যথেষ্ট দালাল জন্মিতেছে না তাহার কারণ শিক্ষার অভাব।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বীমাসংগ্রাহকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা আছে। বিশেষতঃ সে সমস্ত দেশে ঐ সকল বিষয়ে নানারূপ মূল্যবান প্রবন্ধাদি বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এসকল বিষয় খুব অল্পই আলোচিত হয়।

"বাংলার বাণীতে" শ্রীমনোমোহন্ ঘোষ মহাশয় একটী অতি প্রয়োজনীয় দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন লোককে জীবন বীমায় রাজী করাইবার জন্য উপযুক্ত বীমা সংগ্রাহকের প্রয়োজন খুব বেশী। যত দূর জানা গিয়াছে, ভারতের কোন স্থানেই বীমা সংগ্রাহকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার কোন বন্দোবস্ত নাই। ইংরেজী ভাষায় এ সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থাদি আছে। তাহার সাহায্যে যদি বীমার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রতি বৎসর কিছু কিছু করিয়া দক্ষ বীমা সংগ্রাহক তৈরী করিতে পারেন, তবে ভারতীয় বীমার কাজ অনেক বাড়িয়া যাইবে।

আমাদের মনে হয় শুধু সাময়িক ভাবে উপদেশ দান কেন, এ বিষয়ের শিক্ষাদান করিবার জন্য একটী রীতিমত স্কুল খোলা আবশ্যক। কিম্বা Commercial School গুলিতে বীমা সম্বন্ধীয় একটী করিয়া class খুলিলে মন্দ হয় না। commercial School নামে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান চারিদিকে গড়িয়া উঠিতেছে সে গুলিতে কেবল মাত্র Book Keeping, Type Writing and Short hand সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই শেখান হয় না। Commercial School এর ছাত্রদিগকে কেরাণী বা টাইপিষ্ট

করিয়া গড়া হয়, ব্যবসায়ী হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই সেখানে হয় না।

যাহাহউক, বীমার দালালিতে সাফল্য লাভ করিতে গেলে যে কতকগুলি গুণ এবং কতকগুলি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইবার সেই গুণ এবং জ্ঞান যে কি সেই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। বীমাকরার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া আবশ্যক।

লোকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবে "বীমা করিয়া লাভ কি?" ইহার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া চাই। লোককে বোঝান চাই যে বীমা করিলে উত্তর কালে সুখ ও শান্তি লাভ করা যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তির মনে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের রেখা মাত্র অবশিষ্ট আছে তাহার দ্বারা অপরকে বিশ্বাস পরায়ণ করিয়া তোলা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কাজেই যাঁহারা সংগ্রাহকের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন তাঁহাদের বীমায় বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন।

২। যে কোম্পানীর অধীনে কাজ করিতেছ সেই কোম্পানীর উপর বিশ্বাস রাখা এবং তাহাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা চাই।

যাহার জন্য কাজ করিতেছি তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে কাজে জোর পাওয়া যায় না। কাজেই দালালের প্রথম কর্ত্তব্য কোন্ বীমা কোম্পানীর জন্য কাজ করিবে তাহা স্থির করা। কিন্তু একবার কোম্পানীর অবস্থাদি জানিয়া তাহার পক্ষে কাজ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলে মনে মনে আর বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করা উচিত নহে। লোককে বুঝাইতে হইবে যে এই বিশিষ্ট কোম্পানীটাই বীমা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। নিজের গভীর বিশ্বাস না থাকিলে অপরকে বিশ্বাস করান কঠিন হইয়া উঠিবে।

৩। বীমা পদ্ধতির মূলনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বীমা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি ইহা ব্যাঙ্ক অপেক্ষাও অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ কর্ম্মকর্ত্তাগণ যদি অসত্ তার আশ্রয় গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আজ কাল বীমা কোম্পানী ফেল পড়া একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।

এ দেশের জন সাধারণ এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বীমা পদ্ধতি সম্বন্ধে খুব অল্প কথাই জানেন। আমাদের College সমূহে ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে দুইচার কথা শিখান হইলেও বীমা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই শিখান হয় না। অথচ ব্যাঙ্ক ও বীমা ইহারা এক পাখীর দুইখানা ডানা মাত্র। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে ইহাদের কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না।

বীমা সংগ্রাহকদিগকে প্রিমিয়ামাদি নির্দ্ধারিত করিবার মূলসূত্র গুলি জানিয়া রাখিতে হইবে। অনেকের বিশ্বাস কোম্পানী গুলি বুঝি যে যাহার ইচ্ছামত প্রিমিয়াম নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে। একমাত্র গণিত শাস্ত্রই যে প্রিমিয়াম নির্দ্ধারণের মূলভিত্তি একথা চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া না দিলে তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না।

৪। যে সমস্ত পলিসি বা প্ল্যান লইয়া কারবার করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কেন না লোককে ঐ সমস্ত পলিসি বা প্লান গুলির সুবিধা জলের মত বুঝাইয়া দিতে হইবে।

৫। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা চাই যে কেহ উপযাচক হইয়া বীমা করিবে না, এমন কি বলিবামাত্রও কেহই বীমা করিতে চাহিবে না। তাহার যদি

বীমা করিবার সঙ্গতি ও প্রয়োজন থাকে তবে তোমাকেই তাহার প্রাণে বীমা করিবার চাহিদা জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং জন সাধারণের মনে এই চাহিদা জাগাইয়া তোলাই বীমা সংগ্রহ কারীর কৃতিত্ব।

বস্তুতঃ বীমার পলিসি কেহ ক্রয় করে না উহা ক্রয় করাইতে হয়। কিন্তু কেবল বীমার উপকারীতা সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দান করিলেই যে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এমন মনে করিলে ভুল হইবে। বীমায় রাজি করাইতে হইলে বীমা সংগ্রহ কারীর কতকগুলি চরিত্র গত গুণ থাকা আবশ্যক। লোকে যেন তাহাকে ভালবাসে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে বিশ্বাস করে।

৬। খুব মিশুক ও সদানন্দ হইতে হইবে। শিষ্টাচার সম্মত আদব কায়দা গুলি দুরস্ত থাকা দরকার। কোন কারণে কাহাকেও চটাইলে চলিবে না। সকলকে সর্ব্বদাই মিষ্ট ব্যবহারে ও কথায় তুষ্ট রাখিতে হইবে।

মত ফিরাইবার জন্য লোকের সহিত তর্ক করিতে হইবে কিন্তু খুব সংযত ভাবে। মুখ দিয়া যেন অসম্মানের কথা কিম্বা রাগের কথা বাহির হইয়া না যায়।

খুব আগ্রহশীল ও সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক। ধাপ্পা দিয়া কাজ বাগাইতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠকিতে হয়।

লোকের সহিত সর্ব্বদাই খুব মধুর ব্যবহার করিবে—তোমার চরিত্র সম্বন্ধে যেন সকলের খুব উচ্চ ধারণা থাকে।

৭। বীমা সংগ্রহ কারীর নিজের উপর বিশ্বাস থাকা চাই। বীমা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ নখ দর্পণে রাখিতে হয়। কেন না অনেক সময় অনেক লোকে অনেক কথা বলিবে। এমন কি অপর দালাল আসিয়া তোমার client কে ভাগাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে ছাড়িবে না। ইহাতে ভীত বা উত্তেজিত হইলে চলিবে না। খুব ধীরতা ও স্থিরতার সহিত সুযুক্তি পূর্ণ উক্তির দ্বারা client এর সকল সন্দেহের নিরসন করিতে হইবে।

৮। অত্যন্ত আশাবাদী ও ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে একই লোক হয়ত দুই মাস ধরিয়া হাঁটাইবে, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। যে ব্যক্তি বীমা করিবে বলিয়া আশা আছে তাহার সহিত ত সদ্ব্যবহার করিবেই এমন কি যাহার নিকট কাজ পাইবার কোন আশাই দেখা যাইতেছে না তাহাকেও চটাইলে চলিবে না। কেন না ভবিষ্যতে হয়ত তাহার নিকট কাজ বাগান যাইবে।

৯। খুব একজন ভাল শ্রোতা হইতে হইবে। যে যাহা বলিতে চায় তাহাকে তাহা বলিতে দিবে; তোমার কথার যাহারা তীব্র সমালোচনা করিবে খুব ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের কথা আগা গোড়া শুনিয়া পরে নম্রতা সহকারে যুক্তি বলে তাহাদের তর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যে যে সমস্ত client তর্ক করে তাহাদিগকে পটান অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। কেন না তর্ক করিতে গেলেই তোমার কথা ও তাহাকে শুনিতে হইবে এবং তোমার কথা তাহার নিকট যদি সত্য ও যুক্তি পূর্ণ বলিয়া মনে হয় তবে তোমার মতে মত দিতেও সে বাধ্য হইবে।

১০। প্রথম প্রথম খুব কম কাজ পাইবে। কিন্তু তাহাতে হতাশ হইলে চলিবে না। প্রথমে ইহা বড়ই বিরক্তি কর মনে হইবে বটে কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকিবে দেখিবে কাজটী ততই সহজ ও আনন্দজনক হইয়া উঠিতেছে।

১১। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব উচ্চাশা পোষণ করিবে।

চরিত্র গত যে কয়টী গুণের কথা বলিলাম প্রত্যেক বীমা সংগ্রহ কারীরই উল্লিখিত গুণ কয়টী আয়ত্ব করিবার চেষ্টা করা উচিত। এক কথায় বলিতে গেলে বীমার দালালের একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বা Personality থাকা চাই। অর্থাৎ চরিত্রগত এমন একটা বৈশিষ্ট ও মাধুর্য্য থাকা চাই যাহাতে সকল লোকই তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

এই personalityর নাম শুনিয়া কেহ যেন ভয় খাইয়া না যায়। personalityর অর্থ সকল অবস্থায় সকলের সহিত ভদ্র ও বিনম্র ব্যবহার করা। এইটী খুব প্রয়োজনীয় গুণ বলিয়াই ভদ্রতা ও নম্রতার উপর আমি বার বার জোর দিতেছি।

আরও একটী কথা বলা হইয়াছে যে বীমা সংগ্রহ কারীকে খুব মিশুক হইতে হইবে। নিজের যদি কোন বিশিষ্ট বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা থাকে যেমন ভাল গান গাহিতে পারা, বাজাইতে জানা ইত্যাদি, তাহা হইলে বিভিন্ন স্তরের লোকের সহিত মিশিবার খুবই সুবিধা হয়। নহিলে বিভিন্ন ক্লাব, এশোসিয়েশান প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ রাখা বিশেষ সুফল প্রদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের দেশে দক্ষ বীমা দালালের এখনও যথেষ্ট চাহিদা আছে। বাজারে যে দালালের ভিড় দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশই Amature বা সৌখীন। দুই দশ দিনেই তাহাদের সখ মিটিয়া যাইবে, কাজেই প্রকৃত দালালদিগের বাজারে দালালাধিক্য দেখিয়া ভীত হইবার কারণ নাই।

বাংলা দেশ হইতে কাঁচা চামড়ার রপ্তানী—১৯২৬-২৭

বাংলাদেশ হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা চামড়া দেশ বিদেশে রপ্তানী হয়, কিন্তু আলোচ্যবর্ষে যুক্তরাজ্যে খুব কমই কাঁচা চামড়া রপ্তানী হইয়াছে; কারণ জার্মানী হইতে যুক্তরাজ্যে যে দরে কাঁচা চামড়া রপ্তানী করা হইয়াছে বাঙ্গলাদেশ হইতে সে দরে চামড়া রপ্তানী করা সম্ভবপর হয় নাই; সুতরাং আলোচ্যবর্ষে জার্ম্মানীদের প্রতিযোগীতায় বাংলাদেশ হইতে চামড়া রপ্তানী কারীরা দাঁড়াইতে পারে নাই, এবং সে জন্য যুক্তরাজ্যে খুব কমই চামড়া রপ্তানী হইয়াছে। এদিকে আলোচ্যবর্ষে কলিকাতা হইতে যে পরিমাণ কাঁচাচামড়া রপ্তানী হইয়াছে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক দ্রব্য জার্ম্মাণী গ্রহণ করিয়াছে। যাহা হউক আলোচ্যবর্ষে কাঁচা চামড়ার চাহিদা খুবই ছিল এবং যে চামড়া রপ্তানী হইয়াছে তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ছাগলের চামড়া। আলোচ্যবর্ষে দুইকোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ছাগলের কাঁচা চামড়া রপ্তানী হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় তিনভাগ চামড়া ইউনাইটেড্ ষ্টেটে রপ্তানী হইয়াছে।

এই রপ্তানী বিষয়ে একটী বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করিবার আছে। এবার যে সমস্ত কাঁচা চামড়া রপ্তানী হইয়াছে তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ঘড়িয়ালের চামড়া ছিল এবং আলোচ্যবর্ষে বিদেশের প্রায় সমস্ত স্থান হইতেই ঘড়িয়ালের চামড়ার যথেষ্ট চাহিদা ছিল। ১৯২৫ ২৬ সনে ২৩২৬৭২ খণ্ড ঘড়িয়ালের চামড়া বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল; ইহার মূল্য ৩·৩২ লক্ষ টাকা। আলোচ্যবর্ষে ১৩৫৫৪৪২ খণ্ড ঘড়িয়ালের চামড়া রপ্তানী হইয়াছে; ইহার মূল্য ২২·২২ লক্ষ টাকা; ইহার মধ্যে একা ফ্রান্সই গ্রহণ করিয়াছে ১৪·৫০ লক্ষ টাকার ঘড়িয়ালের চামড়া।

মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে শস্য ও ময়দার রপ্তানী ১৯২৬-২৭

১৯২৬-২৭ সনে মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে ১১২৪৪৬ টন শস্য ও ময়দা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; ইহার মূল্য ২২৫·৫২ লক্ষ টাকা।

এই রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে বেশীর ভাগ চাউল ও চাউলই রপ্তানী হইয়াছে।

সিংহলে খাদ্য রপ্তানী হইয়াছে ২০৬৬ টন; ইহার মূল্য ২০·৩৮ লক্ষ টাকা।

গত বৎসর মাদ্রাজ হইতে ৬১৮৩২ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে তাহার অপেক্ষাও খুব বেশী চাউল রপ্তানী হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে মাদ্রাজ হইতে ১০৮৯১০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; ইহার মূল্য ২২·৫৮ লক্ষ টাকা। এইরূপ বেশী চাউল রপ্তানী হওয়ার কারণ সিংহলে খুব বেশী পরিমাণে চাউল পাঠাইতে হইয়াছে।

একা সিংহলই গ্রহণ করিয়াছে ১০৫৮৬৪টন চাউল।

আলোচ্যবর্ষে ১৪০২ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে; ইহার মূল্য ২·৫৬ লক্ষ টাকা।

কিন্তু গত বৎসর মাদ্রাজ হইতে ১৮২৮টন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল, ইহার মূল্য ২·৯৪ লক্ষ টাকা

পাট রপ্তানী

নারায়ণগঞ্জ হইতে বিগত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৭ মাসে যে পরিমাণ পাট রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব।—

জাহাজ কোংর নাম।	পাট রপ্তানীর পরিমাণ
আই জি কোং	৪৪৭৫৭৭০ মণ
ঐ ঢাকা হইতে	১০৩৩৫৫৮ "
বেঙ্গল আসাম কোং	১৬৯২১৪০ "
ইষ্টবেঙ্গল ষ্টিম সিপ কোং	৩৯৩৮৩২ "
চিটাগাঙ ভায়া ভৈরব	৮১৫৬৮০ "
মোট—	৮৪১০৯৮০ মণ

১৯২৮ সনে— ৭৯৭২২০১ "
১৯২৭ " ৯৫৩১২৬৮ "
১৯২৬ " ৮১০১৩৬৬ "
১৯২৫ " ৬৩৭৫৫১৩ "
১৯২৪ " ৭৮২১৯৬৬ "
১৯২৩ " ৫১২৯৯৮৪ "

মাদ্রাজের সহিত বহির্বাণিজ্যের অবস্থা।
১৯২৬-২৭ আগষ্ট

গত ১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে মাদ্রাজের সহিত বহিঃবাণিজ্যের অবস্থা বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে আলোচ্য মাসে আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ দুইই বাড়িয়া গিয়াছে। গতবৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান আলোচ্য মাসে ৫৪·২৬ লক্ষ টাকার আমদানী ও ৮৩·৫২ লক্ষ টাকার রপ্তানী বেশী বাড়িয়া গিয়াছে।

গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলির আমদানী বাড়িয়া গিয়াছে; নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

কলকব্জা + ৫৫০৯০৩৲ টাকা
লৌহ ও ইস্পাত + ১১০৭৪১৫৲
রেলওয়ে লোকমোটিভ ইঞ্জিন
ইত্যাদি + ৩২৬৪১৬৲
তুলার সূতা + ৫৪৬০৪৪৲
তুলার দ্রব্যাদি + ১৪৯:৮৬৲
মটর গাড়ী ইত্যাদি + ৩৩৩৯১২৲

এই গেল আমদানী দ্রব্যের মোটামুটী হিসাব। সেইরূপ রপ্তানী দ্রব্যেও আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যের রপ্তানীও বাড়িয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল।

গরুর চামড়া + ৭৫০৫১৬৲

ছাগলের চামড়া + ৭৯৬৯১৩৲

কাঁচা রবার + ৩২৮৯৪০৲

চীনাবাদাম + ৫১৩৭৪৭৫৲

লঙ্কা + ৩১৯১৫৯৲

ব্ল্যাক চা + ১৭২৯৬৮৯৲

কতকগুলি দ্রব্যের আবার রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে। তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল; কাঁচা ছাগলের চামড়া—২২৫১৪৬৲; রেড়ীর বীজ —৪৯৬৩৮৭৲

কাঁচা তুলা — ৬৯২৩৯৮৲

রঙ্গীন তুলার দ্রব্যাদি — ২২৬৪৫৮৲

তামাক—২১৫৬৬৬৲

ভারতে বাণিজ্য শুল্কের আয়।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে জলপথে ও স্থলপথে ভারতে বা ভারত হইতে লবণ ব্যতীত যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী বা রপ্তানী হইয়াছে তাহার উপর হইতে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বসমেত ৪৪০ লক্ষ টাকা বাণিজ্য শুল্ক আদায় করিয়াছিলেন। ইহা ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাস ও ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসের আয় অপেক্ষা যথাক্রমে ১৬ ও ৩২ লক্ষ টাকা বেশী।

১৯২৭ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত এই আটমাসের আয় মোট ৩১৯০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ কয়মাসে ৩২০৪ লক্ষ টাকা কষ্টমস্ রেভেনিউ আদায় হইয়াছিল। অর্থাৎ এ বৎসরের ৮ মাসের আয় গত বৎসরের আট মাসের আয় অপেক্ষা ১৪ লক্ষ টাকা কম।

এখন ৩১৯০ লক্ষ টাকার মধ্যে কোন্ সূত্রে কত টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখা যাউক।

আমদানী শুল্ক—	২৩৫৪	লক্ষ টাকা
রপ্তানী শুল্ক—	৩৬৩	„ „
Excise duty—		
(১) মোটর স্পিরিট হইতে—	৭৮	„ „
(২) কেরোসীন হইতে—	৬৭	„ „
অন্যান্য	২৮	„ „
মোট—	৩১৯০	„ „

নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টীর উপর হইতে আরব্ধ আমদানী শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়াছে (পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায়):—

১। তামাক। ২। লৌহ ও লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্রপাতি। ৩। খনিজ তৈল। ৪। তুলা ও সিল্ক ব্যতীত অন্য প্রকারের সূতা ও আঁস। ৫। তুলার সূতা। ৬। পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট। ৭। প্রেভিসপ্তডস্। নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টীর উপর হইতে আরব্ধ রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়াছে।

কাঁচা পাঠ। কাঁচা চামড়া।

এতদ্ব্যতীত মটর স্পিরিটের উপর হইতে যে excise duty আদায় করা হয়, তাহার পরিমাণও এবৎসরে গত বৎসরের তুলনায় কিঞ্চিৎ বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু উল্লিখিত দ্রব্য কয়টী হইতে আয়ের পরিমাণ বাড়িলেও অন্য কয়েকটা দ্রব্যের উপর হইতে আরব্ধ শুল্কের পরিমাণ কিছু কিছু কমিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টীর নাম উল্লেখ যোগ্য।

আমদানী শুল্ক—১। চিনি।

২। দিয়াশালাই। মটর গাড়ী ই।

৩। লৌহেতর অন্যান্য ধাতব পদার্থ।

৪। মদ্যাদি লিকার।

৫। নিউমেটিক টায়ার।

৬। সাদা কটনের পিস্ গুডস্।

রপ্তানী শুল্ক :—

৭। থলে, চট প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্য।

excise duty :—

৮। কেরোসিন তৈল।

আমরা উপরে কষ্টমস্ রেভিনিউ এর কথাই বলিয়াছি। কিন্তু কোন কোন বাণিজ্য দ্রব্যের উপর হইতে ইহা ব্যতীত আরও একটা স্বতন্ত্র কর আদায় করা হয়। ইহার নাম protective special duty বা রক্ষা শুল্ক। ১৯২৭ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত এই আট মাসে রক্ষা শুল্ক বাবদ প্রায় ২১৭ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল।

ট্রিপ্লেক্স সেফ্‌টি গ্লাস কোম্পানী লিমিটেড।

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত গ্লাস কোম্পানীর সেয়ারের মূল্য অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যায়। ঐ কোম্পানীর অর্ডিনারী সেয়ারের দাম এক পাউণ্ড মাত্র ; সে ক্ষেত্রে উহা বর্ত্তমানে নয় পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছিলেন আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানী তাহাদের সকল প্রকার মডেলের উইণ্ড স্ক্রীনের জন্য ট্রিপ্লেক্স কাচ ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া সেয়ারের মূল্য অযথা বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকাশ পাইয়াছে যে অষ্টিন মোটর কোম্পানী আগামী বর্ষে (অর্থাৎ ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে) অধিকাংশ মাল ট্রিপ্লেক্স কোম্পানী হইতে কিনিবেন বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন এবং সেই জন্যই উহার সেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

সেয়ার বাজারে এইরূপ tip বা সন্ধান, যে দালাল ঠিকমত দিতে পারে তাহার কদর খুব বেশী এবং যে সকল খেলোয়াড় এইরূপ tip সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারাই জয়যুক্ত হয়। লোকে তাহাদিগকে ভুখোড়, চতুর, ভাগ্যবান ইত্যাদি কত না আখ্যা দেয়! Triplex Safety Glass কোম্পানী যে কাঁচ নির্ম্মাণের অজস্র order পাইয়াছে সুতরাং অংশীদিগকে প্রচুর dividendর লভ্যাংশ দিতে পারিবে এই খবর টুকু সন্ধানী দালালেরা চুপে চুপে তাহাদের মক্কেলদিগকে জানাইয়া দেয় এবং বাজারে Tripler Glass কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে পরামর্শ দিয়া যায়। মক্কেলেরাও চুপে চুপে বাজার হইতে সেয়ার কিনিয়া লয় এবং শেষে যথেষ্ট লাভে সেয়ার গুলি আবার ছাড়িয়া দেয় কিম্বা মোটা ডিভিডেণ্ড খায়। ইহাই হইল সেয়ার বাজারের নিত্য নৈমিত্তিক খেলা।

টারিফ্ বোর্ড ও দিয়াশালাই শুল্ক।

টারিফ বোর্ডের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান্ মার্চেণ্টস্ চেম্বার হইতে শ্রীযুক্ত ওয়াল চাঁদ হীরাচাঁদ, হুসেন ভাই লালজী এবং জে, কে, মেটাকে লইয়া এবং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অক্ কমার্সের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত আনন্দজী হরিদাস, এম্ এন্ মেটা এবং এম, পি গান্ধীকে লইয়া দুইটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। দিয়াশালাই শুল্ক সম্বন্ধে ইঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্ত্তমানে বিদেশী দিয়াশলাইয়ের উপর গ্রোস প্রতি যে ১।৹ আনা আমদানী কর আদায় করা হইতেছে উহা তুলিয়া দেওয়া বা কমাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

বর্ত্তমানে দিয়াশলাইয়ের উপর যে কর ধার্য্য

আছে উহা রাজস্ব হিসাবেই আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চেম্বার বলেন - উহার পরিবর্ত্তে রক্ষা শুল্ক (protective duty) বসাইলে ভাল হয়।

দেশীয় দিয়াশালাই শিল্পের এখন শৈশবাবস্থা। এসময় যাহাতে দিয়াশালাই অযথা সস্তা দরে বিক্রয় হইতে না পারে এবং দেশীয় দিয়াশালাই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

ভারতবর্ষে যত দিয়াশলাইর কারখানা স্থাপিত হইবে তাহাদের প্রত্যেককে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক কারখানায় কত মাল উৎপন্ন হইবে তাহাও কর্ত্তৃপক্ষ হইতে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে। যে কোম্পানীর মূলধনের ৭৫./° ভারতবাসীর নহে এবং ডাইরেক্টর দিগের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ভারতবাসী নহে সে কোম্পানীকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ও এইরূপ মত পোষণ করেন। ইহারা আরও বলেন যে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে দেশী দিয়াশালাই এর উপর কর ধার্য্য করিতে পারেন কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিদেশী দিয়াশলাইয়ের উপরও ঐ অনুপাতে শুল্ক দিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের মধ্য দিয়া যাহাতে বিদেশী দিয়াশলাই ভারতে আমদানী হইতে না পারে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেশীয় রাজ্য হইতে আমদানী দিয়াশালাইয়ের উপর বিদেশী দিয়াশেলাইয়ের সহিত সমানভাবে কর বসাইতে হইবে।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতার বহির্বাণিজ্য।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস অপেক্ষা ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে যত টাকা মূল্যের মাল অল্প বা অধিক পরিমাণ আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে তাহা বন্ধনীর মধ্যে যথাক্রমে— বা + চিহ্ন দ্বারা বুঝান হইল। বলা বাহুল্য কেবলমাত্র প্রধান প্রধান পণ্যের বিবরণই নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

বস্ত্রাদি তুলার দ্রব্য—	২২১ (+ ৫০)
লৌহ ও ইস্পাত —	৭৭ (+ ১৫)
চিনি —	৫৭ (+ ১৮)
বড় বড় কল ও যন্ত্রপাতি—	৫১ (+১১)
তৈল (খনিজতৈল সমেত)	৩০ (—৮)
লৌহ নির্ম্মিত তৈজসাদি—	১৭ (+ ৩)
অন্যান্য ধাতব পদার্থ —	১৯ (— ১)
তামাক—	১২ (+ ১)
ইলেক্ট্রীকের সরঞ্জাম—	১১ (— ১)
রেলওয়ের সরঞ্জাম—	১০ (+ ৪)
মদ্যাদি —	১০ (+ ২)
খাদ্য দ্রব্য ও মুদী খানার সামগ্রী—	২১ (+ ৩)

লক্ষটাকা

রপ্তানী

থলে চট প্রভৃতি

পাট জাত দ্রব্য—	৫১৪ (+ ১৩৯)
কাঁচা পাট—	৪০১ (+ ১৩১)
চা—	৩৬৬ (+ ৮৯)
গালা—	৬৭ (— ১০)
চামড়া—	৩৮ (× ২)
তিসি—	৩২ (× ৩)
গম, কলাই ময়দা প্রভৃতি—	২২ (— ১০)
লৌহ—	১৬ (× ৩)
ম্যাঙ্গানিজ ওর—	১৫ (× ৮)

মাদ্রাজ হইতে তামাক, সিগার ও সিগারেট রপ্তানী।

১৯২৬-২৭

মাদ্রাজ হইতে প্রতি বৎসরেই লক্ষ লক্ষ টাকার তামাক ও সিগারেট দেশ বিদেশে রপ্তানী হইয়েছে। আলোচ্যবর্ষে গত বৎসর অপেক্ষা তামাক বেশী রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় ১২০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক মাদ্রাজ হইতে রপ্তানী হইয়াছিল; ইহার মূল্য—হইয়াছিল ৪৬০০৮ লক্ষ টাকা; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে প্রায় ১৩১ লক্ষ পাউণ্ড তামাক মাদ্রাজ হইতে রপ্তানী হইয়াছে; ইহার মূল্য হইয়াছে ৫২০৩৮ লক্ষ টাকা। তারপর পাতা তামাক আছে। পাতা তামাক রপ্তানী হইয়াছে প্রায় ১৩১ লক্ষ পাউণ্ড, ইহার মূল্য ৪৯০৬৬ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয়াছে ৩৬৩১ লক্ষ টাকার তামাক; ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টে ৫৫৩ লক্ষ টাকা, মালয় ষ্টেটে ৫০১৬ লক্ষ টাকা, এবং নেদার ল্যাণ্ডে ১০৯৭ লক্ষ টাকার তামাক মাদ্রাজ হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৬৭১৪১ পাউণ্ড সিগার ও ২১৬৫০৯ পাউণ্ড সিগারেট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর সিগার ৭০২৭৯ পাউণ্ড ও সিগারেট ১২৬০২৯ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল।

১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের বহির্বাণিজ্য

	১৯২৭ সাল	১৯২৮ সাল	হ্রাস বা বৃদ্ধি
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
রপ্তানী— „ „	২৭২৯	২৯০৪ „	১৭৫
যে সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া পুনর্ব্বার রপ্তানী হইয়াছে—	৭০	৮৮ „	১৮
মোট রপ্তানী— „ „	২৭৯৯	২৯৯২	১৯৩
আমদানী— „ „	২০৯০	২২২৮	১৩৮
আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর বৃদ্ধি—	৭০৯	৭৬৪	৫৫

আমদানী।

১৯২৭ সালের জানুয়ারীর তুলনায় ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টীর আমদানী বাড়িয়াছে।

গম—	১০৪১৮৬৬৲
চিনি—	৬৩২৩১৪৮৲
চাউল—	৩৫৯৯৬৫৮৲
রক্ষিত ফলমূল— বা খাদ্যাদি—	৬৭৯৯৪৬৲
কেরোসিন তৈল—	৩১২৮৮৩৲
মূল্যবান প্রস্তর—	৫৯৫৯০২৲
কাঁচা রেশম—	৬৫২২১৫৲
মাটি ও পোর্সিলেনের জিনিস—	৯৫৮১৬২
লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য—	১৯৪৭১৮৯৲
রেলওয়ের সরঞ্জাম—	১২৯৪৫০৮৲

তুলার দ্রব্য ও কৃত্রিম রেশম— ১৩৬৩১৯৮৲
মোটর গাড়ী— ৫৫০৫৫৬৲
তুলার দ্রব্য, রঙীন— ২৫৪৭৩৯৩৲
সিল্কের দ্রব্য — ৩১৮৪০৩৲
পশমের দ্রব্য— ৫৭৫৫২৩৲

———

নিম্ন লিখিত দ্রব্য কয়টীর আমদানী কমিয়াছে—

বিট চিনি— ৮১৮০৯০৫৲
তুলা, কাঁচা— ৩২০২৫৫৯৲
„ , সূতা— ১৩২৮১৭৪৲
তুলার কাপড়, সাদা— ২৬৩৩৬৬২৲

———

নিম্নে কতকগুলি দ্রব্যের বিবরণ দেওয়া গেল যাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, কোন মাল বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য খুব কমিয়া গিয়াছে, আবার কোন দ্রব্য খুব কম পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

দ্রব্য	পরিমাণ বা সংখ্যা	মূল্য
মোটরের ছাউনি	৯১৬৩ নং	১১৯৩৫১৲
চা—	৬৮৪৭৫ পাউণ্ড	১০৮৯২৪৲
কাগজ—	৭৮৯০ হন্দর	১৮৭৪১৩৲
করগেট সিট	১২১১ টন	৩০৮৭২৪৲
লাল সীসা	৪৩ হন্দর	২৪২২৯৲
প্যারাফিন মোম	৩২৫ টন	১৬১৯১৲

———

রপ্তানী।

১৯২৭ সালের জানুয়ারী অপেক্ষা ১৯২৮ সালের জানুয়ারীতে যে সমস্ত দ্রব্যের আমদানী বাড়িয়াছে (অবশ্য মূল্যের দিক দিয়া) তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মশলা, মরিচ— ৯৫১১১১৲
কফি— ৬৪৯৯২৬৲
চাউল— ৭১৪১৩১৲
গালা— ১৯১৩৩২৪৲
তুলার বীজ— ২৪৭২৫৫০৲
চীনা বাদাম— ৪৫৪৪৫৭০৲
কাঁচা রবার— ১৪৯০৮২২৲
পশম— ৯০৮৬৫৩৲
গো-মহিষাদির চামড়া— ২৮৯৬৯৬১৲
ট্যান করা চামড়া— ২৮৯৬৮০৫৲
ছাগল ভেড়া ইত্যাদির চামড়া ১৪৪৯৪৯২৲

নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টীর রপ্তানী কমিয়াছে।

তুলা, কাঁচা— ৫৪৩০৪৪৩৲
তুলার কাপড়— ২০৮৩৭৪৪৲

———

নিম্নে এমন কতকগুলি দ্রব্যের নাম দেওয়া হইল যাহাদের মধ্যে কোন কোন মাল বেশী পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে কিন্তু অল্প মূল্য পাওয়া গিয়াছে; আবার কোন কোন মাল কম পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে, কিন্তু মূল্য খুব বেশী পাওয়া গিয়াছে।

দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য
পেঁয়াজ—	২৩৩১৩ হন্দর	১৩৩৬১৲
পুরাতন লৌহ—	১৬২২ টন	১০৮৮৲
পিন লেড—	১১০১৩ হন্দর	৭৩০৭২২৲
অভ্র	২২১২ „	১৮৬৮৪২
খনিয়া	৮১ টন	৭৩৮৬
চা, ব্ল্যাক—	১৩৫০১৭৯ পাউণ্ড	৯৫২৫৫৩৲
পাট কাঁচা—	১১৪৭ টন	৬৬৯১১৮৲
চট—	১১১৬৮১৪০ গজ	২৩২৬১৲
থলে—	১২৪৪৭৫ বান্ডা	৪৫৩২৮৬৲
তামাক পাতা—	২০৫৩৩১ পাউণ্ড	৪৮১৯৲

———

১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতার বহির্ব্বাণিজ্য।

গত ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারী মাসে কলিকাতার ব্যবসায় ও বানিজ্য মন্দা পড়িয়াছে বলিতে হইবে। কেননা ডিসেম্বর মাসে আমদাণী ও রপ্তানীর পরিমান যথাক্রমে ৬০৮২ কোটী এবং ১৪০২৯ কোটী টাকা ছিল; কিন্তু জানুয়ারী মাসে ঐ দুই সংখ্যা ৬০৭৩ কোটী এবং ১১০২ কোটীতে পরিণত হইয়াছে। তবে ১৯২৭ সালের জানুয়ারীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ১৯২৮ সালে বহির্বানিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ১৯ লক্ষ এবং ৩৪ লক্ষ টাকা।

আমদানী

বর্ত্তমান বৎসরে জানুয়ারী মাসে যে সমস্ত প্রধান প্রধান মাল আমদাণী হইয়াছে তাহার মোটামুটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে ইহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প আমদানী হইলে + বা − চিহ্নদ্বারা বুঝান হইবে।

	লক্ষটাকা
তুলার দ্রব্যাদি—	১৯৩ (+১৯)
চিনি—	৬২ (−৪)
লৌহ ও ইস্পাত—	৫৮ (−৩)
কলকব্জা ইত্যাদি—	৪৪ (সমান)
খনিজ তৈল—	৩৮ (−১)
অন্যান্য ধাতু—	২০ (−৩)
লৌহ লক্কড়—	১৬ (সমান)
ইলেক্ট্রীকের যন্ত্রপাতি—	১১ (সমান)
মদ্যাদি	৯ (−৬)
রেলওয়ে প্ল্যান্ট ইত্যাদি—	৮ (−২)

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে প্রায় সকল প্রকার পণ্যেরই আমদানী কমিয়াছে বটে, কিন্তু তুলার দ্রব্যাদির আমদানী এরূপ বাড়িয়াছে যে মোট. আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়াই গিয়াছে। আলোচ্য মাসে ৬ কোটী ৯০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হয়; কিন্তু গত বৎসরে ঐ মাসে মাত্র ৫ কোটী ৭০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। গত বৎসরের জানুয়ারীর তুলনায় চিনির ব্যবসায়ে একটু মন্দা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ডিসেম্বর অপেক্ষা আমদানী ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। গত ডিসেম্বরে ২০৪২০ টন পরিষ্কৃত চিনি আমদানী হইয়াছিল; কিন্তু আলোচ্য মাসে ৩৩৪২০ টন আমদানী হইয়াছে।

রপ্তাণী।

১৯২৭ সালে জানুয়ারী মাসে যে পরিমাণ মাল কলিকাতা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া আলোচ্য মাসে যে মাল রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

	লক্ষটাকা
পাটজাত দ্রব্যাদি—	৪০৯ (−৫)
কাঁচা পাট—	২৮৫ (−১৩)
চা—	১৫০ (+১১)
গালা—	৬২ (+১৯)
চামড়া—	৫৩ (+১৬)
ডাল, কলাই, ময়দা—	২১ (সমান)
তিসি—	১৬ (ঐ)
লৌহ (Pig)—	১৪ (+২)
ম্যাঙ্গানিজ্ ওর—	১২ (+২)

পূর্ব্বমাসের তুলনায় রপ্তানী কম হইলে সকল প্রকার রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে পাটই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চট কিনিয়াছে যুক্তরাজ্য; তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক থলি কিনিয়াছে। একমাত্র জার্ম্মানীতেই এবার কাঁচা চামড়ার অধিকাংশ রপ্তানী হইয়াছে। কাঁচা পাট, চা, তিসি এবং ম্যাঙ্গানিজ্ ওর কিনিয়াছে গ্রেটবৃটেন, গালা ও চামড়া কিনিয়াছে যুক্তরাজ্য; চাল কিনিয়াছে কিউবা এবং পিগ্ আয়রণ কিনিয়াছে জাপান।

—:০:—

ভারতে দেশী ও বিদেশী কাপড়ের কাটতি

ভারতবর্ষে গড়ে প্রতিবৎসর কতগজ কাপড়ের প্রয়োজন তাহা জানিতে হইলে ভারতে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণের সহিত আমদানি যোগ দিয়া তাহা হইতে রপ্তানির পরিমাণ বাদ দিতে হইবে। ১৯২৭—২৮ সালে ভারতীয় মিল গুলিতে মোটামুটি ২৩৫৬৬০০০০০ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল এবং প্রায় ১৯৭৩৪০০০০০ গজ কাপড় বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ২৬—২৭ সালে ভারতীয় মিলে উৎপন্ন এবং বিদেশাগত মালের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২৫৮৭০০০০০ গজ এবং ১৭৮৭৯০০০০০ গজ কাপড়; আলোচ্য বর্ষে ভারতে প্রস্তুত কাপড় ১৬৮৬০০০০০ গজ এবং বিদেশাগত কাপড় ৩৩৭৯০০০০ গজ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববৎসরে ভারতে প্রস্তুত কাপড় ১৯৭৪০০০০০ গজ এবং বৈদেশিক কাপড় ২৯১০০০০০ গজ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। অতএব দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের লোকে ১৯২৬-২৭ সালে ৩৮২০১০০০০০ গজ কাপড় ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু ১৯২৭—২৮ সালে ৪১২৭৬০০০০০ গজ কাপড় ব্যবহার করে।

আলোচ্য বর্ষে একদিকে ভারতীয় মিল সমূহে যেমন বেশী পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে অথবা বিদেশ হইতে যেরূপ বেশী পরিমাণ কাপড় রপ্তানী হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ ভারতীয় তাঁতির হাতের প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ বৎসরে ভারতে প্রাপ্তব্য সমস্ত সূতার হিসাব নিকাশ খতাইয়া দেখিলে অতি সহজেই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

আলোচবর্ষে বিদেশ হইতে সর্ব্বসমেত ৫২৩৪৪০০০ পাউণ্ড সূতা আমদানী হইয়াছিল এবং ভারতীয় মিল সমূহে ৮০৮৯১১০০০ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে ২৬০৮০০০০ পাউণ্ড সূতা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে ১৯২৭—২৮ সালে ভারতে মোট ৮৩৫১৭৫০০০ পাউণ্ড সূতা থাকিয়া যায়। অবশ্য ঐ সূতার মধ্যে কিছুটা সূতা ভারতীয় মিল সমূহে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কেননা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐ বৎসর ভারতীয় মিল সমূহে ২৩৫৬৬০০০০০ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। Mr Conbrongh হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে উল্লিখিত পরিমাণ কাপড় তৈয়ারী করিতে ভারতীয় মিলের প্রায় ৪৯৪৮৮৬০০০ পাউণ্ড সূতা প্রয়োজন। অতএব বাকী থাকিল ৩৪০২৮৯০০০ পাউণ্ড সূতা। ঐ সূতাই হাতে তাঁতে বোনা হইয়াছে। Conbrongh সাহেব আরও বলেন ভারতীয় তাঁতিরা গড়ে প্রতি পাউণ্ড সূতা হইতে চারজোড়া কাপড় বুনিতে পারে। অতএব তাঁহার হিসাব মত আলোচ্য বর্ষে ভারতে তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ প্রায় ১৩৬১১৫৬০০০ গজ হইবে।

গত তিন বৎসরে এবং ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে কি পরিমাণ কাপড় আমদানী রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মোটামুটি হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(লক্ষ গজ করিয়া)

	১৯২৩-২৪	১৯২৫-২৬
ভারতীয় কলে প্রস্তুত		
কাপড়ের পরিমাণ	১১৬৪৩	১৯৮১৫
বৈদেশিক আমদানা	৩১২৭১	১৮০৮৭
মোট-	৪২৯১৪	৩৭৯০২
রপ্তানী—		
ভারতীয় কাপড়—	৮৯২	১৬৪৮
বৈদেশিক " —	৬২১	৩৫৪
মোট—	১৫১৩	২০০২

	১৯২৩-২৪	১৯২৫-২৬
ভারতে যে পরিমাণ কাপড় কাটৃতি হইয়াছে	৪২১০১	৩৩১৮০
তাঁতে প্রস্তুত কাপড়	১১৩০০	১১৬৯৯
মোট—	৫৩৪০১	৪৪৮৭৯

	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
ভারতীয় কলে উৎপন্ন		
কাপড়েব পরিমাণ	২২৫৮৭	২৩৫৬·
বিদেশী কাপড়ের আমদানী	১৭৮৭৯	১৯৭৩৪
মোট—	৪০৪৬৬	৪১৩০০
রপ্তানী		
ভারতীয় কাপড়	১৯৭৪	১৬৮৬
বিদেশী কাপড়	২৯১	৩৯৮
মোট—	২২৬৫	২০২৪
ভারতে ব্যবহার করিবার জন্য অবশিষ্ট কাপড়	৩৮২০১	৪১২৭৬
তাঁতে প্রস্তুত কাপড়	১৩৪৩৪	১৮৬১২
মোট—	৫১৬৩৫	৫৯৮৯৮

সমবায় নীতি

২৭শে মাঘ সুরুল শ্রীনিকেতনে বর্দ্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন—

নগর ও গ্রাম

সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগর আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। দেশের প্রাণ যে নগরে বেশী বিকাশ পায় তা নয়; দেশের শক্তি নগরে বেশী সংহত হয়ে ওঠে এই তার গৌরব।

সামাজিকতা

সামাজিকতা হলো লোকালয়ের প্রাণ। এই সামাজিকতা কখনই নগরে জমাট বাঁধতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে, নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সেখানে স্বভাবতই আলগা হয়ে থাকে। আর একটা কারণ এই যে নগরে ব্যবসায় ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন ও সুযোগের অনুরোধে জনসংখ্যা অত্যন্ত মস্ত হয়ে উঠে। সেখানে মুখ্যতঃ মানুষ নিজের আবশ্যককে চায়,

পরস্পরকে চায় না। এই জন্তে সহরে এক পাড়াতেও যারা থাকে তাদের মধ্যে চেনা শুনা না থাকলেও লজ্জা নেই ; জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ক্রমেই বেড়ে উঠচে।

বাল্যকালে দেখেচি আমাদের পাড়ার লোকে আমাদের বাড়ীতে আত্মীয় ভাবে নিয়তই মেলামেশা করত আমাদের পুকুরে আশেপাশে, সকল লোকেরই স্নান,—প্রতিবেশীরা আমাদের বাগানে অনেকেই হাওয়া খেতে আসতেন এবং পূজার ফুল তুলতে কারো বাধা ছিল না। আমাদের বারান্দায় চৌকি পেতে যে যখন খুসি তামাক দাবি করত। বাড়ীতে ক্রীয়া কর্ম্মের ভোজে ও আমোদ আহ্লাদে পাড়ার সকল লোকেরই অধিকার এবং আনুকূল্য ছিল।

তখনকার ইমারতে দালানের সংলগ্ন একাধিক আঙ্গিনার ব্যবস্থা যে কেবল আলো ও ছায়ার অবাধ প্রবেশের জন্ত তা নয়, সর্ব্বসাধারণের অবাধ প্রবেশের জন্তে। তখন নিজের প্রয়োজনের মাঝখানে সকলের প্রয়োজনের জায়গা রাখতে হত ; নিজের সম্পত্তি একবারে কষাকষি করে নিজেরই ভোগের মাপে ছিল না। ধনীর ভাণ্ডারের এক দরজা ছিল তার নিজের দিকে, এক দরজা সমাজের দিকে। তখন যে ছিল ধনী তার সৌভাগ্য চারিদিগের লোকের মধ্যে ছড়ানো ছিল। তখন যাকে বলত ক্রিয়াকর্ম্ম তার মানেই ছিল, রবাহুত অনাহুত সকলকেই নিজের ঘরের মধ্যে স্বীকার করার উপলক্ষ্য।

গ্রামের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব

এর থেকে বুঝতে পারি বাঙ্গলাদেশের গ্রামের যে সামাজিক প্রকৃতি তা সহরেও সেদিন স্থান পেয়েছে। সহরের সঙ্গে পাড়া গাঁয়ের চেহারার মিল তেমন না থাকলেও চরিত্রের মিল ছিল। নিঃসন্দেহই পুরাতন কালে আমাদের দেশের বড়ো নগরগুলি ছিল এই শ্রেণীর। তারা আপন নাগরিকতার অভিমানসত্বেও গ্রামগুলির সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করত। কতকটা যেন বড়ো ঘরের সদর অন্দরের মতো। সদরে ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বর বেশী বটে কিন্তু আরাম এবং অবকাশ অন্দরে ; উভয়ের মধ্যে হৃদয় সম্বন্ধের পথ খোলা।

এখন যে তা নেই এ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি ; দেখতে দেখতে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নগর একান্ত নগর হয়ে উঠল, তার খিড়কীর দরজা দিয়েও গ্রামের আনাগনার পথ রইল না। একেই বলে "ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ"—গ্রামগুলি সহরকে চারিদিকেই ঘিরে আছে, তবু যেন শত যোজন দূরে।

অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য

এ রকম অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য কখনও কল্যাণ কর হতে পারে না। বলা আবশ্যক এটা কেবল আমাদের দেশেরই আধুনিক লক্ষণ নয়, এটা বর্ত্তমান কালেরই সাধারণ লক্ষণ। বস্তুত পাশ্চাত্য হাওয়ায় এই সামাজিক আত্মবিচ্ছেদের বীজ ভেসে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়চে ; এতে যে কেবল মানব জাতীর সুখ ও শান্তি নষ্ট করে তা নয়, এটা ভিতরে ভিতরে প্রাণ ঘাতক, অতএব এই সমস্যার কথা আজ সকল দেশের লোককেই ভাবতে হবে।

য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে সভ্যতা বলে সেই সভ্যতা সাধারণ প্রাণকে শোষণ করে বিশেষ শক্তিকে সংহত করে তোলো—সে যেন বাঁশগাছে ফুল ধরার মতো, সে ফুল সমস্ত গাছের প্রাণকে নিঃশেষিত করে! বিশিষ্টতা বাড়তে বাড়তে এক বাঁকা হয়ে ওঠে—তারি কেন্দ্র-বহির্গত ভারে সমস্তটার মধ্যে ফাটল ধরতে থাকে, শেষকালে পতন অনিবার্য্য।

য়ুরোপে সেই ফাটল ধরার লক্ষণ দেখতে পাই

নানা আকারের আত্ম বিদ্রোহে, কু—ক্লক্স ক্ল্যান, সোভিয়েট, ফ্যাসিষ্ট, কর্ম্মিক বিদ্রোহ, নারীবিপ্লব প্রভৃতি বিবিধ আত্মঘাতিনী রূপে সেখানকার সমাজের গ্রন্থিভেদের পরিচয় পাওয়া যাচ্চে।

শোষণ নীতি

ইংরাজিতে যাকে বলে এক্সপ্লইটেশন (Exploitation) অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্ত্তমান সভ্যতার নীতিই তাই। স্বল্পাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায়; তাতে ক্ষুদ্র বিশিষ্টের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে উঠতে থাকে।

পূর্ব্বেই আভাষ দিয়েছি নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। আর্থিক, রাষ্ট্রীক বা জনপ্রভুত্বের শক্তি চর্চ্চার জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থার আবশ্যক। সেই বিধি সামাজিক বিধি নয়—এই বিধানে মানব ধর্ম্মের চেয়ে যন্ত্রধর্ম্ম প্রবল। এই যন্ত্রব্যবস্থাকে যে আয়ত্ত করতে পারে সেই শক্তি লাভ করে। এই কারণে নগর প্রধানত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এখানে সহযোগিতা বৃত্তি যথোচিত প্রকাশ পায় না।

শক্তি উদ্ভাবনার জন্যে অহমিকা ও প্রতিযোগীতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যখনি তা পরিমাণ লঙ্ঘন করে তখনি তার ক্রিয়া সাংঘাতিক হয়। আধুনিক সভ্যতার সেই পরিমিতি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। কেনন এ সভ্যতা বিরলাঙ্গিক নয়, বহুলাঙ্গিক। এর প্রকাশ ও রক্ষার জন্যে বহু আয়োজনের দরকার—একে ব্যয় করতে হয় বিস্তর; এই সভ্যতার সম্বলের স্বল্পতা একটা অপরাধেরই মত, কেননা বিপুল উপকরণের ভিত্তির উপরেই এ দাড়িয়ে আছে। যেখানেই অর্থ, দৈন্য সেখানেই এর বিরুদ্ধতা। বিদ্যাই হোক, স্বাস্থ্যই হোক, আমোদ আহ্লাদ হোক, রাস্তা ঘাট, আইন, আদালত, যান, বাহন, অশন, আসন, যুদ্ধ চালনা, শান্তিরক্ষা সমস্তই বহু ধনজন সাধ্য। এই সভ্যতা দরিদ্রকে প্রতি ক্ষণেই অপমানিত করে, কেননা দারিদ্র্য একে বাধাগ্রস্থ করতে থাকে।

প্রভাবের নিদান

এই কারণে ধন বর্ত্তমানকালে সকল প্রভাবের নিদান, এবং সকলের চেয়ে সমাদৃত। বস্তুত আজকালকার দিনের রাষ্ট্রনীতির মূলে রাজ প্রতাপের লোভ নেই, ধন অর্জ্জনের জন্য বাণিজ্য বিস্তারের লোভই এখন প্রবল। সভ্যতা যখন এখনকার মতো এমন বহুলাঙ্গিক ছিল না তখন পণ্ডিতের, গুণীর, বীরের, দাতার, কীর্ত্তিমানের সমাদর ধনীর চেয়ে অনেক বেশী ছিল; সেই সমাদরের দ্বারা যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের সম্মান করা হোত। তখন ধন সঞ্চয়ীদের পরে সাধারণের অবজ্ঞা ছিল। এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (parasite); তাই শুধু ধনের অর্জ্জন নয় ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। অপদেবতা মানুষের শুভ বুদ্ধিকে নষ্ট করে; আজ পৃথিবী জুড়ে তার প্রমাণ দেখা যাচ্চে মানুষ মানুষের এত বড়ো প্রবল শত্রু আর কোন দিন ছিল না, কারণ ধনলোভের মতো এত নিষ্ঠুর এবং অন্যায় পরায়ণ প্রবৃত্তি আর নেই। আধুনিক সভ্যতার অসংখ্য বাহুচালনায় এই লোভই সর্ব্বত্র উন্মথিত, এবং এই লোভ পরিতৃপ্তির আয়োজন তার অন্য সকল উদ্যোগের চেয়ে পরিমাণে বেড়ে চলেছে।

কিন্তু একথা নিশ্চয়ই জানতে হবে, যে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কারণ লোভ সামাজিকতার প্রতিকূল প্রবৃত্তি। যাতেই মানুষের সামাজিকতাকে দুর্ব্বল করে তাতেই পদে পদে আত্মবিচ্ছেদ ঘটায়, অশান্তির আগুন কিছুতেই নিবতে দেয় না, শেষকালে মানুষের সমাজস্থিতি বিভক্ত হয়ে পঞ্চত্ব পায়।

বিরোধ কোথায়

পাশ্চাত্য দেশে আজ দেখতে পাচ্চি যারা ধন অর্জ্জন করচে এবং যারা অর্জ্জনের বাহন তাদের মধ্যে কোন মতেই বিরোধ মিটচে না। মেটবার উপায়ও নেই। কেননা যে মানুষ টাকা করচে তারও লোভ যতখানি, যে মানুষ টাকা জোগাচ্চে তারও লোভ তার চেয়ে কম নয়। সভ্যতার সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে ধনের আবশ্যকতা উভয়পক্ষেই। এমন স্থলে পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি কোনো এক জায়গায় এসে থামবে এমন আশা করা যায় না।

লোভের উত্তেজনা, বা শক্তির উপাসনা যে অবস্থায় সমাজে কোন কারণে অসংযত হয়ে দেখা দেয় সে অবস্থায় মানুষ আপন সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব সাধনার দিকে মন দিতে পারে না, প্রবল হতে চায় না। এই রকম অবস্থাতেই নগরের আধিপত্য হয় অপরিমিত, আর গ্রামগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে। তখন যত কিছু সুবিধা, সুযোগ, যতকিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জিভূত হয়। গ্রামগুলি দাসের মত অন্ন যোগায়, এবং তার পরিবর্ত্তে কোনমতে জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকে মাত্র। তাতে সমাজের মধ্যে এমন একটা ভাগ হয় যাতে একদিকে পড়ে তীব্র আলো, আর এক দিকে গভীর অন্ধকার। য়ুরোপের নাগরিক সভ্যতা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীনতাকে এই রকমে বিচ্ছিন্ন করে।

প্রাচীন গ্রীসের সমস্ত সভ্যতা নগরে সংহত ছিল; তাতে ক্ষণকালের জন্য ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করে সে লুপ্ত হয়েছে। প্রভু এবং দাসের মধ্যে তার ছিল একান্ত ভাগ। প্রাচীন ইটালী ছিল নাগরিক। কিছুকাল সে প্রবলভাবে শক্তির সাধনা করেছিল। কিন্তু শক্তির প্রকৃতিই হচ্ছে সহজেই অসামাজিক,—সে শক্তিমান ও শক্তির বাহনকে একান্ত বিভক্ত করে দেয়, তাতে করে অল্প সংখ্যক প্রভু বহু সংখ্যক দাসের পরাশ্রিত হয়ে পড়ে; এই পরাশ্রিতা মনুষ্যত্বের ভিত্তি নষ্ট করে।

নাগরিক সভ্যতা

পাশ্চাত্য মহাদেশের সভ্যতা নাগরিক; সেখানকার লোকে কেবল নিজের দেশের নয় জগৎ জুড়ে মানবলোককে আলো ও অন্ধকারে ভাগ করচে। তাদের এত বেশী আকাঙ্খা যে সে আকাঙ্খার নিবৃত্তি সহজে তাদের নিজের অধিকারের মধ্যে হতেই পারে না। ইংলণ্ডের মানুষ যে ঐশ্বর্য্যকে সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে জানে, তাকে লাভ ও রক্ষা করতে গেলে ভারতবর্ষকে অধীনরূপে পেতেই হবে; তাকে ত্যাগ করতে হলে আপন অতিভোগী সভ্যতার আদর্শকে খর্ব্ব না করে তার উপায় নেই। যে শক্তি সাধনা তার চরম লক্ষ্য, সেই সাধনার উপকরণরূপে তার পক্ষে দাস জাতীর প্রয়োজন আছে। আজ তাই সমস্ত ব্রিটিশ জাতি সমস্ত ভারতবর্ষের পরাশ্রিতরূপে বাস করচে।

এই কারণেই সমস্ত য়ুরোপের বড়ো বড়ো জাতি এসিয়া আফ্রিকাকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে ব্যস্ত, নইলে তাদের সভ্যতাকে আধপেটা থাকতে হয়। এই কারণেই বৃহদাংশিকের উপর ন্যূনাংশিকের পরাশ্রিত্য তাদের নিজের দেশেও বড়ো হয়ে উঠচে। অতিভোগের সম্বল সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সমতুল্য হতেই পারে না; অল্পলোকের সঞ্চয়কে প্রভূত করতে গেলে বহুলোককে বঞ্চিত হতেই হয়। পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্যাই আজ সব চেয়ে উগ্রভাবে উদ্যত।

সেখানে কর্ম্মিক ও ধনিকে যে বিরোধ, তার মূলে এই অপরিমিত ভোগের জন্য সংহত লোভ। তাতে করেই ধনিক ও ধনের বাহনে একান্ত বিভাগ—বিভাগ বিদেশীয় প্রভুজাতীর সঙ্গে দাস জাতির।

তারা অত্যন্ত পৃথক। এই অত্যন্ত পার্থক্য মানব ধর্ম্মবিরুদ্ধ ; মানবের পক্ষে মানবিক ঐক্য যেখানেই পীড়িত, সেইখানেই বিনাশের শক্তি প্রকাশ্য বা গোপন ভাবে বড়ো হয়ে ওঠে। এই জন্যেই মানব সমাজে প্রভু প্রত্যক্ষভাবে মারে দাসকে, কিন্তু দাস প্রভুকে অপ্রত্যক্ষভাবে তার চেয়ে বড়ো মার মারে ; সে ধর্ম্ম বুদ্ধিকে বিনাশ করতে থাকে। মানবের পক্ষে সেইটে গোড়া ঘেঁষে সাংঘাতিক, কেননা অন্নের অভাবে মরে পশু, ধর্ম্মের অভাবে মরে মানুষ।

সভ্যতার বৈষয়িক দিক

ঈসপের গল্পে আছে সতর্ক হরিণ যে দিকে কাণা ছিল সেই দিকেই সে বাণ খেয়ে মরেচে। বর্ত্তমান মানব সভ্যতার কাণা দিক হচ্ছে তার বৈষয়িক দিক। আজকের দিনে দেখি জ্ঞান অর্জ্জনের দিকে য়ুরোপের একটা বৃহৎ ও বিচিত্র সহযোগিতা, কিন্তু বিষয় অর্জ্জনের দিকে তার দারুণ প্রতিযোগিতা।

তার ফলে বর্ত্তমান যুগে জ্ঞানের আলোক য়ুরোপের এক প্রদীপ সহস্রশাখায় জ্বলে উঠে আধুনিক কালকে অত্যুজ্জ্বল করে তুলেচে। জ্ঞানের প্রভাবে য়ুরোপ পৃথিবীর অন্যান্য সকল মহাদেশের উপর মাথা তুলেচে। মানুষের জ্ঞানের যজ্ঞে আজ ইউরোপীয় জাতিই হোতা, সেই পুরোহিত,—তার হোমানলে সে বহুদিক থেকে বহু ইন্ধন একত্র করচে, এ যেন কখনো নিববে না এমন এর আয়োজন এবং প্রভাব। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞানের এমন বহুব্যাপক সমবায়-নীতি আর কখনো দেখা যায় নাই। ইতি পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্রভাবে নিজের বিদ্যা নিজে উদ্ভাবন করেচে। গ্রীসের বিদ্যা প্রধানতঃ গ্রীসের, রোমের বিদ্যা রোমের, ভারতের চীনের ও তাই। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপীয় মহাদেশের দেশ এবং প্রদেশগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট ; তাদেরপ্রাকৃতিক বেড়াগুলি দুর্লঙ্ঘ্য নয়—অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমি বা অত্যুচ্চ গিরিমালা দ্বারা তারা একান্ত পৃথগীকৃত হয়নি। তার পরে এক সময়ে একই ধর্ম্ম ইউরোপের সকল দেশকেই অধিকার করেছিল ; শুধু তাই নয়, এই ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল অনেক কাল পর্য্যন্ত ছিল এক রোমে।

য়ুরোপের বিদ্যালোচনা

এক লাটীন ভাষা অবলম্বন করে অনেক শতাব্দী ধরে য়ুরোপের সকল দেশ বিদ্যালোচনা করেচে। এই ধর্ম্মের ঐক্য থেকেই সমস্ত মহাদেশ জুড়ে বিদ্যার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রকৃতিও ঐক্যমূলক ; এক খৃষ্টের প্রেমই তার কেন্দ্র এবং সর্ব্বমানবের সেবাই সেই ধর্ম্মের অনুশাসন ; অবশেষে লাটিনের ধাত্রীশালা থেকে বেরিয়ে এসে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশ আপন ভাষাতেই বিদ্যার চর্চ্চা করতে আরম্ভ করলে এবং সমবায় নীতি অনুসারে নানাদেশের সেই বিদ্যা এক প্রণালীতে সঞ্চারিত ও একই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে আরম্ভ করলে। এর থেকে জন্মালো পাশ্চত্য সভ্যতা, সমবায়মূলক জ্ঞানের সভ্যতা—বিদ্যার ক্ষেত্রে বহু প্রতাপের সংযোগ, একাঙ্গীকৃত সভ্যতা।

আমরা প্রাচ্য সভ্যতা কথাটা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এ সভ্যতা এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিত্তের সমবায় মূলক নয়,—এর যে পরিচয় সে নেতি বাচক,—অর্থাৎ এই সভ্যতা য়ুরোপীয় নয় এইমাত্র। নতুবা আরবের সঙ্গে চীনের বিদ্যা শুধু যে মেলে না তা নয়, অনেক বিষয়ে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধ। সভ্যতার বাহ্যিকরূপ ও আন্তরিক প্রকৃতি তুলনা করে দেখলে ভারতের হিন্দুর সঙ্গে পশ্চিম এসিয়াবাসী সেমেটিকদের অত্যন্ত বৈষম্য দেখা যায়। এই উভয়ের চিত্তের ঐশ্বর্য্য পৃথক ভাণ্ডারে জমা হয়েচে ; এই জ্ঞান-সমবায়ের অভাবে এসিয়ার সভ্যতা প্রাচীনকালের সংঘাতে ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে মণ্ডিত। ঐতি-

হাসিক কোনো কোনো অংশে কিছু কিছু দেনা পাওনা হয়ে গেছে, কিন্তু এসিয়ার চিত্ত এক কলেবর ধারণ করেনি। এই জন্য যখন প্রাচ্য সভ্যতা শব্দ ব্যবহার করি তখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের সভ্যতাকেই দেখিতে পাই।

এসিয়ার এই বিচ্ছিন্ন সভ্যতা বর্ত্তমান কালের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, য়ুরোপ পেরেচে; তার কারণ, সমবায়নীতি মনুষ্যত্বের মূলনীতি, মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে।—সভ্যতা শব্দের অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র সমাবেশ।

কিন্তু এই য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যেই কোন্‌খানে বিনাশের জন্য বীজ রোপণ চলেচে? যেখানে তার মানবধর্ম্মের বিরুদ্ধতা অর্থাৎ যেখানে তার সমবায় ঘটতে পারেনি। সে হচ্চে তার বিষয় ব্যাপারের দিক। এইখানে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরুদ্ধ। এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রকাণ্ড হয়েছে, তার কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের আয়োজন ও আয়তন আজ অত্যন্ত বিপুলাকৃত। তার ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতায় একটা অদ্ভুত পরস্পর বিরুদ্ধতা জেগেছে।

একদিকে দেশের মানুষকে বাঁচাবার বিদ্যা সেখানে প্রত্যহ দ্রুতবেগে অগ্রসর—ভূমিতে উর্ব্বরতা, দেহে আরোগ্য, জীবন যাত্রায় জড় জগতের বাধার উপর কর্ত্তৃত্ব, মানুষ এমন করে আর কোন দিন লাভ করেনি,—এরা যে দেবলোক থেকে অমৃত আহরণ কর্ত্তে বসেচে। আবার আর একদিক ঠিক এর বিপরীত। মৃত্যুর এমন বিরাট সাধনা এর আগে কোনদিন দেখা যায়নি। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশ এই সাধনায় মহোৎসাহে প্রবৃত্ত; এত বড়ো আত্মঘাতী অধ্যবসায় এর আগে মানুষ কোনদিন কল্পনাও করতে পারত না।

জ্ঞান সমবায়ের ফলে য়ুরোপ যে প্রচণ্ড শক্তিকে হস্তগত করেচে, আত্ম বিনাশের জন্য সেই শক্তিকেই য়ুরোপ ব্যবহার করবার জন্য উদ্যত। মানুষের মধ্যে সমবায় নীতি ও অসমবায় নীতির বিরুদ্ধ ফলের এমন প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখা যায় না। জ্ঞানের অন্বেষণে বর্ত্তমান যুগে মানুষ বাঁচবার পথে চলেচে, আর বিষয়ের অন্বেষণে মরবার পথে। শেষ পর্য্যন্ত কার জয় হবে সে কথা বলা শক্ত হয়ে উঠল।

কেউ কেউ বলেন মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্ব্বাসিত করলে তার আপদ মেটে। একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। চতুষ্পদ পশুদের আছে চার পা, হাত নেই,—জীবিকার জন্যে যতটুকু কাজ আবশ্যক তা তারা একরকম করে চালিয়ে নেয়। সেই কোনো একরকমে চালানোতেই দৈন্য ও পরাভব। মানুষ ভাগ্যক্রমে পেয়েছে দুটো হাত, কেবলমাত্র কাজ করার জন্যে। তাতে তার কাজের শক্তি বিশেষ বেড়ে গেছে; সেই সুবিধাটুকু পাওয়াতে জীব জগতে অন্য সব জন্তুর উপরে সে জয়ী হয়েছে। আজ সমস্ত পৃথিবী তার অধিকারে। তার পর থেকে যখনি কোনো উপায়ে মানুষ যন্ত্র সাহায্যে আপন কর্ম্মশক্তিকে বাড়ায়, তখনি জীবনের পথে তার জয়যাত্রা এগিয়ে চলে। এই কর্ম্মশক্তির অভাবের দিক, পশুত্বের দিক; মানুষের এই শক্তিকে খর্ব্ব করে রাখতে হবে এমন কথা কোন মতেই বলা চলে না, বললেও মানুষ শুনবে না। মানুষের কর্ম্মশক্তির বাহন যন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারেনি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য্য।

শক্তিকে খর্ব্ব করবনা অথচ সংহত শক্তি দ্বারা মানুষকে আঘাত করা হবে না, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কি করে হতে পারে সেইটেই ভেবে দেখবার বিষয়।

শক্তিমানের অবস্থা

শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ

একজন বা একদল মানুষ কোন সুযোগে নিজের হাতে নেয়, তখনি বাকী লোকদের পক্ষে মুস্কিল ঘটে। রাষ্ট্র তন্ত্রে একদা সকল দেশেই রাজশক্তি একজনের এবং তারই অনুচরদের মধ্যেই প্রধানত সঙ্কীর্ণ হয়েছিল। এমন অবস্থায় সেই একজন বা কয়েকজনের ইচ্ছাই আর সকলের ইচ্ছাকে অভিভূত করে রাখত। তখন অন্যায়, অবিচার, শাসন বিকার থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে শক্তিমানদের কাছে ধর্ম্মের দোহাই পাড়তে হত। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'; অধিকাংশ স্থলেই শক্তিমানের কোন ধর্ম্মের কাহিনী শোনবার ইচ্ছা নয় না; তাই কোনো কোনো দেশের প্রজারা জোর করে রাজার শক্তি হরণ করেচে। তারা এই কথা বলেছে, যে, "আমাদের সকলের শক্তি নিয়ে রাজার শক্তি। সেই শক্তিকে এক জায়গায় সংহত করিলে আমরাই বঞ্চিত হই। যদি সে শক্তিকে আমরা প্রত্যেকে ব্যবহার করবার উপায় করতে পারি, তাহলে আমাদের শক্তি-সমবায়ে সেটা আমাদের সম্মিলিত রাজত্ব হয়ে উঠবে।" ইংলণ্ডে সেই সুযোগ ঘটেছে। অন্যান্য অনেক দেশে যে ঘটেনি তার কারণ, শক্তিকে ভাগ করে নিয়ে তাকে কর্ম্মে মিলিত করবার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তি সকল জাতির নেই।

অর্থশক্তি সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনী সম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েচে। তাতে অল্পলোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহুলোকের কর্ম্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহুলোকের কর্ম্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্ত্তি নিয়েই ঢুকেছে। সেই কর্ম্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন,—এই কর্ম্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে, শ্রামকদের প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমতো করে বলতে পারে যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব, তাহলে সেই হয়ে গেল মূলধন। স্বভাবের দোষে ও দুর্ব্বলতার জন্য কোন বিষয়েই যাদের মেলবার ও মেলাবার সাধ্য নেই তাদের দুঃখ পেতেই হবে। অন্যকে গাল পেড়ে বা ডাকাতি করে তাদের স্থায়ী সুবিধা হবে না।

মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা

বিষয় ব্যাপারে মানুষ অনেক কাল থেকে আপনার মনুষ্যত্ব উপেক্ষা করে আসচে। এই ক্ষেত্রে সে আপন শক্তিকে একান্তভাবে আপনারই লোভের বাহন করেচে। সংসারে তাই এইখানেই মানুষের দুঃখ ও অপমান এত বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত। এইখানেই অসংখ্য দাসকে বলগায় বেঁধে ও চাবুক মেরে ধনের রথ চালানো হচ্চে; আর্ত্তরা ও আর্ত্তবন্ধুরা কেবল ধর্ম্মের দোহাই পাড়ছে, আর বলচে অর্থও জমাতে থাকো ধর্ম্মকেও খুইয়োনা। কিন্তু শক্তিমনের ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা দুর্ব্বলকে রক্ষা করার চেষ্টা আজিও সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নাই। অবশেষে একদিন দুর্ব্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে যে আমোদেরই বিচ্ছিন্ন বল, বলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে বল দিচ্ছে; বাইরে থেকে তাকে আক্রমণ করে তাকে ভাঙতে পারি, কিন্তু তাকে জুড়তে পারি না। জুড়তে না পারলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্ম্মশ্রমকে মিলিত ক'রে অর্থশক্তিকে সর্ব্বসাধারণের জন্যে লাভ করা।

একেই বলে সমবায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জানে শ্রেষ্ঠ হয়েচে; লোকব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রচার করচে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ, এত ঈর্ষা, দ্বেষ, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।

শক্তির সংঘাতে

পৃথিবী জুড়ে আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত

অগ্নিকাণ্ড করে বেড়াচ্চে। ব্যক্তিগত লোভ আজ জগৎব্যাপী বেদীতে নরমেদ যজ্ঞে প্রবৃত্ত। একে যদি ঠেকাতে না পারি তবে মানব ইতিহাসে মহা-বিনাশের সৃষ্টি হবেই হবে। শক্তিশালীরা একত্রে মিলে এর প্রতিরোধ কখনই করতে পারবে না; অশক্তেরা মিললে তবেই এর প্রতিকার হবে। কারণ, বৈষয়িক ব্যাপারে জগতে শক্ত ও অশক্তের যে ভেদ সেইটেই আজ বড়ো সাংঘাতিক।

জ্ঞানী অজ্ঞানীর ভেদ আছে, কিন্তু জ্ঞানের অধিকার নিয়ে মানুষ প্রাচীর তোলে না; বুদ্ধি ও প্রতিভা দলবাঁধা শক্তিকে বরণ করে না। কিন্তু ব্যক্তিগত অপরিমিত ধনলাভ নিয়ে দেশে দেশে, ঘরে ঘরে যে সব ভেদের প্রাচীর উঠচে, তাকে স্বীকার করতে গেলে মানুষকে পদে পদে কপাল ঠুকতে, মাথা হেট করতে হবে। পূর্ব্বে এই পার্থক্য ছিল, কিন্তু এর প্রাচীর এত অভ্রভেদী ছিল না। সাধারণতঃ লাভের পরিমাণ ও তার আয়োজন এখনকার চেয়ে অনেক পরিমিত ছিল, সুতরাং মানুষের সামাজিকতায় আজকের মতো এমন অন্ধকারের ছায়া পাড়েনি,—লাভের লোভ, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, গার্হস্থ্য সমস্তকেই এমন করে আচ্ছন্ন ও কলুষিত করেনি। অর্থচেষ্টার বাহিরে, মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্র আরো অনেক প্রশস্ত ছিল।

সাধনায় প্রধান কে ?

তাই আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনীরাই প্রধান; বিরাটকায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখ শান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই হাতে; অন্নের, অর্থোপার্জ্জনের কঠিন বেড়াদেওয়া ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশপথ নির্ম্মাণ তাদেরই হাতে। নির্দ্ধনের দুর্ব্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ ক'রে রেখেছিল; আজ নির্দ্ধনকেও বল লাভ করে তার প্রতিকার করতে হবে।

আজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে য়ুরোপে সমবায়-নীতি অগ্রসর হয়ে চলেচে। সেখানে সুবিধা এই যে মানুষে মানুষে একত্র হবার বুদ্ধি ও অভ্যাস সেখানে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশী। আমরা, অন্ততঃ হিন্দু সমাজের লোক, এই দিকে দুর্ব্বল। কিন্তু এটা আশা করা যায় যে, যে-মিলনের মূলে অন্ন-বস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা সে-মিলনের পথ দুঃসহ দৈন্য ও দুঃখের তাড়নায় এই দেশেও ক্রমশঃ সহজ হতে পারে। নিতান্ত যদি না পারে তবে দারিদ্র্যের হাতে থেকে কিছুতেই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না এবং যদি না পারে তাহলে কাউকে দোষ দেওয়াও চলবে না।

একথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে এককালে আমাদের জীবনযাত্রা যে রকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণের ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তাহলে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধঃপতন হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিত্রাণ বলে না।

মানুষের ইতিহাস

এক কালে যা নিয়ে মানুষ কাজ চালিয়েছে চিরদিন যেতাই নিয়ে চলবে মানুষের ইতিহাসে এমন কথা লেখেনা। মানুষের বুদ্ধি যুগে যুগে নূতন উদ্ভাবনার দ্বারা নিজেকে যদি প্রকাশ না করে তবে তাকে সরে পড়তে হবে। নূতন কাল মানুষের কাছে নূতন অর্ঘ্য দাবী করে; যার জোগান বন্ধ হোলে তারা বরখাস্ত হয়। মানুষ আপনার এই উদ্ভাবনী শক্তির জোরে নূতন নূতন সুযোগ সৃষ্টি করে। তাতেই পূর্ব্বযুগের চেয়ে তার উপকরণ আপনিই বেড়ে যায়।

যখন হাল লাঙল ছিল না, তখন বনের ফলমূল খেয়ে মানুষের একরকম করে চলে যেত; এদিকে তার কোনো অভাব আছে একথা কেউ মনেও করত না। অবশেষে হাল লাঙলের উৎপত্তি হবামাত্র সেই সঙ্গে জমাজমা, চাষ আবাদ, গোলাগঞ্জ, আইন কানুন, আপনি সৃষ্টি হতে থাকল; এর সঙ্গে উপদ্রব জমেচে অনেক; অনেক মারকাট, অনেক চোর ডাকাত জাল

জালীয়াতী, মিথ্যাচার পুঞ্জীভূত হইয়াছে ; এ সমস্ত কি করে ঠেকান যায় সে কথা সেই মানুষকেই ভাবতে হবে যে মানুষ হাল লাঙল তৈরী করেচে। কিন্তু গোলমাল দেখে যদি হাল লাঙলটাকেই বাদ দিতে পরামর্শ দাও তবে মানুষের কাঁধের উপর মুণ্ডটাকে উল্টো করে বসাতে হয়।

ইতিহাসে দেখা গেছে কোনো কোন জাতের মানুষ নুতন সৃষ্টির পথে এগিয়ে না গিয়ে পুরাণো সঞ্চয়ের দিকেই উল্টো মুখ করে স্থাণু হয়ে বসে আছে ; তারা মৃতের চেয়ে খারাপ, তারা জীবন-মৃত। এ কথা সত্য, মৃতের খরচ নাই। কিন্তু তাই বলে কে বলবে মৃত্যুই দারিদ্র্য সমস্যার ভালো সমাধান ? অতীত কালের সামান্য সম্বল নিয়ে বর্ত্তমান কালে কোনমতে বেঁচে থাকা যায় না। মানুষের প্রয়োজন অনেক, আয়োজন বিস্তর, সে আয়োজন জোগাবার শক্তিও তার বহুধা।

বিলাস বল্‌ব কাকে ? ভেরেণ্ডার তেলের প্রদীপ ছেড়ে, কেরোসিনের লণ্ঠনকে, কেরোসিনের লণ্ঠনকে ছেড়ে বিজলী বাতি ব্যবহার করাকে বলব বিলাস ? কখনই নয়। দিনের আলো শেষ হলেই কৃত্রিম উপায়ে আলো জ্বালাকেই যদি অনাবশ্যক বোধ করো, তা হলেই বিজলী বাতীকে বর্জ্জন করব। কিন্তু যে প্রয়োজনে ভেরেণ্ডা তেলের প্রদীপ একদিন সন্ধ্যে বেলায় জ্বালতে হয়েছে, সেই প্রয়োজনেরই উৎকর্ষ সাধনের জন্ম বিজলীবাতি।

আজ একে যদি ব্যবহার করি তবে সেটা বিলাস নয়, যদি না করি সেইটাই দারিদ্র্য। একদিন পায়ে হাঁটা মানুষ যখন গরুর গাড়ী সৃষ্টি করলে তখন সেই গাড়ীতে তার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই গোরুর গাড়ীর মধ্যেই আজকের দিনের মোটর গাড়ীর তপস্যা প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মানুষ সে দিন গোরুর গাড়ীতে চড়েছিল, সে যদি আজ মোটর গাড়ীতে না চড়ে, তবে তাতে তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। যা এককালের সম্পদ তাই আর—এককালের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়ার দ্বারা দারিদ্র্যের নিবৃত্তি শক্তিহীন কাপুরুষের কথা।

সমাজের দুঃখ

একথা সত্য, আধুনিক কালে মানুষের যা কিছু সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে তা অধিকাংশই ধনীর ভাগ্যে জোটে। অর্থাৎ অল্প লোকেরই ভোগে আসে, অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হয়। এর দুঃখ সমস্ত সমাজের ; এর থেকে বিস্তর রোগ, তাপ, অপরাধের সৃষ্টি হয়, সমস্ত সমাজকেই প্রতিক্ষণে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্চে। ধনকে খর্ব্ব করে এর নিষ্পত্তি নয়, ধনকে বলপূর্ব্বক হরণ করেও নয়, ধনকে বদান্যতা যোগে দান করে ও নয়। এর উপায় ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি যথাসম্ভব সকলের মধ্যে জাগরূক করা, অর্থাৎ সমবায় নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

একথা আমি বিশ্বাস করিনে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কোনোদিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। কেননা শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত। এই শক্তির অসাম্যের বাহ্য প্রকাশ নানা আকারে হতেই হবে। তা ছাড়া স্বভাবের বৈচিত্র্যও আছে ; কেউবা টাকা জমাতে ভালবাসে, কারো বা জমাবার প্রবৃত্তি নেই, এমনি করে ধনের বন্ধুরতা ঘটে। মানবজীবনের কোনো বিভাগেই একটানা সমতলতা বা একাকারতা সম্ভব নয়, কিম্বা শোভনও নয়। তাতে কল্যাণ নাই। কারণ প্রাকৃতিক জগতেও যেমন বৈচিত্র, মানব জগতেও তেমনি ; সম্পূর্ণ সাম্য উদ্যমকে শুব্ধ করে দেয়, বুদ্ধিকে অলস করে।

অপর পক্ষে অতি বন্ধুরতাও দোষের, কেননা তাতে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে তার দ্বারা মানুষে মানুষে সামাজিকতার যোগ অতিমাত্রায় বাধা পায়। যেখানেই তেমন বাধা সেই খানেই অকল্যাণ নানা মূর্ত্তি ধরে বাসা বাঁধে। পূর্ব্বেই বলেছি আজকের

দিনে এই অসাম্য অপরিমিত হয়েছে, তাই অশান্তিও সমাজনাশের জন্য চারিদিকে বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত।

কালের সুযোগ সৃষ্টি

বর্ত্তমান কাল বর্ত্তমান কালের মানুষের জন্তে বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্তে যে সকল সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষেই দুর্লভ না হয় সর্ব্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই। কোনমতে খেয়ে পরে টিকে থাকতে পারে এতটুকু মাত্র ব্যবস্থা কোন মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত অর্থ, উদ্‌বৃত্ত অবকাশ, মনুষ্যত্ব চর্চ্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।

আজ সভ্যতার গৌরব রক্ষার ভার অল্পলোকেরই হাতে—কিন্তু এই অত্যল্প লোকের পোষণ ভার বহু সংখ্যক লোকের অনিচ্ছুক শ্রমের উপর। তাতে বিপুল সংখ্যক মানুষকেই জ্ঞানে, ভোগে, স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হয়ে মূঢ় বিকল চিত্ত হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এত অপরিমিত মূঢ়তা, ক্লেশ, অস্বাস্থ্য, ও আত্মবমাননার বোঝা লোকালয়ের উপর চেপে রয়েচে যে অভ্যাস হয়ে গেছে বলে, একে অপরিহার্য্য জেনে এর প্রকাণ্ড অনিষ্টকে আমরা চিন্তার বিষয় করিনে। কিন্তু আর উদাসীন থাকবার সময় নাই। আজ পৃথিবী জুড়ে চারিদিকেই সামাজিক ভূমিকম্প মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ পুঞ্জীভূত শক্তির অতি ভারেই এমন তরো দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্চে। আজ শক্তিকে মুক্তি দিতে হবে।

কৃষি প্রধান দেশ

আমাদের এই গ্রাম-প্রতিষ্ঠিত কৃষি প্রধান দেশে একদিন সমবায়নীতি অনেকটা পরিমানে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন মানুষের যাত্রা ছিল বিরলাঙ্গিক। প্রয়োজন অল্প থাকাতে পরস্পরের যোগ ছিল সহজ। তখনো স্বভাবতই ধনীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল; কিন্তু এখন ধনীরা আত্ম সম্ভোগের দ্বারা যেমন বাধা করেছে, তখন ধনীরা তেমনি আত্মত্যাগের দ্বারা যোগ রচনা করেছিল। আজ আমাদের দেশে ব্যয়ের বৃদ্ধি ও আয়ের সঙ্কীর্ণতা বেড়ে গেছে বলেই ধনীর ত্যাগ দুঃসাধ্য হয়েচে।

সে ভালই হয়েচে, এখন সর্ব্বসাধারণকে নিজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে উদ্ভাবিত করতে হবে, তাতেই তার স্থায়ী মঙ্গল। এই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভারত সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত; পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ আজও দিকে দিকে স্বল্প ধনের পথরোধ করে দাঁড়ায়নি। এই জন্যই সমবায়-নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই; আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্ব্বজনের চেষ্টার পবিত্র সম্মিলন তীর্থে অন্নপূর্ণার আসন প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নব বর্ষারম্ভে

বর্ষারম্ভে পুরাতনের হিসাব নিকাশ করতঃ নূতন খাতা পত্তন করার প্রথা স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে চ'লে আস্‌ছে। এর মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সঙ্গে যে একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সেটা সামাজিক হিসাবেই যে শুধু উপভোগ্য তা' নয়, এতে কারবারের দিক থেকেও অনেকটা প্রচারের কাজ হয়। বছরের শেষে কারবারের আয়, ব্যয়, স্থিতি, মজুত মালের ষ্টক, এবং লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ করতঃ দোকানদার বুঝিয়া নেন যে বিগত বৎসরে বেচাকেনা করিয়া তাঁহার কারবারের অবস্থা কেমন দাঁড়াইল। সারা বছরের এই stock taking এবং হিসাব নিকাশ যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না করেন তাঁহাদিগকে পাকা কারবারী বলা যায় না।

এই পুরাণো বেচা কেনার ও হিসাব নিকাশের মধ্যে অনেক শিখিবার, জানিবার এবং মনে করিয়া রাখিবার জিনিষ থাকে এবং অনেক ভাবিবার এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের বিষওয় থাকে। সুক্ষ্মদর্শী ব্যবসায়ী এই সকল বিষয় ঘাঁটিয়া আগামী বৎসরে দোকান কেমন করিয়া পরিচালনা করিবেন সে সম্বন্ধেও একটা প্রোগ্রাম বা কার্য্যসূচি মনের মধ্যে ছকিয়া লইতে পারেন। এমন অনেক ব্যাপার হয়ত দেখিতে পাইবেন যাহা করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয় নাই, আবার এমন সব কাজ করা হইয়াছে যাহা না করিলেই ভাল হইত।

অনেক সময় মাল কিনিবার অর্ডার দেরীতে পাঠাইবার দরুন হয়ত এমন হইয়াছে যে পূজার মাল কিম্বা শীতের বস্ত্রাদি এত দেরীতে দোকানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে অন্যান্য দোকানে খরিদ্দারেরা মাল কিনিয়া শেষ করিয়াছে; সুতরাং পূজা এবং শীতের বাজারের অর্দ্ধেক বেচা কেনা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে বহুদর্শী এবং হুসিয়ার দোকানীরা বর্ষার আগেই পূজার বাজারের মালের অডার দিয় থাকেন এবং পূজার আগেই শীতের মরসুমের মাল কেনা সারিয়া ফেলেন। আগে থাকিতে মাল কিনিয়া দোকান জাত করার কতকগুলি সুবিধা আছে।

১। Manufacturerদের কাছে ক্রেতার হিড়িক্‌ না থাকায় সুবিধা দরে পছন্দমত মাল কেনা যায়।

২। পূজা অথবা শীতের season বা মরসুম আরম্ভ হবার অনেক আগে থেকেই দোকান সাজানো যায় এবং পছন্দমত জিনিসের দ্বারা জানালা সজ্জা (window display) করা যায়।

৩। খরিদ্দার অবশ্য পূজা বা শীতের মরসুম সুরু না হইলে মাল কেনে না; কিন্তু মরসুম আরম্ভ হইবার অনেক আগে হইতেই এইরূপ publicity ও profaganda অর্থাৎ বিজ্ঞাপন এবং প্রচার কার্য্য চলিতে থাকায় মরসুম সুরু হইবামাত্র খদ্দেরগণ সাধারণতঃ এই সকল দোকানেই জিনিষ কিনিতে ঢুকিয়া থাকে।

অনেক দোকানীর মুখে আমরা শুনিতে পাই যে পূজার অথবা শীতের বাজারের অর্দ্ধেক কেনা বেচা শেষ হইয়া গেল, অথচ আমাদের মাল এখনও আসিয়া পৌঁছিল না; এইরূপ দেরী করিয়া মাল আনাইলে নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়।

১। খদ্দের তাহার বেচা কেনা অনেক আগেই সারিয়া ফেলে সুতরাং তাঁহাদের মাল বেচায় ভয়ানক অসুবিধা হয়।

২। মাল বেচিতে হইলে সস্তায় বেচিতে হয় নচেৎ খদ্দের আকর্ষণ করা যায় না।

৩। অনেক সময় গুদাম জাত মাল বিক্রয় না হওয়ায় Clearance sale বা গুদাম সাবাড়ের দরে মাল বেচিয়া stock কমাইয়া ফেলিতে হয় এবং এইরূপ যেন তেন প্রকারে পাওনাদারের due বা দেনা meet করিতে হয়।

হালখাতা পত্তন করিবার সময় বর্ষশেষের সাল তামামী ভাল করিয়া খতাইয়া দেখিলে এরূপ অনেক ত্রুটী বিচ্যুতির কথা নজরে পড়ে এবং চতুর দোকান-দার সেই সকল অভিজ্ঞতা হইতে আগামী বৎসরের প্রোগ্রাম বা কার্য্যপদ্ধতির জন্ত সতর্কতার সহিত প্রস্তুত হইতে পারেন।

হালখাতার এই একটা দিক দেখাইলাম, কিন্তু ইহার আর একটা দিকও আছে, যেটা বাহ্যত দেখিতে শুধু সামাজিকতা, খানা পিনা এবং আমোদ আহ্লাদ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু ইহার পিছনে ব্যবসা-গিরিরও একটা দিক আছে যাহা উপেক্ষার বিষয় নহে!

হালখাতায় দোকানীরা আপন আপন দোকানের সকল ক্রেতাকেই সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং নানারূপ খানা পিনা এবং আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করতঃ ক্রেতাদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। খদ্দেররাও এই আমোদ আহ্লাদের বিনিময়ে বছরের এই প্রথম দিনে দোকানীকে আপনাআপন দেয় দেনার অনুপাতে টাকা দিয়া হিসাব পরিস্কার করেন কিম্বা নূতন হিসাব খুলিয়া থাকেন। ইহাতে বছরের প্রথমেই খদ্দেরকে শুধু বাঁধিয়া ফেলা হয় না, পরন্তু দোকানের তহবিলেও যথেষ্ট আমদানী হয় এবং দোকান সজ্জার দ্বারা লোকের মধ্যে প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডাও চালানো যায়।

এবার নববর্ষে আমরা যে সকল দোকানে নিম-ন্ত্রিত হইয়াছিলাম তাহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটীর নাম উল্লেখ না করিলে এই বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সর্ব্ব প্রথমেই মনে আসে কাত্যায়ণী ষ্টোর্সের কথা। কলেজষ্ট্রীট মার্কেটে কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ে কাত্যায়ণীর একরূপ ubi-quitious বা সর্ব্বলোকজানিত হইয়া পড়িয়াছে। যদিচ কমলালয়, জহরলাল পান্নালাল, বৈকুণ্ঠনাথ শুঁই, অছেলমোল্লা, রায় কোং, পল কোম্পানী প্রভৃতি সকলেই পরস্পরের সহিত টক্কর দিতেছে, তথাপি কাত্যায়ণীর মধ্যে এমন একটা Forw-ardness বা অগ্রগতির ভাব আছে যাহার প্রভাবে কাত্যায়ণী সকলের উপরে টেক্কা দিতেছে।

নববর্ষে ইহার মাথার উপরে যে নূতন বৈদ্যুতিক চক্র আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল তাহা পথিকের চিত্ত আকর্ষণ করিবেই; তাহার পর দোকানের দরজা দিয়া ভিতরে তাকাইলেই বেনারসীর সজ্জায় চোখ ঝলসিয়া যায়। মনে হইতেছিল সমগ্র দোকান-খানি যেন বেনারসী সাড়ী এবং তাহার শলমা চুমকীর উপর প্রতিফলিত আলোক মালার দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অতঃপর দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিতেই গোলাপ জলের পিচ্‌কারীতে স্নান এবং তাহার পর নানারূপ সুখাদ্য এবং সুপেয় দ্বারা ভূরি ভোজন। দোকানের মালিক নিজে প্রথিত নামা জমীদার হইলেও ব্যবসায় বুদ্ধিতে, আলাপ আপ্যায়নে, বিনয়ে সৌজন্যে এবং সার্ব্বজনিক উদারতায় অল্প বয়সেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। লোকে জমিদার দিগকে অনেক সময় জলৌকা বলিয়া নিন্দা করে। আমাদের প্রিয় দর্শন, কিন্তু দুষ্ট ও দুষমনের যম স্বরূপ জিতেন্দ্র লাল ত ইহাদিগকে Pampered Vampires of the Empire বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুখের বিষয় আজকাল জমীদারদিগের মধ্যে যতীন্দ্রবাবুর ন্যায় আরও অনেক জমিদার আছেন যাঁহারা শিক্ষা, দীক্ষা, আলাপ

ব্যবহার এবং স্বদেশ প্রেমে বহু তথাকথিত মধ্যবিত্ত Legalised Free booters দিগের আদর্শস্থানীয়। ধাক আর ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিব না।

কাত্যায়ণীর সঙ্গে মনে পড়ে হাওড়া মোটর কোম্পানীর কথা। আজকাল সহর বাজারে মোটর না থাকিলে সে মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। বাঙ্গলার রাজধানী এক কলিকাতা সহরেই ২৫ হাজারের উপর Private মোটর কার রেজেষ্ট্রী হইয়াছে; তাহা ছাড়া বাস্ ও ট্যাক্সির সংখ্যা কম নহে। এই সকলের উপর বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, চাবাগান, বন্দর প্রভৃতিতে যে কত মোটর গাড়ী চলা ফেরা করে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। এই সকল মোটর গাড়ীর জন্ম টায়ার, টিউব, তেল, পেট্রল, Parts প্রভৃতি নিত্য দরকার, সুতরাং Motor car Accessroies বিক্রয় করিবার জন্ম সমগ্র দেশে যে কি বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে তাহার ধারণা করা যায় না।

ব্যবসায়ে যাঁহাদের দূরদৃষ্টি আছে, তাঁহারা Motor car parts and Accessories বিক্রয় করার জন্ম capital সংগ্রহ করতঃ দোকান দিতেছেন। কয়েকবৎসর পূর্ব্বেই এ বিষয়ে যে সকল বাঙ্গালী অগ্রণী হইয়া মোটর কার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মতলার নন্দীবাবুদিগের Great Indian Motor work Free School streetএর নন্দবাবুর Indo British Motor Company, ধর্ম্মতলার দে কোম্পানী, এবং লালদীঘির Howrah Motor Companyর নাম দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ Motor car parts এবং Accessories বিক্রয় করার জন্ম Howrah Motor Company সর্ব্বত্র যেরূপ সুনাম এবং প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর পক্ষেই গৌরবের বিষয়। এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে আমরা দেখিতে পাই অতীনবাবু এবং যতীনবাবু পিতাপুত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধুতা, বিনয় এবং ভদ্রব্যবহার।

এবার হালখাতায় খদ্দেরদিগের আদর আপ্যায়নের জন্ম তাঁহারা যে বিরাট আয়োজন করেছিলেন তা' দেখে মনে হচ্ছিল যে ঠিক যেন বিয়ের আয়োজন ক'রেছেন। খানাপিনার বিরাট ব্যবস্থা—ইংরাজী, বাংলা, হিন্দুস্থানী সবরকম খাদ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ, তারপর ছাতের উপর ষ্টেজ বাঁধিয়া নানারূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা এবং সর্ব্বোপরি—কর্ম্মকর্ত্তাদিগের গললগ্নীকৃতবাসে সকল অভ্যাগত দিগকে আদর আপ্যায়ন—এ সবেরই মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট এবং আন্তরিকতা ছিল, যার ছাপ সহজে মুছে যাবার নয়।

হালখাতা ত ১লা বৈশাখের পরেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তারস্মৃতি অনেক দিন জেগে থাকে। কর্ম্মকর্ত্তাদিগের এই যে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা এবং আপ্যায়ন—যাহার মধ্যে Personal elementই সকল সাফল্যের মূল সূত্র ভাবে কাজ করে,—বহুদিন ধ'রে প্রাণে একটা মধুর স্মৃতির ছাপ রেখে যায় এবং মনের উপরও একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে কারবারের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়বেই। যাঁরা হালখাতার এই নিগুঢ় তথ্যটী বুঝতে পেরে সব ব্যাপারের মধ্যে এই Personal element বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্টতার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন তাঁদের হালখাতা করাই সার্থক; নচেৎ মামুলীধরনে দুটো কলার তেউড়, সিঁদুর মাখা মঙ্গল ঘট, এবং আমের পল্লব দোকানের দরজায় সাজিয়ে রেখে দেঁতো হাঁসি এবং স্যাকারিন মিশ্রিত এক এক গ্লাস জল ও দুই একটা "ডুগ্ গীমণ্ডা" জাতীয় মিষ্টান্ন খাইয়ে লোকদের মনোরঞ্জন ক'রতে যাওয়া নিছক পণ্ডশ্রম মাত্র। এতে লোকের মনোরঞ্জনও হয় না, পরন্তু পয়সা অপব্যয় হয় মাত্র

মুক্তার চাষ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাঙ্গলাদেশে অয়েস্টার (oyster) কোন বাঙ্গালী খাদ্যের জন্য ব্যবহার করে না। তাই একমাত্র মুক্তার চাষের জন্ত ছাড়া তাহা সম্প্রতি বিশেষ কোন দরকারে আসবে বলে মনে হয় না। Oyster এর Cocktail ও সুপ শ্বেতাঙ্গ মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইহার চাষ করিতে হইলে সমুদ্রের ধারে চরা জমি যে স্থানে ৬ ফুট হইতে ১৮ ফুট পর্য্যন্ত জল থাকে এমন স্থানে বাঁশকে ছোট ছোট শাখা ও পাতা সহ কেটে ৩ ফুট অন্তর সারি সারি করিয়া প্রোথিত করিতে হয় এবং বাঁশের সঙ্গে কয়েক গোছা পাট বেঁধে দিতে হয়। Oyster এর ডিম যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জলের সঙ্গে ভেসে আসে তখন তাহা ঐ সব বাঁশের শাখা, প্রশাখা, পাতায় এবং পাটের সঙ্গে আটকাইয়া যায়। বাঁশের গোড়ায় বা সমস্ত চরাতে যদি শুষ্ক ঝিনুকের খোলা, ভাঙ্গা মাটীর বাসন ও পাত্রাদি ফেলে দেওয়া হয় সে আরও ভাল। কারণ যেখানে যত বেশী পরিমাণ ডিম আটকা'বে সেখানে তত বেশী Oyster (ওয়েস্টার) জন্মাবার আশা থাকে।

ডিম ছাড়বার ও বর্দ্ধনের সময়, স্থান ও অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তনশীল। সাধারণতঃ Oyster ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে বার্দ্ধক্য লাভ করে। উহা যখন ২ হইতে ২॥ বৎসর বড় হয় তখন অতি সতর্কতার সহিত ছোট শিশের গুলী, ঝিনুকের টুক্‌রা ও গালার-গুল ইহার ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ক্রমশঃ এক প্রকার তরল পদার্থের প্রলেপ পড়িতে থাকে। ১॥০ বৎসর হইতে ৪ বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত দ্রব্যাদি মুক্তার আকারে পরিণত হয়। ঐ প্রকার মুক্তাকে কাটিবার পূর্ব্বে তাহা কৃত্রিম বলিবার কোন উপায় নাই। ইহাকে যেমন আকারে তৈরী করিবার ইচ্ছা হয় তেমনই করা যায়। কারণ যে পদার্থটী Oyster এর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় মুক্তা তাহার অনুরূপই হয়। এই প্রকার এক একটী মুক্তা জাপানে ৩।৪ ইয়েন বা ৪॥০ হইতে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বিক্রয় হয়। কানের দুলের জন্ত ব্যবহার্য্য মুক্তাগুলির জোড়া ৩০।৪০৲ টাকার কমে বিক্রয় হয় না। পূর্ব্ববর্ণিত চরাতে যদি রীতিমত চাষ করা হয় তাহা হইলে প্রতি একরে প্রত্যেক বৎসর (অবশ্য প্রথম ২।৩ বৎসরের পরে) অন্ততঃ ১০০০ মুক্তা পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে কক্সবাজারের দিকে বা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে তেমন চরা জমী বা জল ঢের পাওয়া যায় এবং তাহাতে বোধ হয় চাষ করিতে হইলে তেমন বিশেষ কিছু খরচ করিতে হইবে না। খরচের মধ্যে মোটামুটি প্রতি একরে ১৫০০ বাঁশের দরকার। তাহাতে ৪৫০০ খুটী হইবে; প্রতি খুটীতে /।০ সের করিয়া পাটের দরকার হলে মোট ১১২ মণ পাট লাগিবে। এখন তিন বৎসর পরে ঝিনুকের খোলার অভাব হইবে না। ১০০০ মুক্তার দাম কম পক্ষে ২০০০৲ টাকা তাহাতে যদি ১০০০৲ টাকা বার্ষিক প্রতি একরে খরচ হয় তবুও চাষীর বোধ হয় ১০০০৲ (প্রতি একরে) লাভ থাকিবে।

আমার বোধ হয় নূতন নূতন যাহারা চেষ্টা করিতে যাইবেন চাষের প্রণালীর অজ্ঞতা বশতঃ তাহাদের গড়পড়তা বার্ষীক প্রতি একরে ২০০৲ বাঁচিলেও লাভ নিতান্ত কম নয়। ইহাও বলে রাখা দরকার যে চরাজমি বা জল নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সেই স্থানে oyster (ওয়েসটারের) ডিম সাধারণতঃ ভেসে আসে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পরীক্ষার পর যেস্থানে তাহা ভাসিয়া আসিবার সম্ভাবনা বেশী তেমনই স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে। উপরোক্ত প্রণালী ছাড়া স্থল বিশেষে বিভিন্ন দেশে আরও অনেক প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ নিয়ম কোন্‌স্থানে উপযোগা হবে তাহাও পরীক্ষণীয়। উপরোক্ত ঝিনুক বা oyster হইতে মুক্তা বের করে নেবার পর তাহার খালি খোলাগুলী oyster ফারমে ছাড়িয়া দেওয়া যেতে পারে এবং মাংস আমাদের দেশে না খাওয়া হলেও নানা উপায়ে অন্ত-দেশে পাঠাবার উপযোগী করা যায়। মাংসের সস্তা বশতঃ যদি অন্তত্র পাঠাবার সুবিধা না হয় তবে তাহা মুরগী, হাঁস, বরাহ ইত্যাদির যাহারা চাষ করে তাহাদিগকে বিক্রয় করা যেতে পারে। উহা ঐ সব প্রাণীর পক্ষে উপাদেয় খাদ্য ও পুষ্টিকর।

মিষ্ট জলে বা নদী, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদিতে নাইয়েডিসের (naiades) চাষ হয়; জাপান, চীন, আমেরিকা, জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং প্রায় সকলেই সুফল লাভ করিয়াছে। চীনে ইহার চাষ অনেক দিন থেকে চলে আসছে। ইহাতে প্রথমে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ডিমধারী ঝিনুক সংগ্রহ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ১০ ফুট দৈর্ঘ্য, ১০ ফুট প্রস্থ, ২ ফুট গভীর একটি ছোট চৌবাচ্চায় ২০০।২৫০ মাগুর, ভেকুটী, রুই, কাতলা ইত্যাদি জাতীয় যে কোন প্রকারের মাছ ছাড়িতে হয়। ঐ সব মাছগুলি নিতান্ত ছোট না হওয়াই ভাল; সংগৃহীত ঝিনুকের ভিতর থেকে ডিম বা গ্লোকিডিয়া (Glochidia) বাহির করিয়া ঐ পুকুরে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহাতে গ্লোকিডিয়াগুলি মাছের কানে (gills) ও 'পর' (fins) গুলিতে সংযুক্ত হয়। এই ভাবে মাছগুলিকে পুকুরে ২।৩ দিন রাখিবার পর যখন দেখা যায় যে তাহাদের কানে ও পরে উপযুক্ত পরিমাণ গ্লোকিডিয়া glochidia বা ডিম দেখা যাইতেছে তখন ঐ মাছগুলিকে নদী, জলাশয় বা পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নদী বা পুকুরে মাছগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার পর ৬ দিন হইতে ১৮ দিনের মধ্যে এবং কোন কোন সময় কএক মাসের মধ্যে গ্লোকিডিয়া ছোট ছোট ঝিনুকে পরিণত হয় ও ক্রমশঃ মাছের কাণ ও 'পর ছেড়ে নদী বক্ষে বা পুকুরে ঝরিয়া পড়িতে থাকে। এখানেই ঝিনুক ক্রমশঃ বড় হয়। জাতি বিশেষে ঝিনুক ৩ বৎসর হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে পূর্ণতা বা বার্দ্ধক্য লাভ করে। ঝিনুক যখন ২॥০ হইতে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয় তখন তাহার ভিতর সতর্কতার সহিত শিশের বা গালার গুলি, ঝিনুকের পালিশ করা টুকরা ইত্যাদি প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। তাহাতে উপরোক্ত oyster এর মধ্যে মুক্তা বর্ণের তরল পদার্থের প্রলেপ ক্রমশঃ পড়িতে থাকে। ৬ মাস হইতে ১॥০ বৎসরের মধ্যে তাহা কৃত্রিম মুক্তায় পরিণত হয়। ইহা স্বাভাবিক মুক্তার চেয়ে দেখিতে কোন অংশে খারাপ নহে বরং বাজারে কাঁচের বা গালার যে কৃত্রিম মুক্তা বিক্রয় হয় তাহার চেয়ে ঢের বেশী দিন টেকশই ও সুন্দর হয়। এই জন্যই ইহার মূল্য অন্যান্য রাসায়নিক উপায়ে তৈরী মুক্তার চেয়ে ঢের বেশী।

চীনে ফুচাউ বুদ্ধ মন্দিরে ঐভাবে তৈরী করা ছোট বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি কিছুতেই মনে করিতে পারিনি যে তাহা প্রকৃত মুক্তা নহে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, নদীর ঝিনুকের ভিতর ঐ প্রকার বুদ্ধের ছাপ দেওয়া ক্ষুদ্র টিন খণ্ড প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং ৬।৭ মাসের মধ্যে উহা মুক্তা বর্ণে পরিণত হয়।

(ক্রমশঃ)

আহম্মদ রহমান নেজাম (মোহাজ্জী)

গরমের মরসুম্

ফুলের বাগান

এখন বাংলাদেশে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। প্রায় অধিকাংশ season flower বা ঋতু কালীন ফুলগাছ যাহা এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়, তাহা এই সময়েই শুকাইয়া যায়। কিন্তু যে ফুল-গাছগুলি এই সময়ে কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে সেগুলির গোড়ায় উপযুক্ত পরিমাণে জল দিবে। নিয়মিত উহাদের গোড়ায় জল দিতে পারিলে ফুল গাছগুলি কিছুদিন বাঁচিয়া যাইতে পারে। গাছ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহাদের গোড়ায় জল দেওয়া আবশ্যক।

বর্ষাকালে ভাল ফুলগাছ লাগাইবার জন্য এখন হইতেই জমী ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সারা শীতকাল ব্যাপী ফুল হওয়ায় জমীর উর্ব্বরতা অনেক কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং ঋতুকালীন ফুলগাছগুলি মরিয়া গেলেই জমীগুলিকে বেশ করিয়া খুঁড়িয়া দিবে এবং মরা গাছের সমস্ত শিকড় জমি হইতে তুলিয়া ফেলিবে।

তারপর জমিতে বেশ করিয়া সার দিয়া উর্ব্বর করিয়া রাখিবে। চন্দ্রমল্লিকা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ফুলগাছ [illegible] হইতে [illegible] [illegible] এবং যে ফুলগাছগুলি একজাগায় লাগান হইয়াছিল তাহাদিগকে তুলিয়া একটা উর্ব্বর জমীতে পৃথক পৃথক করিয়া পুঁতিয়া গোড়ায় গোবর বা অন্য কোন রূপ সার দিবে।

এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, এবং গাঁদা ফুলের বীজ বপনকরিতে হয়। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন; আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে; বর্ষান্তে বসাইলে ভাল হয়।

শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থাস, কক্সকোম, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম ধুতুরা, মাটিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপনের এই প্রকৃষ্ট সময়।

সব্জী বাগান

সব্জীর বাগানে এখন বিশেষ কিছু করিবার নাই, তবে যে গাছগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে তাহাদের গোড়ায় জল দিবে। এই সময় গাছ হইতে ফসলের বীজ তুলিয়া বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। তারপর উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিবার জন্য, ঐ বীজগুলি বোতলে বন্ধ করিয়া রাখিবে।

যে সকল পেঁয়াজের গাছ বীজের জন্য রাখা হইয়াছে, সে সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহপূর্ব্বক উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া বোতলে রক্ষা কর।

চুপড়ী আলু, খাম আলু প্রভৃতির বীজ রোপণ কর; তাহাদের গাছ লতাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দাও। এসময়ে পল্মনটে, চাঁপানটে লালশাক ও ডেঙ্গুয়ার বীজ বপন করিতে হয়। যাবতীয় শাকের বীজ এই সময় লাগাইতে হয়।

ভুয়েশশা, তরমুজ ও ফুটীর ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপে জল সেচন কর।

এখন স্পারাগাছের ফসল পাইবার সময়। উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর। সীম, শশা বেগুন, লাউ, কুমড়া, মকা বা ভুট্টা, হরিদ্রা, এরারুট, জেরুসালেম, আর্টিচোক, মানকচু, শকর কন্দ আলু ডেঙ্গুয়া, চাঁপানটে, শাক, মূলা, বর্ষাতিমূলা, গুড়িকচু, পটোল, ঝিঙ্গা, কাকরোল, ধুন্দুল, করলা, ঢেড়স প্রভৃতির বীজ রোপনের ও বপনের এই উপযুক্ত সময়।

এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিংড়াইতে হয়, বেগুন গাছে ভাটি বান্ধিয়া দিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়।

শাকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল পাইতে হইলে ভুট্টা, বুনিতে আর কালবিলম্ব করা উচিৎ নহে।

লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, পালা ঝিঙ্গা, শশার বীজ যদি এখনও না বুনিয়া থাকেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া অগত্যা এই সময় বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমেই শেষ করিতে হয়।

জলদী ফুলকপি খাইতে গেলে এই সময় হইতেই পাটনাই ফুলকপি বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হয়।

ফলের বাগান

এই সময় ফলগাছের গোড়ায় জল দিবে। লিচু এই সময় প্রায় পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং পাখীতে যাহাতে লিচুফল নষ্ট করিতে না পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে এবং সম্ভব হইলে লিচুগাছ জাল দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

বৈশাখের শেষে ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমপক্ষে স্পারা গাছের ফসল পাইবার সময়। উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর।

বৎসরের মধ্যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে অত্যন্ত গরম পড়ে। চারিদিক হইতে গরম বাতাস বহিতে থাকে, এবং মাটি শুকাইয়া ফাটিয়া যায়। তবে ঝড়ের সঙ্গে কিছু কিছু বৃষ্টী হয় বলিয়া গাছপালা প্রভৃতি বাঁচিয়া থাকে, এই দুই মাসের মধ্যে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া ব্যতীত আর বিশেষ কিছু করিবার নাই।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণই এখন একমাত্র কার্য্য।

কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের দাবা কলম করিতে হয় তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হইবে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে; সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। এখন সেখানে বাঁধাকপি ও ফুলকপির বীজ বপন করা যায়।

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত যে সকল বীজ বপন করা যায় তাহার তালিকা,—

(১) সর্ব্বপ্রকার মুক্তকেশী বেগুন, /৩ সেরা

বেগুন, ফ্রেঞ্চ গোল বেগুন, কাটোয়ার ডাঁটা, পাটনাই ঝাড়, ডেঙ্গো ডাঁটা, দেশী ও আমেরিকান পুঁই, পেঁপে, লঙ্কা, ধানী লঙ্কা।

এই সকল বীজ হইতে চারা তৈয়ারী করিয়া জমিতে চারা রোপণ করিতে হয়।

(২) আমেরিকান ও দেশী বরবটী, ঝিঙ্গা, ভারার বা মাচার শশা, মাটির বা ভুয়ে শশা, বর্ষার কুমড়া, চিচিঙ্গা বা হোঁপা, চালকুমড়া বা ছাঁচিকুমড়া, চাঁপা নটে, লাল বর্ষার শাক, পদ্মনটে, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল বা খাঁকশা, দেশী ও জাপানী ধুন্দুল, সর্ব্বপ্রকার দেশী সীম, সিঙ্গাপুর লাউ, কাবুলি লাউ, হলুদ, কচু, ওল, আম আদা, ঝাল আদা, চিনাবাদাম।

এই সকলের বীজ মাদায় বা হাপরে বপন করিতে হয়।

(৩) দেশী, ফ্রেঞ্চ ও আউসে মূলা, বর্ষাতি বা আউসে মূলা, গোল ফ্রেঞ্চ ও এণ্ডা মূলা, শাক আলু, শোন, ধইঞ্চা, অড়হর।

এই সকলের বীজ জমীতে চাষ দিয়া জমিতে ছিটাইয়া বপন করিতে হয়।

বসন্তের প্রতিষেধক

বর্ত্তমান বর্ষে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। প্রতি বসন্ত ঋতুতে হাম, জলবসন্ত, ও বসন্ত রোগের আক্রমণ দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটী মুষ্টিযোগের উল্লেখ করিতেছি। ঔষধগুলি বিশেষ পরীক্ষিত এবং শাস্ত্রীয়; ঔষধের সহিত পথ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পলতা নিমপাতা, ব্রাহ্মী, হেলেঞ্চা, পটোল, বেতাগ, উচ্ছে, সজিনার ফুল ও ডাটা বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। বাসি বা পচা মৎস্য মাংস ব্যবহার কোনমতেই যেন কেহ না করেন। বসন্তের টিকা লইবার সুযোগ থাকিলে অবিলম্বে লওয়া উচিত।

(১) রুদ্রাক্ষচূর্ণ ৵০ আনা ও গোলমরিচ চূর্ণ ৵০ আনা সমভাগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিনে তিনবার পান করিলে বসন্ত রোগ উপশমিত হয়।

(২) শ্বেত কণ্টিকারীর কাঁচা মূল অর্দ্ধ তোলা গোল মরিচ সহ চন্দনের ন্যায় বাটিয়া দিনে ২ বার সেব্য।

(৩) হরিদ্রা চূর্ণ ৵০ আনা উচ্ছে পাতার রস ২ তোলা সহ পান করিলে হাম ও বসন্ত রোগের উপদ্রব হ্রাস পাইবে।

(৪) হরিতকী বীজের শাস চূর্ণ ৵০ আনা জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে বসন্ত রোগ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

কবিরাজ
শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ
আয়ুর্ব্বেদ নিকেতন। যশোহর।

মুষ্টিযোগ

অজীর্ণে :—সম পরিমাণ লবণ ও যোয়ান মিশাইয়া খাইলে অচিরে অজীর্ণ দোষ ও পেট ফাঁপা দূর হয়।

অম্লরোগ—প্রত্যহ প্রত্যূষে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ও আহারের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে এক পোয়া পরিমাণ গরম জল খাইলে অম্ল রোগের বিশেষ উপকার হয়।

মাথা ধরায়—রক্ত চন্দন ঘসিয়া কপালে প্রলেপ দিলে মাথাধরা নিবারিত হয়। প্রত্যূষে নাক দিয়া জলপান করিলে সকল প্রকার মাথাধরা অচিরে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে।

কর্ণ শূলে :—তুলসীর পাতা অথবা সীমপাতার রস ঈষৎ গরম করিয়া কাণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

দাঁতের মাজন :—সরিষার তৈলে লবণ মিশাইয়া দাঁত মাজিলে, পাথুরিয়া কয়লার সাদা ছাই দিয়া দাঁত মাজিলে, ফটকিরী গুড়া দিয়া দাঁত মাজিলে রক্ত বন্ধ হয়, মাড়ি ফোলে না এবং অকালে দাঁত পড়ে না এবং কখনও দন্তশূল জন্মায় না।

সহজে কাপড় কাচা :—সাবান ১॥ পোয়া, সোহাগা ১॥ কাঁচ্চা একত্র মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিলে কাপড় অতি সহজে অত্যন্ত পরিষ্কার হয় ও অর্দ্ধেক সাবান খরচ হয়।

দীর্ঘকাল দুগ্ধরক্ষা :—খাঁটী দুগ্ধ চিনির সহিত জ্বাল দিয়া ক্ষীরের ন্যায় ডেলা তৈয়ার করিয়া এয়ার টাইট করিয়া রাখিলে প্রায় এক বৎসর কাল ঠিক থাকিবে। ব্যবহার করার সময় ইহা কিঞ্চিৎ লইয়া জলে দিলেই পুনরায় দুধের ন্যায় হইবে।

বেলের মোরব্বা :—প্রথমে কাঁচা বেল-গুলিকে উত্তমরূপে ছাড়াইয়া চাকা করিবে; তৎপর বীচিগুলি বাহির করিয়া দিবে। অনন্তর ঠাণ্ডা জলে প্রায় দেড়ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে উহার কস বা আটা বাহির হইয়া যাইবে। তখন চিনির রসে সিদ্ধ করিলেই বেলের উত্তম মোরব্বা প্রস্তুত হয়।

স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধি :—গরম জলে স্তন ধুইয়া এরণ্ডগাছের পাতা সেই গরমজলে ডুবাইয়া তদ্দ্বারা রাত্রিকালে স্তন বাঁধিয়া রাখিলে স্তনে দুগ্ধ বাড়িবে।

ইন্দুর নিবারণ :—ক্রমান্বয়ে এক সপ্তাহ কাল আকন্দ পাতার ধুম গৃহমধ্যে ও ইন্দুর গর্ত্তে প্রদান করিলে ইন্দুর সমূহ চিরদিনের জন্য সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।

গরুর দুধ বৃদ্ধির উপায়ঃ—লবণ ১ টাক, লালীগুড় ১ পোয়া, পিপুল চূর্ণ ১ তোলা, ভাতের মাড় আধসের, মাস কলাই আধসের, একত্রে ৩।১২ দিন প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে খাওইয়ালে গরুর দুধ খুব বেশী বাড়ে।

গর্ভ নিবারণের উপায়ঃ—ঋতু স্নানের পর ৪।৫ দিন প্রাতে খালি পেটে মটর পরিমাণে হিং কলার মধ্যে পুরিয়া খাইলে গর্ভ নিবারণ হইয়া থাকে।

গামোছা রং করাঃ—হীরাকসের জলে একটু চুন মিশাইয়া গামোছা ভিজাইলে চাঁপাফুলের মত রং হয়।

নানা জাতীয় লেবুর ব্যবহার

লেবু নানা জাতীয় আছে; তন্মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী জাতীয় লেবু ব্যবহার করিয়া থাকি—পাতি লেবু, কাগজ লেবু, গোঁড়া লেবু, টাবা লেবু, কমলা লেবু, সরবতী লেবু।

গোঁড়া লেবু।

গোঁড়া লেবুকে সংস্কৃত ভাষায় জম্বীর বলে। ইহার অন্যান্য নাম জম্ভ, জম্ভার, জম্ভল। ইহা উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও অম্লরসজ। ইহার প্রয়োগ—বায়ু, কফ, বমনবেগ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমিনাশক।

কেহ কেহ অম্লশূল রোগে গোঁড়া বা পাতি লেবু বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল পাইয়া থাকেন। তাহার কারণ "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং"—বেশী কিছুই ভাল নহে; ইহাতে হাত পা জ্বালা, ঘুর্ণী, চক্ষুতে জোনাকির মত দেখা, এই সকল লক্ষণ দেখা যায়। সুতরাং কেহ যেন এই দ্রব্য অধিক মাত্রায় ব্যবহার না করেন।

টাবা নেবু

টাবা লেবুকে সংস্কৃত ভাষায় মাতুলুঙ্গ, বীজপুর রুচক ও ফলপূরক বলে।

ইহা—অম্লমধুর রস, অগ্নিদীপক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী এবং কণ্ঠ, জিহ্বা ও হৃদয়শোধনকারক। প্রয়োগ—ইহা রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসা নাশক।

কমলা লেবু

কমলা লেবুকে সংস্কৃত ভাষায় মিষ্ট নিম্বু বলে।

ইহা—মধুর রস, গুরু, কফোৎক্লেশী, বলকারক, পুষ্টিজনক। প্রয়োগ—ইহা বায়ু, পিত্ত, গরদোষ বিষ, রক্তদোষ, শোষ, অরুচি, পিপাসা, ও বমিনাশক।

কমলা লেবুর জন্মস্থান এই ভারতবর্ষে। নিম্ন বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের সকল স্থানেই কমলার চাষ হইতে পারে। কলিকাতার ১০০ ক্রোশের মধ্যে কমলা জন্মে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পার্ব্বত্য প্রদেশেই এই ফল সুন্দর জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কমলা সুপক্ক হয়।

কলিকাতায় প্রধানতঃ দুই জাতীয় কমলার আমদানী দেখা যায়। ১। শ্রীহট্ট। ২। নাগপুর। এই দুই প্রদেশ হইতে আনীত হয়। তবে শ্রীহট্টের কমলাই উৎকৃষ্ট। ঐ সকল কমলার আবরণ বা খোসা পাতলা এবং শাসও যথেষ্ট হয়। বিশেষতঃ সুপক্ক হইলে ইহা বড়ই মুখপ্রিয় হয়; সিলেটের কমলার

বর্ণ অপেক্ষাকৃত কিছু লাল্‌চে; আর নাগপুর হইতে যে সকল কমলা আসে তাহাদের খোলা পুরু, কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভাযুক্ত লাল।

নাগপুরী কমলায় অম্লরস নাই বলিলেও চলে, কিন্তু স্বাদে শিলেটের মত নহে। আর সুগন্ধের ত কথাই নাই। গৃহের মধ্যে শিলেটের কমলা থাকিলে গৃহ সুগন্ধে আমোদিত হয়। কিন্তু নাগপুরী কমলায় তাহার লেশ মাত্র পাওয়া যায় না।

শ্রীহট্ট হইতে শীতের আরম্ভেই কমলালেবু আসিতে থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের আগমন না হয় ততদিন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কলিকাতায় আনীত হয়। নাগপুরী কমলা ফাগুন মাসের শেষাশেষি আসিতে আরম্ভ হয় এবং ৩।৪ মাস যথেষ্ট পরিমাণে কলিকাতায় পাওয়া যায়।

কমলালেবু গাছ।

কমলালেবু গাছ কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে রোপণ করিতে হয়। কলমের চারার গাছগুলিতে অতি শীঘ্র ফল দিতে আরম্ভ করে। যে সকল জমিতে চুণ ও পটাস্‌ থাকে এবং মাটিতে কাঁকর মিশান থাকে, সেই সকল জমিতেই কমলার চাষ হয়; কমলার জমী উচ্চ হওয়া আবশুক। অস্থিচূর্ণ ও গোয়ালের আবর্জ্জনাই কমলালেবু গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

আশ্বিন মাসের প্রথমেই প্রত্যেক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া মূল অনাবৃতভাবে এক পক্ষকাল রাখিলে ভাল হয়। তারপর উহার গোড়ায় অস্থিচূর্ণ সার, পচা গোময় সার, পুরাতন গাঁথনির চুণ শুরকীর জমাট মসলা ও নূতন ভাল মাটি একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেইগুলি ভরাট করিয়া দিতে হয়। যে স্থানে অধিক বায়ু সঞ্চালিত হয়, সেরূপ স্থানে কমলার গাছ ভাল জন্মে না। বিশেষতঃ সমুদ্রের বাতাস কমলার গায়ে লাগিলে গাছ শুকাইয়া যায়, ফল হওয়া ত দূরের কথা।

আমাদের দেশে যাঁহারা উদ্যানে কমলার চারা বসান তাঁহারা প্রায় দেখিতে পান যে ফল টক হইয়া যায়। এইজন্য কমলার গোড়ার চারিদিকে দুই হস্ত পরিমিত একটী পরিধিযুক্ত বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থিত জমি কোপাইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চুণ মিশাইয়া দিলে সেই গাছের ফল মিষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু গাছের গোড়ায় চুণ দিলে উপকার হয় না বরং গাছ ঝল্‌সিয়া যায়। শ্রীহট্ট প্রদেশের মাটিতে চুণ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া শ্রীহট্টের কমলা এত সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত হয়।

ডাক্তার কবিরাজগণ বলেন—রোগীকে যদি সুমিষ্ট কমলা সর্ব্বদা দেওয়া যায় তাহাতে রোগী শরীরে বল পায়, ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। এমন কি আঙ্গুর ও বেদানা অপেক্ষা কমলা লেবু অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

নারাঙ্গী লেবু

ইহা—অম্লমধুর রসযুক্ত, অগ্নিদীপক ও বায়ুনাশক। ইহা সুগন্ধী ও মুখপ্রিয়; এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে স্বকুসুগন্ধি ও মুখপ্রিয়। নারাঙ্গীলেবু—উষ্ণবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক।

বাতাবী লেবু

বাতাবীলেবু সচরাচর দুই জাতীয় দেখা যায়। একটীর ভিতরের বর্ণ হরিদ্রাভাযুক্ত শ্বেত এবং অন্যটীর ভিতর গোলাপী রং যুক্ত। এই লেবু প্রথমতঃ Batavia দ্বীপ হইতে আনীত হয়; এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে বাতাবিয়া বা বাতাবী। ইহার অপর নাম শোপদ্দ।

বাতাবি লেবু গাছ

বীজ, গুটি, বা দাবা কলমে ইহার চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষাকালেই চারা তৈয়ারী করিবার সময়। ৬।৭ হাত অন্তর চারা রোপন করা উচিত। অন্যান্য গাছের যেরূপ পাট হইয়া থাকে, তদপেক্ষা

ইহার বিশেষ কিছু পাট করিবার নাই। তবে মাটির তারতম্যানুসারে ও বীজের প্রকারভেদে ইহার ফলের বিশেষ তারতম্য হয়।

পৌষমাসের শেষ ভাগে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কয়েক দিবস শিকড় বাহির করিয়া রাখিয়া, পরে সার দিয়া তাহা ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাঘ মাসে গাছে ফুল আইসে। ইহার ফুল শুভ্র বর্ণের, থোলো থোলো ও মনোহর সুগন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার ফল কাঁচা খাওয়া যায় না। শ্রাবণ মাস হইতে গাছে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। গাছ হইতে না পাড়িলে প্রায় এক বৎসর কাল ইহা গাছেই ঝুলিতে থাকে। কিন্তু পাকিয়া যাইবার পর অধিক দিন গাছে থাকিলে ক্রমে নীরস হইয়া যায়। মাঘ মাসে যখন গাছে ফল ধরে তখন গাছের গোড়ায় লবণ দিলে ফল সুমিষ্ট ও রসাল হয়। ইহার আবাদ প্রণালী অন্যান্য লেবু গাছেরই মত।

—গন্ধবণিক পত্রিকা।

কলিকাতার বাজার দর

ঘৃত

ভারতী—	৬৬৲
খুরজা—	৬৬৲
সিকোরাবাদ—(খুরজা মার্কা)	৬২॥০
লক্ষ্মী—	৬৭৲
বাদসাসাগর—	৫৫৲

বিনোদ মার্কা খাটী সরিষার তৈল

১০০ টীন বা ততোধিক প্রতিমণ	২৩৲
১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টীনের কম	২৩/০
খুচরা	২৪৲
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	৩/০

বাজার দর—তৈল

পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাটি (রাধাকৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর ২২৸০, ২৩৲	
,, ঐ ১ মনের দর	২৩৲
,, ঐ খুচরা	২৬৲
,, কানপুর টিন সমেত	২৪৲ ২৪॥০
,, ঘানির	২৭॥০ ২৮৲
নারিকেল তৈল	২০॥০, ২১৲
ঘানীর তৈল	১৭॥০, ১৮৲ ২০৲

আটা, ময়দা, সুজী

পেটেন্ট ময়দা প্রতিমণ	৭৸/০
মিহি ,,	৭॥/০
গৃহস্থী ,, ,,	৭।/০
সুজী ,, ,,	৭৸/
আটা "বি"	৭॥/০
আটা ২নং ,,	৭।০
আটা এস মার্কা ,,	৭/০
আটা ৩নং ,,	৫৲

উপরোক্ত মূল্য বস্তাসহ বুঝিতে হইবে।

কেরোসিন তৈল

১। আমরিকান তৈল :—

মোঙ্কেক	৮৸৶০	প্রতিকেস
চেষ্টর	৮॥৶০	,,
বানর	৮/০	,,
ঐ টিন	৬॥/০	,,
বিলাতী	৬৶০	,,
হাতী, গ্যালান	৫৶৫	

স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। বর্ম্মা তৈল :—

কমল	৮৷/০	প্রতিকেস
গ্লোব লাইট	৮৸/০	,,
উইণ্ডসর	৮॥/০	,,
চক্র	৬।১০	দুইটিন
সূর্য্য	৬।১৯	,,
তারা	৬৷৵১০	,,
ভিক্টোরিয়া	৫৸১০	,,
হাস	৫৸১০	,,
ছাগল	৬॥১০	,,
মুরগী ও চাবি	৫৸/১০	,,

করগেট ও লোহা

২২ গেজ	করগেট	সিট দর	১২॥০	হন্দর
২৪ ,,	,,	,,	১১৸/০	,,
২৬ ,,	,,	,,	১৪৲	,,
২৪ ,,	আর পি, ডি ,,		২৸/০	,,
জয়েষ্ট	(কড়ি) ,,		৬।০	,,
বরগা	(টী) ,,		৮.০	,,
পাটী		,,	৮৲	,,
বল্টু		,,	৮৲	,,

কাঁটাতার	.১৸০	,,
মটক।	॥৵০	পিস

মেণ্টাল ও পেণ্ট।

ব্লক টীন পেনাঙ্গ ছাপ	১৫'৲	হন্দর
আর, টি তামার ইনগট	৬?০	,,
অষ্ট্রেলিয়ান ঐ	৬৭।০	,,
পিগলেড, বি, এম মার্কা	২১॥৵০	,,
ঐ দেশী প্রস্তুত	.৯।০	,,
এণ্টিমান, এ, এস, পি মার্কা	৭১০	,,
ঐ অন্যান্য মার্কা	৪৬॥০	,,
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১৩১৸০	,,
পিতলের চাদর ৪+৪	৬৯৸০	,,
পিতলের ছড়	৬৯৲	,,
রূপার সিট ৪×৪	৮৬৲	,,
রূপার রড	৯২৲	,,
সীসার সিট	২৬॥০	,,
জিঙ্ক ইনগট বিলাতী	২৩॥০	,,
,, ,, (দেশী প্রস্তুত)	২২৲	,,
হাববাক্স হোয়াইট		
জিঙ্ক পেণ্ট	৪২।০	,,
,, হোয়াইট লেড পেণ্ট	৩৫৸৶০	,,
,, গ্রিন পেণ্ট	২৭।০	,,
,, রেড অক্সাইড পেণ্ট	২৭৵০	,,
হাবাকের তারপিন প্রতি গ্যালন	৪৸৶০	,,
রংয়ের তৈল পাকা ,,	২৸৩	
ঐ কাঁচা	২॥৵৩	
সিমেণ্ট মাটী দেশী প্রতি টন	৫৫॥০	
ঐ বিলাতী প্রতি ব্যায়েল	১১॥৵০	

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
মার্চ্চেণ্ট, ৮৬, এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ছাতার হাতল চিত্রণ শিখাইবার স্কুল।

বিগত ১৩৩৪ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যে আমরা "ছাতা প্রস্তুত ও মেরামত প্রণালী" এবং "ছাতার হাতল প্রস্তুতের ব্যবসায়" নামক দুইটি সচিত্র ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধগুলিতে ছাতা নির্ম্মাণের ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ বাহির হইয়াছিল এবং কলিকাতার যতগুলি ছাতার কারখানা আছে তাহাদিগের মধ্যে প্রকাশযোগ্য প্রায় সমুদয় কারখানার নাম ও ঠিকানাদি প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সকল প্রবন্ধ পাঠের ফলে অনেকের মনে ছাতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কুটীর শিল্প হিসাবে অতি অল্প মূলধনেই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যুবকগণ প্রতি সহরে, বন্দরে এবং বাজারে ছাতা নির্ম্মাণ এবং মেরামতের কারখানা খুলিতে পারেন। ছাতা নির্ম্মাণের সমুদয় parts বা অংশই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। জাপান এবং জার্ম্মানীর মালই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। কলিকাতার অনেক কার্ম্মই এই সকল parts আমদানী করিয়া থাকেন, কারখানাওয়ালারা তাহাদিগের নিকট হইতেই parts এবং ছাতার নানাবিধ কাপড়ের থান খরিদ করিয়া থাকেন এবং ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা হইতে মুলীবাঁশ আমদানী করতঃ ছাতার হাতল তৈয়ারী করিয়া থাকেন। এই মুলীবাঁশও কলিকাতার অনেক আড়তে পাইকারী দরে পাওয়া যায়।

মুলীবাঁশের মধ্যে গরমবালী পুরিয়া উত্তপ্ত লৌহ যন্ত্রের দ্বারা কেমন করিয়া ছাতার হাতলগুলি বাঁকানো হয় তাহা ৩৪ সালে প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধগুলিতে দেখানো হইয়াছে। অতঃপর বেঁকানো হাতলগুলির গায়ে প্রদীপের শিখার দ্বারা নানারূপ মার্কা করা হয় এবং এইরূপ বিচিত্র রঙের নক্সা যে সকল হাতলে থাকে সেই সকল হাতল বেশী দামে বিক্রয় হয়। এইরূপ রং বেরং এর নকাশী কাটা হাতল প্রতি ঘণ্টায় যে কারীগর বেশী তৈয়ারী করিতে পারে সে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মজুরী পায়; বর্ত্তমান সময়ে এক একজন দক্ষ কারীকর দৈনিক ২॥০ টাকা হইতে ৩৲ টাকা অনায়াসে রোজগার করিয়া থাকে।

কিন্তু,—এইখানে একটা কিন্তু আছে। এই সকল নকাশী কাটা কারীগরেরা সেকেলে মামুলী প্রথায় প্রদীপের শিখায় ফুঁকা মারিয়া ছাতার হাতলে নকাশী করিয়া থাকে, তাহাতে প্রথমতঃ production বা তৈরী কম হয়; দ্বিতীয়, অন্ধকার বায়ুহীন ঘরে প্রতিদিন নিয়ত ফুঁকা মারিয়া নকাশী কাটিতে থাকায় এই যুবক কারীগর প্রায়ই যক্ষ্মা এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয় এবং বাঁচিয়া থাকিলেও অল্পদিনের মধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এস, সি মিত্র এই নকাশী কাটার একটী সুলভ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ছাতার হাতলে নকাশী কাটার ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং এই শ্রেণীর কারীগরদিগের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের চিত্র এবং কার্য্য প্রণালীর আমূল বিবরণ আমরা ৩৪ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশ করিয়াছি, সুতরাং তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না।

ছাতা নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে অনেক শ্রমবিভাগ বা Division of Labour আছে। বিভিন্ন মাপের ছাতার কাপড় কাটার জন্য cutter আছে, তাহা সেলাই করার জন্য tailor বা দর্জ্জী আছে, হাতলগুলি বেঁকাইবার জন্য শিক্ষিত কারীগর আছে, তাহারা শুধু হাতল বাঁকাইয়া ছাড়িয়া দেয়; এই হাতলগুলি আবার চাঁছিয়া, ঘষিয়া, পালিশ করিয়া দাগ কাটিয়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র কারীগর আছে; অতঃপর এই সকল হাতলে নকাশী কাটার জন্য একদল দক্ষ কারীগর আছে; তারপর হাতলে groove বা ছেঁদা কাটার জন্য মিস্ত্রীর কাজ আছে; সর্ব্বশেষে এই সমুদয় parts বা অংশ assemble করা বা জোড়া দিবার জন্য একদল কারীগর আছে। এইরূপে সমগ্র শিল্পটীর মধ্যে বিভিন্ন কাজের শ্রম বিভাগ আছে। বুদ্ধিমান পাঠক এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে ছাতার হাতলে নকাশী কাটাই এই ব্যবসায়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং শ্রমসাধ্য কাজ। দক্ষ কারীগরেরা পুরাতন কুঁদা প্রণালীতে কাজ করিয়া দৈনিক ২৷৷০ টাকা হইতে ৩ টাকা রোজগার করিয়া থাকে ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার তাঁহার যন্ত্র আবিষ্কার করায় এই marking বা চিত্রাঙ্কণ বিভাগের কাজে অশেষ উন্নতি হইয়াছে।

এই চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা না শিখিতে পারিলে ভদ্র লোকের ছেলের পক্ষে ছাতার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সাফল্য লাভ করা কঠিন; এইজন্য আমরা বঙ্গীয় শিল্প বিভাগকে এ সম্বন্ধে একটী Demonspation class বা হাতেকলমে শিখাইবার জন্য একটী স্কুল খুলিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম এবং কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিয়াছিলাম।

এ সম্বন্ধে ৮ই এপ্রিল তারিখে Industries Department হইতে আমরা যে পত্র পাই তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম।

From

The Director of Industries, Bengal.

To

The Editor, Byabosha-O-Banijya,
9-3, Romanath Mazumdar
St. Calcutta.

Dated the 8th April, 26.

Dear Sir,

Ref :—Your letter dated the 8th March, 1929.

Sub :—Umbrella handle making machineries.

These machines, particularly the marking apparatus, are largely in use by the workers in Calcutta and recently a set of these machines have been installed in a well organised umbrella handle making factory at Chittagong.

There is a proposal to open a Class to impart training in umbrella hadle making at the Industrial Research Laboratory, at a nominal fee of Rs. 5/-per mensem per student. A full course of training is expected to cover a period of one month. Kindly let me know early if the applicants mentioned in your letter are desirous of obtaining a course of training under

the above conditions. It is to be noted that the number of students that can be trained at a time is only six,

Yours Faithfully,
Director of Industries,
BENGAL.

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ এই demonstration class খুলিতে রাজী হওয়ায় কুটীর শিল্প শিক্ষার্থী যুবকদিগের মহদুপকার সাধন করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে "Forward" এবং তাঁহার বাংলা সহযোগী "বাংলার" কথা এই বিষয় উল্লেখ করিয়া শিল্পবিভাগকে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিষয়টীর সম্বন্ধে কিছুই না জানিয়া এবং জানার চেষ্টাও না করিয়া যা তা, লিখিয়া দায়িত্ব হীনতার পরিচয় দিয়াছেন।

আমরা এত কথা আদৌ লিখিতাম না; শিল্পবিভাগ হাতল marking সম্বন্ধে একটী demonstration class খুলিয়াছেন শুধু এই কথা এবং তৎসম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য সংবাদটুকু দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতাম। কিন্তু Forward এবং বাঙ্গালার কথা এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ এবং ভ্রমাত্মক সংবাদ প্রকাশ করায় শিল্প শিক্ষার্থী লোকদিগের মনে উৎসাহ কমিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া এ সম্বন্ধে আমাদের এত কথা লিখিতে হইল। কারণ Forward এবং বাঙ্গালার কথা দেশের আপামর সাধারণ সকলেই পড়ে এবং তাহাদ্বারা অনেক সময় মতগঠন করে। এইজন্য এ সকল বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করার পূর্ব্বে সকল বিষয় জানিয়া মতামত প্রকাশ করিলে সাধারণের কল্যাণ হয়; আশাকরি সহযোগীদ্বয় আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন না; আমরা একক, সহায় সম্পদ বিহীন এবং দেশের সহানুভূতি না পাইয়াও কেবল এই সকল বিষয় নিয়া পড়িয়া আছি, সুতরাং তাঁহাদের ন্যায় প্রতিপত্তিশালী কাগজে যদি এমন সংবাদ বা মন্তব্য বাহির হয় যাহাদ্বারা দেশের যুবকগণের মনে কোনও শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মিতে পারে তাহা হইলে আমাদের সব চেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়া যাইবে এই জন্যই ছাতার হাতলের ব্যবসায় সম্বন্ধে এতকথা পুনরায় লিখিতে হইল।

গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগ একটা দারুণ প্রহসন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ এই বিভাগটী গভর্ণমেণ্টের কোনও স্বতন্ত্র পাকা বিভাগ নহে; Miscellaneous বা নানাজাতীয় কাজের মধ্যে Industries Department বা শিল্পবিভাগের আসন রচনা করা হইয়াছে এবং বৎসরে ইহার পিছনে মাত্র১২০০০্টাকা খরচ করা হয় এই টাকার প্রায় সমস্তই বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানায় খাইয়া যায় এবং যে সামান্য"চটকস্য মাংসং"অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বারা অসংখ্য ক্ষুধাতুরের মুখে ক্ষুদের কণা ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু এজন্য কর্ম্মচারীদের নিন্দা করা চলে না। এতবড় একটা প্রয়োজনীয় জাতিগঠন এবং বেকার সমস্যা দূরীকরণের বিভাগকে একেবারে কপর্দ্দকহীন পঙ্গু করিয়া রাখায় গভর্ণমেণ্ট নিজেই জনসমাজে নিন্দিত এবং ধিকৃত হইতেছেন এবং এইরূপে দেশে যে বিরাট বেকার বাহিনীর সৃষ্টি হইতেছে তাহার দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র অশান্তির আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এইরূপ অস্বচ্ছলতার মধ্যেও শিল্পবিভাগের কর্ম্মচারীগণ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য যে সকল চেষ্টা করিতেছেন তাহা অস্বীকার করতঃ অন্যায়রূপে যদি আমরা তাহার কদর্থ করি এবং দেশের লোককে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করি তবে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের

তাহাতে কিছুই আসিবে যাইবে না, কিন্তু প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হইবে আমাদের দেশেরই হতভাগ্য বেকারগণ। শিল্পবিভাগের দ্বারা দেশের লোক যেরূপে উপকৃত হইতেছেন তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম।

১। বিখ্যাত কেমিষ্ট Dr. R, L, Dutta কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত প্রণালী হাতেকলমে শিখাইয়াদিবার জন্য Demonstration ক্লাশ খুলিয়াছেন, সেখানে আমাদের পত্র নিয়া অনেকে সাবান প্রস্তুত শিখিয়া আসিয়া নিজে কারখানা করিয়াছেন।

২। ছোট আকারে Tannery করিতে হইলে Bengal Tanning Institute কেমন করিয়া কাঁচা চামড়া পাকাইতে হয় অর্থাৎ Tan করিতে হয় তাহা সমস্তই এখানে শিখাইয়া থাকেন ইহা দ্বারা চামড়া ব্যবসায়েচ্ছু যুবকদিগের অশেষ সাহায্য হইতেছে।

এইরূপ লাক্ষপ্রস্তুত প্রণালী, গালা তৈরী, সাবানের জন্য চর্ব্বি রিফাইন করার উপায়, ছাতার কড়ির ব্যবসায় ইত্যাদি ছোটবড় নানা শিল্প শিক্ষার সম্বন্ধে বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। এই বিভাগের কর্ম্মচারীগণ যেরূপ দক্ষতা এবং যত্ন সহকারে সকলকে সাহায্য করিতে তৎপর এরূপ গভর্ণমেন্টের অন্যান্য বিভাগে সাধারণতঃ দেখা যায় না।

কিন্তু খড় না দিয়া ঘর ছাওয়ার মত গভর্ণমেন্ট ইহাদিগকে টাকা না দিয়া শিল্পগঠন করিতে বলিয়াছেন, ভেল্কী দেখাইতে না পারিলেও ইহাদের যত্ন এবং চেষ্টার শিল্প সম্বন্ধে যে সকল সুফল সন্ধান স্থিরি হইতেছে এবং নূতন নূতন আমদানীর যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের দ্বারা নানারূপ সুযোগের সৃষ্টি হইতেছে। বেকার যুবকগণ যদি ভ্রমচালিত হইয়া সে সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার না করেন তবে পরিণামে তাঁহারাই বঞ্চিত হইবেন। ছাতা প্রস্তুতের ব্যবসায় অতি সহজ একটী কুটীর শিল্প এবং অল্প মূলধনেই আরম্ভ করা যায়। প্রতিবৎসর বহুলক্ষ টাকার ছাতা এদেশে আমদানী হয়, বেকার যুবকগণ হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে অনায়াসে এক একটী ব্যবসায় কেন্দ্রে বসিয়া এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারেন এবং মাসে ২।৩ শত টাকা রোজগার করিয়া বিদেশী শোষণ কথকাংশে বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবসায়ের দুইটী কঠিন অংশ হইতেছে ছাতার হাতল বাঁকানো এবং তাহাতে নকাশী কাটা। এই দুইটী কাজ অল্প যুবকেরা না শিখিতে পারিলে কারীগরের হাতের তলায় থাকিতে হইবে এবং কখনও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। এইজন্য শিল্পবিভাগ এই দুইটী কাজ হাতেকলমে শিখাইয়া দিবার জন্য Demonstration ক্লাস খুলিয়া বেকার যুবকদিগের সম্মুখে আয়ের এক নূতন উপায় খুলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা এই সুযোগ হারাইতে না চান তাঁহারা অবিলম্বে আমাদিগকে পত্র লিখুন আমরা তাঁহাদিগকে এই ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দিব।

পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

INDIAN TRADE JOURNAL
13th December, 1928

মোম

(R 187) স্থানীয় কোনও ব্যবসায়ী মোম খরিদ করিতে চাহেন।

বোরাক্স (BORAX) বা সোহাগা

(R 188) রাম নগরের (যুক্ত প্রদেশ) কোনও ব্যবসায়ী সোহাগা বেচিতে চাহেন।

নীমতেলের খইল

(R 189) কানপুরের জনৈক মহাজন নীম তেলের খইল বেচিতে চাহেন।

নাইজার Seed

(R 190) ভিজিয়ানাগ্রামের জনৈক ব্যবসায়ী Niger seed বেচিতে চাহেন।

পদম্ কাঠ

(R 191) রামনগরের (যুক্ত প্রদেশ) জনৈক কাঠের আড়তদার পদমকাঠ (juniperus macropoda) এবং হিমালয় প্রদেশজাত পেন্সিল প্রস্তুতের উপযোগী cedar কাঠ সরবরাহ করিতে চাহেন।

রীটা ফল (SOAPNUTS)

(R 192) রামনগরের জনৈক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে রীটা ফল বেচিতে চাহেন।

তীব্বতী পশম

(R 193) রাম নগরের জনৈক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে তীব্বতী পশম সরবরাহ করিতে পারেন।

CACTUS OIL

(R 194) নিউ ইয়র্কের কোনও ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে cactus oil খরিদ করিতে চাহেন।

INDIAN TRADE JOURNAL
20th December 1923

সিন্ কোনার ছাল

(R 195) বোম্বাইয়ের কোনও ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে লাল সিন্ কোনার ছাল খরিদ করিতে চাহেন।

নারিকেল

(R 196 কানপুরের জনৈক আড়তদার প্রচুর পরিমাণে নারিকেল ও কোপরা খরিদ করিতে চাহেন।

ঘি

(R 197) ফতেগড়ের জনৈক ব্যবসায়ী ঘি সরবরাহ করিতে চাহেন।

চীনাবাদাম

(R 198) কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে চীনা বাদাম কিনিতে চাহেন।

মুগাসুতা

(R 199) জোড় হাটের জনৈক ব্যবসায়ী মুগার সুতা সরবরাহ করিতে চাহেন।

আলু

(R 200) ফতেগড়ের (যুক্ত প্রদেশ) জনৈক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে আলু সরবরাহ করিতে চাহেন।

RHODONITE

(R 201) রেঙ্গুনের জনৈক ব্যবসায়ী রডো নাইট (manganese silicate) বেচিতে চাহেন।

চাউলের ভুষি

(R 202) বোম্বাইয়ের কোনও কলওয়ালা চাউলের ভুষি বেচিতে চাহেন।

ময়দা

(R 203) ফতেগড়ের (যুক্ত প্রদেশ) কোনও ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে ময়দা সরবরাহ করিতে চাহেন।

শুঁটকীমাছ

(R 204) বিলাতের কোনও ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে শুঁটকী চিংড়ী মাছ খরিদ করিতে চাহেন।

INDIAN TRADE JOURNAL
27 th December 1923

রেড়ীর খইল

(R 205) স্থানীয় কোনও ব্যবসায়ী রেড়ীর খইলের খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

ক্রোম ও ম্যাঙ্গানীজ

(R 206) বোম্বাইয়ের কোনও ব্যবসায়ী chrome and manganese ores খরিদ করিতে চাহেন। শতকরা ৪৮ এবং ৪৩—৪৫ ভাগ ক্রোম ও ম্যাঙ্গানীজ থাকা চাই।

পোলাং তেল

(R 207) কোলাচেলের (colachel in travancore state) জনৈক ব্যবসায়ী পোলাং তেল প্রচুর পরিমাণে বেচিতে পারেন। এই তেল ধোবী সাবান তৈয়ার করিতে লাগে।

আসাম অঞ্চলে কাপড় কাঁচা সাবান এবং কোম্পানী বাগানের তামাকের আমি আশানুরূপ কাট্তি করিতে পারিব বলিয়া বেশ আশা রাখি।

আমি উক্ত দুইটী জিনিষের, commission agent ভাবে কাজ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি কোনও বড় কারখানার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিন এবং পত্র পাঠ কিছু sample এবং terms ইত্যাদি লিখিয়া পাঠান। আশা করি আমি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিব। বিনীত—

শ্রীশৈলেন্দ্র নারায়ণ রায়।

P. o. Digboi, upper Assam.

লাক্ষার জঙ্গল বিলী

মথুরাপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড্ তাঁহাদের মালদহের জমিদারীর মধ্যে লাক্ষার জঙ্গল বিলী করিবেন। এই জঙ্গলে প্রায় ৩১০০০ কুলগাছ আছে; যাঁহারা লাক্ষার চাষ আবাদ করিতে চা'ন, তাঁহারা জঙ্গল বিলীর সমুদয় বিবরণের জন্য নিম্নের ঠিকানায় অবিলম্বে পত্র লিখুন। ১৫ই মে পর্য্যন্ত আবেদন গৃহীত হইবে।

S. E. Wilmot Esqre
Managing Director
The Mathrapur Zemindary Coy Ld.
Po. Muthrapur
(Malda)

বাতীল্ রেলওয়ে স্লীপার (SLEELPERS)

G. I. P. রেলওয়ে বিস্তর 3rd class বাতীল sleeper (unserviceable 3rd class Sleepers) বিক্রয় করিবেন বলিয়া নোটীশ দিয়াছেন। ২৫শে মে'র মধ্যে উক্ত রেল কোম্পানীর ফরমে আবেদন করিতে হইবে। এক টাকা পাঠাইয়া দিলে মুদ্রিত ফরম এবং কিনিবার সর্ত্তাদি পাওয়া যাইবে। এই সকল বাতীল sleeper দ্বারা দরজা জানালার ফ্রেম তৈরী করা যায় এবং জ্বালানী কাঠ রূপেও বিক্রয় করা যায়। নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন—

The Divisional Engineer
Jhansi North Division
G. I. P. Ry Jhansi

কুলী সরবরাহের কণ্ট্রাক্ট

১৯২৯ সালের ১লা অক্টবর হইতে মনীহারী-ঘাট এবং সাঁকরীগলি ঘাটের কুলী কণ্ট্রাক্টের কাজ খালী হইবে। এই Labour Contract এর কাজ বিলীর জন্য এখন হইতেই দরখাস্ত নেওয়া হইতেছে এবং ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত নেওয়া হইবে। উক্ত দুই ঘাটে রেল হইতে ষ্টীমারের flat বা গাধাবোটে এবং গাধাবোট হইতে ষ্টীমারে কয়লা এবং অন্যান্য সকল প্রকার মাল বোঝাই এবং খালাস (Loading and un-loading) করার contract লইতে হইবে। কয়লার খাদে Coal raising বা খনির ভিতর হইতে কয়লা উঠাইবার Labour contract লাভ করিয়া বহুলোক লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। এইরূপ Labour বা কুলী Contract পাকড়াইতে পারিলে অনেকের ভাগ্য খুলিয়া যায় এবং এই সকল Contract secure করার জন্য লোকে অনেক টাকা খরচ করে। নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিলে সকল বিবরণ জানিতে পারিবেন।

J. Bell Esqre
Divisional Superintendent
Howrah

কাগজের বাক্স তৈরীর কারখানা

কলিকাতার উপকণ্ঠে একটী Card Board manufactring and Printing কারখানা চালাইবার জন্য জনৈক ধনীর প্রয়োজন; কারখানা চালু অবস্থায় আছে—কিন্তু কিছু মূলধনের দরকার; যিনি মূলধন দিয়া কারখানাটি চালাইবেন তাঁহাকে Managing Agency দেওয়া যাইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন।

Card Board
C/o Manager, Byabosha O Banijya
9-3 Romanath Majumdar Street,
Calcutta.

ব্রাসের কারখানা

Brush manufacturing এর আগোগোড়া সমুদয় কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং Modern upto date Machineries সম্বন্ধে expert

অনৈক লোক ধনী খুঁজিতেছেন যিনি বা যাঁহারা সকল রকম Brush manufacture করিবার জন্য উপযুক্ত মূলধন দিয়া কারখানা করিতে পারেন। ধনীর সন্ধান পাইলে তিনি estimate আদি সব দিতে পারেন। নিম্নে সন্ধান করুন।

Brush
C/o Manager, Byabosha-O-Banijya
9-3 Romanath Majumdar Street
Calcutta

TIMBER এবং অন্যান্য জঙ্গল PRODUCE

১৫ই হইতে ১৯শে জুলাইয়ের মধ্যে গোরখপুরের (B, N. W, Ry) Forest Division এ Timber এবং নানারূপ Forest Produce বিক্রয় করার জন্য বাৎসরিক Auction Sale হইবে। সবিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নে পত্র লিখুন।

Divisional Forest Officer
Gorakhpur
U. P.

Wolfrum Ores

অনৈক ব্যবসায়ী Wolfrum ores কিনিতে চান। Tungsten এর percentage এবং Analysis এর Report সহ নিম্নে পত্র লিখুন।

Box 4852
C/o manager, B. O. B.

MANGANFSE ORES

অনৈক ব্যবসায়ী Manganese orees বেচিতে চান। ৭০০০ টন মজুত আছে। Ore এর মধ্যে minimum 48°/₀ manganese আছে। নিম্নে পত্র লিখুন।

Box 4851
C/o Manager, B. O. B.

কোলিয়ারী বিক্রী

Messrs G. A, Achard Co, Ld (ইন volnntary Liqnidation) এর জুবাবদি কলিয়ারী Auction Sale এ ৫নং মিশন রোডে ১৪ই মে তারিখে বিক্রয় হইবে। বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নে লিখুন।

Liquidator.
25 Mangoe Lane. Calcutta

RAILWAY STORES

E, B, Railwayতে নানারূপ stores সরবরাহ করার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। এই সকল stores সরবরাহ করিয়া বহু অবাঙ্গালী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, আর আমাদের ঘরের ছেলেরা "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ৭ই জুনের মধ্যে টেণ্ডার দেওয়া চাই। ৪নং কয়লাঘাট ষ্ট্রীটে Locomotive Superintendent এর আপিসে টাকা সহ দরখাস্ত করিলে এই টেণ্ডারের সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

Sale of Misscellaneous Merchandise and Unclaimed Property

আগামী ২১শে এবং ২৯শে মে তারিখে হাওড়ার মাল আপিসে (The Central Lost Property Offiice, Howrah) Auction Sale এ নানারূপ Unclaimed Property এবং মালপত্র বিক্রয় করা হইবে। উক্ত আপিসে অনুসন্ধান করিলে বিক্রেয় মাল পত্রাদির লিষ্ট পাইবেন। বলাবাহুল্য এই সকল নীলামে বহু অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী অনেক সময়ে মাটীর দরে নানারূপ মাল কিনিয়া যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। আমরা বাঙ্গালী ব্যবসায়ে যুবকদিগকে এই সব নীলামের জায়গায় যোরা ফেরা করিতে পরামর্শ দিতেছি।

APPRENTICE গ্রহণ

আগামী জুলাই মাসের মধ্যে E, B, Railwayর Workshop এবং কাঁচড়া পাড়ার Technical School এ ২৯ জন apprentice গ্রহণ করা হইবে। নিম্নের ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

The Loco and Carr Superintendent
E, B, Ry.
4, Koila Ghat Street, Calcutta.

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

৯ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [২য় সংখ্যা

চায়ের-চাষ *

ভারতবর্ষের লোকেরা পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসবার পর থেকে শুধু যে তাদের আচার বিচারেরই পরিবর্ত্তন হয়েছে তা নয়—তাদের আহারবিহারের মধ্যেও বেশ একটা উল্‌টা ধারা বইতে সুরু করেছে। এমন একটা দিন ছিল যখন চা, চপ্‌, কাটলেট প্রভৃতি সাহেবী খানার দোকান ত' দূরের কথা ঘরে তৈরী করে খেলেও হিন্দু সমাজে বেশ একটা ছোটখাট রকমের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ত—তখন লোকের ধারণা ছিল ও সমস্ত "অখাদ্য" খেলে হিন্দুয়ানী নাকি আর কোন মতেই রক্ষা করা যাবে না। কিন্তু আজ আমাদের সে মনভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে বলতে হবে।

---

* এই প্রবন্ধটী চা সম্বন্ধে জনৈক শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত। চাবাগানের অনেক বাঙ্গালী ম্যানেজার এবং তাঁহাদের সহকারীগণ হাতে কলমে চাবাগান সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু চাবাগানে যে সকল সার দেওয়া হইয়া থাকে তাহার রাসায়নিক তত্ত্বগুলি জানা থাকিলে ইহাদের অভিজ্ঞতার ভিতর এক নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিবে এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎলব্ধ জ্ঞানের মধ্যেও তাঁহারা এক নূতন আস্বাদ পাইবেন। জ্ঞান অনন্ত, অসীম এবং অফুরন্ত। বিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রতিদিন মানবের নিকট ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নূতন নূতন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেছে। পৃথিবীর জীবন্ত জাতিরা এই ইন্দ্রজাল আয়ত্ত করিয়া পৃথিবীতে এক এক মায়াপুরী রচনা করিতেছে। আর আমরা "সবজান্তা নরেন্দ" হইয়া বলি "ও! ওই কথা বলছেন?—ও আমরা এবং আমাদের দেশের চাষারা আজ চোদ্দ পুরুষ ধ'রে করে আসছি।" ফল এই হ'য়েছে যে এই চোদ্দ পুরুষ ধরে গোলামী ক'রতে ক'রতে আজ ভিটামাটী যায় যায় হইয়াছে। আশাকরি যারা চাবাগানের কাজে হাতে কলমে লেগে আছেন তাঁরা এই প্রবন্ধগুলি মনোযোগ-সহকারে পড়বেন এবং তাহ'লে উপকৃত হবেন একথা আমরা সাহস ক'রে ব'লতে পারি। সম্পাদক।

কিছুদিন পূর্ব্বে রসরাজ অমৃতলাল কোন এক সভায় বক্তৃতা কর্ত্তে উঠে প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছিলেন—"ছেলেবেলা আমরা জানতুম খোস-পাচড়া হলেই সাবান মাখতে হয়—কিন্তু এখন দেখছি সাবান না হলে ছেলে বুড়া কারুরই এক বেলাও চান করা হয় না।" অমৃতলালের টিপ্পনী শুধু যে সাবানের বেলাই প্রযোজ্য তা নয়—চা সম্বন্ধেও ঠিক ঐকথা খাটে।

ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্ব্বে চা খাওয়াটা ছিল মস্ত একটা বাবুয়ানি। খুব পয়সা ওয়ালা বা খুব সৌখীন লোক না হলে কেউ বড় একটা চা খেত না—কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ত চা পানের প্রবর্ত্তন হয়েছেই তাছাড়া এমন কি কুলিদেরও একটা দিনও চা নাহলে চলে না। আগে গৃহস্থের বাড়ী কোন ভদ্রলোক এলে পান তামাক দেওয়াটাই ছিল প্রথা; কিন্তু এখন চা সিগারেট তার স্থান অধিকার করে নিয়েছে। ইউরোপ আমেরিকায় ত চা পানের প্রথা বহুদিন থেকেই চলে আসছে; এক ভারতেই ও জিনিষ ছিল না। কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষেও চায়ের চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে লাখ লাখ টাকার মাল প্রতিবৎসর এখানেই বিক্রয় হয়।

একথা বোধ হয় কাউকে বলে দিতে হবে না, যে ভারতকে অন্ত কোন দেশের উপর চায়ের জন্ত নির্ভর কর্ত্তে হয় না যদিও বছরে প্রায় ১৫০ লাখ পাউণ্ড বাইরে থেকে এদেশে আমদানী হচ্ছে। দুনিয়ার মধ্যে ভারতই হল চায়ের প্রধান কেন্দ্র। দার্জ্জিলিং ও আসামের চায়ের ক্ষেতগুলিতে অজস্র পরিমাণে চা হচ্ছে এবং সে চা সিন্দুক বন্দী হয়ে দেশবিদেশে প্রেরিত হচ্ছে। কম পক্ষে ৭০১৪৪৩ একরের ও বেশী জমিতে চায়ের চাষ হয়ে থাকে এবং দিন দিন ক্ষেতের পরিমাণ অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যে সমস্ত জায়গায় চায়ের চাষ হয় তার মধ্যে আসামই শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে—তারপর দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। তাছাড়া নীলগিরি, কাংগ্রা, দেরাদুন, ত্রিবাঙ্কুর ও—কোচিনেও অল্প বিস্তর চায়ের চাষ হয়ে থাকে। এই সমস্ত চাক্ষেত্রে গড়ে প্রতি বৎসর ২৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। প্রায় ৬ লক্ষ লোক এই সব বিভিন্ন চাবাগানে কাজ করে।

দেড় শতাব্দী আগে চা-চাষ কর্ব্বার কল্পনাও বোধ হয় কোন ভারতবাসীর মাথায় আসতো না—একজন ইংরেজই প্রথম সে কল্পনা করেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সার জোসেফ ব্যাঙ্ক (Sir Joseph Banks) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পরামর্শ দান করেন যে ভারতে চায়ের চাষ কল্লে মন্দ হয় না। এক চীনেতেই তখন খুব চা-চাষ হত। Banksএর পরামর্শ মত কয়েকজন লোককে চীনে পাঠান হল বীজ সংগ্রহ কর্ব্বার জন্তে, আর কয়েকজন চীনা লোককে সঙ্গে করে আনতে যারা কেমন করে চা-চাষ কর্ত্তে হয় তা এদেশ বাসীকে শিখিয়ে দিতে পারবে।

ঠিক এই সময়ে আসামের জঙ্গলে চা-গাছ আবিষ্কৃত হল। তখন গভর্ণমেণ্ট স্থির কর্লেন ঐখানেই তাহলে চা-বাগান স্থাপন করা যাবে। আসাম ছিল তখন জঙ্গলে ভরা—ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের আবাসস্থল। সেখানে গেলে লোকে বড় আর একটা ফিরে আসত না বলেই বোধ হয় আমাদের দেশে একটা প্রবচন চলে আসছে যে কামরূপে গেলে মানুষ ভেড়া হয়ে যায়। কিন্তু সে যুগের কথা হোলেও এখন আসাম আর সে আসাম নেই। এখন আসামের টি-ষ্টেটসগুলা স্বর্গের নন্দন কাননেরই মত অপূর্ব্ব শোভাসম্পদে পরিপূর্ণ।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম আসামে একটা চা-বাগান স্থাপিত হয়—সেই হ'ল ভারতের একটা প্রকাণ্ড ব্যবসায়ের সূত্রপাত।

কোন বড় ব্যবসাতেই বাঙালীর বড় একটা

হাত নেই। ভারতে কাপড়ের কলস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তার অধিকাংশই হ'ল বম্বেওয়ালাদের—লোহার কল স্থাপিত হয়েছে সে হ'ল পার্শীদের—পাটের কল স্থাপিত হয়েছে সে হ'ল ইংরেজের ;—তাছাড়া, রবারক্ষেত প্রভৃতি যা কিছু বড় জিনিষ সবই অ-বাঙ্গালীদের করায়ত্ব। কেবল এক কয়লা আর চাএর ব্যবসাতেই এখনও বাঙালীর কিছু হাত আছে। অনেকগুলি চা বাগানের মালিক বাঙালী—তারা বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই এ সমস্ত বাগান চালাচ্ছে বোল্‌তে হবে—কেননা সেয়ারের ওপর শতকরা যত টাকা লাভ তারা দিচ্ছে-কোন ইংরেজ কোম্পানীই তা দিতে পাচ্ছে না। জগতের লোকের ধারণা বাঙ্গালীর আদৌ ব্যবসা বুদ্ধি নেই; বাঙালী শুধু ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে ভাবের ঘোরে মাতামাতি কর্ত্তেই পটু। কিন্তু এই ধারনাটা যে কত বড় ভুল, উল্লিখিত চা-কোম্পানী গুলি তা স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে।

তবু ইংরেজ ব্যবসাদারদের কাছ থেকে আমাদের অনেক জিনিস শেখবার আছে, কেননা ইংরেজ জাতটাই হ'ল বণিক জাত। ব্যবসা কর্ত্তেইত ওরা প্রথমে এদেশে এসেছিল। তারপর কেমন করে যে ওদের হাতের মানদণ্ড "না পোহাতে শর্ব্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে" সে ইতিহাসের কথা সে কথায় আমাদের কাজ নেই। তবে এটা ঠিক যে ব্যবসা ক'রে ক'রে ওরা পেকে গেছে, কাজেই ব্যবসায় উন্নতি কর্ত্তে গেলে ওদের গুরু বলে আমাদের মেনে নিতেই হবে।

এই চায়ের কথাই ধরা যাক্। যে ভাবে ওরা ভারতবর্ষে চায়ের মার্কেট তৈরী করে নিলে তা ভেবে দেখবার জিনিস। প্রথমে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে কোম্পানীর পয়সায় চায়ের দোকান খোলা হ'ল। অবশ্য যে গুলা খোলা হ'ল সে গুলা ঠিক দোকান নয়, চা-ছত্র বল্লেই তাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। কেননা সেখান থেকে কাউকে চা কিনে খেতে হ'ত না, বিনামূল্যেই তা পাওয়া যেত।—আবার শুধু তাই নয় দক্ষিণার ও ব্যবস্থা ছিল—সে হচ্ছে কলের গান শোনা। এ দেশের লোকে ঐ রকম জামাই আদর পেয়ে প্রত্যহ চা খেতে আরম্ভ কল্লে—তিন বার, চার বার। ক্রমে ক্রমে নেশা বেশ জমে উঠতে লাগল। আগে যেটা সখের জিনিস ছিল-এখন তা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যে পরিণত হ'ল। কোম্পানী কিন্তু এবার চা বিতরণ করা বন্ধ করে দিলে। কিন্তু যাদের নেশা হয়ে গেছে তাদের ত আর চা না পেলে চল্‌বে না—কাজেই তারা কিনে খেতে লাগল। এই রকমে চা-পান আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হয়।

অবশ্য চায়ের মার্কেট তৈরী কর্ব্বার জন্যে যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করা হয়েছিল নৈতিকতার দিক দিয়ে তা হয়ত অধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু ঐ হ'ল ব্যবসা। পৃথিবীতে বাস কর্ত্তে গেলে মাত্রাতিরিক্ত নীতিবাগীশ হ'লে চল্‌বে না; অনেক রকম কৌশল খাটালে তবে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়।

অবশ্য উল্লিখিত উপায়ে প্রচার কার্য্য চালাবার মত পয়সা ও সুবিধা বাঙালীর নেই--কেননা গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে বৈদেশিক এবং আমাদের মধ্যেও একতা কিংবা সঙ্ঘবদ্ধতা (Organisation) নেই। তবে যে উপায় গুলী বাঙালীর সাধ্যের মধ্যে অন্ততঃ সেগুলী আমাদের ইংরেজদিগকে অনুসরণ কর্ত্তে হবে। যেমন সারের ব্যবহার। বাঙালীরা যে আদৌ সার ব্যবহার করে না এমন নয়, তবে সাহেবেরা যেমন প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করে—তারা যেমন সর্ব্বদাই অনুসন্ধান কচ্ছে, পরীক্ষা কচ্ছে, কোন সার ব্যবহার কল্লে বেশী ফসল পাওয়া যাবে—বাঙালীর মধ্যে সে রকম সারের প্রতি অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায় না। যে সমস্ত চা বাগিচা দেশী লোকের অধিকারে—সেগুলা হ'ল আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান।—তার উন্নতির চেষ্টা বাগিচাওয়ালাদেরও

যেমন কর্ত্তব্য—দেশবাসীরও সেই রকম কর্ত্তব্য বলে আমরা মনে করি। চা বাগানে কি রকম সার ব্যবহার করা উচিত সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণাই এ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আমরা আলোচনা কর্ত্তে চাই।

(২)

পৃথিবীর বুকের ওপর যা কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাই, মোটামুটি তাদের দুটো ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক হ'ল জীবজগৎ, আর এক জড় জগৎ। মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা—এ সমস্তই জীবজগতের অন্তর্গত। এই জীবজগৎ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে দরকার আলো, বাতাস, তাপ, আর জলের। বৃক্ষলতার জীবন ধারণের জন্য আরও দুই একটা জিনিসের দরকার সে হল মাটি আর নুন।

আলো নহিলে গাছ বাড়তে পারে না কেননা আলোর মধ্য থেকেই ওরা হজম কর্ব্বার শক্তি সংগ্রহ করে। অন্ধকার জায়গায় একটা গাছ পোঁত, দেখবে ক্রমেই তার দেহ ক্ষীণ হয়ে আসছে—আওতায় গাছ পোঁত, দেখবে সে আলোর দিকে মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর কারণ আলো বৃক্ষলতার প্রাণ রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

গাছপালার বৃদ্ধির ওপর উত্তাপেরও যে বেশ একটু প্রভাব আছে তা স্বীকার কর্ত্তেই হবে। আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই শীতপ্রধান দেশে গাছের বৃদ্ধি খুব অল্প এবং ধীর। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঠিক এর বিপরীত ব্যাপারই পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে গাছপালা খুব দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠে। তবে সব সময়ই যে এই নিয়ম খাটে তা নয়—অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

বাতাস নহিলে কোন জীবই বাঁচতে পারে না—গাছও না। বাতাসের সঙ্গে যে অম্লজান বাষ্প (Oxygen) রয়েছে তা নহিলে কোন জীবেরই এক দণ্ডও চলে না। আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি সেও ঐ অম্লজান বাষ্পের জন্য। গাছপালারা বাতাস থেকে আরও একটা জিনিস টেনে নেয় সেটা, হচ্ছে কার্ব্বন ডায়ক্সাইড (Carbon dioxide)। একটা গাছ যে সব উপাদান দিয়ে তৈরী তার শতকরা ৪০।৫০ ভাগ হ'ল কার্ব্বণ (carbon) বা কয়লা। বাতাসের এই কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড থেকেই গাছের সমুদয় কয়লা সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জল না হ'লে যে গাছ বাঁচে না—এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। জল নিজেই ত একটা খাদ্য, তা ছাড়া অন্য খাদ্য সংগ্রহের সহায়কও বটে। গাছের দাঁত নেই যে আমাদের মত শক্ত জিনিস চিবিয়ে খাবে। শিকড়ই হ'ল তার মুখ এবং পা। অবশ্য পাতা ছাল সর্ব্বাঙ্গ দিয়েই গাছেরা খাদ্য আহরণ করে সত্য তবে এ বিষয়ে তাকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করে শিকড়। মাটির সঙ্গে গাছের গ্রহণোপযোগী যে সমস্ত খাদ্য আছে সে গুলো জলে ভিজে নরম হয়ে গেলে, গাছ শিকড় দিয়ে সে গুলকে টেনে নিয়ে পাতার কাছে পাঠিয়ে দেয়—সেখানে সমস্ত খাদ্য পরিপাক হতে থাকে।

গাছপালার বৃদ্ধির পঞ্চম উপাদান হচ্ছে খণিজ লবণ। যা থেকে উহার ত্বকের সৃষ্টি হয়। মাটিতে খুব অল্প পরিমাণে খণিজ লবণ থাকলেও গাছ বাড়ে বটে কিন্তু খুব প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকলে গাছ আরও বেশী এবং দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়।

(৩)

জীব মাত্রেরই শরীরের সর্ব্বদা ক্ষয় হচ্ছে। বেঁচে থাকতে হলে সেই ক্ষয় পূরণ করে দিতে হবে কার্য্য-ক্ষম হতে গেলে আবার শুধু সেই ক্ষয় পূরণ করে দিলেই চলবে না আবার সঞ্চয় কর্ত্তে হবে। আহার্য্যের মধ্যেই ওই ক্ষয় পূরণ ও সঞ্চয় কর্ব্বার

উপাদান বর্তমান রয়েছে—তাই আমরা আহার্য্য গ্রহণ করি। আমরা যদি স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান হতে চাই তা হলে আমাদের মাছ মাংস ঘি দুধ খেতে হয়—গরু ভেড়ার কাছ থেকে যদি আমরা বেশী দুধ বা বেশী মাংস পেতে চাই—তা হলে তাদের নানা রকম পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দিতে হয়; সেই রকম গাছ-পালার ও গোড়াতে ভাল ভাল সার যোগাতে না পারলে তার কাছ থেকে বেশী এবং ভাল ফসল পাবার আশা করা বৃথা। কিন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য গাছের উৎকৃষ্ট সার বলে বিবেচ্য হবে তা জানতে হলে আগে গাছটাই কি কি জিনিষ দিয়ে তৈরী তা জানা দরকার।

গাছ যে সকল উপাদানে তৈরী তা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; এক দাহ্য আর এক অদাহ্য। এক টুকরা কাঠ পুড়ে গেলে আমরা দেখতে পাই পড়ে আছে খানিকটা ছাই বা কয়লা। সেই ছাই কাঠের চেয়ে ওজনেও কম আবার আকারেও ছোট। কাঠ পুড়ে গেলে পড়ে থাকে শুধু অদাহ্য পদার্থ গুলা; কাজেই কাঠের সমস্ত অদাহ্য পদার্থই ছাই বা কয়লার মধ্যে বর্তমান।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে ঐ ছাই নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টা দিয়ে প্রস্তুত। ফস্ফরাস্, পটাশ, ক্যালসিয়াম্, গন্ধক, লৌহ, সোডা, সিলিকন্, ক্লোরিন, এবং ম্যাঙ্গানিজ। কাঠের মধ্যে দাহ্য পদার্থ আছে চারটে—নাইট্রোজেন্, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ এবং কার্ব্বণ বা কয়লা। অদাহ্য পদার্থ গুলার মধ্যে শেষে যে চারটাও নাম করা হয়েছে অর্থাৎ সোডিয়াম্, সিলিকন, ক্লোরিন এবং ম্যাঙ্গানিজ—এগুলা যে সব গাছের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তা নয় এবং এগুলা বৃক্ষ জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও নয়। তবে বাকী দশটা উপাদান সমস্ত বৃক্ষ-লতার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে এবং তার যে কোন একটার অভাব হ'লে গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটবে।

উল্লিখিত উপাদান গুলির কোন্টা গাছের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করে তা জানবার জন্যে এক অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। প্রথমে কয়েকটী কাচের পাত্রে খানিকটা পরিশ্রুত জল বা পরিষ্কার বালি রেখে তার মধ্যে খানিকটা ক'রে নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ড (Nitrogen Compound) মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর একটা পাত্রে গাছের সমস্ত উপাদান প্রদান করে বাকী গুলাতে পর্য্যায়ক্রমে এক একটা উপাদান কম রাখতে হবে। এইবার প্রত্যেকটী পাত্রের জলে কিছু দিনের জন্য এক একটী গাছের শিকড় ডুবিয়ে রাখলে তাদের হ্রাস বৃদ্ধি দেখে সহজেই নিরূপণ করা যাবে কোন গাছের উপর কোন উপাদানের প্রভাব কিরূপ।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি বাতাস আর মাটি থেকে গাছ তার আহার্য্য সংগ্রহ করে। বাতাস থেকে যা টেনে নেয় তার মধ্যে কার্ব্বণই প্রধান। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন সংগ্রহ করে জল থেকে। বায়ুমণ্ডলের বার আনা ভাগই নাইট্রোজেন হলেও অধিকাংশ গাছই বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ কর্ত্তে অক্ষম—এমন কি মাটির ভিতর যে অস্থিচূর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ড থাকে তাও তারা সরাসরি গ্রহণ কর্ত্তে পারে না—কেন না শক্ত জিনিষ গ্রহণ কর্ব্বার শক্তি গাছের নেই। কিছুদিন মাটির মধ্যে থাকলে বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুর (bacteria) সংস্পর্শে এসে ঐ সমস্ত নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসে যায় এবং ক্রমে উহা জলে দ্রবীভূত হয়ে গেলে গাছেরা তাদের শিকড়ের সাহায্যে ঐ দ্রবীভূত নাইট্রোজেন টেনে নেয়।

গাছের বৃদ্ধির জন্যে যে সমস্ত খণিজ পদার্থের দরকার বলে আমরা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে তিনটে জিনিসের প্রয়োজন খুব বেশী। সে তিনটে হ'ল ফস্ফরিক্ এসিড্, পটাশ, এবং চুণ।

বাকী জিনিষ গুলার যে কোনই উপযোগীতা নেই এমন কথা আমি বলি না!—তবে এ কথা সত্য যে গাছের জীবনে সে গুলার প্রভাব খুব কম এবং প্রায় সমস্ত মাটিতেই যে পরিমাণে সেই সমস্ত পদার্থ থাকে তাতে গাছের প্রয়োজন মিটিয়েও ঢের বেশী থেকে যায়।

সাধারণতঃ কর্দ্দমাক্ত এবং ভারী মাটিতেই প্রচুর পরিমাণে পটাশ [Potash] মিশ্রিত থাকে ; কিন্তু হাল্‌কা এবং শুষ্ক মাটিতে উহার পরিমাণ খুব কম। কাজেই ঐ ধরণের মাটিতে পটাশ সংযোগ কর্ত্তে পারে যথেষ্ট সুফল ফলবার সম্ভাবনা রয়েছে ।

মাটীর মধ্যে ফস্‌ফরিক্ এসিড প্রায়ই ক্যাল্‌সিয়াম্ বা ম্যাগনিসিয়ামের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। কখন কখন লৌহ এবং এলুমিনিয়মের সঙ্গেও ফস্‌ফরিক্ এসিড দেখতে পাওয়া যায়। গাছের দেহে যে প্রোটীন [protien] আছে সে ঐ ফস্‌ফরিক্ এসিড দিয়েই তৈরী হয় ।

যাহা হউক আমরা সার ব্যবহারের কথা বলছিলাম। কোন্ গাছের জন্য কি কি সার ব্যবহার কর্ত্তে হবে এবং তাদের পরিমানই বা কি তা জানবার জন্য সাধারণতঃ সেই গাছের ছাই বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। লিবিগ্ (Liebig) যে mineral theoryর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে ও ঠিক ঐ ভাবে। তাঁর মত হচ্ছে এই যে একটা গাছের ছাই বিশ্লেষন কল্লে যে সমস্ত উপাদান যে অনুপাতে পাওয়া যাবে আমরা যদি মাটিতে সেই সমস্ত উপাদান সেই অনুপাতে মিশিয়ে দিই তাহলেই—জমিতে ঠিকমত সার দেওয়া হবে এবং গাছের কাছ থেকে সব চেয়ে বেশী ফসল পাওয়া যাবে।

ধরুণ,—একটা গাছে নাইট্রোজেন এবং ফস্‌ফরিক এসিডের পরিমাণ খুব বেশী। এস্থলে Leibigএর থিওরি অনুযায়ী কাজ কর্ত্তে গেলে মাটিতে নাইট্রোজেন এবং ফসফরিক এসিডের সার প্রদান করাই বিধেয়। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ওই থিওরির মধ্যে কিছু কিছু গলদ আছে। কেন না গাছের আবশ্যকীয় সমস্ত উপাদান মাটিতে বর্ত্তমান থাকলেই যথেষ্ট হবে না। গাছের হ্রাস বৃদ্ধি বহুল পরিমাণে তার ঐ সমস্ত পদার্থ গ্রহণ কর্ব্বার শক্তির উপর নির্ভর কচ্ছে।

চায়ের পাতা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বৎসর যে জমীতে ১০ মণ চা উৎপন্ন হয় তা থেকে নিম্ন লিখিত পদার্থ কটা কমে গেছে ।

নাইট্রোজেন..... ৩৫—৪০ পাউণ্ড
ফসফরিক এসিড......৭—১০ ,,
পটাশ ......১৬—২০ ,,

উপরোক্ত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত কল্লেই মনে হয় নাইট্রোজেন, ফসফরিক এসিড ও পটাশই হল চা গাছের উপযুক্ত সার। ঐ কটা জিনিসই যে চা গাছের সার তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু কি অনুপাতে ঐ কটা জিনিস মিশান হবে সেইটাই ভাববার কথা। অবশ্য চায়ের পাতা বিশ্লেষণ করে যে অনুপাতে ঐ গুলি দেখিতে পাওয়া যায় সেই অনুপাতে মিশালেই যদি যথেষ্ট হত তা হলে আর কোন হাঙ্গামাই থাকত না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলেছি অনেকখানি নির্ভর করে চা গাছ কী পরিমাণে ঐ গুলা গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্বে তার ওপর। কাজেই চা বাগানে কি কি সার কত পরিমাণে ব্যবহার কর্ত্তে হবে তা তাড়াহুড়া করে স্থির কল্লেই চলবে না—ভাল করে পরীক্ষা করে ঠিক কর্ত্তে হবে।

(ক্রমশঃ)

মুক্তার চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতর পর)

জাপানে কিয়টোর অন্তঃপাতী একটী দোকানে রক্ষিত ঝিনুকের ভিতর হারের উপযোগী এক সঙ্গে ১৩টী মুক্তা এক সাইজের দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে এক একটি ১ রতির চেয়ে বেশী বড় নয় সুতরাং কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণ করা জওহুরীদের পক্ষেও কষ্ট সাধ্য।

উপরোক্ত প্রকারে মুক্তাপ্রসবকারী ঝিনুকের চাষ করিলে অনেক সময় স্বাভাবিক বা প্রকৃত মুক্তাও জন্মাইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। ঐ প্রকার স্বাভাবিক মুক্তা এক একটির মূল্য ৭,৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়েছে বলিয়া শোনা যায়। ঝিনুকের চাষে যে শুধু মুক্তাই পাওয়া যাবে তাহা নয়। ইহাতে যে খোলা বা ঝিনুক পাওয়া যায় তাহা বোতাম তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ঢাকায় স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট ও বড় বোতামের কারখানা আছে। ইহার মধ্যে যে কয়টীতে বৃহৎ আকারের বোতাম তৈয়ারীর ব্যবস্থা আছে তাহাতে ঝিনুকের অভাবে আশানুরূপ কাজ চলিতেছে না। যাহাদের বোতাম তৈয়ারীর কারখানা আছে তাহারা অনায়াসে ঝিনুকের চাষ করিতে পারে, তাহাতে বেশী মূলধনের প্রয়োজন নাই অথচ স্থায়ী ভাবে ব্যবসার উন্নতির জন্ম ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু মুক্তা যাহা পাওয়া যাবে তাহা তাহাদের জন্ম আশাতীত লাভ বলিলে ও হয়।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মৎস্য বিভাগ ১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঢাকায় কয়েকটী পুকুরে ঝিনুক চাষের পরীক্ষা ও করা হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার ফলাফল সম্বন্ধে সাধারণ লোক কিছু জানে না। এই পরীক্ষার ফলাফল যদি বাঙ্গালাতে প্রকাশ করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিতরণ করা হইত তাহা হইলে এ চাষের প্রতি অনেকেরই হয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহা অবশ্য সুখের বিষয় যে মৎস্য বিভাগ (Fisheries dept) রুই কাতলা মাছের চাষ সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন ও কয়েকটী স্থানে তাহার চাষের উপযোগীতা ও নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে স্থানীয় লোককে শিক্ষা দেবারও চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপভাবে জনসাধারণ যাহাতে নানারূপ অর্থকরী বিষয় হাতে কলমে শিখিতে পারে তাহার practical demonstration দেখাইয়া সেই সকল অর্থকরী ব্যবসায়ে জনসাধারণকে প্রলুব্ধ এবং নিয়োজিত করার চেষ্টা করাই প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পৃথিবীর যে সকল দেশ স্বাধীন এবং জনতন্ত্রের ইচ্ছার উপর যে সকল দেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয় সেইসকল দেশে এইরূপ ভাবেই শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে এবং হইতেছে।

আমরা কি ইহা আশা করিতে পারিনা যে পুনরায় গবর্ণমেণ্ট মৎস্যবিভাগ খুলিয়া মাছের ও তৎসম্পর্কে অন্যান্য জলচর প্রাণীর চাষের উন্নতির চেষ্টা করিবেন? যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বা

দেশের লোক এ সম্বন্ধে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা না করিবেন সে পর্য্যন্ত তাহার উন্নতির কোন আশা করা যায় না। বর্ত্তমানে মাদ্রাজ মৎস্য-বিভাগের তত্বাবধানে ফিশারী স্কুল (Fishereis Training Institute) খোলা হইয়াছে। ইহা ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে কালিকাটে খোলা হয়। তাহাতে ছাত্রদিগকে সমুদ্রে মাছ ধরা, নৌকা চালান, জাল-বোনা ও মাছের চাষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাদের শিক্ষার জন্য প্রাণী বিজ্ঞান (Zoology) সম্বন্ধে দেশীয় ভাষায় একটী পুস্তকও তৈরী করা হয়েছে। এই স্কুলের হেড মাষ্টার বি,এসসি, পাশ। তিনি ও স্কুলের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষকগণ ছাড়া মৎস্য বিভাগের নানা বিষয়ে পারদর্শী কর্ম্মচারীগণও সময় সময় কোনো কোন বিষয়ে স্কুলে বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

এই স্কুলে যাহারা ৩ বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাদিগকে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ দেওয়া হয়। এপ্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ও উপরোক্ত বিভাগের তত্বাবধানে ৮।১০টী আছে। ইহাতে জেলেদের ছেলেরাই বিশেষভাবে শিক্ষা পায়। ইহা ছাড়া ঐ বিভাগের অনুমতিক্রমে যে কেহ তাহা দেয় যে কোন বিভাগীয় কাজের শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এই বিভাগের তত্বাবধানে মাছের চাষ ও তৎসংক্রান্ত নানা প্রকার মৎস্য সংরক্ষণ ক'রবার কারখানা যেমন কেনারী (Cannery) ও তৈল তৈরী এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার চাষ ক'রবার উপায় উদ্ভাবন করিবার উপযোগী পরীক্ষাগার আছে। এই বিভাগটী সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার অনুকরণেরই করা হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিহার ও উড়িষ্যা এবং ত্রিবাঙ্কুরের মৎস্য বিভাগ হইতে লোক পাঠান হইয়াছে কিন্তু যতদূর জানা আছে তাহাতে এই নদীমাতৃক বাংলা দেশের কোনও ছাত্রকে দেখি নাই।

আহম্মদর রহমান মেজ.ম।

[লেখক এখন আমেরিকায় অবস্থান করিয়া University of Washington এ Zoologyতে M. Sc. পড়িতেছেন।— মোহাম্মদী—

লাক্ষার চাষ ও শেল্যাক প্রস্তুত প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত বিষয়ের পর)

গুণানুসারে সাজান—প্রথমে ষ্টীক্-ল্যাকের বড় বড় দানাগুলি ছোট দানা হইতে পৃথক করিয়া সাজাইবে। যদি বড় বড় দানাগুলি পূর্ব্বেই পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে ছোট দানার চেয়ে ভাল "সেলাক" উৎপন্ন হইবে; কারণ ছোট দানাগুলি ধুলা, বালি এবং আরও অন্যান্য প্রকারের ময়লা জিনিষে মিশ্রিত থাকে। কাজেই ছোট দানাগুলি হইতে বড় দানাগুলি পৃথক করাই যুক্তিসঙ্গত। ৬নং চালুনীর দ্বারা প্রথমে দানাগুলি পৃথক করিতে হয়। যে সমস্ত চালুনীর প্রতি লাইনে এক এক ইঞ্চির মধ্যে একই আকারের ৬টি করিয়া ছিদ্র থাকে, তাহাকেই ৬নং চালুনী বলে। এই চালুনীতে ছাঁকিয়া লইলে লাক্ষার মধ্যে ধুলা বালি প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারে না এবং চালুনীর উপর যাহা থাকে, তাহা হইতেই উৎকৃষ্টতম সেলাক উৎপন্ন হয়। আর চালুনীর ছিদ্রের মধ্য দিয়া যাহা নীচে পড়িয়া যায়, যদিও তাহাতে ধুলা বালি থাকে তথাচ তাহা হইতে নিকৃষ্ট ধরণের সেলাক উৎপন্ন হয়।

চূর্ণীকরণ—লাক্ষা ছাড়াইয়া লইবার পর ষ্টীক্ল্যাককে মিলে চূর্ণ করা হয় এবং সেই চূর্ণ ১০নং চালুনীতে ছাঁকা হয়। যে সমস্ত চালুনীর প্রত্যেক ইঞ্চিতে ১০টি করিয়া ছিদ্র থাকে, তাহাকেই ১০নং চালুনী বলে। ১০নং চালুনীতে ছাঁকিবার উদ্দেশ্য এই যে, বড় বড় খণ্ডগুলি একেবারে ছিদ্র দিয়া গলিয়া যাইতে পারে না। লাক্ষার কণাসমূহ চূর্ণ করিবার সময় একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, মূল কাঁচা উপাদান যাহা ইতঃপূর্ব্বেই পরিষ্কার হইয়াছে, তাহা আর চূর্ণ করিবার প্রয়োজন নাই ইহাতে বার বার একই জিনিষ চূর্ণ করিবার জন্য যে ব্যয় হয়, সেই ব্যয়টা বাঁচে এবং আরও এই হয় যে, খাঁটি লাক্ষার অনেক ভাল ভাল কণা উৎপন্ন হইলে কেবল বাতিল জিনিষেরই পরিমাণ বাড়ে। বলা বাহুল্য আবার সেই অনুপাতে ভাল সেলাকও উৎপন্ন হইতে পারে না। কাজেই মূল উপাদানকে সোজা সুজি চূর্ণ করিতে নাই; কেবল যে সমস্ত ছোট ছোট কণাগুলি আর চূর্ণ করিবার প্রয়োজন নাই, সেই কণাগুলি বাছিয়া বাছিয়া আলাহিদা করিয়া লইলেই হয়। মূল কাঁচা উপাদান ১০নং চালুনীতে ঝাড়িয়া লইলেই এবং বড় বড় দানাগুলি যাহা চালুনীর উপরে

থাকে সে গুলিকে চূর্ণ করিয়া—আবার ঐ ১০নং চালুনীতে ঝাড়িলেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে যতক্ষণ না সমস্ত উপাদানটা চালুনীর ছিদ্র পথ দিয়া যায় ততক্ষণ একবার চূর্ণ করা আবার চালুনী দিয়া ঝাড়া এইরূপ পালটা-পালটি করিতে হয়। প্রথমে যে প্রকার সেলাকের কথা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট (Best) ও নিকৃষ্ট (Inferior) সেলাকের কথা বলা হইয়াছে তাহা পৃথক পৃথক্ ভাবে চূর্ণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ১০নং চালুনীর ছিদ্র পথে তাহা যাইবে। ৬নং চালুনীর ছিদ্র পথে যে সমস্ত ষ্টীক্ল্যাক্ যায় নাই, তাহা চূর্ণ করিয়া এমন করিতে হইবে যাহাতে তাহা ১০নং চালুনীর ছিদ্র পথে যায়; প্রত্যেকবার চূর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণীকৃত সেলাককে আলাহিদা করিয়া রাখিতে হইবে এবং বড় বড় গুলিকে আবার চূর্ণ করিয়া এমন করিতে হইবে, যাহাতে সমস্ত চূর্ণীকৃত দ্রব্য ১০নং চালুনীর ছিদ্রপথ দ্বারা যাইতে পারে। দ্বিতীয় ধরণের অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রকারের সেলাকে ময়লা ও নানা প্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকে। প্রথমে তাহা হইতে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট কণা সমূহ পৃথক করিয়া লইতে হইবে এবং ১০নং চালুনীতে যে সমস্ত কণা পড়িয়া থাকিবে তাহা এমন ভাবে চূর্ণ করিতে হইবে, যেন তাহা ১০নং চালুনীর মধ্য দিয়া যায়।

চূর্ণীকরণের প্রণালী :—ছোট ছোট কারখানায় জাঁতা বা চাক্কী নামে এক প্রকার পাথরের দ্বারা ষ্টীক্ ল্যাক্ চূর্ণ করা হয়। মফঃস্বলে এই প্রকার জাঁতা দ্বারাই কলাই হইতে ডাউল বাহির করা হয় এবং গম পেষা হয়।

যন্ত্রচালিত চালুনী।

শস্য ভাঙ্গা যন্ত্রে ষ্টীক ল্যাক্ চুর্ণীকরণ:—কারখানায় স্ত্রীলোক শ্রমজীবিরাই যাঁতায় ষ্টীক্ ল্যাক চূর্ণ করে। কোন কোন কারখানায় অবশ্য ষ্টীক্ ল্যাক চূর্ণ করিবার জন্য বৃহদাকারের পাথর ব্যবহার করা হয়। এই প্রস্তর হাতে ও বৈদ্যুতিক বলে উভয়ের দ্বারা চালিত হইতে পারে। সাধারণ প্রকারের শস্য ভাঙ্গিবার জাঁতায় দুইজন লোক হইলেই চলে। আবার বৈদ্যুতিক বলেও জাঁতা চালান যাইতে পারে, তাহাতে চুর্ণী করণের খরচা কম পড়ে। কিন্তু বৈদ্যুতিক বলে কেবলমাত্র বড় বড় সেলাক কারখানায় কাজ চলিতে পারে। ষ্টীক্ ল্যাক্ চুর্ণীকরণের জন্য শস্য ভাঙ্গিবার যন্ত্র বা রোলার ব্যবহার করিলে দুই রকম ফল পাওয়া যায়। প্রথমটীতে সময় ও শ্রম কম লাগে এবং ষ্টীক্ ল্যাক্ অতি স্বল্প ভাবে পেষণ করা হয়। বলা বাহুল্য বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত পাথরে ঐরূপ হয় না। কাজেই ফ্যাক্টরীতে রোলার যন্ত্র রাখিলে যাঁতা অথবা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালনাযোগ্য পাথর অপেক্ষা অল্প সময় ও খরচে বেশী কাজ পাওয়া যায়।

চালুনী ও তদ্দ্বারা ঝাড়িবার কথা—লাক্ষা পৃথকীকরণের জন্য নানা জাতীয় চালুনী ব্যবহার করা হয়। মোটা চালুনী দেখিতে গোলাকার এবং লোহার তার দিয়া প্রস্তুত। কোন কোন চালুনী আবার আকারে ত্রিকোনাকার; টিনসংযুক্ত লোহারপাতে ত্রিকোণাকার ছিদ্র করিয়া এই প্রকার চালুনী প্রস্তুত করা হয়। ছোট ছোট কারখানায় ২০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট গোলাকার চালুনী অথবা ত্রিকোনাকার বড় চালুনী ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোক শ্রমজীবিরা তাহা পরিচালনা করে। বড় বড় কারখানায় বৃহদাকারের ত্রিকোণাকার তার বিশিষ্ট চালুনী ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত চালুনী দালানের কড়ি বরগার সহিত দড়ি অথবা লোহার শিকল দ্বারা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং কুলীরা তাহা এ ধার ও ধারে দোলায়। অপেক্ষাকৃত বড় বড় কারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা এ ধার ও ধার সঞ্চালনশীল চালুনী ব্যবহৃত হয়। ভাল ভাল চালুনীতে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে উপাদান দিতে হয়; কাজেই মোটা চালুনীর ন্যায় বড় আকারের চালুনী কিনিবার প্রয়োজন নাই। সুন্দর পিতলের তার দিয়া এইরূপ ছোট চালুনী তৈয়ার হয়।

ধূলি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার কথা—দ্বিতীয় প্রকারের চূর্ণীকৃত লাক্ষা ১০নং চালুনীর মধ্য দিয়া পরে ৪০নং চালুনীর মধ্যে উপস্থিত হয়; তখন সকল প্রকার বালি ও ধুলার কণা সমূহ লাক্ষার ভাল ভাল কণার সহিত মিশিয়া যায়। ৪০নং চালুনীর উপরে যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা কুলায় করিয়া কিংবা ঝাড়িবার পাখা দ্বারা ঝাড়া হয়; ইহাতে ষ্টীক্ ও গাছের ছালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল পৃথক্ হইয়া পড়ে। কারখানায় সাধারণতঃ স্ত্রীলোক মজুরেরাই ঝাড়ার কার্য্য করিয়া থাকে, কারণ তাহারাই এ কার্য্যে বিশেষ পরিপক্ক। এই উপায়ের দ্বারা চুর্ণীকৃত লাক্ষা সমস্ত প্রকার ধূলা, মাটী, আবর্জ্জনা মুক্ত হয়, তারপর ইহা ধৌত করিবার বিভাগে লওয়া হয়। প্রথম প্রকারের চূর্ণীকৃত লাক্ষাও ধৌত করিবার পূর্ব্বে বাতাসের দ্বারা ঝাড়া হয়; কিন্তু এই প্রথম প্রকারের লাক্ষা বাতাস করিবার পূর্ব্বে তাহা ৪০নং চালুনীতে দেওয়া হয় না; যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে ৬নং চালুনীতে দিবার সময়ই বালুকা প্রভৃতি সমস্তই চলিয়া গিয়াছে।

ক্ষুদ্র বালুকা কণা হইতে লাক্ষা উদ্ধার—৪০নং চালুনীর মধ্য দিয়া যে সমস্ত কণা যায় তাহাতে বালি থাকে। ইহা হইতে লাক্ষা উদ্ধার করিতে গেলে প্রথমে ৯০ নং চালুনীর দ্বারা ঝাড়িতে হইবে, তাহাতে বালি ও বড় বড় কণা সমূহ পৃথক্ হইয়া যাইবে। তাহার পর ইহাতে পাখা দিয়া বাতাস করা হয়, ফলে তাহাতে যে লাক্ষা থাকে তাহা উদ্ধার হয়। এস্থলে একথা বলা প্রয়োজন যে, এই ভাবে যে লাক্ষা উদ্ধার হয় তাহা অতি নিকৃষ্ট জাতীয় লাক্ষা; কারণ ইহাতে কাঁচা মালের যাহা কিছু মাটী ময়লা তাহা সমস্তই থাকিয়া যায়। কাজেই ইহা স্বতন্ত্র ভাবে গালান ভাল। গলাইলে নিকৃষ্ট জাতীয় শেলাক উৎপন্ন হয়; সাবধানে কাজ করিলে ইহা হইতেই আবার T, N, জাতীয় সেলাক তৈরী করা যায়।

চূর্ণীকৃত লাক্ষা ধৌতকরণ—উপরোক্ত প্রণালীতে দুই প্রকারের লাক্ষা প্রস্তুত করিয়া পরে স্বতন্ত্রভাবে জলে ডুবান হয়, তাহাতে লাক্ষার ছিদ্র সমূহ নরম হয় এবং লাক্ষাকে দ্রবীভূত করে। পাথরের গামলা কিংবা নাদায় লাক্ষা জলে ডুবান হয়। গামলার আকারে প্রস্তুত সিমেণ্টের চৌবাচ্চায়ও ইহা ডুবাইতে পারা যায়। বড় বড় কারখানাতে এইরূপ চৌবাচ্চা সারি সারি রাখা হয়। খুব বৃহদাকারের একটী মাত্র বড় চৌবাচ্চার দ্বারা এই ডুবানর কাজ হইতে পারে না। বড় কারখানাতে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত ঢাকের মত আকৃতি বিশিষ্ট ঘূর্ণীয়মান চৌবাচ্চা সমূহ লাক্ষা ধুইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। চূর্ণীকৃত ও পৃথকীকৃত লাক্ষা সাধারণতঃ ১২—২৪ ঘণ্টা কাল জলে ডুবাইয়া রাখা হয়।

তাহা হইলে লাক্ষাকণা হইতে রং পৃথকীকৃত হওয়ায় জলের বর্ণ লাল হয়। জলে ডুবান শেষ হইলে লাক্ষা ঘসিয়া মাজিয়া ভালরূপে ধৌত করা হয়। যাহারা ধৌত করে তাহাদিগকে "ধসনদার"
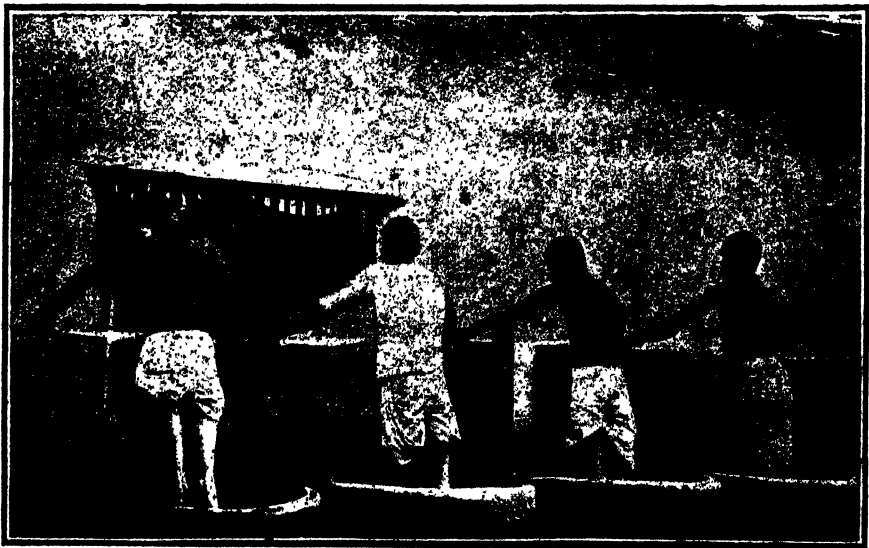
পাথরের গামলায় চূর্ণীকৃত লাক্ষা ধৌতকরণ

সীমেণ্টের চৌবাচ্চায় লাক্ষা ধৌতকরণ।

বলে। সে চৌবাচ্চার মধ্যে দাঁড়াইয়া লাক্ষা পা দিয়া মাড়াইতে থাকে এবং একখণ্ড বাঁশ ধরিয়া থাকে। চৌবাচ্চার যে দিকটা করাত দিয়া কাটার মত সেই দিকটার দিকে লাক্ষা মাড়াইতে থাকে। যে বাঁশটা সে ধরিয়া থাকে তাহা লম্বা লম্বি ভাবে দালানের কড়ি বরগার সহিত বাঁধা থাকে সে এ দিক ওদিক নানাদিকে পা নাড়িয়া নাড়িয়া মাড়াইতে থাকে। শুধু পা দিয়া নহে, হাত দিয়াও সে মাড়াইয়া থাকে। চৌবাচ্চার জল কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়, যখন দেখা যায় যে জল আর লাল হইতেছে না, অথচ অতি অল্প পরিমাণে লাল হইতেছে তখন ধৌত করা সম্পূর্ণ হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে। ধৌত করা জল একখণ্ড কাপড়ে ছাঁকা হয়,তাহাতে জলের মধ্যে যদি কোন লাক্ষার ক্ষুদ্র কণা থাকে,তবে তাহা পাওয়া যায়। সেই কণা সমূহ শুষ্ক করিবার জন্য কোন দূরবর্তী স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, অথবা লাক্ষার রং যে চৌবাচ্চায় থাকে সেই চৌবাচ্চায় লইয়া যাওয়া হয়। এই চৌবাচ্চাকে "রং করিবার গর্ত্ত (Dyepit) বলে। ইহা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, কারখানা হইতে যতদূর সম্ভব দূরে ইহা রাখা উচিত। যদি কারখানার নিকটে কোন কৃষিক্ষেত্র থাকে, তাহা হইলে ছোট ছোট কারখানায় ধৌত করা জল নলের দ্বারা সেই কৃষি ক্ষেত্রে লইয়া যাইয়া ছাড়িয়া দিতে পারিলে প্রভূত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়; কারণ লাক্ষারংয়ের সার জাতীয় গুণ আছে। ধৌত করণের পর, ধৌত করা লাক্ষা একটি বাঁশের ঝুড়িতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে যে অতিরিক্ত জল ইহাতে থাকে, তাহা বাহির হইয়া যায়। পূর্ব্বেই ধূলা ও মাটির কণাসমূহ পৃথক করিয়া লওয়া হয় বলিয়া চৌবাচ্চার নীচে অতি অল্প পরিমাণেই কাদা জমিয়া থাকে। যদি অল্প পরিমাণে

কাদা থাকে, তবে তাহা স্বতন্ত্র ভাবে সংগ্রহ করিয়া তারপর বাতিল লাক্ষা ও ৯০নং চালুনী হইতে প্রাপ্ত ধুলাও মাটি এবং লাক্ষার বীজের শেষাংশ হইতে প্রাপ্ত ধূলা ও মাটির সহিত মিশাইতে হইবে। এই শেষাংশ একটু সাবধানতার সহিত ধৌত করিতে হয়, কারণ কণা সমূহ অতি ছোট, পরন্তু ময়লা ও ধূলা বেশী। এরূপ অবস্থায় ভাল ভাল লাক্ষা কণা হইতে ধূলা বালি একেবারে পৃথক করা কখনই সম্পূর্ণ রূপে পারা যায় না। সাধারণতঃ ইহা হইতে নিম্ন জাতীয় T, N, সেলাক উৎপন্ন হয়।

ধৌত করিবার পাত্র--বড় বড় সেলাকের কারখানায় ঢাকের ন্যায় লোহার পাত্রে করিয়া সেলাক ধৌত করা হয়। এই পাত্র গোলাকার, ইহার দৈর্ঘ্য ৮ফুট ও পরিধি ৪৷৷০ ফুট। একবারে ১৬মণ চূর্ণীকৃত লাক্ষা এই আধারে দেওয়া যাইতে পারে। নিজের বৃত্তির উপর আধারটি ঘুরে এবং তাহাতেই লাক্ষা ধৌত হয়। সাধারণতঃ ঘণ্টায় ১২০ বার করিয়া এই আধারটি ঘুরে। দুই ঘণ্টায় ১৬ মণ লাক্ষা এই পাত্রে ধৌত করা যাইতে পারে।

জল সরবরাহ—লাক্ষা ভিজাইবার ও ধৌত করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে পরিষ্কার জলের প্রয়োজন; কাজেই যেখানে লাক্ষা ধৌত করা হয়, তাহার নিকটেই জলাধার থাকা নিতান্ত দরকার। যে কূপ এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে শুষ্ক হয় না, সেইরূপ কূপ নিকটে থাকিলে ভাল হয়। ধৌত করিবার আধারের নিকট একটি নল কূপ বসাইতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। বড় বড় কারখানার নল কূপ হইতে বৈদ্যুতিক শক্তির বলে পাম্প করিয়া জল ধৌত করিবার আধারে লইতে পারা যায়। ছোট ছোট কারখানায় সাধারণ রকমের নল কূপ থাকিলেই হয়; প্রত্যহ যে পরিমাণে জল লাগে সেই অনুপাতে নলকূপ বসাইলেই চলিতে পারে।

চৌবী আকার—ধৌত করিবার

ধৌত লাক্ষা শুষ্ককরণ।

পর লাক্ষা যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাকে চৌরী বা "সাফা দানা" বলে। চৌরীর রং সোনালী ও গাঢ় লাল এই দুইরংয়ের হয়। কুসুমী এবং বৈশাখী লাক্ষার রং সোনালী রংয়ের হয়। "কাত্‌কী", পুরানো এবং খারাপ ভাবে গাদা দেওয়া লাক্ষার রং গাঢ় লালবর্ণের হইয়া যায়। চৌরির রং দেখিয়াই লাক্ষার শুদ্ধি অশুদ্ধি নির্ণীত হয়। যদিও ধৌত লাক্ষার সাধারণ নাম চৌরী তথাচ ছোট ছোট দানা সকলকে "কুনী" বলে।

শুষ্ক করণ—ধৌত করিবার পর যে "চৌরী" প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সিমেণ্ট করা মেজের উপর একটি পাতলা চাদর পাতিয়া তাহার উপর ছড়াইয়া দিবে। যেরূপ যায়গায় ধুলা বালি নাই, সেরূপ স্থানেই চাদর পাতিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিবে। গ্রীষ্ম কালে কোন ছায়া যুক্ত স্থানে এবং শীতকালে সকালের সূর্য্য কিরণে শুষ্ক করিবে। চৌরীর" চাদর মধ্যে মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিতে হয়। তিন ঘণ্টার মধ্যে চৌরী শুষ্ক হয়। লাক্ষা ধৌত করিবার পরও ছোট ছোট আগাছা, ছাল, কাঠ প্রভৃতি থাকে; কিন্তু কোন ধুলা মাটী থাকে না। সেলাকে ধুলা মাটী না থাকিলেই তাহার মূল্য নিরূপিত হয়, ছোট ছোট আগাছা, ছাল কি কাঠ থাকিলে তাহাতে সেলাকের গুণ নষ্ট হয় না; যেহেতু এই আগাছা প্রভৃতি গালিত লাক্ষা কাপড়ে ছাকিবার সময় উপরে থাকিয়া যায়।

ধৌত করা লাক্ষায় বাতাস করিতে হয়, তাহা হইলে ছাল ও আগাছার যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল তাহাতে থাকে, তাহা অপসারিত হয় এবং ধুলা মাটি অল্প পরিমাণে থাকিলেও তাহা দূর হয়। "চৌরী" হইতে এই প্রকারে অতি পরিষ্কার ও প্রথম শ্রেণীর সেলাক উৎপন্ন হয়।

ঝাড়া—ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য চৌরীতে বিভিন্ন রকমের লাক্ষা মিশ্রিত করিতে হয়। নানা

শুষ্ক লাক্ষা ঝাড়া।

রকমের লাক্ষা একত্র মিশ্রিত করিলে ক্রেতাদের পক্ষে সস্তাদামে কিনিবার সুবিধা হয়। নতুবা অমিশ্রিত লাক্ষা অত্যন্ত দামী বলিয়া খরিদদারেরা কিনিতে পারে না। যখন ফসল হইতে উৎপন্ন লাক্ষা গলাইবার জন্য প্রস্তুত করা হয়, তখনই সাধারণতঃ মিশ্রণ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে, তবে উন্নত প্রণালীতে সেলাক প্রস্তুত করিলে মিশ্রনের আদৌ প্রয়োজনীয়তা থাকে না; কারণ যে প্রণালীতে সেলাক প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে অতি নিকৃষ্ট কাঁচা মাল হইতেও বিক্রয়যোগ্য উত্তম সেলাক প্রস্তুত হয়; পক্ষান্তরে ভাল ভাল রকমের কাঁচা মাল হইতে উৎকৃষ্টতম সেলাক উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক হয়—বর্ত্তমানে প্রচলিত সেলাক প্রস্তুত প্রণালীদ্বারা উৎপন্ন সেলাকের মূল্য হইতেও তাহার মূল্য অধিক হয়।

হরিতাল মিশ্রণ—পীতাভ সেলাকই সাধারণতঃ পছন্দ করা হয়। ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য অল্প পরিমাণে হরিতাল (Sulphide of Arsenic) লাক্ষার সহিত সংমিশ্রণ করা হয়। ইহা অতি অল্প পরিমাণে মিশ্রণ করা হয়; সাধারণতঃ চৌরীর মণকরা ২—৪ ছটাক পরিমাণ হরিতাল মিশ্রণ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মণ করা ৮ ছটাক পর্য্যন্ত মিশ্রিত করা হয়; কিন্তু ৮ ছটাকের অধিক কখনই মিশ্রণ করা হয় না। মিঠাই মণ্ডাদির জন্য যে সেলাক ব্যবহৃত হয়, তাহাতে "হরিতাল" মিশ্রণ করা হয় না। সেলাক উৎপন্নকারীরা মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত করণের জন্য যে সেলাক বিক্রয় করেন, তাহাতে কোন প্রকার আর্সেনিক মিশ্রিত নাই, একথা বলিয়া থাকেন। এই প্রকারের সেলাক "কুসমী" নামধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লাক্ষা হইতে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণ সেলাকের খণ্ড হইতে এগুলি অপেক্ষাকৃত গাঢ়।

হরিতাল প্রস্তুত ও মিশ্রণ—হরিতাল এক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ। বিষাক্ত বলিয়া খুব সাবধানতার সহিত ইহাতে হাত দিতে হয়। অতি সুন্দররূপে ইহা চূর্ণ করিতে হয়। শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় প্রকারেই হরিতাল চূর্ণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে মসলায় যেমন একটু জলের ছিটা দিয়া তাহা গুঁড়া করা হয়, সেইরূপ অতি পাতলা তাল করিয়া একটু জলের ছিটা দিয়া ইহা চূর্ণ করাই ভাল। ছোট ছোট কারখানায় সাধারণ জাঁতার দ্বারাই হরিতাল উত্তমরূপে চূর্ণ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রী-লোকেরাই এইরূপ চূর্ণ করে। তবে বড় বড় কারখানায় Edge runner mill এ হরিতাল চূর্ণ করা হয়। যত বেশী সুন্দররূপে হরিতাল চূর্ণ করা যাইবে, তত কম পরিমাণে হরিতাল লাগিবে, যেরূপ উত্তম প্রকারের চৌরীর জন্য অল্প পরিমাণ হরিতালের প্রয়োজন হয়। হরিতালের অতি পাতলা তাল লইয়া ফসল হইতে উৎপন্ন শুষ্ক লাক্ষা তাহাতে মিশাইতে হয়। হরিতাল মিশ্রণ করিবার পর চৌরীকে একটী পরিষ্কার সিমেন্ট করা দেড় ইঞ্চি পুরু চাদরে পাতিয়া শুষ্ক করিতে হয়, তারপর গালাইবার থলিতে উহা পুরিতে হয়। চৌরীকে সূর্য্য কিরণে রাখিবার প্রয়োজন নাই; বাতাস চলা ফেরা করে এরূপ স্থানে চাদরটী পাতিয়া রাখিলেই অল্প সময়ের মধ্যে উহা শুষ্ক হইয়া যায়।

পশুর লোম [furs]

সলোম পশুচর্ম্ম পাশ্চাত্য বিলাসিনীগণের একটী অতি আদরের সামগ্রী। তাঁহারা খুব উচ্চমূল্যে সুদৃশ্য কোমল পশুচর্ম্ম ক্রয় করিয়া থাকেন। এইজন্য য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহার একটী প্রকাণ্ড ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভল্লুক, নেক্‌ড়ে বাঘ, সীল প্রভৃতি জন্তুর চর্ম্মের উপর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম থাকে উহাকে ইংরাজী ভাষায় 'ফার' বলে। ঐরূপ কোমল লোমাবৃত চর্ম্মের ও ইংরাজী নাম 'ফার'। 'ফার' প্রস্তুত করিবার মোটামুটি পদ্ধতি নিম্নে বিবৃত করিলাম।

প্রথমে চামড়ার উপর হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, স্থূল ও কর্কশ লোমগুলিকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাকে তুষ, ফটকিরি এবং লবণের জলে কচ্‌লিয়া কচলিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ফটকিরি চামড়াটাকে এমন ভাবে ট্যান্ করিয়া ফেলে যে উহা ঠিক কচি ছাগলের চামড়ার আকার ধারণ করে। তৃতীয়তঃ চাম্‌ড়াটাকে সাবান ও সোডা দিয়া পরিষ্কৃত করিয়া আর এক দফা পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। সর্ব্বশেষে ইহাকে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইলেই 'ফার' প্রস্তুত হইয়া গেল। কখন কখন বিভিন্ন রঙ লাগাইয়া লোমগুলিকে সুন্দর সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। রঙ করিলে চর্ম্মখানি শুধু যে বর্ণ সম্পদেই সমুন্নত হইয়া উঠে তাহা নহে, কখন কখন ইহার লোমগুলিও ভেল্‌ভেটের মত কোমল হইয়া উঠে।

রঙ করিবার তৃতীয় উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে অনেক সময় দেখিবা মাত্র 'ফার' খানি যে কোন জন্তুর চাম্‌ড়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সকল জন্তুর চাম্‌ড়ার দর একরূপ নহে। সকল জন্তুর চামড়া সকলে পছন্দও করেন না। সৌখীন সমাজে যে সমস্ত 'ফার' আদর লাভ করে, তাহার দাম এত বেশী যে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। এইজন্য ব্যবসায়ীগণ এক নূতন ফন্দি আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা অল্প মূল্যের 'ফার' গুলিকে এমন ভাবে রঙ করিয়া রাখে যে দেখিলে সে গুলিকে অধিক মূল্যের আসল 'ফার' বলিয়াই মনে

হয়। অথচ আদপে এগুলি নকল। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ম সাধারণতঃ খরগোস ও বিড়ালের চামড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। য়ুরোপে খরগোসের চামড়ার এত বেশী চাহিদা যে হাজার হাজার লোকে খরগোসের ব্যবসা করিতেছে। আমাদের দেশে যেমন ছাগল ভেড়া প্রভৃতি পালন করা হয়, ওদেশে সেইরূপ খরগোস পালন করিয়া অনেকেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। খরগোসের মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং উহার চামড়া হইতে 'ফার' প্রস্তুত হয়।

খরগোস পালন বেশ লাভজনক ব্যবসায়। ইহার চাহিদা প্রত্যহই বাড়িয়া যাইতেছে। খরগোসের লোমের মূল্যও নিতান্ত অল্প নহে। ইহা হইতে felt বা নামদা প্রস্তুত হয়। মেমেদের মাথায় যে feltএর টুপি দেখিতে পাওয়া যায়—সাধারণতঃ ঐগুলি খরগোসের লোম দিয়াই প্রস্তুত। ইহার দাম খুব বেশী। এক একটী টুপি ১৫৷২০ টাকার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না।

শুধু যে খরগোসের লোম হইতেই felt বা নামদা প্রস্তুত হয়—তাহা নহে। সকল প্রকার লোমই ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর অনেক টাকার 'নামদা' বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইতেছে। এইরূপে অজস্র অর্থ এই দরিদ্র দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ইহার প্রতীকার করা কি একেবারেই অসম্ভব? —আমাদের ত তাহা মনে হয় না। ভারতবর্ষে নামদার কারখানা গড়িয়া তোলা যায়। তূলার ছাঁট জমাইয়া যেরূপ কম্বল তৈয়ারি হয়—পশমের ছাট জমাইয়া সেইরূপ নামদা প্রস্তুত করিতে হয়। এ দেশের যুবকেরা শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত বিদেশে গমন করিতেছে। তাহারা যদি দলে দলে ব্যারিষ্টারী স্বদেশে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হয়, তাহা হইলে দেশের অর্থ দেশের মধ্যেই থাকিয়া যায়, অথচ তাহারাও বড় লোক হইতে পারে। পরিশ্রমীও অধ্যবসায়শীল লোকের তত্ত্বাবধানে ছোট-খাট কারখানা খুলিলে তাহা হইতে যে বেশ দু পয়সা লাভ করা সম্ভব—এ উদাহরণ আমরা চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছি। আগে বিদেশ হইতে বহু টাকার ওয়াটার প্রুফ্ বা বর্ষাতি কাপড় এদেশে আমদানী হইত। কিন্তু এখন এখানেই ওয়াটার-প্রুফের কারখানা স্থাপিত হওয়ায় দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে ৩।৪টী ওয়াটার-প্রুফের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং সুখের বিষয় তাহাদের সকল গুলিই দিন দিন বেশ উন্নতি লাভ করিতেছে।

এই ওয়াটার প্রুফের কারখানা স্থাপনের অগ্রনী আমাদের প্রিয়বন্ধু মিঃ এস্, এন, বসু; ইনি পরলোক-গত প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ডি, এন্, রায় মহাশয়ের জামাতা। এ দেশে শিক্ষা সমাপ্ত করতঃ সর্ব্বোচ্চ উপাধি নিয়া ইনি আমেরিকায় বহুদিন যাবত শিক্ষা লাভ করেন। আজ কয়েকবৎসর হইল বালীগঞ্জে ওয়াটার প্রুফের কারখানা স্থাপন করিয়া মিঃ, বোস্ সমগ্র দেশের মধ্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা শীঘ্রই এই কারখানার বিষয় প্রকাশ করিব।

যাহা হউক নামদার কারবারের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। বর্ত্তমানে 'ফার' বা পশুচর্ম্মের যে কারবার চলিতেছে তাহার আরও উন্নতি সাধন করা সম্ভব। ভোদড় বা উদ্‌বিড়াল কাহাকে বলে তাহা পল্লীগ্রামের লোকের অবিদিত নাই। উহারা মৎস্যকুলের যম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে পুকুরের প্রতি উহাদের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই পুকুরের

উদ্‌বিড়ালের শক্তি অপরিসীম। একটী ১২।১৪ সের মাছের গায়ের জোর কম নহে। জলে থাকিলে একজন মানুষেও উহাকে কাবু করিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উদ্‌বিড়াল গুলি অক্লেশেই ১২।১৪ সেরের মাছকে জখম করিয়া ফেলে এবং ডেঙ্গায় তুলিয়া আনিয়া পরমানন্দে ভক্ষণ করে। মৎস্যের শত্রু এ হেন উদ্‌বিড়াল যে মানুষেরও শত্রু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেই ইহাদিগকে ধ্বংস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অবশ্য সুবিধা পাইলেই পল্লীবাসী ইহাদিগকে মারিয়া ফেলে এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মারিয়া ফেলিয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া দেয়—শকুনি কুকুরে তাহাদিগকে উদরস্থ করে।

কিন্তু এইভাবে এ সমস্ত জিনিষ নষ্ট করা উচিত নয়। ভোঁদড়ের চামড়া খুবই মূল্যবান। ইহা বেচিয়া বেশ দু পয়সা লাভ করা যাইতে পারে। শ্বেতাঙ্গ সমাজে যে সমস্ত সামগ্রী বিলাসের উপাদান বলিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়, otter-fur বা উদের চামড়া তাহাদের মধ্যে একটী। এইরূপ সাদা খেক-শিয়াল, বেজী, প্রভৃতির চাম্‌ড়াও খুব বেশী দরে বিক্রয় হয়। যাঁহারা চামড়ার ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাঁহাদিগকে আমরা এই সকল লাভ জনক চামড়ার ব্যবসায়ে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি

চুল (Hair)

চুল কাটিয়া ফেলিলে আবার উহা বাড়িয়া উঠে—ইহা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। অনেকে মনে করেন চুলের অগ্রভাগই বুঝি বাড়িয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। চুলের আগা বাড়ে না—বাড়ে ইহার গোড়া। ইহার মূল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র cell দিয়া গঠিত। সেগুলি চর্ম্মের অন্তস্তরে অবস্থান করে। দিনের প্রতি মুহুর্ত্তেই নূতন নূতন cell জন্মলাভ করিতেছে এবং পুরাতন cell গুলি চুলের আকার ধারণ করিয়া ইহার দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া তুলিতেছে।

সকল মানুষের চুল একরূপ নহে—সকল জন্তুর চুল ও একবর্ণের নহে। কাহার চুল কাল, কাহার চুল সোনালি, কাহার সাদা এবং কাহার বা হরিদ্রাভ চুল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন চুলের মূলে যে bulb রহিয়াছে উহার cell সমুদায়ে একপ্রকার রঙীন তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। ঐ তৈলাক্ত পদার্থের অস্তিত্বই বিভিন্ন ব্যক্তির চুলের বর্ণ বৈষম্যের একমাত্র কারণ। cellএর মধ্যে যদি গাঢ় বাদামী রঙের তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ চুল গজাইবে। এইরূপে cellএর তৈলের রঙ গাঢ় রক্তবর্ণ হইলে চুলের রঙ হইবে সোনালী। সাদা চুলের মূলে কোনরূপ রঙীন্ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে না।

চুল হইতে মানুষের নানা প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করে। ইহা হইতে কুশন, সোফা, কৌচ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ারী হইতেছে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য প্রধানতঃ ঘোড়া ও গরুর চুলই

ব্যবহৃত হয়। মস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য বহু কাল হইতেই লোকে পরচুলা পরিধান করিয়া আসিতেছে। তা ছাড়া যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতিতে কৃত্রিম গোঁফ দাড়ি প্রভৃতি পরচুলা না হইলে চলে না। সাধারণতঃ ঘোড়ার কেশর ও লেজের নরম চুল হইতেই এই সমস্ত পরচুলা প্রস্তুত হয়। ঘোড়ার কেশর ও লেজের চুলগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রথমে উহাদিগকে আচড়াইয়া সমান করিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর দড়ির মত পাকাইয়া একটী ঠাণ্ডাজলপূর্ণ পাত্রে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে পাত্রটীকে জলন্ত উনানের উপর বসাইয়া পাত্রের জল কুসুম কুসুম গরম হইয়া উঠিলে চুলের জড়াগুলি তুলিয়া লইয়া উহার পাকগুলি খুলিয়া ফেলিলে উহা হইতে চমৎকার কোকড়ান চুল পাওয়া যায়। এই ভাবেই কৃত্রিম কোকড়ান চুল তৈয়ারী করা হয়। কৃত্রিম রঙ লাগাইয়া চুলের বর্ণও পরিবর্ত্তিত করা যায়। এক্ষেত্রে সাদা চুলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

চুল হইতে আরও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। জার্ম্মানীতে গরুর চুল (লেজের চুল) হইতে কার্পেট তৈয়ারী করিবার জন্য বিরাট বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। নরওয়ে প্রদেশের চুল-শিল্প নিতান্ত নগন্য নহে। সেখানে ইহা হইতে সুন্দর সুন্দর মোজা প্রস্তুত হয়। এক সময় ঘোড়ার চুল হইতে ক্রনোলাইন (Crinoline কাপড় তৈয়ারি হইত। এখন একপ্রকার উদ্ভিদতন্তু (American aloe) বা আমরা যাহাকে আনারের পাতা বলি তাহাই লোমের স্থান অধিকার করিয়াছে। এইরূপে উট, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি সকল জন্তুর চুলই নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। শুয়ারের চুল হইতে চমৎকার ব্রুশ তৈয়ারি হয়। এমন কি মানুষের চুলও ফেলা যায় না। বরং মানুষের চুলের চাহিদা খুবই বেশী। ইহা হইতে কৃত্রিম দাড়ি, গোঁফ চুল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। চুলের দড়ি, চেন, ব্রোচ প্রভৃতি ও সৌখীন সমাজে যথেষ্ট আদর লাভ করে।

জার্ম্মাণী, ইতালী ও ফ্রান্সের গরীব লোকেরা অনেক সময় নিজেদের মাথার চুল বিক্রয় করিয়া ফেলে। যাহাদের চুল কোকড়ান এবং সুশ্রী তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত দেশ হইতে হাজার হাজার টাকার চুল প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। চুলের কারবারে চীনের নাম ও উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষেও যে চুলের কারবার হয়, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। অথচ প্রতিবৎসর অনেক টাকার চুল এখান হইতে বিলাতে চালান যায়। সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমাঞ্চল হইতেই এই সমস্ত চুল সংগৃহীত হয়। ইউ, পি, মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের লোকে মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলে। বড় বড় তীর্থে মস্তক মুণ্ডন এক প্রকার পুণ্য কার্য্যের মধ্যেই গণ্য। হাজার হাজার লোক প্রতিদিন মানত রক্ষা করিবার জন্য এই সমস্ত তীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিতেছে। নাপিতগণ সেই সব চুল ফেলিয়া না দিয়া যত্নপূর্ব্বক সঞ্চিত করিয়া রাখে। পরে চুল ব্যবসায়ীগণ উহাদের নিকট হইতে মাল কিনিয়া জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেয়। সাধারণতঃ প্রকাশ্য নিলামে এই সমস্ত চুল বিক্রয় হয়। Statesman-এর নিয়মিত পাঠক যাঁহারা তাঁহাদের অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন উহার বিজ্ঞাপন স্তম্ভে বাহির হইতেছে—"অমুক মন্দিরের চুল—এতমণ—প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। নিলামের তারিখ......ইত্যাদি।"

শুধু যে মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিরের চুলই বিক্রয় হয়, তাহা নহে। বাংলা দেশের অনেক মন্দিরের চুলও বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে মোটের উপর বলিতে গেলে বাংলা দেশে চুলের ব্যবসায়—আমরা মনুষ্যচুলের কথাই বলিতেছি—

সেরূপ জোরের সহিত চলিতেছে না। অবশ্য তাহার অনেক কারণ আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলায় মস্তক মুণ্ডনের প্রথা সেরূপ প্রচলিত নাই। এখানে সকলেই মাথায় চুল রাখে—কেবল অতিরিক্ত বড় হইলে অগ্রভাগ গুলি ছাটিয়া ফেলে মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ সেই ছাটা চুল ও সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা নাই। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে চুল কাটিতে হইলে নাপিতের দোকানে যাইতে হয়—নাপিত বাড়ীতে আসিয়া চুল কাটিয়া দিয়া যায় না। আর আমাদের দেশের ব্যবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। এখানে নাপিতই বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চুল কাটিয়া বেড়ায়। লোকে তাহার দোকানে যাইবে কি, তাহার দোকান বলিয়াই কোন স্থান নাই। অবশ্য আজকাল এই অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কলিকাতায় এবং অন্যান্য সহরে দুই চারিটী "হেয়ার কাটিং সেলুন" স্থাপিত হইয়াছে ইহাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এই সমস্ত সেলুনে প্রত্যহ যে সমস্ত চুল সঞ্চিত হয় প্রায়ই সেগুলি আবর্জ্জনা জ্ঞানে রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেগুলি এরূপে ফেলিয়া না দিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিলে কিছু পয়সা পাইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে শুধু যে তাঁহাদেরই লাভ হইবে তাহা নহে। যাঁহারা তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ চুল কিনিয়া বিদেশে রপ্তানী করিবেন তাঁহাদেরও যথেষ্ট লাভ হইবে। এই উপায়ে চুলের ব্যবসায় করিলে দুই চারিজন বেকার যুবকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে। অন্ততঃ যাত্রা থিয়েটারের জন্য পরচুলা তৈরীর ব্যবসা করিলে যে ভালরূপ আয়ের সংস্থান হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই এমন কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম নাই যেখানে আজকাল থিয়েটারের ঢেউ ঢোকে নাই এবং এমেচার পার্টী তৈরী হয় নাই। ইহাদের সকলেই পরচুলার খরিদদার; সুতরাং জিনিষ কাটাইবার ভাবনা নাই।

গঁদ ও রজন

গঁদ ও রজনের গুণ-গত এবং আকারগত সৌসাদৃশ্য এত অধিক যে সাধারণ লোকে ঐ দুইটী পদার্থের মধ্যে পার্থক্য যে ঠিক কোন্‌খানে তাহা সহজে ধরিতে পারে না। তাহারা মনে করে "ভাজা চাল্" এবং "মুড়ি" যেমন একই জিনিষের বিভিন্ন নাম মাত্র সেইরূপ একই জিনিষকেই বুঝি স্থান কাল ও পাত্রভেদে গঁদ ও রজন এই বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ দুইটী জিনিষ ঠিক এক নহে।

চেহারায় যতই মিল থাকুক না কেন, কোন্‌টী কোন্ জিনিষ তাহা জানিবার জন্য উপায় আছে। গঁদ জলে গলিয়া যায় কিন্তু স্পিরিটে গলিয়া যায় না; আবার রজন জলে গলিয়া যায় না বটে কিন্তু স্পিরিটের সংস্পর্শে ইহা সহজেই গলিয়া যায়। এই উপায়ে গঁদ ও রজনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই সহজ হইয়া পড়ে।

গঁদ কথাটী খুবই ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার বৃক্ষের চট্‌চটে নির্য্যাস বা আটার সাধারণ নাম গঁদ। অবশ্য রবার বা রবার জাতীয়

গাছের কথা স্বতন্ত্র। উহাদের নির্য্যাস গঁদের পরিবর্ত্তে "লেটেক্স" নামে অভিহিত হয় এবং লেটেক্সের গুণ ও ধর্ম্মও গঁদ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। যাহা হউক রবার বা রবার জাতীয় গাছ ভিন্ন অন্যান্য গাছের আটাকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) রজন (২) রজন-গঁদ এবং (৩) গঁদ।

বলা বাহুল্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিতে গেলে ঐ তিনটী ভাগের প্রত্যেকটীকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত।

গঁদ ও রজনের মধ্যে যে বাস্তবতঃ বিশেষ কোন পার্থক্য নাই—এ কথা আমরা বলিয়াছি। এমন কি অনেক সময় একই জিনিষকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কোপাল গঁদের (Gum Copal) নাম করিলেই চলিবে। ঐ দ্রব্যটীর বাজার নাম "কোপাল গঁদ" হইলেও, বিশেষজ্ঞগণ উহাকে কোপাল-রজন বলিয়া অভিহিত করেন।

রজন :—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রজন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম আফ্রিকার "কোপাল" নিউজিল্যাণ্ড এবং নিউক্যালিফোর্নিয়ার 'মনিলা' ও "কাউরী" এবং দক্ষিণ আমেরিকার রজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষেও প্রচুর পরিমাণে রজন উৎপন্ন হইয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশে সরকারের বনবিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে উক্ত বিভাগ ১৯২৪-২৫ সনে সর্ব্বসমেত ৯৭,৭৭৫ মন রজন সরবরাহ করিয়াছিল এবং বরাবরই প্রায় ঐ পরিমাণ রজন প্রতি বৎসর সরবরাহ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আফ্রিকায় যে রজন উৎপন্ন হয় তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উহার দাম সকলের চেয়ে বেশী। কোপাল কুরী (Kauri) প্রায় ইহার সমকক্ষ; কাজেই ইহাও খুব মূল্যবান।

কাঠিন্যই রজনের বিচার করিবার মাপ কাটি। যে রজন যত কঠিন, তাহাই তত উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমরা উপরে কয়েক প্রকার রজনের নাম করিয়াছি; কিন্তু ঐ কয়টী ছাড়া আরও নানা প্রকারের রজন আছে। তাহাদের নাম ও প্রাপ্তিস্থান নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) দামার (Dammar) রজন। ইহা মালয়, সুমাত্রা এবং ইষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন হয়।

(২) এলিমি। ইহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন হয়।

(৩) কলফণি (colophoy) or coanmon)। ইহার প্রাপ্তিস্থান আমেরিকার যুক্তরাজ্য।

(৪) এম্বার। প্রুশিয়ার বাল্টিক প্রদেশে ইহা উৎপন্ন হয়।

(৫) একারইড (Acaroid)। ইহার প্রাপ্তিস্থান ওয়েল্‌স এর উত্তরাঞ্চল এবং টাসমেনিয়া।

(৬) সাণ্ডারিক (Sandaric)। ইহা আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া যায়।

(৭) মাষ্টিক (mastic)। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তি প্রদেশ সমূহে ইহা উৎপন্ন হয়।

(৮) ড্রাগন্‌স্ ব্লড (Dragonns blood)। ইহার প্রাপ্তিস্থান ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ এবং সকোট্রা। এশিয়ার নানা স্থানে বিশেষতঃ দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চলে অর্থাৎ শ্যাম, ইণ্ডোচীন প্রভৃতি দেশে ও ইহা উৎপন্ন হয়।

Gum resins

উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্য গুলিই খাঁটি রজন। কিন্তু আরও এক প্রকার আটা আছে যাহা রজন ও গঁদের মাঝামাঝি। ইহাদিগকে ইংরাজীতে gum

resins বলা হয়,—"গঁদ-রজন" বলা যাইতে পারে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই "না-গদ না-রজনের" স্থান খুবই নিম্নে। কাজেই এই সম্বন্ধে বেশী কথা না বলিয়া কেবলমাত্র এইগুলির নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে।—

১। গ্যাম্বোগ (gamboge)। ইহার প্রকৃত নাম কাম্বোড্ হওয়াই উচিত। কেননা কাম্বোডিয়ার অরণ্যানী সমূহে ইহা উৎপন্ন হয়।

২। ম্যালোডোরাস এশ ফোটিডা The malodorous Asfoedita বা হিং ইহার প্রাপ্তিস্থান পারস্য।

৩। Myrrh এবং Bedellin। ইহা ভারতবর্ষ, আরব ও সোমালিল্যাণ্ডে উৎপন্ন হয়।

Gum resins ছাড়া আরও একপ্রকারের রজন আছে; তাহাদিগকে বাল্‌সামিক রেজিন Balsamic resins বলে। এইগুলি তৈলাক্ত-পদার্থ এবং সুগন্ধযুক্ত। অসংখ্য বাল্‌সামের মধ্যে পেরুর বাল্‌সাম্ বা তার্পেনটাইন্, বেঞ্জইন্ সেটারাস্, ভিনিসদেশীয় তার্পেনটাইন, গার্সিনিয়া, ইলুরিন (Illurin), গর্জ্জন, পডোফিলিন (Podophyllion) স্কেমনি (scammony), কেটোরিয়াম্, অপপোনাক্স (opoponax) ফ্রাঙ্কিন্‌সেন্স (Frankincence) ল্যাডানাম্, সাগাপেনিয়াম, এবং Sacahmac এর নাম উল্লেখযোগ্য।

গঁদ :—

এইবার খাঁটী গঁদের কথা ধরা যাউক। সকল প্রকার গঁদের মধ্যে গাম্ আরেবিকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; আবার বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাম্ আরেবিকের মধ্যে গাম্ একেশিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষে "ঘাটী" নামক যে গঁদ উৎপন্ন হয়, তাহাও নিতান্ত মন্দ নহে। গঁদ জলে গলিয়া যায় একথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু সকল গঁদ একই সময়ের মধ্যে গলিয়া যায় না। পারস্য হইতে একপ্রকার গঁদ রপ্তানী হয় উহা আদৌ জলে গলিয়া যায় না। তুরস্কের ট্রাগাসন্থ গঁদ (Tragacanth) জলে গলিয়া যায় বটে কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। ইহা গুড়াইয়া দিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে গলিয়া যায়।

রজন, গঁদ প্রভৃতির উপযোগীতা :—

গঁদ ও রজনের প্রধানতম উপযোগীতা বার্ণিশের উপাদান হিসাবে। আসবাবের উপর ফ্রেঞ্চ পালিশ করিতে হইলে কয়েক প্রকার গঁদ ও রজনের সাহায্য লওয়া অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে পরিমাণ গঁদ ও রজন উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই বার্ণিশ বা পালিশ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কয়েক প্রকারের রজন হইতে তার্পিন ও ঔষধ উৎপন্ন হয়। এই সম্পর্কে গেসাম (Guaiacum), বেঞ্জইন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গেসাম রজন হইতে বাত ও বেদনার মালিস প্রস্তুত হয়। বেঞ্জইন বুকের দোষের একটী অব্যর্থ মহৌষধ। পেরুর বাল্‌সাম্ ইহার রোগবীজ ধ্বংস করিবার শক্তির জন্য বিখ্যাত। চিকিৎসকগণ এন্টিসেপ্টিক হিসাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে—থাইসিস্ রোগে ইহা ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে কেবল খোস্ পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগের প্রতিষেধকরূপে ইহার ব্যবহার হয়। এইরূপে পডফিলিন্ Podophyllin) এবং স্কেমনি (Scammony) রজন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে আপনাপন স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। ঐ দুইটী দ্রব্যই উৎকৃষ্ট জোলাপ; তন্মধ্যে শেষোক্তটীরই বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

শুধু যে পালিশ-কারক ও চিকিৎসকই গঁদ ও রজন ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা নহে।

যাহারা সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করেন তাঁহারা ইহাকে বাদ দিতে পারেন না। তবে এই কার্য্যের জন্ম খাঁটি রজন বা গঁদ ব্যবহৃত হয় না। বালসাম রজন বলিয়া যে তৈলাক্ত পদার্থের আমরা উল্লেখ করিয়াছি উহাই সুগন্ধি তৈলের উপাদান। সুগন্ধি প্রস্তুতকারকের প্রয়োজনানুরূপ বালসামের মধ্যে বেঞ্জইন, বালসাম অফ টলু (Balsum of tolu) কেষ্টোরিয়াম, অপপোনাক্স এবং লাডানাম (ladanum) প্রধান।

বেহালা বা এস্রাজের ছড়িতে ঘসিবার জন্ম যে রজন ব্যবহৃত হয় তাহার ইংরাজী নাম কলফোনি (Colophony) সাধারণতঃ আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই এই জাতীয় রজন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইত গেল রজনের কথা। গঁদের প্রয়োজনীয়তা অন্ম প্রকার। প্রধানতঃ আটা প্রস্তুতের উপাদান হিসাবেই ইহার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গঁদ হইতে যে কতপ্রকার আটা প্রস্তুত হইতে পারে তাহা ১৩৩৩ সালের ব্যবসায় বাণিজ্যে আলোচিত হইয়াছে।

কয়েক প্রকারের গাম্ খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে পারস্যে এবং আফগানিস্তানের আসাফোটিডা বা হিং নামক এক প্রকার গঁদ বা রজন উৎপন্ন হয় একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উহা অতীব দুর্গন্ধময়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই দেশে ঐ দুর্গন্ধ বিশিষ্ট গঁদই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমন কি কয়েক প্রকার তরকারীর উহাই প্রধান উপাদান। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে রন্ধন করিলে উহার যে দুর্গন্ধ সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইয়া যায়। হিং এর খাদ্য দ্রব্য হজম করাইবার শক্তি যে অসাধারণ তাহা সকলেই জানেন।

উপরে অনেক প্রকার রজনের নাম করা হইয়াছে কিন্তু সেলাক (shellac) এর নাম করা হয় নাই। সেলাক বা গালা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। উহা না থাকিলে ফ্রেঞ্চ পালিশ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই প্রসঙ্গে ধুনার নাম করাও উচিত ছিল। ইহা প্রধাণতঃ পুরাতন শাল বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীর নিকট ধুনার উপযোগিতা অবিদিত নহে। অগ্নির উপর ধুনা নিক্ষেপ করিলে যে সুবাসিত ধুম উৎপন্ন হয় তাহা সকলেই বিদিত আছেন এবং সকলেরই ঘরে ঘরে সকাল সন্ধ্যা ইহা ব্যবহৃত হয়। ধুনা হইতে আটা প্রস্তুত হয়।

এই প্রবন্ধে আমরা যে সকল গঁদ বা রজনের কথা বলিয়াছি সে সমস্তই প্রকৃতি হইতে আপনা আপনি উৎপন্ন হয়। কিন্তু আজ কাল পাশ্চাত্য দেশ সমুহে কৃত্রিম উপায়ে গঁদ ও রজন উৎপন্ন হইতেছে। উহা হুবহু প্রাকৃতিক গঁদ ও রজনের মত। এমন কি সাধারণ লোক বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া ও উভয়ের মধ্যে অনুমাত্র পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না। এইগুলির দাম ও অপেক্ষাকৃত অল্প। কাজেই ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম রজন স্বাভাবিক রজনের স্থান অধিকার করিতেছে। বর্ত্তমানে রজনের অবস্থা অনেকটা নীলের মত। এক সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রাকৃতিক নীল ব্যবহৃত হইত কিন্তু আজ সস্তা দরের কৃত্রিম নীল উহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে।

গঁদ বা রজনের চাহিদা নিতান্ত অল্প নহে। এই ভারতেই প্রতি বৎসর ৩।৪ লক্ষ টাকার গঁদ আমদানী হয়। তাহার পর রজনের কথা স্বতন্ত্র। অবশ্য কয়েক লক্ষ টাকা খুব বেশী টাকা নহে, কিন্তু যে দেশের অধিবাসীর দৈনিক আয় গড়ে ছয় পয়সার অধিক নহে, সে দেশের পক্ষে ঐ টাকাকে নিতান্ত অল্পই বা বলি কেমন করিয়া।

এ দেশে প্রতিবৎসর দলে দলে ছাত্র বিজ্ঞান পাঠ সমাপ্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইতেছে।

তাহাদের মধ্যে অনেকেই মেধাবী এবং উদ্ভাবনা শক্তি সম্পন্ন। শেষোক্তদের মধ্যে আবার কেহ দেশ বিদেশে শিল্প শিক্ষা করিতে যান। তাঁহারা যদি বড় ছাড়িয়া ছোট ছোট শিল্পে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তাঁহাদের ও দেশের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে গঁদ, রঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিলে শুধুই যে ভারতের ঐ ঐ দ্রব্যের অভাব ঘুচিবে তাহা নহে, এমন কি উন্নতি করিতে পারিলে বিদেশেও উহা চালান দেওয়া যাইতে পারে।

লিমিটেড কোম্পানার কথা

House of Labourers Ld.

বা

কর্ম্মীভবন

৩৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় আমরা কুমিল্লার House of Laboures বা শ্রমিকদিগের কারখানা সম্বন্ধে এক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। সামান্য ২১০ টাকা মূলধন হাতে নিয়া বাঙ্গালার কয়েকজন নির্য্যাতিত রাজবন্দী কেমন করিয়া একটা বৃহৎ অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে সেই প্রবন্ধে তাহার কথাই আলোচনা করিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক কুমিল্লা সহরের কয়েক জন লোক ব্যতীত আর কেহ যাহাদিগের অস্তিত্বের কথাই জানিত না আজ সমগ্র বাংলাদেশে তাহাদিগের নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অনুষ্ঠান যখন বড় হইয়া পড়ে তখন নানা-দিকে তাহাদের কর্ম্মের ক্ষেত্র ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং সমালোচনার সুযোগ এবং ছিদ্র বাহির করা দর্শকদিগের পক্ষে কঠিন হয় না এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশে এইরূপ সমালোচকের সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী। দেশের বার লাইব্রেরীগুলি সাধারণতঃ এইরূপ দায়ীত্ব জ্ঞান হীন সমালোচনার (irresponsible criticism) কেন্দ্রস্থল; কারণ এইখানেই দেশের শিক্ষিত যুবকগণ একত্র জমা হইয়া থাকেন এবং যাঁহাদের যে পরিমাণে কাজ কম্ম কম তাঁহারা সেই পরিমাণ আগ্রহ এবং একাগ্রতার সহিত পরচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। ইহাতে দেশের কোন কল্যাণও হয়ই না পরন্তু এইরূপ দায়ীত্ব জ্ঞান হীন আলোচনার ফলে অনেক অনুষ্ঠানের ক্ষতি হয়।

কুমিল্লার কর্ম্মী ভবন সম্বন্ধে আমাদিগের কাগজে প্রশংসাবাদ বাহির হইবার পর কয়েক জন লোক আমাদিগের নিকট অনুযোগ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং কেহ কেহ আমাদিগের আফিসে দেখা করিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় পর পর কর্ম্মী ভবনে strike বা ধর্ম্মঘট উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সংবাদ পত্রের সাহায্যে সেই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে সকলের মনেই একটা চাঞ্চল্য

উপস্থিত হয় এবং কর্ম্মী ভবনের কর্ম্মীদিগের মধ্যেযে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে সকলের মনেই একটা ধারণা গড়িয়া ওঠে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে লোকমুখে কর্ম্মীভবনের কর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে নানারূপ গুজব রটনা হইতে থাকে।

এই সকল গুজব বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে চারিদিকে যে দুর্ণাম রটনা হইতেছে তাহা প্রধাণতঃ এই :—

১। ইঁহাদের মধ্যে আর যথেষ্ট স্বদেশীভাব নেই কারণ ইঁহারা Half Pant পরিয়া কাজ করেন এবং মাথায় টুপী ব্যবহার করেন।

২। ইঁহারা চা পান করেন এবং সেই চায়ের পেয়ালা শুধু যে বিদেশী তাহা নয়, একেবারে খাস Hall and Andersonএর বাড়ী থেকে কেনা।

৩। কর্ম্মীদিগের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং কর্ম্মী ভবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

আমরা এ সম্বন্ধে কুমিল্লার House of Labourersএর নিকট তাঁহাদের বক্তব্য শুনিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম এবং তাহার উত্তরে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাগ্রে এইস্থলে প্রকাশ করিলাম।

এখানে আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত একথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি যে আমাদিগের সহিত কুমিল্লার এই কর্ম্মী ভবনের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কোনও সম্বন্ধ নাই। চরিত্রের বল, সততা, অধ্যবসায় এবং একনিষ্ঠা থাকিলে একেবারে মূলধন হীন হইয়াও আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ কেমন করিয়া এক একটী বড় অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা কুমিল্লার এই কর্ম্মীভবন সম্বন্ধে গত আশ্বিন মাসে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং এদেশের শিক্ষিত বেকার বন্ধুদিগকে—তাঁহারা বার লাইব্রেরীতেই আড্ডা জমান বা চপ্ কাটলেটের দোকানে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পরচর্চ্চা রূপ রসাল রটনায় মগ্ন থাকুন—এই উদ্যোগী যুবকদিগের আদর্শ অনুকরণ করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলাম।

কর্ম্মীভবনের কর্ম্মীদিগের প্রশংসাবাদ করিবার ইহাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। নচেৎ ওকালতীর ভাষায় বলি তাঁহাদিগের সহিত আমাদের "কোনও প্রজা মনীব সম্বন্ধ নাই।" অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত আমাদের কাগজের কোনও সম্বন্ধ নাই, এমন কি তাঁহারা আমাদের কাগজের গ্রাহকও নহেন। অন্যান্য অনেক কাগজে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, কিন্তু আমাদিগের কাগজে তাঁহারা কোনও বিজ্ঞাপনও বাহির করেন নাই এবং সেজন্য আমরা কখনও তাঁহাদিগকে অনুরোধও করি নাই কিম্বা তাঁহাদিগের নিকট অনুযোগও করি নাই; অথচ আজ ৮ মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে আমরা প্রায় আট পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি।

এ কথা গোড়াতেই বলিয়া রাখিলাম এই জন্য যে কোনও অনুষ্ঠানের অনুকূল সমালোচনা করিলেই আজ কাল লোকে ভাবে যে নিশ্চয়ই ইহারা এজন্য দাম উসুল করিয়া নিয়াছে। কিন্তু কুমিল্লার কর্ম্মীভবনের সহিত আমাদের গ্রাহক হিসাবেও আজিও কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

এইবার কর্ম্মীভবনের পত্রখানা এইখানে প্রকাশ করিতেছি।

House of Labourers Ld

Comilla, A. B. Ry.

15. 5. 29.

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১২-৫-২৯ তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের নিকট অপরিচিত। কাজেই আপনার আমাদের প্রতি পক্ষ পাতিত্ব করিবার কোন হেতুই থাকিতে পারে না। আপনি আপনার কাগজে যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া দেশের একটিভাল প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করিয়াই লিখিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। আপনি আমাদের যেরূপ অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে আমরা নিজেরাই সঙ্কুচিত হইয়াছি। অযাচিত ভাবে এই উপকারের জন্য আমরা চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।

কারখানায় আংশিক ভাবে strike হইয়াছিল একথা সত্য। strike মিটিয়া গিয়াছে ইহাও সত্য। strike করিবার পূর্ব্বে striker রা আমাদের নিকট কোন অভাব অভিযোগ জানায় নাই এ কথাটি উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে কাগজে আমাদের পক্ষ হইতে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা আপনি নিশ্চয় দেখিয়াছেন। Free Press এর Editor শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত চিঠি সেই সময়ই দিয়াছিলাম। আপনি তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। দেশের সর্ব্বত্র যে হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সব কারখানাতেই strike হওয়া সম্ভব। আমাদের কারখানায় কখনও তাহা হইবে না, আমরাও জোর করিয়া একথা বলিতে সাহস করিতেছি না। তবে এরূপ যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা আমরা সর্ব্বদাই করিব।

আমাদের কারখানায় strike করাইতে পারিলে যাহাদের সুবিধা হয় দুঃখের বিষয় এমন লোক সহরে আছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে Comillaর Electric Licence এর জন্য আমরা প্রথম প্রার্থী হই। আমাদের পর আরেক দল আর একটি Application for Electric Licence দাখিল করিয়াছে। সেই হইতে আমাদের কারখানায় কর্ম্মীদের মধ্যে নানা গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে।

* * * *

আমাদের কারখানার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লোকে যেমন ইচ্ছা মন্তব্য করিতে পারে। তাহাতে আমাদের বিচলিত হইবার কিছুই নাই। আট বৎসর পূর্ব্বে যখন নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, আমাদের নিকট ভবিষ্যতে বিশ্বাস তখনও যেমন ধ্রুব ছিল আজও তাহাই আছে। আমরা জানি, যে আজকাল যদিও আমাদের অনেক সময় "বাবুর কাজ করিতে হয়, তাহা হইলেও আমরা একেবারে "বাবু" নই। আমরা প্রত্যেকে নিজ হাতে কাজ করিতে জানি এবং আবশ্যক হইলে করি। আজ যদি কারখানার সমস্ত শ্রমিক বাহির হইয়া যায় তাহা হইলেও কারখানা ফেল হইয়া যাইবার কোন কারণ নাই। আট বৎসর পূর্ব্বে যখন সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার কোন হেতু ছিল না তখনও আমাদের বিশ্বাস অচঞ্চল ছিল। গত ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে তাহা আরো দৃঢ় হইয়াছে বিন্দুমাত্রও কমে নাই। একবার গড়িয়াছি। প্রয়োজন হইলে আবার নূতন করিয়া গড়িতে পারি এ সামর্থ্য ও সাহস রাখি।

কে, কবে, কোথা হ'তে আপনার নিকট আমাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য পাঠাইয়াছে তাহা জানিলে হয়ত আরও অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিতাম। তবে এইরূপ অনুরোধ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা করিলাম না।

লোকে জল্পনা কল্পনা নানারূপ করিতে পারে; তাহা প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় নাই। তবে তথ্য (facts) সম্বন্ধে যদি আপনার আরও কিছু জানিবার থাকে তবে প্রশ্ন করিলে আমরা সাগ্রহে উত্তর দিব। অথবা আপনি নিজে আসিয়া অনুসন্ধান করিলে আরও ভাল হয়।

আমরা অনেক সময় এমন অতিরিক্ত প্রশংসা পাই যাহাতে নিজেরাই লজ্জিত হই। কিন্তু আমরা গত ৮ বৎসরে কিছু কাজ করিয়াছি এ কথা বিশ্বাস করি। ইংরাজিতে একটা কথা আছে Give even the devil his due. এই হিসাবে আমাদেরও কিছু credit প্রাপ্য আছে। যাহা হউক আশা করি এ বিষয়ে আর বেশী লেখা নিষ্প্রয়োজন।

নিঃ

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এইবার এই সকল সমালোচক দিগের উক্তি সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। কর্ম্মিগণ Half pant এবং টুপী পরেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে আর স্বদেশী ভাব নাই—এই কথা যাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়ান তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই স্বাদেশিকতা কিছু থাকুক আর না থাকুক প্রাণের মধ্যে পরচ্ছিদ্রান্বেষণ এবং পরচর্চ্চার প্রবৃত্তি যে খুব প্রবল এবং মনের মধ্যেও যে যথেষ্ট গরল বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ যুক্তির দোহাই দিয়া ইহারা এইরূপ ও রটনা করিতে পারেন যে অমুক লোক স্বদেশী গরুর গাড়ী ছাড়িয়া যখন বিদেশী রেলে চলা ফেরা করে, অথবা সনাতন নৌকা ছাড়িয়া ষ্টীমার এবং মোটর বোটে যাতায়াত করে তখন উহাদের মধ্যে আর স্বদেশী ভাব নাই, উহারা আসল স্বদেশদ্রোহী।

চুনোট করা ঢিলা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া কোঁচা ঝুলাইয়া হাতুড়ী পিটাইতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বেশ পরিয়া এক বৈঠকখানায় বসিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া পরচর্চ্চা করার পক্ষেই সুবিধা—কোনও শ্রমসাধ্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। "ঘরে ছুঁচোর কের্ত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন" বাংলা দেশে একটা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থই এই যে কোঁচাটা বাবুগিরিরই লক্ষণ। কাপড় কোঁচাইবার জন্ত অনেক ধনীর গৃহে স্বতন্ত্র চাকর থাকে; তাহারা সারা দিন ধরিয়া কেবল কাপড়ই কোচায়। এই সকল কুঞ্চিত কাপড়ের কোচা হাতে করিয়া বাবুরা চলাফেরা করিয়া থাকেন। লোক রাখিয়া যাহাদের কাপড় কোচাইবার ক্ষমতা নাই, তাহারা নিজেরাই কোচাইয়া কাপড় পরে।

কোঁচা যে সকল রকম শ্রমসাধ্য কার্য্যের পরিপন্থী তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক সময় যর গৃহস্থালীর কাজে কোনও বাক্স প্যাটরা সরাইতে হইলে প্রথমে আমাদের কোঁচা সামলাইবার দরকার হইয়া পড়ে পথ চলিবার সময় পাছে রাস্তার ধুলা কাদা লাগি[illegible] সাধের কোঁচা নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে কোচাটি সর্ব্বদ[illegible] হাতে করিয়া চলাফেরা করিতে হয়। কোঁচা উঠাই[illegible] কোমরে গুঁজিয়া রাখা চলে সন্দেহ নাই। কি[illegible] তাহার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে এত সাধে কোঁচার বাহারই তাহা হইলে খোলে না, সুতরা[illegible] কোঁচা দেওয়াই পণ্ডশ্রম। কোঁচা হাতে করিয়া চ[illegible] ফেরা করার দরুন একখানি হাত আবদ্ধ হইয়া থা[illegible] সুতরাং কোনও কাজেই আসে না। দৌড় ঝা[illegible] করিতে হইলে "রাধার কোমরে ঘাঘরীব" ন্যায় কোঁ[illegible] আগেই ধুলায় লুটায় এবং কোঁচাকে বাঁচাইতে হই[illegible] একটা হাতকে অকেজো করিয়া রাখিতে হয়। আ[illegible] মারামারী বাধিলেত কথাই নাই,—কাঁচা এবং কোঁ[illegible] তখন বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান বিপদ হইয়া দাঁড়ায়। প্রতি[illegible] পক্ষ এক টানেই তোমাকে দিগম্বর করিয়া ছাড়ি[illegible] পারে।

কুমিল্লার কর্ম্মী ভবনের কর্ম্মীরা আমাদি[illegible] এই সনাতন "ঢিলে কাঁছা" এবং "লম্বা কোঁচা" প[illegible] ত্যাগ করতঃ বর্ত্তমান সভ্য জগতের পনের আনা লো[illegible] যে পোষাক গ্রহণ করিয়াছে তাহাই যদি গ্রহণ করি[illegible] থাকেন তবে বলিব যে তাঁহারা ঠিক পথই ধরিয়াছেন Half pant এবং টুপী শ্রমিকের পোষাক; ইহা জী[illegible] সংগ্রামের উপযোগী; full pant উঠিতে বসিতে দ্রুত চলাফেরা করিতে, বাধা জন্মায় এবং অসোয়াস্তিক[illegible] বলিয়া গত যুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য দেশের জীব জাতীগণ full pantএর জায়গায় Half pant এ[illegible] full sleeve shirt এর জায়গায় half হাতা shi[illegible] এর প্রচলন করে। জীবন সংগ্রামে কঠোর শ্রম সা[illegible] কাজ এবং দৌড় ঝাপ করিবার পক্ষে এইরূপ পোষাকে আশ্চর্য্য উপযোগীতা উপলব্ধি করিয়া লড়াইয়ের [illegible]

হইতে সমগ্র জগতের লোক এই Half pant ও half হাতা shirt কে business garement বা শ্রমোপযোগী পোষাক বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

যে সকল জাতীজীবন্ত এবং যাহাদিগের মধ্যে একটা forwardness বা অগ্রগতি আছে—তাহারা পুরাতনের জীর্ণ অস্থি কঙ্কাল কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে না। নিত্য নূতন নূতন চিন্তা এবং আবিষ্কার তাহাদিগকে প্রতি নিয়ত উন্নত হইতে উন্নততর পথে লইয়া যাইতেছে। এই পোষাকের মধ্যেও ভিক্টোরিয়া যুগ (Victorian age) হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যে কত রূপান্তর হইয়াছে এবং কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভিক্টোরিয়ার যুগে মেয়েদের ঘাঘরা ছিল পায়ের পাতা পর্য্যন্ত লম্বা এবং লেশ ও করসেট আটা বডিস সকল মেয়ের অঙ্গে শোভা পাইত। আর আজ সেই ঘাগরা পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে ; তাহার স্থানে যে skirt আসিয়াছে তাহা পায়ের পাতা ছাড়িয়া হাটু ছাড়াইয়া আর ও ২।৮ ইঞ্চি উপরে উঠিয়াছে। করসেটও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর বিবেচনায় একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুরুষদের পোষাকেও কম পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে সবুট লেস আটা ব্রীচ পরা, পরচুলা মাথায় Country gentleiman এর অস্তিত্ব এযুগে আর ইংলণ্ডে খুজিয়া পাওয়া যায় না।

এই সকল পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্ত পাশ্চাত্য দেশে কেহ কাহাকে ও স্বদেশ দ্রোহী বা স্বাদেশীকতা হীন বলিয়া মনে করে না। বরং এই পোষাক পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহাদিগের মধ্যে যে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সকল রকম অগ্রগতির প্রতীকরূপে তাহাদিগের যে জীবন্ত মূর্ত্তি আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। আর এই অলস নিদ্রাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষা-বিদ্বেষ-কলহ-পরিপূরিত মরণোন্মুখ জাতির মধ্যে দেখিতে পাই নিজের ত কিছু গড়িবার বা সৃজন করিবার শক্তি নাই ; অপরে যদি যুথভ্রষ্ট হইয়া নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য, অধ্যবসায় এবং একনিষ্ঠার বলে কোনও কিছু একটা গড়িয়া তুলিল তবে অমনি শত শত ঈর্ষা-কাতর পাণ্ডুর চক্ষু তাহাদিগের পশ্চাতে কেবলই ঘুরিতে লাগিল যে কোন্‌খানে একটা ছিদ্র পাই যে সেইটাকে উপলক্ষ করিয়া দেশের মধ্যে একটা সোরগোল তুলিয়া উহারা যে বাড়িয়া উঠিয়াছে সেই বাড়ন্ত মাথাটা কেমন করিয়া কাটিয়া আমাদের সমান করিয়া দিতে পারি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি Half pant শ্রমিকের পোষাক ; যাহারা শ্রমসাধ্য কাজ করিবে তাহাদের পরিধানের উপযোগী ইহাপেক্ষা উত্তম পোষাক আজিও জগতে বাহির হয় নাই। যদি কোনদিন বাহির হয় এবং সেই উন্নত তর পোষাক আমাদের দেশের লোক গ্রাহণ করে তবে আমরা তাহাদিগের জয়ধ্বনি করিব। Half Pant পরিলে দুইটা হাতই মুক্ত থাকে সুতরাং সকল কাজেই সম্পূর্ণ সাহায্য পাওয়া যায়। Half Pant Belt দ্বারা আটকানো থাকে সুতরাং কাজের চাপে মুহুর্মুহু মুক্ত কচ্ছ কিম্বা দিগম্বর হইবার আশঙ্কা থাকে না। তদুপরি Half Pant এর দুই পাশে দুইটী পকেট এবং ধারে Belt এর সঙ্গে আবশ্যক মত Hook আদি থাকায় অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে রাখা যায় যাহা কাঁছা কোঁচার দ্বারা হবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল কারণ পরম্পরায় সমগ্র জগতের শ্রমিকগণ Half Pant কে গ্রহণ করিয়াছে। কুমিল্লার কর্ম্মীরা যদি তাহা করিয়া থাকেন তবে আমরা শতমুখে তাঁহাদের তারিপ করিব।

তারপর Hat এর কথা। রৌদ্রে মাথাটাকে রক্ষা করিতে হইলে যে কোনও একটা মস্তকাবরণ চাই। বলা বাহুল্য বাংলা দেশ "নাংগা মাথার মুলুক", অর্থাৎ মাথা খালী রাখাই এ দেশের লোকের

রীতি; তবে বাইরে ঘোরাফেরা কিম্বা কাজকর্ম্ম করিতে গেলে একটা মস্তকাবরণ চাই; তাই এ দেশে ছাতার চলন হইয়াছে। কিন্তু শ্রমসাধ্য কাজ করিতে গেলে ছাতা ব্যবহার করা অসম্ভব; কারণ তাহাতে একটা হাত আটকাইয়া থাকে। এইজন্য এ দেশের কৃষকেরাও রৌদ্রে কাজ করার সময় মাথায় একটা আবরণ দিয়া থাকে; ইহা অনেক সময় গাছের পাতা দ্বারা তৈরী হয় অথবা বাঁশের চাঁচাড়ী দ্বারাও তৈরী হয়। Office cap কিম্বা গান্ধী টুপীর দ্বারা এ কাজ হয় না, কারণ উভয় টুপিই brimless বা কিনারা বিহীন, সুতরাং সূর্য্যাতপ হইতে মস্তকটাকে রক্ষা করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সকলদিক বিবেচনা করিয়া সূর্য্যাতপ হইতে মাথা বাঁচাইবার পক্ষে সোলা হ্যাটই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কর্ম্মীরা যদি হ্যাট মাথায় দিয়া চা বাগানের মাটি কোপান কিম্বা কামার শালায় লোহা পিটান্ তবে তাঁহাদের efficiency বা কর্ম্ম করার ক্ষমতা যে অনেক বেশী বাড়িয়া যাইবে তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সুতরাং প্রথম নিন্দাবাদের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে ইহার মধ্যে কোনও সার কথা নাই; বরং এই সকল নিন্দা দ্বারা "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি" নীতিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা সমালোচকদিগকে বলি যে এই সকল "নমাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, ন ভ্রাতা," জাতীয় কর্ম্মীদিগের ন্যায় যে কোনও একটা অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করুন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে পরের সমালোচনা করা অপেক্ষা নিজের সৃজনের মধ্যে কি অপার আনন্দ আছে!

২। কর্ম্মীদের চা পান করা একটা বিদেশী ভাবের লক্ষণ বলিয়া রটনা করা হইতেছে। চা পান না করিতে পারাই ভাল বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু যদি কেহ চা পান করে তবে তাহার মধ্যে স্বদেশ প্রেম নাই এবং সে বিদেশীভাবগ্রস্ত হইয়াছে এত বড় একটা নিরেট খাজা কথার আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। এই ব্যবস্থায় তাহা হইলে সুভাষ বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, পণ্ডিত মতিলাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের পণ্টনের দীনাতিদীন ভলান্টীয়ারটী পর্য্যন্ত সকলেই দেখিতেছি স্বদেশদ্রোহী বা স্বদেশপ্রেমহীন প্রচ্ছন্ন বিদেশী; কিন্তু ইহারা সকলেই যে চাপায়ী, এবং বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতের পয়গম্বর স্বরূপ এ কথা বোধ হয় কর্ম্মীভবনের সমালোচকগণ অস্বীকার করিবেন না। আর এই সকল ভারত বিখ্যাত নেতারা যে চায়ের পেয়ালা পিরিচ ব্যবহার করেন তাহা কোন্ স্বদেশী চীনা মাটীর কারখানা হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে তাহা আমরা একবার জানিতে চাই। সত্য সুন্দর দেবের আমলে Tangra Pottery Works এ এবং স্বদেশীযুগে Gwallior Pottery Works হইতে দেশী পেয়ালা পিরিচ বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু কোনও দেশ হিতৈষী বাঙ্গালী ভ্রাতার চেষ্টায় সত্যসুন্দর বাবু Tangra Pottery Works হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন এবং সেই হইতে Tangra Potteryর পেয়ালা পিরিচও আমরা আর বাজারে দেখিতে পাই না। গোয়ালিয়ারের পেয়ালাও বহুকাল হইল অদৃশ্য হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গত শ্রাবণ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে "চীনা মাটির দ্রব্যের ব্যবসায়" প্রবন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম নিম্নে তাহার দুই একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"গত কয়েক বৎসরে বিদেশ হইতে মোট কত টাকার চীনা মাটীর দ্রব্যাদি সমগ্র ভারতে আমদানী হইয়াছে নিম্নে তাহার একটা হিসাব প্রদত্ত হইল।

১৯১৯—২০ সাল	৭২, ৫৪, ৮২০ টাকার মাল
,, ২০—২১ সাল	৮৮, ৭৬, ৭৫০ ,, ,,

„ ২১—২২ „	৭৮, ৭২, ৫৪৬, „ „
„ ২২—২৩ „	৭৯, ৯২, ৯৭৫, „ „
„ ২৩—২৪ „	৭০, ৯০, ৮০৬, „ „
„ ২৪—২৫ „	৭৫, ২৫, ৫৪২, „ „

এই তালিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক চীনা মাটীর বাসন বেচিয়াই বিদেশী বণিকেরা কত টাকা এ দেশ হইতে লইয়া যাইতেছে।" পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ত এই প্রবন্ধের মধ্যে আমরা একটী inset matter ও দিয়াছিলাম। তাহাও এইখানে পুনরুদ্ধার করিয়া দিলাম :—

"গত ছয় বৎসরে ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত ৭৯ টাকা চীনা মাটীর দ্রব্যাদি খরিদ বাবদ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। চীনা মাটীর দ্রব্যাদি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করতঃ স্বদেশে এই সকল জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিলেই তবে এই বৈদেশিক শোষণ, বন্ধ হইতে পারে। ইহার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। সভায় গলাবাজী করিলে কিম্বা খবরের কাগজে লম্বাই চওড়াই প্রবন্ধ ছাপাইলে দেশোদ্ধার হয় না। তাহারা দেশবাসীকে কিছু কালের জন্ত ধাপ্পা দেওয়া (Bluffling) যায়, কিন্তু দেশ সেবা হয় না। গলাবাজী ছাড়িয়া জাপানীদের মত নীরবে নিঃশব্দে এইরূপ এক একটী কারখানা গড়িয়া বৈদেশিক শোষণের পথ বন্ধ করুন, তবেই দেশোদ্ধারের পথ সুগম হইবে। নচেৎ কেবল ধাপ্পার ছারা ছয় মাস কেন, ছয় হাজার বছরেও স্বরাজ আসিবে না।"

বাজারে দেশী পেয়ালা পিরিচি কিনিতে পাওয়া যায় সত্বেও বিদেশী পেয়ালা নহিলে যদি চা পান করিতে রুচি না হয় তবে বলিতে বাধ্য হইব যে শরীরে ব্যাধি ঢুকিয়াছে এবং তাহার চিকিৎসার দরকার। চা পান করাটা যদি মানিয়া লই তবে তাহার আধারটীও কেনার দরকার; কারণ চা উত্তপ্ত পানীয়, উহা আধার ব্যতীত "পানি পাত্তো" পান করা যায় না। এ ক্ষেত্রে দেশী পেয়ালা যদি বাজারে কিনিতে পাওয়া না যায় তবে বাধ্য হইয়াই বিদেশী পেয়ালা লোকে কিনিবে, যেমন মোটরগাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া পেন, পেন্সিল প্রভৃতি সবই ছেলে বুড়া সকলে কিনিতেছে অথচ কেহই তাহাদিগকে স্বদেশদ্রোহী বলে না।

অতঃপর এই সকল সমালোচকের তৃতীয় অপবাদের আলোচনা করতঃ আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

অতঃপর এই সকল সমালোচকের তৃতীয় অপবাদের আলোচনা করতঃ আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

কর্ম্মীদিগের মধ্যে ভাগবাটোয়ারার কিরূপ বন্দোবস্ত আছে তাহা আমরা জানি না, জানিবার ইচ্ছা কিম্বা ঔৎসুক্যও নাই। কারণ আমি এই কারবারের অংশী নহি—অথবা লেন দেন, হিসাবেও—এই অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের—কোনও সম্বন্ধ নাই। তবে কয়েকজন সহায় সম্বল হীন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় এতবড় একটা অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার সাফল্য এবং জয় পরাজয়ের দিকে প্রাণের একটা আকুলতা পড়িয়া আছে বৈকি!—যখনই ইহার কথা মনে হয় তখনই প্রাণে প্রার্থনা ওঠে;—আহা! ইহাদের ভাল হোক্—দিন দিন ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক—"ভূতলে অধম বাঙালী জাতি" বলিয়া ঘরে বাইরে আজ যে ধিকার ধ্বনি উঠিতেছে, আহা! ইহাদের কর্ম্মকুশলতা এবং সাফল্য তাহার প্রতিবাদকরিতে সমর্থ হউক এবং আরও শত শত যুবক ইহাদের সাফল্যে প্রবুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হইয়া উঠুক।

কর্ম্ম করিতে গেলে কর্ম্মিদিগের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা লইয়া বিবাদ, বিসম্বাদ এবং গোলমাল হওয়া অবশ্যম্ভাবী না হইলেও অসম্ভব নহে। পিতা পুত্র এবং ভাই ভাইয়ের মধ্যেও এইরূপ কলহ হইয়া থাকে; ইহা শোভনও নহে কিম্বা বাঞ্ছনীয়ও নহে—; সুতরাং

কলহের কারণ উৎপাটন করিয়া ফেলাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। অনেক সময় দেখা যায় যে বাইরের বাতাস না পাইলে এই সকল কলহের আগুন ধুমায়মান অবস্থাতেই নিভিয়া যায়; আর বাহির হইতে নানা-রূপ অনুকূল বাতাস পাইলে এই ধুমায়মান বহ্নি শত-দিকে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করতঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া ওঠে।

ভারতের প্রায় সকল কারখানার মধ্যে মালিক-দিগের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলা এক শ্রেণীর রাজনৈতিকদিগের পেশা হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। ইহার ফলে তাঁহারা নিজেরা সুখে সচ্ছন্দে আছেন সন্দেহ নাই কিন্তু মরিতে বসিয়াছে ভারতের শিশু শিল্পগুলি। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে গত দুই বৎসরের ক্রমাগত ধর্ম্মঘটের ফলে পঁচিশটী কাপড়ের কল লিকুইডেশনে গিয়াছে। গড়পড়তার প্রত্যেক কাপড়ের কলে দশ লক্ষ টাকা মূলধন ধরিলে অংশীদিগের আড়াই কোটী টাকা জলে গেল এবং এই কাপড়ের কলগুলিতে যে পরিমাণ সুতা এবং বস্ত্র বয়ন হইত সেই পরিমাণ বিদেশী সুতা এবং বস্ত্র এদেশে বিক্রয় করিবার ক্ষেত্র এবং সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল।

এবারকার ধর্ম্মঘটের ফলে ৪০ হাজারের বেশী শ্রমিক ৩ মাস কাল বোম্বাই সহরে নানা ক্লেশ ভোগ করার পর আপনাপন গ্রামে চলিয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে যতগুলি কাপড়ের কল আছে তাহার দ্বারা দেশের কাপড়ের অভাব ১ অংশ মাত্র নিবারিত হইত। বাকী ২ অংশ বিদেশ হইতে আম-দানী করিতে হয়। এখন ধনীক এবং শ্রমিক দিগের মধ্যে প্রতিনিয়ত কলহের ফলে যে পরিমাণ কাপড় তৈরী বন্ধ হইয়া যাইতেছে সেই পরিমাণ বিদেশী কাপড় বিক্রয় হইতেছে এবং আমাদের economic দৈন্যও বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু রাজনীতির মহড়া যাহারা দিতেছেন এসকল কথা ভাবিয়া দেখার তাঁহাদের অবসর কোথায়?—অথবা ভাবিয়া দেখিলেও এসব গোলমাল না তুলিতে পারিলে তাহাদের রসদ জোগাইবে কাহারা? —এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

কর্ম্মীভবনের কর্ম্মিদিগের মধ্যে মনোমালিন্য দেখিয়া যাহারা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুখের বিষয় তাঁহাদের উল্লাস আপাততঃ স্থায়ী হইতে পারিল না, কারণ এই মনোমালিন্য সম্প্রতি মিটিয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে আবার হয়ত হইতে পারে, কিন্তু হইলেও কেমন করিয়া সে সকল সমস্যার নিরাকরণ হইবে তাহার আভাষ জিতেন্দ্রবাবুর পত্রের মধ্যেই রহিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাহারা ২১০ টাকা লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিল আজ তাহাদের সম্মিলিত মূলধন হইয়াছে কয়েক লক্ষ টাকা; গত বৎসর মাহিয়ানার বাবদই তাহারা ৪০০০০ টাকা দিয়াছে এবং সকল খরচ বাদে ১০,৫০০, টাকা নিট লাভ করিয়াছে; এতদ্ব্যতীত একটি চা বাগিচা এবং ইঞ্জি-নিয়ারী কারখানাও ইহারা চালাইয়াছে। Half pant-ই পরুক, আর চা ই খাক, আর মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটাই করুক খালি হাতে যে বাঙ্গালী যুবকেরা এত বড় একটা অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে এবং সৃজন শক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছে তাহারা আমাদের নমস্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

"কীর্ত্তিকেমা টী কোম্পানী"—সম্বন্ধে আমরা যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার উত্তরে ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্ম্মের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এক-খানি বৃহৎ বর্ণনা পত্র পাঠাইয়াছেন। এবার স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় উহা প্রকাশ করা হইবে।

সম্পাদক।

গৃহস্থালীর কথা

এণ্টি ফ্রেকেল্ বা মুখের মেছেতা দূর করার লোসন্ :—

প্রস্তুত প্রণালী—২ আউন্স বেঞ্জইন টিংচার, এক আউন্স—টিংচার টলু, আধ ড্রাম রোজ ম্যারির তৈল একত্রে একটি বোতলে পুরিয়া তাহার কর্ক আটিয়া দেও। যখন ব্যবহারের দরকার হইবে, তখন চা খাইবার এক চামচ মিক্শ্চার বড় এক গ্লাস জলের সহিত মিশাইয়া দিন এবং প্রত্যহ সকালে ও রাত্রিতে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে একখানি নরম কাপড়ে ভিজাইয়া প্রয়োগ করিবে।

বাইসাইকেল পরিষ্কার করিবার উপাদান

যে কোন দোকানে সাইকেল পরিষ্কার করিবার জন্য উপাদান চাহিলে তাহারা একটি বাক্স দিবে, সেই বাক্সে বাইসাইকেল পরিষ্কার করিবার উপযোগী যাবতীয় জিনিষ থাকে। সাইকেল আরোহণ করিবার পর যখন সাইকেলে ধুলা কাদা জড়াইয়া থাকিবে, তখন সর্ব্বাগ্রে সাইকেলের ধুলা কাদা ঝাড়িয়া ফেলিবে, সাইকেলের শিকল প্যারাফিন দিয়া পরিষ্কার করিবে এবং সাইকেল পরিষ্কারের তৈল প্রয়োগ করিবে, তার পর যত্ন সহকারে উহা মুছিয়া ফেলিবে। নতুবা তৈলের উপর ধুলা জমিয়া কল বন্ধ করিয়া দিবে। টায়ার যাহাতে না ভিজে সেই রূপ চেষ্টা করিবে। এনামেল এবং নিকেলের অংশগুলি ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করতঃ প্লেট পাউডার দ্বারা পালিশ করিয়া রাখিবে। শীতকালে সাইকেল ঘরে আবদ্ধ রাখিতে চান ত, উহার ধাতব অংশগুলিতে ভ্যাসেলিন লাগাইয়া রাখিবেন এবং যে ঘরে সাইকেল রাখা হইবে, সে ঘর যদি শুষ্ক হয়, তবে একপাত্র জল তথায় রাখিয়া দিবেন। জলীয় বাতাসে সাইকেলের টায়ার ভাল থাকে।

জুতার কালী প্রস্তুত করণ।

১২ আউন্স আইভরি ব্ল্যাক, এক আউন্স অল-

পাইয়ের তৈল, ৮ আউন্স চিটে গুড় ও আধ আউন্স আরবীর গঁদ চূর্ণের সহিত একত্রে লেইয়ের মত পিষিয়া তাহার সহিত ধীরে ধীরে ২ কোয়ার্ট ভিনিগার মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঘুটিবে। তাহার পর দেড় আউন্স সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিলেই সুন্দর জুতার কালী তৈয়ারী হইবে।

২। সিকি পাউণ্ড কাল আইভরি সিকি পাউণ্ড চিটা গুড় ও এক আউন্স সুইট্ অয়েল একত্রে মিশাইবে, মিশাইয়া এমন ভাবে নাড়া চাড়া করিবে যে, তৈল যেন সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়; তাহার পর ক্রমে ক্রমে এক আউন্স ভিট্রিয়ল ইহার অপেক্ষা ৩।৪গুণ বেশীজলে মিশ্রিত করিয়া মিশাইবে এবং ৩।৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবে। তারপর যখন ইহা জলের সহিত একেবারে মিশিয়া যাইবে তখনই উৎকৃষ্ট কালী তৈয়ারী হইবে।

৩। ২ আউন্স আইভরি ব্লাক, ২ আউন্স লাল আঁখের চিনি এবং এক চামচে সুইট অয়েল একত্রে মিশাইবে, তার পর এক পাইট ঠাণ্ডা ভিনিগার মিশাইয়া ধীরে ধীরে নাড়িবে, তাহা হইলেই সুন্দর কালী হইবে।

৪। ৮ আউন্স আরবীয় গঁদ ও ২ আউন্স চিটে গুড় আধ পাইট কালী ও ২ আউন্স ভিনিগারের সহিত মিশাও, তার পর এই মিশ্রণ ছাকিয়া লইয়া তন্মধ্যে স্পিরিট্ মিশাইলেই সুন্দর কালী তৈয়ারী হইবে।

৫। এক পাউণ্ড আইভরি ব্লাক চূর্ণ, ৪ অংশ গুড় এবং ২ আউন্স সুইট্ তৈল একত্রে মিশাইবে এবং এমন ভাবে ঝাকিবে যে তৈল যেন একেবারে মিশিয়া যায়, তারপর এক পাইট বীয়ার মদ ও এক পাইট ভিনিগার মিশাইলেই সুন্দর কালী হইবে।

নীল বর্ণ পাথর বা কল

চূর্ণ করা নীল লইয়া তাহাতে শ্বেতসার জাতীয় কোনও জিনিষ যথা ময়দা, চাউলের গুঁড়া ইত্যাদি সমপরিমাণে মিশ্রিত কর এবং গরম জল মিশাইয়া তাহা কাই করিয়া ছোট ছোট পিটার আকারে পরিণত করিবে। তাহা হইলেই নীল রঙের পাথর তৈয়ারী হইবে। যদি খুব গভীর নীল রং করিতে হয়, তাহা হইলে নীলের পরিমাণ বেশী দিতে হইবে।

বোর্ড হইতে দাগ তুলিবার উপায়

সিকি পাউণ্ড সাঁজি মাটি এবং সিকি পাউণ্ড বাখারী চুণ লইবে, এক বোতল আন্দাজ গরম জলে মিশাইয়া তাহা কাইয়ের মত করিবে এবং চর্ব্বি অথবা তেলের দাগের ওপরএকটা পুরু আবরণ ১০।১২ ঘণ্টা বিছাইয়া রাখিবে, তাহার পর উহা পরিষ্কার জলে ধৌত করিবে,যদি প্রয়োজন হয় তবে বালি দ্বারা ধুইবে। যদি চর্ব্বির দাগ খুব বেশী হয়, এবং মেঝে অত্যন্ত ময়লাযুক্ত হয়, তাহা হইলে মেঝের উপর ২৪ ঘণ্টা কাল আবরণটি রাখিয়া তৎপরে উহা ধৌত করিবে। বোর্ড ধুইবার সময় কখনও উহা আড়াআড়ি ভাবে ধুইবে না। পরন্তু উপর নীচে ভাবে আঁসের গতিলক্ষ্য করিয়া ঘাসবে।

বোর্ড সাফাই করা

একটি ছোট বাটীতে তিন ভাগ সুন্দর বালি এক ভাগ চুণ মিশ্রিত করিবে, তারপর তন্মধ্যে মার্জ্জন করিবার বুরুশ ডুবাইয়া দিবে এবং সাবানের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করিবে। ইহাতে চর্ব্বি দূরীভূত হইয়া বোর্ড সাদা হইবে এবং সমস্ত পোকা মাকড় ও নষ্ট করিবে। বোর্ডগুলিকে পরিষ্কার জলে পরিষ্কার রূপে ধৌত করিয়া লইতে হইবে। যদি চর্ব্বির মাত্রা খুব বেশী হয়, তাহা

হইলে যে যে স্থানে চর্ব্বি অধিক তথায় সাজি মাটির আবরণ (Coating) সিদ্ধ জলে মিশাইয়া দিতে হইবে। সাফাই করিবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টা কাল এই ভাবে রাখিতে হইবে।

পুস্তক পরিষ্কার করা

একখানা ছোট শুষ্ক রুটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে পুস্তকাদির মলিনস্থানে ঘসিলে উহা পরিষ্কার হয়। যে সমস্ত পুস্তকের কভার বা মলাট কাপড়ের, সেগুলি পরিষ্কার করিতে গেলে একটি ডিমের সাদা অংশ ভাল করিয়া ফেটাইয়া তাহার মধ্যে একটি স্পঞ্জ ডুবাইয়া সেই স্পঞ্জের দ্বারা ধুইবে।

পুস্তক হইতে চার্ব্বির দাগ উঠাইবার উপায়

সামান্য বেঞ্জিন দ্বারা চর্ব্বির দাগটা নরম বা স্যাঁতসেঁতে করিয়া লইবে, তারপর পাতার প্রত্যেক দিকে একখানি করিয়া ব্লটিং কাগজ দিয়া উপরের দিকে গরম ইস্ত্রী বুলাইয়া লইবে।

ইন্দুরের হাত হইতে পুস্তকাদি রক্ষার উপায়

ইন্দুরের হাত হইতে পুস্তকাদি রক্ষা করা বড়ই কঠিন কাজ। তবে যদি একটু পরিমাণে ক্ষুদে অথবা ধানী লঙ্কার গুঁড়া পুস্তকের তাকের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইন্দুরের অত্যাচার দূর হয়।

কি করিলে পুস্তকাদি স্যাঁতসেঁতে হয় না

অতি উগ্র গন্ধবিশিষ্ট কয়েক ফোটা তৈল পুস্তকাধারে ছড়াইয়া দিলে বই স্যাঁতসেঁতে হইবে না।

ব্রাউন জুতা পালিশ করা

লেবুর রস দিয়া প্রথমে দাগ উঠাইয়া ফেলিবে, তার পর টার্পিণ তৈলে মৌচাক গলাইয়া তদ্বারা জুতা পালিশ করিবে।

পেটেণ্ট লেদারের বুট পরিষ্কার করা

পেটেণ্ট লেদার বুট পরিষ্কার করিতে হইলে ভিজা স্পঞ্জ দিয়া প্রথমে এবং পরে নরম শুষ্ক ন্যাকড়া ও সুইট্ অয়েল দিয়া মুছিয়া লইবে, জুতার ধারে কালী দিয়া পালিশ করিয়া লইবে। পেটেণ্ট লেদার বুটের পক্ষে একটু দুধও বিশেষ উপকারী।

বুট পরিষ্কার করা

তিনখানি ভাল ব্রুস ও ভাল কালী বুট পরিষ্কার করিতে দরকার। তিনখানি ব্রুস কেন লাগিবে এ প্রশ্ন অনেকে করিতে পারেন। তাঁহাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য বলিতেছি যে, একখানি শক্ত ব্রুস জুতার কাদা পরিষ্কার করিতে, একখানি নরম ব্রুস কালী দিতে এবং আর একখানি মাঝামাঝি শক্ত পালিস করিবার জন্য দরকার। প্রত্যেক ব্রুস এই প্রকার স্বতন্ত্র কার্য্যের জন্য রাখা দরকার। কালী কর্ক আটিয়া যত্নের সহিত রাখা দরকার। যখন জুতায় বেশী কাদা লাগে, তখন কাদা পরিষ্কার করিয়া স্পঞ্জ দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে হয়। তৎপর আগুনের তাপে উহা শুকাইতে হয় বটে, কিন্তু যেন আগুনের কাছে জুতা না রাখা হয়। মহিলাদের জুতা যাহাতে ভালরূপে পালিশ হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। আজকাল যে কালীতে মহিলাদের জুতা কালী করা হয়, তাহাতে কালী করিবার পর একখানি নরম কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলার দরকার হয়।

জুতা কি করিলে ফাটে না

একখণ্ড ফ্লানেল তিসির তৈলে সিক্ত করিয়া তাহা জুতার "সোলে" বা তলদেশে ও জুতার চারিপার্শ্বে মাখিবে, তারপর গোঁড়ালি উঁচুভাবে রাখিয়া জুতা শুকাইতে দিবে।

দেশের কথা।

মার্টিন কোম্পানীর অংশীদার, ব্যবসায় জগতে বাঙ্গালীর শ্রাঘার্হ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিংয়ের শৈত্য নিবাসে সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি নূতন কয়েকটি রেলপথ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিবেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

* * * *

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সম্পর্কে জড়িত থাকায় যশোহরের প্রবীণ উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার সি আই ই মহোদয় তাঁহার উল্টাডিঙ্গিস্থিত পাট ও নুনের আড়ৎ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদুবাবু শুধু পাকা ব্যবহারজীবীই নহেন, পরন্তু ব্যবসাদারও বটে। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার এই প্রকার অর্থনাশ ও মনস্তাপ সত্যই বড়ই দুঃখের বিষয়।

* * * *

সুপ্রসিদ্ধ ড্রাগিষ্ট মেসার্স বি কে পাল কোংর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার নবোদ্যমে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। পাল মহাশয়ের বদান্যতা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি সুস্থ শরীরে পিতৃকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন, ইহাই ভগবৎচরণে প্রার্থনা।

* * * *

মিঃ এ, কে, সেন গুপ্ত একজন পাকা বহুদর্শী কাটার। তিনি স্বয়ং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে কিছুদিন হইল একটী দর্জ্জি বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বেশ কাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান বেকার সমস্যার দিনে সেনগুপ্ত মহাশয় এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভালই করিয়াছেন।

* * * *

১০।১১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ অছেল মোল্লা এণ্ড কোং শুধু যে কেবল শীতের সময় শীত বস্ত্রের আমদানী করেন, তাহা নহে; তাঁহারা এই দারুণ গ্রীষ্মে নানাপ্রকার রেশমী বস্ত্রাদিরও আমদানী করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

* * * *

কলিকাতার ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অক্রূরকুমার নন্দী ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ২০০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে বৃহদায়তনে বিলাতী কায়দায় দোকান স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

শ্যামবাজার ২নং কালা চাঁদ সান্যাল লেনস্থ প্রসিদ্ধ কে, সি, বসু এণ্ড কোংর বিস্কুট ও বার্লি ভারত বিখ্যাত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বসু মহাশয় এখন বার্দ্ধক্যে প্রপীড়িত বলিয়া তাঁহার পুত্রেরা অতি কৃতীত্বের সহিত কারখানার কাজ চালাইতেছেন। আমরা এরূপ দেশীয় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্ব কামনা করি।

* * * *

৺পি, এম, বাগচি এণ্ড কোংর কর্ম্মকর্ত্তা এখন তাঁহার পুত্রেরা। ইঁহারা নানাপ্রকার ব্যবসায়

কার্য্যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। শুনিলাম, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের চেষ্টায় তাঁহাদের প্রেস হইতে একখানি দৈনিক পত্র বাহির হইবে। আমাদের মতে বাগচি মহাশয়েরা যে টাকা দৈনিকের পাছে অপব্যয় করিবেন, সেই টাকা দিয়া একটা স্বদেশী কারখানা করিলে দেশের প্রকৃত উপকার সাধন করিতে পারিবেন।

* * *

ডাঃ এল্, ডি, মিত্র মহাশয় এক সময়ে কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। এখনও ৭নং হ্যারিসন রোডে তাঁহার প্রাচীন ঔষধালয় চলিতেছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম তাঁহার কৃতীপুত্র এটর্ণী শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ বি এল আমাদের প্রিয় বন্ধু অশ্বিনী ঔষধালয়টি ভালরূপে চালাইবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। গরীব দুঃখীর জন্য তিনি কি ঔষধের মূল্য হ্রাস করিবেন?

* * * * *

কে বলে বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি নাই? যদি ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকিবে, তবে দেখিতে দেখিতে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজ খবরের কাগজের ব্যবসায়ে এত লাভ করিতে পারিতেন না। আমরা শুনিলাম, সতীশবাবু দৈনিক বসুমতীর হিন্দী সংস্করণ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এখন বৃহস্পতির দশা চলিতেছে, সুতরাং এ কার্য্যেও সাফল্য লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

* * * * *

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এত দিন ইংরাজী বাঙ্গালা অনেক সংবাদ পত্রে লেখনী পরিচালনা করিয়া এখন শুনিতে পাইলাম ব্যবসায় করিতে সংকল্প করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়াও একবার কাপড়ের দোকান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অল্প দিনেই উঠিয়া যায়। এবারকার উদ্যম আবার "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায়" পর্য্যবসিত হইবে না ত? "যার কর্ম্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

* * * * *

প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীবি এবং ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বৃদ্ধবয়সে অসুস্থ দেহে এখন তাঁহার হাজারিবাগের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি হাইকোর্ট হইতে তাঁহাকে Lunatic বা বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহার অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত সমরেশ চট্টোপাধ্যায়কে সমুদয় বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট তাঁহার সম্পত্তি সমূহ আবদ্ধ রহিয়াছে। অদৃষ্টের এরূপ মর্ম্মান্তিক পরিহাস খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। চক্রবর্ত্তী সাহেবের এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আমরা ব্যথিত এবং মর্ম্মাহত হইয়াছি।

* * * * *

বিখ্যাত কয়লার ব্যবসায়ী আমাদের শ্রদ্ধের বন্ধু এবং সুহৃদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স হইতে বর্ত্তমান কাউন্সিলে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইলে আমরা পরম সুখী হইব। তিনি শুধু সুযোগ্য ব্যক্তি নহেন, পরন্তু তাঁহার ন্যায় উৎসাহী কর্ম্মী ও সচরাচর দেখা যায় না।

* * * * *

Bengal Insurance and Real Property কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ

ঘোষ আবার উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। গত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা লিখিয়াছিলাম ;—

আজ ২।৩ বৎসর হইতে শুনিতেছি যে জিতেনবাবু আবার একটা নূতন কিছু গড়িবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন এবং বন্ধুবান্ধব দিগকে লাগাইয়া বেড়াইতেছেন। সেদিন দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আর কতকাল দেরি করিবেন—এখনও কি hatching ?"—

জিতেনবাবু শুষ্কমুখে উত্তর দিলেন যে, "না,—এইবার laying সুরু হইবে।"

এই ঘটনার পর আটমাস পরে আবার সেদিন দেখা হইল—আবার সেই উত্তর এইবার laying সুরু হইবে। এত দীর্ঘকাল প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যে সন্তান প্রসূত হয় তাহা প্রায়ই মৃত অথবা বিকলাঙ্গ হয়। আমরা বলি, ভায়া,—দুই নৌকায় পা দিলে কোনটাই সামলানো যায় না। হয় পুলিশ কোর্ট ছাড়, আর না হয়—Clive Streetএর অঞ্চল ছাড়। "ভুড়ও খাব, টামাকও খাব" সে হবে না।

* * *

হিন্দুস্থানের পরিচালক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বিনাবাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। নলিনীবাবুর কর্ম্মকরিবার শক্তি যে অসাধারণ ইহা তাঁহার অতি বড় শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে। যে সকল লোক কাউন্সিলে গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নলিনীবাবু যেরূপ দক্ষতার সহিত নানাবিষয়ে আন্দোলন এবং আলোচনা উত্থাপন করিয়া সরকার পক্ষকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। আশাকরি নলিনীবাবু এবারেও সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিবেন ;

* * * *

আমরা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম যে বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল পরলোক গত রায় বৈকুণ্ঠ নাথ সেন বাহাদুরের সুযোগ্য ভ্রাতা হাইকোর্টের প্রথিত নামা ব্যবহার জীবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ সেন হঠাৎ কলেরা রোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার দর্জ্জী পাড়ার গৃহে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ওকালতীতে হেমেন্দ্র বাবুর যথেষ্ট পশার প্রতিপত্তি হইয়াছিল সন্দেহ নাই ; কিন্তু দেশীয় শিল্পের অকৃত্রিম সহায় এবং অনুরাগী বলিয়া সমগ্র বাংলা দেশে তাঁহার নাম সুপরিচিত। দেশ সেবায় এবং দেশীয় শিল্প গঠনে হেমেন্দ্র নাথ তাঁহার অগ্রজ বৈকুণ্ঠ নাথের হাতে গড়া পুতুল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; আমরা দেখিতাম একজন যেন অপরের ঠিক এক খানি ছায়া। ভাই ভাইয়ের মধ্যে এমন শ্রদ্ধা এবং সদ্ভাব এযুগে এক কলুটোলার পরলোক গত কবি-রাজ ভ্রাতৃদ্বয় দেবেন্দ্র নাথ এবং উপেন্দ্র নাথ ছাড়া আর কাহারও মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। স্বদেশী যুগের প্রবল বন্যা দেশের উপর যে "পলি" ফেলিয়া গিয়াছিল তাহার সদ্ব্যবহার করার জন্য যে সকল দেশ প্রাণ কর্ম্মী নীরবে লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন বৈকুণ্ঠ নাথের "লক্ষণ ভাই" হেমেন্দ্র নাথ তাঁহাদিগের অন্যতম। ট্যাংরার পটারী ওয়ার্কস্, কাচের কার-খানা এবং ছোট বড় নানা শিল্পানুষ্ঠানের জন্য হেমেন্দ্র নাথ দিনের পর দিন অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। অসহায়া হিন্দু বিধবারা ঘরে বসিয়া কেমন করিয়া পুতুল তৈরী করিতে পারে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীমতী কুমুদিনী বসু হেমেন্দ্র বাবুর সাহায্য চাহিয়াছিলেন। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র হেমেন্দ্র বাবুর সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া হাইকোর্টের ফেরতা তাঁহার নিকট

আসিয়া নানারূপ পরামর্শ দিতেন এবং অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতেন। আজ হেমেন্দ্র নাথের সেই মিষ্ট বচন,সহাস্য মুখ এবং বিনম্র ব্যবহার মনে পড়িতেছে আর চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে। স্বদেশীযুগের নীরব কর্ম্মীরা চলিয়া যাইতেছেন, আর "একে একে নিভিছে দেউটি"। ভগবান করুন বৈকুণ্ঠ নাথ এবং হেমেন্দ্র নাথের মধ্যে যে ভ্রাতৃ ভাব দেখিয়াছি তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যেও সেই সৌহার্দ্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব অক্ষয় এবং অটুট থাকুক, আর সর্ব্বোপরি দেশীয় শিল্প সাধনায় এবং প্রতিষ্ঠায় পরলোক গত দুই ভাই যে খ্যাতি এবং সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বংশধর গণ সেই প্রতিষ্ঠা আরও বাড়াইয়া তুলুন।

* * * *

কো অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সুশিক্ষিত, সদালাপী, বিনয়ী, প্রিয়দর্শন টেপার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, কর্ম্ম কুশল নলিনী মোহন রায় গরমের জ্বালা সহিতে না পারিয়া শিলংএ গিয়া ছিলেন। সেখানে একমাস বাস করিয়া আবার কলিকাতার আগুণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। চিরহিম পার্ব্বত্য প্রদেশের শৈত্যাবাস পরিত্যাগ করতঃ দেশীয় অনুষ্ঠানের জন্য এইরূপ ক্লেশ স্বীকার অন্যান্য জমিদারগণের অনুকরণীয়।

কর্ম্মবীর।

বহু কল্যাণ করিছ সাধন তুমি হে সমাজ পতি,
তোমারই কর্ম্ম কুশলতা হেতু এ দেশের এই গতি।
রামেরে করিছ "একঘরে" তুমি শ্যামকে করিছ "বন্ধ"
"পতিত" করিছ কারো কুলে যদি পাও এতটুকু গন্ধ।
তৃষ্ণার জল কারা কারা দিলে বিষম লাগেনা বুকে,
সে মহাসত্য জেনেছি প্রথম তোমাদেরি ও-শ্রীমুখে।
কাদের ছোঁয়ায় ভাত মুড়ি দিয়ে শরীরাভ্যন্তরে
বিদ্যুৎ ক্রিয়া কতখানি হয় বুঝায়েছ ভাল করে।
জড়বাদী গুলো বিদ্যুৎ নিয়ে বাজে কাজে শুধু রত,
আলোতে, পাখায়, মিল, কলে তারে খাটায় ভৃত্য মত।
বিদ্যুৎ তার আধ্যাত্মিক যত ক্রিয়া হতে পারে
জেনেছ তোমরা ঝিমে ঝিমে তাহা নিঃশেষে একেবারে।
চরমোন্নতি করি আজ তার বসে আছ হ'য়ে শিব
মহিমা তোমার না বুঝে অজ্ঞে মিছে বলে নির্জীব।
সমাজের হিত, স্বদেশের সেবা করিতেছ দিয়ে প্রাণ
খেটে খেটে কত পরিশ্রান্ত, ভেবে ভেবে কত ম্লান,

প্রলয়ে পৃথিবী উলট পালট হয়ত হইতে পারে,
তব বৈঠকে জাতের বিচার চলিবে নির্ব্বিকারে ;
"এক ঘরে," "ঠেকো" "পতিত করার" বিরাম নাইক কভু,
কি যে কল্যাণ করিছ দেশের কি আর বলিব প্রভু ।
জালিয়ান ওয়ালা হত্যা ব্যাপার হয়ে গেল দেশে যবে
নির্ব্বিকল্পে জাতেরই বিচারে তখনো বসিয়া সবে ।
চলন্ত ট্রেণে জোপলারে বধ করে গেল অবহেলে
তখনো তোমরা "ছুঁলে জাত যায়" বিচার করিয়া গেলে ।
যারে খুসি তারে ধরে নিয়ে গেল জেলে পুরে দিল শেষে
"সজাত কারা" তুমুল বিচার চালালে তখনো দেশে ।
মুসলমানেরা মন্দির ভেঙ্গে বুকে দেয় ছোরা ভ'রে
"অচল সচল জাত" নিয়ে তুমি কাটালে তর্ক করে ।
সমাজ রক্ষা করে আসিতেছ শুনি বহুকাল হ'তে
লোকের সংখ্যা এগিয়ে চলেছে এদিকে মৃত্যু পথে ;
বছরে বছরে দুর্ভিক্ষের বিরাট করাল গ্রাস
শত শত গ্রাম উজাড় করিয়া করিছে সর্ব্বনাশ ।
প্লাবনে মরিয়া নরনারী শিশু কত চলে যায় ভাসি
তাহাদের খোঁজ হে সমাজ পতি রাখনা তোমরা আসি ;
অজন্মা দেশে লেগেই রয়েছে শাসকের নিপীড়ন,
খেতে না পাইয়া মরে যায় লোক কত শত অগনন
নব নব ব্যাধি সারা দেশটাকে রাখিয়াছে যেন গিলে
বিবর্ণ মুখ, বিশীর্ণ দেহ, পেট জোড়া শুধু পিলে,
দুই বিঘে জমি, দশটী সরিক, মামলাও বায় ঠাঁই,
এইত দেশের অবস্থা আজ প্রাণটুও যেন নাই ।
দেশ রসাতলে গেল কিবা তাহে জাত নিয়ে তুমি থাক
লাথি মেরে দূরে ছোট জাতে ফেলি নিজেরে সরায়ে রাখ ;
জাত বেজাতের ধাপ্পা বাজি যে আরো কত আছে জানা
করে যাও. দেখি, তুমিত মোড়ল তোমারে কে করে মানা ;
এইভাবে যদি সমাজ গড়িতে সমর্থ হও তুমি
বিধি রবে শুধু, মানুষ রবে না হ'বে এ শ্মশান ভূমি,
বর্ম্মী বটে হে নেতৃবর্গ সমাজের শিরোমণি—
গাঁয়ে না মানিলে তবুও মোড়ল যাও নিজেদের গণি ।
জাতের গর্ব্ব করি না, সে শুধু তোমারই শ্রমের ফল
হে সমাজ পতি তুমিই করেছ ভারত মুখোজ্জ্বল ।

———— (সংগ্রহ)

পাট বা কোষ্টা।

চিলিয়ান নাইট্রেট্‌ অফ্‌ সোডা প্রয়োগ করিয়া ফলন বৃদ্ধি করিবার উপায়।

পাট খাদ্যশস্য নয় বটে কিন্তু বাঙ্গালার আবাদী ফসলের মধ্যে ইহা মূল্যবান। পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে ইহার চাষ অধিক পরিমাণে হয়। এই উদ্ভিদের প্রধান জাতি দুইটী, তন্মধ্যে যেটীর ফল গোল ও বীজ ঘোর জরদা রঙের হয়, তাহা যাহার ফল লম্বা ও বীজ কাল হয় তাহাকে মিঠা পাট, তোষা পাট অথবা বগীপাট (Corchorus olitorius) বলা হয়; তাহার আবাদ কলিকাতার সন্নিহিত জেলাগুলিতেই অধিক হয়।

তীতা পাট অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে জন্মায় আর

তীতা পাট বা সিরাজগঞ্জ পাট (Corchorus capsularis) নামে সচরাচর প্রচলিত, উহার আবাদ প্রধানত উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গেই হয় আর অপরটী চারা ২।৩ হাত উচ্চ হইলে জমিতে জল দাঁড়াইলেও এই জাতের পাটের কোনও ক্ষতি হয় না; তবে জমির জল বেশী দিন দাঁড়াইয়া থাকিলে নীচের দিকের পাট

মোটা ও কর্কশ হয়। তোষাপাট বা বগী পাট আউস ধান্যের জমির ন্যায় উচ্চ জমিতে উৎপন্ন করিতে হয়।

পাট কাদাপ্রধান জমিতে জন্মাইলে উহার বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় এবং তন্তুও অপকৃষ্ট হয়, এইজন্য পলিময় বা দো আশ মাটীই ইহার আবাদের জন্য নির্ব্বাচন করা উচিত। বীজের জাতি ও মৃত্তিকার তারতম্যের জন্য পাটের রং সাদা বা লালচে এবং আঁইশ মোটা বা পাতলা হয়। সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি গ্রামে প্রচলিত পাটের তন্তু তোষাপাট অপেক্ষা অধিক সাদা ও কোমল হয় এ কারণ তোষাপাট অপেক্ষা এইগুলি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, কিন্তু তোষাপাট অধিক দীর্ঘ ও শক্ত হয়। যে জাতির পাটের ফল গোল হয়, তাহাদের মধ্যে কাকিয়া বোম্বাই', ও যে জাতির পাটের ফল লম্বা তাহাদের মধ্যে "চুচুড়া" (Chinsura green) শ্রেষ্ঠ; এই দুইটী জাতির বীজ সরকারী কৃষিবিভাগ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

ভূমির অবস্থিতি অনুসারে পাটের বীজ মাঘ মাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বপন করা হয়। নীচু জমিতে বীজ শীঘ্র বপন করা হয়; কারণ ঐরূপ জমিতে অল্প বৃষ্টি হইলেও জল জমিতে পারে। উৎকৃষ্ট তন্তু উৎপন্ন করিবার জন্য অধিক নীচু জমি সুবিধাজনক নহে।

মোটামুটী বীজের পরিমাণ বিঘা প্রতি ৴১॥০ সের হইতে ৴২ সের দিতে হয়। লাঙ্গল ও বিদা দিয়া মাটী ঝরঝরে করিবে ও ঘাস মারিয়া ফেলিবে। বীজ বুনিবার সময় উত্তর হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বীজ ছিটাইয়া দিবে। বীজ বুনিবার পর আর একবার বিদা দেওয়া উচিত।

পাট উৎপন্ন করিতে সারের প্রয়োজন নাই এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। রবিখন্দ, তামাক, আলু প্রভৃতি শস্যের সহিত পর্য্যায় করিয়া পাট উৎপন্ন করিয়া ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বজায় রাখিবার পদ্ধতি চলিত আছে। ইহাতেই বোঝা যায় পাট ভূমি হইতে উদ্ভিদের উপযোগী যে যে খাদ্য অধিক আহরণ করিয়া লয় জমি পতিত রাখিয়া কিংবা পর বৎসর পাট ব্যতীত অন্য জাতির ফসল জন্মাইয়া ভূমির উর্ব্বরাশক্তি এককালে হীন হইতে দেওয়া হয় না। যদিও পূর্ব্ববঙ্গে মধ্যে মধ্যে পলি পড়িয়া ভূমিতে উদ্ভিদ খাদ্যের কোনও অংশের সংযোগ হয়, সে হেতু নাইট্রোজনাত্মক সারের প্রয়োজন নাই এইরূপ ধারণা করা ঠিক নয়; কারণ পলি মাটীতে অধিক নাইট্রোজেন থাকে না।

রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ফরিদপুরের এগ্রিকালচরাল অফিসার, ১৯২৪ সালে পরীক্ষা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়েন তাহা এইরূপ :—

জমির নিশানা	জমির মাপ	ব্যবহৃত সারের পরিমাণ।	পাটের ওজন। মঃ	সেঃ	ছঃ
১। ১ম দফা	দশ কাঠা	নাইট্রেট অফ সোডা /৫			
		সরিষার খইল ১/০	৩	॥৪	॥০
	ঐ	বিনাসারে	২	॥২	০
		বৃদ্ধি	১	/২	॥০
২য় দফা	ঐ	সরিষার খইল ১/০			
		নাইট্রেট অফ সোডা /৫	৩	।৮	।০
	ঐ	বিনাসারে	২	॥৭	০
		বৃদ্ধি	০	৸১	।০
২। ১ম দফা	পাঁচ কাঠা	সরিষার খইল ॥০ মণ			
		নাইট্রেড অফ সোডা /২॥০	১	৸৬	॥০
	ঐ	বিনাসারে	১	॥৩	০
		বৃদ্ধি	০	।৩	॥০
২য় দফা	ঐ	সরিষার খইল ॥০ মণ			
		নাইট্রেট অফ সোডা /২॥০	১	৸৯	০
	ঐ	বিনাসারে	১	॥৩	০
		বৃদ্ধি	০	।৫	॥০
৩। ১ম দফা	দশ কাঠা	সরিষার খইল ১/০ মণ			
		নাইট্রেট অফ সোডা /৫	৩	॥৯	০
	ঐ	বিনাসারে	২	৸৯	০
		বৃদ্ধি	০	৸০	০
২য় দফা	ঐ	সরিষার খইল ১/০ মণ			
		নাইট্রেট্ অফ সোডা /৫	৩	॥৫	।০
		বৃদ্ধি	০	॥৬	।০

মন্তব্য :—১ম পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফল হইতে দেখা যাইতেছে যে বিঘায় ।০ সের নাইট্রেট্ অফ সোডা প্রয়োগ করিয়া গড়ে ফসলের বৃদ্ধি বিঘা প্রতি ১৸৩৸ হইয়াছে। ২য় পরীক্ষায় গড়ে ফসলের বৃদ্ধি বিঘা প্রতি ১।৮। ৩য় পরীক্ষায় গড়ে ফসলের বৃদ্ধি ১।৵।০।

নাইট্রেট অফ সোডা না দিয়া পাট নাইট্রেট অফ সোডা দিয়া

বিঘা প্রতি /৫ সের নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগে পরীক্ষিত পাটের প্রতিকৃতি।

১৯২৭ সালে রায় সাহেব দেবেন্দ্র নাথ মিত্র ফরিদপুরে নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগে চুঁচুড়া সবুজ (লম্বা ফল) পাটের উপর পরীক্ষা; করেন তাহার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমির নিশানা	জমির মাপ	ব্যবহৃত সার	সারের পরিমাণ সেঃ ছঃ	সারের মূল্য	প্রয়োগের মজুরী	মোট খরচ	উৎপন্ন পাটের ওজন মঃ সেঃ	পাটের মূল্য
১। ব্লক বি, প্লট ১১ এ	৩ কাঠা	বিনা সারে				—	১।৭	১৪।০
ঐ	ঐ	নাঃ সোডা	/২।০	৷৷/০	৵০	৷৷৶০	১৸১	১৭৸০
২। ব্লক বি, প্লট ২২	ঐ	নাঃ সোডা	/২।০	৷৷/০	৵০	৷৷৶০	১৷৷৬	১৬৷৷০
ঐ	ঐ	বিনা সারে	—	—		—	১।৯	১৪৸০
ঐ	ঐ	রেড়ীর খৈল	/৫	৸৵০	৵০	১৲	১৷৷৪	১৬৲
৩। ব্লক বি, প্লট ২১ এ	২ কাঠা	বিনা সারে	—	—		—	।৯	৪৸
ঐ	ঐ	নাঃ সোডা ও রেড়ীর খৈল	প্রত্যেকটীর /১ সের	।৶০	/১০	৷৷১০	৸২	৮৲

প্রথম পরীক্ষার ফলে নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগে ৩ কাঠায় ২৶০ লাভ হয় অর্থাৎ বিঘায় ১৮৸০।

দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলে বিনা সার হইতে নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহারে ফসলের আধিক্যের দরুন ৩ কাঠায় লাভ হয় ১/০ অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৭/৫ আর রেড়ীর খইলের তুলনায় নাইট্রেট অফ সোডার দরুন লাভ ৩ কাঠায় ৸/০ আনা হয়। অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৫।৶১০।

তৃতীয় পরীক্ষার ফলে—/১ রেড়ীর খৈল ও /১ সের নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ করিয়া ২ কাঠা ১৷৷৶১০ লাভ হয় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২৭৶০। রেড়ীর খৈলের সহিত নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করি: সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে। পাটের মূল্য ১০৲ মণ ধরা হইয়াছে।

...বড়িয়া কৃষিক্ষেত্রে ১৯২৬ সালে, যে পরীক্ষা হয় তাহার ফল নিম্নরূপ হইয়াছে ঃ—

...য় নিযুক্ত ...রূপ।	একর হিসাবে (৩ বিঘায়) ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	সার প্রয়োগের তারিখ	একর হিসাবে (৩ বিঘায়) উৎপন্ন তন্তুর ওজন	একর হিসাবে (৩ বিঘায়) সারের মূল্য	একর হিসাবে নাইট্রেট প্রয়োগ একর হিসাব করিবার হেতু অধিক মজুরী	উৎপন্ন তন্তুর মূল্য	নাইঃ সোঃ দিগর দ্বারা উৎপন্ন ফসলের মূল্য ও অন্য উপায়ে উৎপন্ন ফসলের মূল্যের জমা খরচ, একর হিসাবে লাভ
...বিঘা	গোবর ৩০০ মণ, রেড়ীর খইল ৩ মণ, নাইট্রেট অফ সোডা ১॥০ মণ	৯ই মে, ১৯২৬	২৪ মণ	গোবর ৬০৲ খইল ২০।০ নাইট্রেট অফ সোডা ১৩॥০ মোট ৯৩৸০	১।০	২৪০৲	কেবল গোবর দ্বারা উৎপন্ন ফসল অপেক্ষা ৩৯৸০ লাভ
...	গোবর ৩০০ মণ	লাঙ্গল দিবার কালে	১৬॥০ মণ	গোবর ৬০৲	——	১৬৫৲	
...াঠা	গোবর ৩০০ মণ নাইটেট অফ সোডা ১॥০ মণ		২২॥০ মণ	৬০৲ নাইটেট ১৩॥০	১॥০	২২৫৲	কেবল গোবর দ্বারা উৎপন্ন ফসল অপেক্ষা ৪৫৲ লাভ।

...ঃ খইল ও নাইট্রেট অফ সোডার দরুণ ৭॥ মণ পাট অধিক হয় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২॥ মণ। পাট এই বৎসর ১০ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল। ...উৎপন্ন পাটের মূল্য খরচ বাদে একর হিসাবে ১৪৪৸০ আর গোবর দ্বারা উৎপন্ন পাটের মূল্য খরচ বাদে ১০৫৲ টাকা সুতরাং প্রতি একরে ...র্থাৎ বিঘা প্রতি ১৩।০। কেবল নাইট্রেট অফ সোডার দরুণ ৬৷০ মণ পাট অধিক হয় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২৷০ মণ। মূল্য হিসাবে ...লাভের পরিমাণ, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১৫৲ টাকা।

...নর পরীক্ষা ফল হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, নাইট্রেট অফ সোডার দরুণ বিঘা প্রতি ২৷০ মণ হইতে ২॥০ মণ পাট অধিক ...ড়, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে ও যাহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া নাইটেট অফ সোডা পাটে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন ...। পাটের পরিমাণ বিঘা প্রতি এইরূপ বৃদ্ধি হয় ইহা আমাদের জানাইয়াছেন।

...টের দর অতিশয় মন্দ হইয়াছিল তাহা সত্ত্বেও নাইটেট অফ সোডা প্রয়োগে লাভের পরিমাণ খরচা বাদে ভালই হইয়াছিল। আমরা ...প্রয়োগ দ্বারাই পাটের বৃদ্ধি হইয়াছে বলিতেছি তাহা আকার নহে যে হেতু ১০২৬ সালের খইলের পরিমাণ ১০২৫ সালের অর্দ্ধেক করা ...দরুণ ফসলের বৃদ্ধি বিঘা প্রতি প্রায় ১৯২৫ সালের মত হইয়াছিল। ১৯২৬ সালে অবশ্য খইলের পরিমাণ ১৯২৫ সালের সমান হইলে ...লাভ থাকিত না; অতএব সার হিসাবে নাইটেট অফ সোডা কেবলমাত্র গোবর বা খইল হইতে যে অধিক উপযোগী তাহাই প্রমাণিত ...নাইটেট ব্যবহার করিলে সার দিবার ব্যয়ের হ্রাস হইয়া লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে ইহাই দেখা যাইতেছে।

Extract from Annual Report of the Dept. of Agricultuae! Bengal 1926-27.

নাইট্রেট অক সেডা না দিয়া পাট নাইট্রেট অক সোডা দিয়া

বিঘা প্রতি /৫ সের নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগে পরীক্ষিত পাটের প্রতিকৃতি।

১৯২৭ সালে রায় সাহেব দেবেন্দ্র নাথ মিত্র ফরিদপুরে নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগে চুঁচুড়া সবুজ (লম্বা ফল) পাটের উপর পরীক্ষা; করেন তাহার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমির নিশানা	জমির মাপ	ব্যবহৃত সার	সারের পরিমাণ সেঃ ছঃ	সারের মুল্য	প্রয়োগের মজুরী	মোট খরচ	উৎপন্ন পাটের ওজন মঃ সেঃ	পাটের মূল্য
১। ব্লক বি, প্লট ১১ এ	৩ কাঠা	বিনা সারে				—	১।৭	১৪।০
ঐ	ঐ	নাঃ সোডা	/২।০	॥৴০	৵০	॥৶০	১৸১	১৭৸০
২। ব্লক বি, প্লট ২২	ঐ	নাঃ সোডা	/২।০	॥৴০	৵০	॥৶০	১॥৬	১৬॥০
ঐ	ঐ	বিনা সারে	—	—		—	১।৯	১৪৸০
ঐ	ঐ	রেড়ীর খৈল	/৫	৸৵০	৵০	১৲	১॥৪	১৬৲
৩। ব্লক বি, প্লট ২১ এ	২ কাঠা	বিনা সারে	—	—		—	।৯	৪৸
ঐ	ঐ	নাঃ সোডা ও রেড়ীর খৈল	প্রতিটীর /১ সের	।৶০	/১০	॥১০	৸২	৮৲

প্রথম পরীক্ষার ফলে নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগে ৩ কাঠায় ২৸৴০ লাভ হয় অর্থাৎ বিঘায় ১৮৸০।

দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলে বিনা সার হইতে নাইট্রেট অক সোডা ব্যবহারে ফলনের আধিক্যের দরুন ৩ কাঠায় লাভ হয় ১৴০ অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৭/৫ আর রেড়ীর খইলের তুলনায় নাইট্রেট অক সোডার দরুণ লাভ ৩ কাঠায় ৸৴০ আনা হয়। অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৫৶১০।

তৃতীয় পরীক্ষার ফলে—/১ রেড়ীর খৈল ও /১ সের নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগ করিয়া ২ কাঠায় ১॥৶১০ লাভ হয় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২৭৶০। রেড়ীর খৈলের সহিত নাইট্রেট অক সোডা ব্যবহার করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে। পাটের মূল্য ১০৲ মণ ধরা হইয়াছে।

*ব্রাহ্মণবেড়িয়া কৃষিক্ষেত্রে ১৯২৬ সালে, যে পরীক্ষা হয় তাহার ফল নিম্নরূপ হইয়াছে :—

জমির নিশানা বা নম্বর।	পরীক্ষায় নিযুক্ত ভূমির মাপ।	একর হিসাবে (৩ বিঘায়) ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	সার প্রয়োগের তারিখ	একর হিসাবে (৩ বিঘায়) উৎপন্ন তন্তুর ওজন	একর হিসাবে (৩ বিঘায়) সারের মূল্য	একর হিসাবে নাইট্রেট প্রয়োগ করিবার হেতু অধিক মজুরী	একর হিসাব উৎপন্ন তন্তুর মূল্য	নাইঃ সোঃ দিগর দ্বারা উৎপন্ন ফসলের মূল্য ও অন্য উপায়ে উৎপন্ন ফসলের মূল্যের জমা খরচ, একর হিসাবে লাভ
১। কেতা সি,সংখ্যা ১০, ১১, ১২ ও ১৩।	১ বিঘা	গোবর ৩০০ মণ, ডেড়ির খইল ৩ মণ, নাইট্রেট অফ সোডা ১॥০ মণ	৯ই মে, ১৯২৬	২৪ মণ	গোবর ৬০৲ খইল ২০।০ নাইট্রেট অফ সোডা ১৩॥০ মোট ৯৩৸০	১॥০	২৪০৲	কেবল গোবর দ্বারা উৎপন্ন ফসল অপেক্ষা ৩৯৸০ লাভ
২। কেতা সি, সংখ্যা ৬, ৭, ৮ ও ৯।	ঐ	গোবর ৩০০ মণ	লাঙ্গল দিবার কালে	১৬॥০ মণ	গোবর ৬০৲	——	১৬১৲	
৩। কেতা সি, সংখ্যা ২ ও ৪। ২২॥০	১০ কাঠা	গোবর ৩০০ মণ নাইটেট অফ সোডা ১॥০ মণ		২২॥০ মণ	৬০৲ নাইটেট ১৩।০	১॥০	২২৫৲	কেবল গোবর দ্বারা উৎপন্ন ফসল অপেক্ষা ৪৫৲ লাভ।

মন্তব্য :—একর হিঃ খইল ও নাইট্রেট অফ সোডার দরুণ ৭॥ মণ পাট অধিক হয় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২॥ মণ। পাট এই বৎসর ১০ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল। নাইট্রেট দিগর দ্বারা উৎপন্ন পাটের মূল্য খরচ বাদে একর হিসাবে ১৪৪৸০ আর গোবর দ্বারা উৎপন্ন পাটের মূল্য খরচ বাদে ১০৫৲ টাকা সুতরাং প্রতি একরে লাভের পরিমাণ ৩৯৸০ অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১৩।০। কেবল নাইট্রেট অফ সোডার দরুণ ৬/০ মণ পাট অধিক হয় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২/০ মণ। মূল্য হিসাবে নাইট্রেট ও গোবর দিয়া লাভের পরিমাণ, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১৫৲ টাকা।

দুই সালের একই স্থানের পরীক্ষা ফল হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রতিয়মান হইতেছে যে, নাইট্রেট অফ সোডার দরুণ বিঘা প্রতি ২/০ মণ হইতে ২॥০ মণ পাট অধিক উৎপন্ন হইয়াছিল। বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে ও যাহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া নাইটেট অফ সোডা পাটে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা নাইটেট প্রয়োগে পাটের পরিমাণ বিঘা প্রতি এইরূপ বৃদ্ধি হয় ইহা আমাদের জানাইয়াছেন।

১৯২৬-২৭ সালের পাটের দর অতিশয় মন্দ হইয়াছিল তাহা সত্ত্বেও নাইটেট অফ সোডা প্রয়োগে লাভের পরিমাণ খরচা বাদে ভালই হইয়াছিল। আমরা যে নাইটেট অফ সোডার প্রয়োগ দ্বারাই পাটের বৃদ্ধি হইয়াছে বলিতেছি তাহা আকার নহে যে হেতু ১৯২৬ সালের খইলের পরিমাণ ১৯২৫ সালের অর্দ্ধেক করা হয়; তথাপি নাইট্রেটের দরুণ ফসলের বৃদ্ধি বিঘা প্রতি প্রায় ১৯২৫ সালের মত হইয়াছিল। ১৯২৬ সালে অবশ্য খইলের পরিমাণ ১৯২৫ সালের সমান হইলে মন্দা বাজার দরে কোন লাভ থাকিত না; অতএব সার হিসাবে নাইটেট অফ সোডা কেবলমাত্র গোবর বা খইল হইতে যে অধিক উপযোগী তাহাই প্রমাণিত হইল। ঠিক পরিমাণে নাইটেট ব্যবহার করিলে সার দিবার ব্যয়ের হ্রাস হইয়া লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে ইহাই দেখা যাইতেছে।

Extract from Annual Report of the Dept. of Agricultuae ! Bengal 1926-27.

* ১৯২৭ সালে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার সরাইল জমিদারী কৃষিক্ষেত্রের এগ্রিকালচার অফিসার মতীহর রহমান সাহেব পাটে নাইট্রেট্ অফ সোডা প্রয়োগ করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জমির নিশানা	জমির মাপ।	প্রতি তিন বিঘায় (একর) ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	উৎপন্ন পাট তন্তু	সারের মূল্য	প্রয়োগের মজুরী	একর হিঃ উৎপন্ন পাটের মূল্য	লাভ
বক বি, প্লট ৮ ও ৪	দশ কাঠা	গোবর— ২৪০/০ মণ চুণ— ৩/০ মণ নাঃ সোডা ১৷০ মণ	২৭/০ মণ	গোবর— ৪৮৲ চুণ— ৩৲ নাঃ সোডা ১৬৪৵ ৬৫৸৵০	৩৵০	২৩৬৷০	কেবল গোবর অপেক্ষা নাইট্রেট্ প্রয়োগে একর প্রতি ৭২৸৵০ বা বিঘা প্রতি ২৪৷০ লাভ।
বক বি, প্লট ৫ ও ৬	ঐ	গোবর—২৬০/০ মণ চুণ— ৩/০ মণ ক্যাঃ সিয়ানামাইড ১৷০	২৪/০	গোবর— ৪৮৲ চন— ৩৲ ক্যাঃ সিয়াঃ ১৫৸৵০ ৬৫৸৵০	৩৵০	২১০৲	ক্যালসিয়াম সিয়ানামাইড অপেক্ষা নাইট্রেট্ অফ সোডা প্রয়োগে একর প্রতি ২৬৷০ বা বিঘা প্রতি ৮৸০ লাভ।
বক সি, প্লট ১০ ও ১১	ঐ	গোবর—২৪০/০ মণ	১৬/০ মণ	৪৮৲	২৲	১৪৪৷৵০	

* রাজসাহী সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ১৯২৬ সালে চচড়া সবুজ (লম্বাফল) পাটে নাইট্রেট, অফ সোডা প্রয়োগে যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১ ছটাক (16 acre) বিঘা প্রতি ১০০/০ মণ হিসাবে গোবর দেওয়া হইয়াছিল... উৎপন্ন পাটের ওজন বিঘা হিঃ ৯৭২ সের

২। ঐ ঐ বিঘা প্রতি ১০০/০ মণ হিসাবে গোবর এবং বিঘা হিঃ ৩ সের ১/০ ছটাক অর্থাৎ একরে ১/০ নাঃ সোডা প্রয়োগ করা হয় " " " ৭৮২ সের

১ বিঘায় নাইঃ সোডা প্রয়োগে অধিক ফলন ৯০ সের

Annual Report of the Dept of Agri 1927-28.

ব্রাহ্মণবেড়িয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ১৯২৮ সালে চুচুড়া সবুজ (লম্বা ফল) পাটে পৃথক পৃথক জমিতে নাইট্রেট অফ সোডা ও ক্যালসিয়াম সিয়ানামাইড সমান মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া নাইট্রেট অফ সোডার দরুণ বিঘা প্রতি ১/০ মণ পাট অধিক হইয়াছিল।

Annual Report of the Dept of Agri 1927-28

পরীক্ষাগুলির ফল মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অপর প্রকৃতির রাসায়নিক সার অপেক্ষা পাট চাষে চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডার উপযোগীতাই প্রমাণিত হয়। অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ করার জন্য ব্রাহ্মণবেড়িয়া অপেক্ষা ফরিদপুরে উৎপত্তির বৃদ্ধি কম হইয়াছে ইহাই দেখা যাইতেছে। বহু স্থানের পরীক্ষার ফল বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, বিঘা প্রতি ১৫ সের হইতে ॥০ মণ নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ করিলে সারের খরচ বাদ দিয়া লাভ ভালই থাকে।

যাবৎ নাইট্রেট অবস্থায় পরিণত না হয় তাবৎ উহার কোন অংশই উদ্ভিদের আহার্য্য উপযোগী হয় না। অন্য প্রকৃতির সার ভূমিতে ফেলিবার পর এই পরিবর্তন ঘটিতে থাকে আর ঠিক সময়ে উপযুক্ত তাপ, বায়ু ও বীজাণুর অভাব হইলে নাইট্রেট ভিন্ন অন্য প্রকৃতির সারের উপযোগীতা সংশয়াপন্ন হয়। এই কারণ ১৯২৮ সালের ব্রাহ্মণবেড়িয়ার পরীক্ষায় ক্যালসিয়াম সিয়ানামাইড প্রয়োগে নাইট্রেট অফ সোডা অপেক্ষা কম পাট উৎপন্ন হয়; নাইট্রেট অফ সোডা অপেক্ষা নাইট্রোজেন অধিক মাত্রায় থাকা সত্বেও সিয়ানামাইডেতে প্রকৃতির নাইট্রোজেন পাটের খাদ্যোপযোগী
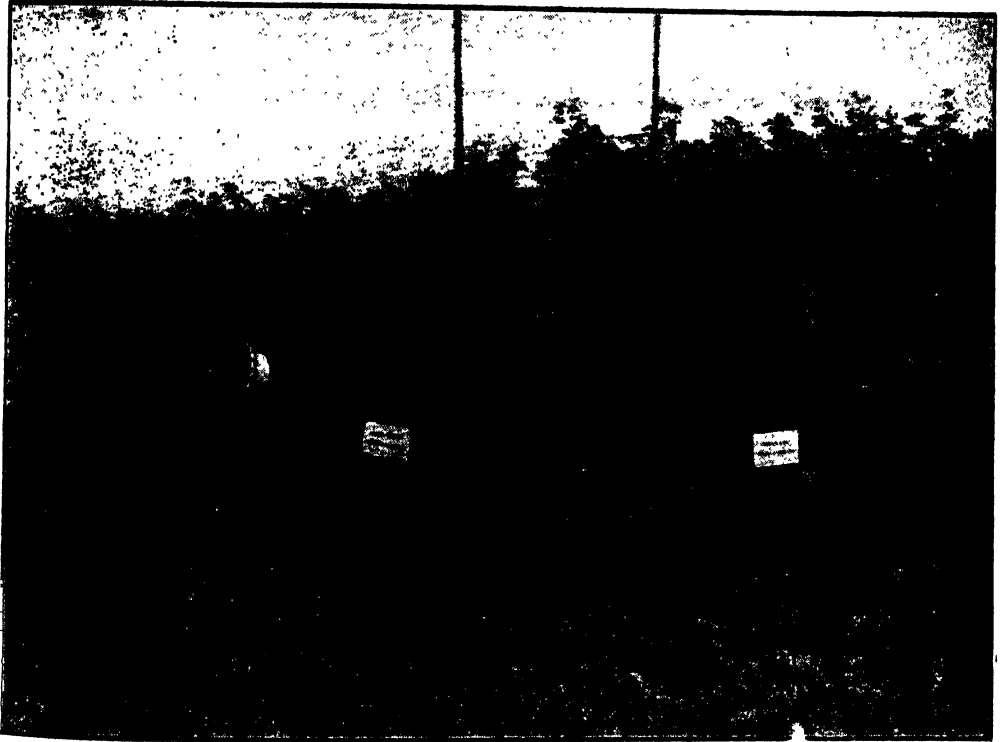
নাইট্রেট অফ সোডার শতকরা ১৫॥০ ভাগই উদ্ভিদের শ্রেষ্ঠ খাদ্য নাইট্রোজেন; এবং এই নাইট্রোজেনের যোগ আনাই অনায়াসে ও অবিলম্বে উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায়। অন্য কোনও প্রকৃতির নাইট্রোজনাত্মক সারের নাইট্রোজেন

হয় নাই। পাট যেরূপ ঋতুতে জন্মায় তাহার জন্য উহার শ্রেষ্ঠ খাদ্য নাইট্রোজেন নাইট্রেট অবস্থায় দেওয়া একান্ত আবশ্যক; কারণ ইহার উপকারিতা লাভ করিতে সময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে না। নাইট্রেট অফ সোডার পরিবর্তে সস্তায় অন্য প্রকৃতির

সার ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের বিচার করিলে কৃষক উপকৃত হইবেন।

ফস্ফরিক এসিড ও পটাশ আরও দুইটী উদ্ভিদের খাদ্য। উচ্চ জমিতে পাট বুনিবার পূর্ব্বে ধৈঞ্চা বা শণ, হাড়ের গুঁড়া দ্বারা ফস্ফরিক এসিড প্রয়োগে উৎপন্ন করিয়া তাহাই ক্ষেত্রে চষিয়া দিয়া পচাইলে জমির উন্নতি হয়। কাঠের ছাই ও কচুরী পানার ছাইতে যথেষ্ট পটাশ পাওয়া যায় অতএব এই দুইটী দ্রব্য মধ্যে মধ্যে ভূমিতে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

তামাক, আলু প্রভৃতি ফসলে ফস্ফরিক এসিড, পটাশ সার ও নাইট্রেট অফ সোডার প্রয়োগ করিবার রীতি ও পরিমাণ কত হইবে আমাদের লিখিলে তাহা জানাইব।

জমির 'আটাল' ভাগ গোবর প্রয়োগ করিলে আলগা রাখে ও উহাতে ফস্ফরিক এসিড ও পটাশের অংশও সামান্য থাকে একারণ ইহার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে আমরা পরামর্শ দিই না বিশেষতঃ ঐ সকল জমিতে যথায় পাট ও ধান পর পর উৎপন্ন করা হয়। অধিকমাত্রায় গোবর সার প্রয়োগ করিতে ব্যয় বাহুল্য হইলে নাইট্রেট অফ সোডার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তাহার পূরণ করা যাইতে পারে। মোটামুটি এক- একভাগ নাইট্রেট অফ সোডা গোবরের দশভাগ পূরণ করিবে। ফস্ফরিক এসিড বা পটাশের পরিমাণ বেশী হইলে পাটের তন্তু নিকৃষ্ট হয়। একন্য আমরা সুপার ফস্ফেট বা হাড়ের গুড়া ইত্যাদি অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিই না।

পাটের জমি তৈয়ার করিবার কালে বিঘাপ্রতি গোবর ৪০ হইতে ৫০ মণ; হাড়ের গুড়া ।৫ সের অথবা সাধারণ সুপারফস্ফেট /৭।০ সের ও কাঠের বা কচুরী পানার ছাই ভূমিতে ফেলিবে। পাটের চারা বাহির হইবার পর যখন চারাগুলি ৮-১০ আঙ্গুল উচ্চ হইয়াছে ও বিদা বা নিড়ান দেওয়া হইয়াছে তখন বিঘার হিসাবে ।৫ সের হইতে ॥০ মণ নাইট্রেট অফ সোডা বেশ চূর্ণ করিয়া উহার সহিত তিনচারি গুণ পরিমাণ ঝুরা মাটী মিশাইবে এবং ঐ মিশ্রণ ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিবে। বর্ষার দরুণ জমিতে জল জমিবার অন্ততঃ ২।৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে ঐরূপ প্রয়োগ করা উচিৎ।

যে সকল পাটের জমিতে বৎসর বৎসর পলি পড়ে তথায় কেবলমাত্র নাইট্রেট অফ সোডা উক্ত উপায়ে ও পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াও লাভজনক ফল পাওয়া যায়। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া ষোল আনা সুফল পাইতে হইলে লাঙ্গল ভালরূপ দিয়া জমির আগাছা মারিয়া ফেলা উচিত; বিদা টানিয়া বা নিড়ান করিয়া চারাগুলিকে খুব ঘেসাঘেসি থাকিতে দিবে না; উহাদের মধ্যে অন্ততঃ ৪।৫ আঙ্গুল ফাক রাখিবে কারণ উপযুক্ত খাদ্য পাইয়া চারার যে পুষ্টি হইবে তাহার প্রসার হইবার জন্য যথেষ্ট স্থান যেন মুক্ত থাকে।

যাহারা বীজের জন্য পাট জন্মান তাঁহারা উপরোক্ত নিয়মে ও পরিমাণে নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ করিলে লাভজনক ফল পাইবেন।

অন্যবিধ তন্তু উৎপাদক উদ্ভিদ যথা, মেস্তা পাট ও শণ এবং মাদুর কাটী, মজু. বাবুই প্রভৃতি তৃণজাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে নাইট্রেট অফ সোডা উপযোগী সার; বিঘাপ্রতি ।৫ সের হইতে ॥০ হিসাবে এই সার শুষ্ক ঝুরা মাটীর সহিত মিশাইয়া ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিতে হয়।

—:০:—

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ অধ্যায় খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

ব্যবসায়ের সংবাদ।

নিম্নলিখিত ব্যবসায়ের সংবাদ ১নং কৌন্সিল হাউস ষ্ট্রীটস্থ বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত এবিষয়ে পত্র ব্যবহার করিয়া প্রত্যুত্তর জানাইলে তিনি সুখী হইবেন।

প্রত্যেক পত্রলেখক তাঁহাদের ব্যাঙ্কের উল্লেখ করিবেন।

ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল ১০ই জানুয়ারী ১৯২৯ হইতে—

আর্সেনিক টি সালফাইড

(আর ২১২) উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ পেশোয়ার সহরের কোন ব্যবসায়ী আর্সেনিক টী সালফাইড ক্রেতা চান।

ক্রোম্ ওর

(আর ২২০) মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোর সহরের এক ব্যবসায়ী উচ্চশ্রেণীর শতকরা ৪৬-৪৮ পর্য্যন্ত ক্রোম ওর সরবরাহ করিতে পারিবেন, এরূপ লোকের সহিত পরিচিত হইতে চান।

রুপার নিকেল ওর

(R২১৪) বোম্বাইয়ের একজন পত্রলেখক রুপার নিকেল ওর সরবরাহ কারক চান।

মূল্যবান পাথর

(R ২১৫) পেশোয়ারের একজন ব্যবসায়ী মূল্যবান পাথর বিক্রেতার সহিত পরিচিত হইতে চান।

ছাগলের কাঁচা চামড়া

(R ২১৬) হাঙ্গেরীর অন্তর্গত বুডাপেষ্টের একজন পত্রলেখক ছাগলের কাঁচাচামড়া ভারতবর্ষ হইতে সরবরাহ করিতে পারিবেন, এরূপ লোকের সহিত পরিচিত হইতে চান। এখনও ঐ দেশে ছাগলের কাঁচা চামড়া আমদানী হয় নাই।

(১৭ই জানুয়ারীর ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল হইতে)

হেনার পাতা ও গুঁড়া

(R ২১৭) বোম্বাইয়ের একটি ফার্ম হেনার পাতা ও গুঁড়া সরবরাহকারী কোন লোকের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন।

ঔষধের গাছগাছড়া

ঔষধের গাছ গাছড়া ও ছাল সরবরাহ করিতে পারিবে, এরূপ লোকের সহিত বোম্বাইয়ের কোন ফার্ম পরিচিত হইতে চান।

সাদা শিরীশ

(R ২১৭) মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের জনৈক ব্যবসায়ী সাদা শিরীষের সরবরাহ করিতে পারেন, এরূপ লোকের সহিত পরিচিত হইতে চান।

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় প্রত্যেক ফার্ম তাঁহাদের ব্যাঙ্কের কথা লিখিবেন।

রুপার নিকেল ওর

(R ২২০) বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ী রুপার নিকেলওর সরবরাহকারীর সহিত পরিচিত হইতে চান।

হরিণের সিং

(R ২২১) যুক্তপ্রদেশের লক্ষৌ সহরের একটি ফার্ম হরিণের সিং ক্রেতার সহিত পরিচিত হইতে চান।

(৩১শে জানুয়ারীর ট্রেড জার্নাল হইতে)

কৃত্রিম রেশম ওয়ষ্টে

(R ২২২) দক্ষিণ ভারত সালেমের একটী ফার্ম কৃত্রিম রেশম ওয়েষ্ট ক্রেতার সহিত পরিচিত হইতে চান।

আরব দেশের গঁদ

(R ২২৩) মান্দ্রাজ প্রদেশের একজন পত্র লেখক আরব দেশের গঁদ সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

পাতলা চামড়ার কাটা অংশ

(R ২২৪) দক্ষিণ ভারতের রাজমহেন্দ্রীর একজন পত্রলেখক পাতলা চামড়ার কাটা অংশ ক্রেতার সহিত পরিচিত হইতে চান।

বানরের চামড়া

(R ২৫৫) পঞ্জাব লাহোরের একটি ফার্ম বানরের চামড়া সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

রেশমের ওয়েষ্ট

(R ২২৬) রেশমের ওয়েষ্ট কিনিতে ইচ্ছুক এরূপ লোকের সহিত দক্ষিণ ভারতীয় সালেমের একজন ব্যবসায়ী পরিচিত হইতে চান।

লবঙ্গ

(R ২২০) জার্মানীর অন্তর্গত হাম্বার্গের একটি ফার্ম ভারতের লবঙ্গ রপ্তানীকারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান। ঐ দেশে এখনও ভারতীয় লবঙ্গ রপ্তানী হয় নাই।

ব্যবসার সংবাদ

অয়েল ইঞ্জিন, ধেনের কল, চাউলের কল আটার কল ইত্যাদির জন্য প্রতি বৎসর আমাদের বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। এই সকল কল ব্যতীত manufacturing business করা অসম্ভব তাই ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু কোম্পানী হইতে এদেশে নানারূপ শ্রম লাঘবকারী কল আমদানী হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় অতি অল্প কারখানার মালিকই এই সব কল এদেশে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। চেষ্টা এবং উদ্যম যে এদেশে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না; কারীগরও একেবারে নাই এমনও নহে; কিন্তু তৈল না হইলে আধার এবং পলিতা প্রভৃতি থাকা সত্বেও প্রদীপ যেমন জ্বলিতে পারে না, তেমনি মূলধন না থাকিলে কারখানারও সৃষ্টি বা শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না।

এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সংগ্রাম করিয়া বেরী কোম্পানী আজ সমগ্র ভারতে এবং সুদূর প্রাচ্য দেশেও যে সম্মান এবং প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। বেরী কোম্পানীর মালিকগণ এ দেশীয় লোক; ইটিলীতে তাঁহাদের নিজস্ব কারখানায় যে সকল অয়েল ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে তাহা কোনও পাশ্চাত্য দেশীয় অয়েল ইঞ্জিন অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহেই বরং সর্ব্বাংশেই এদেশের উপযোগী, অতিশয় মজবুত এবং সুদৃঢ়। আমরা তাঁহাদের কারখানায় নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিতে গিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের স্বহস্ত নির্ম্মিত নানারূপ শ্রম লাঘবকারী যন্ত্রাদির practical dsmonstration বা হাতে কলমে কার্য্য প্রণালী পরিচালনা দেখিয়া আশায় এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি।

গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করার জন্য ইঁহারা যে হস্ত পরিচালিত কল বিক্রয় করিতেছেন তাহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি। আমাদের সম্মুখে প্রায় আড়াই সের আন্দাজ আঁখের গুড় কলের আধারে ঢালিয়া দেওয়া হইল এবং প্রায় পনের মিনিট ঘুরাইবার পর গুড়টা চিনিতে রূপান্তরিত হইল এবং খানিকটা ঝোলা গুড় স্বতন্ত্র পথে বাহির হইয়া গেল। আজকালকার দিনে কল কারখানার সাহায্য না নিয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্যে ব্যবসা করিতে যাওয়া ঠিক খালি হাতে লড়াই করিতে যাওয়ার মত হাস্যকর।

লাখ লিখের স্বপ্ন যাঁহারা দেখিতে চান তাঁহারা দেখুন এবং ছেড়া কাঁথায় শুইয়া ময়ূর সিংহাসনের কাল্পনিক আনন্দ উপভোগ করিতে থাকুন আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু যাহারা বাস্তব রাজ্যে পা টিপিয়া হাঁটিতে চান এবং সামান্য ৫।৭ শত কি হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করতঃ ছোট ছোট কলকারখানার সাহায্যে এক একটা কুটীর শিল্পের পত্তন করিতে চান, আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বেরী কোম্পানীর Show Room এ যাইয়া একবার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসুন এবং তাঁহাদের ইঞ্জীনীয়ার কার

খানায় একবার যাইয়া ঢুঁ মারিয়া আসুন আশায় উৎসাহে এবং আনন্দে বুক ফুলিয়া উঠিবে। আর যাঁহারা মফঃস্বলে আছেন তাঁহারা এখন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইয়া লউন অর্থাৎ তাঁহারা আপাততঃ বেঙ্গী কোম্পানীর নিকট তাঁহাদের শ্রম লাঘব কারী কলকারখানার একখানা সচিত্র ক্যাটালগ বা বিবরণ পত্র চাহিয়া পাঠান। বহু লোক মিছা মিছি ক্যাটালগ নিয়া নষ্ট করে বলিয়া সাধারণতঃ যাকে তাকে অনেকে ক্যাটালগ দেয় না। কিন্তু আমাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলে তৎক্ষণাৎ সচিত্র ক্যাটালগ পাইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

•　•　•

Musical Instrument বা বাদ্য যন্ত্রের ব্যবসায়ে Dwarkin এবং M. L. Saha বাংলা দেশে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। Harold এবং Bevan ও ইহাদের কাছে কোন্ ঠাসা হইয়া গিয়াছেন। Dwarkin এর হারমোনিয়ামের কথা আজ দুই পুরুষ ধরিয়া বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, আর গ্রামোফোনের ব্যবসায়ে M, L. Sahaর নাম না জানে এমন লোক নাই। উভয় দোকানই বাদ্য যন্ত্রের ব্যবসায়ে কলিকাতার বাজারে অসম্ভব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। মফঃস্বলের ক্রেতা ও বিক্রেতা দিগকে আমরা ইহাদের সহিত সরাসরি কারবার করিতে পরামর্শ দিতেছি।

•　•　•

গ্রীষ্ম কাল আসিয়াছে; বাংলার খাল, বিল, পুকুর সব শুকাইয়া ফুটী ফাটা হইয়া যাইতেছে আর প্রতি পল্লীগ্রাম হইতে হাহাকার উঠিতেছে। দূষিত কর্দমাক্ত জল পান করিয়া কলেরা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি জলবাহী (Water borne) নানারূপ রোগে বাংলার পল্লীসমূহ ক্রমে জনহীন অরণ্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতীকার করা যে গ্রামবাসীদের করায়ত্ব এবং সাধ্যায়ত্ব ইহাতে আমাদের কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। পুকুর কাটা বহু ব্যয় এবং সময় সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু এক একটী Tube Well টিউব ওয়েল বা নলকূপ খনন করা এবং তাহার সহিত একটী করিয়া Hand Pumh বা হাত পাম্প লাগাইয়া নেওয়া খুব বেশী ব্যয়সাধ্যও নহে এবং দুই দিনেই সব কাজ সমাধা করা যায়। সর্ব্ব সাকুল্যে ৫০৲ টাকার মধ্যেই একাজ সম্পন্ন হইতে পারে। একার পক্ষে ৫০৲ টাকা দেওয়া সম্ভব না হইলে এক এক পাড়া হইতে কয়েক জনে মিলিয়া চাঁদা করিয়াও এই টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন এবং সকলের সুবিধামত স্থানে নলকূপ খনন করতঃ সেই পাড়ার জল কষ্ট দূর করিতে পারেন। যখন উপায় নাই তখন স্নান শৌচাদি না হয় এঁদো পুকুরে করুন, কিন্তু পানীয় জলটী ঘরে ঘরে যাহাতে এই নলকূপ হইতে লোকে পায় তাহার ব্যবস্থা করুন, দেখিবেন পল্লীর আধা ব্যাধি দূর হইয়া যাইবে। নচেৎ চাতক পাখীর মত ঊর্দ্ধ মুখে খালি গলা ফাটাইয়া চেঁচাইয়া মরিলেও কেহ এক ফোটা জলের ব্যবস্থা করিয়া দিবে না। জেলা বোর্ডের টাকার দ্বারা লক্ষ লক্ষ গ্রামের জলকষ্ট দূর হইতে পারে না এবং পারিবে না। বোর্ডের মধ্যে যাহারা শক্তি শালী মেম্বর তাহারা তাহাদের আশে পাশের গ্রামের জলকষ্ট দূর করার জন্য সব ফোন্টাই নিজেদের পাতে টানিয়া নিবে ইহা স্বাভাবিক এবং স্বতঃসিদ্ধ; বাকী গ্রাম গুলি কি মরিবে? আমরা বলি সকলে সমবায় পদ্ধতিতে দলবদ্ধ হইয়া পাড়ায় পাড়ায় এক একটী নলকূপ ও হাত পাম্প লাগান। এ বিষয়ে ২৮ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড

(28 Strand Road) ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে মেসার্স এ, এম, হোসেন আলীর দোকানে পত্র লিখিলে সব বিষয় জানিতে পারিবেন এবং কলিকাতার সমুদয় দোকান অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা সস্তায় ভাল জিনিষ পাইবেন; কারণ ইঁহারা সব জিনিষই নিজে বিলাত হইতে আমদানী করেন এবং অতি কম লাভে বিক্রয় করেন।

• • •

লোহা, লকড়, কড়ি, বরগা, করগেট চাদর, পাইপ, Barbed wire বা কাঁটা তার ইত্যাদি Hardware লাইনের যাবতীয় জিনিষ ৮৬এ২ ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মেসার্স গোপাল চন্দ্র দত্তের দোকানে অনেক সুবিধায় পাইবেন। তাহাছাড়া Building materials বা ইমারতের দ্রব্যাদিও তাঁহারা যথেষ্ট ষ্টক রাখেন। মফঃস্বল হইতে যাঁহারা কলিকাতায় লোহা লকড়ের মাল বা বিলাতী মাটী, সেট, বার্ণিশ প্রভৃতি খরিদ করিতে চান তাঁহারা নিশ্চিন্তমনায় ইঁহাদের সহিত কারবার করিতেপারেন।

• • •

ভারতের আর একটী অদ্বিতীয় অনুষ্ঠান Godrej এর Safe বা লোহার সিন্দুকের কারখানা। সততা, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতা থাকিলে মানুষ পৃথিবীতে যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে Ardesher B. Godrej এর জীবনী তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে গত ১৯০৫ সালে এক পার্শী যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর চাকুরী অথবা ওকালতী আদি অপেক্ষা কৃত্রিম প্রভৃতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া একেবারে রিক্ত হস্তে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সেই সহায় সম্বল হীন যুবক আজ লক্ষলক্ষ টাকার মালিক হইয়া লোহার সিন্দুকের ব্যবসায়ে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন সে ইতিহাস ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাঠক দিগকে বারান্তরে শুনাইবার ইচ্ছা আছে। আজ Iron Safe Steel Almirah প্রভৃতি নির্মান করতঃ Godrej শুধু যে নিজেই লক্ষপতি হইয়াছেন তাহা নহে পরন্তু বৈদেশিক শোষণের আর একটী রাস্তা মারিয়া আনিয়াছেন পৃথিবীর কোনও কারখানা আজ Godrej এর উপর টেক্কা মারিতে পারে না। অথচ এই সকল জিনিষ দামেও খুব সস্তা। আমরা মফঃস্বলের ক্রেতাদিগকে ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে Godrej এর দোকানে একবার পদার্পণ করতঃ চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসিতে অনুরোধ করি এবং তাহার পূর্বে তাঁহাদের কারখানার প্রস্তুত নানা বিধ দ্রব্যাদির সুন্দর এবং সুদৃশ্য ক্যাটালগ পড়িয়া দেখিতে বলি। আমাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলেই ক্যাটালগ পাইবেন।

• • •

২৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে মেসার্স এন, পি, দত্ত এণ্ড সন এর ঔষধের দোকান অর্দ্ধ শতাব্দীরও আগে স্থাপিত এবং আজ প্রায় তিন পুরুষ যাবত এই দোকান অতীব সুখ্যাতির সহিত সত্তাদরে ঔষধ বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়; তাহারও ৮ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে এই ঔষধের দোকান স্থাপিত হয় এবং তদবধি এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ইঁহারা এই দোকান চালাইয়া আসিতেছেন। মফঃস্বলের খরিদদারগণ এবং কলিকাতার ডেলী প্যাসেঞ্জারের দল ইঁহাদের দোকানে সস্তায় খাঁটী ঔষধ পান বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া থাকেন।

ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer-এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, —যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেন্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেন্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্থতে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন

নাঙ্গল বাঁদ

পাংসা E. B. R. ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূর সপ্তাহে দুইদিন হাট হইয়া থাকে বহু দোকান আছে প্রধান গুলির নাম দিলাম, সমস্ত জিনিষ বেচা কেনা হয়। পাট ও ভুঁসিমালের ইক্ষু গুড় ও খেজুর গুড়ের যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে।

ওজন ৩০ ৮০।৮২।০ শিক্কা

নাঙ্গলে বন্দ বাজারের ব্যবসায়িগণের তালিকা পোঃ আবাইপুর, জিলা যশোহর।

স্টেশনারি দোকান।

১। ফুলকরণ কুণ্ডু।

কাপড় ও কাটা কাপড়।

১। ফুলচরণ কুণ্ডু।
২। ক্ষেত্রমোহন কুণ্ডু।
৩। গুরুদাস, বিনোদবিহারী কুণ্ডু।

শঃ তৈল ও কেরোসিন।

১। জ্যোতিশ চন্দ্র কুণ্ডু।
২। তরণীকান্ত কুণ্ডু।
৩। বিপিনবিহারী কুণ্ডু।

সুতাবিক্রেতা।

১। দুর্গাচরণ রসময় কুণ্ডু।
২। ক্ষেত্রনাথ কুণ্ডু
৩। গৌরিকান্ত কুণ্ডু

মসলা বিক্রেতা।

১। নগর বাসি কুণ্ডু।
২। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

করগেট টীন ও কাঠ।

১। ৺দিননাথ সাহা।
২। জীবন চন্দ্র সাহা।
৩। তরণীকান্ত কুণ্ডু।

ধান্য ও চাউল।

১। গদাধর কুণ্ডু।
২। পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।
৩। ব্রজনাথ কুণ্ডু।
৪। বিপিনবিহারী যুগলকিশর কুণ্ডু।
৫। রসিকলাল কুণ্ডু।
৬। গৌরকিশোর, যুগলকিশোর কুণ্ডু।

৺কেদারনাথ সাহা।

২। আর্য্যাকালী বিশ্বাস।

গুড়ের দোকান।

১। তুলসিরাম কুণ্ডু।
২। রসিকলাল কুণ্ডু।
৩। রামচরণ, প্রিয়নাথ কুণ্ডু।
৪। ৺উন্তবচন্দ্র কুণ্ডু।

পাট ও ভুষিসকল।

১। ৺দিননাথ, ৺কেদারনাথ সাহা। (বেলার)
২। গদাধর কুণ্ডু। (বেলার)

স্বর্ণকার।

১। গগণচন্দ্র নাথ।
২। সাধুচরণ দাস।
৩। ললিতচন্দ্র নাথ।

ঔষধবিক্রেতা ও ডাক্তার।

১। শ্রীমন্ত কুমার কুণ্ডু।
২। সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।
৩। প্রমথনাথ ঘোষ। (হোমিও)

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি ...
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৯ম বর্ষ } আষাঢ় ১৩৩৬ { ৩য় সংখ্যা

ধানের চাষে সারের প্রয়োজনীয়তা।

সমুদায় খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান্যই প্রধান। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ভূমি কৃষির উপযোগী তাহার অধিকাংশই ধান্যের চাষে নিয়োজিত হয়।

ভারতের প্রধান ছয়টী প্রদেশের যে পরিমাণ ভূমিতে ধান্যের আবাদ হয় তাহা ইংরাজী সংখ্যায় এই পুস্তিকার মলাটের উপর লিখিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ধান্য চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ বঙ্গদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঐরূপ ভূমির সমষ্টি বঙ্গদেশে ছয় কোটী বিঘারও উপর হইবে; (তিন বিঘা জমি প্রায় এক একরের সমান)। যে যে স্থলে সমগ্র আবাদী জমির সমষ্টির অর্দ্ধেকের উপর (শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক) অংশে ধান্যের চাষ হয় সেই সকল স্থল ঐ মানচিত্রে ঘোর বর্ণে চিহ্নিত হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে দেখিলে বাঙ্গালা দেশের সমগ্র ভাগই ঐরূপ ঘোর রংএ চিহ্নিত দেখা যাইবে। অতএব ধান্য শস্যের বিঘা প্রতি ফলনের হার বৃদ্ধি করিতে পারিলে বঙ্গদেশে কৃষিজনিত আয়ও বৃদ্ধি পাইবে।

বাঙ্গালা দেশে কয়েক প্রকার ধান্যের চাষ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে আউশ বা আশু ধান্য এবং আমন বা হৈমন্তিক ধান্যই প্রধান। এই দুই প্রকারের ধান্যের চাষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভূমিতে হয়; সেই হেতু উহাদের আবাদে সার প্রয়োগের রীতি ও পরিমাণ পৃথক্।

আমন ধান্যের জমি অপেক্ষা আউস ধান্যের জমিতে অধিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করা হয়। আলু বা কোন প্রকার রবি শস্য এবং আউস ধান পর্য্যায়ক্রমে উৎপন্ন করা পদ্ধতি। আউস ধান উচ্চ বা ডাঙ্গা জমিতে জন্মে; সেই হেতু কৃত্রিম রাসায়নিক সার ঐরূপ জমির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বাঙ্গালা দেশে সচরাচর গোবর ছাই ও পুকুরের

পাঁক মাটী এবং খইলই সাররূপে ব্যবহৃত হয়। ফসলের পরিমাণ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া লাভ উঠাইবার জন্য ঐ সারগুলির প্রয়োগ যথেষ্ট নহে; অধিকন্তু উহাদের প্রয়োগে ব্যয় অধিক হয়। এই সম্বন্ধে আমন ধান্যে সারের প্রয়োগ ও তাহার ফল সম্বন্ধে বাঙ্গালার কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ১৯০৭ সালের ৩নং পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

আমন ধান্য—গত ১৬ বৎসর ধরিয়া আমন ধান্যে সার ব্যবহার করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বিঘা প্রতি ৩৩/০ হইতে ৩৪/০ মণ গোবর প্রয়োগ করিয়া যে ফসল পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ বিঘা প্রতি ১৭/০ মণ গোবর ব্যবহার জনিত উৎপন্ন ফসলের প্রায় সমতুল্য।

বিঘা প্রতি ৩৩/০ হইতে ৩৪/০ মণ গোবর ব্যবহার করিয়া প্রতি বিঘায় গড়ে ১৩৮০ সের ধান ও ১৮।৫ সের খড় পাওয়া গিয়াছিল এবং বিঘা প্রতি প্রায় ১৭/০ গোবর ব্যবহার করিয়া বিঘা প্রতি গড়ে ১৩.৫ সের ধান ও ১৮।৩ সের খড় উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং বিঘা প্রতি ৩৩/০ মণ হইতে ৩৪/০ মণ ও বিঘা প্রতি ১৭/০ মণ গোবর ব্যবহার করিয়া ফসলের পার্থক্য যৎসামান্যই হইয়াছে। এতএব ধান্যের আবাদে বিঘা প্রতি ১৬/০ মণ হইতে ১৭/০ মণ গোবর ব্যবহার করিয়া এই সারের গুণপণার চরম ফল পাওয়া গিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রতি বিঘায় ১/০ মণ হাড়ের গুঁড়া ও।০ সের দেশীয় সোরা ব্যবহার করিয়া বিঘা প্রতি গড়ে ১৬৮৬ সের ধান ও ২৪।২ সের খড় উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রতি বিঘায় কেবলমাত্র ২/০ মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া গড়ে ১৫/৩ সের ধান ও প্রায় ২৩।৮ সের খড় জন্মিয়াছিল; আর বিঘা প্রতি ১/০ মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া ১৪/০ মণ ধান ও ২০/৩ সের খড় পাওয়া গিয়াছিল।

উপরোল্লিখিত ফলগুলি পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে ইহাই স্থিরীকৃত হইবে যে, ১/০ মণ হাড়ের গুঁড়ার সহিত।০ সের মাত্র সোরা প্রয়োগ করিয়া ফসলের উৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সোরাতে দুইটী মাত্র সার পদার্থ আছে, প্রথমটি পটাশ, দ্বিতীয়টী নাইট্রেট অবস্থায় নাইট্রোজেন। বাঙ্গালার কর্দ্দম-প্রধান জমিতে, বিশেষতঃ যে সকল জমি বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায় ও যথায় 'পলি' পড়ে তথায় পটাশ সারের আধিক্য থাকায় ইহাই উপলব্ধি হয় যে নাইট্রেট অবস্থায় নাইট্রোজেনই উৎপত্তির বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। ১৯২৬ সালের কৃষি বিভাগের বিচক্ষণ কর্ম্মচারীগণের রিপোর্টে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়, দেশী সোরায় সর্ব্বথা ভেজাল থাকায় উহার নাইট্রোজেনের পরিমাণের স্থিরতা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে দেশীয় সোরা অপেক্ষা নাইট্রেট অব সোডাতে নাইট্রেট নাইট্রোজেনের অংশ বেশী এবং নাইট্রেট অব সোডা দরেও সস্তা। পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষার ফল হইতে যখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে নাইট্রেট নাইট্রোজেনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল উৎপত্তির কারণ তখন আমরা ধান্যক্ষেত্রে নাইট্রেট অব সোডার ব্যবহার প্রচলন করিতে বাঙ্গালার কৃষিব্যবসায়ীদিগকে যুক্তি দিতেছি।

১৯১৬ সালের বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের বিচক্ষণ কর্ম্মচারীগণের রিপোর্ট যাহা প্রকাশিত হয় তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ—

(Extract from Annual Reports of Expert officers of the Department of Agricultnre Bengal for the year Ending 30th June 1919

"নাগরা" ধানের উপর পরীক্ষার ফল :—

পরীক্ষা	আবাদের খরচ	সারের খরচ	একরে মোট খরচ	একরে প্রতি লাভ	একরে ফলন ধান মণ	সের	ছটাক,	খড় কাহণ	পণ গণ্ডা	মূল্য
(ক) বিনাসার	৩২৸৵১০	"	৩২৸৵১০	২৫৸৵৫	১১	॥৭	।১০	১	৸/০	৫৮৸১৫
(খ) নাইট্রেট অফ সোডা একরে ১/মণ	৩৩৷৶/০	৫৲	৩৮'৶/০	৪২৸৶/১৫	২১	।৭	॥০	২	/০	৮১৶/১৫
(গ) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট একরে ১/মণ	৩৩।/০	৬৲	৩৯।/০	২৪৶/০	১৬	।৯	।১০	১	॥৶/০ ৫	৬৩৷৶/০
(ঘ) গোবর একরে ১০০/মণ	৩৪'৵১৯	৬৵/.৫	৪১।১০	৩৭৸৶/০	১৯	৸০	"	২	॥৵০ "	৭৯৶/১০

* উপস্থিত নাইট্রেট অফ সোডার প্রতি মণের মূল্য ৭॥০ টাকা হওয়া সত্ত্বেও লাভের পরিমাণ ভাল থাকিবে।

সাধারণ পক্ষে নিম্নলিখিতরূপে আমন ধান্যের আবাদ সারের প্রয়োগ করিলে অধিক লাভের উপায় হইবে।

১৬/০ হইতে ১৭/০ মণ গোবর
১/০ " হাড়ের গুঁড়া
।০ দশ সের নাইট্রেট অফ সোডা } বিঘা প্রতি

যখন কাদা চটকাইয়া চারা রোপণের জন্য জমি তৈয়ারী করা হইতেছে সেই সময়ে উক্ত সারের মিশ্রণ ব্যবহার করিতে হইবে। গোবরের পরিমাণ কম থাকিলে নাইট্রেট্ অফ সোডা ।৫ হইতে ॥০ মণ দিতে হইবে। বর্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থিত আমনের জমিতে চারাগুলি রোপণের পর শিকড় লইলে খইলের পরিবর্ত্তে বিঘা প্রতি ।০—।৫ সের নাইট্রেট্ অফ সোডা তিন চারি গুণ শুষ্ক ঝুরা মাটির সহিত জমিতে ছিটাইয়া উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে।

যদি অধিক বৃষ্টি হেতু ক্ষেত্রে জল বিশেষরূপে জমিয়া যায় এবং জমি ছাপাইয়া জল বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহা হইলে নাইট্রেট্, অফ সোডা উক্ত মিশ্রণে ব্যবহার না করিয়া পূর্ব্ব হইতেই বীজের জমিতে বিঘা হিসাবে ৸০ সের তিন চারিগুণ শুষ্ক ঝুরা মাটির সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চারাগুলি যাহাতে রোপণের পূর্ব্বে বেশ মজ-

যুত হয় সে সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক কারণ চারা সবল হইলেই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

আমন এবং কয়েক জাতির আউস ধান্যের চারা জন্মাইলে সেগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া ভিন্ন ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। ঐরূপ ধান্যের আবাদে বীজের জমিতে, চারা ২।৩ ইঞ্চি উচ্চ হইলে বিঘা প্রতি ৮০ সের হিসাবে নাইট্রেট্ অফ সোডা উহার ৩।৪ গুণ পরিমাণ সুখা মাটির সহিত মিশাইয়া ছিটাইয়া প্রয়োগ করা উচিত।

নাইট্রেট্ অফ সোডা প্রয়োগ করিলে বীজের জমির চারাগুলি সহজেই পুষ্ট হইবে কিন্তু সবল চারাগুলি ৩।৪টী একত্রে রোপণ না করিয়া এক একটী ১ ফুট অর্থাৎ ১৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপণ করিলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পাইবে।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার কয়েকটী জেলাতে পাটের ফসল তুলিবামাত্র সেই জমিতেই ধান্য রোপণ করিবার রীতি আছে। ঐ সকল স্থানে বীজের জমিতে নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করিলে ধান্যের চারাগুলি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইবে। চারাগুলি রোপণের উপযোগী করিবার জন্য সময় ক্ষেপ করিলে ক্ষেত্রে জলের আধিক্য হইয়া রোপণ কার্য্যের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হয় বা রোপিত চারাগুলি মাটিতে শিকড় লইবার পূর্ব্বেই জলাধিক্য হেতু ভাসিয়া বা মরিয়া যাইবার শঙ্কা উপস্থিত হয়; কিন্তু বীজের জমিতে নাইট্রেট্ অফ সোডা প্রয়োগ করিয়া অল্প সময়ে চারাগুলিকে বেশ উচ্চ ও মজবুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালে ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে।

আউস ধান্য—আউস ধান্যের জমি যখন তৈয়ার করা হইতেছে সেই সময়ে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে গোবর ও হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করা বিধেয় এবং চারাগুলি যখন ৩ হইতে ৪ ইঞ্চি উচ্চ হইবে তখন নাইট্রেট অফ সোডা বিঘাপ্রতি ।৫—।০ মণ হিসাবে উহার পরিমাণের তিন বা চারিগুণ শুষ্ক এবং সুখা মাটির সহিত মিশাইয়া ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিতে হইবে।

ধান্যের ফসলে নানা প্রকার পীড়া ও কীটের উৎপাত হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে 'উফরা' নামক রোগ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। ঐ রোগ এক প্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কৃমি জাতীয় কীট হইতে উৎপন্ন হয়। কৃমিগুলি নগ্নচক্ষে দেখা যায় না বটে, কিন্তু উহারা ভিজা মাটিতে লুকাইয়া থাকে। কালক্রমে ধান্যের চারাকে আক্রমণ করে এবং তদুপরি অণ্ড প্রসব করিয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়। উহার বিস্তার রোধ করিতে হইলে ধান্য কাটিয়া লইবার পরই 'নাড়া'গুলিকে পোড়াইয়া দিতে হইবে।

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় উল্লিখিত যে সকল পরীক্ষা বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে সেইগুলি অনুসরণ করিয়া নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহার করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ফল পাইতে হইলে বিঘা প্রতি ৴৩ হইতে ।৪ সের নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ করা উচিত।

যে কয়টি পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করা হইতেছে তাহার সকল গুলিতে বিঘা প্রতি নাইট্রোজেন মুখ্য অবস্থার ওজনে মাত্র ৴২ সের ছিল অর্থাৎ নাইট্রেট্ অফ সোডা বিঘা প্রতি ।৵৩ সের হিসাবে প্রয়োগ করা নিমিত্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ ঐরূপ হইয়াছিল। নাইট্রেট্ অফ সোডার ১০০ ভাগে ১৫।০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে অর্থাৎ ৷৵০ মণ নাইট্রেট্ অফ সোডায় ১৫।০ সের নাইট্রোজেন পাওয়া যায়; এই হিসাবে ৴২ সের মুখ্য অবস্থায় নাইট্রোজেন ।৵৩ সের নাইট্রেট্ অফ

সোডায় আছে। নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ অপেক্ষা কম্পোষ্টাত্মক সার ব্যবহারে অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল; তথাপি সার প্রয়োগের মোট ব্যয় বাদ দিলে ঐ সকল পরীক্ষায় অধিকাংশতেই লাভ বেশ ভালই হইয়াছিল।

আমরা যে হাড়ের গুঁড়া বিঘা প্রতি ১৶০ মণ হিসাবে প্রয়োগের যুক্তি দিয়াছি তাহার কারণ এই যে উৎপন্ন ধান্য ভূমি হইতে ফস্‌ফরিক এসিডের যে অংশ অপহরণ করে উক্ত সার প্রয়োগে তাহা পূরণ হইবে; সকলপ্রকার শস্যই ভূমি হইতে ফস্‌ফরিক এসিড অল্প বিস্তর পরিমাণে আহরণ করিয়া লয়, আর জমিতে উক্ত দ্রব্যের একান্ত অভাব হইতে দেওয়া অনুচিত। বিশেষতঃ ঐ সকল আউস ধান্যের জমিতে বর্ষায় পর্য্যায় ক্রমে ইক্ষু বা আলু জন্মান হইয়া থাকে।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগকৃত পরীক্ষার ফল

বাংলার কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর এফ, স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে (১) বারাসত মহকুমার অন্তর্গত রাজীপুর (২) মসলন্দপুর (৩) হরিণ আলমডাঙ্গা (৪) জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জামালপুর ও (৫) জামালপুর মহকুমা সমূহে আউস ধান্য চাষে উক্ত সার ব্যবহারে পরীক্ষার ফল নিম্নে লিখিত হইল :—

জমি	প্রতি বিঘায় সারের পরিমাণ।	প্রতি বিঘায় ফসলের পরিমাণ				
		১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং
		মণ	মণ	মণ	মণ	মণ
১।	দেশ প্রচলিত সার ...	৫॥০	৪	৩॥০	৫।৫	৫॥০
২।	নাইট্রেট অফ সোডা ১৩॥০ সের ... বেসিক স্থপারফস্ফেট ১৩॥০ সের ...	৭॥০	৬	৮	১০	১০
	বিঘা প্রতি উৎপন্ন ফসলের বৃদ্ধি।	২	২	৪॥০	৪।৫	৪॥০
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
	বিঘা প্রতি বর্দ্ধিত উৎপন্ন ফসলের দাম ...	৬৲	৬৲	১৩॥০	১৩৶০	১৩॥০
	বিঘা প্রতি সারের মূল্য	৪৲	৪৲	৪৲	৪৲	৪৲
	বিঘা প্রতি মোট লাভ ...	২৲	২৲	৯॥০	৯৶০	৯॥০
	নাইট্রেট অফ সোডা ও বেসিক স্থপারফস্ফেট ব্যবহারে প্রতি তিন বিঘায় লাভ ...	৬৲	৬৲	২৮॥০	২৭৶০	২৮॥০

বালি ব্রিজ।

বালিতে গঙ্গার উপর যে সুবৃহৎ পুল নির্ম্মিত হইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ঐ পুলের উপর দিয়া দুইটী রেলপথ যাইবে। তাহা ছাড়া গাড়ী ঘোড়া যাইবার রাস্তা ও লোক চলাচলের পথ ত আছেই।

নির্ম্মাণ কার্য্য বেশ দ্রুতগতিতেই চলিতেছে। আশাকরা যায় যে ১৯৩০ সালের শেষাশেষি পুল খোলা যাইতে পারিবে।

কলিকাতা সহরে বরফের কাটতি।

গ্রীষ্মকালে কলিকাতা সহরে বাস করা দায় হইয়া পড়ে। পিচের রাস্তা হইয়া আজকাল গরম আরও বাড়িয়াছে। গরম যত বাড়িতেছে বরফের কাটতিও সেই পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। শীতকালে কলিকাতা সহরে গড়ে দৈনিক ১০০০ মণ বরফ বিক্রয় হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দৈনিক বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৮০০০ মণে পরিণত হয়।

এই বরফের অধিকাংশই খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও মাছ ফলমূল প্রভৃতি টাটকা রাখিবার জন্য যে বরফ ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে।

বর্ণচোরা মাছ।

সমুদ্রে নানা প্রকারের অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রে এক প্রকারের মাছ আছে তাহারা পাখীর ন্যায় বাসা বাধিয়া ডিম পাড়ে। সমুদ্রের মধ্যে কোন কাঠি বা মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া আছে এমন অন্য কোন জিনিস পাইলে তাহারা উহার গায় ঘাস, পাতা এবং সমুদ্র উদ্ভিদের শিকড় প্রভৃতি দিয়া বাসা বাঁধিয়া লয় এবং তাহার মধ্যে ডিম পাড়িয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইহারা নাকি আবার বর্ণচোরা। শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ইহারা ইচ্ছামত আপনাদের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

টেলিফোন্ ও টেলিগ্রামের সংযোগ।

আজকাল ভারতবর্ষের প্রায় সকল সহর হইতেই অন্য সহরের লোকের সহিত টেলিফোন্ যোগে কথা কহা যায়। কিন্তু তথাপি এমন

অনেক স্থান রহিয়া গিয়াছে যেখানে টেলিফোনের সংযোগ নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট ফোনোগ্রাম পদ্ধতির প্রচলন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে টেলিফোন্ প্রথমে টেলিগ্রাফ আফিসে পাঠাইতে হইবে, টেলিগ্রাফ আফিস উহা সরাসরি যেখানে ফোন্ করিতে হইবে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী টেলিগ্রাফ আফিসে সংবাদ পাঠাইবে। তৎক্ষণাৎ সেখানকার আফিস হইতে ফোন্‌যোগে সংবাদটী যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। অবশ্য ইহাতে খরচ কিছু বেশী পড়িবে কিন্তু তাহা নামমাত্র। এই ধরণের টেলিগ্রামে সাধারণ টেলিগ্রাফ ফি অপেক্ষা দুই আনা বেশী দিতে হইবে।

বিলাতে ট্যাক্সের বহর।

পৃথিবীর মধ্যে মাথাপিছু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ট্যাক্স যোগাইতে হয় বিলাতের লোককে। আমেরিকার লোক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী। কিন্তু বিলাতের ট্যাক্সের বহর আমেরিকার চেয়েও বেশী। ১৯২৬ সালে বিলাতের লোককে গড়ে মাথাপিছু ১৫ পাউণ্ড ২ শিলিং ৮ পেন্স করিয়া রাজকর (বার্ষিক) দিতে হইয়াছিল। উহার মূল্য প্রায় ২১৩ টাকা ১১ আনা। ঐ বৎসর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ট্যাক্সের হার ছিল নিম্নলিখিত রূপ।

মাথা পিছু ট্যাক্সের হার

	পা	শি	পে
গ্রেটবৃটেন	১৫	২	৮
ফ্রান্স	৮	৫	১০
জার্ম্মাণী	৫	৬	৫
ইটালী	৩	৮	৯
আমেরিকা	৬	১	১১
	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
ক্যানাডা	৬	১৯	৪
অষ্ট্রেলিয়া	৯	১০	৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	১১	৭	২
নিউজিল্যাণ্ড	১৪	০	৯

কিন্তু চিরদিনই ট্যাক্সের বহর ওরূপ ছিল না। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে প্রত্যেক দেশকেই প্রচুর যুদ্ধ ঋণ করিতে হয়; এখন তাহা শোধ করিতে হইতেছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধে যে সকল লোক আহত হইয়াছিল তাহাদের ভাতা প্রভৃতি বাবদ প্রতিবৎসর বহুটাকা গভর্ণমেণ্টকে ব্যয় করিতে হয়। সেই ব্যয় সঙ্কুলান করিবার নিমিত্ত এইরূপ অধিক হারে করবৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে ট্যাক্সের বহর কিরূপ ছিল নিম্নে তাহা দেখান গেল।

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
গ্রেটবৃটেন	৩	১১	৪
ফ্রান্স	৩	৭	০
জার্ম্মাণী	১	১০	৮
ইটালী	২	২	৮
আমেরিকা	১	৭	১১

ক্যানাডা প্রভৃতি দেশেও ট্যাক্সের পরিমাণ বর্ত্তমানের অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ ছিল মাত্র।

এখানে একটী কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। উপরে যে ট্যাক্সের তালিকা দেওয়া হইল উহা direct ট্যাক্স মাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক লোককে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী কর ভার বহন করিতে হয়; কেননা সভ্য গভর্ণমেণ্টের indirect Tax এর আয় নিতান্ত অল্প নহে। নানারূপ পণ্যের উপর যে শুল্ক বসান হয়, গভর্ণমেণ্ট তাহা ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে

আদায় করেন বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই ট্যাক্স বহন করে সাধারণ প্রজাবৃন্দ।

সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নূতন গৃহের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান খাজা নাজিমুদ্দিন যে বিবরণী পাঠ করেন তাহাতে জানা যায় যে, ব্যাঙ্কটি ২০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ইহার মূলধন ছিল মাত্র ৬ হাজার টাকা। বর্ত্তমানে এই মূলধন ৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্ত একটি ভাণ্ডার আছে। নবাব আবদুল গণির আমানত টাকার সুদ হইতে এই সাহায্য ভাণ্ডার হইয়াছে। গরীব মুসলমান ছাত্রদিগকে ইহা হইতে সাহায্য করা হয়।

কাশীতে নূতন বায়স্কোপ কোম্পানী

এলায়েন্স পিকচারস্ কর্পোরেশন নাম দিয়া কুড়ি লক্ষ টাকা মূলধনে কাশীতে একটি নূতন বায়স্কোপ কোম্পানী রেজিষ্টারী হইয়াছে।

টিনের খনির ব্যবসায়

বর্ম্মার কনসলিডেটেড টিনমাইনস নামে একটি বৃহৎ কোম্পানী লণ্ডনে গড়া হইয়াছে। কোম্পানীর মূলধন ১০০০০০০ পাউণ্ড তাহাদের ডিরেক্টর হইয়াছেন সার সিসিল বাটলার। সার [illegible] ও সার নিউটন মুর। কোম্পানী [illegible] প্রদেশে বর্ম্মা কিন্তান ও মাইনিং কোম্পানীর [illegible] খনি ও অন্যান্য অনেক খনি [illegible]

বংশবাটী [illegible] কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বংশবাটীও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসিগণের মধ্যে একটী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোকের চেষ্টায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিষ্ট্রার উপরোক্ত নামে একটি ব্যাঙ্ক খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন।

ডেরাডুন সামরিক বিদ্যালয়

ভারতের জঙ্গীলাট ডেরাডুনের সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য যে দশজন ছাত্রকে এবার মনোনীত করিয়াছেন তাহার মধ্যে বাংলাদেশের একজনকেও নেওয়া হয় নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যাহাদিগকে মনোনীত করা হইয়াছে তাহাদের অনুপাত এইরূপ :—

মান্দ্রাজ	১
পাঞ্জাব	৪
ভূপাল	১
আজাইগড় দেশীয় রাজ্য	১
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	১
যুক্ত প্রদেশ	১
মধ্য প্রদেশ	১

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে এক বাঙ্গালা দেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সকল দেশ হইতেই ছাত্র মনোনয়ন করা হইয়াছে; অবশ্য সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্যে কোনও বাঙ্গালী ছাত্র প্রার্থী ছিলেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। যদি প্রার্থী কেহ না থাকিয়া থাকেন তবে বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। কারণ বিগত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল মাত্র এক বাংলাদেশ হইতেই বাঙ্গালীরা Bengalee Regiment

বাঙালী যুবক দিগকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল এবং জীবনে কখনও যুদ্ধ না দেখিয়াও মেসোপাটেমিয়ার রণক্ষেত্রে এই সকল যুবকেরা যেরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পাইলে বাঙ্গালীরাও যে রণ ক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিতে পারে তাহার প্রমাণ গত যুদ্ধের সময় দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সামরিক কলেজে ঢুকিবার জন্ত বাঙ্গালী যুবক কেহ চেষ্টা করিলেন না কেন, অথবা চেষ্টা করিয়া থাকিলে তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইল না কেন তাহা অনুসন্ধান করা উচিত।

আমাদের স্মরণ হয় পরলোকগত ডাক্তার এস্, কে, মল্লিকের চেষ্টায় বাঙ্গালী রেজিমেন্ট সম্বন্ধে একটী স্থায়ী কমিটী গঠিত হইয়াছিল; সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্র নাথ বসু এবং ডাক্তার দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এই কমিটির সভ্য ছিলেন। এ সম্বন্ধে ইহারা কিছু জানেন কি না, এবং বাঙ্গালী যুবক দিগকে সামরিক বিভালয়ে ভর্ত্তি করাইবার জন্ত তাঁহারা কোনও চেষ্টা করিয়া ছিলেন কিনা তাহা জানিবার জন্ত আমরা উৎসুক রহিলাম।

কলকারখানার প্রসার।

গ্রেট বৃটেনের ক্ষুদ্র বৃহৎ কলকারখানার যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ১৯২৭ সালে বৃহৎ কারখানার সংখ্যা ছিল ১৪৭৫০১টি। পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ১৪৫৪১১টি। আলোচ্যবর্ষে ক্ষুদ্র কারখানার সংখ্যা ছিল ১২১৮-৬১টি। ইহাতে দেখা যায় যে, বড় বড় কলকারখানার সংখ্যা যেমন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তেমনি হ্রাস পাইতেছে।

বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে বৃহৎ কলকারখানার সংখ্যা শতকরা ৪০টি করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতকরা ২৬টি করিয়া হ্রাস পাইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, ক্ষুদ্র মূলধনযুক্ত ছোট-খাটো শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রবল প্রতিযোগিতার দিনে হটিয়া যাইতেছে এবং বড় বড় কলকারখানার মালিকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিয়া ক্রমেই অধিকতর লাভবান হইতেছে।—

বাসের শব্দহীন নূতন এঞ্জিন।

লণ্ডন জেনারেল ওমনিবাস কোম্পানীর গবেষণাগারে এমন এঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে যে, বাস তাহার দ্বারা চালিত হইলে কোনরূপ শব্দ শুনা যাইবে না। শীঘ্রই লণ্ডনের রাজপথে সেরূপ বাস দেখা যাইবে। একশত অশ্বশক্তিযুক্ত নূতন এঞ্জিন খুব দ্রুতবেগে পথ দিয়া যাইলেও কোনরূপ শব্দ হইবে না। যদি ঐ পরীক্ষা সাফল্য মণ্ডিত হয়, তবে সকল বাসেই ঐরূপ এঞ্জিন জুড়িয়া দেওয়া হইবে। ছোট ছোট মোটর বাসের জন্তও ঐরূপ এঞ্জিন আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে।

বাংলার স্ত্রীলোক অপরাধী।

ইং ১৯২৭ সালের বাংলার দণ্ডিত অপরাধীদের সংখ্যা বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, ঐ বর্ষে মোট ৪৮২ জন স্ত্রীলোক দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৪২০, এবার বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮২ জন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ২১৭, মুসলমান [illegible], [illegible], এবং অন্যান্ত জাতির ১০[illegible] [illegible] ১০

বৎসরের নীচে, ১০ জনের বয়স ১৬ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে, ২৮ জন ১৯ হইতে ২১ বৎসরের, ২১৬ জন ২২ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে, ১২৯ জন ৩১ হইতে ৪০ বৎসরের, এবং ৯৩ জনের বয়স ৪০ এর উপর। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২২ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যেই অপরাধ-প্রবণতা সব চেয়ে বেশী।

পেন্সিলে বিষ।

পেন্সিলের চলন খুবই বেশী। উহার মধ্যে 'কপিং' পেন্সিলই ছেলে মেয়েরা বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। কারণ উহা হইতে সুন্দর বেগুণে রঙের লেখা বাহির হয়। কিন্তু এই পেন্সিল বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার না করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে। এই শ্রেণীর অনেক পেন্সিলের সীসে এক রকম রং ব্যবহার করা হয়, যাহা রক্তের সংস্পর্শে আসিলে মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা। কোন ব্যক্তিকে শরীরের কোন স্থানে পেন্সিলের সীস ঢুকিয়া ভাঙ্গিয়া থাকিলে এমন কি কেবল মাত্র ফুটিয়া গেলেও সেখানকার তন্তুগুলির ভিতরে প্রথমে বেগুনি রং সঞ্চারিত হইয়া যায়। তার ফলে শরীর বিষাক্ত হইয়া মানুষ অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পড়িতে পারে। এ কারণে খুব সাবধানতার সহিত এই পেন্সিল ব্যবহার করা আবশ্যক। আর ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে এই পেন্সিল কখন দেওয়া উচিত নয়। তাহারা যাহাতে কোন প্রকার পেন্সিলের সীস মুখে না দেয়, সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

বঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যু।

গত ১৯২৭ সালে বঙ্গে ৪,৮৮৩ পুরুষ, ৪,৯১৪ স্ত্রী লোক ও ৭,৯৫৫ শিশু. মোট ১৭,৭৫২ জনের অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে আত্মহত্যায় ৩,২৫৭, জলে ডুবিয়া ৮,২০৬, সর্পাঘাতে ৩,৭০৯, বন্যপশু দ্বারা ১৪৭, অট্টালিকা হইতে পতনে ২৪০, এবং অন্যান্য কারণে ২,১২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। দেশের এই অস্বাভাবিক মৃত্যু-হার দেখিয়া সত্যই শরীর শিহরিয়া উঠে; ইহার পর ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ওলাউঠা, ইত্যাদি ত আছেই।

বায়োস্কোপ বাতিকের পরিণাম।

ব্রজেন্দ্রনাথ দুবাই নামক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্র ঘন ঘন বায়োস্কোপে যাইবার ফলে কিরূপে চুরি বিদ্যায় প্রবৃত্ত হয় তাহার অদ্ভুত কাহিনী সে আদালতে বর্ণনা করিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, যুবকটি চক্ষু ঢাকিয়া রেশম এবং ঘড়ির দোকানে যাইয়া ধারে জিনিষ কিনিত। জামিন স্বরূপ তাহার সাইকেল রাখিয়া যাইত। কিন্তু আর ফিরিত না।

আসামী কাঁদিতে কাঁদিতে আদালতে সকল দোষ স্বীকার করিয়া বলে যে, সে ছয়টি স্থানে চুরি করিয়াছে। সে নিয়মিত বায়োস্কোপে যাইত, এবং সেখানেই সে চুরি বিদ্যার এই নূতন পন্থা শিক্ষা করে।

ময়মনসিং সহরের অনেক ছাত্রও এইরূপ দুর্মতিপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার গতাস্তর [illegible] বায়স্কোপ নহে, থিয়েটার। প্রকাশ যে কালিকাদের কোনও [illegible] থিয়েটার [illegible]

যাইয়া কিছুকাল ধরিয়া থিয়েটার দেখাইতেছিল; হাজারী থিয়েটারের নেশায় এমনি মাতিয়া ওঠে যে থিয়েটারের টিকিট কিনিতে হাতের সমস্ত সম্বল খোয়াইয়া ফেলে এবং শেষে বাড়ী হইতে টাকা চুরী করিয়া আসিয়া থিয়েটার দেখার সখ মিটাইতে আরম্ভ করে এবং কোনও বেশ্যার মোহে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়।

পাপের আকর্ষণ এমনি প্রবল এবং পাপপথ এমনি পিচ্ছিল যে একবার এই পথে পা দিলে আর রক্ষা নাই। এই জন্যই সাধুরা বলিয়াছেন যে পাপ প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে; আর ছাত্রজীবনেরত কথাই নাই। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা। যাহারা এই মহাজনবাক্য অবহেলা করিয়া ছাত্রজীবন অসার আমোদ আহ্লাদে যাপন করে, পরিণামে তাহাদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইলে ছাত্রজীবনে সংযমী হইয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়; তরলমতি যুবকেরা এ বয়সে আপনার হিতাহিত ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, তাই অভিভাবকদিগের এই সময় সতর্ক থাকিতে হয়, নচেৎ শেষে বুক চাপড়াইলে কোন লাভ নাই।

সৎ দৃষ্টান্ত।

স্বনাম প্রসিদ্ধ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মহোদয় তাঁহার স্বগ্রাম ২৪প পরগণার অন্তর্গত [illegible] উন্নতি সাধনা [illegible] অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। [illegible] ইংরাজী বিদ্যালয় [illegible] অবৈতনিক প্রাই মারি বিদ্যালয় করিয়া দিয়াছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য জেলাবোর্ডের হস্তে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়াছেন। প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রামে যাইবার জন্য একটী পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে তিনটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বি এ পর্য্যন্ত পড়িবার জন্য অনেক ছাত্রকে তিনি খরচ দিয়াছেন। আজকাল পয়সা হইলে যাহারা সহরে গিয়া নানারকম বিলাস বিভোগে জলের মত টাকা উড়ান তাঁহারা স্যার রাজেন্দ্রের কথা স্মরণ করুন। পল্লীর উন্নতি হইতে বেশী দেরী হয় না যদি দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই রকম দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন।

নারী জগত।

বিদুষী মহিলা চিকিৎসক।—শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চৌধুরীর তৃতীয়া কন্যা দিল্লীর লেডিহার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ হইতে এম, বি, বি, এস-সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনিই আমাদের সর্ব্ব প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট চিকিৎসক। আসাম গভর্ণমেণ্ট শিক্ষালাভের জন্য কিছুতেই ইহাকে বৃত্তি দিতে রাজী হন নাই।

শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশান বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধা বরিশালের অবসর প্রাপ্ত প্রফেসার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষের কন্যা। তাঁহার আগে আর কোন মহিলা ঈশান বৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কুমারী শান্তি মিশ্রগণিতে এম, এ, পড়িবেন।

ডায়োসিসান কলেজের কুমারী [illegible] বি এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া-

ছেন। লীলা রায় অধ্যক্ষ সারদারঞ্জনের কন্যা। বেথুন কলেজের কুমারী সুধা মিত্র বি, এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হইয়াছেন।

ত্রিবান্দামের শ্রীমতী আনা চণ্ডী বি এল এর ফাইনাল পরীক্ষায় সম্মানের সহিত পাশ করিয়াছেন। তাঁহার আগে ত্রিবান্দামের আর কোন নারী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই।

শ্রীমতী কল্যাণিকুট্টি অম্মল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় ইতিহাসে ও অর্থনীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া টঙহান্টার পুরস্কার ও আম্মারা গার পাদক পাইয়াছেন।

বোম্বাই ইউনিভারসিটির দ্বিতীয় কৃষি পরীক্ষায় পুণার শ্রীমতী রাজুল ওজর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বিমাণ পরিচালনায় ভারতীয় ছাত্রের নৈপুণ্য।

ডি হ্যাভিলাণ্ড ফ্লাইং স্কুলে যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছে। জানা গেল যে, ইহাদের মধ্যে তিন জন ইতি মধ্যেই "এ" শ্রেণীর সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিমান বিভাগের ভাইস মার্শাস স্যার সেপ্‌টন বেকার ইহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন; তিনি ইহাদের বিবর অবগত হইয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিমান বিদ্যা যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে,কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতীয় ছাত্রগণ বিমানপোত চালনা করিতে পারিবে।

[illegible] দলের মধ্যে মিঃ কাভালীর [illegible] [illegible] হইতেছে। তিনিই [illegible] হইতে ভারতে একখানি Mono[illegible] করিয়া আগমন করিতেছেন। করাচীতে আসিয়া তিনি ভারতের মাটিতে পদার্পন করিবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইতেছে এবং ভারতের সকল নরনারী আজ করাচীর দিকে চাহিয়া আছে। ভারতীয় বিমানবীরের এই প্রথম উদ্যম ভগবান জয়যুক্ত করুন।

গোশালা প্রতিষ্ঠা।

গত ২রা ফাল্গুন সরস্বতী পূজার দিবস কালনার মহাকুল শ্রীযুক্ত রাম দেও তেওয়ারীর উদ্যোগে কালনার অপর পারে গঙ্গার চরের উপর প্রায় ১০০ শত বিঘা জমির উপর গোশালা প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তেওয়ারীজী উক্ত ১০০ শত বিঘা জমি গোশালার উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন। ইতি মধ্যেই গোশালায় কয়েটী গরুকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখানেও যে পিঞ্জরাপোলের ন্যায় বৃদ্ধ গো মহিষদিগকে স্থান দেওয়া হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ঐ দিন কাল্নার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। তেওয়ারীজী উপস্থিত ইতর ভদ্র সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণে ও আদর আপ্যায়নে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যাহা হউক এতদিন পরে কালনার একটী বহুকালের অভাব দূরীভূত হইতে চলিল।

মাড়োয়ারীরা ব্যবসায়ে যেমন অজস্র অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন তেমনি ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্রে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা এবং গোরক্ষার জন্যে গোশালাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন; বাংলার অনেক জমিদার আছেন যাঁহাদের বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকার উপর। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে গোজাতির এবং কৃষির উন্নতি [illegible] গোশালাদি স্থাপন করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের [illegible] অর্থই বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে [illegible] বায় সুতরাং গরোপ[illegible] কোথা [illegible]?

চায়ের চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

যে কোন জমিতেই চা গাছ জন্মাতে পারে; কিন্তু যে কোন জমিতেই চা গাছ রোপন করে যে লাভবান হওয়া যাবে তা নয়। কাজেই চা-চাষের পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম কাজ হ'ল জমি নির্ব্বাচন করা।

জমির উর্ব্বরতা নির্ভর করে সাধারণতঃ দুটা জিনিসের উপর—এক আবহাওয়া ও বাহ্যিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা Physical condition আর এক সেই স্থানের মাটির রাসায়নিক গঠন বা Chemical composition. কাজেই শুধু কোন স্থানের মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেই বলে দেওয়া যায় না সে স্থান উর্ব্বর কি না। হয়ত কোন জায়গার ইটের মত শক্ত আটাল মাটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সার পদার্থ রয়েছে এবং আর এক জায়গার বালি মাটিতে সারের মাত্রা খুব কম তথাপি পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঐ শক্ত আটাল মাটি অপেক্ষা নরম বালি মাটিতেই চায়ের চাষ ভাল হয়।

অবশ্য চা চাষ কর্ব্বার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র হ'ল সেই স্থান যে [illegible] বালি আঁশ এবং সহজেই চূর্ণ [illegible] যেতে পারে। অন্য মাটিতে চা চাষ [illegible] প্রয়োগ করে [illegible] প [illegible] ফেলা উচিত। কেউ কেউ (bheel) বীল্ মাটিতে চা বাগিচা স্থাপন কর্ব্বার পক্ষপাতী। তাঁদের এ পক্ষপাতের কারণ হচ্ছে—বীল্ মাটিতে চা চাষ করে' যত বেশী চা পাওয়া যায় এমন আর কোন মাটিতেই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বীল্ মাটির একটা মারাত্মক দোষ রয়েছে। বীল্ মাটিতে যে গাছ জন্মায় তাতে পরিমাণে খুব বেশী চা উৎপন্ন হলেও উৎকর্ষতার দিক দিয়ে চা খুবই খারাপ হয়। দ্বিতীয়তঃ অনেকে সন্দেহ করেন বীল্ মাটির উৎপাদিকা শক্তি খুব অধিক দিন স্থায়ী নয় এবং একবার সে শক্তি কমে গেলে হাজার হাজার মন সার নিক্ষেপ করে'ও তা পুনর্ব্বার ফিরে আস্‌বে না। অবশ্য একথার সত্যতা আজিও প্রমাণিত হয়নি—কেন না অধিকাংশ বীল মাটির বাগিচাই নূতন।

যাহা হউক্ বীল মাটি সম্বন্ধে ঐ ধরণের একটু আধটু সন্দেহ থাক্‌লেও বালি আঁশ মাটির উপযোগীতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই কারুর মনে স্থান পায় না। চা চাষ বালি আঁশ মাটিতে যে ভাল হয় একথা আজ সর্ব্ববাদী সম্মত। বালি আঁশ মাটির প্রথম এবং প্রধান গুণ এই যে ঐ স্থানের গাছের উৎপন্ন চা খুব উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়তঃ বালি আঁশ মাটির উৎপাদিকা শক্তি কমে এলে ও সার সংযোগে তাঁর

লুপ্তশক্তিকে পুনর্ব্বার ফিরিয়ে দেওয়া যায়; কাজেই বহুদিন ধরে চাষ করেও বাগানের উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ কমে যায় না।

(৫)

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি জমির উৎপাদিকা শক্তি একটামাত্র জিনিসের উপর নির্ভর করে না। নানা অবস্থার সমাবেশে এবং নানা পদার্থের অস্তিত্বে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়—আবার তাদের অভাব হলেই ঐ শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। ঠিক কোন্ কোন্ জিনিসের উপর ঐ উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর কচ্ছে—এবং কত পরিমাণে নির্ভর কচ্ছে তা জানবার জন্যে বহুদিন থেকেই বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ পরীক্ষা কার্য্য চালাচ্ছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হলেও আংশিক ভাবে যে সিদ্ধ হয়েছে সে কথা আজ জগতের প্রত্যেক শিক্ষিত কৃষকই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কর্ব্বেন।

ভূমির উর্ব্বরতা যে সমস্ত জিনিসের উপর নির্ভর করে তাদের মোটামুটী দুটা ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—এক যার উপর মানুষের সম্পূর্ণ হাত নেই যথা রৌদ্র, বৃষ্টি ইত্যাদি; আর এক যার উপর মানুষের সম্পূর্ণ হাত আছে যেমন ফস্ফরাস্, পটাশ, চূর্ণ প্রভৃতি কোন একটা বা দুইটা সার পদার্থের অল্পতা বা আধিক্য।

যদি কোন স্থানে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় মানুষ হাত দিয়ে তাকে রোধ কর্ত্তে পারে না—যদিও ভাল ড্রেণের ব্যবস্থা করে সে সমস্ত জল বের করে দিতে পারে। সেই রকম অনাবৃষ্টি হলে ও মানুষ জোর করে বৃষ্টিপাত করাতে পারে না। বড় জোর কূপ খনন করে বা অন্য উপায়ে বাগানের জলের অভাব সে মিটিয়ে দিতে পারে। তাই কার্য্যতঃ ঐ সমস্ত জিনিসের ওপর মানুষের সম্পূর্ণ হাত নেই। কিন্তু যদি কোন জমিতে চুণের মাত্রা একটু কম থাকে বা ফস্ফরাসের মাত্রা অল্প হয় তা হলে চুণ বা ফস্ফরাস সংযোগে মাটির পূর্ণশক্তি ফিরিয়ে আনা মানুষের দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই সাধ্য।

আবার ধরুণ মাটির texture বা গঠন। যে মাটির texture ভাল নয় মানুষ তার texture ভাল করে তুলতে পারে কর্ষণের দ্বারা, এবং সার প্রয়োগের দ্বারা। যেমন এটেল মাটিতে চুণ প্রয়োগ কর্লে সাধারণতঃ তার texture ভাল হয়ে উঠে।

জমির উৎপাদিকা শক্তি কতকপরিমাণে আরও একটা জিনিসের ওপর নির্ভর করে সেটা হয়ত অনেকেই জানেন না। আমি ভূমধ্যস্থিত জীবাণুপুঞ্জ Bacteriaর কথাই বলছি। বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পেয়েছেন যে মাটির মধ্যে হাজার হাজার রকমের জীবাণু বাস কচ্ছে। এদের মধ্যে দুরকমের জীবাণু আমাদের খুব কাজে লাগে কেননা তাদের অবস্থিতিতে জমি দিন দিন সারবান্ হয়ে ওঠে। এক জাতীয় জীবাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন্ টেনে নিয়ে বৃক্ষলতাকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন্জনিত খাদ্য সরবরাহ করে; আর এক জাতীয় জীবাণু জৈব পদার্থ থেকে যবক্ষার সম্পর্কীয় দ্রব্য বিচ্ছিন্ন ক'রে নাইট্রেট উৎপাদনে সহায়তা করে।

উপরোক্ত দুই প্রকারের জীবাণুর মধ্যে একদল ধনচে এবং শিম্বী জাতীয় গাছের শিকড়ের গাঁটে বাস করে এবং আর একদল বাস করে মাটির মধ্যে। এই শেষোক্ত দলকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক যারা জৈব পদার্থের সঙ্গে মিলন ক'রে এমোনিয়া লবণ বা Salt of Ammonia উৎপন্ন করে, আর এক যবক্ষার [illegible] জীবাণু যারা ঐ এমোনিয়া

কম্পাউণ্ডকে নাইট্রেটে পরিণত করে।' কিন্তু কোন রকম একটা basic metal না থাকলে নাইট্রেট উৎপন্ন করা যায় না—কাজেই মাটিতে চুণ, পটাশ, ম্যাগনিশিয়া, বা সোডার মত কোন basic পদার্থের অবস্থিতি একান্তই বাঞ্ছনীয়। তবে আমার মনে হয় ঐ কটা দ্রব্যের মধ্যে চুণের প্রয়োজনীয়তাই সকলের চেয়ে বেশী।

সাধারণতঃ কর্ষিত অকর্ষিত প্রায় সকল মাটিতেই অল্পাধিক পরিমাণে এসিড (Acid) বর্ত্তমান। এই এসিডের আতিশয্য জমিতে, নাইট্রেট উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কাজেই চাষীর সর্ব্বদাই চেষ্টা করা উচিত যাতে ভূমির এসিডের পরিমাণ দিন দিন কমে যায়। কিন্তু মাটিতে খুব অল্প পরিমাণে এসিড থাকাও যে অবাঞ্ছনীয় তা নয় কেননা ঐ সামান্য এসিড থাকায় গাছ পালার মাটি থেকে খনিজ পদার্থ সমূহ টেনে নেবার সুবিধা হয়।

নাইট্রেট উৎপাদক জীবাণুগুলির অক্সিজেনের অভাব হ'লে নাইট্রেট উৎপন্ন কর্ত্তে পারে না। কাজেই নাইট্রেটের প্রয়োজন আছে এমন জমির খুব ভাল রকম জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ঘন ঘন কর্ষন করে সেই জমির ভিতরের মাটীকেও উত্তমরূপে বাতাস খাওয়ান উচিত। কিন্তু বাগানে যদি ভালরকম ড্রেণের ব্যবস্থা না থাকে এবং জমিতে জল বসে তাহলে অক্সিজেনের অভাবে নাইট্রেট সমূহ বিশ্লিষ্ট হয়ে সমস্ত নাইট্রোজন বেরিয়ে যায় এবং তাতে মাটী দিনকে দিন অনুর্ব্বর হয়ে পড়ে।

বহুদিনের পরীক্ষার পর এই সেদিন বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে মাটিকে উত্তপ্ত করে কিম্বা Toluene, Phenol প্রভৃতি ব্যবহারের দ্বারা মাটির ক্ষতিকারক-জীবাণুগুলিকে ধ্বংস কর্ত্তে পারলে মাটির উৎপাদিকা শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। মাটির মধ্যে এমন অসংখ্য প্রকারের জীবাণু রয়েছে যারা নাইট্রোজেন গ্রাহী বা নাইট্রেট উৎপাদক জীবাণু ভক্ষণ করেই কলেবর পুষ্ট করে। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা তাদের ধ্বংস কর্ত্তে পারলে নাইট্রেট উৎপাদক জীবাণুগুলি অবাধে বংশবৃদ্ধি কর্ত্তে থাকে এবং তাতে জমির উর্ব্বরতা বেড়ে যায়।

কিছুদিন হ'ল একদল বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করেছেন যে সকল বৃক্ষলতার মূলের মধ্যদিয়েই এক জাতীয় বিষাক্ত জৈব পদার্থ নিঃসৃত হয় এবং সাধারণতঃ এই বিষাক্ত জৈব পদার্থের আবির্ভাবের ফলেই সেই স্থানের ভূমি অনুর্ব্বর হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা ঐ সমস্ত বৈজ্ঞানিকের মতকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে রাজী নই। কেননা তাঁহাদের মধ্যে কেহই আজ ও তাঁদের মতটা যে অভ্রান্ত তা অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণ কর্ত্তে পারেন নি।

(৫)

জমি কর্ষণ করা যে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায় একথা আজ কাউকে নতুন করে বলতে যাওয়া আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর মাটি চষেই জীবিকা নির্ব্বাহ কর্চ্ছে। একজন নিরক্ষর অজ্ঞ চাষা যে সেও জানে অকর্ষিত ভূমির চেয়ে কর্ষিত ভূমিতে ঢের বেশী ফসল পাওয়া যায়। ভূমি কর্ষন কর্ব্বার উদ্দেশ্য মাটিকে আলগা করে ফেলা, এবং ভিতরে বাতাস এবং জল প্রবেশ কর্ত্তে দেওয়া। একখণ্ড জমি বহুদিন অকর্ষিত পড়ে থাকলে তার মাটি এমন শক্ত হয়ে যায় যে কচি কচি গাছের চারা গুলি তাদের নরম শিকড় সমূহ তার ভিতর অবাধে চালিয়ে দিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ভিতরের মাটি নিরস ও শক্ত হওয়ায় গাছের পক্ষে কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ মাটির মধ্যে বাতাস তথা অক্সিজেন প্রবেশ কর্ত্তে না পারায় নাইট্রেট উৎপন্ন হতে পারে না, ফলে জমি ক্রমশঃই তার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়া ফেলে। ভূমি কর্ষণের আর একটা উদ্দেশ্য হ'ল জমিতে যে সার প্রয়োগ করা হয় মাটির সঙ্গে সেগুলিকে ভাল ক'রে মিশিয়ে দেওয়া। কাজেই চাষ ক'রে লাভবান হতে হ'লে প্রত্যেক চাষের জমিই বার বার উত্তম রূপে কর্ষণ করে ফেলা উচিত।

বর্ষাকালই ভূমিকর্ষণ কর্ব্বার উপযুক্ত সময়। এই সময় অজস্র বারিপাতে এবং চায়ের পাতা সংগ্রহকারী কুলিদের পায়ের চাপে প্রায়ই বাগানের মাটি বসে যায় ও চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে; এই জন্য সমস্ত চা বাগিচাতেই বর্ষাঋতুতে জমিতে চাষ দেওয়া হয়।

পাহাড়ের ওপর উঁচু টিলাতে যে সমস্ত বাগান অবস্থিত বর্ষাকালে সে সমস্ত বাগানের আগাছা সমূহ একেবারে গোড়া থেকেই নিড়িয়ে তুলে দেওয়া নিতান্ত বুদ্ধিমানের কাজ নয়; কেননা তাতে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলে সমস্ত মাটি ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা। এই জন্যই, সাধারণতঃ ঐ ধরণের বাগান সমূহে আগাছগুলি নিড়িয়ে না ফেলে তাদের আগাগুলা এমন করে ছিটে দেওয়া হয় য'তে না তারা বেশী বেড়ে উঠতে পারে।

চা বাগানে শীতকালেও যে চাষ দেওয়া হয় না—তা নয়। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না সত্য কিন্তু তখনও চাষ দেওয়ার উদ্দেশ্য সেই একই—মাটিকে সরস রাখা এবং মাটির মধ্যে রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশ কর্ব্বার সুযোগ দেওয়া। বর্ষাকালে চাষ দেওয়ার সময় বেশী গভীর করে মৃত্তিকা খনন করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শীতকালে বেশ গভীর করেই মাটি খুঁড়ে ফেলা উচিত। চা-বাগানে কী ভাবে ভূমি কর্ষণ কর্ত্তে হয় তা নিম্নে বিবৃত করা গেল।

সমস্ত চা বাগিচাতেই সার বন্দী ক'রে চাগাছের ঝোপ বসান হয়। এই রকম প্রত্যেক দুই সারের মাঝখান দিয়ে এক একটা সরু অথচ লম্বা জুলী কাট্‌তে হয়। অবস্থা অনুসারে জুলী গুলিকে আঠার ইঞ্চি থেকে চব্বিশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর ক'রে খুঁড়া যেতে পারে। তারপর এই সমস্ত খাল বা খাদগুলি গোবর, নীল মাটি, গাছ, পাতা, জঞ্জাল প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ করে ফেলতে হবে। ঐ সমস্ত গাছ পাতার উপর বেসিক্ স্লাগ্ (basic slag) ছিটিয়ে দিয়েও অনেক সময় বেশ সুফল পাওয়া গেছে। স্লাগের মধ্যস্থিত চূর্ণ ঐ সমস্ত লতাপাতা-গুলির পচন ক্রিয়ায় সহায়তা করে। যাহা হউক যাঁরা উপরোক্ত মতে 'সার' প্রয়োগ কর্ব্বেন তাঁদের নাইট্রোজেন ও পটাশ সম্পর্কীয় সার ও ব্যবহার করা উচিত; কেননা তা না হলে বেসিক্ স্লাগের মধ্যে যে ফস্‌ফরিক্ এসিড্ আছে তার সমস্ত সুফল পাওয়া যাবে না।

আজকাল কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ নূতন ধরণে চাষ করা হচ্ছে। মাটির ৩।৪ ফুট নীচে সামান্য পরিমাণ ডিনামাইট্ রেখে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাতে অনেকখানি যায়গার মাটি সম্পূর্ণরূপে ওলট পালট হয়ে যায় এবং কস্মিন কালেও তা পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পায় না। খুব শক্ত এবং এটেল মাটিতেই ডিনামাইটের সাহায্যে চাষ করা হয়। কিন্তু খুব প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হ'লে ঐ পদ্ধতি যে কতদূর কার্য্যকরী হবে তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না।

লাক্ষার চাষ ও শেল্যাক প্রস্তুত প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত বিষয়ের পর)

কাপড়ের থলিতে রাখা—হরিতালের সহিত চৌরি মিশাইয়া মোটা মার্কিণ কাপড়ে প্রস্তুত থলির ভিতর তাহা পুরিতে হয়। দৈর্ঘ্যে সেই কাপড় সাধারণতঃ ১৩। গজ এবং প্রস্থে ২" ইঞ্চি হওয়া দরকার এবং তাহাতে যেন ২০ সের চৌরী ধরিতে পারে। উৎকৃষ্ট রকমের সেলাক উৎপন্ন করিতে গেলে যেন খুব খাপি বোনা কাপড় ব্যবহার করা হয়; তাহা হইলে যদিও কোন ধুলা বালি থাকে তাহা আর সেলাকে থাকিতে পারিবে না। এই কার্য্যে কখনও কখনও একটা ব্যাগের ভিতর আর একটা ব্যাগ পুরিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। একটা পুরাতন ব্যাগের মধ্যে একটি নতুন ব্যাগ পুরিয়া দিলেই চলে। একটি ব্যাগ সেলাই করিয়া ৫।৬ বার ব্যবহার করা যাইতে পারে। চৌরী ব্যাগের মধ্যে "ভর্ণা" নামক একটা লোহার নল বা চোঙ দ্বারা চালিয়া দেওয়া হয়। ইহা অতি যত্নের সহিত ব্যাগে পুরিতে হয়। যখন উৎকৃষ্ট জাতীয় ফসল হইতে উৎপন্ন লাক্ষা (Grain lac) গালাইতে হয়, তখন ব্যাগ খুব কাণায় কাণায় ভর্ত্তি করিয়া পূর্ণ করিতে হয়। যখন নিকৃষ্ট জাতীয় অথবা পুরাতন লাক্ষা গালাইতে হয়, তখন ব্যাগের মধ্যে কিছু স্থান খালি রাখিতে হয়; তাহা হইলে যাহা গলে না এমন সমস্ত লাক্ষা থাকিতে পারিবে। যদি গালাইবার সময় এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে বড় বড় আত লাক্ষা বাহির করিবার জন্য ব্যাগের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়।

গালাইবার প্রণালী—কাপড়ের থলিতে যে চৌরী থাকে তাহা গালাইতে গেলে বিশেষ দক্ষতা ও সাবধানতার প্রয়োজন। তিন জন লোককে এজন্য প্রত্যেক উনানে কাজ করিতে হয়। এই সমস্ত লোকের প্রত্যেকের কার্য্য তালিকা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া থাকে। ইহাদের নেতাকে "কারিগর" বলে এবং সে অন্য দুইজনকে চালাইয়া লয়। এই তিনজন লোক একত্রে চুক্তি হিসাবে মজুরি পায়। চুক্তি থাকে যে প্রত্যেক মণ সেলাকে তাহারা একটা মজুরি পাইবে এবং সেই মজুরি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবে, এবং প্রত্যেকে যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইবে সেইরূপ ভাবে সে মজুরি লইবে। সেই সর্ত্তের ফলে "কারিগর" অন্য দুইজনের চেয়ে অধিক দক্ষ লোক বলিয়া শত করা ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে মজুরি পায় এবং বাকী টাকা যথাক্রমে শত করা ৩৪ ও ১৬ টাকা হিসাবে "বেলু-

ইয়া" ও "ফেকইয়ার" মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, কারিগর উনানের ধারে বসে এবং থলির ভিতর যে লাক্ষা থাকে তাহা আংগুনে ঘন ঘন ধরিয়া গালায়। যাহাতে লাক্ষা পুড়িয়া না যায় কিম্বা অল্প উত্তপ্ত হয় সেইদিকে তাহার সতর্ক দৃষ্টি থাকে; "ফেকইয়া" ব্যাগের অন্য ধারে বসে এবং যাহাতে সব দিকটা সমান ভাবে উত্তপ্ত হয়, সেজন্য সর্ব্বদা ঘুরাইতে থাকে। আর "বেলুইয়া" কারিগরের নিকট হইতে এক তাল দ্রবীভূত লাক্ষা লইয়া একটা পাতলা চাদরে তাহা ছড়াইয়া দেয়। এক্ষণে উনান ও লাক্ষা গলান ব্যাপারে যে যে যন্ত্রের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে বর্ণনা করা যাই-তেছে এবং এই তিন জনের কি কি কাজ করনীয় তাহা বিস্তারিত ভাবে বলা যাইতেছে।

উনান বা ভাটা—ভাটার মানে কাদার নির্ম্মিত একটী খিলান এবং তাহার তলায় অগ্নি রাখিবার একটী আধার থাকে। ইহাকেই চলিত কথায় "ভাটা" বলে। যে মাটিতে আদৌ বালুকা নাই অথবা সামান্য বালি থাকে সেইরূপ মাটী দিয়াই ভাটা তৈয়ারী করিতে হয়। যাহাতে মাটি শুষ্ক অথবা উত্তপ্ত হইলে ফাটিয়া না যায়, সে জন্য মাটীর সহিত ধানের তুষ মিশ্রিত করা হয়। যদি তুষ না পাওয়া যায়, তৃণ অথবা ঘাস মিশ্রিত করি-লেই চলে। খিলানের আকার অর্দ্ধ বৃত্তাকার হয় এবং ইহার দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ও উচ্চতা ২ ফুট করিতে হয়।

ভাটা প্রস্তুত করিতে গেলে প্রথমে ইট দিয়া একটি অর্দ্ধ বৃত্তাকার খিলান প্রস্তুত করিয়া তাহা কাদা দিয়া আটিতে হয়। তারপর কাদা শুকাইয়া গেলে ইটগুলি সরাইয়া লইলেই ভাটা প্রস্তুত হয়। ইট দ্বারা প্রস্তুত বাহিরের খিলানের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ভাটার ভিতরকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ হয়। ইটের খিলা-নের ভিতরকার ফাঁপা স্থান একটী পাঁচ ইঞ্চি পরিমিত ইটের প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করিতে হয়। যে দিকটা বন্ধ থাকে, সেই দিকটাই ভাটার পশ্চাৎ দিক। কাদা দিয়া যে খিলান তৈয়ারী হয়, তাহার পুরু মাথায় ৮ ইঞ্চি হওয়া দরকার এবং কোণও পশ্চাৎদিকে ইহা আরও পুরু হয়। যাহাতে ভাটা অতিরিক্ত উত্তপ্ত না হয় সেজন্য কাদা দ্বারা খিলান তৈয়ারী করার দরকার।

কাদা দ্বারা তৈয়ারী খিলানের সম্মুখ ভাগ একটী টুপীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট দণ্ডের উপর অবস্থিত থাকে, সেই দণ্ডটী চূড়া পর্য্যন্ত ১০ ইঞ্চি বিস্তৃত হইয়া কোণের দিকে একটু একটু করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চি কাদায় গাথিয়া এই দণ্ড (Projection) তৈয়ারী করা হয়। এইরূপ দণ্ড থাকায় উনানের উত্তাপ সোজাসুজি উপরের দিকে উঠিতে পারে না। এইরূপ দণ্ড (Projection) থাকায় আংশিক-ভাবে দ্রাবীভূত লাক্ষা উত্তপ্ত করিবার সহায়তা হয়।

উপরের কাদার খিলান আংশিক ভাবে শুষ্ক হইলে নীচেকার খিলানের ইট সকল সাবধানতার সহিত সরাইয়া লওয়া হয়। কেবল পশ্চাৎ দিকের ইটগুলি সরান হয় না। ইট সরানর পরে কেবল মাত্র কাদার খিলান থাকে এবং সেই কাদার খিলানকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করা হয়। কখন কখন যদি অল্প সময়ের মধ্যে ভাটা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে ইটের খিলানের মধ্যে অল্প পরিমাণ আগুন জ্বালান হয়, সেই আগুনের উত্তাপে ভাটা তাড়াতাড়ি কার্য্যোপযোগী হয়।

ভাটার সম্মুখে কোন লোক দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার দক্ষিণ হস্তের দিকে যে অংশটা থাকে, তাহাকে ভাটার বাম পার্শ্ব বলে। খিলানের মধ্যে

যতটুকু ফাঁক থাকে, সেই ফাঁকের মধ্যে কাঠার উপর কাঠার আগুণ জ্বালান হয়। কোণ হইতে কেন্দ্র স্থল পর্য্যন্ত আগুণের আধার ক্রমশঃ চালু ভাবে আসে। কাঠ কয়লার আগুণ করা হয় এবং কারিগর তাহা একটি লম্বা "কোল চুলা" দিয়া মুহুর্ম্মুহু খোঁচাইয়া দেয়। একটী হালকা বাঁশের মাথায় লোহার ফলক যোগ করিয়া শাবলের মত আকারে এই "কোলচুলা" তৈয়ারী করা হয়। দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ৬ ফুট হয়।

ভাটা, ডোঙ্গীপাথর ও সালামী-পাথর—"ডোঙ্গীপাথর" ও "সালামীপাথর" নামে দুইখানা পাতলা পাথর ভাটার সম্মুখে স্থাপন করা হয়। ইহাদের মধ্যে ডোঙ্গী পাথর আকারে বড়, সাধারণতঃ ইহা তিন ফুট লম্বা এক ১—১৷৷ ফুট চওড়া হইয়া থাকে এবং ৩—৫ ইঞ্চি পুরু হয়। আর "সালামী" পাথরের প্রস্থ ডোঙ্গী পাথরের ন্যায় এবং ইহা যতটুকু লম্বা ততটুকু চওড়া। তবে ডোঙ্গীর চেয়ে ইহা সাধারণতঃ অল্প পুরু। সাধারণতঃ ১৷৷০ ৩ ইঞ্চি পরিমাণে পুরু। ডোঙ্গীপাথরের উপরের কিয়দংশ খুঁড়িয়া গর্ত্ত করা হয়, যাহাতে অল্প পরিমাণে জল তাহাতে ধরিতে পারে। এই গর্ত্তের মধ্যে জল থাকায় পাথরটা ঠাণ্ডা থাকে, নতুবা আগুনের তাতে ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ডোঙ্গীর অবশিষ্টাংশ ঠাণ্ডা থাকে এবং সালামীরও সমস্ত উপরিভাগটা ঠাণ্ডা থাকে। ডোঙ্গী পাথর ভাটার সম্মুখে লম্বা-লম্বি ভাবে রাখা হয়। এই পাথর ভাটার মধ্যস্থ ফাঁকা স্থানের চেয়ে ছোট বলিয়া ⅔ অংশ মাত্র ঢাকা পড়ে, আর বাকী ⅓ অংশ সালামী পাথরের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ডোঙ্গী ও সালামীর শেষ ভাগটা যদি একত্রে সংলগ্ন করা হয়, তাহা হইলে সংলগ্ন স্থানের (joints) মধ্য দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না। সংযোগ করিবার জন্য একটু সিমেণ্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন।

কারিগরের বসিবার আসন

কারিগরের বসিবার স্থান ইট ও মাটি দিয়া সালামির শেষ দিকে অর্থাৎ ভাটার দক্ষিণ দিকের শেষ ভাগে তৈয়ারী করিতে হয়। সালামির উচ্চতর শেষঅংশ যতটুকু উচ্চ, কারিগরের বসি-বার স্থানও ততটুকু উচু হওয়া প্রয়োজন। দুই বর্গফুট পরিমিত স্থানে কারিগরের বসিবার স্থান নির্ম্মান করা হয় এবং এমন ভাবে তৈয়ার করা হয়, যাহাতে আগুণের আঁচ তাহার গায়ে না লাগিতে পারে, অথচ সে ভাটার সম্মুখ ভাগটা দেখিতে পায় ও লাক্ষা গলিতেছে কি না তাহাও দেখিতে পারে এবং যখনই প্রয়োজন হয় আগুণ

ভাটা।
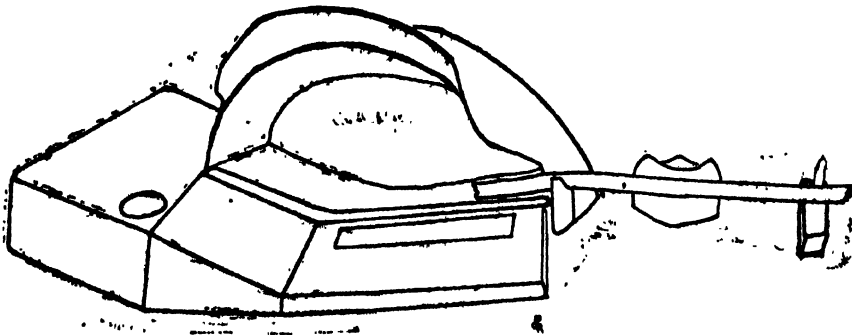
খোঁচাইয়া দিতে পারে। ভাটার বাম দিকের শেষ প্রান্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কারিগর বসিয়া থাকে। তাহার ডান পায়ের নিকটে একটি পাথরের গামলা থাকে তাহাকে "পাথ্‌রী" বা "আথ্‌রী" বলে। এই পাথ্‌রী কতকটা মাটিতে পোঁতা থাকে। গামলায় যে জল থাকে, সেই জলে ডুবাইয়া কারিগর তাহার অস্ত্র শস্ত্র ঠাণ্ডা করে এবং মুহুর্মুহু ভোজী ও সালামীর উপর জল ছিটাইয়া দেয়।

ব্যাগ কিসের উপর রাখিতে হয়

ভাটার বাম দিকের শেষাংশে "ইউ" (U) এই আকারের একটি অবলম্বন বসাইতে হয়. তাহার উপর কেরুইয়া কর্ত্তৃক ঘুরাইবার সময় লাক্ষার ব্যাগ থাকে। এই অবলম্বন লোহার অর্দ্ধ বৃত্তাকারের উপর অথবা একটি মৃন্ময় পাত্রের গলার উপর রাখা হয়—সাধারণতঃ কলসীর কাণা হইলেই ভাল হয়। ইহা কাদার একটি ছোট থামের সহিত গাথা থাকে এবং মেঝে হইতে এক ফুট উচ্চ হয়।

জল সিদ্ধ করা—ভাটার বামদিকের শেষাংশে ও পশ্চাৎ ভাগে কেরুইয়ার ব্যবহার্য্য জল সিদ্ধ করিবার জন্য একটি সাধারণ উনান তৈয়ারী করা হয়। এই উনান এরূপ ভাবে তৈয়ারী যে ইহার ছাই চৌরীর ব্যাগে পৌঁছিতে পারে না কিংবা চৌরীকে অপরিষ্কার করিতে পারে না। যে কোন প্রকারের জ্বালানি কাঠ এই উনানে জ্বালান যাইতে পারে।

কেরুইয়া ও তাহার অস্ত্র শস্ত্র

কারিগর তাহার বাম হস্তে চৌরীর ব্যাগের এক প্রান্ত ধরিয়া বসিয়া থাকে। শেষের দিক হইতে ব্যাগটি প্রায় ২ ফুট খালি থাকে এবং কারিগর চৌরীর সম্মুখে খুব কসিয়া গেরো দেয়; তাহার ফলে ব্যাগের শেষ দিক দিয়া লাক্ষা আসিতে পারে না। তাহার হাত হইতে লাক্ষার ব্যাগ আগুনের সম্মুখে যায় এবং তথা হইতে U "ইউ" আকৃতি বিশিষ্ট অবলম্বনের উপর দিয়া কেরুইয়ার নিকট যায়। কেরুইয়া ভাটা হইতে কিছু দূরে বসিয়া থাকে। কারিগরের হাত হইতে U "ইউ" আকৃতি বিশিষ্ট অবলম্বন পর্য্যন্ত ব্যাগের যে অংশ তাহাকে "পেরা" বলে। যে হেতু লাক্ষাকে ধূলাবালি বিবর্জ্জিত অবস্থায় অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে হয়,সেইহেতু ব্যাগ যেন খালি মেঝে কখনও স্পর্শ না করে। "U" আকৃতি বিশিষ্ট অবলম্বন হইতে ইহা কতকগুলি ব্লকের উপর দিয়া যায়। ঐ সমস্ত ব্লককে "ধারা" বলে; তথা হইতে ইহা চরকিতে যায়। ধারা একখণ্ড কাঠ দ্বারা প্রস্তুত, দৈর্ঘ্যে ইহা এক ফুট ও ইহার বেড়
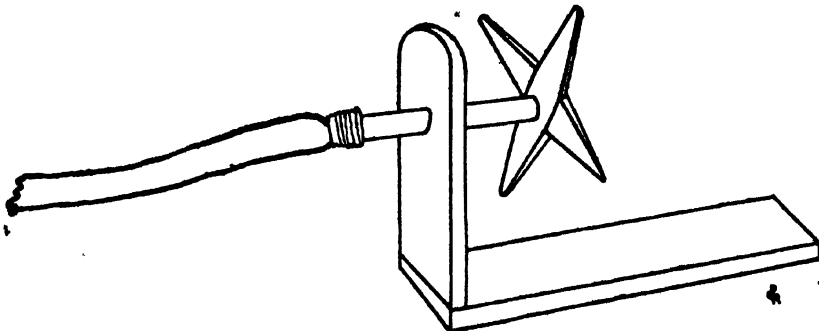
চরকি

চারি ইঞ্চি। ইহার তলদেশ সমতল। ইহার শেষ দিকে একটি কাঠ অথবা বাঁশের হুল বা পিন আছে, তাহা উচ্চতায় এক ফুটের অধিক নহে। একটি গর্ত্তের মধ্যে লম্ব ভাবে উহা অবস্থিত। ব্যাগ সম্পূর্ণ রূপে এই ব্লকের উপর স্থাপিত। ব্যাগের দৈর্ঘ্য যত বড়, ব্লকের সংখ্যাও তত বেশী হয়। "ফেরুইয়া" ব্যাগের শেষাংশ চরকীতে বাঁধে এবং মেঝের উপর বসে। চরকী ঘুরাইয়া ব্যাগ ঘুরাইতে থাকে এবং কারিগরের আদেশানুসারে সে ঘুরানর মাত্রা কমবেশী করে। যেমন ব্যাগের লাক্ষা গলিতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ফেরুইয়া চরকী লইয়া ভাটার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

কারিগর ও তাহার যন্ত্রপাতি

কারিগরের চারি প্রকার যন্ত্র। যথা (১) চার্ণা (২) প্রবন্ধ বা পীরবন্ধ (৩) কোলচুলা বা কাৎচুলা (৪) কিরিখোদ্নী।

চার্ণা—একটি কাঠের হাতল বিশিষ্ট সমতল লোহাকে চার্ণা বলে। উহার ফলা ৯ ইঞ্চি লম্বা—১॥ ইঞ্চি চওড়া এবং ⅛ ইঞ্চ পুরু ; ফলার কোণ সমূহ গোলাকার ; ইহার সাহায্যে কারিগর পেরার উপর—অর্থাৎ লাক্ষাপূর্ণ থলিটি আগুণের পাশে ঘুরাইয়া লাক্ষাকে আবশ্যকমত গলিত অবস্থায় রাখে।

প্রবন্ধ—প্রবন্ধ চার্ণারই মত, তবে ইহার আকার কিছু ছোট। দৈর্ঘ্যে উহা ৮ ইঞ্চি এবং ইহার কোন হাতল বা বাট নাই। ইহার সমস্ত কোণও গোলাকার। পেরা হইতে গলিত লাক্ষা পিপায় স্থানান্তরিত করিবার জন্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

কোলচুলা—কোলচুলার কথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নিজের আসনে বসিয়া কারিগর ইহার সাহায্যে অনায়াসে আগুণ খোঁচাইয়া দিতে পারে। ইহার লম্বা হাতলের সাহায্যে কারীগর যে কোনও স্থানে বসিয়া আগুন উস্কাইয়া দিতে পারে।

কিরিখোদ্নী—কিরিখোদ্নী এক জাতীয় ছুরি। কারিগর ইহা পেরা কাটিবার জন্ত ব্যবহার করে। যে সমস্ত লাক্ষার অবশিষ্টাংশ গলে না, তাহাকে কিরি বলে এবং তাহা বাহির করিয়া লইবার জন্ত ইহা ব্যবহার করা হয়। ব্যাগের মধ্যস্থ সমস্ত লাক্ষা ছাঁকা হইয়া গেলে যখন অধিক পরিমাণে না গলিবার মত লাক্ষা থাকে, তখন এই কিরিখোদনী দ্বারা পেরাকাটা হয়। থলির ভিতর এই সব তলানি থাকিয়া গেলে অধিক পরিমাণে চৌরি গলিতে পারে না। সুতরাং কিরিখোদ্নী দ্বারা থলি চাঁছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় ; অবশ্য পুরাতন লাক্ষা গলাইবার সময়েই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

বেলুইয়া ও তাহার যন্ত্রপাতি

বেলুইয়া কারিগরের ডান পার্শ্বে একটু নীচে বসে। সে দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে। যথা (১) পিপা (২) বেলা।
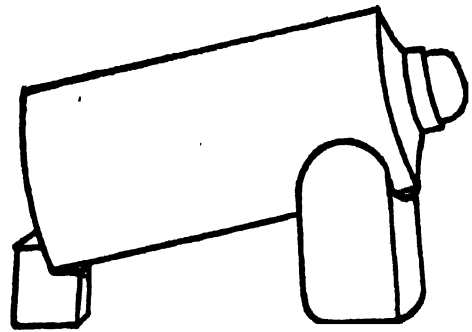
পিপা

পিপার অবস্থান—পিপা চাকচিক্যময় পোরসিলেনে প্রস্তুত একটি গোলাকার আধার। দৈর্ঘ্যে উহা ২ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং পরিধি ১০ ইঞ্চি।

ইহার চারি ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট একটি মুখ আছে, কিন্তু কোন গলা নাই। ছেঁড়া ন্যাকড়ার বর্ক দ্বারা ইহার মুখবন্ধ করা হয়। গরম জলের দ্বারা পিপার মুখ প্রায় পরিপূর্ণ করা হয়; তার পর পিপার মুখ বন্ধ করিয়া মেঝের উপর খাঁই কাটা দুইটি থামের উপর ইহা কতকটা কাৎ করিয়া বসান হয়। (চিত্র দেখ) থাম দুইটির মধ্যে একটি বড় আর একটি ছোট। পিপাটিকে কারিগরের বসিবার আসনের নিকট বসান হয়; যাহাতে সে সহজে ইহার মধ্যে গলান অথবা কর্ত্তিত লাক্ষা দেয়া হইতে রাখিতে পারে। প্রবন্ধের সাহায্যে সে আপন আসন ত্যাগ না করিয়া ইহা করিতে পারে। তাহার বাম দিকে একটি ছোট টিনে করিয়া উনানে জল সিদ্ধ হইতে থাকে। পিপা ভর্ত্তি করিবার জন্যই জল ব্যবহৃত হয় এবং পিপার জল ঠাণ্ডা হইলে তৎস্থলে গরম জল পুরিবার জন্য এই রূপে জল গরম করা হয়; বেলুইয়া পিপার পশ্চাতে দাঁড়ায়, পিপার মুখের নিকট দাঁড়ায় না।

সেক্কা—প্রায় দেড় ইঞ্চি পরিমিত তাল পত্রকে সেক্কা বলে। কচি তাল পত্রের মাঝ থানের পাতা খুলিবার পূর্ব্বেই ইহা সংগ্রহ করা হয়। ব্যবহারের দ্বারা ইহার কোমলতা নষ্ট হইলেই ইহার স্থানে নূতন তাল পত্র দেওয়া হয়। শক্ত সেক্কাকে কিছুক্ষণ পিপার মধ্যে গরম জলে রাখিলে উহা নরম হয়।

গলাইবার প্রণালী কারিগর কাপড়ের ব্যাগের এক অংশ লইয়া তাহার আসনে বসিয়া থাকে, ঐ অংশে চৌরি থাকে। ঐ অংশ তাহার হাতে আল্‌গা ভাবে ধরা থাকে, আর বেলুইয়া চরকীর সাহায্যে ব্যাগের অন্য অংশটা ঘুরায়। কিছুক্ষণ ব্যাগ গরম হইলে ব্যাগের ছিদ্র পথ দিয়া গলিত লাক্ষা বাহির হইয়া আইসে। কারিগর অতঃপর মুহূর্ত্তের জন্য ব্যাগটি দৃঢ় ভাবে ধরে এবং অব্যবহিতটা ঘুরানর ফলে ব্যাগের মধ্য হইতে কিছু পরিমাণে গলিত লাক্ষা বাহির হয়। যখন যথেষ্ট পরিমাণে গলিত লাক্ষা ব্যাগের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইসে, কারিগর তাহার হাতের মুঠি আল্‌গা করে এবং সমস্ত ব্যাগটিকে ঘুরিতে দেয়। তাহার পর সে ধীরে ধীরে গলিত লাক্ষা সেক্কার উপর তাহার চর্ব্বির দ্বারা ধরে। যাহাতে লাক্ষা বেশী পুরু ও বেশী পাতলা না হয়, সেজন্য সে ইহা সেক্কার উপর ধরে এবং আগুনের ধারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লাক্ষার তালটাকে সর্ব্বদা এরূপ নরম অবস্থায় রাখে যাহাতে তাহা শক্তও না থাকে আবার একেবারে গলিয়াও না যায়। কারিগর আপন অভিজ্ঞতা বলে জানিতে পারে কখন সেক্কার কাজ শেষ হইল। গলিত লাক্ষা যখন তখন সালামী ও তোজী পাথরের উপর পড়ে। কারিগর পাথ্‌রী হইতে জল ছিটাইয়া উহা সর্ব্বদা ভিজা রাখে। যদি পাথরগুলি ভিজা না রাখা হয়, তাহা হইলে লাক্ষার ফোঁটা গুলি উহাতে লাগিয়া থাকে এবং সহজে তাহা উঠাইতে পারা যায় না।

যখন লাক্ষা সেক্কার সাহায্যে আগুনের সাম্‌নে গলানো হইতে থাকে, তখন বেলুইয়া গলিত লাক্ষার তাল কারিগরের নিকট হইতে লইবার জন্য প্রস্তুত হয়। সে গরম জলে পিপা পরিপূর্ণ করে এবং যাহাতে ইহা অধিক মাত্রায় উত্তপ্ত না হয়, সেদিকে নজর রাখে। যদি বা কোন কারণে ইহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে পিপার কর্কটি খুলিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে ইহা ঠাণ্ডা হয় অথবা ইহার ভিতরে একটু ঠাণ্ডা জল ঢালিলেও ইহা ঠাণ্ডা হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তপ্ত পিপার অসুবিধা এই যে, গলিত লাক্ষা

ইহার উপর লাগিয়া থাকে, কিন্তু যদি পিপা কম উত্তপ্ত থাকে, তাহা হইলে কখনও লাগিতে পারে না। আবার অত্যন্ত কম উত্তাপও ভয়ানক অসুবিধা জনক; ইহাতে পিপার উপর লাক্ষা রাখিলে শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং পাতলা চাদরের ন্যায় তাহা ছড়াইয়া ফেলা যায় না। পিপার উত্তাপের সমতা রক্ষা করা বিশেষ দক্ষতার কাজ। পিপার উপরিভাগ হইতে আংশিক ভাবে ছড়ান লাক্ষা স্থানান্তরিত করিবার সুবিধার জন্য পূর্ব রাত্রিতে দুই ছটাক সরিষার তৈলে জল সিদ্ধ করিয়া পিপা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। জল ও তৈলের এই সংমিশ্রণ পিপার মধ্যে থাকে এবং গলানর কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঢালিয়া ফেলা হয়। অতঃপর পিপা পুনরায় গরম জলে পূর্ণ করা হয়।

লাক্ষা ছড়ান—সেঁকা শেষ হইয়া গেলে কারিগর পিপার উচ্চতর শেষ দিকে গলিত লাক্ষার একটি তাল রাখে। বেলুইয়া নত হইয়া পিপার দুই দিকে লাক্ষার তাল চ্যাপ্টা করিয়া রাখে। তাহার হাতের তালু দিয়া ধীরে ধীরে চাপ দিলেই এইরূপ চ্যাপ্টা হয়। তাহার পর সে প্রত্যেক হাতে নেরার একটি শেষাংশ লয় এবং চ্যাপ্টা লাক্ষার উচ্চ ধারের উপর আড়ভাবে ইহা রাখিয়া পিপার চারিদিকে ধীরে ধীরে চাপ দিতে থাকে; ইহাতে বৃত্তের উপরিভাগে লাক্ষা বিস্তৃত হয়। যদি যথাযোগ্য ভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে আংশিক ভাবে বিস্তৃত এই লাক্ষা উপরি ভাগের অর্দ্ধেকের বেশী স্থান ব্যাপিয়া থাকে। "বেলুইয়া" এখন বিস্তৃত লাক্ষার দুইটি ধার ধরে এবং সাবধানতার সহিত পিপা হইতে চাদরটি টানিয়া বাহির করে, প্রত্যেক টানেই চাদরটি বিস্তৃত হয়। লাক্ষার চাদর এখন একটি ছাগলের চামড়ার ন্যায় বড় হয়, তাহা সত্বর ভাটার

সেলাক বিস্তৃত অবস্থা
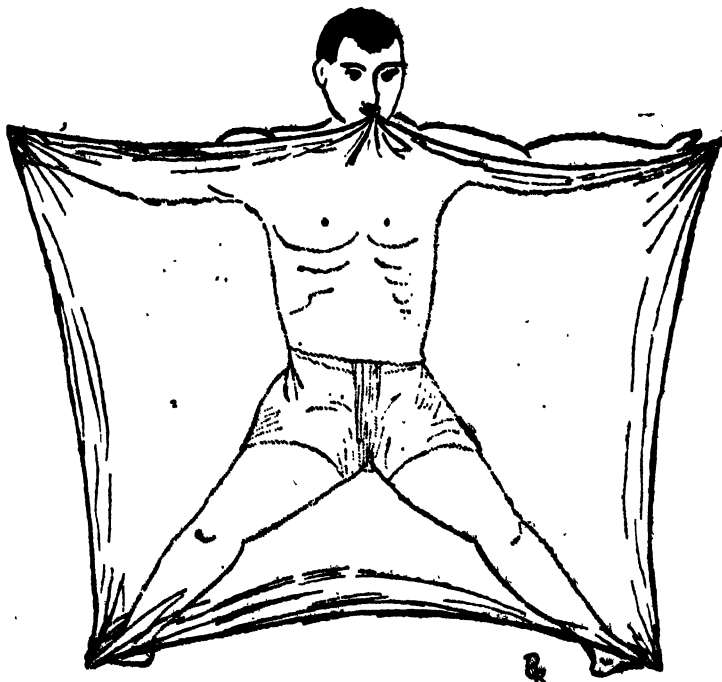
আগুনের সম্মুখে লওয়া হয়, তথায় বেলুইয়া দুই হাতে ধরিয়া ইহা সেঁকে। তাহার পর চাদরটি আরও বিস্তৃত করিবার জন্য সে ইহা টানিতে থাকে। চাদরটি ঠাণ্ডা হইবার পূর্ব্বে বেলুইয়া ইহা তাহার হাত, পা ও দাঁত দিয়া যতদূর সাধ্য বিস্তৃত করিতে থাকে। (চিত্র দেখ) এবার চাদরখানি ঠাণ্ডা হয় এবং শক্ত হয়। চাদরের কোণগুলি কিন্তু তেমন বিস্তৃত হয় না, কাজেই কোণে যে লাক্ষা থাকে তাহা ভাঙ্গিয়া কারিগরের নিকট পুনরায় দ্রবীভূত করিবার জন্য পাঠান হয়। এই অবিস্তৃত কোণের সেলাকের ওজন সাধারণতঃ মণ করা ২—২॥ সের হয়। তবে চতুর বেলুইয়ার হাতে কোণের সেলাকগুলি এত কম হয় যে তাহার ওজন মণ করা এক সেরের চেয়েও কম হয়।

ছড়ান লাক্ষাকে তখন "চাপড়া" বা "সেলাক" বলে। ইহাকে ছোট ছোট টুকরায় ভাঙ্গা হয় এবং সাজান হয়। পূর্ব্বোক্ত কোণ সমূহ ছাড়া চাদরের আরও যে যে অংশ যথানিয়মে ছড়ান হয় নাই, তাহা পৃথক্ রাখা হয় এবং পূর্ব্বে যাহারা ইহা লাগাইয়া ছিল তাহাদের নিকট পুনরায় লাগাইবার জন্য ফেরত পাঠান হয়; বলা বাহুল্য এজন্য তাহাদিগকে অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া হয় না। এই নিয়মের ফলে লাক্ষা গলান বিভাগের যে সমস্ত মজুরেরা কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা প্রকাশ করে তাহারা সায়েস্তা হয়।

কিরি বা ব্যাগের মধ্যস্থ তলানী

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আগুনের সমক্ষে গলিত লাক্ষাকে ব্যাগ হইতে নিঙড়াইয়া বাহির করা হয়। কাজেই কারিগর ব্যাগের যে শেষ অংশ ধরিয়া থাকে তাহা পাকান দড়ির ন্যায় হইয়া যায় এবং এদিকে যে লাক্ষা গলাইবার মত নহে তাহা ক্রেক্ষইয়ার ব্যাগের শেষ দিক্‌টাতে চলিয়া যায়। লাক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যাগ হইতে নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা থলির মধ্যে উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতেই ব্যাগের সেলাইকরা মুখ খুলিয়া দিয়া অথবা ব্যাগের কিয়দংশ কাটিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই অবশিষ্টাংশ বা তলানীকে "কিরি" বলে, এবং ইহার সহিত গাছের ছোট ছোট ডালপালা, আগাছা এবং অন্যান্য আবর্জ্জনা মিশ্রিত থাকে। এগুলি বড় বলিয়া ব্যাগের ছিদ্র পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না এবং এগুলি ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দিয়া লাক্ষার বহিরাগমনের পথে বাধা জন্মায়। লাক্ষায় সাধারণতঃ শতকরা ৩০—৫০ ভাগ কিরি থাকে; অবশ্য ক্রুড লাক্ষার গুণাগুণ ও অবস্থার উপরে এবং চৌরী ধৌত করা ও বাতাস করার উপরে ইহা নির্ভর করে। নীরেস এবং পুরাতন মাল হইতেই বেশী কিরী বাহির হয়।

"কিরির" পরিমাণ—চৌরি হইতে মণ করা কি পরিমাণ কিরি বাহির হইবে, তাহা লাক্ষার গুণাগুনের উপর নির্ভর করে।

কিরির পরিমাণ।

নং	চৌরির নানাপ্রকার ভেদ	চৌরির প্রতি মণে কিরির পরিমাণ—ছটাক
১	কুসুম	১০—১২
২	কুল বা বের	৩২
৩	পলাশ	৪৮—৫৬
৪	কুসুম শতকরা ৫০ ও পলাশ শতকরা ৫০ ভাগ	৩২

যাহারা লাক্ষা গলায় তাহাদের অবহেলার জন্যেও কিরির পরিমাণ অনেক সময় খুব বেশী হয়। কারণ তাহারা থলী হইতে ভাল করিয়া গলিত লাক্ষা বাহির করে না।

———

ছাত্রসমাজে স্বাস্থ্যহীনতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Students Welfare Committee বা ছাত্র হিতসাধিনী সমিতির এক রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, ছাত্র সমাজের স্বাস্থ্যহীনতা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। গড়পড়তা শতকরা ৬৬ জন ছাত্রের শরীরে কোন না কোন রোগ বর্ত্তমান। এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিম্নে এই রিপোর্টের সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

মোটামুটি চেহারা

ছাত্রদিগকে পেশীবহুল, মোটা, দোহারা ও কৃশ—এই চার ভাগে ভাগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে শতকরা হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে কৃশ ছাত্রের সংখ্যা কম, কিন্তু সিটি কলেজে সব চেয়ে বেশী। আবার ছাত্রদের মধ্যে অর্দ্ধেক দোহারা শ্রেণীভুক্ত এবং মাত্র শতকরা ১০ভাগ পেশীবহুল। আমাদের মধ্যে পেশীবহুল ছাত্র যে এত কম, তাহা যে কেহ বিকাল বেলা গোলদীঘিতে ঘণ্টাখানেক বেড়াইয়াছেন, তিনিই জানেন। আমাদের মত এই যে ব্যায়াম, দৌড়ঝাঁপ নৌকা বাওয়া, মল্লক্রীড়া—এসব প্রত্যেক ছাত্রদের অবশ্য করণীয় ও শিক্ষণীয় হওয়া উচিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রূপ নিয়ম করা উচিত যে ম্যাট্রিকুলেশন এফ-এ, বি-এ ও এম-এ, ইত্যাদি পরীক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হইবে, উহাতে উত্তীর্ণ না হইলে সাধারণ পরীক্ষায় পাশ করা যাইবে না। অবশ্য প্রথমে ব্যাপারটা শক্ত বটে, কিন্তু ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অবস্থা যখন এমন শোচনীয়, তখন ঔষধ তেমনি তীব্র হওয়া উচিত।

কুঁজ

শতকরা ৪ জন ছাত্র কুঁজো—কিন্তু বয়স যে ছাত্রের যত কম, তার কুঁজ ও ধরা পড়ে তত শীঘ্র। সেই জন্ম বোধ হয় ইউনিভারসিটি কলেজে শতকরা ১৯ জন কুঁজো। সিটি ও প্রেসিডেন্সী

কলেজে যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৪৬ ও ৪৮ জন কুঁজো। লেখবার ও পড়বার সময়ে সোজা হয়ে বসে লিখলে পড়লে ততটা কুঁজো হওয়ার সম্ভাবনা থাকেন।

রং

গায়ের রং হিসাবে ছাত্রদের চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে—খুব ফরসা, ফরসা তামাটে ও কাল। পরীক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে ইথিয়োপীয়দের ন্যায় কাল রং পাওয়া যায় নাই। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, শতকরা ১ ভাগ খুব ফরসা, ২৩ ভাগ ফরসা, ৬৮ ভাগ তামাটে ও ৭ ভাগ কাল। সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালীদের অধিকাংশই তামাটে রংয়ের। এবিষয়ে অবশ্য "ছাত্রহিতসাধিনী সভা" বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ গায়ের রং সম্বন্ধে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শতকরা হিসাবে স্কটিশ চার্চ কলেজে সব চেয়ে বেশী 'খুব ফরসার' সংখ্যা, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে 'কাল'র সংখ্যা সব চেয়ে কম। ইউনিভারসিটি ও সিটি কলেজে "খুব ফরসা" সবচেয়ে কম এবং প্রথমোক্ত কলেজে কালোর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। প্রেসিডেন্সীকলেজে 'তামাটে'র সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৭৬ ভাগ। জাত্‌ বা বর্ণ হিসাবে রংয়ের খেলা দেখিলে অনেক মজার তথ্য জানিতে পারা যাইবে। 'খুব ফরসার' সংখ্যা সবচেয়ে বেশী সুবর্ণ বণিক সমাজে, তার পরে ব্রাহ্মণদের মধ্যে, তারপরে বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজে। এই হিসাবে সুবর্ণবণিক সমাজ বাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ পরীক্ষিত সুবর্ণবণিক ছাত্রদের সংখ্যা খুবই কম। তাহা হইলে এই জানা গেল যে সাধারণতঃ আমরা যাদের "উঁচু" জাত বলি, তাদের মধ্যেই রং ফরসা দেখা যায়।

"কাল"র সংখ্যা মুসলমান, মাহিষ্য ও গন্ধবণিকদিগের মধ্যে বেশী, কিন্তু এই হিসাবে, মাহিষ্য ও গন্ধবণিকদিগকে বাদ দেওয়াই উচিত, কেননা ঐ সমাজভুক্ত পরীক্ষিত ছাত্রদের সংখ্যা কম।

ওজন ও উচ্চতা

সিটি কলেজের ছাত্রেরা ওজন ও উচ্চতা হিসাবে বাকী-কলেজের ছাত্রদের অপেক্ষা হীন। সাধারণ ছাত্রদের ২০।২১ বৎসর বয়সই উঁচুতে বাড়িবার সময় এবং এই সময়ই তাহারা ওজনেও বাড়ে।

বুকের বেড়

নিঃশ্বাস লইয়া বুক ফুলাইবার বেলাতেও সিটি কলেজের ছাত্রেরা বাকী কলেজের ছাত্রদের কাছে হার মানে।

কানে শোনা

সাধারণতঃ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, বয়সের সঙ্গে সবেই শুনিবার ক্ষমতা কমিতে থাকে এবং ডান কান অপেক্ষা বাঁ কানই বেশী খারাপ হয়।

চোখ

শতকরা ৩৬ জন ছাত্রের দৃষ্টি শক্তি কম, তার মধ্যে আবার শতকরা ১৩ জন ঠিক চসমা ব্যবহার করে। সুখের বিষয় মেসার্স বটকৃষ্ট পাল কোম্পানী এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন। চোখ খারাপ হিসাবে ইউনিভারসিটি ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা অগ্রণী এবং ইহাদের তুলনায় সিটি কলেজের ছাত্রদের চোখ খারাপ খুবই কম। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে,

১৬ বৎসর বয়স থেকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ চোখ বেশী খারাপ হইতে থাকে। চোখ খারাপ ও দাঁতের অসুখের সঙ্গে একটা ভিতরকার সম্বন্ধ আছে।

দাঁত

এক তৃতীয়াংশ ছাত্রদের দাঁত খারাপ। এ বিষয়ে কমিটী দুঃখের সহিত জানাইয়েছেন যে, ছাত্রদের চোখ খারাপের দিকে যতটুকু মনোযোগ আছে, দাঁতের দিকে তাহাও নাই।

বিবিধ

বিবিধ প্রকার মধ্যে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, গলা, প্লীহা, টন্‌সিল্‌, যকৃৎ ইত্যাদি ধরা হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ, কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজের শতকরা ৪৭ জন ছাত্র উপরোক্ত কোন না কোন অসুখে ভোগে কিন্তু সিটি ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ঐ হিসাবের সংখ্যা হইল ২১ ও ১৬। উপরোক্ত প্রায় প্রত্যেক রোগে ইউনিভারসিটি কলেজের ছেলেরা যত ভোগে, এমন আর কোন ছাত্রেরা ভোগে না।

সর্ব্বসমেত

সমস্ত রকমের রোগ ধরিলে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরাই বেশী ভোগে, কারণ সিটি, স্কটিশ চার্চ্চ,ইউনিভারসিটি ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের যথাক্রমে শতকরা ৬৪, ৬৪, ৭৭, ৯১ জন ভোগে। মোটামুটি গড়পড়তা ধরিলে শতকরা ৬৬ জন ছাত্রের শরীরে কোন না কোন রোগ বর্ত্তমান।

ব্যায়াম চর্চ্চা

(শ্রীইন্দুভূষণ সেন)

ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে কি হয়? ব্যায়ামের প্রধান গুণই হচ্ছে—মাংসপেশীসমূহকে পরিপুষ্ট করা। এই মাংসপেশী কি? মাংসপেশী হচ্ছে—অতি সূক্ষ্মতন্তুর সমষ্টি।

মাংসপেশীর মধ্যে এক শ্রেণীর পেশী আপনা আপনি সঙ্কুচিত হয়। আবার এগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার না হইলে ভিতরের তন্তুগুলি ক্রমশঃ বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের আকুঞ্চনক্ষমতাও হ্রাস হইয়া যায়। কোন দুর্ব্বল ও কৃশ মাংসপেশী আকুঞ্চিত হইলে তাহার মধ্য হইতে উচ্ছ্বসিত রক্তধারা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে রাঙা করিয়া তোলে। এই রক্তধারার মধ্যে যে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, তাহার দ্বারা মাংসপেশীর সঙ্কোচ ও প্রসারণের দ্বারা তাহার আকার বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে দেহেরও শক্তি বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চার দ্বারা মানুষের শরীরের নানা প্রকার উন্নতি হয়। যৌবনের সৌন্দর্য্য কিসে? সুগঠিত মাংসপেশী ও শারীরিক শক্তিই যৌবনের উপযোগী সৌন্দর্য্য। শারীরিক বলে মানুষের মনের বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্বাস্থ্য যদি

অটুট থাকে, তাহা হইলে মানুষের সকল কাজেই উৎসাহ আসে।

নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চার দ্বারা কুঁজো ব্যক্তি সোজা হয়। যাহাদের বক্ষ সঙ্কীর্ণ তাহাদের বক্ষ প্রশস্ত হয়, যাহাদের চলন শক্তি বিকৃত প্রায় হইয়াছে তাহাদের সেই বিকৃত ভাব দূর হইয়া থাকে।

পার্শ্বাস্থি সকলই মানুষের বক্ষঃস্থলের কাঠামো। যদি ব্যায়াম করা না হয়, তাহা হইলে সেগুলি বাহির দিকে না আসিয়া ভিতর দিকে দুমড়াইয়া যায় এবং সে কারণে বক্ষঃস্থল সমতল না হইয়া আমাদের নিঃশ্বাস যন্ত্র ফুস্ফুস্‌কে চাপিয়া ধরে। যাঁহারা ২০।২২ বৎসরের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের এই সমস্ত দোষ মোটেই থাকে না। অধিক বয়সে ব্যায়াম অভ্যাস করিলেও দেহের গড়ন সব পরিবর্ত্তিত না হোক, কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়।

যাহাদের মস্তিষ্কের কাজ বেশী করিতে হয়, তাঁহাদের ব্যায়ামচর্চ্চা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ মস্তিষ্কের ও মনের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যদি দেহকে অবহেলা করা হয়, তাহা হইলে খালি মাথা মানুষকে কখনই বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। ব্যায়ামের দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ও ফুস্ফুসের কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। যদি কোন রকম ব্যায়ামও না করা হয়, তাহা হইলে মাত্র একবার যদি দ্রুতবেগে দৌড়ান যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকারিতা আপনার দ্বিগুণ হইয়াছে ও ফুস্ফুসের কার্য্যকারিতা তার হইতে ঢের বেশী বৃদ্ধি হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডই দেহস্থিত সমস্ত তন্তুর মধ্যে রক্তের সঞ্চার করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড যদি দ্রুত চলিতে থাকে, তাহা হইলে রক্তের যোগান বেশী করিয়া দিতে পারিবে যদি ফুস্ফুসের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সমস্ত ধমনী শোণিতের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে "অক্সিজেন" বা অম্লজান পাওয়া যায়। এই অক্সিজেন মানুষের মহা উপকারী জিনিষ। অক্সিজেন দেহের রক্ত ও তন্তুগুলির ভিতর নূতন তেজ ও শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে, এবং এই জন্যই দেহে নবজীবনের ও সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্যায়ামের দ্বারা—মানুষের চিন্তা শক্তি—মানুষের ধারণাশক্তি—মানুষের হজমশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এমন কি ব্যায়ামের দ্বারা—মানুষের সমস্ত অবসাদ—মানুষের নিশ্চেষ্টতা নষ্ট হইয়া মানুষকে চেষ্টাশীল ও কর্ম্মপরায়ণ করিয়া তোলে। যাহারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলকে যথাসম্ভব বাড়াইয়া তুলিতে পারেন।

ব্যায়াম মানুষকে সুন্দর করিয়া থাকে। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই ব্যায়াম করা আবশ্যক। আমি স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম করিবার কথা বলায়—অনেকের হয় ত ইহা ভাল লাগিবে না। কিন্তু জগতে সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বাস্থ্য ও শক্তি এই দুইই লাভ করিতে হইবে। পুরুষদিগেরও যেমন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক—স্ত্রীদিগেরও সেইরূপ স্বাস্থ্যবতী ও শক্তিশালিনী হওয়া প্রয়োজন। ব্যায়ামের দ্বারা স্ত্রী জাতির স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

স্ত্রী-জাতি যদি আবার পূর্ব্বের ন্যায় গৃহকর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনেকটা ব্যায়ামের কাজ হইতে পারে। স্ত্রী-জাতিকে অন্তর্ম্পশ্যা করিয়া না রাখিয়া যদি কিছু সময় বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে। আমাদের স্ত্রী-জাতির স্বাস্থ্য এত খারাপ যে, একটা সন্তানের জননী হইলেই—তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য একে

বারে নষ্ট হইয়া যায়—ইহা সকলেই যে লক্ষ্য না করিয়াছেন তাহাও নহে। ইহার মূল কারণ আমাদের মনে হয়, সংসারের কর্ত্তব্য পালনে অন্তঃপুর-বাসিনী জননীগণ যেদিন হইতে সভ্যতার আলোকে —আলস্যের আনন্দে—বিলাসিতার বিমোহিনী সৌন্দর্য্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পথ হারাইয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহারা নারীর শক্তি ও সৌন্দর্য্য সমস্ত হারাইয়াছেন।

ব্যায়ামের দ্বারা মানুষ যে সত্যই স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হইতে পারে—তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেই স্যাণ্ডোর নাম শুনিয়াছেন। স্যাণ্ডো বাল্যকালে এত বেশী রোগা ছিলেন যে, তাঁহার পিতামাতা তাঁহার জীবনের আশাই ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চার দ্বারাই তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়সের যে মাপ দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁহার—

ওজন—১৪ ষ্টোন ৬ পাউণ্ড (আড়াই মন)
উচ্চতা—৫ ফিট ৯।০ ইঞ্চি
গলা—১৮ ইঞ্চি
ছাতি—৪৮ ইঞ্চি
উরু—২৬ ইঞ্চি
হাঁটু—১৪ ইঞ্চি
কাফ্—১৮ ইঞ্চি
পায়ের নলি—৮।০ ইঞ্চি
বাইসেপ—১৯।০ ইঞ্চি
পুরোবাহু—১৬।০ ইঞ্চি
কব্জি—৭।০ ইঞ্চি

ইঁহার ফুস্‌ফুসের শক্তিও অদ্ভুত। সাধারণ অবস্থায় ইঁহার বক্ষের বেড় ৪৮ ইঞ্চি, কিন্তু স্ফীত হইলে ৬২ ইঞ্চি হইয়া থাকে অর্থাৎ ১৪ ইঞ্চি বাড়িয়া থাকে।

বিলাতের একজন ডাক্তার নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া তাঁহার মাংসপেশী সমূহকে এতই ক্ষমতাশালী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে—ইনি পূর্ণ সাঁইত্রিশ মণ কুড়ি সের ওজনের ভারি জিনিষ কাঁধে করিয়া অনায়াসে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। ইঁহার নাম—ডাক্তার উইনসিপ। ইনিও যৌবনকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। ইঁহাকে ইঁহার সঙ্গীরা অত্যন্ত মারধর করিত, সেই কারণে ইনি সঙ্গীদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যায়াম চর্চ্চা অভ্যাস করেন।

ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া এইরূপ হ্যাকেনস্মিডক্, রামমূর্ত্তি, নাইডু, কালু, গামা, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীমভবানী (ভবানীচরণ সাহা), গোবর (যতীন্দ্রনাথ গুহ) প্রভৃতি বহু ব্যক্তি পৃথিবীর মধ্যে অসাধারণ শক্তিশালী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। অতএব যদি কেহ স্বাস্থ্যবান হইয়া জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ব্যায়াম চর্চ্চা অভ্যাস করুন।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাঙ্গলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

(৭ই ফেব্রুয়ারীর ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত)

বাতি

(আর ২২৮) বোম্বাইয়ের একটি বাতির কারখানা খরিদ্দারদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

ভুষ

(আর ২২৯) মহীশূর রাজ্যের ভাওনগরের একজন পত্রলেখক ভুষ ক্রয় কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

সিলভার ভাণ্ড্

(আর ২৪১) বিহার-উড়িষ্যার টাটানগরের একটি ফার্ম্ম ভারতীয় সিলভার ভাণ্ড সরবরাহ-কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

গাম কাটিরা

(আর ২৪২) আমেরিকা যুক্তরাজ্যের নিউ-ইয়র্কস্থ একটি ফার্ম্ম গামকাটিরা সরবরাহ কারিদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

রেঙ্গুণ হ্যারিকট বীন্

(আর ২৪৩) নিউ জিলাণ্ডের অন্তঃপাতী অক্ল্যাণ্ডের একজন পত্র প্রেরক রেঙ্গুণ হ্যারিকট বীন্ রপ্তানী কারকদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

ভাজা মশুরীর ডা'ল

(আর ২৪৪) নিউজিল্যাণ্ড অক্ ল্যাণ্ডের একজন পত্র প্রেরক ভাজা মশুরীর ডাইলের রপ্তানী কারকের সহিত পরিচিত হইতে চান।

(১১ই এপ্রিলের ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল হইতে)

চামড়ার জিনিষ

(এস্—৪) যুক্তপ্রদেশস্থ কানপুরের চামড়ার দ্রব্য প্রস্তুতকারী একটি কারখানার মালিক সুট্‌-কেস্ প্রভৃতি চামড়ার জিনিষ ক্রয় করিবার খরিদ্দারের সহিত পরিচিত হইতে চান।

পডোফাইলম্—রুট

(এস্—৫) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থ আবোতাবাদের একজন পত্র লেখক পডোফাইলাম এমোডীরুট, বেলেডোনারুট প্রভৃতি ক্রয় কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

(১০ই এপ্রিলের ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল হইতে)

সোল লেদার

(এস্—৬) রাজপুতানা জয়পুর সহরের একটি কারখানা সোল লেদারের খরিদ্দার চান।

সয়া বীন্

(এস্—৭) যুক্তরাজ্যের বার্ম্মিংহামের একটি ফার্ম্ম ভারতীয় সয়াবীন্‌সের রপ্তানী কারকের সহিত পরিচিত হইতে চান।

(২৫শে এপ্রিল ট্রেড্ জার্ণাল)

শিমুল

(এস্—৮) দিল্লীর একটি কারখানা ক্যাপক বা সিমুলসরবরাহকারীর সহিত পরিচিত হইতে চান।

বালি ও ছোট পাথর

(এস্—৯) কলিকাতার কোন ফার্ম্ম জল পরিষ্কার করিবার উপযোগী বালি ও ছোট পাথরের টুক্‌রা সরবরাহ কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

বিদেশী মসলা

(আর ৩৩০) সুইডেনের অন্তঃপাতী গোথেন বর্গের একজন পত্রলেখক ভারতীয় মসলা সরবরাহ কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

(২১শে এপ্রিলের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত)

লোহার পিপে

(আর ২৩৯) যুক্তপ্রদেশের কাণপুরের একটি ফার্ম্ম পুরাতন লোহার পিপের সরবরাহ কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান। এই পিপার যেন ৪০—৪৫ গ্যালন মাল ধরে এরূপ হওয়া চাই ?

তিল তৈল

(আর ২৪০) বর্ম্মা—রেঙ্গুনের তিল তৈল ক্রয় কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

তুলার ওয়েষ্ট

(এস্—১০) দক্ষিণ ভারতের রাজ মহেন্দ্রীর একটি ফার্ম্ম তুলার ওয়েষ্ট সরবরাহ কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

(২রা মের ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল হইতে)

ইউকালিপটাস্ তৈল

(এস্—১১) মাদ্রাজের একটি ফার্ম্ম ইউক্যালিপটাস্ তৈল ও লিমনগ্রাসের তৈল ক্রেতার সহিত পরিচিত হইতে চান।

পুরাতন ঘি

(এস্—১২) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোধরার একজন পত্র লেখক পুরাতন ঘৃত ক্রয়কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

পিয়ার রস

(এস্—১৩) টাট্‌কা ও রক্ষিত পিয়ার ফলের রস সরবরাহ করিতে পারেন, স্থানীয় কোন ফার্ম্ম এরূপ লোকদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

(৯ই মের ইণ্ডিয়ান্ ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত)

গাম ঝাড়

(এস্—১৪) করাচীর একটি কারখানা গাম ঝাড়ের খরিদ্দারের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন।

সোপষ্টোন পাউডার

(এস্—১৫) স্থানীয় কোন ফার্ম্ম সোপ-ষ্টোন পাউডারের খরিদ্দারের সহিত পরিচিত হইতে চান।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১নং পত্র।

মহাশয়—

এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক বেলেডোনা Belladona কি জিনিষ হইতে প্রস্তুত হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি। আমি জানি যে বেলেডোনা নামক একপ্রকার গাছ আছে, সেই গাছ হইতেই উক্ত ঔষধটি প্রস্তুত হয়। বেলে-ডোনার চাষ আমাদের এ সব অঞ্চলে কোথাও হয় কি না, হইলে কোথায় হয় এবং কি প্রণালীতে চাষ করিতে হয় ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

নিবেদক—
শ্রীবগলাপ্রসন্ন ঘোষ।
৩০৪৪ নং গ্রাহক।

১নং পত্রের উত্তর।

আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই ঠিক। Belladona নামক একপ্রকার ছোট গাছের ডাল পাতা, ফল, মূলাদি হইতে Belladona নামক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই বেলে-ডোনার পাতা অনেকটা কাঁটা বেগুনের পাতার মত খুব বড় হয়। পশ্চিমের পাহাড় এবং জঙ্গলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এক এক জায়গায় বেলেডোনার জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। দেওঘরে ডিগ্‌রিয়া এবং ত্রিকুট পাহাড়ে অজস্র বেলেডনার গাছ আছে। সেখানে এই গাছকে "বাঘবোছিয়া" বলে ; অর্থাৎ ইহার যে ফল হয়

তাহা দেখিতে ঠিক বাঘের নখের মত বলিয়া স্থানীয় লোকেরা ইহাকে "বাঘনোছিয়া" বা বাঘের নখ বলে। সেখানকার লোক সকলেই জানে যে সর্দ্দী, কাশী প্রভৃতি রোগে বাঘনোছিয়ার পাতার রস অব্যর্থ ঔষধ; ছেলেপেলেদের সর্দ্দী কাশী হইলে একটা বাঘনোছিয়ার কল ফুটা করিয়া ছেলেদের গলায় তাহা সুতার দ্বারা বাঁধিয়া দেয় এবং তাহাতেই প্রায় সকলের কাশী, সর্দ্দি সারিয়া যায়। বংলা দেশের জঙ্গলেও ইহার চাষ হইতে পারে; কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে কেহই আজিও পর্য্যন্ত এদিকে মন দেয় নাই। সাঁওতাল পরগণার যে সকল পার্ব্বত্য জমিতে বেলেতোনায় গাছ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেখিয়া মনে হয় যে দো আঁশ জমি মাত্রেই ইহার চাষ হইতে পারে। কিন্তু উঁচু জমি হওয়া চাই যাহাতে বর্ষার জলে ডুবিয়া না যায়। চেষ্টা করিলে শীতের শেষে দেওঘর হইতে প্রচুর পরিমাণে বেলেতোনার বীজ সংগ্রহ করা যায়।

২নং পত্র।

মহাশয়—

নিম্নলিখিত বিষয়টী আপনার ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রকাশ করিয়া যাহাতে ইহার সদুত্তর পাইতে পারি তার উপায় করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

আজকাল অনেক লোকে নিজের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ মোটরকার এবং লরী ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু মফঃস্বলের পথ ঘাটের বিশৃঙ্খলতার দরুণ অনেক সময়ে মোটরের টায়ার কাটিয়া অনেক পয়সা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এমতাবস্থায় আজকালকার রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে কেহ কি এমন একটী সদুপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন যে উপায় দ্বারা হঠাৎ ফুটিয়া যাওয়া, অথবা কোনও ধারাল অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া গিয়া যদি টায়ার অকর্ম্মণ্য হয় তাহা হইলে সেই ফুটা বা কাটা টায়ারকে পুনঃ জুড়িয়া দেওয়া যায়। যদি এমন কোনও পুডিন বা আঠা যায়া তাহা জুড়িতে পারা যায় তাহা জানাইলে অর্থাৎ ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশ করিলে আমরা অনেক উপকৃত হইব। ইতি—

বিনীত—
শ্রীশ্রীপদ মুড়ীর গোস্বামী।
গ্রাহক নং ৪০১৮

---

২ নং পত্রের উত্তর।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার কোনও এক কোম্পানী এইরূপ টায়ার মেরামত করার একটা solutionএ দেশে বিক্রয় করার জন্য পাঠাইয়াছিলেন এবং যতদূর মনে হয়, বহুবাজারের Macfarlane & co তাহার এজেন্সী নিয়া Handbill আদি বিলি করিয়াছিলেন। আমরা এ সম্বন্ধে সঠিক সন্ধান নিয়া পরে প্রকাশ করিব। ইতি মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক অথবা পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এ সম্বন্ধে কোনও সন্ধান দিতে পারেন তবে আনন্দের সহিত সে সংবাদ আমরা প্রকাশ করিব।

---

৩ নং পত্র।

কলিকাতা বা ইণ্ডিয়ার অন্য স্থানে খুব বড় করগেট ব্যবসায়ী কে? ইহার agency লওয়া যাইতে পারে কিনা? নিজে কাহার নিকট লিখিতে হইবে? কোথায় এই Company আছে? এ সম্বন্ধে Possible সমস্ত সংবাদই পাইতে ইচ্ছা করি;

বিরক্ত সহ্য করেন বলিয়াই আমিও বিরক্ত করিলাম।

বিনীত—
শ্রীসুশীলকুমার চৌধুরী।
ষ্টেশন রোড, গাইবান্ধা—
রংপুর।

৩ নং পত্রের উত্তর।

কলিকাতায় এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা বিদেশ হইতে সরাসরি Corrugated এবং Plain sheet আমদানী করিয়া থাকেন। কলিকাতার বাহিরে ভারতের অন্যান্য স্থানের Importer দের খোঁজ করায় কোনও লাভ নাই; কারণ তাহারাও বিদেশের যে সকল স্থান হইতে এই সব মাল আমদানী করে কলিকাতার ব্যবসায়ীরাও সেই সকল স্থান হইতে আমদানী করে এবং ভারতের অন্যান্য সমুদয় বন্দরের আমদানী একত্র করিলে যত মাল হয় তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী মাল একা কলিকাতা বন্দরে আমদানী হইয়া থাকে। কারণ সমগ্র আসাম প্রদেশ, দার্জ্জিলিং পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ ঘরবাড়ীই করগেট টীন দ্বারা নির্ম্মিত। সুতরাং কলিকাতার Inporter গণ খুব বেশী পরিমাণে order দেয় বলিয়া Manufacturers দের কাছে সুবিধা দরে কিনিতে পারে। Inporter কলিকাতায় অনেক আছে; তন্মধ্যে কয়েকটী খুব বড় Inporter এর নাম ও ঠিকানা দিলাম:—

১। Ahmuty & Co. Ltd.
100 Clive Street.

২। Alexander young Ld,
27/2 Clive Street.

৩। Gopal Chandra Dass & Co Ld.
86/A/2 Clive Street.

৪। A. N. Hussunally & Co,
28 Strand Road,

৫। Anandjee Hari Dass & Co.
20 Darmahatta Street.

৬। Angus Keith & Co.
98/5 Clive Street.

৭। Behari Lal Dutt & Sons
30 Clive Street.

৮। Cameron & Co Ld.
Mercantile Building, Lall Bazar,

ইহাদের নিকট আমাদের নামোল্লেখ করতঃ পত্র লিখুন।

———

৪ নং পত্র।

মহাশয়!

আমি আপনার পত্রিকার ৪১৫৬ নং গ্রাহক। আপনার ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় লণ্ডনের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষজাত ঝিনুক খরিদ করিবেন বলিয়া দেখিতে পাইলাম। আমি উক্ত প্রকারের ঝিনুক প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিতে পারি। উক্ত ব্যবসায়ীর নাম, ঠিকানা, তিনি কত ঝিনুক খরিদ করিবেন এবং তাহার মূল্য কত করিয়া মণ দিতে পারেন সমস্ত বিষয় জানিয়া দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

২। তেঁতুলের বিচী দ্বারা কোন প্রকার কাজ হয় কিনা এবং উহা বাজারে বিক্রী হয় কিনা বিস্তারিত জানাইয়া বাধিত করিবেন।

৩। আমি যথেষ্ট পরিমাণে মুরগীর ডিম সরবরাহ করিতে পারি; কলিকাতায় পাইকারী হিসাবে মুরগীর ডিমের দর কত। আপনারা উক্ত ডিম বিক্রী করিয়া দিবার কোন বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন কিনা জানাবেন।

Yours sincerely
S. H. Siddiqui

———

৪ নং পত্রের উত্তর।

এই সংবাদ ১৯২৮ সালের ৮ই নবেম্বরের Indian Trade Journalএ প্রকাশিত হইয়াছিল

এবং Reference নং ছিল B 161 এই Reference উল্লেখ করতঃ নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন :—

Director General of Commercial
Intelligence
1 Council House Street, Calcutta.

Indian Trade Journal এ যে সকল সংবাদ বাহির হয় সে সম্বন্ধে কোনও খবর জানিতে হইলে আমাদের নিকট পত্র না লিখিয়া সরাসরি ঐ ঠিকানায় পত্র লিখিবার জন্ত আমরা পরামর্শ দিয়া আসিতেছি এবং প্রতি মাসেই ব্যবসায়ের সন্ধান অধ্যায়ে তাহা লিখিয়া জানাইতেছি; তথাপি আমাদের লিখিয়া বৃথা সময় নষ্ট করেন কেন তাহা বুঝি না।

২। তেঁতুলের বীচি ভাজিয়া খোসা ফেলিয়া দিলে তাহার মধ্যে যে শাঁস পাওয়া যায় তাহা আটার স্তায় গুঁড়া করিয়া, পশু খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায়। ভারতবর্ষের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষের সময় ইহার গুঁড়া মানুষ এবং পশু উভয়কেই আহার্য্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে ভাল বই মন্দ ফল হয় নাই। এই গুঁড়ার সহিত অন্তান্ত আনাজের কুদ এবং ভুষি মিশাইয়া উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য হিসাবে বিক্রয় করা যায়। পল্লীগ্রামে ইহার প্রয়োজন হয় না সত্য; কিন্তু কলিকাতা নগরীর স্তায় বৃহৎ সহর বাজারে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার পশুখাদ্য বিক্রয় হয় এবং এই পশুখাদ্য বা Cattle fodder এর ব্যবসা করিয়া পোস্তা, আহিরীটোলা, বেলেঘাটা, চেৎলা প্রভৃতি অঞ্চলে বহু পশ্চিমা অবাঙ্গালী ব্যবসাদার যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। সেখানে তেঁতুলের বীচির আটা অন্তান্ত পশুখাদ্যের সহিত মিশ্রণরূপে ব্যবহার করা চলে।

ইহা ছাড়া এই আটা হইতে একরকম সুন্দর আঠা তৈরী হয়। তাঁতের মাজ তৈরী করিতে কারীগরেরা অনেক সময় "কাইবীচি" বা তেঁতুলের বীচি হইতে লেইয়ের স্তায় এক প্রকার আঠা তৈরী করিয়া থাকে। যে দেশে gloy নামক আঠা বিদেশ হইতে বহু টাকার আমদানী হয়, সেদেশে ইহার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

৩। মুরগীর ডিমের পাইকারী দর আকার এবং তাজা কি বাসী তাহা বিবেচনায় সাধারণতঃ ।৹ আনা হইতে ।৵৹ আনা কুড়ি বিক্রয় হয়। খরিদদার ঠিক করিয়া দিবার আমাদের সময় বা সুবিধা নাই। কলিকাতায় ২৮টি বাজার আছে। এই সকল বাজারে নিজে আসিয়া পাইকারদের সহিত বন্দোবস্ত করুন। চিঠির দ্বারা ব্যবসা পত্তন করা চলে না। আমরা শুধু সন্ধান বলিয়া দিয়া সাহায্য করিতে পারি।

---

৫ নং পত্র

মহাশয়—

আপনাদের নিকট 2B. H. P. Power এর যে অয়েল এঞ্জিন আছে তাহার সঙ্গে কত বড় তৈলের কল (সরিষার তৈল) খাটানো যাইতে পারে? এবং ঐ দেশের কলের মূল্যই বা কত হইবে। ঐ সঙ্গে যদি ফিল্টার প্রেস আনানো যায় তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ কত পড়িবে?

২। আপনাদের নিকট বোতল তৈরী করার কল আছে কিনা এবং থাকিলে তাহার দরের একটা লিষ্ট পাইলে বড় আপ্যায়িত হই।

৫ নং পত্রের উত্তর।

দুই Horse Power এর ইঞ্জিনের দ্বারা কোনও তেলের ঘানী চালানো য'য় না। এক জোড়া ঘাণী চালাইবার উপযোগী করেন ইঞ্জিনের অন্ততঃ ৫ ঘোড়ার শক্তি থাকা চাই। বরং ৬ কিম্বা ৮ H. P. হইলে খুব ভাল হয়। মূল্যাদির বিষয় ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিতে পাইবেন।

২। আমাদের নিকট মোজা তৈরীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল আছে। তাহার বিবরণাদি সব ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। আমাদের এখানে সুবিধা এই যে কলের অর্দ্ধেক মূল্য ডিপজিট করিলে ক্রেতাকে আমরা বিনা পারিশ্রমিকে ১৫ দিন অথবা একমাস কারখানায় রাখিয়া কল চালানো শিখাইয়া দিই।

৬ নং পত্র।

মহাশয়,—

আপনার ব্যবসাবাণিজ্য আজ আটবৎসর চলিতেছে এতদিন আপনি দেশের লোকের নিকট অনেক রকম ব্যবসার সন্ধান দিয়াছেন তাহা কাগজে দেখিতেছি। কিন্তু দেখিতেছি না কেবল আপনার উপদেশ অনুসারে কেকে কিকি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং কেই বা কৃতকার্য্য হইলেন—কেই বা অকৃত কার্য্য কেন হইলেন—এবং আপনার কাগজ দ্বারা দেশের লোকের কার্য্যতঃ কোন উপকার হইতেছে কিনা তাহা আপনারও জানা উচিত এবং যাহারা বর্ত্তমান গ্রাহক আছেন তাঁহাদেরও জানা দরকার। হাতে কলমে কে কি কাজ করিয়াছেন তাহার একটা অধ্যায় এই পত্রিকার অঙ্গসন্ধান করিয়া স্থান দিবেন কি? আর যাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহারাও যদি এই পত্রিকার খরচ দিয়া আমান তবে অপরে আরও উৎসাহ পাইতে পারে। আশাকরি আমার পত্রখানা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

বিনীত—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহড়ী।
গ্রাহক নং ৩০১৭

৬ নং পত্রের উত্তর।

যোগেন্দ্র বাবু আমাদের পুরাতন গ্রাহক এবং এই কাগজের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী। তাঁহার প্রস্তাব যে সমীচীন এবং সময়োচিত হইয়াছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে পত্রিকা প্রকাশকদিগের সহিত পাঠক এবং গ্রাহকদিগের সংযোগ এবং সহানুভূতি খুব কম; এই পত্রিকার সৃষ্টি হইতে আমাদিগকে সংবাদ এবং প্রবন্ধাদি প্রেরণের দ্বারা সাহায্য করিতে সকলকে মধ্যে মধ্যে অনুরোধ জানাইয়া থাকি কিন্তু response বা সাড়া অতি কমই পাইয়া থাকি।

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী অধ্যায়ে অনেক গ্রাহক এবং পাঠক মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদিগের নাম ধামাদি পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই; এজন্ত আমরা তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। কিন্তু পরস্পরের চিন্তাধারা এবং অনুসন্ধিৎসার ফলাফল যেরূপ ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত এবং আলোচিত হইলে দেশের সমাজের, এবং জাতির কল্যাণ হইতে পারে সেরূপ কোনও সহকারীতা আমরা আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের নিকট হইতে একপ্রকার পাই না বলিলেই হয়। অথচ পাশ্চাত্য দেশের সমুদয় কাগজেরই ইহাই একটা বিশেষত্ব। রবিবারের Statesman এর Enquiry অধ্যায় পড়িয়া দেখিলে অনুসন্ধিৎসু কত ব্যাকুল নরনারীর জ্ঞানালোচনার ফলাফলের বিষয় যে আমরা জানিতে পারি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পরস্পরের চিন্তাধারা এবং অনুসন্ধানের ফলাফলের এই যে প্রতিনিয়ত আদান প্রদান চলিতেছে ইহার দ্বারা জগতের যে কি মহাকল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহার ধারণা করা যায় না। আর আমাদের দেশে কেহই এ সকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামায় না। কাহারও মনে খবরের কাগজে কোনও কথা লিখিবার ইচ্ছা হইলেও আলস্য এবং ঔদাসীন্যের জন্য আর তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না।

দেশব্যাপী জনসাধারণের মানসিক অবস্থাই যখন এইরূপ তখন কেহ যে উদ্যোগী হইয়া নিজেদের আরব্ধ কার্য্যের ফলাফল খবরের কাগজের মারফতে সকলের মধ্যে প্রচার করিবেন, এ দুরাশা আমরা রাখি না। তবে যোগীন বাবুর এই প্রস্তাব দেখিয়া আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ আপনাপন কৃতকার্য্যের ফলাফল আমাদিগকে লিখিয়া পাঠান তবে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারি।

কলিকাতার বাজার দর

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল,ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে,তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্তি পড়্তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের চলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটীর আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

বাজার দর

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৪ই জুন

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১৮১০
টাকশালে "	২১॥/১০
বড়ালের "	২১৷১০
চিনাপাত "	২১॥০
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৫৬।৶০
ঐ খুচরা	৫৬৸৶০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স
২৮ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ঘৃত

১৪ই জুন

মটকী—	৬৭৲
ভারতী—	৬৬৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৬০॥০
লক্ষ্মী—	৬
বাঁদাসাগর—	৫৪॥০

বাজার দর—তৈল

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটি (রাধা কৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর		২২৸০, ২৩৲
ঐ ১ মনের দর		২৩৲।
" ঐ খুচরা		২৬৲
" কানপুর টিন সমেত		২৪৲ ২৪॥০
" ঘানির		২৬।০ ২৮৲।
নারিকেল তৈল		২০॥০, ২১৲
রেড়ির তৈল		১৭॥০, ১৮৲। ২০৲

শ্রীললিতমোহন পাল (রাধাকৃষ্ণ অয়েল মিল)

বিনোদ মার্কা খাঁটি সরিসার তৈল

১৪ই জুন

১০০ টীন বা ততোধিক প্রতিমণ	২৩৲
১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টীনের কম	২৩/০
১১ টীন বা ততোধিক ১ গাড়ী কম	২৩৶০
খুচরা	২৪৲
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	২৸০

প্রাপ্তিস্থান—রায়সাহেব বিনোদবিহারী সাধু
২২।৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট ও ১৫৬নং অপার
সার্কুলার রোড, কলিকাতা

আটা, ময়দা, সুজী

পেটেন্ট ময়দার প্রতিমণ	৭৸৶০
মিহি " "	৭॥৶০
গৃহস্থী " "	৭৷৵
সুজী " "	৭৸৶০
আটা "ঘি" "	৭॥৶০
আটা ২নং "	৭।০
আটা এস মার্কা "	৭৶০
আটা ৩নং "	৫৲

উপরোক্ত মূল্য বস্তাসহ বুঝিতে হইবে।
কাসেম ও ইস্মায়েল, ২১নং আমড়াতলা গলি।

কেরোসিন তৈল

১। আমেরিকান তৈল :—

স্নোফ্লেক	৮৸৶০	প্রতিকেস
চেষ্টর	৮॥৶০	"
বানর	৮৶০	"
ঐ টিন	৩।৶০	"
বিলাতী	৩৷৶০	দুইটিন
হাতী—গ্যালন		৫৶০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। ঘর্ষা তৈল:—

কমল	৮।/০	প্রতিকেস
গ্লোব লাইট	৮৸৶০	"
উইণ্ডসর	৮।/	"
চক্র	৬।১০	ছুইটিন
সূর্য্য	৬।১০	"
তারা	৬৵১০	"
ভিক্টোরিয়া	৫৸১০	"
হাঁস	১০৸৫	"
ছাগল	৬।১০	"
মুর্গি ও চাবি	৫৸৵১০	"

তামা-পিতল

১৪ই জুন

	প্রতি হন্দ
ব্লক টিন, পিনাঙ্গ	১৫৪৲"
তামার ইন্‌গট, আর, টী,	৬২৲"
" " এস, ই, সি	৬২৲"
" " অষ্ট্রেলিয়ান	৬৩৲"
" চাদর ৪×৪	৬৫৲"
" স্ক্র্যাপ	৫২৲"
পিত:লর চাদর ৪×৫	৫৬।০"
" চাকি	৬১৲"
" স্ক্র্যাপ	৩৩৲"
" রড	৩৭৲"
হার্ড পেলটার	১৫৲"
সফট পেলটার, পি, এচ, ব্রাণ্ড	২১৲
ঐ লোজহাটি	২১৲
পিগলোড বি, এম, রিফাইণ্ড	১৭৲
ঐ বিলাতী	১৮৲
এন্টিমণি	৫০৲

বাজার শান্ত

প্রাণদাস বসুবাবাস, ৬২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মসলা

হলদী (মছলি পত্তন)	৯।০ ১০।০
ঐ (হিরোট)	১২।৶০
ঐ (কড়পী)	১১৸০
সুপারী (মাঝারি)	১৪।০ ১৫।০
ঐ বড়দানা (ঐ)	১৬৸০
ঐ পাজরী	১৬।০ ১৮৵০
ঐ (ছোট)	১৭৲
ঐ (জাহাজী)	২৲, ১৪৲
ঐ (দোকানী কাটা)	১৩৲
ধনিয়া	৮৲
গোল মরিচ (কানানোরী)	৬৫৲
ঐ (অলপী)	৬৪৲
লবঙ্গ	২৲, ২৶০, ২।০
এলাচি (বড়)	৩১।০, ৩২।০
ঐ (ছোট)	৫।০, [illegible]
সাগুদানা	৯।০, ৯।৶
এরারুট	৬।০, ৭।০
পিপুল (বড়)	৭০৲, ৭৫৲, ৮২৲
ধুনা (জাহাজী)	৬০৲, ৭০৲
ঐ (রেঙ্গুনী)	১৩৲, ১৩।০
বাদাম (কাগজী)	৩৮৲, ৪২৲
ঐ (কাঠিয়া)	২৫।০
মনাক্কা	১৬৲, ১৯৲
কিসমিস	২২।০
সোয়া	১৪।৮, ১৭৲
রজন	১১৸০, ১৪৲
সোহাগা (বিলাতী)	১০।০
আবীর (লাল)	৭।০,

হরিতাল	৪৮৲
আরকল (বড়)	১৸/৬
আরকল (ছিকাদার)	৩২৲, ৪০৲
নিশাদল	১৯৲
মূর্ব্বা	১৯৲
জয়ত্রী	৫।০, ৫৸০
তগ্ তগ	১৬৲
তুঁতিয়া	২১॥০
চন্দন (খাঁটি)	৭৮৲
মুসব্বর	২৭৲ ৩৫৲
মাজুফল	৩৬৲
ফিটকারী	৫॥০
পচাপাতা	২২৲
রাল	১২৬৲
সীসা	১১॥০
দারচিনী	১৩॥০
মুক্তাশথ	২৬।০
সিন্দুর (ভেলী)	১০৲, ১৫৲
ঐ (বস্তার)	৬০৲
বংশ লোচন	১১৲, ১২॥০
মহাভরী	১৫৲
কর্পূর (ভেলা)	১৪৭৲
শুঁঠ (দেশী)	২৪৲
তার্পিন	৭৲ ২৪৲
মিশ্রী (১—২নং)	৯৸০, ১০।০

শ্রীরাম মনোহর বিশ্বনাথ, ৯৪ নং লোয়ার চীৎপুর রোড, কলিকাতা

করগেট ও লোহা

২২ গেজ	করগেট	সিট	দর	১২॥০	হন্দর
২৪ "	"	"		১১৸৶০	"
[illegible]	"	"		১৪৲	"
২৪ "	আর পি, ডি	"		১২৸৶০	"
জয়েষ্ট	(কড়ি)	"		৬।০	"
বরগা	(ঐ)	"		৮॥০	"
পাটী		"		৮৲	"
বল্টু		"		৮৲	"
কাঁটাতার		"		১১৸০	"
মটকা		"		৷৶০	পিস

গদা নারায়ণ পাল এণ্ড সন্স ৩নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মেটাল ও পেণ্ট

কলিকাতা, ১৪ই জুন

ব্লক টীন পেনাজ ছাপ	১৫৩৸০	হন্দর
আর, টি তামার ইনগট	৬১।০	"
অষ্ট্রেলিয়ান ঐ	৫৮৸০	
পিগলেড, বি. এম, মার্কা	১৯।০	"
ঐ দেশী প্রস্তুত	১৮৸৶০	"
এ্যাণ্টিমনি, এ, এস, পি মার্কা	৭২৸০	"
ঐ অন্যান্য মার্কা	৬৭॥০	"
ফসফর ব্রোন্জ ইনগট	১২৮৸০	"
পিতলের চাদর ৪ × ৪	৭০।০	"
পিতলের ছড়	৬০৸০	"
কপার সিট ৪ × ৪	৮৫।০	"
কপার রড	৮৯।০	
সীসার সিট	২৪॥০	
জিঙ্ক ইনগট বিলাতী)	২১॥০	
" " দেশে প্রস্তুত)	২০॥০	
হাববাক্স হোয়াইট		
জিঙ্ক পেণ্ট	৫॥০	
" হোয়াইট লেড পেণ্ট	৩৫॥০	
[illegible] গ্রিন পেণ্ট	২৬।০	
রেড অক্সাইড পেণ্ট	২৬।০	

হাবাকের তারপিন প্রতি গ্যালন	৪৸৵১০
রংয়ের তেল পাকা "	২৸৵১০
ঐ কাঁচা "	২৷০
সিমেণ্ট মাটী দেশী প্রতি টন	৫৫৲
ঐ বিলাতী প্রতি ব্যারেল	১২৵০

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ মার্চ্চেণ্ট,
৮৬, এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাল, যব ও গম

অড়হর (গোটা)	৪৷৵০ হইতে ৪৷০
খেসারী (বড় দানা)	৪৸০ " ৪৸৵০
খেসারী	৫৸০ " ৬৷০
মুগুর (গোটা বড়দানা)	৫৸০ ৬৲
গম (কৈজাবাদী)	৫৷৵০, ৫৷০
ঐ (কাণপুরী)	৬৲, ৬৷০
ছোলা (গোটা) এলাহাবাদী	৫৵০
সরিষা	৯৷০, ৯৸০
ঐ (ছোট)	৮৷০ ৮৸০
রাই সরিষা (ছোটদানা)	৭৷০, ৭৸০
ঐ (বড়)	৮৷০, ৮৸০
মেথী (তেরেওা এলাহাবাদ)	৬৷৵০ ৬৸০
কাল মটর	৫৷৵০ ৫৷০,
ঐ ছোট	৪৸০, ৪৸৵০
ঐ সাদা	৫৲, ৫৵০
তিল সাদা	৭৷০, ৮৲
মঁশুর খাড়ী ডাল	৯৷০, ৯৷০

সেয়ার মার্কেটের খবর।

কলিকাতা, ২২শে জুন মহরম পর্ব্বোপলক্ষে সেয়ার মার্কেট বন্ধ থাকায় প্রকৃত পক্ষে মাত্র ৩ দিন এই সপ্তাহে কাজ হইয়াছে। পাটের কলের সেয়ারের কাজ বেশী না হইলেও মোটের উপর দর স্থির ভাবে রহিয়াছে। কয়লার খনির সেয়ারের দুই একটী ব্যতীত প্রায়গুলির দরই অপরিবর্ত্তিত ভাবে স্থির রহিয়াছে। চা বাগানের এবং কাপড় ও সূতার কলের সেয়ারের অল্পমাত্র কাজ হইয়াছে। নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ারের কাজ ও খুব কম পরিমাণ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কিছুই নাই।

কোম্পানীর কাগজ

৫৲ সুদের (১৯৪৫-৫৫) কোম্পানী কাগজের দর খুব তেজী হইয়া ১০২৵০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এবং ঐ দরে ও কেতার খুব আধিক্য

আছে বটে কিন্তু বাজারে বিক্রেতার অভাব হেতু বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। কিন্তু ৪৲ সুদের (১৯৬০—৭৫) কাগজের দর অনেক নীচু হইয়া ৮১।০ হইয়াছিল কিন্তু এই দরেও খরিদদার জোটে নাই। ৩॥০ সুদের কাগজের দর কমিয়া ৬৯।০ হইয়াছিল।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পূর্ণ) ১৪৪৫৲ এবং ঐ (বন্টিত) ৩৫২৴ দরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ১৮।০ এবং ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১০৩৲ দরে কাজ হইয়াছে।

রেল কোম্পানী

ডিহিরী, রোটাস লাইট রেলের ১৫৮০ দরে সামান্য কাজ হইয়াছে। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলের ১৫০৲ এবং সারা সিরাজগঞ্জ রেলের ৯০৲ দরে কাজ হইয়াছে। এই শেষোক্ত দুইটি রেলের সেয়ারের চাহিদা ও বেশ আছে।

কয়লার খনি

গত সপ্তাহে এই বিভাগের সেয়ারগুলির যেরূপ চাহিদা ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ তেজী দর হইয়াছিল, এই সপ্তাহে তাহার কিছুই নাই বরং অনেক স্থানে দর মন্দা হইয়াছে। রাণীগঞ্জের সেয়ারের উপরই লোকের খুব ঝোঁক পড়িয়াছিল এবং দর ৪৬।০ পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার গত বৃহস্পতিবার ৪২৲ পড়িয়া গিয়া পুনরায় শুক্রবারে যখন সকলে জানিতে পারিল যে টাটা কোম্পানীর সঙ্গে যে সকল মকদ্দমা চলিতেছিল তাহাতে টাটা কোম্পানীর হার হইয়াছে, তখন আবার দর ৪৬৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বেঙ্গল কোলের সেয়ার ৪৭০৲ পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষে ৪৬০।০ নামিয়াছে। এম্‌লগেমেটেড ১৩৲, বরাকর ১৫৲, ইকুইটেবল ২২৮০, ঘুসিক ও মুসলিয়া ৮৲০, পেঞ্চভেলী ৩৩৲ এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৬১৲ দরে কাজ হইয়াছে।

কাপড় ও সূতারকল

এই বিভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনই কাজ হয় নাই। তবে বেঙ্গল নাগপুর ৩২।০ আনাতে স্থির ভাবেই আছে এবং ডানবারের দর ২৩০৲ পর্য্যন্ত ছিল। মুইর মিলের সেয়ারে ক্রেতাগণ ২৩০৲ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সেয়ারের জন্য দিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু ঐ দরে কোন বিক্রেতা বেচিতে রাজী হয়েন নাই।

পাটের কল

প্রথমেই বলা হইয়াছে এই বিভাগে কাজ খুব সামান্যই হইয়াছে এবং যে কাজ হইয়াছে তাহার দর প্রায় স্থিরভাবে রহিয়াছে। তবে ছোট সেয়ারগুলির মধ্যে ক্লাইভ ও হাওড়ার দর হেসিয়ানের দর তেজী থাকার দরুণ সামান্য কয়েক আনা বেশী হইয়াছে। কিন্তু ন্যাশনালের দর বরাবরই ২৭।০ আনায় স্থির ভাবে রহিয়াছে।

পাট ও হেসিয়ানের দর

হেসিয়ান ৯ পোর্টার	১৪।০
পাট রিজেক্‌সন	১১।০

চা-বাগান

গত ১৭ই জুনের ৩নং নিলামের যে দর পাওয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকই সন্তোষজনক নহে। চা'য়ের "কোয়ালিটী" নানারূপ থাকায় গত সপ্তাহের দর হইতে এ সপ্তাহের দর এক আনা হইতে দেড় আনা নীচু হইয়াছে। কাজেই অনেকে ঐ তারিখের নিলামে মাল বিক্রী স্থগিত রাখিয়া পরে প্রাইভেট ভাবে পাউণ্ড প্রতি দেড় আনা কম দরে মাল ছাড়িয়াছে।

চা যদি ভাল কোয়ালিটীর হয় এবং প্রস্তুতও যদি খুব সতর্কতার সহিত ভাল ভাবে হয়, তবে তাহার দর বরাবরই তেজী থাকিবেই থাকিবে এবং চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়িবে।

আশা করি, চা বাগানের মালিক ও কর্মচারী বর্গ এ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

কাছাড় এবং শ্রীহট্ট জিলায় প্রবল বন্যা হওয়ায় অনেক বাগান ডুবিয়া গিয়াছে। এমন কি অনেক চা বাগানের চা প্রস্তুতের কারখানাগুলি যাহা সাধারণতঃ উঁচু জমিতে থাকে, তাহাও ডুবিয়া যাওয়ায় চা বাগানের সেয়ারের কাজ কর্ম প্রায়ই বন্ধ রহিয়াছে। যে দুই চারিটি সামান্য কাজ হইয়াছে, তন্মধ্যে সেন্ট্রাল কাছাড় ৮৮৲ হাতীকিরা ২১৷৷০ মহিমা ১৬৲ এবং ত্রিহানা ১৪৲ দরে কাজ হইয়াছে।

নানাবিধ কোম্পানী

এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। তবে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল ১৬৷৷০, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগনের সেয়ারে কোন ভিত্তিতেও না দেওয়ায় কোন সুবিধাজনক কাজ হয় নাই। ইলেকট্রিক সেয়ারের মধ্যে ভাগলপুর, জব্বলপুর, মজঃফরপুর ইলেকট্রিক সেয়ারের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে এবং সাজাহানপুর পাটনা এবং ঢাকা ইলেকট্রিকের সেয়ারের বেশ লাভ হইতেছে। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর সেয়ারের ১৩৲ এবং কর্পোরেশনের দরও ১৩৲ টাকা ছিল এবং মেদিনীপুর জমিদারীর সেয়ারের দর ১২৭৷৷ ছিল।

অন্য পাটের কলের সেয়ারের দর একটু স্থির-ভাবে ছিল কিন্তু শেষকালে ছোট সেয়ারগুলির দর বড়গুলি অপেক্ষা মন্দ হইয়াছিল। বাজারের ভাব মোটের উপর মন্দা। কয়লার খনি সেয়ারের মধ্যে অস্ত রাণীগঞ্জ ও ওস্তালের দর তেজী ছিল এবং ওস্তালের সেয়ারের চাহিদা বেশী ছিল দরও তেমনি ২৲ বৃদ্ধি হইয়াছে।

চা বাগানের সেয়ারের মাত্র একটি কাজ হইয়াছে।

নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই।

কোম্পানীর কাগজের দর স্থির আছে।

কোম্পানীর কাগজ।

৩৲ সুদের কাগজ	৫৯৲
৩৷৷০	৬১৷৵০, ৬০৷৷০, ৬১৷০
৪৲ সুদের বণ্ড (১৯৬০—৭০)	৮১৷৶০
৪৷০ (১৯৩৪)	৯৫৲

ব্যাঙ্ক।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ)	৫৯৲
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১৮৷৵০, ১৮৷৶০
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (বণ্টি)	৩৫২—
	৩৪?৲, ৪৫১৲

পাটের কল।

এংলো ইণ্ডিয়া	৪৪৫৷০
অকল্যাণ্ড	৩১৭৲, ৩১৪৲
বালী	৩০৮৲
বরানগর	৮৬৲, ২৮৮৲, ২৮৮৷০
ক্লাইভ	৩১৷৵০, ৩১৷৶০, ৩১৷০
ডেল্টা	৫৭৫৲
এম্প্যায়ার	৬৫৷০
কোর্ট মটার	৮৬৫৲, ৮৬১৷০
ইউনিয়ন	৪১০৲
হাওড়া	৫৭৷৶০, ৫৭৷৵০, ৫৭৷৶০, ৫৮৶০, ৫৭৷০

কামারহাটি	৫৮৮।০
কাঁকিনাড়া	৫৬৪৲; ৫৬০৲
ক্লাসনাল	২৯।৵০ ২৯৸০, ২৯৸৵০, ২৯।০
নিউ সেন্ট্রাল	৬১২৲
প্রেসিডেন্সী	১১৵০
রিলায়েন্স	৮১৸০, ৮১৲
ইউনিয়ন	৭০৮৲, ৭১০৲
ওয়েভার্লি	৮৸৵০

কয়লার খনি।

এমালগেমাটেড	১২৸৵০, ১৩৵০
ভুলান বরারী	২৫৸০
বোকারো ও রামগড়	১৪।০
সেন্ট্রাল ধর্মাবণ্ড	১৶০
পুরুলিয়া	৩।৵০
ইকুইটেবেল	২৩৲, ২৩ ০, ২৩।৶০
গোবিন্দপুর	২৵০, ২।০
নিউ বীরভূম	১৮৶০ ১৮৸১
" ভেতুড়িয়া	২/০, ২।০
নর্থ দামুদা	৫৲ ৫৵০
ওভাল	১১৸৵০, ১২।০, ১৩।০
রাণীগঞ্জ	৪৬৵০, ৪৫৸৵০, ৪৫।৵০
দামলা কোলিয়ারী	৭৸০, ৮৲
সিজারণ "এ"	১।০, ১।৵০

ঐ "বি"	২।৶০, ২।/০,
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	৬১।০
সুদামদী	১।৵০, ১৸০, ১।০

চা বাগান।

সাপই	১৪।০

নানাবিধ কোম্পানী

বেঙ্গল আসাম ষ্টিম সিপ	২৪৫৲
" টেলিফোন (অর্ডি)	১২।৵
" কেমিক্যাল (প্রেফ)	৯।০, ৯।০
কলিকাতা ট্রাম	১৩৲ ১৩।০ ১২৸৵০
গোরক্ষপুর ইলেক্ট্রিক্	১১৲, ১১'০,
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল	১৬।০
মেদিনীপুর জমিদারী	১২৭।০
টিটাগড় পেপার	১৪৲, ১৪।০
হুগলী ডকিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৯৲
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন (প্রেফ)	৮১৲

রবার কোম্পানী।

বালগাউনী	৩ ডলার
সুনাস	২ ডঃ ২২। সেণ্ট
তেলুক আনসন্	২ ডঃ ১২ সেণ্ট

বর্ষার কৃষি

ফুলবাগান

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কাটিং কলম চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কস্মকোষ, কেপগাঁদ', দোপাটী প্রভৃতি ফুলবীজ বপন করা হইয়াছে।

দোপাটী, ক্লটোনিয়া, ধুতরা, রাধাপদ্ম, মার্টিনিয়া, ক্যানা প্রভৃতি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই।

ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

সব্জী বাগান

মকাই, ছোট মোকাই এবং দে-ধান এই সময় চাষ করিতে হয়।

বিলাতী সব্জীবীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

পালম শাক ও বিলাতী বেগুন—টমেটো শীঘ্র ফসল করিতে হ'লে এই সময় বীজ বপন করিতে হয়।

আদা, হলুদ, হেরুজালেম, আর্টিচোক, এরারুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া এখন দাঁড় বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয়, এবং জলে গোড়া আলগা হইয়া পড়িয়া যায় না।

শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হয়। আমন বেগুণের বীজ ফেলিয়া এখন চারা প্রস্তুত করিতে হয়। নানাবিধ শাক, সীম, লঙ্কা, শীতের শশা, লাউ, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জীবীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ফলের বাগান

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আসবাব বৃক্ষ, যথা—শিশু, সেগুন, মেহগিনি, খয়ের, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এ সময় বপন করা উচিত।

আম, লিচু, পিচফল, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ার করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে এ সময় সচেষ্ট হইতে হয়। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইয়া উঠিবে।—সম্মিলনী।

আষাঢ় মাসেও যে সকল বীজ বপন করা যায় তাহার তালিকা,—

(১) সর্ব্বপ্রকার মুক্তকেশী বেগুন, সিঙ্গাপুর বেগুন, ৵৬ সেরা বেগুন, ফ্রেঞ্চ গোল বেগুন, কাটোয়ার ডাঁটা, পাটনাই ঝাড়, ভেঙ্গো ডাঁটা, দেশী ও আমেরিকান পুঁই, পেঁপে, সূর্য্যমুখী লঙ্কা, ধান লঙ্কা।

এই সকল বীজ হইতে চারা তৈয়ারী করিয়া জমিতে চারা রোপণ করিতে হয়।

(২) আমেরিকান ও দেশী বরবটী, ঝিঙ্গা, ভারায় বা মাচার শশা, মাটির বা ভুঁয়ে শশা, বর্ষার কুমড়া, চিচিঙ্গা বা হোপা, চালকুমড়া বা ছাঁচিকুমড়া, চাঁপা নটে, লাল বর্ষার শাক, পল্লনটে, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল বা খাঁকশা, দেশী ও জাপানী ধুন্দুল, সর্ব্বপ্রকার দেশী সীম, সিঙ্গাপুর লাউ, হলুদ, কচু, ওল, আম আদা, ঝাল আদা, চিনাবাদাম।

এই সকলের বীজ মাদায় বা হাপরে বপন করিতে হয়।

(৩) দেশী, ফ্রেঞ্চ ও আউসে মূলা বর্ষাতি বা আউসে মূলা, গোল ফ্রেঞ্চ ও এশু মূলা, শাঁক আলু, শোন, ধইঞ্চা, অরহর।

এই সকলের বীজ জমীতে চাষ দিয়া জমিতে ছিটাইতে বা বপন করিতে হয়।

রেলের টাইম টেবল

(সকলগুলিই কলিকাতার সময়)

ই, বি, রেল :—	কলিকাতা ছাড়ে	কলিকাতা পৌঁছে
খুলনা	রাত্রি ৩-৫২ মিঃ	ভোর ৫-২০ মিঃ
চট্টগ্রাম মেল	সকাল ৭ টা	রাত্রি ৭-৫৪ মিঃ
খুলনা প্যাসেঞ্জার	সকাল ৯ ৪০ মিঃ	সন্ধ্যা ৭-২ মিঃ
সান্তাহার	বেলা ১০-৩৪ মিঃ	ভোর ৫-২০ মিঃ
বরিশাল এক্সপ্রেস	বেলা ২-৩০মিঃ	বেলা ১০-২৯মিঃ
পূর্ণিয়া	বেলা ২-৪৪ মিঃ	সকাল ৭-১৪ মিঃ
পার্ব্বতীপুর	বেলা ৩-১৯ মিঃ	
আসাম মেল	বেলা ১২-১৫মিঃ	বেলা ৩-৫৮ মিঃ
গোয়ালন্দ	সন্ধ্যা ৬-৫৪ মিঃ	বেলা ১০-৪৯ মিঃ
ই, আই, রেল এক্সপ্রেস	সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ	সন্ধ্যা ৬-১৩ মিঃ
সিরাজগঞ্জ	রাত্রি ৮-১০ মিঃ	সকাল ৭-৪০ মিঃ
দার্জ্জিলিং মেল—	রাত্রি ৮-১০মিঃ	সকাল ৭-২৪মিঃ
যোগবানী—	রাত্রি ৮-৩৮ মিঃ	বিকাল ৩-৫ মিঃ
বেঙ্গল নর্থ এক্সপ্রেস —	রাত্রি ৯-১৫ মিঃ	ভোর ৬-৪০ মিঃ
খুলনা মেল—	রাত্রি ৯-৪৫ মিঃ	ভোর ৫-২০ মিঃ
ঢাকা মেল—	রাত্রি ১০-১০ মিঃ	ভোর ৫-৪৪ মিঃ
শিলিগুড়ী—	রাত্রি ১১-১৪ মিঃ	ভোর ৬ ৪০ মিঃ

বি, এন, রেল—	কলিকাতা ছাড়ে	কলিকাতা পৌঁছে
বোম্বাই মেল—	বিকাল ৪টা	সকাল ৭ ৫৪ মিঃ
মাদ্রাজ মেল—	বিকাল ৫-১২মিঃ	সকাল ১১-৪মিঃ
পুরী এক্সপ্রেস	রাত্রি ৮-২৪মিঃ	সকাল ৭-২০মিঃ
রাঁচী এক্সপ্রেস (ভায়া টাটানগর)—	রাত্রি ৯-২৪ মিঃ	সকাল ৬-৩০ মিঃ
গোমো এক্সপ্রেস —	রাত্রি ৯-৫৪মিঃ	ভোর ৫-৪৭মিঃ
ই, আই, রেল—		
বোম্বাই মেল	সন্ধ্যা ৭-৩০মিঃ	বেলা ১২-২০ মিঃ
কালকা এক্সপ্রেস	রাত্রি ৮-৩০মিঃ	সকাল ৭-৩০মিঃ
দিল্লী এক্সপ্রেস—(ভায়া গ্র্যাণ্ডকর্ড)	বেলা ২টা	রাত্রি ৮-৩৬ মিঃ
ঐ (ভায়া মেন)	বেলা ১১·৩০মিঃ	সকাল ৮টা
ডেরাডুন এক্সপ্রেস—(ভায়া গ্র্যাণ্ডকর্ড)	রাত্রি ৮টা	সকাল ৬-৪৪ মিঃ
বারাণসী এক্সপ্রেস—(ভায়া মেন)	রাত্রি [illegible]৫ মিঃ	সকাল ৬ ৩৯ মিঃ
আগ্রা এক্সপ্রেস—(ভায়া সাহেবগঞ্জ)	সন্ধ্যা ৭-৪০ মিঃ	সকাল ৭-২০ মিঃ
প্যাসেঞ্জার—	রাত্রি ১০-১৪ মিঃ	ভোর ৫-৩০ মিঃ

কীর্ত্তি কোনা টী কোম্পানী

শ্রীযুক্ত "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ফাল্গুন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় উক্ত কোম্পানী বিষয়ে আপনি যে বিবরণটী লিখিয়াছেন, উহাতে অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া গিয়াছে। আপনি একপক্ষ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে। আশা করি আমার এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া আপনি এ বিষয়ে সাধারণের নানারূপ ভুল ধারণা দূর করিবেন। এই বিষয়ে সমস্ত সঠিক সংবাদ আপনি এই সহিত প্রেরিত ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং এজেন্ট দিগের একখানি রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিবেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে, ইহা হইতে যথার্থ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আপনার পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে পারিবেন। এই রিপোর্টেই আপনি দেখিতে পাইবেন যে উহাতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সমস্তই কোম্পানীর নিজ কাগজ পত্র হইতে গৃহিত, সুতরাং উহাতে ম্যানেজিং এজেন্ট দিগের কল্পিত কিছুই নাই। যে কোন পাঠক আমাকে পত্র লিখিলেই এই রিপোর্ট একখানি পাইবেন।

আপনি লিখিয়াছেন, কোম্পানী Boom এর সময় মিত্র এণ্ড সন্স এই কোম্পানী গঠন করিয়া উহার শেয়ার বিক্রয় করেন। উহা ঠিক নহে, কারণ এই Boom এর অনেক পূর্ব্বেই কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। মিত্র এণ্ড সন্স উহার ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন। আমি তাঁহাদের ম্যানেজার ছিলাম মাত্র। এই কোম্পানী ছাড়িয়া আমি বিদ্যাসাগর কলেজে "মাষ্টারী" করিতেছি, আপনার এ কথাও একবারে ঠিক নহে, কারণ কোম্পানী ছাড়িবার পূর্ব্ব হইতেই আমি ওই "মাষ্টারী" করিতাম এবং বিদ্যাসাগর কলেজে "মাষ্টারী" করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই অন্য কলেজেও "মাষ্টারী" করিতাম।

আর একটী বিষয়েও আপনি তাঁহাদের উপর একটু অবিচার করিয়াছেন। মিত্র এণ্ড সন্সএর কোন কোম্পানীই "বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজাইয়া উঠে নাই এবং শরতকালের রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।" ইণ্ডিয়ান্ এঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানীর লিকুইডেশনের কারণ একেবারে অন্যরূপ, যাহার সহিত মিত্র এণ্ড সন্সএর কোনই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই সকল বিষয়ে এখানে আলোচনা করা অসম্ভব।

ম্যানেজিং এজেন্ট দিগের আমলে কোম্পানীর ৪টী বাগান ছিল, উহাদের নাম—নিউচর গোলা, টিপ্রাপাড়া, বেথুবাড়ী, এবং ভৈরবনগর; এবং প্রায় ৩৫০ একরের আবাদ ছিল। কোম্পানীর ওই সময়ের প্রস্পেক্টাস্ দেখিলেই আপনি এই সমস্ত জানিতে পাইবেন। যে কারণে এবং যে অবস্থায় তাঁহারা উহা ডিরেক্টর দিগের হাতে দেন তাহা এই সহিত প্রেরিত রিপোর্টেই দেখিতে পাইবেন।

এই ১, বৎসর তাঁহাদিগের পরিচালনায় উহার সমস্তই গিয়াছে। যে ১৫০ একর, ইঁহারা এখনও আছে বলিতেছেন, তাহা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়, কারণ, বাগানে কুলী ও ম্যানেজার ছিল না, সুতরাং সমস্তই জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। জঙ্গল কাটিয়া এখন কিছু গাছ পাওয়া যাইতে পারে। অবস্থা জানিবার উপায় নাই; কারণ, কিছুকাল হইতে ডিরেক্টর গণের রিপোর্ট কিংবা মিটিংএর নোটিস্ আমরা অনেকেই পাইতেছি না। মিটিং হয় কিনা তাহাও জানি না। বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেন্ট শান্তিবাবু, শুনিয়াছি মাত্র কয়েক টাকার শেয়ার কিনিয়াই কোম্পানীর "অংশীদার" হইয়াছেন, সুতরাং কোম্পানীর উন্নতিতে তাঁহার লাভের আশা কতদূর তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উপস্থিত মাসিক বৃত্তিই এ অবস্থায় তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। এরূপ বন্দোবস্তে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সাধারণে সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মিত্র এণ্ড সন্স তাঁহাদের অন্যান্য কোম্পানীতে কীর্ত্তিকোনার টাকা ধার দিতেন এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। তাঁহাদের এরূপ করিবার কোনই ক্ষমতা ছিল না। সভীয় রিপোর্টেই এ বিষয়ে যথার্থ ঘটনা লিখিত আছে। কেবল ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানীকে ডিরেক্টরগণ কিছু টাকা লাভের জন্য ধার দিয়াছিলেন। মিত্র এণ্ড সন্স এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারেন নাই, এবং বাধা দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। এই তাঁহাদের দোষ।

ইঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানীর লিকুইডেটরের রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ টাকার মধ্যে অনেক টাকা 'কীর্ত্তিকোণা' পাইয়াছেন। ঐ সমস্ত টাকা কি হইল? তাহাদ্বারা বাগানগুলি রক্ষা করা হইল না কেন?

মিত্র এণ্ড সন্স‌এর, শেয়ার ভিন্ন, কোম্পানীর নিকট, আরও অনেক টাকা পাওনা আছে। তাঁহারা যখন ইহার পরিচালন ভার ডিরেক্টরদিগের হাতে ছাড়িয়া দেন, তখন তাঁহারা, ঐ টাকা পরে তাঁহাদিগকে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। পরে, টাকা দেওয়া দূরে থাকুক, দেনাই অস্বীকার করেন। সব কথা এখানে বলিতে গেলে "পুঁথি বাড়িয়া যাইবে", কিন্তু এ কথা অংশীদার দিগকে জানান উচিত যে মিত্র এণ্ড সন্স অনেক পূর্ব্বেই প্রায় ২০০০০ টাকার দাবীতে কীর্ত্তিকোনার নামে কলিকাতা হাইকোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাহার শুনানী আরম্ভ হইবে। বিচারাধীন মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু বলিবনা, কিন্তু কীর্ত্তিকোনার রিপোর্ট প্রভৃতি ঐ বিষয়ে নীরব কেন?

আপনার উদ্ধৃত রিপোর্টে দেখিতেছি যে প্রফেসর এম্, এম্, ঘোস্, ৮০০০৲ টাকা এবং তস্য জামাতা ও 'অন্যান্য', ১৬০০৲ টাকা কোম্পানীর নিকট পাইবেন। এই ব্যাপারটী কি এবং কি জন্য উহারা হঠাৎ পাওনাদার হইলেন, একবার অনুসন্ধান করিতে পারেন। এই কোম্পানী বিষয়ে অনেক ব্যাপার আছে, আবশ্যক হইলে ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই মাত্র বলিয়া রাখিলে অন্যায় হইবে না যে মিত্র এণ্ড সন্স‌এর হাতে থাকিলে এই মূল্যবান সম্পত্তিটী এরূপ ভাবে নষ্ট হইত না এবং এতদিনে শতকরা বার্ষিক ৫০৲ টাকা না হইলেও, অন্ততঃ ২৫৲ টাকা হিসাবেও তাঁহারা অংশীদার দিগকে লভ্যাংশ দিতে পারিতেন। কয়েকজন নূতন এবং ব্যবসা কার্য্যে অনভিজ্ঞ অথচ অকপট চিত্ত ডিরেক্টর দিগের বুদ্ধির দোষেই কোম্পানীর এই দুরবস্থা হইয়াছে। এখনও ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং এজেন্টগণই, সম্ভব হইলে, ইহাকে বাঁচাইতে পারেন। শান্তিবাবু কিংবা অপর কেহই ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র মিত্র।

[illegible] বাদুরিয়া, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

আমাদের বক্তব্য

কীর্ত্তিকোনা টী কোম্পানী সম্বন্ধে আমরা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছি তাহা হুবহু এখানে প্রকাশ করিলাম। এই পত্রের সঙ্গে যোগেশবাবু একটী ইংরাজী Statement বা বর্ণনা পত্রও পাঠাইয়াছেন। ১৯২২ সালে কীর্ত্তিকোনার ডিরেক্টরগণ তাঁহাদিগের ম্যানেজিং এজেন্ট মিত্র এণ্ড সন্সের নামে যে সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন তাহার উত্তরে মিত্র এণ্ড সন্স ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসে এক বর্ণনা পত্র দাখিল করেন। সেই বর্ণনাপত্রের একটী মুদ্রিত কপিও যোগেশবাবু আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এই বর্ণনাপত্রে কীর্ত্তিকোনা এবং তাঁহাদিগের পরিচালনাধীনে অন্যান্য যে সকল লিমিটেড্ কোম্পানী ছিল তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থার অনেক আভাষ পাওয়া যায়, বাংলাদেশে যাঁহারা লিমিটেড কোম্পানীর সেয়ার খরিদ করেন তাঁহাদিগকে আমরা এই মুদ্রিত বর্ণনাপত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি। এই সকল বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে আমাদিগের দেশে কোম্পানী কি ভাবে পরিচালিত হয় তাহার অনেক রহস্য জানিতে পারা যাইবে এবং এইরূপ আলোচনার ফলেই লিমিটেড কোম্পানী পরিচালনা সম্বন্ধে লোকের জ্ঞানও বাড়িবে এবং জনমতও গড়িয়া উঠিবে। যোগেশবাবু যদি কোম্পানীর অবস্থা আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন তবে আমাদিগকে এ সম্বন্ধে আর কিছু না লিখিলেও চলিত, কিন্তু তিনি কোন কোন বিষয়ের উত্তর এমন ভাবে দিয়াছেন যাহাতে সাধারণের মনে সম্পূর্ণ ভুল ধারনা জাগাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

১। কীর্ত্তিকোনার Managing agencyর গঠন এবং পরিচালনা সম্বন্ধে ফাল্গুনের সংখ্যায় আমরা এইরূপ লিখিয়া ছিলাম।

"গত ১৯১৬ সালে ২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এই কোম্পানী রেজেষ্টী হয় এবং ইহার নাম The Kirtikona Tea Coy Ltd. রাখা হয়; Mitra & Sons ইহার Managing agents নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র এই Mitra & Sons এবং কীর্ত্তিকোনা টী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা; কোম্পানী গঠন করিয়া Mitra & Sons নাম দিয়া তিনি তাহার পরিচালনাও নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের সাহায্যে কাজ চালাইতে ছিলেন।"

ইহার উত্তরে যোগেশবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে লোকের চোখে ব্যর্থধুলা দেবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"মিত্র এণ্ড সন্স এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন; আমি তাঁহাদের ম্যানেজার ছিলাম মাত্র।"

এই উক্তির দ্বারা যোগেশবাবু সাধারণকে

বুঝাইয়া দিয়াছেন যে মিত্র এণ্ড সন্স নামক যে Managing agency firm ছিল তাহার সত্বাধিকারী সব অপর লোক; তাঁহার সহিত এই firmএর সত্বাধিকারীত্ব হিসাবে কোনও সম্বন্ধ ছিল না, তিনি কেবল মাত্র তাহাদের ম্যানেজার ছিলেন —এই যা সম্বন্ধ।—

কিন্তু যোগেশবাবু কি বলিতে চান যে প্রকৃত ঘটনাও তাই? আমরা জানিতে চাই যে এই Mitra & Sonsএর সত্বাধিকারী কে বা কাহারা ছিল? আমাদের সংবাদ এই যে যোগেশবাবু নিজেই এই কার্য্যের জন্মদাতা, প্রতিষ্ঠাতা এবং একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পুত্র, শ্যালক এবং ভ্রাতা সকলেই এই কার্য্য এবং তাঁহার স্থাপিত সমুদয় কোম্পানীর সহিত ঘনিষ্টভাবে সংস্থষ্ট ছিলেন।

এই রূপ আত্মীয় স্বজনের দ্বারা Managing agency firm গঠন করিলেই যে তাহা দোষের হইবে এমন কথা আমরা কদাচ বলিনা কিম্বা এরূপ মতও পোষণ করি না। তিনি যে বলিয়াছেন যে এই Mitra & Sonsএর তিনি কেবলমাত্র ম্যানেজার ছিলেন এই উক্তির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি; ইহা ইংরাজীতে যাহাকে Bluff বলে ঠিক তাই। সম্প্রতি কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোক কাউন্সিল নির্ব্বাচনের সময় প্রতিপক্ষের জবাবে বলিয়াছিলেন যে অমুকের সহিত আমার নিজের কোনও আত্মীয়তা নাই, সে আমার কেহ নহে, তবে আমার স্ত্রীর ভাই বটে। যোগেশ বাবুর জবাবটাও অনেকটা সেই ধরণের হইয়াছে। কীর্ত্তিকোনা টী কোম্পানী স্থাপন করিলেন তিনি; তাহার পরিচালনার জন্য আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে Mitra & Sons নাম দিয়া Managing Agency Firm ও করিলেন তিনি; এবং তাহার পর কীর্ত্তিকোনার যাবদীয় কীর্ত্তির প্রধান কর্ত্তা হইলেন তিনি; কিন্তু জবাব দাখিলের সময় তিনি বলিতে চান যে আমাকে Managing Agentরা কেবল মাত্র Manager রাখিয়াছিল। আমরা যোগেশবাবুর নিকট জানিতে চাই—এই কার্য্যের প্রতিষ্ঠাতা, সর্ব্বপ্রধান পরিচালক ও একমাত্র Controlling hand তিনিই ছিলেন কিনা? এসকল কথা গোপন করিয়া লাভ কি? অথবা লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মিতে পারে এরূপ উক্তি করাতেই বা কি সুফল ফলিতে পারে?

২। তিনি লিখিয়াছেন কোম্পানী গঠনের বহু পূর্ব্বেও তিনি মাষ্টারী করিতেন এবং এখনও আবার মাষ্টারীই করিতেছেন। কথাটা যোগেশ বাবুর ভাষায় বলি, "সম্পূর্ণ ঠিক নহে"। কোম্পানী গঠনের বহুপূর্ব্বে তিনি পুলিশের চাকুরী করিতেন বলিয়া জানি, পরে মাষ্টারী করেন। যাহা হউক সে ভালই হইয়াছে, ঘরে ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কামারের কুম্ভকার বৃত্তি অবলম্বন করা যে সুবিধাজনক নয় এই তথ্যটি আগে উপলব্ধি করিতে পারিলে এই দীনদরিদ্র দেশের অংশীদিগের কষ্টার্জ্জিত কয়েক লক্ষ টাকা এইরূপভাবে উপিয়া যাইত না। দেশের লোককে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলিতে সেয়ার কিনিবার জন্য যখন ডাকাইয়াছিলেন, তখন ত প্রতিদিন আকাশের চাঁদ হাতে ধরিয়া দিতেন। এখন কোম্পানীগুলি যাওয়াতে তিনি ত ঘরে ফিরিলেন, কিন্তু যাহাদের টাকাগুলি গেল গুরুকথায় তাহাদের সান্ত্বনা মিলিবে কি?

৩। আমরা লিখিয়াছিলাম কোম্পানী Boom এর সময় যোগেশ বাবু অনেকটি লিমিটেড কোম্পানী [illegible] কিন্তু সেগুলি ঠিক যথা-

কালের ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিয়া লুপ্ত হইয়া যায়। যোগেশ বাবু বলিতেছেন যে আমরা এই উক্তির দ্বারা তাঁহাদের প্রতি অবিচার করিয়াছি। কিন্তু এখনও আমরা আমাদিগের উক্তির পুনরুক্তি করিতেছি।

১৯১৩ সালে কীর্ত্তিকোনা এবং অন্যান্য চা বাগানগুলি খোলা হয়। ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মোটর কোম্পানী তাহার পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কানপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে তেলের কল তাহারও পরে স্থাপিত হয়। ১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে ভারতের বহুলোকের হাতে যথেষ্ট টাকা মজুত হইতে থাকে এবং শেষে এমন এক অবস্থা আসে যে লোকে টাকা যে কোথায় রাখিবে বা invest করিবে তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই সময় চতুর এবং বুদ্ধিমান লোকেরা নানারূপ পন্থা উদ্ভাবন করতঃ লোকের সঞ্চিত টাকা খাটাইতে সুরু করেন এবং সেই হইতে কলিকাতায় Land boom, Company boom ইত্যাদি আরম্ভ হয়।

১৯১৪ সালে জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯১৬ সাল হইতে যোগেশ বাবুর কোম্পানী রচনা সুরু হয়। সুতরাং এই সকল প্রতিষ্ঠানে যে হু হু করিয়া টাকা উঠাইয়াছিল তাহা Company Booming এরই একমাত্র ফল; নচেৎ যোগেশ বাবু কিম্বা তাঁহার সৃষ্ট Mitra & Sons এর মধ্যে এমন কোন বহুদর্শী অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর নাম ছিল না যাহার আকর্ষণে লোকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলিতে লক্ষ লক্ষ টাকার সেয়ার কিনিতেছিল। স্থাপিত হইবার কয়েকবৎসর পরেই এই কোম্পানীগুলি সূর্য্যালোকে মশার ন্যায় কিছুকাল নাচিয়া কুঁদিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। সুতরাং তাহারা যে কালে ব্যাঙের ছাতার দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল একথা লেখায় আমরা কি অবিচার করিয়াছি তাহা বুঝিলাম না।

যোগেশ বাবু কিম্বা তাঁহার স্থাপিত Mitra & sons যে অসাধু উপায়ে সাধারণের এই টাকাগুলি নষ্ট করিয়াছেন কিম্বা পকেটস্থ করিয়াছেন এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু তাঁহাদের দুর্দ্দৈব, অদূরদর্শিতা এবং অবিবেচনার ফলেই যে এই সকল কোম্পানী নষ্ট হইল তাহা বলিতে আমাদের কোনও দ্বিধা নাই।

যোগেশবাবুর নিজের উক্তি হইতেই দেখিতে পাই যে কীর্ত্তিকোনার অধীনে ৪টী বাগান ছিল; যদি এই বাগান কয়টী মিত্র এণ্ড সন্স সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে পারিতেন তবে অংশীরাও লাভবান হইতেন, ম্যানেজিং এজেণ্টরাও তাঁহাদের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইতেন এবং কীর্ত্তি কোনার কীর্ত্তিও রক্ষা পাইত। কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। তাঁহারা শুধু চা কোম্পানী করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; দিন দিন নূতন নূতন ব্যবসায়ে হাত বাড়াইতে লাগিলেন, এবং সেজন্ত নূতন নূতন কোম্পানীও গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন; অথচ এই সকল কোম্পানী পরিচালনা করিবার হাত, পা, মাথা, মগজ সবই এক যোগেশবাবুর। "এণ্ড সন্সের" মধ্যে আর যাঁহারা ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত ভাবে ছিলেন তাঁহারা সাক্ষী গোপাল মাত্র, আর সাক্ষী গোপাল না হইলেও পর্ব্বতের বোঝা মূষিকে বহন করিতে পারে না। ফলে একই লোককে ৪টী চা বাগান, একটী মোটর কোম্পানী—একটী ইঞ্জিনিয়ারিংএর কারখানা, পশ্চিমে আবার অয়েল মিল ইত্যাদি নানা কাজ কারবারের নিত্য অর্থের যোগান দেওয়া এবং তাহার আনুষঙ্গিক নানারূপ চিন্তা উদ্বেগাদি পোহাইয়া পৃথগার

সহিত সবগুলিকে চালনা এবং রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে একে একে প্রদীপগুলি তৈলাভাবে নিভিতে লাগিল।

লড়াইয়ের পর হইতে এ যাবত যতগুলি কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সবগুলির ধ্বংসের মূলকারণ প্রায় একই। ইহারা একটী কোম্পানী গঠন করিয়া সেটীকে Consolidate বা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার পূর্ব্বেই আর একটী কোম্পানী গঠন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং ছয় মাসে ছয়টী নূতন কোম্পানী গড়িয়া চারিদিক হইতে যখন টাকার টান পড়িতে আরম্ভ হয় তখন তাল সামাল্ দিতে অক্ষম হইয়া বেসামাল হইয়া পড়েন এবং অতঃপর দরজায় লালবাতী জালিতে বাধ্য হ'ন।

Chary কোম্পানী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় নানা কোম্পানীর মধ্যে আমরা এই একই দোষ লক্ষ্য করিয়াছি। কেবল রাজ্যজয় করিলেই হয় না, সেটীকে দখলে আনিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে অনেক কাঠিণ্ড লাগে। Conquest without Consolidation এর ফলে ইতিহাসে বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আলেকজাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ন ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। আমাদের প্রাচ্যদেশের রাজা গজনীর সুলতান মামুদকেও তাঁহার এক স্ত্রীলোক প্রজা উপদেশ দিয়া গিয়াছিল Don't acquire more Territories than what yon can manage. অর্থাৎ যে রাজ্য সুশৃঙ্খলার সহিত ব্যবস্থা করিতে পার না, তাহা দখল করিতে যাইও না; যতটা পার ততটাই কর।

আমাদের কোম্পানী পরিচালক বা managing agents দের মহারোগ এই যে একটা কোম্পানীতে তাহাদের তৃপ্তি হয় না, অথবা মন ওঠে না। কিছুই নূতন কোম্পানী গড়া চাই; তখন মনে থাকে না যে খাজায় দিন সামনে আসিতেছে; একবার টাল্ খাইতে সুরু করিলে সে টাল্ সামাল্ দিবার পক্ষে তোমার দেশের অবস্থা, অংশীদের stake, ধনীদের মনোবৃত্তি, ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যবহার—পারিপার্শ্বিক ঘটনা সবই তোমার প্রতিকূল। চারিদিকের এই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তোমাকে ধীরে—অতি ধীরে পথ দেখিয়া—পথের নানা বিঘ্ন ও fitfall সমূহ এড়াইয়া সন্তর্পনে পা বাড়াইয়া চলিতে হইবে।

তা' না করিয়া অংশীদিগকে ভোগা মারিয়া বোকা বুঝাইবার জন্ত এই সব Company Promoter বা Company Adventurers অমনি তর্কজাল জুড়িয়া দেন,—কেন?—বার্ড কোম্পানী অমন একগোটা কোম্পানী manage করিতেছে; Andrew Yule কত শত কোম্পানী চালাইতেছে—Octavus Steel, Shaw Wallace, McLeod ইত্যাদির অধীনে কত কোম্পানী সুপরিচালিত হইতেছে! আর আমরাই বা কেন পারিব না? আমরা বাঙ্গালী বলিয়াই কি দোষ হইল?—আমরা কম কিসে? উহাদের মধ্যে বি এ, বি, এস্-সি, এম, এ, এম, এস্ সি, কয়জন আছে? একরকম নেই বলিলেই হয়। আর? আর আমাদের কেরাণীদের মধ্যেই দুই চারিটা ডিক্রীধারী আছে। তা' ছাড়া বাঙ্গালীর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী জাত সমগ্র ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। তবে?—তবে আর কি! ওরা যা পারে আমরা তা ওদের চেয়ে খুব ভাল রকমেই—পারি বলি দেশের লোক আমাদের এই কোম্পানীর শেয়ারগুলি সব কিনে নেন।

সহজ বিশ্বাসী লোকে এই সব যুক্তি তর্ক শুনে

তাহাদের স্বভাবজাত খুব প্রবণতা এবং স্বদেশ প্রেমের আতিশয্যে (?) মনে করে তাইত,এরাই বা পারবে না কেন? সুতরাং সেয়ার কিনিতে সুরু করে।

এই সেয়ার কেনা যদি Invest ment এর idea থেকে করা হয় অর্থাৎ ১০।৫ হাজার টাকা করিয়া সেয়ার কেনা হয় তবে উভয় পক্ষেরই মঙ্গলের কারণ হয়। কিন্তু প্রত্যেক বাঙ্গালী কোম্পানীর গঠন প্রণালী অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় যে তাহার অংশী দিগের মধ্যে পনের আনা লোকই হয় ২৫ টাকার আর না হয় ৫০ টাকার সেয়ার কিনিয়াছে। Investment এর idea থেকে আদৌ নয়, কেবল ক্যানভাসার দের হাত এড়াইতে না পেরে অথবা স্বদেশ প্রেমের নিতান্ত ভণ্ড আদর্শ থেকে। এ যেন ঠিক ফাঁকী দিয়ে বৈতরণী পার হবার চেষ্টা অথবা পচা কলা দিয়ে নৈবিদ্য সাজিয়ে পুরুৎকে ঠকানো এবং ভগবানের মনোতুষ্টি করার চেষ্টা। এই ২৫৲ অথবা ৫০৲ টাকার একখানা সেয়ার কিনে এরা ভাবে ক্যানভাসার দের হাত থেকে ত নিষ্কৃতি পাওয়া গেল এবং স্বদেশ প্রেমও দেখান হোলো। কাহারও মনে হয় না যে এই সব অনুষ্ঠানে একটা investment করি। কোম্পানীতে যাহাদের stakeই হচ্ছে ২৫ টাকার কিম্বা ৫০৲ টাকার তাহারা সে কোম্পানীর crisis বা বিপদের সময়—নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া পেছনে মদৎ দিতে আসিবে কেন?—সে স্বতঃই মনে করে managing agent ব্যাটা যা পারে তাই করুক, আর নেহাৎ যদি লালবাতী জ্বালিতে হয় তবে আমার ওই ৫০৲ টাকা না হয় যাবে, স্বদেশ সেবা ক'রতে গেলে এরকম দণ্ড ত দিতেই হবে।

ইংরাজেরা পারে, আর আমরা পারি না কেন তাহার এত অসংখ্য কারণ আছে—যা বলিতে গেলে একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। ইংরাজদের যখন টাকার টান্ পড়ে তখন হাত পাতিবা মাত্র যে কোনও ব্যাঙ্ক তাদের টাকা দেয়, আর আমরা গলায় উত্তরীয় দিয়া দরজায় ধন্না দিলেও একটী পয়সাও দেয়ই না, উপরন্তু দরোয়ান রাস্তা দেখাইয়া দেয়। ইংরাজের ঠেকা পড়িলে তাহার অংশীগণ যে যেমন পারে আরও টাকা ঢালিয়া গ্যারান্টর হইয়া মদৎ দেয়, কারণ সেই সব কোম্পানীতে তাহার যে হাজার হাজার টাকা invest করা আছে। কোম্পানী গেলে যে সে সর্ব্বস্বান্ত হইবে। সুতরাং কোম্পানীকে বাঁচাইতেই হইবে। আর আমাদের? আমাদের কোনও investment নাই—আছে ক্যানভাসার তাড়াইবার এবং স্বদেশ প্রেম exhibit করার মত ২।১খানি ২৫৲ টাকা বা ৫০৲ টাকার সেয়ার যাহার application money দিয়া দুই একটী কলের হয়ত টাকা দিয়াছি! সুতরাং কোম্পানীতে stake কই?—তাহার জন্য দরদ কোথায়? স্বদেশী অনুষ্ঠান বা স্বদেশ প্রেমের টান? সেত ওই সেয়ার কিনেই দেখিয়েছি? আবার কেন? এখন Managing Agents যদি টাল সাম্‌লাইতে না পারে তবে দেশের লোকের কাছে তার বাপান্ত করিব এবং সব ব্যাটাই যে চোর একথা জোর গলায় চেঁচিয়ে বলে প্রমাণ ক'রব যে ব্যবসা বাণিজ্যে আজিও আমরা তৈরী হয়নি,আমাদের ম্যানেজিং এজেন্টরা আসল চোর, তাদের ব্যবসাবুদ্ধি নেই,—হিম্মৎ নেই, resource নেই। এদের দিয়ে কি কোনও কারবার হয়! অতএব সেয়ার কিনতে গেলে কাদাদের কাছে আর না——এখন থেকে কেবল গৌরাঙ্গ ভজ আর গৌর, গৌর, বল।

যে দেশের average mentalityই এইরূপ সে দেশে বিপদের সময় অংশীদের কাছে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যাবে না এ একরকম জানা কথা; ব্যাঙ্ক হ'তে কোনও accommodation দেবে না এও একরকম জানা কথা। এসব জেনে শুনেও যারা রোজ একটা ক'রে নূতন কোম্পানী স্থাপন করে তাদের ব্যবসা বুদ্ধির উপর আমাদের কোনও আস্থা নাই। পোলোয়া কালিয়া খেতে ভাল কিন্তু হজম শক্তি থাকা চাই।

ইউরোপীয়েরা দশ বিশটা কোম্পানী চালাচ্ছে, তাদের নিজেরও যেমন শক্তি সামর্থ্য, সাহস ও হিম্মৎ আছে তেমনি পিছনে বল, ভরসা এবং সংঘবদ্ধ টাকার (organised Capital) জোর আছে। তোমার আমার পশ্চাতে কি আছে? —আছে কেবল বাক্যের ফোয়ারা আর ধাপ্পা-বাজীর ঢেউ। এই ফোয়ারা এক বার ৬ মাসে স্বরাজ আনার ধাপ্পা দিয়াছিল, আবার এবার আর এক ধাপ্পা ভাঁজিতেছে। আমাদের সদা প্রভুর (In the year of our Lord God) এই ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের কাল রাত্রি দ্বাদশ যাম অতিক্রম করার পূর্ব্বে দুর্ব্বিনীত ইংরাজরাজ যদি স্বেচ্ছায় রাজ্যটা আমাদের মত বাক্যবাগীশদের হাতে তুলিয়া দিয়া ভাল মানুষের মত "উত্তু্ পেনাম্বি সাগরম" অর্থাৎ ভেলায় চড়িয়া সমুদ্রপথে নিজের দেশে চলিয়া না যায় তবে যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি রবে আমরা বাঙ্গলার গগন পবনে এমন বিচিত্র বিচিত্র কলরব তুলিব যে তাহার জ্বালায় ইংরেজের চৌদ্দপুরুষ বাপ্ বাপ্ করিয়া দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে। আমাদের পশ্চাতে এই রকম বাক্যের বল ভরসাই আছে। এ বুদ্ধিতে যাহারা ব্যবসাক্ষেত্রে পা বাড়াইতে না যানে তাহাদের স্কুল কলেজের টাকা জোর দিয়া বাহির করিয়া আনা আমরা অপর্ব বলিয়া মনে করি। এইজন্য বলি যা সয় তাই কর। তুমি ছাগলে চড়িতে পার না, রেসের ঘোড়ায় চড়িতে যাও কোন্ সাহসে? আগে বাবা ছাগলে চড়, গাঁয়ের বেতো ঘোড়ায় ওঠ, টাটু ঘোড়া ছুটাও শেষে Raceএর ঘোড়া ছুটাইতে যাইও।

তারপর যোগেশবাবু বলিয়াছেন,—Mitra & Sons তাঁহাদের অন্যায় কোম্পানীতে কীর্ত্তি-কোনার টাকা ধার দিতেন এ কথা "সম্পূর্ণ ঠিক" নহে। এই "সম্পূর্ণ ঠিক" কথাটা ঠিক উকিলী মার পেঁচের বুদ্ধির সহিত ব্যবহার করা হইয়াছে। "সম্পূর্ণ ঠিক" নহেত কতখানি ঠিক তাহা যোগেশবাবু বলিয়া দিবেন কি? তাঁহার প্রেরিত Reportএ দেখিলাম কীর্ত্তি কোনার ডিরেক্টরেরা Mitra & Sons এর বিরুদ্ধে চার্জ্জ আনিয়াছেন—

The Managing Agents wrongfully viacrted funds of the Company to another Company which was on the verge of insolvency. অর্থাৎ Managing এজেন্টস্ কীর্ত্তিকোনার মূলধন অন্যায় এবং অবৈধ-রূপে এমন একটা কোম্পানীর পিছনে ঢালিয়া দিয়াছিলেন যাহার অবস্থা তখন দেউলিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এ কথার উপর আর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

আমরা ডিরেক্টরদের কথা বিশ্বাস করিব না Managing Agents দের কথা বিশ্বাস করিব? যাঁহাদের পরিচালনার ফলে কোম্পানী এই দশায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং যাহার কারণ অনুসন্ধান [illegible] সমূহ কাগজপত্র এবং facts [illegible] করিয়া ডিরেক্টরগণ ম্যানেজিং এজেন্টদিগের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ আনয়ন

করিয়াছেন তাহা একেবারে উড়াইয়া দিবার মত কোনও materials বা মাল মসলা আমরা দেখিতে পাইলাম না।

এই অভিযোগের উত্তরে যোগেশ বাবু—লিখিয়াছেন—

"মিত্র এণ্ড সন্স তাঁহাদের অন্যান্য কোম্পানীতে কীর্ত্তিকোনার টাকা ধার দিতেন একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। তাঁহাদের এইরূপ করার কোনই ক্ষমতা ছিল না। কেবল ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীকে ডিরেক্টরগণ লাভের জন্য কিছু টাকা ধার দিয়াছিলেন, মিত্র এণ্ড সন্স এবিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারেন নাই এবং বাধা দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। এই যা তাঁহাদের দোষ।"

যোগেশবাবুর জবাবের ভঙ্গীটা এমনি যে ডিরেক্টরগণ কীর্ত্তিকোনার তহবিল হইতে টাকা নিয়া অন্যান্য কোম্পানী গুলিকে দিবার জন্য যেন জেদ করিয়াছিলেন; ডিরেক্টরদের জেদের বিরুদ্ধে তাঁহারা বাধা দিবেন কি করিয়া? তাঁহারাত হাজার হ'লেও চাকর মাত্র। সুতরাং ডিরেক্টরদের কাজে বাধা দিবেন কি করিয়া? যদি আপনারা দোষ বলেন, তবে এইটাই তাঁহাদের দোষ হইয়াছে।

যোগেশবাবুর জবাবটার ভাব এইরকম। কিন্তু তিনি কা'কে বোকা বুঝাইতে চান?— আমাদের সংবাদ এই, যে Indian Engineering কোম্পানীকে কীর্ত্তিকোনার টাকা ধার দেবার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই যোগেশ বাবুর চেষ্টায় এবং তাঁহারই জপানোর ফলে তদানীন্তন ডিরেক্টরগণ এই ফাঁদে পা দিয়া কীর্ত্তিকোনার সর্ব্বনাশ করেন।

এদেশের কোম্পানী গঠন এবং ডিরেক্টরদের ক্রিয়াকলাপ যাঁহারা জানেন তাঁদের কাছে যোগেশবাবুর এ জবাব বালকোচিত বলিয়া মনে হইবে। এ দেশে কোম্পানী গঠন করে Managing Agentরা এবং কোম্পানীর দুধ, সর, ক্ষীর, চাঁছি সবটাই উপভোগ করে Managing Agentরা; কারণ কোম্পানীতে তাদের স্বার্থ যেমন ষোলআনা বজায় থাকে এমন আর কারো থাকে না। সুতরাং প্রথম দফায় ডিরেক্টর মনোনয়ন করার সময় চতুর ম্যানেজিং এজেণ্টগণ বাছিয়া বাছিয়া এমন সব নামজাদা হবুচন্দ্র ডিরেক্টর পাকড়াও করে যারা একেবারে Noninterfering অর্থাৎ—কোনও কাজে খোঁচাখুঁচি করে না, ব্যবসা বুদ্ধি সম্বন্ধে একেবারে খাজা নীরেট; অথচ ডিরেক্টরের ফিয়ের টাকাটা পকেটে পুরিবার জন্য লালায়িত। ইহারা সভায় যোগ দিয়াই বলে সব ঠিক আছে ত? অর্থাৎ ফিয়ের টাকাটা মোড়ক করিয়া রাখিয়াছ ত? তারপরের জিজ্ঞাস্য— কোথায় সহি করিব? ব্যস্! ডিরেক্টরের কাজ হইয়া গেল।

এই জাতীয় ডিরেক্টরগণ পাকা ঘাগী ম্যানেজিং এজেণ্টদের হাতে কাদার তালের মত ব্যবহৃত হয়। এজেণ্ট তাহার নিজের খেয়াল, স্বার্থ বা সুবিধার জন্য কখনও ইহাদিগকে শিব গড়িতেছে আবার কখনও বা ইহাদিগকে বাঁদর বানাইতেছে। এ দেশের কোম্পানী পরিচালনা আজিও একরূপ সম্পূর্ণ ভাবেই ম্যানেজিং এজেণ্টদের করতলগত এবং কবলগ্রস্ত। ম্যানেজিং এজেণ্টরা যাহা ইচ্ছা করে, ডিরেক্টর দিগকে বোকা বানাইয়া তাহাই করিয়া লয়। যোগেশবাবু আজ নির্লিপ্ত সাধুর মত তাই লিখিতেছেন যে Indian Engineering কোম্পানীতে কীর্ত্তিকোনার এই টাকা ধার দেওয়া ব্যাপারে তাঁহাদের ত হাত ছিলই না, পরন্তু ডিরেক্টরদের এই অন্যায় কার্য্যে বাধা দিবার তাঁদের

এখন ইচ্ছা থাকিলেও তা তাঁরা ক'রতে পারেন নি—কারণ সে ক্ষমতা তাঁদের ছিল না—এই যা তাঁদের দোষ।

যোগেশবাবু যে জবাব দিয়াছেন তার ভাবটা ঠিক এই রকমের। আমরা বলি চালাকীর একটা সীমা আছে; এবং মানুষ বোকা হইলেও একেবারে অত বোকা নহে। আমাদের সংবাদ এই যে Indian Engineering কোম্পানীকে টাকা ধার দিবার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত—প্রস্তাব করা হইতে ডিরেক্টরদের বোকা বানাইয়া পাশ করাইয়া নিবার সমুদয় ধাপেই যোগেশবাবু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া এই কার্য্যটী হাসিল করিয়া লইয়া ছিলেন, এখন বেগতিক দেখিয়া Resolution কয়টী তুলিয়া দিয়া ডিরেক্টরদের scape goat বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু Bluffing সব জায়গায় চলে না এবং সবাই কীর্ত্তিকোমার নির্বোধ নহে।

আমরা এত কথা এমন করিয়া লিখিতাম না, যদি দেখিতাম যোগেশবাবু তাঁহার জবাবে সরল সহজভাবে সব দোষ ত্রুটি স্বীকার করিয়া যাহাদের কয়েকলক্ষ টাকা তাঁহাদের বুদ্ধির দোষে নষ্ট হইয়া গেল তাহাদের এখনও কি করিয়া রক্ষা করা যা'য় সে সম্বন্ধে আলোচনার অবতারনা করিতেন। তা না করিয়া কিছু লোকের চোখে ধূলি দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন; এইজন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনেক অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করিতে হইল।

যোগেশবাবু তাঁহার জবাবে প্রফেসর M. M. Bose এবং তাঁহার জামাতার ইস্তফার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন। আমরাও এ সম্বন্ধে প্রফেসর বসু মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিতেছি এবং তাহার ফলাফল যথাসময়ে ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাহির করিব।

সম্প্রতি আমরা শুনিতে পাইলাম যে উক্ত কোম্পানী ডিবাবুর হাত হইতেও বাকি বাগান কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং এবার নাম ধাম সব বদলাইয়া সম্পূর্ণ এক নূতন নামে কোম্পানীর সেয়ার বাজারে বিক্রয় করা হইতেছে। আন্দামান দ্বীপ হইতে জনৈক এক গৌরাঙ্গকে আমদানী করিয়া চূড়োভাবে বসানো হইয়াছে যাহাতে গৌর রূপ দেখিয়া লোকেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব এই কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে ঢালিয়া দেয়। কীর্ত্তিকোমার কীর্ত্তি দিনে দিনে রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে; আমরা এসম্বন্ধে তদন্ত করতঃ আগামীতে সকল বিবরণ প্রকাশ করিব।

আলু রক্ষার উপায়।

বর্ষাকাল আসিল; এইবার পোকা এবং পচনের হাত হইতে আলু রক্ষা করাই দোকানীদের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। আমরা এই প্রবন্ধে আলু রক্ষা করার উপায় আলোচনা করিব। শীতকালে আলুর ফসল ক্ষেত হইতে উত্তোলিত হয় এবং নানা স্থান হইতে বড় বড় [illegible] সব আলু মহাজনদের গুদামে আমদানী করা হয়; বাজারের পাইকার ও খুচরা দোকানদারেরা এই সব আলুর গুদাম হইতে বাজারে আলুর আমদানী করিয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শেষাশেষি পর্য্যন্ত [illegible] আলু [illegible] এবরকম [illegible] শেষ হয়। [illegible] পর এই আলুকে [illegible] এবং

পচনের হাত হইতে রক্ষা করাই এক বিরাট সমস্যা। কারণ এই আলুর পুনরায় নূতন ফসল বাজারে আমদানী না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা আগামী আশ্বিন মাস তক্ ব্যবহৃত হইবে।

একদিকে আলুর উৎপত্তি এবং আমদানী যেমন বন্ধ হইয়া যায়, অপরদিকে তেমনি আবার পোকা এবং পচনের জন্ত বহু আলু নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আষাঢ় মাস হইতে আলুর দাম ক্রমেই বাড়িতে বাড়িতে আশ্বিনের কাছাকাছি এক এক সময় ।৵০ আনা ॥০ আনা সের দাঁড়ায়, অথচ বর্ত্তমান সময়ে /১০ পয়সা ৵০ আনা সের আলু বিক্রয় হইতেছে।

এই কীট পতঙ্গ এবং পচনের হাত হইতে কি উপায়ে আলু দীর্ঘকাল টাটকা রাখা যায় এ সম্বন্ধে পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানবিদ নানারূপ তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন, কারণ, আলু সমগ্র মানবজাতির এক staple food বা প্রধান খাদ্য। এ দেশে আলু রক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি কর্ম্মচারী যে সকল উপায় বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এইখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। যাহারা আলুর ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাঁহারা এই সকল উপায় পরীক্ষা করতঃ ফলাফল আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

বিগত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, ইতালী দেশের আলুর সহিত বীজ আলুর একটী প্রধান শত্রু এদেশে আসিয়াছে। প্রথমতঃ, পাটনাতেই এই পোকার উপদ্রব ঘটিয়াছিল। অধুনা সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগণা, বর্দ্ধমান, হুগলী ও আসাম প্রভৃতি স্থানেও, এই পোকার উপদ্রবে আলুর বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। বীজের জন্য যে আলু সঞ্চিত রাখা হয় সেগুলিকে উহারা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই পোকাগুলি এক প্রকার ছোট প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-প্রজাপতিগুলি আসিয়া পাতার নিম্নদেশে ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির এবং তাহারা পাতা কিম্বা ডাঁটার ভিতরে যাইয়া শাখা খাইতে আরম্ভ করে। ফলে এই উপায়ে যে কীটদষ্ট পাতা ও ডাঁটাগুলি একেবারে শুকাইয়া যায়। ইহাতে আলুর যেটুকু ক্ষতি হয় তাহা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ক্ষেতের যে সকল আলু মাটীর বাহিরে জন্মে, তাহাদের চোখের উপরও প্রজাপতিগুলি ডিম পাড়িয়া যায়। এই ডিম ফুটিলে, পোকাগুলি আলুর শাখা খাইতে খাইতে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ কীটদষ্ট আলুও ভাল আলুর সহিত গুদামজাত হইয়া থাকে।

বিপদ এইখানে ; পোকাগুলি ১৫ দিনের মধ্যেই প্রজাপতিরূপে আলু হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য ভাল আলুর চোখের উপর ডিম পাড়ে। এইরূপ ভাবে ক্রমশঃ সমস্ত আলুই কীটদষ্ট হইয়া পড়ে। আলুর চোখের কাছেই পোকার নাদী জড় হইয়া থাকে। তদৃষ্টেই আলুর ভিতরে পোকা আছে কিনা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১০।১৫ দিনের মধ্যেই পোকাগুলি সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পোকাগুলির বর্ণ শ্বেত এবং দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি হয়। ইহারা আলুর বাহিরেই পুত্তলি করিয়া থাকে। প্রত্যেকটী স্ত্রী প্রজাপতি অন্যূন একশত ডিম প্রসব করিয়া থাকে।

এইবার কেমন করিয়া এই কীটের হাত হইতে আলু রক্ষা করা যায় আমরা তাহার আলোচনা করিব। প্রথমে গুদামের কথা বলি।

শীতল ও শুষ্ক গৃহেই আলুর গুদাম করা উচিত। গুদাম ঘরটি অন্ধকার রাখিতে হইবে,

কিন্তু তাহাতে হাওয়া খেলিবার উপযুক্ত [illegible] চাই। মেঝে হইতে কিছু উচ্চে মাচা প্রস্তুত করিয়া, তদুপরি বীজ আলুগুলি বিস্তৃত ভাবে রাখিতে হয়। যে আলু গুদামজাত করিতে হইবে, সে গুলি ভাল করিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। কীটদষ্ট অথবা পচা আলু গুদামে স্থানলাভ করিলে গুদামের সমস্ত আলুই কীটের উপদ্রবে পচিয়া নিঃশেষ হইতে পারে। মাচাতে এক ইঞ্চি পুরু একপরত শুষ্ক বালুর উপর আলু রাখিতে হয়। সকল আলুর উপরই বালুর ছিটা দিবে। আলু রক্ষার এইটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রত্যেক মাচাতে দুই তিন পরত (স্তর) আলু রাখা যায়। প্রথম একপরত আলু রাখিয়া, তদুপরি আবার বালু ছড়াইয়া দিতে হয়। এই বালুর উপর দ্বিতীয় পরত আলু রাখা যায়। এইরূপে বালুর মধ্যে স্তরে স্তরে আলু রাখার প্রথাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। কিন্তু যাহাতে মাচার উপর বালু বা আলু স্তরের উচ্চতা এক হস্তের অধিক না হইয়া পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ তাহা হইলে, আলু গরম হইয়া পচিয়া যাইতে পারে পক্ষান্তরে একটি আলুও যাহাতে বালুস্তরের বাহির হইয়া না পড়ে, সে দিকেও নজর রাখা উচিত।

গুদামের সকলগুলি আলুই বালুতে ঢাকা থাকিলে, উক্ত প্রজাপতিগুলি আলুর উপর ডিম পাড়িয়া যাইতে পারে না। নদীর বালি উত্তমরূপে শুষ্ক ও শীতল করিয়াই তাহা ব্যবহার [illegible] হয়। সময় সময় গুদামের আলুগুলি [illegible] উচিত। গুদামে কোনও আলু [illegible] নিয়াছে দেখিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ বাছিয়া আনিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে হয়। অথবা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উনুনের আগুনে পোড়াইয়া ফেলা। তাহা হইলে পোকার বংশ সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ করিতে পারিলে অনেক ডিম নষ্ট হইয়া যায়। ফলে কীটের উপদ্রব খুব কমিয়া থাকে। বিহার ও উড়িষ্যার কৃষি বিভাগ নানা পরীক্ষার পর, আলু রক্ষার উক্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উপায় অবলম্বন করাতে, পরীক্ষায় সুফল ফলিয়াছে।

আলুর ক্ষেতে পোকার উপদ্রব ঘটিলে, যে সকল আলু গাছের পাতা শুষ্ক হইয়া ঝলসিয়া যাইতেছে, সেই সকল গাছ উঠাইয়া আনিয়া, পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে কীটের উপদ্রব অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে। পোকার উপদ্রব আরম্ভ হইবা মাত্রই, তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। যে সকল সারিতে আলু রোপণ করা হয়, সেই সকল সারির ব্যবধান যদি একটু বেশী করা যায়, তাহা হইলে মাটীর বাঁধও প্রশস্ত হয়; ফলে আলুগুলি মাটির বাহিরে আসিতে পারে না। আলুগুলি মাটির বাহির হইয়া আসিলেই, স্ত্রীজাতীয় প্রজাপতি তদুপরি ডিম প্রসব করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহা না হইলে, উহাদিগের বংশবৃদ্ধির অসুবিধা ঘটে। সুতরাং কীটের উপদ্রব খুব কম হয়। যে সকল স্থানের আলুক্ষেত্রে কীটের উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তথাকার আলুক্ষেত্রের সারিগুলির ব্যবধান যথোচিত প্রশস্ত করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়।

উপরে যে পোকার কথা বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আরও ২।১ জাতীয় পোকা আলুগাছের অনিষ্ট করিয়া থাকে। কেবল গাছে যে সকল কীটের উপদ্রব হয়, সেই সকল কীট ও আলুর অনিষ্ট করে।

একরূপ সবুজ রঙের পোকা অনেক সময় আলু গাছে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা গাছের সমস্ত রস চুষিয়া খাইয়া ফেলে, ইহাতে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয়। আক্রান্ত গাছগুলি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্ষেত্রের কোনও আলুগাছে এই জাতীয় পোকা দেখিলেই তাহা মারিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে বাছিয়া বাছিয়া পোকা মারিয়া ফেলিতে পারিলে, কোনরূপ বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মিত্র।

ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তথা লালা হরকিষেন লাল জনৈক বাঙালীর উপর "ভারতের" বেঙ্গল ব্রাঞ্চের চার্জ ন্যস্ত করেছেন; ইনি কেবল বাঙালী ন'ন, পরন্তু একজন উচ্চশিক্ষিত মেধাবী বাঙালী। তীক্ষ্ণ ব্যবসা বুদ্ধি সম্পন্ন হোলে যে কয়েকজন ভারতবাসী সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন হরকিষেণ লাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ব্যবসায়ে এঁর সাফল্য লাভের প্রধান হেতুই হচ্ছে এই যে লোক বেছে নেবার এঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে। বাংলাদেশে ব্যবসা করতে হোলে—বিশেষতঃ বীমার ব্যবসা—উপযুক্ত বাঙালীর দ্বারা সে কাজ যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা, কোনও অবাঙালীর দ্বারা সেরূপ হবার আশা করা যায় না। চতুর, মেধাবী হরকিষেণ লাল এই সত্যটী উপলব্ধি কোরেই Mr. T. C. Gupta কে বেঙ্গল ব্রাঞ্চের ম্যানেজার এবং যুবক কর্মী শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্তীকে Organising Secretary নিয়োগ করেছেন। উৎসাহী [illegible], স্থির এবং শান্ত, আশা করা [illegible] এঁদের ব্যবস্থায় [illegible]

পোড়বে। All Bengal Teachers Conference উপলক্ষে হরিচরণ বাবু কিছুদিন আগে রাজসাহী গিয়াছিলেন এবং সেখানে ভারতের জন্য জমি তৈরী কোরে রেখে এসেছেন। মিঃ বিঃ সিঃ দাস মেদিনীপুর জেলা organise কোরতে গিয়েছেন। আমরা বহুবার বোলেছি বিনা মূলধনে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনের যদি কোনও বিরাট ক্ষেত্র থাকে তবে সে বীমার কাজে। মেদিনীপুরে বেকার যুবকদিগের মধ্যে যাঁরা [illegible] কাজে দক্ষ তাঁরা Mr. Das, এর সহিত [illegible] করুন এবং ভারতের এজেন্সী গ্রহণ [illegible] বীমার কাজে লেগে যান। একেবারে রিক্ত হস্তে বিনা মূলধনে অর্থোপার্জ্জনের এমন রাস্তা আর নেই। তবে লেগে [illegible] এবং বুঝে নিয়ে তাঁর কোম্পানীর [illegible] যোগাড় [illegible] দিতে হয়। নচেৎ বাজে কোম্পানীর [illegible] হোলে তাঁরা একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন।

[illegible] এইজন্য কোরলাম [illegible] বীমা কোম্পানীর মধ্যে [illegible] [illegible]। গত [illegible] বৎসর ধোরে [illegible]

শুধু ধর্ম্মসমবায়ের কাছ থেকে একটা Plot নিলেই আবার হয় না। তার পর জঙ্গল কাট্‌তে হবে, ভেড়ী বাঁধ্‌তে হবে, লোনা মার্‌তে হবে, প্রজাপত্তন কর্‌তে হবে, হাল, গরু কিনে দিতে হবে, চাষ আবাদ কর্‌তে হবে, তবে ফসল পাবার ব্যবস্থা হবে। এর জন্যে পেছনে ধনবল, জনবল দুই চাই। মিঃ জে, সি, দাস এবং ইন্দুবাবু উভয়েরই পিছনে ধনবল ছিল, উভয়েই দুইটী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং টাকার facility বা স্বচ্ছলতা, এবং ক্রেডিট উভয়েরই যথেষ্ট ছিল এবং আছে। এই জন্যেই দুইজনে দেখতে দেখতে দুইটী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এই নবাগতদের পিছনে কি আছে—জানি না। এঁদের ঠিক আখড় বোল্‌তে পারি না কারণ এঁরা এখনও ক্যাদিম্‌ই দিচ্ছেন। আমরা তাঁদের নিরুৎসাহ কর্ত্তে বা বা বোল্‌তে চাই না। শুধু পথের দুর্গমতার কথা একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম। পর্ব্বতের চোখা দুর্দিকের পক্ষে বওয়া সোজা নহে।

* * *

ইউনিকের Valuation Report বাহির হইয়াছে। প্রথম Quin quennial এ হাজার করা ৫০ টাকা বোনাস্ দেবার মত surplus হইয়াছে বলিয়া ইউনিকের London Actuary কেবল্ পাঠাইয়াছেন। বরুণাবাবুর এবং তাঁহার অংশী রমেশবাবুর মুখে এবার বেশ্ দাম হাসি ফুটিয়াছে; ইউনিকের কর্ম্মীদেরও কোমরে জোর দাঁড়াইয়াছে।

* *

বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলির মধ্যে হিন্দুস্থান ও ন্যাশন্যালের নামই সর্ব্বাগ্রে সকলের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে হিন্দুস্থান, তাহাদের নিজের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। অনেকের ধারণা যে হিন্দুস্থান বিল্ডিং হিন্দুস্থানের নহে। উহা ধর্ম্মসমবায়েরই বাড়ী, হিন্দুস্থান Lessee মাত্র; দীর্ঘ দিনের লীজ নিয়া "হিন্দুস্থান বিল্ডিং" নাম দিয়া এখানে আছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। যদিও হিন্দুস্থান ও ধর্ম্মসমবায়ের বাড়ী ঠিক একই বাড়ী বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থান তাহার নিজের জমিতে নিজে বাড়ী তুলিয়াছে। সমস্ত জমিটা প্রায় ৫ বিঘার উপর; কলিকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে ৯৯ বছরের লীজ নিয়ে সেই জমির খানিকটা হিন্দুস্থান তাহার নিজের জন্যে রাখে এবং বাকী সমস্তটা ধর্ম্মসমবায় নেয়। তারপর উভয়ে নিজের নিজের নক্সা ও মতলব অনুযায়ী বাড়ী উঠাইয়াছে। সুতরাং হিন্দুস্থানের বাড়ী যে হিন্দুস্থানের নহে বলিয়া মাঝে মাঝে গুজব ওঠে, এই রটনার মূলে কোনও সত্য নাই। যাক আমরা যা' বোলছিলাম তাই বলি। নিজেদের একটা জমকালো বাড়ী না হ'লে ইন্‌সিওরেন্সের আসর জমে না। এজেন্টরাও ভাল রকম কাজ করবার সুখ পায় না। এই জন্যে দেখা যায় যাবতীয় বড় বড় বীমা কোম্পানী তাদের হেড অপিসে ত বিরাট অট্টালিকা তুলিয়াছেই, পরন্তু বহু শাখা প্রশাখাতেও নিজেদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা তুলিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদেশী কোম্পানীদের মধ্যে Royal ও Standard এর নাম করা যাইতে পারে। ড্যালহৌসী স্কোয়ারে Royal Insurance Building ও Standard Building না দেখেছেন এমন লোক নেই। বোম্বের Oriental ও [illegible] [illegible] অট্টালিকা তুলেছেন। এক ওরিয়েণ্টাল ঢাকা

[illegible] স্বদেশী ও [illegible] [illegible] হ'লেও বাঙালী কোম্পানী আছে; সুতরাং প্রাণের আনন্দে বুকটা ফেঁপে ওঠে না, যেমনি [illegible] দেখতে হয়। বিধুবাবু তাই [illegible]

"বিনা স্বদেশী ভাষা
মিটে কি আশা ?

[illegible] সব ব্যাপারের মধ্যে হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের [illegible]—মনটা আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। [illegible] হিন্দুস্থান ধর্মসমবায়ের নেতৃত্বে গাঁথা [illegible] ঈর্ষাকাতর লোক নানা গুজব রটাইতে [illegible] পায়। ধর্মসমবায়ের কাজ কর্মের আয়ত কোনও অস্তিত্ব দেখি না। অম্বিকা উকীল মহাশয়ের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মসমবায়ের কর্মজীবন পটল তুলিয়াছে—এক নিশানা মাত্র রহিয়াছে ধর্মসমবায়ভবন। সেটও শুনিতেছি—Highest Bidder-এর হাতে তুলে দেবার আয়োজন হচ্ছে। সহরে ঢেঁড়া পড়িয়াছে Rome shall be sold to the highest bidder আমরা হিন্দুস্থানের মধ্যমণি নলিনী রঞ্জনকে বলি, ঘরের গাই পরে নিয়া যায় কেন ?—[illegible] অনেক দুধ দেবে। বড় লোকের গোয়ালে অযত্নে অনাহারে এমন দুধেলা গাই কসাইখানার হইয়া গিয়াছে। তোমার হাতে [illegible]নিবন্ধে [illegible] দেখছে—দেখতে এর [illegible] আর এক রকম হ'য়ে যাবে, তাতে আমাদের আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই! কোন্ পাড়ার কেন্দ্রস্থলে ৫ বিঘার উপর এমন রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকা-সমগ্র এশিয়ার মধ্যে কোনও বীমা কোম্পানীর আছে কিনা সন্দেহ।

যাক এতদিন আমরা হিন্দুস্থানের বাড়ী দেখেই আনন্দ পেয়েছি, এবার ন্যাশনালেরও শীঘ্র বাড়ী উঠবে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে Commercial Intelligence আপিসের সামনে ন্যাশনালের জন্য সুন্দর একটা জমি নেওয়া হয়েছে, এবার শীঘ্রই বাড়ী সুরু হবে শুনলাম।

ভারত ইন্সিওরেন্সও Central Avenue এর উপর জমি নিয়েছেন বাড়ী ওঠাবার জন্যে। জায়গাটা আমাদের মতে তেমন সুবিধাজনক স্থানে হয়নি। তবে প্রচারের দিক থেকে লোকের চোখে প'ড়বে বলে মনে হয়, কিন্তু Business Quarter থেকে অনেক দূরে হ'য়ে গেল। এ ব্যাপারে আমরা হয় বিবেচনা সাকেন বুদ্ধির তারিফ ক'রতে পারি না।

এর পরেই ক্রমানুসারে ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান এবং ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের পালা। ভগবান করুন সব বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীগুলি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

৯ম বর্ষ] শ্রাবণ ১৩৩৬ [৪র্থ সংখ্যা

চায়ের চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গাছ লতা পাতা প্রভৃতি কেটে মাটির মধ্যে ফেলে রেখে দিলে কিছুদিনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সেগুলি পচতে আরম্ভ ক'রেছে—এবং তারও কিছু দিন পরে গাছ পালার চিহ্ন মাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—সমস্তই কৃষ্ণ বর্ণের মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এই কৃষ্ণ বর্ণের মৃত্তিকাকে ইংরেজী ভাষায় humus বলে। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্ব কালেই humus খুব উৎকৃষ্ট সার বলে গণ্য হয়ে এসেছে।

আর সকল মাটিতেই humus মিশ্রিত রয়েছে—তবে অল্প আর বিস্তর। আলো এবং বাতাসের সংস্পর্শে এসে কিছুদিনের মধ্যেই humusএর মধ্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়। এইজন্য আলগা বালি-মাটিতে খুব অল্প পরিমাণে humus দেখতে পাওয়া যায় এবং শক্ত এটেল মাটিতে ওর পরিমাণ থাকে খুব বেশী। এখন কথা উঠ্‌তে পারে—সকল মাটিতেই humus আসে কোথা থেকে? এর উত্তর খুবই সোজা। এক মরুভূমি ছাড়া পৃথিবীর উপর প্রায় আর সকল স্থানেই কোন না কোন রকমের গাছ, লতা বা ঘাস জন্মে থাকে। সে সমস্ত মরে যায় আবার জন্মায়। এই রকম যে অসংখ্য বৃক্ষ-লতা পৃথিবীর বুকের উপর নিত্য লয় প্রাপ্ত হচ্ছে তাদের দেহ পচে মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়ে ওই humusএর সৃষ্টি হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি জমির উৎপাদিকা শক্তি বহুল পরিমাণে তার গঠণ বা texture এর উপর নির্ভর করে—আর texture নির্ভর করে তার মধ্যে

জৈব পদার্থের অস্তিত্বের পরিমাণের উপর। উল্লিখিত humusই হ'ল সেই জৈব পদার্থ।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এনষ্টেড্ (Mr Ansted) বলেন উর্ব্বরা জমি মাত্রেই অল্পবিস্তর হিউমাস্ বর্ত্তমান রয়েছে। হিউমাস্ পদার্থ প্রয়োগ করে যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে যায় তার একমাত্র কারণ হ'ল হিউমাছের সংযোগে মৃত্তিকাস্থ নাইট্রেট উৎপাদক ব্যাকৃটিরিয়া সমূহের বংশ এবং কার্য্যকারীতা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ঠিক কি পরিমাণ হিউমাস্ কত খানি জমিতে প্রয়োগ করলে সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে—তা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত রূপে জানা যায় নি। তবে একথা সত্য যে প্রত্যেক চাষীই গোবর ও অন্যান্য সারের মত হিউমাস্ পদার্থও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে।

বহুপ্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে জমিতে সাররূপে চুণ প্রয়োগ কর্ব্বার প্রথা চলে আস্‌ছে। অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করলেও সেখানে কোন প্রকার গাছ ভাল রকম জন্মায় না। ঐরূপ অজন্মা হবার একমাত্র কারণ এইযে ঐসকল জমি সাধারণতঃ অম্লাক্ত উপাদানে পূর্ণ থাকে এবং অম্লতা শস্যাদি জন্মিবার পথে একটা অন্তরায় বলেই গণ্য। শস্যক্ষেত্রে আবশ্যক মত চুণ প্রয়োগ করলে কিন্তু মৃত্তিকার ঐ অম্ল দোষ একেবারেই দুরীভূত হয়ে যায়। আগে আগে অনেকের ধারণা ছিল একেবারে রাশি খানেক চুণ বাগানে ছড়িয়ে দিলেই বাগানটী দিন দিন বেশ শস্য শ্যামল হয়ে উঠবে—কিন্তু আজকাল সে ভুল সম্পূর্ণরূপেই ভেঙ্গে গেছে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে এক সঙ্গে অনেক চুণ প্রয়োগ করা অপেক্ষা ঘন ঘন অথচ অল্প অল্প চুণ ব্যবহার করাই অধিকতর সুফল প্রদ।

চুণ ব্যবহারে জমির উৎপাদিকা শক্তি খুব বেশী রকম বেড়ে যায়। চুণ গাছের খাদ্য হলেও সকল গাছের মধ্যেই চুণ দেখতে পাওয়া যায় না। তবে চুণের আদর খাদ্য হিসেবে নয়, কেন না তাতে নাইট্রোজেন্, ফস্‌ফরাস্ কিম্বা পটাশ খুব অল্প পরিমাণে থাকে। জমিতে চুণ প্রয়োগ কর্ব্বার প্রথম কারণ এইযে ইহা উদ্ভিদকে মৃত্তিকা থেকে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সমূহ সহজে গ্রহণ কর্ব্বার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে।

চুণ প্রয়োগ করলে মাটির গঠন বা texture ও পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। শক্ত এটেল মাটির কণা সমূহ ইহার সংযোগে আলগা হয়ে আসে আবার নরম বালি মাটিতে চুণ মিশ্রিত করলে তার কণা সমূহ পরস্পরের সঙ্গে অনেকটা জমাট বেঁধে যায়।

জমিতে প্রয়োজন মত চুণ না থাকলে বৃক্ষাদি ভালরূপ পুষ্টিলাভ কর্ত্তে পারে না, কেন না সে স্থলে তার আবশ্যকীয় খাদ্য সমূহ মৃত্তিকা থেকে গ্রহণ করা তার পক্ষে কষ্ট কর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ অম্লাক্ত উপাদান চুণের দ্বারা বিশোধিত না হওয়ায় জমির ধাতব লবণকে সহজেই দ্রবীভূত করে ফেলে এবং সেই বিষাক্ত দ্রব্য বৃক্ষদেহে সঞ্চারিত হওয়ায় বৃক্ষের বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। কিন্তু মৃত্তিকায় যদি অম্লাক্ত উপাদান না থাকে তা হলে তাতে চুন দেওয়া সম্পূর্ণরূপেই অনাবশ্যক—এবং শুধু অনাবশ্যক নয়, অনিষ্টকর ও বটে। জমিতে অম্লাক্ত উপাদান থাকলে তাতে অন্য কোন প্রকার সার প্রয়োগের কোনই সার্থকতা নাই, কেননা অম্লদোষের জন্য ঐ সমস্ত সার বৃক্ষের গ্রহণ যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং গাছেরাও উহা গ্রহণ কর্ত্তে পারে না।

মৃত্তিকায় চুণ প্রয়োগ করলে জৈবিক উপাদান বা humus (হিউমাস) অতি সত্বরই বৃক্ষের

খাদ্যরূপে পরিণত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি মৃত্তিকাভ্যন্তরে অসংখ্য প্রকারের জীবাণু বর্ত্তমান রয়েছে—তাদের মধ্যে কতকগুলি শস্যাদির অনিষ্টকর, আবার কতকগুলি উদ্ভিদের পরম উপকারী; চুণ প্রয়োগ করলে প্রথমোক্ত জীবাণু সমূহ নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু শেষোক্ত জীবাণুগণের বৃদ্ধির পক্ষে কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। চুণ প্রয়োগ করলে মৃত্তিকা বিষাক্ত হতে পারে না। চুণের এই রকম অজস্র উপযোগীতা আছে বলেই সমস্ত চায়ের বাগানেই অল্পাধিক পরিমাণে চুণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অন্যান্য জমির চেয়ে চায়ের জমিতে সাধারণতঃ চুণের অভাব একটু বেশী অনুভূত হয়। কারণ আমাদের দেশের চা বাগান সমূহ সাধারণতঃ অত্যুচ্চ পাহাড়ে জমিতেই স্থাপিত; পাহাড়ে জমির বিশেষত্ব এই যে উহার একদিক অপেক্ষাকৃত উঁচু। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ধৌত হয়ে উঁচুদিকের মাটি নিম্নাভিমুখে চলে আসে, কাজেই ঐ ধোয়াট মাটীর সঙ্গে চুণ ও নিম্ন স্থানে গিয়ে জড় হয়। এই জন্য ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে ঘন ঘন অথচ অল্প পরিমাণে চুণ ব্যবহার করাই প্রশস্ত।

ভারী, ভিজা ও এটেল মাটিতে নতুন পাথুরে চুণ (quick lime) ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু হাল্কা বালি মাটিতে কার্ব্বনেট বা slaked lime ব্যবহার করা ভাল।

বর্ষাকালে জমিতে চুণ প্রয়োগ কর্ত্তে নেই। গ্রীষ্মকালই ইহা প্রয়োগ কর্ব্বার প্রশস্ত সময়। বিশেষতঃ যদি পরে অন্যান্য সার প্রয়োগ কর্ত্তে হয় তা হলে গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই জমিতে চুণ দিয়ে দেওয়া উচিত।

জমি অনুসারে চুণের মাত্রা ঠিক কর্ত্তে হবে। সাধারণ জমিতে প্রতি একরে ৫।৭ হন্দর চুণ ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম বলে দেওয়া চলে না—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সমস্ত বাগানে চুণ প্রয়োগ কর্ব্বার পূর্ব্বে একটুকরা জমিতে পরীক্ষা করে দেখা উচিত কি পরিমাণে চুন ব্যবহার করা সকলের চেয়ে লাভ জনক—তারপর সেই অনুপাতে সমস্ত জমিতে চুণ প্রয়োগ করলে আর কোন রকম অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

জমিতে চুণ প্রয়োগ করবার উপযোগীতা যে কি আমরা মোটামুটি তা বর্ণনা করেছি। কিন্তু চুণ প্রয়োগ করলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে যায় শুনে কেউ যেন না মনে করেন যে তিনি যত অধিক পরিমাণে চুণ প্রয়োগ কর্ত্তে থাকবেন জমির উৎপাদিকা শক্তিও সেই অনুপাতে বেড়ে যেতে থাকবে।

মাত্রাতিরিক্ত চুণ ব্যবহার করলে কোনরূপ মঙ্গল ত হয়ই না—বরং নানারূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে চুণ নিজেই খুব একটা সার পদার্থ নয়; চুণের আদর এই জন্য যে উহা অন্যান্য সার পদার্থকে অতি শীঘ্রই বৃক্ষের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত করে। কাজেই জমিতে যেমন চুণ প্রয়োগ করা উচিত—অন্যান্য সার প্রয়োগ করা ও সেই রকম বা তার চেয়ে বেশী দরকার। সকল প্রকার চাষের বেলাই এ কথা সত্য—তবে চা চাষের বেলা ঐ সমস্ত কথা আরও সত্য।

চায়ের জমিতে অত্যধিক চুণ প্রয়োগ কর্ব্বার কুফল সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটা সুন্দর প্রবচন আছে। নিয়ে সেটা উদ্ধৃত করলাম—

"Lime and lime without
manure
Will make both farm
and farmer poor."

এর বাংলা তর্জ্জমা কল্লে অনেকটা এই রকম দাঁড়ায়

"সার বিনা শুধু চুণ করিলে
প্রয়োগ—
জমি অনুর্ব্বর হয়, চাষীর
দুর্ভোগ॥"

জমিতে চুণ প্রয়োগ সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা বলেই আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ কর্ব্ব। চুণের সঙ্গে একত্রে কোন নাইট্রোজেন সম্পর্কীয় পদার্থ, খৈল বা সালফেট অব এমোনিয়া প্রভৃতি সার প্রয়োগ কর্ত্তে নাই। নাইট্রোলিম্, বেসিক স্ল্যাগ প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থে কাঁচা চুণ রয়েছে সে সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে ও ঐ কথা খাটে। কেননা চুণের সঙ্গে ঐ সমস্ত সারের সংযোগ হলে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ফলে এমোনিয়া উৎপন্ন হতে থাকে।

এ কথা সকলেই জানেন যে এক খণ্ড জমিতে বহু বৎসর ধরে চাষ কর্ত্তে থাকলে ক্রমে ক্রমে সেই জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়। এই রকমে খুব উর্ব্বরা জমিও কালে কালে অনুর্ব্বর হয়ে পড়ে। জমির সেই লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্যই সারের প্রয়োজন। খুব উর্ব্বরা অথচ পতিত জমিতে চাষ কর্ত্তে আরম্ভ করে প্রথম প্রথম খুব বেশী পরিমাণে সার প্রয়োগ কর্বার দরকার করে না—কিন্তু যে জমিতে বহুদিন হ'তে চাষ করা হচ্ছে তার উৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত রাখতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে সার একান্তই প্রয়োজন।

শুধু যে পটাশ, চুণ, নাইট্রেট, বা ফস্ফরাস্ প্রভৃতি সার সংযোগে কৃত্রিম উপায়ে জমির উৎপাদিকা শক্তি সংরক্ষিত বা বর্দ্ধিত হয় তা নয়—ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যান্য উপায়ও অবলম্বিত হয়ে থাকে। Green manuring পদ্ধতিটা তাদের মধ্যে অন্যতম। green manuring পদ্ধতিটা যে কী তা আমরা পরে বিবৃত কর্ব্ব; এখন দেখা যাক্ চায়ের বাগিচায় সার প্রয়োগের সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ক) প্রথমেই দেখা উচিত যাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি এবং চা গাছের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ প্রতি একার ভূমিতে যেন চায়ের ফসল বাড়তে থাকে।

(গ) তৃতীয়তঃ উৎকর্ষতার দিক দিয়ে দিন দিন যেন চায়ের উন্নতি হতে থাকে।

উপরোক্ত বিষয় কটীর মধ্যে প্রথম বিষয়টীর প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য—কেননা জমির উৎপাদিকা শক্তির উপরই সেই বাগানের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ভর কচ্ছে। উৎপাদিকা শক্তি যদি কমে যায় তবে জমির দামও কমে যাবে।

প্রতি একারে চায়ের ফসল বাড়াবার চেষ্টা করা যেমন উন্নতিকামী চাষী মাত্রেরই লক্ষ্য, সেই রকম তাদের এটাও দেখা উচিত যে বাগান থেকে যে চা পাওয়া যাচ্ছে তা যেন আদৌ নিকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট হয়ে না পড়ে। বাগানের চা যখন সবে খারাপ হতে সুরু করে তখন প্রায়ই তা ধর্ত্তে পারা যায় না। হয়ত প্রথম প্রথম চায় ফসল কমে যেতে থাকে—আবার সময় সময় তাও বোঝা যায় না; কেননা অনেক সময় এ দেখা গেছে যে সত্য সত্যই ফসল কমে গেলেও উত্তমরূপে পাতা সংগ্রহ করার দরুণ ফসল বেড়েছে বলেই ভুল হয়েছে। এই জন্য খুব সাবধান হয়ে খুব বিবেচনার সহিত পরীক্ষা করে দেখা উচিত প্রকৃত পক্ষে বাগানের মাটির অবস্থা কী। এবং মাটি যদি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় তা হলে কাল বিলম্ব না করে আমাদের উপদেশ মত সার প্রয়োগ করা বিধেয়। বিশেষতঃ যে সমস্ত চা বাগানের মাটি খুবই সাধারণ ধরণের এবং যেখানে একার প্রতি ৫ মণের বেশী চা পাওয়া যায় না—সে সমস্ত জমির

উন্নতি করে বিজ্ঞান সম্মত সার প্রয়োগ করা সর্ব্বতো ভাবেই বাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্বে আমরা green manuring এর কথা বলেছি। এই green manure বা সবজী সার বল্‌তে কি বুঝা যায় তাই আমরা এখন বলব।

বৃক্ষলতার জীবন ধারণের জন্য নাইট্রোজেনের একান্ত প্রয়োজন। বায়ুমণ্ডলে অজস্র পরিমাণে নাইট্রোজেন রয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার বৃক্ষলতা বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ কর্ত্তে পারে না—মৃত্তিকা থেকে তাদের তা গ্রহণ কর্ত্তে হয়। এই জন্যই জমিতে নাইট্রোজেন সম্পর্কীয় পদার্থ প্রয়োগ কল্লে সাধারণতঃ উহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এক অড়হর, ধনিচা প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদেরই বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ কর্ব্বার ক্ষমতা আছে। ঐ সমস্ত উদ্ভিদের শিকড়ে বহুসংখ্যক গুটিকা উৎপন্ন হয়। সেই গুটিকার মধ্যে লোকচক্ষুর অগোচর এক প্রকার অসংখ্য জীবাণু (bacteria) বাস করে। আমরা পূর্ব্বে সেই গুলিকে নাইট্রেট উৎপাদক জীবাণু বলে উল্লেখ করেছি। এই সমস্ত জীবাণু শিকড়ের চারিপার্শ্বস্থ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে মাটির মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। এইরূপে এই সমস্ত উদ্ভিদ মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সঞ্চারিত করে বলে ইহাদিগকে সবজী-সার বলে।

শুধু যে নাইট্রোজেনের জন্যই সবজী সার ব্যবহার করা হয় তা নয়—উহার প্রয়োগে মাটীতে হিউমাস্ এর মাত্রাও বেড়ে ওঠে।

আজকাল সমস্ত চাবাগানেই বহুল পরিমাণে সবজী চাষ করা হয়—জমিকে সারাল কর্ব্বার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আরো বেশী সবজী চাষ কর্ব্বার পক্ষে একটা মস্ত বাধা হচ্ছে মজুরের অভাব। চা ষ্টেট সমূহে যত মজুর পাওয়া যায় অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ সেরে ব্যাপক ভাবে সবজী চাষ কর্ব্বার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। এই মজুরের অভাব দূর করা যায় কেবল একটী উপায়ে। সবজী গাছগুলি যখন বেশ বড় হয়ে উঠবে তখন সেগুলার গোড়া কেটে দিতে হবে। তাতে শুকিয়ে ক্রমশঃ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে।

চা বাগানে সবজী সার প্রয়োগের উপযোগীতা সম্বন্ধে পেরাডিনায়ার চা ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা কার্য্য চালান হয়েছিল তার ফলাফলের বিবরণ থেকে এক অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"বহুবার পরীক্ষা করে দেখবার পর আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, যদি সবজী সার প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়—এমন কি ঠিক মত সবজী চাষ কর্ত্তে পার্লে জমিতে যে আর আদৌ নাইট্রোজেন ব্যবহারকর্ত্তে হবে না—এতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।"

শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে এলবিজিয়া ষ্টিপুলেটা (Albizzia Stipulata) গাছই সর্ব্ব প্রথম সবজী সার হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। এই গাছ লাগানোর সুবিধা এই যে এরা চায়ের ঝাড়গুলিকে সূর্য্যের তীব্র কিরণ থেকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করে। এলবিজিয়া গাছ আবার নানা জাতিতে বিভক্ত। সকল জাতীয় এলবিজিয়ার মধ্যে আজকাল এলবিজিয়া মলুক্কানা (Albizzi Moluccana) গাছই বেশী প্রসার লাভ করেছে দেখতে পাওয়া যায়। Moluccana গাছের বিশেষত্ব এই যে গ্রীষ্মকালে যখন প্রায় সকল প্রকার গাছেরই পাতা ঝরে যায় তখনও এই জাতীয় গাছ নিজেদের ঘন পত্রাবরণে চায়ের ঝাড়গুলিকে প্রখর সূর্য্য কিরণ থেকে অবলীলা ক্রমেই রক্ষা করে থাকে।

এলবিজিয়া ব্যতীত Dodap, Boga Med-eloa, Tephrosia Canbida প্রভৃতি উদ্ভিদও চা-ক্ষেত্র সমূহে খুব উৎকৃষ্ট ধরণের সবজী সার বলেই গণ্য হয়।

আর দুইটী বহু-ব্যবহৃত সবজী সার হল ধনিচা ও মাটি কলাই। প্রায় সকল জমিতেই ধনিচা গাছ জন্মায় প্রচুর পরিমাণে এবং মাটি কলাই গাছ সকল জমিতে না জন্মালেও সার প্রয়োগে অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে ওঠে।

যাহাহউক এই সমস্ত উদ্ভিদ চাষ কর্বার সময় মনে রাখা উচিত যে জমির উন্নতি করেই এই সমস্ত গাছ রোপন করা হয়—আর জমির উন্নতি নির্ভর করে এই সমস্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধির ওপর।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে ধনিচা বা মাটি কলাই প্রভৃতি উদ্ভিদ রোপন কর্বার পূর্ব্বে জমিতে ফস্ফরিক এসিড্ ও পটাশ মিশ্রিত সার প্রয়োগ করে ঐ সকল উদ্ভিদের বৃদ্ধি অসম্ভব রকম বেড়ে ওঠে। কাজেই চায়ের জমিতে সবজী সার প্রয়োগ কর্বার পূর্ব্বে ফস্ফরিক এসিড ও পটাশ মিশ্রিত সার প্রয়োগ করা সর্ব্বতো ভাবেই বাঞ্ছনীয়। সার প্রয়োগ কর্বার পর শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ চাষ করে লাভের অঙ্কটা কি রকম ওঠে নিয়ের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করে বেশ ভাল মতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আসামস্থ হুনওয়াল্ টি কোম্পানীর অধীনে জে, পি, ফার্গুসন্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কৃত পরীক্ষার ফল।

জমির পরিমাণ	একার প্রতি ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	প্রতি একার জমিতে কত চা-পাতা উৎপন্ন হইয়াছিল	প্রতি একারে উৎপন্ন চা	সার দেওয়া জমিতে একার প্রতি কত বেশী চা উৎপন্ন হইয়াছিল	নয় আনা পাউণ্ড হিঃ বৃদ্ধির মূল্য	একার প্রতি ব্যবহৃত সারের মূল্য	মোট লাভ বা লোকসান
					টাকা	টাকা	টাকা
১ একার	আদৌ সার ব্যবহার করা হয় নাই	১৮৮৮ পাউণ্ড	১২২ পাউণ্ড	... ...	...	...	...
ঐ	১১২পাউণ্ড মিউরিয়েট অব্ পটাশ ২২৪ পাউণ্ড পি, এন, মিক্শ্চার সবজী সার	৩২২২ ,,	৮০৫½ ,,	৮৩½ পাউণ্ড	৪৬৸/১০	২০/০	১৯৸/১০

আসামস্থ আমলুকী টি : এষ্টেটের এ ক্রাইষ্টেল কৃত পরীক্ষার ফল

জমির পরিমাণ	সারের পরিমাণ	প্রতি একারে উৎপন্ন পাতার পরিমাণ	প্রতি একারে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ	সার দেওয়া জমিতে প্রতি একরে চায়ের বৃদ্ধি	।৵১০ সাড়ে সাত আনা পাউণ্ড হিঃ বৃদ্ধির মূল্য	একার প্রতি ব্যবহৃত সারের মূল্য	একার প্রতি মোট লাভ বা লোকসান
		পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	টাকা-আনা পাই	টাঃ-আঃ-পাঃ	টাঃ আঃ পঃ
১ একার	৮০ পাউণ্ড মুরিয়েট অব পটাশ ও মাটি-কলাই	২০৯৬	৫২৪	৭৮	৩৪—১৫—০	৬—৩—৬	২৮—১১ ৬
ঐ	কেবল মাটি কলাই	১৭৮৪	৪৪৬	...	...	...	...

লাক্ষার চাষ ও সেল্যাক প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিরি কেক বা পিঠায় পরিণত করা ঃ—

ব্যাগ হইতে লইবার পর উত্তপ্ত নরম কিরিকে চ্যাপ্টা গোলাকার পিঠায় বা কেকে পরিণত করা হয়। ইহার ব্যাস ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি এবং বেধ ¾ হইতে ১½ ইঞ্চি। এই সমস্ত কেক ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরে খুব বিক্রয় হয়। ভারতবর্ষে পশ্চিম দেশীয় চুরী, বালা ও পুতুল প্রস্তুত কারকেরা ইহা ক্রয় করে; আর ফরাসী, জার্ম্মাণী এবং আমেরিকার ক্রেতারাও ইহা ক্রয় করিয়া থাকে। কিরিতে শতকরা ৫০ ভাগ লাক্ষা থাকিলে টি এন্ শেলাকের অর্দ্ধেক দাম পাওয়া যায়।

পাশেরা বা মোচড়ান ব্যাগের লাক্ষা :—

মোচড়ান ও শুষ্ক ব্যাগে যে লাক্ষা থাকে, তাহাও উদ্ধার করিতে পারা যায় ; উহাকে "পাসেওয়া" বলে। নিম্নলিখিত প্রকারে মোচড়ান ব্যাগ সিদ্ধ করিয়া লাক্ষা উদ্ধার করিতে হয়। ৪ ফুট ব্যাস ও ৫ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট একটি পাত্রে এই শুকনো লাক্ষাপূর্ণ ব্যাগ বা থলিগুলি রাখিয়া তাহার সহিত আধ সের সাজি মাটী ও সোডা দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ করিলে থলিতে যে লাক্ষা লাগিয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া যায় এবং উপরে ফেণার আকারে ভাসিয়া উঠে; ঐ ফেনা একটা ঝাঝরি দিয়া তুলিয়া লইতে হয়। তারপর আবার একসের পরিমিত সাজিমাটি উহাতে দেওয়া হয়, তাহার ফলে আরও ফেনা উঠে এবং তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তুলা হয়। কয়েকবার এইরূপ করিলেই থলির মধ্য হইতে সমস্ত লাক্ষাই বাহির হইয়া আসে।

এই ভাবে যে লাক্ষা দিয়া চ্যাপ্টা পিঠা তৈয়ারী হয়, তাহার ব্যাস ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি পরিমিত হয় এবং ঐরূপ আকারেই বিক্রীত হয়। এই পিঠায় বিশুদ্ধ লাক্ষা থাকায় টি এন্ সেলাক ও কিরি এতদুভয়ের মাঝামাঝি মূল্যে বিক্রীত হয়। এইরূপে কাপড়ের ব্যাগের সিদ্ধ কার্য্য চলিতে থাকে এবং জলের ভিতর ৫-৬ সের পরিমিত সাজি মাটি দিয়া ব্যাগের ভাজ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং এক গাছি দড়ির সহিত ব্যাগের একটি দিক বাঁধা হয়; সেই দড়ি একটি হাত চাকার সঙ্গে বাঁধিয়া তাহা ঘুরান হয়। সমস্ত রাত্রি ব্যাগগুলি গরম জলের মধ্যে থাকে। তাহার পর তাহাদিগকে পরিষ্কার জলে ধৌত ও রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। ব্যাগগুলি তাহার পর সেলাই বিভাগে লওয়া হয়; তথায় দর্জ্জী ব্যাগ রিপু করে এবং পুনরায় যাহাতে সেগুলি চৌরী দ্বারা পরিপূর্ণ হইবার উপযোগী হয়, সেইরূপ করে।

সেলাকের পরিমাণ—প্রতি মণ ক্রুড্ লাক হইতে কি পরিমাণ চৌরী বাহির করা যায় তাহা নিম্নলিখিত দুইটি অবস্থার উপরে নির্ভর করে।

(১) লাক্ষা ব্যতীত অন্যান্য পদার্থের মিশ্রণ (২) ও রজজাতীয় পদার্থের পরিমাণ।

যদি ভেজাল দ্রব্যগুলি soluble বা জলে গুলিয়া যায় তাহা হইলে চৌরির জন্য ক্রুড লাক্ষা ধৌত করিবার সময় উহার ওজন অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। কিন্তু যখন ভেজাল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হয় না এবং উহাতে এমন সব পদার্থ থাকে যে, তাহা চালুনীর ছিদ্র পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না, তখন ইহা ধৌত করিলে যে ক্ষতি হয়, তাহাতে লাক্ষার ওজন বেশী কমিয়া যায় না। লাক্ষার নূতন ফসলে রজজাতীয় দ্রব্য বেশী থাকে; সুতরাং ধুইবার সময় এই রজ জলে গলিয়া বাহির হইয়া যায় বলিয়া লাক্ষাও ওজনে কমিয়া যায়। কিন্তু পুরাণ ফসলে এই রজ না থাকায় তাহার ওজন কমিয়া যায় না। বিভিন্ন জাতীয় চৌরী হইতে সাধারণতঃ এক মণ করিয়া সেলাক পাওয়া যায়; অবশ্য ইহা ষ্টীক্ লাক্ষার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। নিম্নলিখিত তালিকায় ষ্টীক্ ল্যাকের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে কিরূপ সেলাক পাওয়া যায় তাহা দেখানো হইল :—

চৌরী হইতে সেলাক উৎপত্তি

নং	লাক্ষার বিভিন্ন শ্রেণী	একমণ সেলাক প্রদানের উপযোগী চৌরীর ওজন সের
১	কুসুম	৪৪
২	কুল অথবা বের	৪৮
৩	পলাশ	৫০

নিম্নলিখিত তিনটি কারণে চৌরী হইতে সেলাক তৈরী করার সময় তাহার ওজন কমিয়া যায়।

(১) পোড়ানোর জন্য হ্রাস বা ক্ষতি

(২) ব্যাগের গায়ে যাহা লাগিয়া থাকে। —"পাসোয়া"

(৩) ব্যাগের মধ্যে তলানী পড়া—"কিরি"

এই তিনটি কারণের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি কারণের বিষয় এইমাত্র বলা হইয়াছে। অতএব পোড়ানোর জন্য কি প্রকারে ক্ষতি বা হ্রাস হয়, তাহাই এ স্থানে বলা যাইতেছে।

পোড়ানোর জন্য ক্ষতি—লাক্ষা অত্যন্ত দাহ্যশীল বলিয়া যতই সাবধানতার সহিত গলান হউক না কেন, গলিত লাক্ষার কিয়দংশ অত্যন্ত উত্তাপের ফলে পুড়িয়া যায় এবং তজ্জন্য চৌরীর ওজন কমিয়া যায়। তবে খুব বেশী পরিমাণে সাবধান হইলে ক্ষতির পরিমাণ আরও কম হইতে পারে। লাক্ষা যত পুরাতন হয়, ততই উহার দাহ্য শক্তি বাড়িয়া যায় সুতরাং গলাইবার সময় বেশী পরিমাণ লাক্ষা জলিয়া যাওয়ায় চৌরীর ওজন কমিয়া যায়। বেশী দিন থাকিলে লাক্ষার উৎপাদন শক্তি কমিয়া যায়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যদি টাট্‌কা বীজ হইতে প্রাপ্ত চৌরিতে ৩৫ সের সেলাক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ একই ওজনের এক বৎসরের পুরাতন চৌরীতে মাত্র ৩৪ সের সেলাক উৎপন্ন হইবে, এবং চৌরী দুই বৎসরের পুরাতন হইলে ৩৩ সের সেলাক উৎপন্ন হইবে। তিন বৎসরের পুরাতন চৌরী ভালরূপে গলে না—এবং যদিই বা কোনরূপে গলান যায়, তাহা হইলে মাত্র ৩৩ সের সেলাক উৎপন্ন হইবে। ৫।৬ বৎসরের পুরাতন চৌরি গলান যায় না—এবং গলাইতে গেলে পুড়িয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

সেলাক বিক্রয়

সেলাকের শ্রেণী বিভাগ—ভারতবর্ষে যতগুলি সেলাকের কারখানা আছে, তাহাতে "টি এন," জাতীয় সেলাকই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইহার প্রচলনই অত্যন্ত বেশী। যদিও ইহা বিশুদ্ধ নহে, তথাচ এই T. N. সেলাকের পরে আরও দুই শ্রেণীর সেলাক আছে। যথা—(১) ইমাম্ গঞ্জ সেলাক (২) শতকরা বার ভাগ সেলাক।

এই দুই শ্রেণীর লাক্ষার ভিতর নানারূপ ময়লা থাকে এবং অনেক (resin) থাকে। টি, এন এর উপরের গ্রেডের সেলাককে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলে; ষ্ট্যাণ্ডার্ড আবার ১নং ষ্ট্যাণ্ডাড, ২নং ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৩নং ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি নামে খ্যাত; ষ্ট্যাণ্ডার্ডের উপর ফাইন এবং ফাইনের উপর সুপার ফাইন super fine বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেলাক। উচ্চ শ্রেণীর সেলাক প্রস্তুত করিতে গেলে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কোন প্রকার ময়লা মাল কেনা না হয় এবং পরেও যাহাতে কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য মিশান না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্রুড লাক্ষা যেন উচ্চ শ্রেণীর হয়। সেলাকের আরও কতিপয় গ্রেড্ বা শ্রেণী আছে, তাহা উচ্চতর শ্রেণীর সেলাক। এই শ্রেণীর সেলাক—কতিপয় বড় ও প্রাচীন সেলাক কারখানার মালিকদের নিজস্ব ট্রেড্ মার্ক।

বোতাম লাক্ষা ও বেদানা লাক্ষা

সেলাক ব্যতীত আর দুই প্রকার নামজাদা পরিশ্রুত লাক্ষা আছে, যথা—বোতাম লাক্ষা ও বেদানা লাক্ষা। সাধারণতঃ বোতাম লাক্ষায় কোন প্রকার আর্সেনিক থাকে না। সেলাক যে ভাবে তৈরী করে, ইহাও সেইভাবে তৈয়ারী করিতে হয়। কেবলমাত্র তফাৎ এই যে ইহা পাতলা চাদরের আকার না করিয়া কারিগর সাধারণতঃ একটি লৌহ কিংবা দস্তার চাদরের উপর অল্প পরিমাণে গলিত লাক্ষা বাতাসার ন্যায়ফোটা ফোটা করিয়া ফেলিয়া যায়; এই ফোটা বা drop গুলি ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া ১½ হইতে ৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট বোতামের আকারে যাইয়া দাঁড়ায় এবং সাধারণতঃ ⅛ ইঞ্চি মোটা হয়। যখন উহা শক্ত হইয়া আসে তখন উহাতে কারখানার মালিকের ষ্ট্যাম্প বা শীল মোহর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে আর্সেনিক না থাকায় এই বোতাম লাক্ষা বেশীর ভাগ মোদকদিগের কাজে ব্যবহৃত হয়। লজেন্ চুষ, নানারূপ মিঠাই, সিরাপ, আচার প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের বোতল harmetically (বায়ু চলাচল বন্ধ করার মত) বন্ধ করার জন্য এই buttom lac যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। মিঠাইয়ের কাজে ইহা ব্যবহৃত হওয়ায় প্রমানিত হইতেছে যে, বোতাম লাক্ষায় আর্সেনিক থাকে না।

বোতাম লাক্ষার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহা চৌরী হইতে প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে খুব অল্প পরিমাণেই resin থাকে অথবা আদৌ থাকে না। নিকৃষ্ট শ্রেণীর Button লাক্ষা "কিরি" ও "মোলামা" হইতে প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর লাক্ষার সহিত আগাছা মিশ্রিত করিলে এবং ধৌত করিবার পাত্রে চৌরি হইতে পৃথক করিলে যে তলানী থাকে তাহা হইতে নিকৃষ্ট জাতীয় লাক্ষা প্রস্তুত হয়। ইহাতে নানা অনুপাতে resin বা রজন থাকে এবং ইহার রং ঘোরালো হয়। বোতাম লাক্ষার মূল্য তদনুযায়ী সেলাকের মূল্য অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম। গার্ণেট লাক্ষা পরিশ্রুত লাক্ষার নিকৃষ্ট শ্রেনার লাক্ষা ও লাক্ষার অপরিষ্কার অংশ হইতে প্রস্তুত। সাধারণতঃ ইহা স্পিরিটের প্রণালীতে প্রস্তুত হয়।

সেলাকের ব্যবহার—শিল্প জগতে সেলাকের বহুল ব্যবহার প্রচলন আছে। পালিশ প্রস্তুত ও নানাপ্রকার বার্ণিশ প্রস্তুত করিবার জন্ত ইহা বহুকাল হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও সেল্যাক সাধারণতঃ এই কাজের জন্তই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে গ্রামোফোন প্রস্তুত কারকেরা রেকর্ড তৈয়ারীর জন্ত ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। বৈদ্যুতিক দ্রব্য সমূহের শক্তির পথ রোধ করিবার জন্ত (insulating) ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এরোপ্লেন নির্ম্মাণ সম্পর্কেও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গোলা বারুদের কারখানায় ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া অনেক প্রকার শিল্প আছে যাহাতে সেলাক কোন না কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। উদাহরণ স্বরূপ এ স্থলে কয়েকটি শিল্পের নাম করা যাইতেছে। যথা (১) শীল দিবার গালা, ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম, টুপি, সঙ্গীত ও চশমা, টাইপ রাইটার, খেলার সরঞ্জাম, পুতুল, মোটরকার প্রভৃতি।

সেলাক বিক্রয়ের প্রণালী—ভাল সেলাক—তৈয়ারী হইবার পূর্ব্বেই বিক্রীত হইয়া যায়; কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁচা মাল সংগ্রহের পূর্ব্বেই বিক্রীত হইয়া যায়। তখন হইতেই দাম দস্তুরের কথা চলিতে থাকে, তবে বিক্রয়ের সাধারণ প্রথা অন্তরকম। দালাল ছাড়া সেল্যাক্ সাধারণতঃ কখনও বিক্রয় হয় না। প্রত্যেক কারখানার নিজস্ব দালাল থাকে; সেই দালালের দ্বারাই সচরাচর সে কারখানার সেলাক বিক্রয় হয়। এক একটা দালাল অনেকগুলি কারখানার জন্ত কাজ করে। কারখানা হইতে সেল্যাক বাক্স বন্দীকরতঃ প্রত্যেক বাক্সে ২ মণ করিয়া সেলাক তাহারা কলিকাতায় দালালের নিকট রেল যোগে পাঠাইয়া দেয়। যে মাল রেলযোগে পাঠান হয় তাহার জন্ত রেলওয়ে রসিদ ও নমুনা পাঠানো হয়। রসিদ ও নমুনা পাইবামাত্র দালাল চেকে হৌক অথবা নগদ টাকায় হৌক শতকরা ৭৫, টাকা জিনিষের মুল্য বাবদ পাঠাইয়া দেয়। তাহার পর মাল খালাস করিয়া দালাল তাহা নিজের দায়িত্বে আপন গুদামে রাখিয়া দেয় এবং জাহাজের মালিকের সঙ্গে বিক্রয়ের জন্ত কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকে। যখন বিক্রয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া যায়, তখন দালাল কারখানার মালিককে বাকী মুল্য পরিশোধ করে এবং সেলাকের মোট দামের উপর শতকরা এক টাকা হিসাবে নিজের দালালী কাটিয়া রাখে।

দালালকে আবার সাধারণতঃ কতকগুলি অধস্তন দালাল (under broker) সাহায্য করে। এই অধস্তন দালালদিগকে কারখানার মালিক বেতন দিয়া রাখে, তাহারা প্রত্যেক দিন বাজার দরের খবরা খবর দেয়। শতকরা চারি আনা হিসাবে তাহারা দালালের নিকট হইতে কমিশন পায়। বড় বড় কারখানার মালিকেরা সাক্ষাৎ ভাবে দালালের সহিত কথাবার্ত্তা চালায়, আর ছোট ছোট কারখানার মালিকেরা অধস্তন দালালদের সহিত কাজ কর্ম্মের কথাবার্ত্তা চালায়। অধস্তন দালালদিগকে সাধারণতঃ গোমস্তা বলে। কোন কোন কারখানার মালিক তাঁহাদের মাল নিজেরাই জাহাজে রপ্তানী করেন।

তৈয়ারী ও বিক্রয়ের খরচা—একমণ সেলাক তৈয়ারী ও বিক্রয় করিতে প্রায় ১৬৲ টাকা খরচ পড়ে; অবশ্য এই মূল্য ক্রুড লাক্ষা ছাড়া। নিম্নে উর্দ্ধতন মূল্য নিরূপণ তালিকা দেওয়া হইল:—

	টাকা	আনা	পাই
একমণ সেলাক উৎপাদন করিতে দুই মণ ষ্টিক ল্যাক ক্রয় করিতে দালালী মণ করা চারি আনা		৷৹	
দুই মণ ষ্টীক্ ল্যাক বাতাস করিয়া, চূর্ণ করিয়া এবং ধৌত করিয়া চৌরি প্রস্তুত করিতে	১৲		
একমণ সেলাক উৎপন্ন করিতে চৌরী গলাইবার জন্য কাপড়ের ব্যাগ—	১৲		
একমণ সেলাক উৎপন্ন করিতে ভাটায় ব্যবহৃতব্য কাঠ কয়লা—	১৲	৷৹	
একমণ সেলাক প্রস্তুত করিতে গলাইবার জন্য চুক্তি হিসাবে মজুরী—	৩৲	৷৹	
প্রত্যেকটা ২৲ টাকা হিসাবে ২ মণ সেলাক রাখিবার জন্য কাঠের বাক্স—	১৲		
হরিতাল ও প্যাকিং খরচা—	১৲		
কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলওয়ে মাশুল—		৸৹	
বাক্স খুলিবার জন্য ও নমুনার জন্য ও পুনরায় বন্ধ করিবার জন্য প্রতি মণে আধসের পরিমাণ কম—	১৲		
কলিকাতার দালালী—	১৲		
প্রত্যেক মণ সেলাকে সুদ ও মূল্য হ্রাস—	১৲		
মাল পাইতে বিলম্ব অথবা বিক্রয়ে বিলম্ব হইলে দালাল যে শতকরা ৭৫৲ টাকা অগ্রিম দিয়াছে তাহার বাবদ সুদ	১৲		
কর্ম্মচারীদের খরচা এবং বৎসরের চারি মাস স্থায়ী কর্ম্মচারীগণ অলস ভাবে বসিয়া থাকা হেতু ব্যয়—	২৲		
	মোট——১৬৷৹		

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ কথা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই লাক্ষা ব্যবসায়ে একচেটিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, দেশীয় প্রথানুসারে হাতে যে সেলাক প্রস্তুত হয়, তাহা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত কলে প্রস্তুত সেলাকের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। কাজেই হাতে প্রস্তুত সেলাকই অনেকে পছন্দ করেন। ভারতের কয়েকটি বড় বড় কারখানায় ও ইউরোপ এবং আমেরিকায় কলে প্রস্তুত প্রণালী প্রচলিত আছে। একথা

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেলাকের পরিবর্ত্তে অন্য কোন বস্তু ব্যবহার করা যায় না। আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডে সেলাকের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষের আবিষ্কারের বহু চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

কিন্তু উল্লিখিত সুবিধা সত্ত্বেও ভারতে সেলাক প্রস্তুতের ব্যবসায় জগতের প্রতিযোগিতায় দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এমন কি যে সমস্ত বড় বড় কারখানার হাতে সেলাক প্রস্তুত হয়, সেই সমস্ত কারখানার মালিকেরা আশঙ্কা করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে এই ব্যবসায় ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইবে। লাক্ষার রপ্তানী দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে বটে, কিন্তু সেলাকের রপ্তানী কমিয়া যাইতেছে; ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, মহাজনের আশঙ্কা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে।

ইউরোপ খণ্ড ও আমেরিকার কারখানা ওয়ালারা ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত ফসলোৎপন্ন লাক্ষা বা "চৌরি" ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তাহা আপন দেশে পরিষ্কার করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে ভারতীয় সেলাকের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিতেছেন। এমন কি ষ্টীক লাক্ষা পর্য্যন্ত বিদেশী ক্রেতারা ভারতের বাজারে ক্রয় করিতেছে। "কিরি" এবং লাক্ষা গলাইবার পর অবশিষ্ট যাহা তলানী পড়িয়া থাকে (waste মাল) তাহাও বিদেশী ক্রেতারা ভারতের বাজারে ক্রয় করিতেছে। তাহারা এই সমস্ত waste product হইতে পুনরায় লাক্ষা উদ্ধার করে।

ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপাদি পাশ্চাত্য দেশে সেলাক পাঠাইবার মাশুল হইতে কিরি, "চৌরি ও ষ্টীক ল্যাক পাঠাইবার মাশুল অনেক কম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যে কারণে সেলাক রপ্তানী হয়, তাহার প্রত্যেক মণে ভারতের মজুরেরা ১৬৲ ষোল টাকার উপর উপার্জ্জন করে এবং প্রত্যেক মণ চৌরির রপ্তানীর উপর মাত্র ৫৲ পাঁচ টাকা আয় করে। আর যদি ষ্টীক্‌ল্যাক রপ্তানী করা হয়, তবে সে কিছুই পায় না।

এই সমস্তের প্রতীকার করে কারখানার মালিকেরা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অপ্রস্তুত লাক্ষা ও আংশিকভাবে প্রস্তুত লাক্ষার উপর রপ্তানী শুল্ক বসান হৌক।

এই প্রবন্ধের লেখকগণ বালরার মিঃ গ্রেগরি ও মেসার্স আরাটুন কোম্পানী এবং মির্জাপুরের মেসার্স রোজার্স পারাট্ কোম্পানীর কর্ম্মাধ্যক্ষদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহারা লেখকদিগকে আপনাপন কারখানা দেখিবার সুযোগ ও সুবিধা না দিলে কখনই এই প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারিত না। এই প্রবন্ধে যে সমস্ত চিত্র দেওয়া হইল, তন্মধ্যে কতিপয় চিত্রের ফটোগ্রাফ এই কারখানাদ্বয় হইতে গৃহীত।

এক্সপেলারে খোল পেষাই

লাভ-লোকসানের হিসাব

(শ্রীশিশিরকুমার মিত্র)

ঘানি মিলের সঙ্গে এক্সপেলার বসানর ইচ্ছা অনেকেই প্রকাশ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে আমার মতামত এবং লাভালাভের একটা হিসাব চেয়ে পাঠিয়েছেন।

একটা এক্সপেলারে দৈনিক ৮ ঘণ্টায় ১০০ মণ খোল পেষাই করতে পারা যায় এবং ঘানির খোল এক্সপেলারে পেষাই করলে শতকরা ৪।৫ ভাগ তেল পাওয়া যায়। এক্সপেলারে পেষিত হলে ঘানির খোল অধিকতর কার্যোপযোগী হয়, সুতরাং এই খোলের দামও বেশী হওয়া উচিত।

আমরা নীচের হিসাবে ঘানির খোল থেকে প্রাপ্ত তেলের পরিমাণ মাত্র শতকরা ৩½ ভাগ ধরেছি আর এক্সপেলারের খোলের দাম ঘানির খোলের দামের সমান ধরেছি। ৩০ জোড়া ঘানি থেকে উৎপন্ন খোল মাত্র একটা এক্স-পেলারে পেষণ করতে পারা যায়, এবং একটা এক্সপেলার বসানর খরচ সর্ব্বসমেত ৬ থেকে ৭ হাজার টাকার ভিতর পড়ে। ৩০ জোড়া ঘানি থেকে প্রাপ্ত সরষের খোল এক্সপেলারে পেষণ করলে, খরচ খরচা বাদে মোট কত টাকা লাভ হতে পারে তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া হল।

এই রকম কাজে অর্থাৎ খোল পেষাই ব্যাপারে কোন জটিলতাই নেই এবং এর বসানর জন্য বিশেষ কোন ভিত্তি বা আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। এই সূত্রে এইটুকু বলে রাখা ভাল যে, আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে এক্সপেলারের খোলের চাহিদা বেড়ে চলেছে এবং বাস্তবিক পক্ষে এক্সপেলার থেকে প্রাপ্ত তিসির খোল ঘানির খোলের চেয়ে বেশী দরে বিক্রী হচ্ছে।

লাভালাভের হিসাব

দৈনিক ৮ ঘণ্টায় ১০০/০ মণ হিসাবে একমাসে মোট পেষিত সরিষার খোলের পরিমাণ—৩০০০/০ মণ

পেষণের ফলে কমপক্ষে শতকরা ৩॥০ ভাগ হিসাবে প্রাপ্ত সরিষার তেলের পরিমাণ—১০৫/০ মণ

এক্সপেলার থেকে প্রাপ্ত খোলের পরিমাণ—২৮৯৫/০ মণ

আয় :—

১০৫ মণ খাঁটী সরিষার তেলের দাম ২৩৲ টাকা মণ হিসাবে—২৪১৫ টাকা।

২৮৯৫ মণ এক্সপেলার খোলের দাম—৩৲ টাকা মণ হিসাবে—৮৬৮৫৲ টাকা। মোট—১১,১০০ টাকা।

ব্যয় :—

৩০০০ মণ ঘানি খোলের দাম—৩৲ টাকা মণ হিসাবে—৯০০০৲ টাকা।

৩০০০ মণ খোল পেষাইয়ের মোট খরচ (শক্তিব্যয়, লোকজনের মাহিনা, মোট মূলধনের উপর শতকরা ১০্ হিসাবে মূল্য হ্রাস)—৩৫্ টাকা। মোট—৯৩৫০্ টাকা।

মোট মাসিক লাভের পরিমাণ—১৭৫০্ টাকা। সুতরাং ৭০০০্ মূলধনে বাৎসরিক আয়—১৭৫০´× ১২—২১০০০্ টাকা।

অতএব প্রতি শত টাকায় তিনশত টাকা হারে লাভ।

খোল পেসাইয়ের জন্য এক্সপেলারের ব্যবহার, অপচয়শীল ঘানির উচ্ছেদ সাধন, আর সরাসরি বীজ পেষাই কার্য্যে এক্সপেলার প্রবর্ত্তন তৈলের ব্যবসায়ের উন্নতির প্রথম সোপান বলে ধরা যেতে পারে। মিলের লাভ বৃদ্ধি ছাড়া এতে মিলের মালিকরা এক্সপেলারের কার্য্যকারিতা, উপযোগিতা আর লাভা-লাভের পরিমাণ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারেন এবং ভবিষ্যতে ঘানির বদলে এক্সপেলার স্থাপন বিষয়ে ইতস্ততঃ করবার কিছুই থাক্‌বে না।

খোল পেষাইয়ের জন্য এক্সপেলারের প্রবর্ত্তন কোরে ধীরে ধীরেঘানি গুলির উচ্ছেদ সাধন করা যেতে পারে। ঘানিগুলি খারাপ হলেই সেগুলিকে বন্ধ কোরে দেওয়া উচিত; কেবল বিনা খরচায়, পুরাণো বাতিল করা ঘানির অংশ দিয়ে মেরামত করে যে ঘানিগুলো চলন উপযোগী হয়, সেই গুলোই চালান উচিত। ঘানিগুলি খারাপ হওয়া, আর বাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেষিত বীজের পরিমাণ কম্‌তে থাক্‌বে; কিন্তু মিলের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বজায় রাখতে গেলে, নানা উপায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করা যেতে পারে।

ঘানিতে পুরাপুরি পেষণ না করেই খোলগুলি তুলে নিতে হবে। এই খোলে যথেষ্ট পরিমাণ তেল থেকে যাবে, কিন্তু এক্সপেলারে পেষিত হবার সময় বাকী তেলের সমস্তটা বেরিয়ে আস্‌বে। ১৪।১৫টা ঘানি বাতিল দেওয়ার পর আর একটা এক্সপেলার বসাতে হবে। এই দুইটী এক্সপেলার যথাযথ ভাবে পরিচালনা করলে ৩০ জোড়া ঘানির সমান কাজ করতে পারবে। সরাসরি বীজ পেষাই কাজে কত টাকা লাভ হইতে পারে তা পরে আলোচিত হবে।

উপরোক্ত আয় ব্যয়ের হিসাবের সময় ধরে নেওয়া হয়েছে যে যথোপযোগী এক্সপেলার যথাযথ ভাবে পরিচালন করা হয়েছে।

এক্সপেলারের গঠনকৌশল ও কার্য্যবিধি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা, থাকা উচিত। এক্সপেলার প্রবর্ত্তনে পূর্ব্বে কি কি সতর্কতার প্রয়োজন, আর কোন্ কোন্ বিষয় বিচার সাপেক্ষ এইবার তাহার আলোচনা করিব।

খোল পেষাই অথবা সরাসরি বীজ পেষাই—এই দুই কাজেই এক্সপেলার ব্যবহার করা যেতে পারে। ডেলা ডেলা খোলের চেয়ে গুড়া করা খোল যথা-যোগ্যভাবে পেষিত হয় বলে, Cake breaker যন্ত্র সাহায্যে খোলগুলি গুড়া করে পেষাই করাই সঙ্গত। টাট্‌কা, নরম খোল গুড়া না করেও পেষাই করা যেতে পারে; কিন্তু পুরানো শক্ত খোলের জন্য এই প্রক্রিয়া অপরিহার্য্য। বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর Cake breaker দেখা যায়; এইগুলির নির্ব্বাচন—কত কিহি খোল চাই তার উপরই নির্ভর করে। ঘানি-মিলে খোল পেষাইয়ের জন্যে এক্সপেলার বসানর খরচ সর্ব্বসমেত ৬।৭ হাজার টাকা পড়ে। নির্ম্মাতা-হিসাবে, এর বীজের প্রকার ভেদে এই রকম একটা এক্সপেলার ঘণ্টায় ৪ থেকে ৮ মণ খোল পেষাই কর্ত্তে পারে। সাধারণতঃ, ঘানির খোল এক্সপেলারে পেষণ করলে শতকরা ৪।৫ ভাগ তেল পাওয়া যায়; এক্সপেলারে সরাসরি বীজ পেষাই কর্ত্তে হলে নিম্নলিখিত প্রাথমিক সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন হয়।

(১) বীজ পরিষ্করণ যন্ত্র (Asperater) বীজে লোহার টুকরা ইত্যাদি থাকলে এই গুলিকে বীজ থেকে দূরে করার জন্ত এক প্রকার চুম্বক যন্ত্র (Magnetic Separator) এই Asperator এ সংযুক্ত থাকে।

(২) বীজ কর্ত্তন যন্ত্র (Decorticator)। খোলা ভাঙিয়া বাদ দিবার দরকার হলে শুধু এই যন্ত্রের ব্যবহার হয়, যেমন চীনা বাদাম, রেড়ীর বীজ ইত্যাদি।

(৩) বীজ চূর্ণীকরণ যন্ত্র (Roller Mills) বীজগুলিকে পেষণের পূর্ব্বে প্রয়োজন মত গুঁড়া করার জন্ত এই যন্ত্রের আবশ্যক।

(৪) খোল ভাঙাই যন্ত্র (Cake breaker) যখন বীজ গুলিকে দুবার পেষাই হয় তখন প্রথম পেষাইয়ের পর এই যন্ত্রে খোল গুলিকে গুঁড়া করার আবশ্যক হয়।

(৫) তৈল ছাঁকাই যন্ত্র (Filter press) ঘোলাটে তৈল পরিষ্কার করার জন্ত এই যন্ত্র আবশ্যক মত ব্যবহৃত হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে প্রাথমিক প্রক্রিয়ার জন্ত বিদেশী বিক্রেতারা যে সব যন্ত্র অনুমোদন করেন, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য তৈল শিল্পের অনুযায়ী বলে আমাদের দেশে বিশেষ সুফল দেয় না। আমাদের দেশের তৈল বীজগুলিতে' সাধারণতঃ বেশী তেল থাকে, সেই জন্ত পাশ্চাত্যের অনুমোদিত যন্ত্রে প্রয়োজন অনুরূপ ফল পাওয়া যায় না

বীজ পরিষ্কার করার আবশ্যকতা যে কতখানি, তা পূর্ব্বে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। ধুলা, বালি ইত্যাদি ময়লা যে শুধু উৎপন্ন তেলের কোয়ালিটি খারাপ করে ও নিষ্কাষিত তেলের পরিমাণ কমিয়ে দেয় তা নয়, এ গুলির জন্ত চাপ-প্রয়োগশীল অংশগুলির দ্রুতগতিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই ধুলাবালির জন্ত পিষ্ট বীজের পরিমাণ কমে যায় ও উৎপন্ন খোলেরও বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায় না।

পেষণের পূর্ব্বে তূলার বীজ, রেড়ী ইত্যাদি বীজের খোলা বাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক। খোলা সমেত বীজ পেষাই যুক্তিযুক্ত নয়, মিলের মালিকদের উচিত যে এই প্রথা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করে তাদের যন্ত্রের অযথা ক্ষয় নিবারণ করা।

প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তৈল বীজ গুলি গুড়া করিবার কাজই বিশেষ দরকারী। এর উপর বীজ থেকে নিষ্কাষিত তৈলের পরিমাণ নির্ভর করে। মিলের লাভ লোকসান অনেক পরিমাণে ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গুড়া করার জন্তে "রোলার মিলের "নির্ব্বাচন ও যথাযথ ভাবে তাহার পরিচালন মিলের মালিকদের পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য। এই রোলার মিলগুলি পরস্পর সাহায্যকারী দুটী চোঙ বা "রোল" (Roll) দিয়ে তৈরী হয়। এক জোড়া রোল এমন ভাবে পাশাপাশি সাজান থাকে যে তৈল বীজগুলি সোজা-সুজি দুটী রোলের মাঝখান দিয়ে যায়। বীজের প্রকার ভেদে এক, দুই বা তিন যোড়া উপরি উপরি সাজান রোল দিয়ে নির্ম্মিত রোলের মিল ব্যবহৃত হয়। রোলের বহির্গাত্র প্রয়োজন অনুসারে মসৃণ অথবা খাঁজ কাটা করা হয়। প্রত্যেক জোড়া ঘূর্ণ্যমান রোলের একটীকে এমন ভাবে বিয়ারিং (Bearing) এর মধ্যে সংবদ্ধ রাখা হয় যাতে সেটী কেবল ঘুরতেই পারে, এদিক ওদিক নড়তে পারে না; আর অপরটীকে স্প্রিংয়ের দ্বারা প্রথমটীর গায়ে ঠেলে রাখা হয়। এই দুটী রোলের মাঝের ফাঁকটীকে নিয়ন্ত্রিত করবার পন্থা আছে। সেইজন্ত যখন যে রকম প্রয়োজন, স্প্রিংয়ের চাপ কমিয়ে বা বাড়িয়ে, সেই রকম ভাবেই এই রোল দুটীকে বাঁধা যায়; আর এই স্প্রিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় অতি সহজে হাত চাকা (Hand wheel) অথবা প্যাচ (Set screw)

দিয়ে প্রয়োজন অনুরূপ চাপ প্রয়োগ করা যায়। কোন রকমের কাঠের, লোহার কিম্বা পাথরের টুকরা যদি এই রোল দুটির মাঝখানে এসে পড়ে, তা হলে স্প্রিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রোলটি আপনা হতে পিছু হটে যায় ও ঐ সব টুকরাগুলি সহজেই ভিতর দিয়ে চলে যায়; রোলগুলিকে কোন রকমে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। এই রোলার মিলগুলি ব্যবহারের উদ্দেশ্যই এই যে, বীজগুলিকে এমন ভাবে গুড়া করা—যাতে সর্ব্বনিম্ন চাপ প্রয়োগেই অত্যধিক পরিমাণে তেল পাওয়া যেতে পারে। গুড়া যত মিহি হবে; তেলও তত বেশী পাওয়া যাবে—এই রকম সিদ্ধান্ত কিন্তু বড়ই ভ্রান্ত। গুড়া করা বীজের সুক্ষতার মাত্রা প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হয়। রোলগুলি খাঁজ কাটা হবে কিম্বা মসৃণ হবে, তাও বীজের প্রকার ও বীজস্থ তেলের পরিমাণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়।

তৈল-বীজ গুলি যখন দুবার পেষাই করা হয়, তখনই খোল ভাঙ্গাই যন্ত্রের আবশ্যক হয়। বীজে শত করা ৪২ ভাগের বেশী তেল থাকলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুবার পেষাই করা দরকার হয়। প্রথম পেষায়ের সময় প্রায় ৬০।৭০ ভাগ তেল বেরিয়ে আসে, বাকী তেল দ্বিতীয় পেষণের সময় পাওয়া যায়। টাটকা খোল এমনি গুঁড়া না করেই পেষাই করা যেতে পারে, কিন্তু খোল ভাঙ্গাই যন্ত্রে (cake breaker) গুঁড়া করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে দেখা যায় যে, শতকরা ৪২।৪৫ ভাগ তেল বিশিষ্ট বীজগুলিকে উত্তমরূপে ঠিক মত পেষাই করলে প্রায় সব তেলই একবারে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ, এক্সপেলার থেকে নির্গত তেল একটু ঘোলাটে হয়। সেইজন্য এই তেল পরিষ্কার করার জন্য ফিল্টার প্রেস ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত প্রথা একটু বদলে দিলেই ফিল্টার প্রেসের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হবে না।

বীজ পোষণ (feeding) ইত্যাদি কাজ, বীজ বাহক (conveyor), বীজ উত্তোলক (elevator) ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা সুসম্পন্ন করা যেতে পারে।

যে সব বিষয় বর্ণনা করা হোল, তা থেকে বেশ বোঝা যাবে যে, এক্সপেলার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক যন্ত্রের নির্ব্বাচন বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কোনও বিশেষ কাজে কোনও বিশেষ যন্ত্র চলবে কি না, তা বিক্রেতাদের ভূয়া কথায়, কিম্বা তাঁদের বিক্রীত যন্ত্রের সংখ্যা থেকে বোঝা যায় না। প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় যে সব যন্ত্রের প্রয়োজন, তার নির্ব্বাচন, বীজের প্রকার ইত্যাদির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

• শক্তি উদ্ভাবনী যন্ত্রাদির (Power plant) খরচ বাদ দিলে দেখা যায়, সরিষা পেষাইয়ের জন্য দুইটী এক্সপেলার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক যন্ত্রাদিতে খরচ পড়ে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। ইহাদ্বারা দিনে ১৯০ মণ বীজ পেষাই চলবে। যেখানে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়—সেখানে যন্ত্রাদি চালনার জন্য ঐ শক্তি ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা ও তৈল সম্বন্ধীয় যাবতীয় খবর ধারাবাহিক ভাবে "বাঙ্গলার কথায়" প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাকটিকিট পাঠালে এই সম্বন্ধে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রবন্ধ লেখকেরকাছ থেকে পাওয়া যাবে। তাঁর ঠিকানা—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র
C/o বাঙ্গলার কথা।

———

সারের রাসায়নিক তত্ত্ব।

জমিতে অনেকেই সার প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাহার উপকারীতাও স্বীকার করেন, কিন্তু এই সার প্রয়োগের মধ্যে যে রাসায়নিক তত্ত্বটী নিহিত আছে সে সম্বন্ধে অনেকেরই কিছু ধারণা নাই। এইজন্য আমরা সারের রাসায়নিক তত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটী কয়েকটী কথা এখানে আলোচনা করিলাম। আশা করি ইহার দ্বারা অনেকেই উপকৃত হইবেন।

সারের তিনটী উপাদান— উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য তিনটী বস্তুর প্রয়োজন হয়।

(১) নাইট্রোজেন।

(২) ফসফরিক এসিড ও

(৩) পটাশ।

উদ্ভিদের ঐ প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভূমিতে সার প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্দেশীয় কৃষকগণ একমাত্র গোবর ব্যবহার করিয়াই ভূমিতে সার দ্রব্যের অভাব সম্পূরণ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ গোবর প্রয়োগ করা উচিত, তাহা সচরাচর একত্রে পাওয়া যায় না, অথবা পাওয়া গেলেও তাহা এরূপ ব্যয় সাপেক্ষ যে, প্রয়োগের পরিণাম লাভজনক হয় না। একমাত্র গোবরের দ্বারা যে সার প্রয়োগের সম্পূর্ণ সার্থকতা হয় না তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; গোবরের সারে উপরোক্ত তিনটী উপাদানই কিঞ্চিৎ মাত্রায় থাকে বটে কিন্তু উহাদের কোনটীই তেমন অধিক পরিমাণে গোবরে পাওয়া যায় না যাহা উদ্ভিদের পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হয়।

অতএব কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য গোবর ব্যতীত সুলভে অন্য বস্তুর দ্বারা উদ্ভিদের খাদ্যের অভাব পূরণ করা বিশেষ আবশ্যক; একারণ পাশ্চাত্য দেশে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সারগুলি বহুল প্রচলন লাভ করিয়াছে। ঐ সকল রাসায়নিক সারগুলির বিচিত্রতা এই যে সেগুলিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় বস্তু এরূপ অধিক মাত্রায় থাকে যে উহাদের অল্প

পরিমাণ প্রয়োগ করিলে তাহাই উদ্ভিদের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট হয় ও পরিমাণে সার ব্যবহার জনিত ব্যয়ও কম হয়।

সারের ব্যবহার—উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য উল্লিখিত তিনটী উপাদানের পরিমাণের এরূপ সামঞ্জস্য থাকা উচিত যে একটীর অভাব ও অপর দুইটীর প্রাচুর্য্য না হয় বা দুইটীর প্রাচুর্য্য ও একটীর অভাব না হয়। অর্থাৎ তিনটীই যেন উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্ব স্ব পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এই বিষয়ে আরও লক্ষ্য থাকা উচিত যে ঐ তিনটী পদার্থ যেন এরূপ প্রকৃতির হয় যে জলে দ্রব হইয়া ঐগুলি অনায়াসে উদ্ভিদ শরীরে নীত হইতে পারে। নাইট্রোজেনাত্মক সর্ব্ববিধ দ্রব্যের মধ্যে নাইট্রেট অবস্থার সার সদ্য সদ্য উদ্ভিদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়; অপর প্রকৃতির নাইট্রোজেনযুক্ত সার যাবৎ ভূমিতে বিবিধ উপায়ে নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত না হয় তাবৎ তাহারা উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত হয় না। এ বিষয়ে কোনও প্রকার মতভেদ নাই। এমোনিয়াম্ সাল্‌ফেট প্রয়োগে জমিতে যে হাজা দোষ দেখা যায় নাইট্রেট্ অফ্ সোডা প্রয়োগে তাহা হয় না।

এদেশে ফসলের উৎকর্ষ বিধানের জন্য নাইট্রোজেনযুক্ত সার ক্ষেত্রে কখনও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। ধৈঞ্চা বা ঐ জাতীয় ফসল জন্মাইয়া জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া কিংবা খইল ব্যবহার দ্বারা উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের প্রয়োজন কখনও পূরণ করা যায় না। উক্ত উপায়ের দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির অভাব দূর হইতে পারে, কিন্তু ফসল উৎপন্ন করিয়া ষোল আনা লাভ হইবে না।

উদ্ভিদকে সদ্য সদ্য প্রচুর নাইট্রোজেন সরবরাহ করিবার জন্য নাইট্রেট অফ সোডাই উপযুক্ত সার, আর যে সকল জমিতে ফস্‌ফরিক এসিড বা পটাশের একান্ত অভাব হয় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে একমাত্র নাইট্রেট্ অফ সোডা প্রয়োগেই অধিক লাভজনক ফল পাওয়া যায়।

ইক্ষুর ফসলের জন্য যে পরিমাণ ফস্‌ফরিক এসিডের প্রয়োজন হয় ধান্য ফসলে ততটা হয় না বটে, কিন্তু ধান্য আবাদে ইহার আবশ্যকতা আছে। কোনও উপায়েই বাঙ্গালার কৃষকগণ সারের ঐ উপাদানটী ভূমিতে প্রয়োগ করেন না। হাড়ের গুঁড়া আকারে ফস্‌ফরিক এসিড ধান্যের ভূমিতে প্রয়োগ করাই সাধারণ চাষীর পক্ষে সুলভ উপায়; একারণ বিঘা প্রতি ১৵০ মণ হাড়ের গুঁড়া আমন ধান্যের জমির জন্য যথেষ্ট হইবে। আউস ধান্যের জমিতে অনেক রকম মূল্যবান ফসলও জন্মান হয়; আর ঐ প্রকার ভূমিতে ইক্ষু বাদামলুই প্রভৃতি উৎপন্ন করিবার সময় আরও অধিক পরিমাণে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে কিংবা যদি ধৈঞ্চা জন্মাইয়া জমিতে সার দেওয়া হয় তাহা হইলে ধৈঞ্চা বপন করিবার সময় হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে কঠিন অবস্থার ফস্‌ফরিক এসিড সরল অবস্থায় পরিণত হইবে; এইরূপ স্থলে ধান্যের চারার কেবলমাত্র নাইট্রেট অফ সোডার প্রয়োগেই যথেষ্ট হইবে। কেবল সুপারফস্‌ফেট নামক রাসায়নিক সার উদ্ভিদকে অতি সত্বর ফস্‌ফরিক এসিড সরবরাহ করে; যে সকল আউস ধান্য মূল্যবান্ তাহাদের আবাদে এই সার নাইট্রেট অফ সোডার সহিত বিঘা প্রতি দশ হইতে বারো সের প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তামাকের ফসলের ন্যায় ধান্য শস্যে পটাশ বেশী মাত্রায় আবশ্যক না হইলেও উহারও প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালার কৃষকগণ সাধারণতঃ

ছাই প্রয়োগের দ্বারা জমিতে পটাশের অভাব মোচন করেন। বিলাতী পানা বা কচুরী পানার ছাইতে পটাশের মাত্রা যথেষ্ট থাকে; অতএব ঐ অনিষ্টকর উদ্ভিদ ধ্বংস করিয়া তাহা ছাই সাররূপে জমিতে লাগান যাইতে পারে।

সলফেট অফ্ পটাশ এবং মুরিয়েট অফ্ পটাশ নামক রাসায়নিক সার দুইটীতে পটাশ অধিক মাত্রায় পাওয়া যায় উপরোক্ত যে কোনও অবস্থার পটাশই উদ্ভিদের পক্ষে সমান উপযোগী। বৎসরান্তর রাসায়নিক পটাশ সার বিঘা প্রতি ৴৫ ৴৭ সের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বীজ বপনের এবং চারা রোপণের পূর্ব্বে পটাশ সার জমিতে ফেলিবে; সুপারফস্ফেটও ঐরূপ সময়ে ব্যবহার করিতে হয়।

গরু নানারূপ ঘাস, খড়, এবং লতা, পতাদি খাদ্য করিয়া তাহার গোবরে তন্তুজাতীয় (fibrous) উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে; এই উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে বলিয়া তাহা মাটীর আঁটাল ভাব দূর করিয়া জমিকে নরম করে আর ঐরূপ অবস্থায় আবাদ বেশ ভাল হয়; কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় উদ্ভিজ্জ পদার্থ জমিতে জমিয়া গেলে কাদা মাটীর কণাগুলি বৃহত্তর ভাবে পৃথক হইয়া যায় ও মাটীর আলগা অবস্থা হয়। ক্ষেত্রের ঐরূপ অবস্থা হইলে ধান্যের চারা মাটীতে শিকড় লইতে পারে না; কারণ শিকড়গুলি আর তখন মাটী আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না; তাহার প্রধান অবলম্বনই হয় তখন এই সকল তন্তু জাতীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ যাহার গোড়ায় বেশী জল জমিলেই তাহারা ফুলিয়া ওঠে; এবং ধানের শিকড়ও তখন আলগা হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় জমিতে জল জমিলে আমন ধান্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

বর্দ্ধমান জেলায় বাঙ্গালার অপর জেলাগুলি অপেক্ষা গোবর বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়; আর তথায় ফসলের ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখা যায়। ঘাস, আগাছা প্রভৃতি পচিয়াও জমির ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে। এরূপ হইলে কৃষকগণ জমির জল বাহির করিয়া দিয়া ক্ষেত্রে 'খাড়ী লবণ' ছড়াইয়া দেয়। ঐ ক্ষার পদার্থ প্রয়োগে কাদা মাটীর কণা আঁট হইয়া বসিয়া গেলে উদ্ভিদের শিকড় মাটীতে জমিয়া যায় খাড়ী লবণের সহিত বিঘা হিসাবে নাইট্রেট্ অফ্ সোডা দশ সের উহার তিন চারি গুণ শুষ্ক ঝুরা মাটির সহিত মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলে চারাগুলি শীঘ্র সতেজ হইয়া উঠে।

তামাক।

ভারতবর্ষে তামাকের চাহিদা অত্যন্ত অধিক। কালের পরিবর্ত্তনে এই চাহিদা আবার দিন দিন অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের মধ্যে এক শিখ জাতি ব্যতীত প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকই অল্পাধিক ধূমপান করিতে অভ্যস্ত। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে আবাল বৃদ্ধ বণিতার তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সাধারণতঃ বয়স্ক পুরুষেরাই তামাক, সিগারেট বা বিড়ি ব্যবহার করেন। কিন্তু মেয়েরাও যে কোন ভাবেই তামাক ব্যবহার করেন না—এমন কথা বলিতে পারি না। কেন না মেয়েদের মধ্যে দোক্তা, জর্দ্দা, সুর্ত্তি প্রভৃতি খাওয়ার নেশা দস্তুর মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কবিরাজদের মধ্যে অনেককে বড়াই করিয়া বলিতে শুনি যে আমরা তামাক বা সিগারেট খাই না। কিন্তু তাঁহারা দুইটী নাসারন্ধ্রে যে পরিমাণ নস্য অর্থাৎ সুবাসিত তামাক গুঁড়া ব্যবহার করেন তাহাদ্বারা একটা বালককে অজ্ঞান করিয়া ফেলা যায়। আজ কাল ছেলেদের মধ্যে ও তামাকের নেশা ঢুকিয়াছে। স্কুলের বালক ও আজ নস্য নয়,দোক্তাখাওয়া, সিগারেট বিড়ি ফুঁকিতে পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এখানে ইহার ইউটিলিটির দিক বিচার করিব না, কেবল মাত্র ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে সমস্ত জিনিষটা বিবেচনা করিয়া দেখিব।

যে কারণেই হউক না কেন ভারতে তামাকের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল এদেশে আমদানী করা হয়। ১৯২৮-২৯ সালে সমুদ্র পথে ২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী তামাক, চুরুট, সিগারেট প্রভৃতি ইংরাজ অধিকৃত ভারতে আমদানী হয়।

ভারতবর্ষে যদি আদৌ তামাকের চাষ না হইত তাহা হইলে বিলাতী সিগারেটের আমদানী দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ থাকিত না। কিন্তু ভারতবর্ষ তামাক চাষের একটী প্রধান কেন্দ্র। ইংরাজ অধিকৃত ভারতে প্রতি বৎসর কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ একার জমিতে তামাকের চাষ হইয়া থাকে। খুব ভাল ফসল হইলে এক একর উত্তম জমীতে ১৬৫০ পাউণ্ড হইতে ১৯৫০ পাউণ্ড কিওর করা তামাক পাতা জন্মিতে পারে। কিন্তু ভাল ফসল না হইলেও গড়ে একার প্রতি ১০০০ পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। সেই হিসাবে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় এক শত কোটী পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই অল্প বিস্তর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তবে তাহাদের মধ্যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ ও বোম্বাইয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। বাংলার রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চল তামাক চাষের জন্য বিশেষরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বঙ্গদেশে গড়ে প্রতি বৎসর ২৯০ হাজার একার জমীতে তামাকের চাষ হইয়া থাকে।

• এক একর—তিন বিঘা

যে দেশে এরূপ বিস্তৃত ভাবে তামাকের চাষ হয় সে দেশে যে কোটী কোটী টাকার বিদেশী তামাক আমদানী হইতেছে ইহা নিতান্তই লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। আরও লজ্জার কথা এই যে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশেরই তামাক বিদেশ ভ্রমণ করতঃ একটু রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগের কষ্টার্জ্জিত অর্থ বিদেশী বণিকের সিন্দুক ভরাইয়া তুলে। প্রতি বৎসরই এদেশ হইতে অজস্র কাঁচা তামাক বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, অবশ্য কিছু কিছু সিগারেট ও চুরুট ও যে রপ্তানী না হয় তাহা নহে। নিম্নের হিসাব দেখিলেই গত কয়েক বৎসরের রপ্তানীর পরিমাণ বুঝা যাইবে।

	পাউণ্ড	টাকা
১৯২৩-২৪	৫৫৯৯১৫৩১	১০২৯৭৩০১৲
১৯২৪-২৫	৪৪১৪০১৭৫	১২৫০৬৮৯৪৲
১৯২৫-২৬	৬৮০১৮০৬৯	১১১৪০০১৭৲
১৯২৬-২৭	২৯৭৯৩৬১৩	১০৪১৫২২১৲

বলাবাহুল্য ঐ রপ্তানী তামাকের অধিকাংশই পাতা তামাক অর্থাৎ সিগার ও সিগারেটের উপকরণ মাত্র। ১৯২২-২৩ সালে মোটে ২১৫ লক্ষ পাউণ্ড পাতা রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৪-২৫ সালে উহা বাড়িয়া ৪৪১ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হয়। তৎপরে রপ্তানীর পরিমাণ পুনর্ব্বার কমিতে থাকে। ১৯২৫-২৬ এবং ১৯২৬-২৭ সালে যথাক্রমে ৬৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ২৯৭ লক্ষ পাউণ্ড পাতা রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতীয় পাতার প্রধান খরিদ্দার গ্রেট বৃটেন।

দেশের মাল বিদেশে রপ্তানীর অর্থ দেশের অর্থাগম। কাজেই বিদেশে মাল রপ্তানী করায় কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু দেশের অভাব পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। কেন না বিদেশীরা ঐ কাঁচা মাল হস্তগত করতঃ তদুৎপন্ন দ্রব্যই এ দেশের হাটে বাজারে দশগুণ দরে বিক্রয় করিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রেট বৃটেনই ভারতীয় তামাক পাতার প্রধান খরিদ্দার। ১৯২৬-২৭ সালে গ্রেট বৃটেন কিঞ্চিদধিক এক কোটী পাউণ্ড তামাকের পাতা সাড়ে ৩৮ লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু ঐ বৎসর তাহারা এই ভারতের বাজারে কেবল মাত্র ৪১৪-২২৩৬ পাউণ্ড সিগারেট বিক্রয় করিয়াই ১৯২৮৮-২৪০৲ টাকা স্বদেশে লইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তামাকের মশলা ও চুরুটের মূল্য বাবদ আরও ১লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা হইবে।

দেশের অর্থ দেশে রাখিতে হইলে কাঁচা মালকে এ দেশেই পাকা মালে পরিণত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক চুরুট ও সিগারেটের ফ্যাক্টরী স্থাপন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আগেকার লোকে তামাক খাইত। কেহ কাহারও বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পান তামাক দেওয়াই ছিল সামাজিক রীতি। কিন্তু আজ কাল চা, সিগারেট পান তামাকের স্থান অধিকার করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমৃত নিস্যন্দিনী লেখনী মুখে গুড় গুড়ির সহস্র স্তুতিবাদ করিলেও এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁহার সপক্ষে রায় দেওয়া সত্বেও হুঁকা কলিকা আজকাল সভ্য সমাজে আর কল্কে পাইতেছে না। ইহাতে দুঃখ করিয়া লাভ নাই—অনুশোচনাও সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ফল। কালের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। কালের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ীকে চলিতে হইবে।

হুকার তামাকের কারবার এ দেশে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগীতা না থাকায় এবং চাহিদাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া ব্যবসায়ীগণের বিশেষ চিন্তার কারণ হয় নাই। বিড়ির কারবার ও বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। সিগারেট অপেক্ষা অনেক সস্তা বলিয়া এই দরিদ্র দেশে বিড়ির চাহিদা অত্যন্ত অধিক।

বঙ্গদেশে বিড়ির প্রচলন প্রথম খুব বাড়িয়া যায় বঙ্গ ভঙ্গের সময় স্বদেশী আন্দোলনের ফলে। তখন সকলে একযোগে বিলাতী সিগারেট ছাড়িয়া স্বদেশী বিড়ি টানিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে অসংখ্য লোক এই শিল্পে আত্ম নিয়োগ করিয়াছে। এই কারবারে যাহারা লিপ্ত আছে তাহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

বাংলার বাহিরেও বিড়ির প্রচলন খুব বেশী। ১৯২৪ সালে বিহার ও যুক্ত প্রদেশে ২৪১টী বড় বড় বিড়ির কারখানা ছিল। ঐ গুলিতে যথাক্রমে ৪৬০০ এবং ১২৫০০ লোক কাজ করিত। ছোট ছোট কারখানার হিসাব পাওয়া যায় না। যাহা হউক তৎপরে এই গত চারি বৎসরের মধ্যে যে ঐ ব্যবসায় আরও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিড়ির ব্যবসায় করিয়া কত লোক যে করিয়া খাইতেছে কলিকাতার পথচারীকে তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না। কলিকাতার রাজপথে কয়েক গজ অন্তর এক একটী বিড়ির দোকান এবং প্রত্যেক দোকানেই ২।১ জন হইতে ১০।১৫ জন লোক অবিরত ক্ষিপ্রহস্তে বিড়ি বাঁধিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কলিকাতার বিড়ির দোকানগুলিতে একটী জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যাহারা বিড়ি বাঁধিবার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জনই মুসলমান।

আমার এই ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে বিড়ি তৈয়ারী করিতে কোন বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন করে না। মূলধন ও যৎসামান্য হইলেই চলে। বিশেষতঃ ইহাতে আদৌ দৈহিক শক্তির প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী মুসলমান অপেক্ষা শারীরিক শক্তিতে বাঙ্গালী হিন্দু ঢের বেশী দুর্ব্বল। তাহার শ্রমসাধ্য কাজ করিবার শক্তি নাই। তাই প্রত্যেক শ্রমসাধ্য কাজ হইতেই বাঙ্গালী হিন্দু হটিয়া যাইতেছে। কিন্তু যে সমস্ত কাজ করিতে আদৌ দৈহিক শক্তির প্রয়োজন নাই সে কাজও তাহারা খুঁজিয়া পায় না; হিন্দুর ছেলেরা যাহারা লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা পায় নাই বা সামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছে অথচ যাহাদের অত্যধিক পরিশ্রমসাপেক্ষ কার্য্য করা সাধ্যে কুলাইয়া উঠে না, তাহারা মুসলমান-দিগের অনুকরণে বিড়ির ব্যবসায় আরম্ভ করিলে লাভবান হইবে সন্দেহ নাই। [বিড়ির ব্যবসায় সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ১৩৩৩ সালে "ব্যবসা ও বাণিজ্যে সবিস্তারে সচিত্র প্রবন্ধাকারে বর্ণিত হইয়াছে)।

যাহা হউক বিড়ির কথা ছাড়িয়া এইবার সিগারেটের কথা আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমানে তামাকের ব্যবহারগুলির মধ্যে সিগারেট রূপেই আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখন ইতর ভদ্র সকলেই সিগারেট ফুঁকিতে অভ্যস্ত। এমন কি সিগারেটের ধূমপান করিতে না পারিলে আজকাল নাকি "ভদ্রতা" রক্ষা হয় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী

ফলস্বরূপ সিগারেটের কাটতি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছে।

সিগারেট অপেক্ষা চুরুটের দাম বেশী এবং উহা খুব আভিজাত্যের লক্ষণ। সাধারণতঃ সাহেব লোক বা অভিজাত সম্প্রদায়ই চুরুট ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সকলেরই নাকি অভিজাত হইবার সখ, তাই সেই সখ অন্যভাবে মিটাইবার উপায় না পাইয়া চুরুট ব্যবহারের দ্বারাই মিটাইয়া লইতেছে। ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তনও যতই বাড়িতে থাকে, বাহিরে কেঁচোর পত্তন ততই জাহির হয়। এইটাই বর্ত্তমান যুগের স্বাভাবিক লক্ষণ। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশে চুরুটের প্রচলনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু যাউক, আমাদের কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। Facts লইয়াই আমাদের কারবার এবং Facts এই যে সিগারেটের ন্যায় চুরুটের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতবর্ষে কয়েকটা বড় বড় সিগারেটের ও চুরুটের কারখানা আছে। ১৯২৪ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে গভর্ণমেন্ট যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ বৎসর মাদ্রাজে বড় বড় ২টী চুরুটের কারখানা ছিল। একটিতে ৩৮৬ জন, এবং অপরটীতে ১৩৫ জন লোক কাজ করিত। রেঙ্গুনে একটি চুরুটের বড় কারখানা, মাদ্রাজে আরও ১৪টি এবং ব্রহ্মদেশে ১৬টি ছোট ছোট কারখানা আছে। এতদ্ব্যতীত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কুটীর শিল্প হিসাবে গৃহস্থেরা চুরুট তৈয়ারী করিয়া থাকেন। গভর্ণমেন্ট হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ১৯২৪ সালে ঐ শিল্পে ১৩১৩৬ জন লোক নিযুক্ত ছিল।

মুঙ্গের ও বাঙ্গালোরে এক একটি বৃহদাকার সিগারেটের কারখানা আছে। তা ছাড়া কলিকাতাতেও কয়েকটা ছোট ছোট সিগারেটের কারখানা আছে।

ভারতবর্ষে কি পরিমাণ সিগারেট উৎপন্ন হয় তাহা নির্ভুল ভাবে নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। কেননা কেবল বড় বড় কারখানাগুলির উৎপন্ন মালের হিসাব পাওয়া যায়, ছোট ছোট কারখানার হিসাব সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

যাহা হউক ১৯১৬ সালে বাষ্পীয় বা ইলেক্‌ট্রিক শক্তি চালিত যন্ত্রপাতি সাহায্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড সিগারেট উৎপন্ন হইয়াছিল। সংখ্যা হিসাবে উহা ৩৬১২৫ লক্ষ সিগারেট হইবে। গড়ে ১ হাজার সিগারেটের ওজন প্রায় ২২ পাউণ্ড; একপাউণ্ড আধসেরের সমান; বলাবাহুল্য বর্ত্তমানে উৎপন্ন মালের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন যন্ত্রশক্তিতে গড়ে প্রতিবৎসর প্রায় ৪৫০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপন্ন হয়।

উল্লিখিত হিসাব হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে ভারতে যে সিগারেট উৎপন্ন হয় ভারতের চাহিদার তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আরও দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের সমস্ত ফ্যাক্টরীগুলি পুরাপুরি ভারতীয় নহে।

ভারতবর্ষে যে প্রচুর পরিমাণে তামাকের চাষ হয় একথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। অথচ দেখিতে পাই প্রতি বৎসরই অজস্র সিগারেটের মসলা এদেশে আমদানী হইতেছে। আপাততঃ দৃষ্টিতে ইহা একটি বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এতকাল ভারতবর্ষে খুব

বেশী পরিমাণে উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হইত না। অথচ সিগারেটাদি প্রস্তুত করিতে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তামাকের প্রয়োজন। আমেরিকার ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে খুব উৎকৃষ্ট তামাক জন্মিয়া থাকে। তাই ভার্জ্জিনিয়ার তামাকই সিগারেটের উপাদানরূপে এ দেশে আমদানী করা হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন বাংলার বুড়ির হাট অঞ্চলে, পুষার কৃষি-ক্ষেত্রে এবং ভারতের অন্যান্য প্রায় সকল প্রদেশেই উৎকৃষ্ট বিদেশী তামাকের চাষ হইতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে অত্যুৎকৃষ্ট সিগারেটের তামাক উৎপন্ন হইবে। অথবা এখনই যে প্রচুর পরিমাণে সিগারেটের উপযোগী তামাক উৎপন্ন হইতেছে না— তাহাই বা বলিব কেমন করিয়া? ভারতীয় পাতার প্রধান ক্রেতা বিলাত এবং প্রতিবৎসর ভারতে যে পরিমাণ বিদেশী সিগারেট আমদানী হয় তাহার পনের আনাই বিলাতে তৈয়ারী। অর্থাৎ যে বিলাতী সিগারেটের আমরা বহুতর প্রশংসা করিয়া থাকি ভারতীয় তামাক পাতা তাহার প্রধান উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক সিগারেটের উপযুক্ত তামাক যদি এদেশে প্রচুর পরিমাণে নাও জন্মিত, তাহা হইলেও এদেশে সিগারেট শিল্প উন্নতি করিতে পারে। কেননা আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সিগারেটের মসলা এদেশে আমদানী হয় এবং ঐ মসলার উপর যে ডিউটি বসান হইয়াছে সিগারেটের উপর হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চহারে ডিউটী আদায় করা হয়। উহাতে সিগারেট শিল্প গড়িয়া উঠিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইতেছে।

চুরুটের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। চুরুট শিল্পে আমাদের আশাতীতরূপে উন্নতি করা উচিত ছিল, কিন্তু সেরূপ উন্নতি যে হয় নাই তাহা আমাদের অবহেলার ফল মাত্র। ব্রহ্মদেশে চুরুটের ব্যবসায় খুবই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ভারতের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসীডেন্সীই এই শিল্পে অগ্রণী।

বাংলা দেশে চুরুটের ফ্যাক্টরী খোলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কেননা উহার মালমশলা বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বুড়ীর হাটের তামাক পাতা চুরুট জড়াইবার বিশেষ উপযোগী। ফল কথা ঐ স্থান হইতেই সিগারেট প্রস্তুতের পাতা দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হয়।

ভারতে তামাক শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জল এবং আশাপ্রদ। এবং এই এক একটী শিল্পকেই অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার দ্বারা হাজার হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে। এখন যদি আমরা এই শিল্পে আত্ম নিয়োগ না করি তবে বিদেশীরা এখন যেভাবে আমাদিগকে শোষণ করিতেছে তাহা ত করিবেই অধিকন্তু এদেশেও ফ্যাক্টরীস্থাপন করতঃ দেশী-শিল্প গড়িয়া তুলিবার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া দিবে।

বিদেশীয় বণিকগণ এদেশে কি অতিকায় আকারে সিগারেটের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে তাহার একটু আভাষ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাংলাদেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা ছীজর্, রেলওয়ে, হাওয়াগাড়ী ট্যাট্লার, হাতীমার্কা ইত্যাদি নানা Brand বা মার্কার সিগারেটের কথা দিনরাত শুনিতেছেন। এইসকল সিগারেট ব্যাপক ভাবে এদেশে চালাইবার জন্য Imperial Tobacco Company (ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানী) নামে একটী বিরাট

অনুষ্ঠান এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অনুষ্ঠানকে সিগারেট প্রচলনের একটি Trust (ট্রাষ্ট) বলিলেই ঠিক ব্যাখ্যা করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কোনও একটী ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ফেলিবার সময় আপনাদের মধ্যে এক একটী Trust বা সংঘবদ্ধ অনুষ্ঠান (organisation গঠন করিয়া থাকেন। এই সকল Trust এর সমবেত মূলধনের জোরে বাজারে অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী টিকিতে পারে না। আমরা সংবাদ পত্রে মাঝে মাঝে যে Steel Trust, Cotton Trust Oil Trust ইত্যাদির কথা পড়িয়া থাকি সে সবই এইরূপ Huge Capitalistic Combination বা ধনীদিগের অগাধ অর্থের সমবায় সমষ্টি। এই অর্থের জোরে ইহারা বাজারের সব কাঁচা মাল কিনিয়া ফেলে এবং খরিদদারের কিনিবার শক্তি বুঝিয়া আপনাদের ইচ্ছাও সুবিধামত দর বাঁধিয়া বাজারে মাল বিক্রয় করে। এই সকল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে কোনও ছুনো পুঁজি মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। সিগারেটের ব্যবসা ব্যাপক ভাবে এদেশে চালাইবার জন্য Imperial Tobaco Company নানা সিগারেটের ব্যবসায়ীদিগকে একত্র সংঘবদ্ধ করিয়া যে বিরাট Combination গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহাকেও ছোট খাটো রকমের একটা সিগারেটের Trust বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চৌরঙ্গীতে Imperial Tobacco কোম্পানী যে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন তাহা দেখিলে তাক্ লাগিয়া যায়।

নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ কোম্পানীগুলি এই Combination এর মধ্যে রহিয়াছে।

1. Imperial Tobacco Coy of India Ld.

2. Indian Leaf Tobacco Devolopment Coy Ltd

(Inccrporated in the British Isles)

3, Tobacco Manufacturets (India Ld)

(Iucorporated in the British Isles)

4. Printers (India Ld)

Incorporated in the Britisd Isles)

5. Arcadian Tobacco Coy Ld

(Incorporated in England)

6. Thos Bear & Sons (India Ld)

(Incorporated in England)

7. Penninsular Tobacco Coy Ld

(Incorporated in England)

8. Dominion Tobacco Coy Ld

(Incorporated in the Birish Isles)

9. British American Tobacco Coy (India Ld)

(Incorporated in England)

আজ বাংলাদেশের নেতা, উপনেতা, অধিনেতা প্রভৃতি সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দিগকে করযোড়ে বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি —আপনারা একবার একটু ধীর ভাবে এই সকল ছোট ছোট কথা চিন্তা করিবার অবসর করুন; দেশের আনাচে কানাচে যত "সবুজ" "তরুণ" ও "কাঁচার" দল পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের সবুজী ও তরুণী দিগকেও ঘরের বাহির করার জন্য উচ্চকণ্ঠে—কেবা রব করিতেছেন তাঁহাদিগকেও আজ একবার বলি—

যোরের এই কাল ঘোর্
তবু কি ভাঙ্গিবে না ভোর্?

তুচ্ছ এক একটা "পয়সা প্যাকেট" সিগারেট বেচিয়া কত কোটী টাকা এক বাংলাদেশ হইতেই বিদেশী বণিকগণ তাহাদের বুদ্ধি এবং সংঘের (organisation) জোরে উপার্জন করিয়া লইতেছে আর তোমরা এখনও কেবল পুতুল ঘরের সখের সেনা সাজিয়া জগতকে হাসাইতেছ আর আত্মপ্রতারণায় ডুবিয়া মরিতেছ। তোমাদের তরুণসংঘ, সবুজ সংঘ, কাঁচার মেলা শুধু কি কেবল ঘর মজাইয়া পরকে হাসাইবার জন্যই সৃষ্টি হইতেছে? ইউরোপের কেবল নারীনৃত্য, চটুল চাহনী আর থিয়েটার সিনেমাই কি তোমাদের বরণীয় এবং করণীয় হইল?—

পাশ্চাত্য দেশে যাহা গৃহ সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল সুখ এবং ধ্বংসকারী বলিয়া সকল মনীষিগণ একবাক্যে তীব্র নির্ঘোষে নিন্দা করিতেছেন, ইউরোপের সেই abominable উচ্ছিষ্ট গুলি মাথায় তুলিয়া তোমরা পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতেছ, আর যে সকল সদ্‌গুণ ইউরোপীয় জাতিকে সসাগরা ধরিত্রীর মালিক করিয়া তুলিয়াছে তাহার একটী সদ্‌গুণেরও কি অনুকরণ করিতে শিখিবে না? ওরে দেশের সবুজ ও কাঁচার দল! এখনও একবার অন্তঃচক্ষু চাহিয়া নিজেদের আসল অবস্থাটা তলাইয়া দেখিতে শেখ।

এই সিগারেটের শোষণের কথা পাড়িলেই একদল উপনেতা আছেন যাঁহারা অমনি ফতোয়া জারী করিবেন "সিগারেট খাওয়া বন্ধ কর। কংগ্রেসের সখের সেনারা যে যেখানে আছ কোমর বাঁধিয়া দলে দলে, নগরে নগরে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে পিকেটিং করিতে লাগিয়া যাও যাহাতে দেশের লোক আর সিগারেট না খায়।"

হায়, পোড়া কপাল! এই সব নীতির ফতোয়ার যদি মদ খাওয়া, তামাক খাওয়া, সিগারেট ফোঁকা জগতের কোনও লোক ছাড়িয়া দিত, তবে পাদ্রীরাই জগতে রাজত্ব করিত; এবং বহুকাল আগেই কল কারখানা সব বন্ধ হইয়া যাইত। **সিগারেট লোক খাবেই** এই বিরাট সত্যটীকে মানিয়া লইয়া দেশের ধনীদিগকে আমরা সংঘবদ্ধ হইয়া সিগারেটের কারখানা স্থাপন করতঃ বিদেশী কর্ত্তৃক এই শোষণ বন্ধ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছি। সিগারেট খাওয়া বন্ধ কর এ Scruon লোকে শুনিবে না। যাহারা খাইবার তাহারা খাইবেই।

এই সিগারেট খাইয়াই তোমার দেশের লোক—যাহাদিগকে তুমি দিনরাত গরীব, বুভুক্ষিত, অনশন এবং অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিতেছ, প্রতিবৎসর বহু কোটী টাকা উড়াইয়া দিতেছ। এই টাকা গুলির দ্বারা বিদেশী ধনীরাই আরও অর্থশালী, সম্পদশালী এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, আর তোমরা দিন দিন আরও গরীব, কাঙ্গাল, শক্তিহীন এবং ভুখা হইয়া মরিতেছ। আমরা বলি তোমরাই সংঘবদ্ধ হইয়া সিগার, সিগারেট ইত্যাদি তৈরী করতঃ তোমাদের এই নেশাখোর ভাইদের কাছে বিক্রয়ের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে তোমাদের পকেটেও যেমন অর্থ আসিবে তেমনি তোমাদের স্থাপিত কারখানা সমূহে কাজ করিয়া কত হাজার হাজার নিরন্ন বেকার ভাইয়ের অন্নের সংস্থান হইবে।

আমাদের বুলি এই। পাদ্রীর বুলি নয়, সংস্কারকের বুলি নয়, দেশোদ্ধারী নেতা উপনেতার বুলি নয়। সোজা, সরল ব্যবসায়ীর কথা। চোখের উপর দেখিতেছি এক সিগারেট বেচিয়া লাখ, দশ লাখ নহে একেবারে কয়েক কোটী টাকা পর দেশীর পকেটে যাইতেছে, আর আমরা

ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছি এবং তাহাদেরই নির্ম্মিত সিগারেটের আগুনে মুখ পোড়াইয়া কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ায় নিজেদের মুখে মসীলেপন করিতেছি এবং দেশটাকেও দুঃখের কালোমেঘে ছাইয়া ফেলিতেছি। কত টাকায় এক কোটী টাকা হয় সে কথাটা ভাবিয়া দেখার তোমাদের অবসর আছে কি ?

তোরা না সব সবুজ!—তোরা না সব কাঁচা!—নজরুল না তোদের বলে থাকেন কালবৈশাখীর ঝড়,—রক্ত মেঘের উল্কাপিণ্ড, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাস ?—কই তোদের সে ঝোড়ো হাওয়া,কই তোদের সে উল্কার গতি ?—কেবল 'নারী নৃত্য' আর পুচ্ছ তুলে নাচ ? ধিক্! ধিক্! হাজার বছরের আলস্যের inertia ঝেড়ে ফেলে একবার স্বামীজীর অভয় বাণী সম্বল করে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে পড়্। বাংলার ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দরদী বাঙ্গালীর কাছে এই সব statistics নিয়ে যা—যেয়ে বল্ যে এখনও সময় আছে—; এখনও ঘরের পুঁজি পাতি বের করে, মূলধন একত্র করে, সংঘবদ্ধ হ'য়ে বাংলার অভাব, বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব বাঙ্গালীরাই তা পূরণ কোরবে। এরজন্যে চাই বাঙ্গালী বাঙ্গালীর মধ্যে অফুরন্ত প্রেম, অপরিসীম দরদ। কে কোথায় দরদী আছ, কে বাংলাদেশ—এই সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা সোনার বাংলা দেশ—এবং বাঙ্গালী জাতির জন্য নিভৃতে নীরবে রোদন করিতেছে, তোমরা আজ সব একত্র হও, সংঘবদ্ধ হও। বাঁচিবার জন্য, পরিবার পরিজনের মুখে এক মুঠা ক্ষুধার অন্ন তুলিয়া দিবার জন্য তোমরা একবার হুঙ্কার করিয়া ওঠ, বল,—

"উঠবো মোরা।
উঠবো মোরা।
বিধির আদেশবাণী"।

সিগারেটের তামাক প্রস্তুত জন্য গত ১৯২৫-২৬ সালে আমেরিকার এক ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশ হইতেই **দুই কোটী তের লক্ষ টাকার তামাক** ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। চেষ্টা করিলে ভারতের বহুস্থানে এই তামাকের আবাদ করা যায়। চাই কেবল ধনী, জমিদার ও কর্ম্মীদের সংঘবদ্ধ সমবায়। দেশের সবুজ ও তরুণের দল। তামাক বাবদ এই দুই কোটি তের লক্ষ টাকার শোষণ বন্ধ কর।
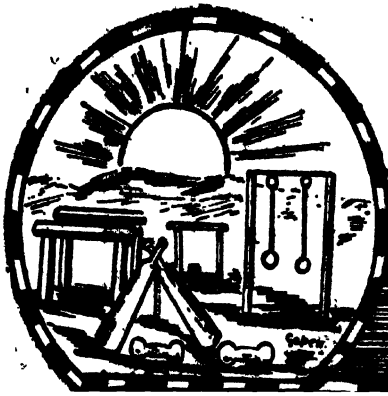
বর্ত্তমান অস্ত্র বিদ্যার অলৌকিক ঘটনা

লর্ড—লিষ্টারের—(Lord Lister) নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান অস্ত্র চিকিৎসাবিদ্যায় যা কিছু উন্নতি হয়েছে—সব তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। লর্ড—লিষ্টার জন্মাবার পূর্ব্বে সার্জ্জারী বা অস্ত্রবিদ্যার তেমন কিছুই উন্নতি হয়নি। তখন কেবলমাত্র ঘা, ফোড়া অস্ত্র করা, দেহের কোন অংশ হাত বা পা কাটিয়া দেওয়া, ইহাই ছিল অস্ত্রবিদ্যার চরম। তখন অস্ত্র করার দরুণ যদি কোন জ্বালা যন্ত্রণা হইত তা হইলে তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা বা কোন কৌশলে নূতন উপায়ে অস্ত্র করার বিদ্যা কিছুই ছিল না। অস্ত্রবিদ্যার এইরূপ দুর্দ্দিনে লিষ্টার দৈহিক ও মানসিক সব বলে বলীয়ান হইয়া দেখা দিলেন এবং বিজ্ঞানের আলোতে সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় এক নবযুগ আনয়ন করিলেন। তিনি যে আশ্চর্য্যকর তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন তাহাতে মানবের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইয়া—অশেষ কল্যাণ সাধিত হইল।

লিষ্টার যখন অস্ত্র চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন তখন প্রথম প্রথম কেহই দেহের অভ্যন্তরে তাঁহার দ্বারা অস্ত্র করাইতে সাহসী হইল না। যদি বা কেহ অশেষ যন্ত্রণায় বাধ্য হইয়া তাঁহার নিকট অস্ত্র করাইতে যাইত তাহা হইলে সে মরিয়া হইয়াই এ কার্য্যে অগ্রসর হইত। মোট কথা প্রথমে তাঁহাকে কেহই বিশ্বাস করে নাই। বাস্তবিকই সে সময়ে দেহের মধ্যে ফোড়া হইলে বা অন্য কিছু অস্ত্র করিতে—কোন অস্ত্রচিকিৎসকই সাহসী হইতেন না, যদিবা কখন এইরূপ অস্ত্র করিতে হইত তাহা হইলে রোগীর প্রাণের মায়া একরূপ ত্যাগ করিয়াই এ কার্য্যে হাত দিতে হইত।

যাহা হউক অস্ত্রবিদ্যার কিছুকাল নিযুক্ত থাকার পর লর্ড লিষ্টার অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন এবং তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন যে এখন তিনি দেহের যে কোন স্থানে অক্লেশে ও অতি সত্বর অস্ত্র করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু এসকল নাকরিয়াও তিনি যদি "কি প্রকারে রক্ত ও ঘা ফোড়া দূষিত হয়" কেবলমাত্র এই একটী বিষয়ে গবেষণা করিয়া ইহার ফলাফল নির্ণয় করিতেন তাহা হইলেই তাঁহার নাম একজন মানব হিতৈষীরূপে সকলের হৃদয়ে যুগ যুগ ধরিয়া—অঙ্কিত হইয়া থাকিত। তিনি ছাত্রজীবনেই স্থির বুঝিয়াছিলেন যে অস্ত্রবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে—মানবের—দৈহিক যন্ত্রণা লাঘব করা এবং লক্ষ্য রাখা যেন অস্ত্র করার ফলে লোক অধিক সংখ্যক মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। পরবর্ত্তী কালে এই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়া তিনি প্রকৃত পক্ষেই একজন অভিজ্ঞ কৃতবিদ্য অস্ত্রচিকিৎসক হইয়াছিলেন।

রক্ত কি প্রকারে দূষিত হয় তাহার মূল তত্ত্বই তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব—আবিষ্কারের ফলে মনে হয় আর দশ বিশ বৎসরের মধ্যে অস্ত্রবিদ্যা ক্ষেত্রে এরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে যে এখন যে সকল ঘটনাকে আমরা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করি তখন তাহা পুরাতন বলিয়া মনে হইবে। রক্ত কি করিয়া দূষিত হয় এবং তাহা নিবারণের উপায় কি এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়ার ফলে যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ বিষয়ে উন্নতি এত দ্রুত সম্পন্ন হইয়াছে যে বর্ত্তমানে ভাল ভাল বৃদ্ধ অভিজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসকগণ পূর্ব্ব অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া পূর্ব্বকার অবস্থা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠেন। তখন এ তত্ত্ব না জানার দরুণ হাঁসপাতালে রোগের বীজাণু খুব ভয়াবহ ভাবে ছড়াইয়া পড়িত এবং অনেক লোক মারা পড়িত।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে রক্ত কি প্রকারে দূষিত হয় তাহা জানার দরুণ কার্য্য খুব সহজ হইয়া আসিয়াছে। এখন সকলেই জানে কেমন করিয়া ক্ষত স্থান চিকিৎসা করিতে হয় ও কেমন করিয়া ড্রেস করিতে হয়। এখন কোন্ ক্ষতস্থান দূষিত হইবে এবং কোন্ স্থান পচিয়া যাইবে তাহা চিকিৎসকগণ খুব জোর করিয়াই বলিয়া দিতে পারেন। এখন ঘা, ফোড়া সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান তাঁহাদের নখ দর্পণে।

এখন এ বিষয়ে কার্য্যও খুব সহজ হইয়া আসিয়াছে। একটু জ্ঞান থাকিলেই এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা যায়। ব্যাপারটী এই যে ময়লা এবং অপরিষ্কার স্থানে নানারূপ রোগের বীজাণু জন্মে এবং দ্রুত বাড়িয়া ওঠে; এই বীজাণুই শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে; সুতরাং রক্ত যাহাতে দূষিত না হয় সেজন্য ময়লা ও বীজাণুকে দূরে রাখিবে অর্থাৎ সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ঘা ফোড়ার উপর ময়লা না জমে। এইটুকু ব্যাপার না জানার দরুণ পূর্ব্বে লোকে ঘা বা ফোড়া অস্ত্র করাইলে মৃত্যু অবধারিত জানিয়া রাখিত; কিন্তু লর্ড লিষ্টারের আবিষ্কারের ফলে বর্ত্তমানে লোকে ঘা ফোড়া যতই কঠিন হউক না কেন, তাহা অস্ত্র করাইয়া মনে প্রায় ষোল আনা বিশ্বাস করে যে, সে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে।

বাস্তবিক বর্ত্তমান কালে অস্ত্র বিদ্যায় যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সকলেই এ বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞাত আছেন।

বর্ত্তমানে দেহের অভ্যন্তরে কি কঠিন কঠিন স্থানে যে অস্ত্র করা হয় এবং তাহাতে সুন্দর ফল পাওয়া যায় তাহা ভাবিলেও হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে। পূর্ব্বের ন্যায় এখন মরিয়া যাইবার আশঙ্কা খুব কম লোকের মনেই উদিত হয়। অক্লেশে ও অতি সহজে অস্ত্র করিবার বর্ত্তমানে যে কত রকমেরই যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হইতেছে এবং লোকের যন্ত্রণা লাঘব করিবার যে কত দিক দিয়া চেষ্টা চলিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু এ সকলেরই মূল সেই স্বনাম ধন্য পুরুষ লর্ড লিষ্টার!

লর্ড লিষ্টার কোয়েকার (Quaker) পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিবারের সকলেই নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন, এবং এ বিষয়ে সকলেই যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মদের ব্যবসা করিতেন। এই ব্যবসায়ে তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতার হাতে যথেষ্ট অর্থ থাকায় লর্ড লিষ্টার বাল্যকালেই আপটন হাউস্ (Upton House) বাড়ী খানী ক্রয় করিয়াছিলেন। এই বাড়ী খানি অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত ছিল। এখানে তিনি দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই বাড়ীতেই তিনি ৫ই এপ্রিল ১৮২৭ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এইখানে তিনি পিতামাতা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

তিনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পিতা, মাতা বা অন্ত কেহই জানিতে পারেন নাই বা কল্পনা করেন নাই যে এই ছেলেই একদিন অস্ত্র বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। যাহাহউক ঐ বাড়ীতেই তিনি বাল্যকাল হইতেই নানাবিধ বিজ্ঞানের মূল সূত্র জানিবার, লক্ষ্য করিবার ও তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা যোসেফ জ্যাক্‌সন্ লিস্‌টার (Joseph Jackson Lister) অবসর কালে চক্ষু বিষয়ে গবেষণা করিতেন; তিনি এ বিষয়ে শীঘ্রই খুব খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং রয়েল সোসাইটীর ফেলো নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ পিতার সংসর্গ ও মনোরম প্রকৃতির আবহাওয়ায় থাকিয়া লর্ড লিষ্টারের মন অতি বাল্যকালেই বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়াছিল। বাল্যকালে তিনি বিজ্ঞানের বিষয় চর্চ্চা করিতে পাইতেন। যৌবনকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা এই মত সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ইউনিভারসিটি কলেজ হস্পিটালে ভর্ত্তী করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন তাঁহার অস্ত্রবিদ্যার যশঃ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তখন এই কলেজ তাঁহার নিকট হইতে কোন সাহায্য পায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে লণ্ডনকে খুব সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে কারণ এডিনবার্গ ও গ্লাসগোতেই তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও আশ্চর্য্যজনক—আবিষ্কারের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়। এইখানেই তিনি রিসার্চ্চ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং অস্ত্র চিকিৎসায় এরূপ আন্দোলন তুলিয়াছিলেন যে সমস্ত জগৎ আজ সেইজন্য উপকৃত হইতেছে এবং লর্ড লিষ্টারের নাম অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেছে।

তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এডিনবার্গ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাকে ঐ স্কুলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই স্কুলে তিনি আট বৎসর

কার্য্য করিয়াছিলেন। মধ্যে যদিও তিনি কিছুদিন গ্লাস্গো বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্য করিয়াছিলেন, তথাপি অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপ এইখানেই নিবদ্ধ ছিল এবং এই স্কুলেই কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই স্কুলে আটবৎসর কার্য্য করার পর তিনি লণ্ডনে কিংস্ কলেজ হস্পিটালে সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সেই সময়ে হাঁসপাতালের অবস্থা অতি জঘন্য ছিল। ঐ অবস্থার সহিত বর্ত্তমান কালের হাসপাতালের অবস্থা তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কারণ তখনকার দিনে অস্ত্রচিকিৎসার ধনী লোকদিগের জন্য একরূপ আইন ও গরীবদের অন্যরূপ আইন ছিল। তখন হাঁসপাতালে গরীবদের প্রতি কোনই যত্ন লওয়া হইত না।

সকলেই জানেন বর্ত্তমান কালে হাঁসপাতালে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রতি সমান যত্ন লওয়া ও লক্ষ্য রাখা হয়। বাড়ীতে কোন ঘা ফোড়া অস্ত্র করার অপেক্ষা হাঁসপাতালে যাওয়া এখন সকলেই অধিক নিরাপদ মনে করে; কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না, তখন হাঁসপাতাল অপেক্ষা বাড়ীতেই রোগীর ভাল চিকিৎসা হইত। হাঁসপাতালে যাইয়া কোন কিছু কঠিন ঘা বা ফোড়া অস্ত্র করাইতে তখন সকলেই ভয় পাইত। নালী ঘা বা রক্ত দুষ্টি জনিত কোন ক্ষতস্থান চিকিৎসা করাইতে হইলে রোগীরা কয়েকটী হাঁসপাতালে যাইতে এতই ভয় পাইত যে তথায় তাহারা জীবনের আশা একরূপ ত্যাগ করিয়াই যাইত। তখন হাঁসপাতাল হইতে কেহ রোগমুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলে সে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করিত। বাস্তবিক পক্ষে তখন হাঁসপাতালে খুব বেশীর ভাগ রোগীই মৃত্যু মুখে পতিত হইত।

ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অস্ত্রচিকিৎসক গণ বলেন যে তখন হাঁসপাতালে অতিরিক্ত রোগী গ্রহণ করা হইত। এক বিছানায় দুইজন করিয়া রোগী থাকিত। সুতরাং একরোগীর দেহ হইতে অন্য রোগীর দেহে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিবার খুবই সুবিধা পাইত। এইরূপে প্রায় সমস্ত কঠিন কঠিন রোগই সংক্রামক হইয়া পড়িত; এবং হাঁসপাতালে রোগ না সারিয়া ইহা রোগের—নিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে হাঁসপাতালে রোগীরা খুব ঠেসাঠেসি করিয়া অবস্থান করায় গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া উঠে এবং এই বাতাসে রোগের বীজাণু মিশিয়া যাওয়ায় ক্ষতস্থানের রক্ত দূষিত হইয়া উঠে। কিন্তু ঠিক কি প্রকারে রক্ত দূষিত হয় এবং রক্ত দূষিত হইলেই বা পরে কিরূপ ফল হয় তাহার মিমাংসা তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন নাই। ইহার গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে একমাত্র সক্ষম হইয়াছিলেন লর্ড লিষ্টার।

লিষ্টারের সময় প্যাষ্টর (Pasteur) মনুষ্য দেহে কেন উত্তেজনা হয় এ বিষয়ে বহুবিধ গবেষণা করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় ইহাতে বৈজ্ঞানিক জগতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে বাতাসে ধূলিকণা সংযোগ হওয়ায় কি প্রকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে লিষ্টার ঠিক্ করিলেন যে ক্ষতস্থান দূষিত হওয়ার কারণই হইতেছে ক্ষতস্থানে বাতাস লাগান অথবা ক্ষতস্থানে কোন ময়লা দ্রব্য সংযোগ করা। তিনি আরও ঠিক্ করিয়াছিলেন যে ক্ষতস্থানে যে কোন বাতাস লাগিলেই যে ক্ষতস্থান দূষিত হইবে তাহা

নহে, পরন্তু রোগের কীটাণুপূর্ণ বাতাস লাগিলেই ঘা বা ফোড়া দূষিত হইয়া যায়।

এই সময়ে কতকগুলি হাঁসপাতালে রোগীদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অস্ত্র চিকিৎসায় রোগীগুলা বেশীরভাগই বাঁচিতেছিল না। শেষে রোগীর মৃত্যুসংখ্যা এরূপ ভয়াবহ ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে অস্ত্রচিকিৎসকগণ কোন ক্রমেই এই ব্যাধীর হাত হইতে রোগীদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। শেষে নিরুপায় হইয়া তাঁহারা ঠিক করেন যে হাঁসপাতালের গৃহ, ঘর, দুয়ার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে নূতন কাট খড়ি দিয়া সম্পূর্ণ নূতন ধরণে হাঁসপাতাল তৈয়ারী করিতে হইবে, তাহা হইলে রোগের সমস্ত বীজাণু নষ্ট হইয়া যাইবে; এবং ঐ সমস্ত ব্যাধির হাত হইতে রোগীগণ নিস্তার পাইবে।

এই ব্যাপারটী শুনিতে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয় এবং অনেকে হয়ত এরূপ ঘটনা যে ঘটা সম্ভব তাহা বিশ্বাসই করিতে পারেন না। কিন্তু সত্য সত্যই দুই একটী হাঁসপাতালের সমুদয় গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং ইহা যে কিরূপ হাস্যকর ব্যাপার ও কি পরিমাণ আর্থিক অপব্যয়ের কার্য্য হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়, আর দৃষ্টান্ত এই ব্যাপক ভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলেই চক্ষুস্থির!

যাহা হউক লিষ্টার এই বিপদ হইতে সকলকে উদ্ধার করিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে বাতাস ও ধূলিকণার সহিত রোগের বীজাণু চালিত হয় এবং উত্তাপের দ্বারা অথবা বিশেষ বিশেষ ঔষধের দ্বারা এই বীজাণু গুলিকে নষ্ট করিতে পারা যায়। এই আবিষ্কারের পর রোগীদিগকে Septic পীড়ার হাত হইতে রক্ষা করা খুব সহজ হইয়া উঠিল। তখন সাধারণ দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দরকার থাকিলই না; বরং উপযুক্ত উপায়ে হাঁসপাতালের সমস্ত গৃহাদি পরিষ্কৃত রাখা সুরু হইল এবং সংক্রামক পীড়ার ভয় যাহাতে একেবারে চলিয়া যায় তাহারও এ উপায় নির্দ্ধারিত হইল।

লিষ্টার যখন মূল ব্যাপারটী ধরিয়া ফেলিলেন যে বাহির হইতেই রোগের বীজাণু আসে তখন তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে ঐ বীজাণুর গতিপথ রোধ করা যায়। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে তিনি এমন একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন, যাহাতে রোগের বীজাণু ক্ষতস্থানে প্রবেশ করিতে না পারে, আর যদিই বা প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা যায়। এই উপায় অবলম্বন করায় রোগের বীজাণু ধূলিকণা বা বাতাসের সহিত মিশিয়া আর ক্ষত স্থানে প্রবেশ করিতে পারিল না বটে কিন্তু অন্য উপায়ে বীজাণুগণ ক্ষতস্থানে লাগিয়া উহা দূষিত করিতে লাগিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া লিষ্টার দেখিলেন যে অস্ত্র করিবার জন্য যে ছুরি কাঁচি বা যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হয়, তাহার দ্বারাই বীজাণু ক্ষতস্থানে নীত হয়।

সুতরাং ইহার হাত হইতে কি উপায়ে রোগীকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও পরীক্ষা চলিতে লাগিল। প্রথমেই কারবলিক এসিড ব্যবহার করিয়া দেখা গেল যে, ইহাতে বেশ একটু ভাল ফল পাওয়া গেল; ইহার দ্বারা ক্ষত স্থানে সমস্ত রোগের বীজাণু মরিয়া যায় সত্য, কিন্তু—রোগীর সেই ক্ষত স্থানের চারিপার্শ্বে শিরা উপশিরাগুলি কারবলিক এসিডে বড়ই উত্তেজিত হইয়া আক্রান্ত হয় এবং তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। অতদিকে কারবলিক এসিড ব্যবহারে

অস্ত্রচিকিৎসকের হাতের আঙ্গুলে অত্যন্ত যন্ত্রণা উৎপাদন করে।

এইরূপে কারবলিক এসিড্ ব্যবহার করিয়াও ঠিক্ মনোমত ফল পাওয়া গেল না। লর্ড লিষ্টারও কিন্তু হাল্ ছাড়িলেন না। কারবলিক এসিডের পরিবর্ত্তে আর কোন উন্নতপ্রণালীতে কার্য্য করা চলে কিনা সে জন্য তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে অনেক বিপদ আপদের মধ্য দিয়া চলিয়া শেষে কারবলিক স্প্রে (Carbolic Spray) এই কার্য্যের জন্য গ্রহণ করিলেন এবং ইহা ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ উপকার পাইলেন।

কারবলিক্ স্প্রে ব্যবহারে ক্ষতস্থানের রক্ত আর দূষিত হইতে পারিল না এবং অস্ত্রচিকিৎসকগণও নিঃসন্দেহে ইহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই কারবলিক স্প্রে—ব্যবহারে ক্ষতস্থানে আর কোন দুষ্ট কীটাণু প্রবেশ করিতে পারিল না এবং লর্ড লিষ্টারও ইহা ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু ইহার আবিষ্কারের কিছুদিন পরে পুনরায় আরও উন্নত নূতন প্রণালীতে কার্য্য করিবার জন্য তিনি মনস্থ করিলেন। কারবলিক স্প্রের—ব্যবহার ছাড়িয়া দিতে তিনি একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু লর্ড লিষ্টারের স্বভাবই এই ছিল যে, তিনি কোন একটা কিছু আবিষ্কার করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা ও চেষ্টা করিতেন যে সেই আবিষ্কৃত দ্রব্যটীর উপর আরও কোন উন্নতি করা যায় কিনা।

এইখানে একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। ঘটনাটী হয়ত অনেকেই জানেন না। বিষয়টী এই যে একবার রাণীভিক্টোরীয়ার দেহে একটী ফোড়া হইয়াছিল। ইহার জন্য তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। তখনকার বিখ্যাত ডাক্তার—সার—উইলিয়ম্ জেনার (Sir William Jenner) এই ফোড়া অস্ত্র করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে রাণীকে একেবারে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই। শেষে লর্ড লিষ্টার কারবলিক স্প্রের সাহায্যে রাণীকে সম্পূর্ণরূপে সারাইয়া দিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য রাণী ভিক্টোরিয়া লর্ড লিষ্টারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া কারবলিক স্প্রের ব্যবহার সমর্থন করিয়াছিলেন।

এইরূপে লিষ্টার অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কঠিন কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য তাঁহাকে প্রভূত ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাহার সমস্ত কার্য্যাবলীতে—বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কত বড় একজন চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ্যান্‌টিসেপ্‌টিক্ সার্জ্জারীর ভিত্তি (Antiseptic surgery) সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; সমস্ত বিষয়ে কল্পনা ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল এবং জীবনে বহুবিধ কঠিন কঠিন ঘা ও ফোড়া অস্ত্র করিয়া অস্ত্রচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন।

১৯২৯ ১৯৩০ সালে বসন্তের আক্রমণ

আগামী ১৯২৯ হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত সারা বাংলায় বসন্ত ভীষণভাবে ব্যাপ্ত হইবে। অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ ও পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেণ্ট বলেন যে, প্রতি ৬০বৎসর অন্তর এইরূপ মহামারী হইয়া থাকে। ১৯৩০ সাল সেই মহামারীর বৎসর। তাই পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতিরোধের আয়োজন হইতেছে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেক লোকেরই এবার টীকা লওয়া উচিৎ। একেত দেশ ম্যালেরিয়া ও কলেরায় জরাজীর্ণ, তাহার উপর যদি বসন্তের ঝটিকা বহিতে থাকে তবে দেশ একপ্রকার জনশূন্য হইবে।

বসন্তের প্রতিষেধক রূপে আমরা নিম্নে কয়েকটী মুষ্টিযোগের উল্লেখ করিতেছি।

পলতা, নিমপাতা, ব্রাহ্মী, হেলেঞ্চা, পটোল, বেত্তাগ্র; উচ্ছে, সজিনার ফুল ও ডাঁটা বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। বাসি বা পচা মৎস্য মাংস যেন কেহ ব্যবহার না করেন। বসন্তের টীকা লইবার সুযোগ থাকিলে অবিলম্বে টীকা লইবেন।

(১) রুদ্রাক্ষ চূর্ণ ৵০ আনা ও গোলমরিচ চূর্ণ ৵০ আনা সমভাগে বাসি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিনে ৩ বার পান করিলে বসন্ত রোগ উপশমিত হয়।

(২) শ্বেত কণ্টিকারীর কাঁচামূল অর্দ্ধতোলা ৩টা গোলমরিচ সহ ভাল করিয়া বাটিয়া দিনে দুইবার সেব্য।

(৩) হরিদ্রা চূর্ণ ৵০ আনা, উচ্ছে পাতার রস ২ তোলা সহ পান করিলে হাম ও বসন্ত রোগের উপদ্রব হ্রাস হইবে।

(৪) হরিতকী বীজের শাঁসচূর্ণ ৵০ আনা জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে বসন্ত আরোগ্য হয়।

(৫) যাঁহারা ৩ বৎসর পূর্ব্বে টীকা গ্রহণ করিয়াছেন, হাম ও বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় তাঁহারা পুনরায় টীকা লইবেন।

(৬) প্রত্যহ খাঁটী সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন।

(৭) সর্ব্বদা শুচিভাবে থাকিবেন। বাড়ীর সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ঘরে ধূপ-ধূনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনও ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবেন না।

(৮) প্রত্যহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত নিমপাতা ভাজা অথবা পলতা ও বেগুনভাজা এবং দুই একটি উচ্ছে ও উহার বীচি খাইবেন। উচ্ছের মধ্যে কয়লা-উচ্ছে হইলেই ভাল হয়। এইগুলি হাম ও বসন্তরোগের বিশেষ প্রতিষেধক।

(৯) মাছ; মাংস ও ডিম এই সময় একেবারে

না খাওয়াই ভাল। কই, শিঙ্গি, মাগুর ও জেয়োল মাছ একেবারেই এই সময় খাইবেন না।

(১০) পোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক দ্রব্য এই সময় খাওয়া মোটেই উচিত নহে।

(১১) বাজারের দুগ্ধ, দোকানের চা পান এবং বাজারের খাবার এই সময় না খাইলে ভাল হয়।

(১২) শুষ্ক হরীতকীর আঁটি ফুটা করিয়া সুতা দিয়া পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে ও মহিলারা বাম হস্তে ধারণ করিবেন।

(১৩) কাঁচা কণ্টিকারীর মূল চারি আনা ও গোলমরিচ পাঁচটা একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া সপ্তাহে দুইবার করিয়া সকালে সেবন করিবেন। এই মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা—বয়স অনুসারে অর্দ্ধ বা এক চতুর্থাংশ বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে।

(১৪) কিম্বা, তেলাকুচা, মাধবী লতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস—ইহাদের প্রত্যেকটি দ্রব্যের পাতা।৵০ আনা মাত্রায় লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই ক্বাথ সপ্তাহে এক দিন করিয়া পান করা হিতকর

(১৫) কিম্বা নিম্ব, বহেড়ার বীজ ও হরিদ্রা প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা মাত্রায় লইয়া শীতল জলে পেষণ করিয়া সপ্তাহে একদিন অন্তর পান করিলে হাম ও বসন্ত রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা—ঐ অনুসারে লইতে হইবে।

বাজারে প্রচলিত বসন্ত রোগের প্রতিষেধক যে সকল ঔষধ আছে, ঐ সকল প্রতিষেধক ঔষধের মধ্যে দুই একটী ঔষধ উপরিলিখিত যোগটির উপাদান সমূহে প্রস্তুত হইয়া থাকে; এবং তাহা বিশেষ কার্য্যকরী।

(১৬) কিংবা মোচার রস দ্বারা শ্বেত চন্দন ঘষিয়া বৈকালে সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মাত্রা—দুই আনা শ্বেতচন্দন ও চারি আনা মোচার রস।

(১৭) কিংবা, হিঞ্চে শাকের রস মধ্যে মধ্যে পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হিঞ্চে শাক ইহার একটি সুন্দর প্রতিষেধক ঔষধ।

(১৮) কিংবা, প্রত্যহ সকালে দুই আনা মাত্রায় উচ্ছে পাতার রস খাইলে বসন্ত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(সংগ্রহ)

বঙ্গদেশে যক্ষ্মারোগের পরিমাণ

বঙ্গদেশে মোট লোক সংখ্যা ... ৪৬,৫০০,০০০

যক্ষ্মারোগগ্রস্থ লোকের সংখ্যা, মোট ৮০০,০০০

শ্বাসযন্ত্রে যক্ষ্মাগ্রস্থ ... ৫৫০,০০০

অন্য প্রকারের যক্ষ্মাগ্রস্থ লোকের সংখ্যা ২৫০,০০০

বহু লোক কাশের সহিত যক্ষ্মার বীজাণু ছড়ায় তাহার সংখ্যা ... ৫৫০,০০০

যক্ষ্মারোগে মোট মৃত্যুর পরিমাণ (বাৎসরিক) ... ১০০,০০০

প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগে মারা যায় ১,০০০,০০০ জন।

রেডিও ব্রডকাষ্টিং

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্য নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়া মানবের সুখ সমৃদ্ধির সহায়তায় নিযুক্ত হইতেছে। পুরাতনের মোহ যাঁহারা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদের মুখে অবশ্য এখনও এই যান্ত্রিক সভ্যতার নিন্দাই শুনিতে পাওয়া যায়। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মোটর লরী ছাড়িয়া গরুর গাড়ীর যুগে ফিরিয়া যাওয়ার সময় আর নাই। কাজেই দুনিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে; অন্যথা জাতি হিসাবে চিরকাল আমরা সকলের পশ্চাতেই পড়িয়া থাকিব।

স্বভাবতঃ রক্ষণশীল ভারতবাসী আমরা—নূতন কিছু দেখিলেই তাহা সাদরে গ্রহণ করি না; বরং তাহার ছিদ্রান্বেষণে রত হইয়া থাকি। আধুনিক সভ্য জগতে কিন্তু তাহার ঠিক বিপরীত নীতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিত্য নূতনের সন্ধান পাইবার কৌতূহল তাহাদের এত বেশী যে, কোনও আবিষ্কারের সংবাদ পাইবা মাত্র পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা তাহার পরিপুষ্টি সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। জীবন যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে এই দারুণ বেকার সমস্যার দিনে, এরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আমাদের পক্ষেও একান্ত প্রয়োজন।

এ যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গুলির মধ্যে "রেডিও ব্রডকাষ্টিং" অন্যতম। ইহাকে বাঙ্গলা ভাষায় কেহ কেহ "বেতার বার্ত্তা" আখ্যা দিয়াছেন। ইতি মধ্যেই এই "রেডিও ব্রডকাষ্টিং" পাশ্চাত্য দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে কাজে লাগাইয়া তথাকার অধিবাসীরা নানাদিক দিয়াই লাভবান হইতেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাক। এই সেদিন মাত্র বৃটিশ পার্লামেন্টের সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে "রেডিও ব্রডকাষ্টিং" অনেক সাহায্য করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মোটের উপর এবারকার নির্ব্বাচন অনেকটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এবং খরচও অন্যান্য নির্ব্বাচন অপেক্ষা কম পড়িয়াছে।

বিলাতের নির্ব্বাচন নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তথায় সভা সমিতি করিয়া ভোটারদিগের নিকট নির্ব্বাচন প্রার্থীদের বক্তব্য প্রচার করিতে হয়। যতজন নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন প্রত্যেকের কথা শুনিয়া তবে ভোটদাতাগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করেন। এরূপ নির্ব্বাচন সভায় প্রায়ই মারামারি, দাঙ্গা হাঙ্গামা, ইট-পাটকেল বর্ষণ, এমন কি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইত। এবার "রেডিও ব্রডকাষ্টিং এর" সাহায্যে নির্ব্বাচন প্রার্থীদের বক্তব্য প্রচারিত হওয়ায় এ সমস্ত গোলযোগ একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। লণ্ডন নগরীতে গড়ে প্রায় দুইটী বাড়ীর মধ্যে একটী বাড়ীতে এই রেডিও সেট বসিয়াছে। যে স্থলে এই সেট বসান থাকে সেই স্থলে সমাবেত হইয়া বাড়ীর লোক এবং প্রতিবেশীবর্গ ১০ জন ২০ জন কিম্বা ২৫ জন অনায়াসেই এই বেতারবার্ত্তা শুনিতে পারে। বক্তৃতা

বেশ স্পষ্ট শোনা যায়, সভায় উপস্থিত হইয়াও এরূপ নির্ব্বিঘ্নে তাহা শোনা যায় না। বক্তারাও "রেডিও সেটের" সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে বেশ সাজাইয়া গোছাইয়া তাহার বক্তব্য বলিতে পারেন—বাহিরের গোলযোগ আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কিম্বা বিরুদ্ধবাদীর ব্যঙ্গ কৌতুক তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তার পর অনেক বেশী শ্রোতাও একসঙ্গে এই বক্তৃতা শুনিতে পারে। এক সভায় বড় জোর পাঁচ হইতে দশ হাজার লোক সমবেত হয়; কিন্তু "রেডিও"র মারফতে অন্ততঃপক্ষে ৫০ হাজার লোকের নিকট বক্তব্য বিষয় পৌঁছাইয়া দেওয়া চলে।

এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়,—আধুনিক সভ্যতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তির যুগে "রেডিও ব্রডকাষ্টিং"এর কার্য্যকারিতা কত বেশী।

বিলাতের General Electionএ Broad castingএর যে সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল এদেশের কাউন্সিল ও করপোরেশন ইলেকশনেও যে অচিরে সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কারণ এদেশের নির্ব্বাচনেও যুক্তির পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আদর্শের জায়গায় স্ব স্ব দলের প্রাধান্যকীর্ত্তন, কবির লড়াই, হাতাহাতি, মারামারি এবং সভাভঙ্গ ইত্যাদি সব জিনিষই আমদানী হইয়াছে। এখন সুশৃঙ্খলার সহিত কোনও নির্ব্বাচন সভার অনুষ্ঠান করা দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতেছে এবং কালে হয়ত অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এরূপ অবস্থায় Broad castingএর সাহায্যে প্রত্যেক নির্ব্বাচন প্রার্থী দেশের লোককে তাঁহার নিজের বক্তব্য অনায়াসে এবং অনেক অল্প ব্যয়ে জানাইতে পারিবেন, এবং তাঁহার বক্তব্য যে বাড়ীতেই Receiving set আছে সে বাড়ীর সকলেই নির্ব্বিবাদে শুনিতে পারিবেন। কলিকাতা সহরের বাড়ীগুলিতে এখনই যে পরিমাণ Radio set বসান হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয় প্রতি রাত্রে অন্যূন দশ হাজার লোক রেডিও প্রদত্ত গান, অভিনয় এবং বক্তৃতাদি শুনিয়া থাকে, এখনই Radio station হইতে মাঝে মাঝে অনেক বক্তার বক্তৃতা Broad cast করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগ এবং নানারূপ সমাজ সেবা-সঙ্ঘদিগের বক্তাগণ মাঝে মাঝে এই ষ্টেশন হইতে নানারূপ বক্তৃতা দিয়া থাকেন এবং প্রতি সন্ধ্যায় হাজার হাজার নরনারী এই সকল বক্তৃতা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন; ও তাহা দ্বারা স্বাস্থ্য, শিল্প এবং ঘরকন্নার অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে প্রোপাগণ্ডা করিবার জন্য রেডিও যে কালে কালে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে; এই "রেডিও ব্রড কাষ্টিং" আমাদের দেশে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু এখনও ইহার প্রচলন ব্যাপক ভাবে দেখা যায় না। ইহার মূলে রহিয়াছে ভারতবাসীর স্বভাব সিদ্ধ রক্ষণশীলতা। নূতন কে বরণ করিয়া লইবার যে আগ্রহ তাহা আমাদের মধ্যে নাই। তাই আমাদের দেশবাসী এখনও ইহার কার্য্যকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন না। গ্রামোফোন বা কলের গান যখন সর্ব্ব প্রথম এদেশে আমদানী হইয়াছিল তখনও এরূপ ঔদাসীন্য দেখা গিয়াছিল। কিন্তু আজ এই গ্রামোফোন একরূপ ঘরে ঘরে প্রচলিত হইয়াছে এবং এই গ্রামোফোনের ব্যবসা করিয়া মেসার্স এম, এল, সাহা, প্রভৃতি

কারবারী বর্গ লক্ষপতি হইয়াছেন। আজ বোধ হয় এই প্রয়োজনের কথা আর বিশেষ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। রেডিও ব্রডকাষ্টিং এর" অবস্থাও একদিন ঠিক এরূপ দাঁড়াইবে —তখন হয়তঃ অনেকে আক্ষেপ করিয়া বলিবেন —'তাই তো! কি সুযোগই হেলায় নষ্ট হইয়াছে।"

যাহারা বেকার বসিয়া আছেন তাহাদের সুবিধার জন্য আমরা এই "রেডিও ব্রডকাষ্টিং" এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এখন হইতে এই সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করিলে ভবিষ্যতে উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হইবে। অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন ধনী, কারবারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলের পক্ষেই "রেডিও সেট" অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। এখনই তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

কলিকাতায় "রেডিও ব্রডকাষ্টিং" আরম্ভ হইয়াছে। প্রধানতঃ সৌখীন বিত্তশালীর দলই ইহাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সকালে সন্ধ্যায় তাঁহারা রেডিও মারফতে বিশিষ্ট গায়ক গায়িকার সঙ্গীত এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীর আবৃত্তি আপনার ঘরে বসিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এরূপ আমোদ প্রমোদে অর্থ ব্যয় করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ ধারণা একান্ত অমূলক। কর্ম্ম বহুল জীবনের মধ্যে আমোদ প্রমোদেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

তার পর ব্যবসায়ীর পক্ষেও ইহার উপযোগীতা কম নহে। সম্প্রতি রাত্রি ৯ টার সময় কলিকাতার রেডিও ষ্টেশন হইতে বিভিন্ন ব্যবসায়ের সংবাদ প্রচার করার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে সোনার মার্কেট, পাটের বাজার, হোসিয়ান, এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির দৈনিক সংবাদ রাত্রি যোগেই জানিতে পারা যায়। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ প্রয়োজনীয় সংবাদের জন্য ব্যবসায়ী বর্গকে একমাত্র প্রাতঃকালীন সংবাদ পত্রের অপেক্ষায় থাকিতে হইত। ইহাতে ব্যবসায়ের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধা যে হইত তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা—ব্যবসায়ীর পক্ষে time is money—কয়েক ঘণ্টা আগে একটা সংবাদ পাইলেই সে হাজার হাজার টাকার কারবার করিয়া লাভবান হইতে পারে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অধুনা কলিকাতার মাঠে যে সমস্ত খেলা হয় তাহার সংবাদও এই "রেডিও ব্রডকাষ্টিং" এর মারফতে প্রচার করা হয়। যাঁহারা খেলার অনুরাগী তাঁহারা প্রাতঃকালীন সংবাদ পত্রের অপেক্ষায় না থাকিয়া এখন খেলা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই ফলাফল জানিয়া লইতে পারেন এবং উদ্বেগে আর তাঁহাদিগকে উদ্বেগে কাল কাটাইতে হয় না।

এ তো গেল আমাদের একান্ত ঘরের কথা। দুনিয়ার অপরাপর বৃহত্তর ক্ষেত্রেও এই "রেডিও ব্রডকাষ্টিং" বলিতে গেলে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। সমুদ্রযাত্রী জাহাজ ও বিমানপোতের মধ্যে "রেডিও সেট" রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে বিপদ আপদে সংবাদ আদান প্রদান করার সুযোগ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে সুদূর সমুদ্রগামী জাহাজে কিম্বা বিমানপোতে কোনও অজানা অচেনা মহলে গিয়া বিপন্ন হইলে তাহার উদ্ধারের কোনই উপায় থাকিত না—কেহই তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারিত না। রেডিও সে অসুবিধা দূর করিয়াছে। সংবাদপত্রের পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এই "রেডিও ব্রডকাষ্টিং" এর মারফতে সংবাদ পাইয়া বহু সংখ্যক বিপন্ন জাহাজ

ও বিমানপোতকে গভীর সমুদ্র কিম্বা ভীষণ মরুভূমির মধ্য হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে।

এইরূপে নানা দিক দিয়াই "রেডিও"কে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে; ফলে রেডিও বিশেষজ্ঞদের চাহিদাও বাড়িতেছে। এই সময়ে ব্রডকাষ্টিং ও তাহার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিলে ব্যবসা কিম্বা চাকুরী উভয় দিকেই সুবিধা হইতে পারে। "রেডিও সেটের" দামও অনেক কমিয়াছে। প্রতি সেট্ ২৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫।১৫০৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। ঘরে ঘরে গিয়া ইহার উপযোগীতার কথা বুঝাইয়া দিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা পর্য্যন্ত "রেডিও সেট্" ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইবেন। কারণ ঘরে একটী Radio set বসাইলে তাহার সাহায্যে বাড়ীর ছেলে মেয়েরা একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুইই পাইবে। অথচ একটী setএর দাম একটা হারমোনিয়াম বা গ্রামোফোনের দামের চেয়েও কম।

একটা কথা উঠিতে পারে এবং উঠিয়াছেও যে বায়স্কোপের ন্যায় রেডিওর দ্বারা অনেক মন্দ কথা এবং আদর্শও প্রচার হইতে পারে। বায়স্কোপে যেমন শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কত প্রয়োজনীয় বিষয় চলচ্চিত্রের সাহায্যে জনসমাজে প্রচারিত হইতেছে; তেমনি চুরী,ডাকাতী, দুর্নীতি এবং অশ্লীলতার নানারূপ নূতন নূতন ফন্দী জন সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে; এসবই নির্ভর করিতেছে বায়স্কোপে যেরূপ Film বা চিত্র দেখানো হয় তাহার উপর। তুমি যদি বাড়ীর ছেলে মেয়েদের অবশ্য চিত্র দেখাইতে নিয়া না যাও, তবে তাহারা রিপুউত্তেজক অবশ্য চলচ্চিত্র দেখিয়া অশ্লীল চিন্তার উত্তেজনায় অবসন্ন হইবার অবসর পায় না। তাহার পরিবর্ত্তে নানারূপ শিক্ষাপ্রদ চিত্র দেখাইলে ছেলেদের জ্ঞানও যেমন বাড়িয়া যায় চিত্তেরও তেমনি প্রসারতা হয়।

বেতার বার্ত্তাকেও প্রত্যেক গৃহস্থ এই ভাবে Control বা সংযত করিতে পারেন। বৈদ্যুতিক আলো অথবা পাখা চালাইবার সময় যেমন একটা সুইচ্ Switch টিপিলেই আলো জ্বলিয়া ওঠে আবার টিপিয়া তাহা মুহূর্ত্তে নিভাইয়া দেওয়া যায়, বেতার বার্ত্তাও ঠিক সেইরূপ ভাবে regulate করিতে বা চালাইতে পারা যায়। যদি পিতা মাতা বা অভিভাবক দেখেন বেতার যন্ত্র হইতে এমন কোনও গান বা অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে যাহা বয়স্ক ছেলে অথবা প্রাপ্তবয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে শোনা কল্যাণ কর নহে অমনি তিনি উহা switch off করিয়া দিতে পারেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই আলো-বন্ধ হবার ন্যায় গানও বন্ধ হইয়া যাইবে। আবার অনেক বাদে গানটা শেষ হইয়া গেলে পরবর্ত্তী প্রোগ্রাম শোনার জন্য switch on করিলেই তৎক্ষণাৎ আবার সব শোনা যাইবে। এই সকল ব্যবস্থা থাকায় দরুণ বেতার বার্ত্তার দ্বারা দুর্নীতি প্রচারের সহায়তা করিবার সম্ভাবনা থাকিলেও উহা control বা সংযত করার ব্যবস্থা প্রত্যেক গৃহস্থের নিজের হাতের মধ্যেই রহিয়াছে। সুতরাং Canvasserরা চেষ্টা করিলেই প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে একটী করিয়া রেডিও সেট্ যে বিক্রয় করিতে পারেন তাহাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই। ইহাতে কমিশন হিসাবে বেশ দু'পয়সা উপায় করা যাইতে পারে। তা' ছাড়া চাকুরীর সুবিধা তো আছেই!

অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলিবেন যে, রেডিও সম্পর্কে

শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা কোথায়? ইতিমধ্যেই তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। ৫২।১।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট "ইণ্ডিয়ান রেডিও রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট" নামক একটি শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অভিপয় বিশেষজ্ঞ তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। তথায় রেডিও সম্পর্কিত সকল বিষয় হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সমস্ত যুবক বর্ত্তমানে বেকার বসিয়া আছেন তাহাদের পক্ষে এইটি সুবর্ণ সুযোগ! তাহারা ইচ্ছা করিলে আমাদের নামোল্লেখ করতঃ উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে মুদ্রিত প্রস্পেক্টাস এবং বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

রেডিও set বিক্রয় করার জন্ত যে কয়েকটী দোকান কলিকাতায় খোলা হইয়াছে তন্মধ্যে ১১নং ডালহৌসী স্কোয়ারের Radio supply stores এবং ৫২।১।১ নং কলেজষ্ট্রীটের The Indian Radio Research Institute এর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে লিখিলেই মূল্য তালিকা এবং রেডিও যন্ত্র পরিচালনার শিক্ষা সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ জানিতে পারিবেন।

কলিকাতার বাজার দর

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল,ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে,তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের চলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটীর আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

পাটের বাজার দর।

কলিকাতা ২০শে জুলাই

হেসিয়ানমিলে পুনরায় ধর্ম্মঘট হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় এ বিভাগের দর স্থিরভাবেই ছিল। শীঘ্র শীঘ্র ডেলিভারী যে সকল মালের পাওয়া যাইবে তাহারই মাত্র দর তেজা হইয়াছিল; এবং লোকে বেশী দর দিয়া কিনিয়াছিল কিন্তু "ফরওয়ার্ডের" মাল ডেলিভারীর চুক্তিতে খুব কমই কাজ হইয়াছে।

গত কল্যকার সর্ব্বশেষ বাজার দর নিম্নে দেওয়া গেল।

	৪০ ইঃ ৮ আঃ	৪০ ইঃ ১০॥ আঃ
রেডি	১৪/০	১৮৷/০
জুলাই	১৪৷৶০	১৯/০
আগষ্ট সেপ্টেঃ	১৪৷/০	১৮৷৶০
অক্টো-ডিসেঃ	১৩৷৶০	১৭৮০
জানু-মার্চ্চ	১৩॥০	১৭॥০
এপ্রি-জুন	১৩,০	১৭০

রেডিগুলি এ বিভাগের মালগুলির দরের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, এক ভাবেই স্থির আছে। কয়েকটাকগুলি জুলাই সিপমেন্টের দর ৩৪৷০ এবং ২৷০ পাউণ্ড বি, টুইল (জুলাই) ৩৬৷০ নানাদরে বিক্রয় হইয়াছে।

নিম্নে দর দেওয়া গেল :—

	হেভিসি	বি, টুইল
রেডি	৫৬৲	৩৫৲
জুলাই	৩৬৷০	৩৫॥০
আগষ্ট-সেপ্টেঃ	৩৬॥০	৩৬॥০
অক্টো-ডিসেঃ	৩৬॥০	৩৬॥০
জানু-মার্চ্চ	৩৬॥০	৫৬।০

বস্তাবন্দী পাট (পাকাবেল) গতকল্য বিক্রেতাগণ মাল বেচিতে তত উৎসুক না থাকায় বাজার দর স্থিরভাবে ছিল। ক্রেতাগণ ও গুড ক্রপ কাটের জন্য ৬০৷০, লাইটনিং ৫৭৷০, এবং হার্ট জুলাই আগষ্ট সিপমেন্টের চুক্তিতে ৫২৲ দিতে রাজী ছিল না। নিউ ক্রপের উপরোক্ত তিন প্রকারের মালের জন্য যথাক্রমে ২৬৲, ৫৭৷০ এবং ৫২॥ আগষ্ট মাসে ডেলিভারী পাইলে ক্রেতাগণ দিতে চাহিয়াছে খোলাপাট (লুজ বেল)— এই বিভাগের কাজ মন্দা গিয়াছে। মিলগুলি বেশী প্যাক করা গুড ক্রপের বস্তা সুবিধা দরে পাইলে কিনিতে রাজী ছিল। ঐ বেশী প্যাক করা ডিষ্ট্রিক্ট জুটের জন্য ১১৲ ১০৲ এবং ৮৷০ দরে বিক্রেতাগণ চাহিয়াছিল বটে কিন্তু ঐ দরে কোন ক্রেতা মিলে নাই।

বেলারগণ কিন্তু উত্তম বাছাই নেটিভ "বাৎ" মার্ক, নিউ ক্রপে এবং "২' এস" এবং "৩ এস" জন্য ১১৮০ এবং ১০৮৷ আনা দরে পাইলে ক্রয় করিতে খুব প্রস্তুত আছে। ইউরোপিয়ান প্যাকিংএর মালের দর ১১৷০, ১০৷০এবং ৯৲ দর বিক্রেতাগণ দিয়াছিল বটে; কিন্তু মিলগুলি ঐদরে কিনিতে রাজী নাই।

হাটখোলার বাজার।

গত ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত হাটখোলায় আড়তে কত মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়া কি পরিমাণ পাঠ মজুদ ছিল নিম্নে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল :—

আমদানী	১৫,৫০০ মণ
রপ্তানী	১৫,৫০০ মণ
মজুদ	২,৯৬,৭৫০ মণ

বেলারগণ গুড ক্রপ প্রতিমণ ৯৲ হইতে ১০৸/০ আনা দরে ১০,৮০০ মণ এবং ডিষ্ট্রিক্ট

৯/৩ পাই হইতে ১১৯ পাই প্রতিমণদরে ৩৬৫০ মণ খরিদ করিয়াছে। এবং মিলগুলি ওল্ড ক্রপ ৭০০ মণ ৯৬০ আনা হইতে ১০।/০ আনা এবং ৩৫৫ মণ নিউক্রপ ১০৲ প্রতিমণ দরে খরিদ করিয়াছে। তুলনা গত বৎসরের ঠিক এই দিনের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে এবৎসর আমদানী রপ্তানি এবং মজুদে যথাক্রমে ২,৫০০ মণ, ২,৫০০ মণ এবং ১,৬৮,৭৪০ মণ বেশী হইয়াছে।

মূল্য—গত বৎসর ঠিক এই দিনে ওল্ড ক্রপের ৭॥ হইতে ১৩॥০ এবং নিউক্রপের ১১৮৶৩ পাই হইতে ১৩।৶৩ পাই দর ছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে জুলাই

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১৮/০
টাকশালে " "	২১।/০
বড়ালের " "	২১॥০
চিনাপাত "	২১॥০
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৫৬৸৶০
ঐ খুচরা	৫৭৶০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স
২৮ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ঘৃত

মটকী—	৭২৲
ভারতী—	৭১৲
খুরজা—	৭৪৲
শিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৬৩৲
লক্ষ্মী—	৬৭॥০
বাঘাসাগর—	৬৭৲

তৈল

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটি (রাধা কৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর		২৩।০
ঐ ১ মণের দর		২৩॥,
" ঐ খুচরা		২৬৲
" কানপুর		২৩॥০ ২৪৲
" ঘানির		২৭॥০ ২৮৲,
নারিকেলতৈল		২০॥০, ২০৲
রেড়ির তৈল		১৫॥০, ১৭৲,
মিশ্রিত সরিষার তৈল		১৯৲, ২২॥০

বিনোদমার্কা খাঁটি সরিষার তৈল

২০শে জুলাই

১০০ টীন বা ততোধিক প্রতিমণ	২৪॥০
১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টীনের কম	১৪॥
১১ টীন বা ততোধিক ১ গাড়ী কম	২৪॥/০
খুচরা	২৫৲
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	২॥৶০

আটা, ময়দা, সুজী

পেটেণ্ট ময়দার প্রতিমণ			৭॥০, ৭॥/০
নিমি	"		৭০, ৭।/০
গৃহস্থ	"		৭।৩ ৭/০
সুজী	"	"	৭॥০ ৭॥/০
আটা "বি"		"	৭।০ ৭।/০
আটা ২নং		"	৬৸৶, ৬৸৶০
আটা এস মার্কা		"	৬৸০ ৬৸/০
আটা ৩নং		"	৪।৶০ ৪॥০

উপরোক্ত মূল্য বস্তাসহ বুঝিতে হইবে

কেরোসিন তৈল

১। আমেরিকান তৈল :—

স্নোফ্লেক	৮৸৵	প্রতিকেস
চেষ্টর	৮৷৶০	"
বানর	৮/০	"
ঐ টিন	৪৷/০	"
বিলাতী	৬৷৶০	দুইটিন
হাতী গ্যালন	৫৶১০	

ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। বর্ম্মা তৈল :—

কমল	৮।/০	প্রতিকেস
গ্লোব লাইট	৮৸৵০	"
চইওসর	৮৷৴	"
চক্র	৬৷১০	দুইটিন
সূর্য্য	৬৷১৯	"
তারা	৬৸/১০	"
ভিক্টোরিয়া	৫৸১০	"
হাস	৫৸১০	"
ছাগল	৬৷১০	"
মুর্গী ও চাবি	৫৸৵১০	"

তামা-পিতল

২০শে জুলাই

	প্রতি হন্দর
ব্লক টীন, পিনাঙ	১৬৫৲ "
তামার ইন্‌গট, অব, টী,	৬১৷০ "
" " এন, ই, সি	৬০৷০ "
" " অষ্ট্রেলিয়ান	৬২৷০ "
" চাদর ৪+৪	৬৫৲ "
" ক্রাপ	৫৪৷০ "
পিতলের চাদর ৪+৪	৫৬৷০ "
" চাকি	৬১৲ "
" ক্রাপ	৩৩৲ "
" রড	৩৭৲ "
হাড পেলটার	১৫৲ "
সফট পেলটার, পি, এচ, ব্রাণ্ড	২১৲
ঐ লোভহাটী	২১৲
পিগলেড বি, এম, রিফাইণ্ড	১৭৲
ঐ বিলাতী	১৮৲
এন্টিমণি	৫০৲

মশলা

হলদী (মছলি পত্তন)	৯৷০, ১১৷০
ঐ (হিরোট)	১১৸০
ঐ (কড়পী)	১১৸০
সুপারী (মাঝারি)	১৮৲
ঐ বড়দানা (ঐ)	১৮৷০
ঐ গাজরী	১৮৸০ ১৯৲
ঐ (ছোট)	১৬৸ ১৭৷০
ঐ (জাহাজী)	১২৷০ ১৪৲
ঐ (দোকানী কাটা)	১৪৷০
ধনিয়া	৪৸০ ৫৷০
গোলমরিচ (কানানোরী)	৬৭৷০
ঐ (অলপী)	৬৬৲
লবঙ্গ	২৲ ২৶০ ২৷০
এলাচি (বড়)	২৬৲ ২৭৴ ২৮৲
ঐ ছোট	৪৷০ ৫৷০
সাগুদানা	৮৸৵০ ৯৷৵০
এরারুট	৭৷০ ৮৲
পিপুল বড়	৭৮৲ ৮৩৲
ধুনা জাহাজী	৬৲ ৭৲ ৮৲
ঐ রেঙ্গুনী	১৩৲ ১৪৲
বাদাম কাগজী	৩৭৲ ৪০৲

ঐ কাটিয়া	২৫৲
মনক্কা	১৬।০
কিসমিস	৩২৲
সোরা	১৬৲
রজন	১১৸৵০
সোহাগা (বিলাতী)	৯৲
আবীর (গুলাল)	৬৷০ ৭৲
হরিতাল	৪৮৲
জায়ফল (বড়)	১৷৵০
জায়ফল (ছিব্বাদার)	৩২৲ ৪০৲
নিশাদল	১৯৲
মুর্গা	১৭।০
জয়ত্রী	৫৲ ৫৷০
ভগগুল	১৬৲ ১৭৲
ছুঁতিয়া	১৮৸০
চন্দন (খাঁটি)	৭৭৲
মুসব্বর	২৮৲ ৩৬৲
মাজুফল	৬৩৲
ফিটকারী	৫৷০
পচাপাতা	২২৲
রাঙ	১২৪৲
সীসা	১১৷০
দারচিনি	৯৩।০
মুত্রাশথ	২৬৲
সিন্দুর (ভেলী)	১১৷০ ১৪৷০
ঐ (বকুসন)	২৭৲
বংশ লোচন	৮৲ ১১৲ ১২৷০
মহাভরী	১২।০
কর্পূর (ভেলা)	১৫০৲
শুঁঠ (দেশী)	২৪৲
তার্পিন	৭৲ ২৪৲
মিস্ত্রী (১—২নং)	৯৸০ ১০৷০

করগেট ও লোহা

২২ গেজ	করগেট	সিট দর	১২৷০	হন্দর
২৪ "	"	"	১২৲	
২৬ "	"	"	১৪৲	"
২৪ "	আর পি,	"	১২৸০	"
নয়েষ্ট	ভি (কড়ি)	"	৬।০	"
বরগা	(টী)	"	৮৷০	"
পাটী		"	৮৲	"
বল্টু		"	৮৲	"
কাঁটাতার		"	১১৸০	"
মটকা		"	৷৵০	পিস

মেটাল ও পেণ্ট

কলিকাতা, ২০শে জুলাই

ব্লক টীন পেনাক ছাপ	১৬১৷০	হন্দর
আর, টি তামার ইনগট	৬২।০	"
অষ্ট্রেলিয়ান ঐ	৫৯৲	"
পিগলেড, বি, এম, মার্কা	২০৵০	"
ঐ দেশী প্রস্তুত	১৯৲	"
এন্টিমানি, এ, এস, পি মার্কা	৭২৷০	"
ঐ অন্যান্য মার্কা	৪০৷০	"
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১২৬৸০	"
পিতলের চাদর ৪ × ৪	৬৮৸০	
পিতলের ছড়	৬৩৸০	
কপার সিট ৪ + ৪	৮৫৷০	
কপার রড	৮৭৷০	
সীসার সিট	২৫৷০	
(জিঙ্ক ইনগট বিলাতী)	২১৸০	
" " দেশে প্রস্তুত)	২০৸০	
হাববাক্স হোয়াইট		
জিঙ্ক পেণ্ট	৪০৷০	
হোয়াইট লেড পেণ্ট	৩৫৷০	

গ্রিন পেণ্ট	২০৷৷০
রেড অক্সাইড পেণ্ট	২৬৷০
হাবাকের তারপিন প্রতি গ্রাম	২৬৷০
রংয়ের তৈল পাকা	১৩৷০
ঐ কাঁচা	১৩৷৷০
সিমেণ্ট মাটি দেশী প্রতি টন	৫৩৷৷০
ঐ বিলাতী প্রতি ব্যারেল	১১৷৷০

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
মার্চ্চেণ্ট, ৮৬, এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ডাল যব ও গম

অড়হর (গোটা)	৪৷৵০ হইতে ৪৷৶
খেসারী (বড় দানা)	৪৶০ ৪৷০
মুশুরী (গোটা ঐ)	৬৵০ ৬৷০
যব (কেওরাবাদী)	৫৵০ ৫০
ঐ (কাণপুরী)	৫৶০ ৫৷০
ছোলা (মোটা) এলাহাবাদী	৫৶০
সরিষা	৯৷০, ৯৸০
ঐ (ছোট)	৮৷০ ৮৸০
রাই সরিষা (ছোটদানা)	৭৷০, ৭৸৵০
ঐ (বড়)	৮৷৷, ৮৸০
রেড়ী (ভেরেণ্ডা এলাহাবাদী)	৬৷৷৵০ ৬৸০
কাল মটর	৫৷০ ৫৷৵০
ঐ ছোট	৪৸০, ৪৸৵০
ঐ সাদা	৫৲ ৫৵০
তিল সাদা	৭৷০ ৮৲
মুগুরী থাড় ডাল	৯৷০, ৯৷০

স্বদেশী মিলের কাপড়

(খোলা মালের দর)

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল (শ্রীরামপুর)

১৩১১ নং ফিতা	৯ গজ	২৲
১১৭০ নং ”	৯৷ গজ	২৷৵০
২০১৫ নং চুল	১০ গজ	২৷৶১০
১১৫ নং সাড়ী	১০ গজ	২৸১০
২১৫ নং হাতীপাড়	১০ গজ	৩৶০

মোহিনী মিল (কুষ্টিয়া)

৭৫ নং চুল, ফিতা বা সাদা	১০ গজ	৩৶০
৭৬ নং ঐ	ঐ	৩৴০
২১০ নং চুল	১০ গজ	৩৷৵০
১২ নং হাতীপাড়	১০ গজ	৩৷০
৫০ নং ঐ	ঐ	৩৷৶০
২০৬০ নং চুলপাড়	১০ ও ১১ গজ	৩৲
১৯৬ নং চুলজরীপাড়	১০ গজ	৩৶০

জলপাই গুড়ীর চায়ের বাজার

১৫ই জুলাই

ডুয়ার্সের চা-এর প্রকৃতি ক্রমেই নিকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। ফলে দর সুবিধাজনক উঠিতেছে না। পাতা চা'এর চাহিদা বেশ আছে। ডাষ্ট এর দর ভাল, ৬ পাই বাড়িয়াছে। আসাম চা-এর বেশ চাহিদা আছে। এই তারিখের সেলের গড়ে দর ৷৶৯ পাই। গত বৎসর ছিল ৸১ পাই তৎপূর্ব্ব বৎসর ৸৶১০ পাই।

সেয়ার মার্কেট

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ

পাটের কলের সেয়ারের দর মন্দা

চা বাগানের সেয়ারের চাহিদা নাই

পাটের কলের সেয়ারের কাজ বেশী হয় নাই এবং দরও মন্দা রহিয়াছে। বড় সেয়ারের কাজ যাহা হইয়াছে তাহাও সকল লটের হইয়াছে। বাজারের ভাব মন্দাই রহিয়াছে।

কাপড় ও সূতার কলের সেয়ারের মধ্যে বাউড়িয়া ও ডানবারের বেশ চাহিদা ছিল।

কয়লার খনির সেয়ারের মধ্যে দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কাজও কম হইয়াছে।

চা বাগানের সেয়ারের চাহিদা নাই।

ম্যানেজিং কোম্পানির সেয়ারের মধ্যে খনিজ কোম্পানিগুলির বেশ টান ছিল। অন্যান্য সেয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই।

কোম্পানির কাগজের দর মন্দা।

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৹ সুদের কাগজ	৬৮৲
৪৲ সুদের কর্জ (১৯৬০—৭০)	৭৮৲

ডিবেঞ্চার

৫৷৹ সুদের (১৯১১ - ২১) কামার হাটী জুট মিল ডিবে—	১০১৲
৫৷৹ সুদের (১৯২৬—৪১) ইউনিয়ন জুট মিল ডিবেঃ	১০১৲, ১০১৷৹

রেলওয়ে কোম্পানী

বি, পি, রেল,	১৷৹
দার্জ্জিলিং হিমালয় রেল (প্রেফ)	৯০৲, ৯১৲,

কাপড় ও সূতার কল

বাউড়িয়া	৩৬২৲ ৩৬৪৲ ৩৬৮৲
ডানবার	২২৭৲, ২২৮৲

পাটের কল

এলায়েন্স	৫৫৫৲
এংলো ইণ্ডিয়া	৪৪৫৷৹, ৪৩৯৲, ৪৪২৷৹
অকল্যাণ্ড	৩০৫৷৹
বালী	৩০৮৲
বরানগর	২৮৩৷৹, ২৮৪৲, ২৮৫৲
বিরলা	১৫৸০, ১৬৲
বজবজ	৫৪২৲, ৫৪৫৲,
চিটাগড	৩১৩৲, ৩১২৲, ৩১২৷৹ ৩১৩৷৹
ক্লাইভ	৩৯৸০
ড্যালহাউসী	৫৪২৲
ডেল্টা	৫৫১৲, ৫৪৭৲
এম্পায়ার	৬৪৷৹, ৬৪৸০
ফোর্ট গ্লষ্টার	৮৬২৲
উইলিয়ম	৪১১৷৹
গৌরীপুর	৪৪০৲, ৪৪৮৷৹
হাওড়া	৫৭৷৶০
কাঁকনাড়া	৫৭৮৲, ৫৬৮৲
কেলভিন	৯৬৭৲
কিনিসন	১০২৭৲, ১০৩২৷৹, ১০৩৩৲
ল্যান্সডাউন	২৭৫৷৹, ২৭৭৲
লোথিয়ান	৫২৬৲
নৈহাটী	৫৯০৲
শ্যামনগর	২৮৸০, ২৯/, ২৯, ২৮৸৶১

প্রেসিডেন্সী	১০৮৷০,
রিলায়েন্স	৮১৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড (প্রেফ)	১০৭৲
ইউনিয়ন	৭০০৲

কয়লার খনি

এমালগেমাটেড্	১৬৷৶০, ১৩৷০
বরাকর	১৫৶০, ১৫৲ ঐ (প্রেফ ৯৯৲
পুরুলিয়া	৬৷০
ইকুইটেবেল	২৬৷০
ইকুইটেবেল	২৩৷০
কালা পাহাড়ী	১৮৷০
কাট্রাস বাড়িয়া	৬৪৲
নিউ তেতুড়িয়া	২৷৶০, ২.০
রাণীগঞ্জ	৪১৷০, ৪০৸৶০
সিয়ারশ "এ"	১৷০
সাউথ করণপুরী	৬৷০, ৬৷০

চা বাগান

মহিমা	১৫৷০
টাকভার	৩৬৷০, ২৬৷০

নানাবিধ কোম্পানী

বেঙ্গল টেলিফোন্ (অডি)	১২৮০
" আয়রণ	১১৮০
বর্দ্ধা কর্পো	১৩৷০, ১৫৷০
কলিকাতা ট্রাম্	১২৷০
জব্বলপুর ইলেট্রিক	১২৷০
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ (অডি)	৩৫৷০
" আয়রণ ও ষ্টীল	১৬৮০, ১৭৷০
" কপার কর্পো	২ শিঃ ৯৷০ পেঃ
মদন থিয়েটার	৪৶০, ৪৷০
মর্শাল	২৷৶০, ২৷/০
পুরা টিন	২৯ শিঃ ৮ পেঃ
পুচক টিন	২৭ শিঃ ৫ পেঃ
মেদিনীপুর জমিদারী	১২৬৲, ১২৭৲
রসা ইঞ্জিনিয়ারিং	৯৲
ষ্টুয়ার্ট এণ্ড কোং	২/০, ২৶০
সাজাহান পু ইলেকট্রিক	১৲ (প্রিফি)

রবার কোম্পানী

এলেন বি	২ ডঃ ৪৫ সেণ্ট
জমা	১ ডঃ ৯৭৷ সেণ্ট
হাজাম	২ ডঃ ৫৫ সেণ্ট
জজেই টুকাঙ্গ	১ ডঃ ৪৫ সেণ্ট

নূতন লিমিটেড কোম্পানী

একমাসে ১৯টি গঠিত

গত জুন মাসে বাঙ্গলাদেশে মোট ১৯টি নূতন লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইয়াছে; তাহাদের মোট মূলধন ২২লক্ষ ৯০হাজার শত টাকা। তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

৪টি ব্যাঙ্ক—মোট মূলধন ২৭০০০ টাকা

৬টি ঋণদান সমিতি—৩৪০০০০ টাকা।

১টি ইনভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট—১০০০ টাকা

১টি প্রিন্টিং পাবলিশিং ও ষ্টেশনারী ২০০০০ টাকা।

১টি কেমিকেল ও অন্যান্য ব্যবসা—৫০০০০টাকা

১টি এঞ্জিনিয়ারিং— ২লক্ষ টাকা।

৫টি ব্যবসা ও প্রস্তুতের কোম্পানী—১২১২৫০০টাকা।

২টি মিল ও প্রেস—২০০০০০ টাকা।

রকফেলারট্রাষ্টের দান

ধনকুবের রকফেলারের ট্রাষ্টিগণের নিকট হইতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ৭ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১ কোটী টাকা দান স্বরূপ পাইয়াছেন। ইহার মধ্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন লাইব্রেরীটির জন্য আড়াই লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর পরিকল্পনা করিয়াছেন স্যার গিলবার্ট স্কট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় এই দানের ব্যাপারকে বিস্ময়কর দান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে দান করিয়া যাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য স্যার তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষ। উভয়েই আইন ব্যবসায়ে আপন আপন প্রতিভা বলে আশাতীত যশ এবং অর্থ লাভ করিয়াছিলেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দানের ফলেই আজ আপার সার্কুলার রোডে সায়েন্স কলেজের বিরাট অট্টালিকা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিদেশের এই সকল দানের নিকট আমাদের দেশের দাতাদিগের দান সমুদ্রের নিকট শিশির বিন্দু বলিয়া মনে হয়; তবে আয়ের দিক দিয়াও ইহাদের মধ্যে ঐরূপ আসমান জমীন্ তফাৎ রহিয়াছে একথাও ভুলিলে চলিবে না।

সি পি ঘ

জাতির জন্য তিন কোটী টাকা দান

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে ঋণ হইয়াছে, সেই জাতীয় ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত ২২ লক্ষ পাউণ্ড চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিপুল অর্থ (প্রায় ৩ কোটি টাকা) দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সংগৃহীত হয় নাই, দাতাগণ স্বেচ্ছায় ইহা দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একব্যক্তি ৫ লক্ষ, অপর ব্যক্তি ১ লক্ষ এবং আর একজন ৫ হাজার পাউণ্ড বে-নামা দান করিয়াছেন।

লর্ড ইঞ্চকেপ তাঁহার কন্যা এলিস ম্যাকের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ (ইনি বিমানপোতে আটলাণ্টিক পার হইতে গিয়া মারা গিয়াছিলেন) জাতিকে ৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯১৯ সনে মিঃ ষ্ট্যানলি বল্ডউইন (প্রধান মন্ত্রী) ১ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন। এই সমস্ত দানের টাকা দিয়া সমর ঋণ পরিশোধ করা হইবে। ইংরাজের ঐশ্বর্য্যও যেমন অফুরন্ত, তাহার স্বদেশ প্রেম এবং দেশের কল্যাণের জন্য ত্যাগের বহরও তেমনি অপরিসীম। আমাদের দেশে ধর্ম্মের জন্য, ধন,জন,ঐশ্বর্য্য,সম্পদ এমন কি স্ত্রী পুত্র, পরিবার এবং রাজত্বও হেলায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এমন লোকের সংখ্যা অগণ্য, অসংখ্য। এই ত্যাগে নিজের তৃপ্তি আছে সন্দেহ নাই কিন্তু জাতির পারত্রিক কল্যাণ ছাড়া ঐহিক

সুখ সম্পদ বা কল্যাণ যে একবিন্দুও বাড়ে না, বরং কমায়, একথা আমরা জোরের সহিত বলিব। আজ সময় আসিয়াছে যখন দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য (শুধু নিজের তৃপ্তি নহে) সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে। পরলোকগত চিত্তরঞ্জন এ বিষয়ে পথ দেখাইয়াছেন।

বেতারে খনি খনন।

টেলিগ্রাফে ফটোগ্রাফ পাঠানোর কথা পাঠক শুনিয়াছেন। শুধু ফটো নয়, ম্যাপ, দলিলের নকল, এই সমস্ত টেলিগ্রাফ হইয়া যায়। আবার শুনুন, বেতার টেলিগ্রাফে মাটির নীচে কোথায় কি বহুমূল্য ধাতু, ধনরত্ন আছে, তাহা স্থির করা হইতেছে। করিতেছেন এক পাদরি সাহেব। তিনি এক যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। তাহাতে এই অভিনব কাণ্ডটী সংঘটিত হইতেছে। সাহেব বলেন, প্রতি ধাতু এক প্রকার তড়িৎ প্রবাহ বিস্তার করে। তাঁহার যন্ত্র ঐ প্রবাহ প্রকাশ করিয়া দেয়। খনি লইয়া বড় বড় মহাজনেরা বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করে, পাদরি সাহেবের এই যন্ত্রে তাহাদের সমূহ সাহায্য হইবে। তাহারা পাদরিকে মাথায় তুলিয়া নাচিতেছে। পাদরি নিশ্চয় ধর্ম্মপ্রচারক। কিন্তু কোথায় বা ধর্ম্ম, কোথায় বা আত্ম ? তিনি মাটির তলে পোঁতা সোণারূপা জহরতের আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমাদের পাদরিদের বিদ্যাও যেমন তাঁদের মনের গতিও তদনুরূপ। হিন্দু হইলে বিদ্যা হইল কেবল-শাস্ত্র পাঠ ও তাহার অনুশীলন, আর মুসলমান হইলে কেবল কোরাণই হইল একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। উভয়েরই মনের গতিটা কি তাহা একবার ভাবিয়া দেখা যাক। কেমন করিয়া দেশ, সমাজ ও জগতের কল্যাণ সাধন করিব!—আরে রাধা মাধব!—তাতে যে দেশটা কেবল হয় কাকের আর না হয় বনে চেয়ে যাবে। তা'র চেয়ে পুরুতের পাঁজি আর কাট মোল্লার কড়োয়া ছড়াও। তাতে দেশ উৎসন্ন যায় যাক। তাতে ক্ষতি কি, আমাদের চাল কলার ব্যবস্থাত অটুট থাকিবে!

টেলিভিসনের ক্রমোন্নতি।

টেলিভিসন নামে এক নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে, এই যন্ত্রের সাহায্যে এক স্থানের বক্তা বা অভিনেতার প্রতিমূর্ত্তি বহু মাইল দূরে কোন স্থানে শ্রোতা বা দর্শকের সম্মুখে প্রতিফলিত করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর প্রাঙ্গনে সম্প্রতি কয়েকজন অভিনেতা অভিনয় করেন। আট মাইল দূরবর্ত্তী কোনও স্থানের লোকজন সেই সকল অভিনেতার বক্তৃতাদি "বেতার" যন্ত্রের সাহায্যে শুনিতে পায় এবং তাহাদের চক্ষের সম্মুখে একখানি পর্দ্দার উপর অভিনেতাদের প্রতিমূর্ত্তি ও অভিনয় ভঙ্গি দেখিয়া চমৎকৃত হয়। টেলিভিসনের সাহায্যেই উহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহাই নাকি টেলিভিসনের সাহায্যে প্রথম অভিনয় প্রদর্শন। পর্দ্দার উপর অভিনেতাদের প্রতিমূর্ত্তি এ ক্ষেত্রে মাত্র ৩ বর্গ ইঞ্চি প্রমাণ দেখা গিয়াছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা আশা করিতেছেন, অভিনেতার প্রতিমূর্ত্তি পূর্ণ আকারে পর্দ্দার উপর দর্শকদিগের সম্মুখে প্রতিফলিত করা শীঘ্রই সম্ভব হইবে। বিজ্ঞানের বলে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ কি অসাধ্যই না সাধন করিতেছে—আর আমরা চিরকাল দর্শক এবং শ্রোতা হইয়াই কি জীবন কাটাইব! বিজ্ঞান জগতে আমাদের সবে ধন নীলমণি শার জগদীশ জীবন ভোর কেবল লজ্জাবতীর পাতা নাচাইলেন আর গাছের দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটাইলেন। বলি ব্যবহারিক জগতে দেশের জন্য কিছু করিতে পারিবেন কি ?

কৃত্রিম কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি

গ্যাস-বিশেষজ্ঞ জার্মাণ রাসায়নিক ডাঃ রেডিম্যান একটি "ঐন্দ্রজালিকের পর্দ্দা" আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দাবী করিতেছেন যে এই পর্দ্দা দ্বারা তিনি নগরসমূহকে বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন।

ডাঃ রেডিম্যান অনেকদিন যাবৎ এই বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি গবেষণার ফলে এই আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এমন একপ্রকার গ্যাসের সৃষ্টি হইবে, যাহা নগরীর উর্দ্ধে উঠিয়া গভীর ঘন কুয়াসার মত সমস্ত স্থানকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিবে। ফলে উপর হইতে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

জার্মাণ বিমান সচিবের কর্ম্মচারীদের নিকট ডাঃ রেডিম্যান তাঁহার এই আবিষ্ক্রিয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। একটি অট্টালিকার চারিদিকে ১০টী পাত্র ৭০ গজ অন্তর রাখা হইয়াছিল এবং ঐ পাত্রগুলির প্রত্যেকটিতে ২৪ গ্যালন রাসায়নিক দ্রব্য (আবিষ্কারক ব্যতীত অন্যে এই দ্রব্যের কথা জানে না) ছিল। একটি বিমানপোত অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র ডাঃ রেডিম্যান একটি বোতাম টিপিয়া দেন। ফলে, ৬ সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ পাত্রগুলি হইতে গভীর কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইয়া উর্দ্ধে ৩০০ ফিট এবং নিম্নে ৫০০ বর্গগজ স্থান একেবারে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে এবং ঐ প্রকারে বিমানপোতের আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

ইউরোপ এবং আমেরিকা তাহার যুবকদিগকে বিজ্ঞান ও রসায়ন শিক্ষা দিয়া এমন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছে; আর আমরা?—আমাদের আর্টের ছেলেরও যে দশা, বিজ্ঞানের ছেলেরও ঠিক সেই দশা। "চয়বে সমান দশা তোমার ও আমার"। অর্থাৎ তোমাকেও হয় চাকুরী, নয় ওকালতী, আর না হয় ডাক্তারী করিয়া "ঘৃত তণ্ডুল বস্ত্রেন্ধন চিন্তা"র নিরাকরণ করিতে হইবে, আমাকেও ঠিক সেই পথেই হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে।

ভূগর্ভে স্ত্রী-মজুর

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের কয়লার খনিগুলিতে এবং পাঞ্জাবের লবণের খনিতে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক মজুর কাজ করিয়া থাকে। খনির বাহিরে কাজ করা অপেক্ষা ভূগর্ভে খনির মধ্যে কাজ করা ঢের বেশী বিপজ্জনক ও শক্তিসাপেক্ষ। স্ত্রী-মজুরের মজুরী অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়। ভারতগভর্ণমেণ্ট এই প্রথা দূর করিবার জন্য আইন করিয়াছেন যে ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে সমস্ত খনির মালিক ১৯২৬ সালে যত সংখ্যক স্ত্রী-মজুর ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক স্ত্রী-মজুর রাখিতে পারিবে না। এবং ১৯২৮ সালের পর হইতে প্রতি বৎসর ঐ মজুরের সংখ্যা ১০০ করিয়া কমাইয়া আনিতে হইবে। অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে কোন স্ত্রীলোক বৃটিশ ভারতের কোন স্থানে ভূগর্ভে কাজ করিতে পাইবে না।

বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব যদি আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে সেই আইন কেবল ভূগর্ভে নিযুক্ত স্ত্রী-মজুরের বেলাই প্রযোজ্য হইবে, মাটির উপর যে কোন কার্য্যেই স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহার ফলে সমস্ত খনির মালিকদিগের খনি চালাইবার খরচ আরও বাড়িয়া যাইবে। খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের খরচ (raising cost) এমনিতেই বাড়িয়া গিয়াছে; বৈদেশিক কয়লার প্রতিযোগীতায় দেশীয় কয়লার খনির মালিকগণ ক্রমেই দেউলিয়া হইবার পথে বসিয়াছেন; তাহার উপর আবার এই

সব আইনের নাগপাশ আরম্ভ হইলে কয়লার খনি অচল হইয়া পড়িবে।

রেঙ্গুনের চাউল

বাঙ্গলাদেশে সস্তাদামে রেঙ্গুনের চাউল বিক্রয় হইত। কিছুকাল ধরিয়া উহার বাজার বড়ই মন্দা পড়িয়াছে। রেঙ্গুন হইতে রপ্তানী চাউলের উপর একটা ট্যাক্স ধার্য্য ছিল, সেইজন্য চাউল আর সস্তাদরে বিক্রয় হইত না। সম্প্রতি ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত রপ্তানী ট্যাক্স রহিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাংলাদেশের হাটে বাজারে আবার সস্তাদরে রেঙ্গুনী চাউল দেখা দিবে।

জনবাহুল্য সমস্যার সমাধান

ইটালীতে লোক সংখ্যা এতাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সাইনর মুসোলিনী তাহার একটা সুব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, ইটালীতে যে এক কোটী হইতে দুই কোটী একর পতিত জমী আছে, তাহা উঠিত করিবেন। এই পতিত জমীর মধ্যে কতকাংশ আবার জলাভূমি, সুতরাং ইহাকে বাসযোগ্য করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই কার্য্য করিতে প্রায় ৭ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে এবং ইহা শেষ করিতে ১৪ বৎসরের অধিক সময় লাগিবে। ফাসিষ্ট সম্প্রদায়ের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত হওয়া অবধি এতাধিক ব্যয়সাধ্য কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই ভূখণ্ড বাসযোগ্য হইলে ইটালীর অধিবাসীদিগকে আর অন্য দেশে গিয়া বসতি করিতে হইবে না। বর্ত্তমান লোক সংখ্যার সঙ্কুলান হইয়া আরও এক কোটী লোকের বাস করিবার উপযুক্ত স্থান থাকিবে। এই সকল লোকের জীবিকার উপায়ও করিয়া দেওয়া হইবে। স্বাধীন দেশে সবই সম্ভব।

আলু ও বেগুন চারার সংযোগ

আলুর মূলের সহিত বিলাতী বেগুনের চারার জোড়া লাগাইয়া পাশ্চাত্য দেশে এক অদ্ভুত সঙ্কর সবজীর সৃষ্টি করা হইয়াছে; উহাকে আলু বেগুন গাছ বলা যাইতে পারে।

আলু ও বিলাতী বেগুন (tomato) সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের গাছ। আলু মূল আর বিলাতী বেগুন ফল। বিলাতী বেগুন গাছের নীচে আলুর ন্যায় কোন জিনিষ গজাইয়া উঠে না। কিন্তু আলুর গাছে অনেক সময় ফুল হইতে বিলাতী বেগুন বা টোম্যাটোর ন্যায় একপ্রকার ফল জন্মিয়া থাকে, যদিও তাহা আকারে খুবই ছোট এবং আহারের অযোগ্য।

বৈজ্ঞানিক ভাবিতে লাগিলেন এই দুই গাছের সংযোগে এমন গাছ তৈয়ারী করা যায় না কি যাহার ফল হইবে বিলাতী বেগুন এবং মূল হইবে আলু?

তিনি এক কাজ করিলেন। আলুগাছ একটু বড় হইলে আলু হইতে তাহার ডাটাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং টোম্যাটোর চারার মূল চাঁচিয়া ফেলিয়া উহার ডাঁটাটিকে সেই আলুর মধ্যে উহার ডাটার পরিবর্ত্তে বসাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কয়েক দিনের মধ্যেই গাছে জোড় লাগিয়া গেল এবং আলুর মূল ও বেগুন গাছ বাড়িতে লাগিল। পরে দেখা গেল সংমিশ্রণের ফলে এক অদ্ভুত আলু বেগুন গাছ (Potato + Tomato = Pomato) সৃষ্ট হইয়াছে। উহার মূল আলু এবং ফল বেগুন।

বিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহা একটী বিস্ময়কর আবিষ্কার হইলেও ব্যবসায় জগৎ কিন্তু ইহা দ্বারা লাভবান হইবে না, কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা

দুইটী গাছের সংযোগমাত্র—সংমিশ্রণ নহে। এই উপায়ে এক নূতন উদ্ভিদ জাতির সৃষ্টি করা যায় না। প্রত্যেক গাছে এইরূপ জোড়া লাগাইতে হয়। ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

এই ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত যুবকেরা দুনিয়াটাকে কি ভাবে তোলপাড় করিতেছে। জীবন্ত জাতীর লক্ষণই এই।

প্যারিতে দোকানদারী

কলিকাতার রাস্তায় একদল বিক্রেতা জিনিষপত্র ফিরি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের জিনিসের কোন বাঁধাধরা দাম নাই। তাহারা দাঁও বুঝিয়া যখন যেমন পারে তখন তেমন দরেই মাল বিক্রয় করিয়া ফেলে। একজন হয়ত ফাউন্‌টেন পেন ফিরি করিতেছে। সে যদি দেখে আপনি পল্লীগ্রামের লোক, কলিকাতার চালচলন কিছুই বোঝেন না তাহা হইলে আপনার নিকট একটি কলমের দাম ৮৷১০ টাকা চাহিয়া বসিবে। অথচ উহার দাম হয় ত ৸৹ আনা মাত্র। আপনার নিকট যদি ৫।৬ টাকা বাগাইতে পারে ভালই—নহিলে ২।৩ টাকায় বিক্রয় করিলেও তাহার প্রচুর লাভ থাকিয়া যায়। শুধু এই দেশেই যে ঐরূপ ব্যবসাদারী আছে তাহা নহে; ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দোকানগুলিতে ও ঐ ধরণের ব্যবসাদারী পুরাদমে চলিয়া থাকে।

প্যারিস বাবুয়ানার সহর। সাধারণতঃ পৃথিবীর ধনকুবেরগণই ঐ সহরে বেড়াইতে যায়। আমেরিকা হইতে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক লোক প্যারিসে ভ্রমণ করিতে আসে। দোকানদারেরা লোক বুঝিয়া পছন্দসই জিনিষের যা তা দাম বলিয়া দেয়, তাহার পর দাম কসাকসি করিয়া যা আদায় করিতে পারে।

যাঁহাদের ধারণা বড় দোকান, বা জমকাল দোকান হইতে মাল কিনিলেই ঠকিবার কোন সম্ভাবনা নাই তাঁহারা এই সংবাদ হইতে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

ভারতের কৃষিক্ষেত্র

"ভারতবর্ষ একটী কৃষি প্রধান দেশ"—এই কথাটী আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে ঠিক কী পরিমাণ চাষের জমী আছে, কত জমীতে বর্ত্তমানকালে চাষ হইতেছে, কত জমী চাষের যোগ্য, অথচ পড়িয়া আছে, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ কোন কোন দ্রব্যের চাষ হয়, কোন দ্রব্যের চাষ কত জমীতে হইয়া থাকে—এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর আমরা খুব কমই শুনিয়া থাকি। কিন্তু এ সকল কথার উত্তর আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—অথচ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই—ইহা অপেক্ষা হাস্য কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে।

ভারতবর্ষকে একটী মহাদেশ বলিলেও চলে। কিন্তু ইহার আয়তন কত বড়? পেশাদার আমীন বা ক্ষেত্র পরিমাপকদিগের হিসাব অনুযায়ী ভারতের আয়তন—৬৬৭,১১৭৩০০০ একর। কিন্তু village paper দৃষ্টে মনে হয় ইহার পরিমাণ ৬৬৪৬১৭০০০

একরের অধিক হইবে না। তন্মধ্যে বন-ভূমি ৮৭০২৯০০০ একর, এবং চাষের অযোগ্য স্থান ১৪৯০১৪০০০ একর। প্রায় ৪৯৬৯৮০০০ একর জমী 'পতিত' পড়িয়া আছে এবং চাষ হইয়াছে ২২৬০১২০০০ একর জমীতে। বিধিমত ব্যবস্থা করিতে পারিলে আবাদে পরিণত করা যায় এমন জমীর পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। উহা চাষের অযোগ্য জমী অপেক্ষা বেশী এবং প্রায় ১৫২৫৩১০০০ একর হইবে। ভারতবর্ষে প্রায় ৪৭৭৮৫০০০ একর জমীতে
কৃত্রিম উপায়ে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এখানে যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহা ১৯২৬—২৭ সালের হিসাব। ঐ বৎসর কোন্ কোন্ শস্য কি পরিমাণ জমীতে আবাদ করা হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ধান্য	৭৮৫০২০০০	একর
গম	২৪১৮১০০০	,,
যব	৬৩৮৭০০০	,,
জোয়ার	২১১২১০০০	,,
বজরা (চানা)	১৩৮০১০০০	,,
রাগী (Millet)	৩৮৫৪০০০	,,
ভুট্টা	৫৫৫৫০০০	,,
কলাই	১৪৬৬৪০০০	,,
অন্যান্য খাদ্য শস্য	২৯১৫৪০০০	,,
খাদ্য শস্য মোট—	১৯৭২১৯০০০	একর
ইক্ষু	৩০৪১০০০	একর
অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য যথা মসলা, ফলমূল ইত্যাদি	৭৫৩৭০০০	,,
মোট খাদ্যদ্রব্য	২০৭৭৯৭০০০	একর
তিসি	২৩২৫০০০	একর
তিল	৩১৭২০০০	,,
রাই ও সরিষা	৩২৮০০০০	,,
চীনাবাদাম	৩৮৬৪০০০	,,
নারিকেল	৬৩৪০০০	,,
রেড়ী	৫৭৬০০০	,,
অন্যান্য তৈলবীজ	১১৪৮০০০	,,
তৈলবীজ মোট	১৪৯৯৯০০০	,,
তুলা	১৫৬৮৭০০০	একর
পাট	৩৬০৬০০০	,,
অন্যান্য আঁশ	৮০৫০০০	,,
নীল	১০৪০০০	,,
আফিং	৫৯০০০	,,
কফি	৯১০০০	,,
চা	৭৩৮০০০	,,
তামাক	১০৫৫০০০	,,
গবাদি পশুর খাদ্য	৮৯৪০০০০	,,
অন্যান্য শস্য	১৭২৯০০০	,,
মোট	৪৭৮১৩০০০	,,

মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২৫৫৬১০০০০ একর

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৯২৬-২৭ সালে ইংরাজ শাসিত ভারতে (British India) ২৫৫৬১০ হাজার একর জমীতে চাষ হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আবাদী জমীর পরিমাণ ২২৬০১২ হাজার একর। কাজেই মনে হইতে পারে যে হিসাবের কোথাও গলদ রহিয়া গেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই জমীতে একাধিকবার বিভিন্ন শস্যের চাষ হইয়া থাকে বলিয়া উল্লিখিত বিবরণে দুইবার একই জমির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালার অনাবাদি জমি

বাঙ্গলা দেশে মোট ৪৯৮২৩০৯৩ একর চাষোপযোগী জমি আছে। ইহার প্রায় অর্দ্ধেক জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে আবার ১০০ হইতে ১২০ লক্ষ একর জমি সম্পূর্ণরূপে আবাদের উপযোগী অবস্থায় আছে। ইহা আবাদ হইলে বাঙ্গালা দেশের আয় প্রতিবৎসর ৬০।৭০ কোটী টাকা বৃদ্ধি করা যায়।

বিষের অপব্যবহার

মধ্য যুগে পাশ্চাত্যদেশে গোপনে শত্রু হত্যা করিবার প্রধান উপায় ছিল বিষপ্রয়োগ। এখনও যে বিষ-প্রয়োগ করিয়া গোপনে শত্রুহত্যা করা হয় না তাহা নহে, তবে বিষপ্রয়োগ কারীকে কঠিন রাজদণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু মধ্যযুগে এ বিষয়ে এত আইনের কাঠিন্য না থাকায় শক্তিশালী লোকেরা ইচ্ছামত অবলীলাক্রমে বিষপ্রয়োগ করিতে পারিত; লোকের চক্ষে সামান্য ধূলা দিতে পারিলেই তাহাদিগকে কোন আইন প্রমাণাদি স্পর্শ করিতে পারিত না।

নানারূপ বিষের ব্যবহারে এক শ্রেণীর লোক বিশেষ ভাবে পারদর্শী ছিল। রাজা, রাজপুত্র ও পদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

সম্প্রতি কৌতূহলজনক দ্রব্যাদি সংগ্রহকারী (Curio Collector) জনৈক ইংরাজ, সিজার বর্জিয়ার একটি অঙ্গুরী সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই অঙ্গুরীটির উপরিভাগে বর্জিয়ার নামাঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র নীল আছে। নীলের নিম্নে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অতীব ক্ষুদ্র বিষের বড়ী আছে; সেইটি ইচ্ছাক্রমে অলক্ষ্যে সরান যায়। সিজার যখন কাহারও মৃত্যু ইচ্ছা করিতেন, তখন তাহার মদের গ্লাসে সন্তর্পণে এই প্রকোষ্ঠটি খুলিয়া বিষবড়ী গ্লাসের মধ্যে ঢালিয়া দিতেন।

পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের একটি চাবির রিং ছিল। যাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা হইত, তিনি তাহাকে চাবিটি দিয়া কোন দেরাজ বা তালা খুলিতে বলিতেন। খুলিবার সময় যেমন চাবির রিংএ চাপ পড়িত, অমনি একটি অজ্ঞাত স্প্রিংএ চাপ পড়িয়া একটি অদৃশ্যপ্রায় ফাঁপা সূচ বাহির হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি বিদ্ধ করিত। এই সূচের মধ্যে অতি তীক্ষ্ণ বিষ সঞ্চিত থাকিত এবং তাহাই হতভাগ্যের মৃত্যুর কারণ হইত। অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্যেও তখন এইরূপে কৌশলে বিষ সঞ্চিত থাকিত। আধুনিক যুগের এই সকল দ্রব্য সংগ্রহকারীরা অতি সন্তর্পণে কার্য্য করেন; কারণ কোথায় কি ভাবে যে বিষ সঞ্চিত আছে, তাহা জানা দুষ্কর।

ষষ্ঠ হেনরি একজোড়া দস্তানার দ্বারা হত হইয়াছিলেন। সেই দস্তানায় প্রাণঘাতী বিষ ছিল। এমন কি, তখন গোলাপ ফুলের মধ্যে এমন অজ্ঞাত বিষ দেওয়া হইত যে, ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিলেই জীবন হানি হইত। আধুনিক যুগেও নরহত্যাকারীরা পরিচ্ছদে ও অন্যান্য দ্রব্যে নানারূপ তীব্র বিষ মাখাইয়া জীবন নাশ করে।

সাধারণতঃ আর্সেনিক ও সেঁকো হইতেই নানারূপ তীব্র বিষ প্রস্তুত হয়। নেপল্‌সে এক শ্রেণীর নারীরা Aegua Tofna নামক এক প্রকার তীক্ষ্ণ বিষের ব্যবহার জানিত। Hog Tofna নামক এক ব্যক্তি আর্সেনিকের সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ঐ বিষ বাহির করিয়াছিল বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে অপ্রিয় বা অযোগ্য স্বামী-গুলির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বহু স্ত্রীলোক অকালে বিষ প্রয়োগে আত্মহত্যা করিত। ইহা দমন করিবার জন্য ফ্রান্সে Chambre Ardente নামক একটি ভিন্ন কোর্ট স্থাপন করিতে হইয়াছিল।

আমাদের দেশেও বহুকাল পূর্ব্বে নানা প্রকার বিষের প্রচলন ছিল। আজিও সেগুলি নরহত্যা ব্যতীত অন্য অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সেঁকো বিষ, ধুতরার ফল, কল্কে ফুলের বিচি আফিম, সাপের বিষ, মিঠাবিষ, কুচিলা, জয়পাল, চারি জাতীয় ব্রহ্মপুত্র, হরিতাল, প্রভৃতি বহুপ্রকার দেশীয় বিষ এদেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিষাক্ত পোষাক পরাইয়া জীবন নাশ করার কথা মোগলরাজত্বের ইতিহাসে অনেকবার পড়া গিয়াছে। কালেকালে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে এই সব প্রথা উঠিয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু আত্মহত্যা এবং মানুষ-মারার নূতন নূতন ফন্দী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এইরূপ অপঘাত মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে বহুদিন পরে আবার কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের সাবান বাজারে বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের নিকট হইতে আমরা এক বাক্স সাবান পাইয়াছি। এ বাক্সটী Presentation Box বা উপহারের বাক্স, তাই বাক্সের নাম রাখা হইয়াছে "ডালা"। বাক্সটী কারুকার্য্য এবং আর্টের দিক দিয়া অতি সুন্দর এবং সুদৃশ্য হইয়াছে; ইহার ডালায় ফিতা বাঁধা থাকায় বাক্স খুলিলে ডালা ধরিয়া থাকিতে হয় না।

এই "ডালার" মধ্যে ছয় রঙ্গ এবং ছয় গন্ধ বিশিষ্ট ছয়খানি সুন্দর সাবান আছে। গন্ধে, বর্ণে এবং ব্যবহারে সকল দিকেই ইহা এত সুন্দর হইয়াছে যে ইহাকে বড় শশুর বড় ঐশ্বর্য্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যে যে ফুলের নামে সাবান গুলির নামকরণ হইয়াছে, তাহাদের রঙ্গ এবং গন্ধও ঠিক সেই সেই ফুলের অনুরূপ। এইরূপে গোলাপ, চম্পক, হেনা, বকুল, বেলা ও চন্দন সাবান গুলি ঠিক এই সকল সুবিখ্যাত ফুলের গন্ধ ও বর্ণের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশের বড় শশুরকে অনুকরণ করতঃ বঙ্গৈশ্বর্য্য সমন্বিত এই নয়নমনোহর "ডালার" উদ্ভাবনার জন্য ক্যাল্‌কো পার্কের শরৎ বাবুকে তারিপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পূজা আসিতেছে; প্রিয়জনকে দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপহারের ডালা আর নাই। ক্যাল্‌কো পার্কের কর্ত্তাদের বলি, এই ডালার কথা পূজার বাজারে চারিদিকে প্রচার কর—Crow, Crow and Crow about, যে শুনিবে, সেই আসিবে—যে দেখিবে সেই কিনিবে।

তারপর বাঙ্গালীর বড় আদরের ধোবীসাবানের রাজা "নির্ম্মলিন" ও দেখিলাম। নাম না থাকিলে সকলেই মনে করিত সান্‌লাইট সোপ। একদিন এই নির্ম্মলিন বাংলার বাজারে "সান্‌লাইট" এবং "ম্যাঙ্কে" কানা করিয়াছিল। দুঃখের আবর্ত্তনে ক্যাল্‌কাটা সোপ ওয়ার্কস্ যখন রজনী বন্ধ করিল তাহার পর কত দোকানী পশারীর মুখে যে নির্ম্মলিনের জন্য না হুতাশ করিতে শুনিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালীর ঘরের আদরের নির্ম্মলিন আবার আসিয়াছে। বাঙ্গলার দোকানী পসারী যাহারা ক্যাল্‌কাটা সোপ ওয়ার্কসের পূর্ব্বগৌরব কথা আজিও ভোলে নাই—তাহারা এখুনি Calso Park, বালীগঞ্জে আবার পত্র ব্যবহার করতঃ কারবার সুরু কর।

কলিকাতায় চাএর নীলাম।

বিগত ১৫ই জুলাই তারিখে কলিকাতার বাজারে ৭নং নীলামে যে জেলার যে পরিমাণ চা-বিক্রয় হইয়াছে তাহার বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৭নং নীলামের (১৭ই জুলাই) বিবরণের সহিত নিম্নে দেওয়া হইল :—

জেলার নাম	১৯২৯-৩০ সাল প্যাকেট সংখ্যা—প্রতি পাউণ্ড	১৯২৮-২৯ সাল প্যাকেট সংখ্যা—প্রতি পাউণ্ড
আসাম	৪০২৯—৸৵৭ পাই	৫০৫৯—৸/১১ পাই
কাছাড়	৫৯৯—।/৬ "	১৫২৫—।৶২ "
শ্রীহট্ট	২২৬৮—।/৯ "	৬২১৪—।৵১০ "
দার্জ্জিলিং	৮৯০—১।/১ "	১৭৬৪—১৲১১ "
ডুয়ার্স	৫৫২৬—।৶৯ "	৬১৪৫—৸৪ "
তেরাই	৯৯৯—।৶৩ "	৯৮৭—।৶০ "
ত্রিপুরা	৩২১—।/৯ "	২৯৯—।৵৪ "
চট্টগ্রাম	২০৮—।/৪ "	৫৩১—।৵২ "
ছোটনাগপুর	৮৮—।৵১১ "	৫৭ ৸৵৬ "
কুমায়ুন ও কাংড়া	....	....
দেরাদুন	....	....
	১৪,৯২৮—৸৭ পাই	১৯৬৮১—৸৮ পাই

এই হিসাবের মধ্যে ডাষ্ট টি, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট চা এবং পুরাতন চা-এর হিসাব ধরা হয় নাই। বিগত ১৫ই জুলাই তারিখের নীলামে ৩৭৫৭ প্যাকেট ডাষ্ট টি প্রতি পাউণ্ড ।৵৪ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসের ১৭ই তারিখের নীলামে ৩৭৮৪ পাউণ্ড ৸৩ পাই পাউণ্ড দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

বিলাতে চায়ের বাজার

২২শে জুলাই তারিখের সাপ্তাহিক নীলামে ২৮০০০ বাক্স ভারতীয় চা' ২৮০০০ বাক্স সিংহল চা এবং ৬০০০ বাক্স যাভা চা বাজারে ছিল। বাজার দর প্রতি পাউণ্ডে অর্দ্ধপেনি কমিয়াছে।

বিলাতে ভারতীয় চা'র দর প্রতি পাউণ্ড—

পিকো	১০।৷০ পে—১ শি-৮ পে
ব্রোকেনপিকো	১০৷৷০ পে—২ শি-২ পে
অরেঞ্জ পিকো	১ শি—২ শি-৪ পে
ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো	১০৷৷০ পে—২ শি-৪ পে

চা'র বাজার

৮নং নীলামের অবস্থা

এই নীলামে ২৩৯০০ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছে তন্মধ্যে ৪১০০ বাক্সে গুঁড়া ছিল।

আসামের চা'র প্রকৃতির কিছু অবনতি দেখা গিয়াছে এবং ডুয়ার্সের চাও সাধারণ কোয়ালিটির ছিল। এই নীলামে দার্জ্জিলিংএর কিছু ভাল চা'ও বিক্রয় হইয়াছে।

ভাল পাতা চা'র বেশ চাহিদা ছিল এবং বাজারও পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল।

আসামের ভাঙ্গা এবং পাতার দর গত নীলামের মতই ছিল, তবে কিছু অবনতি হইয়াছে।

সাধারণ মাঝারি চার দরের কোন স্থিরতা ছিল না। মোটের উপর দর পাউণ্ডে ছয় পাই কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। পাতলা চা'র ক্যানিংসের কোন ডাক হয় নাই।

ভাল সাধারণ কাল পাতা ভাঙ্গা চা'র দর কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং বেশ ডাক হইতেছিল।

টিপি ব্রোকন-অরেঞ্জ পিকোর বেশ চাহিদা ছিল এবং গত নীলাম অপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ক্লিন্ কমন ব্রোকন পিকো সুচং পাউণ্ড পড়ে।৬ পাই দরে বিক্রয় হইতেছে।

খুব গুঁড়ার বেশ চাহিদা ছিল এবং দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু অন্য প্রকারের গুঁড়ার সেরূপ চাহিদা ছিল না এবং দরও কিছু কম ছিল।

বিভিন্ন বৎসরের গড়পড়তা দর।

	৮নং নীলাম	৭নং নীলাম
১৯২৯	৷৷৴১১	৸৭
১৯২৮	৸২	৸৮
১৯২৭	৸৶১০	৸৶৯

৭নং নীলামের বিক্রীত চায়ের পরিমাণ

১৯২৯	১০,৭৩৫,২০০	পাউণ্ড
১৯২৮	১৩,১০৪,৪০০	"
১৯২৭	১২,৩৫৫,৯০০	"

ডুয়ার্সে বৃষ্টির পরিমাণ

১৫ই জুলাই তারিখে ১০৭ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ৫৬ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে চা-পান

(জন প্রতি)

গ্রেট বৃটেন	৯½	পাউণ্ড
অষ্ট্রেলিয়া	৮	"
নিউজিল্যাণ্ড	৭½	"
আয়ারল্যাণ্ড	৭½	"
কানাডা	৪½	"
হল্যাণ্ড	৩	"
ইউনাইটেড ষ্টেটস	১ পাউণ্ডের কম	
জার্মানী	½	"
ফ্রান্স	⅛	"
রুশিয়া	½ পাউণ্ডের কিছু বেশী	

জলপাই গুড়ির চায়ের বাজার

৭নং নিলাম—১৬।১৭ জুলাই।

বাগান	যত বাক্স	গড় দর	গত সনের ঐ নং গড় দর
আমবাড়ী	১২৫	৷৵১০	৷৶৬
আটীয়াবাড়ী	১০২	৷৶৫	
আশাপুর	৩১	৷৵৫	
ইষ্টার্ণ	৮৬	৷৵৪	৸৪
ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্স	২৬	৷৪	
কমলা	১২৩	৷৵০	
কোহিনুর	১০৭	৷৴১০	৷৶৪
কাটালগুড়ি	১০৩	৷৶৬	৸৮
খয়ের বাড়ী	৭০	৷৵১১	৸৵৪
গুরজাংঝোরা	১১০	৷৶৬	
চুনিয়া ঝাড়া	১১২	৷৶	
জলপাইগুড়ি	১৬০	×	৸১০
ডায়না	১২১	৸৯	৸৪
ডুয়ার্স ইউনিয়ন	৮৮	৷৵১০	৷৶৯
টেকলাপাড়া	১০৮	৷৶৩	৷৶
দেব পাড়া	১৪৮	৷৷৶৫	
নাক্‌শালবাড়ী	১২৩	৸৵.০	
নদীয়া	১৩৩	৷৵৬	
নর্দ্দার্ণ বেঙ্গল	৮	৸৬	৷৶৭
বাতাবাড়ী	৭০	৷৴১০	
বেঙ্গল ডুয়ার্স	৫৬	৵	
বোরভিট	৭৯	৵৭	৷৶৪
দার্জ্জিলিং ডুয়ার্স	৩৩	৷৶৫	
রামঝোড়া	১৩৪	৷৵২	৸৵১০ ৸৴৪
রহিমাবাদ	৯২	৷৶৩	
সারদা	১৪৪	৷৶৩	৸১
সুকনা	১০৯	৷৶৩	
হোসেনাবাদ	১০২	৷৶১১	৸৴১১

৭নং নীলামের অবস্থা।

এই ৯মাসে ৯৭০০ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৭০০ বাক্স ছিল।

আসামের চা'র প্রকৃতি এই নীলামে কিছু উন্নত ছিল কিন্তু ডুয়ার্সের চা'র প্রকৃতির কিছু অবনতি হইয়াছে এবং কতকগুলি বাক্সে চা'র ভাটা দেখা গিয়াছে।

দার্জ্জিলিংএর চায়ের চাহিদা বেশী হয় নাই। আসামের ভাল মাঝারি গুঁড়ার বেশ চাহিদা ছিল এবং দর গত নীলামের মতই ছিল। ভাল রকমের ব্রোকণ পিকো সুসংএর দর পাউণ্ডে ছয় পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ডুয়ার্সের সাধারণ মাঝারি চা'র দর পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল এবং কতক পরিমাণ চা'র কোন ডাকই হয় নাই। টিপি ব্রোকেণ অরেঞ্জ পিকোর চাহিদাও কিছু কম ছিল।

সাধারণ ব্ল্যাকলিয়া চা'র দর পাউণ্ডে তিন পাই বৃদ্ধি হইয়াছিল।

ক্লিন কমন ব্রোকন পিকো সুসং পাউণ্ডে গড়ে ।৬ দরে বিক্রয় হইয়াছে।

গুঁড়ার দর পাউণ্ডে তিন পাই বৃদ্ধি হইয়াছিল

কলিকাতার চা-বোকার মেসার্স ক্রেস্‌ওয়েল কোম্পানী এখানকার চা বাগানসমূহে জানাইয়াছেন যে চার দর কমিবার বিশেষ সম্ভাবনা। বাজারে অনেক চা মজুত হইয়াছে। ভাল রকমের চা প্রস্তুত করিবার দিকে বাগানের ম্যানেজারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ত্রিস্রোত

গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি করার উপায়।

আমরা অনেক গাভীকেই দুধ চোরা বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক স্থলে তাহা ঠিক নহে। কারণ অনেক সময় দেখা গিয়াছে, গোয়ালার বাটিতে যে সকল গাভী প্রচুর দুধ দিয়াছে, তাহারা গৃহস্থের বাড়ী আসিয়া সেরূপ দুধ দেয় না। তাহার প্রধান কারণ গাভীকে উপযুক্তরূপ খাতাদি না দেওয়া, এরূপ স্থলে গাভীকে দুধ চোরা না বলিয়া গৃহস্থকে গাভীর খোরাক চোরা বলা উচিত। কেননা অধিকাংশ স্থলে সেই সকল গাভী নিয়মিত খাতাদি না পাওয়ায় গোয়ালার বাটীর ন্যায় অধিক পরিমাণ দুগ্ধ দেয় না। প্রায়ই অধিকাংশ গৃহস্থকে দেখিতে পাওয়া যায়, যতদিন গাভীর দুধ থাকে ততদিন তাহাকে খাইতে দেয়, আর যখন দুধ না দেয় বা সামান্ত দেয় তখন আর তাহাকে ভালরূপ খাইতে দেয় না। দিনান্তে মাঠ হইতে চরিয়া আসিলে পর নামমাত্র ২।১ আঁটি শুষ্ক খড় দেয়।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, গরুর দুধ বাঁটে নহে, গরুর দুধ মুখে; ইহা দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে গরুকে আমরা যেরূপ খাইতে দিব, সেইরূপই দুধ পাইব।

যেরূপ খাত্ত খাওয়াইলে গরুর দুধ বেশী হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথম প্রকরণ।

মাষ কলাই (সিদ্ধ)	।৷৹সের
ভাতের মাড়	।৷৹ সের
তেলি গুড়	।৷৹ পোয়া
পিপুলের গুঁড়া	১ তোলা

উপরোল্লিখিত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া দিন কয়েক সন্ধার সময় খাওয়াইলে গাভীর দুধ বেশী হইয়া থাকে। অধিকন্তু লবণ খাওয়ার জন্য গাভীর রক্ত পরিষ্কার থাকে।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

কাঁজি	।৷৹ সের
আঁকের শিকড় বাটা	৴৹ ছটাক

উল্লিখিত দ্রব্য খড় জাবের সহিত মুড়কী মাথার ন্যায় মাখিয়া খাইতে দিলে গাভীর প্রচুর দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকরণ।

বাঁশপাতা সিদ্ধ জল	৴১ সের
যোয়ান	অর্দ্ধ ছটাক।
ইক্ষুরস	৶৹ পোয়া

উল্লিখিত দ্রব্য সকল একত্র করিয়া গাভীকে খাইতে দিলেও দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

চতুর্থ প্রকরণ।

ভেরেণ্ডার কচি কচি ডগা ২।১টি জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর প্রচুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

পঞ্চম প্রকরণ।

ভাতের মাড় অথবা মাসকলাইয়ের ভূষির সহিত লাউ সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

কার্পাস তুলার বীজ খাওয়াইলে এবং উক্ত বীজ ভিজান জল দ্বারা গাভীর পালান্ ধৌত করিয়া দুগ্ধ দোহন করিলে দুগ্ধ বেশী পাওয়া যায়।

সপ্তম প্রকরণ।

গাভী প্রসবের ১২।১৪ দিবস পর হইতে কিছু দিনের জন্য [illegible] চাউলের খুদ সিদ্ধের সহিত [illegible] কুঁড়া মিশ্র করিয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

অষ্টম প্রকরণ।

[illegible] ভিজাইয়া খাওয়াইলেও গাভীর দুগ্ধ দায়িকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

নবম প্রকরণ

গাভীর দুগ্ধ দোহন করিবার কিছু পূর্ব্বে স্তনে রেড়ীর বীচযুক্ত পাতা কিছুক্ষণের জন্য বাঁধিয়া রাখিলে পরে তাহা খুলিয়া দোহন করিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ কিছুদিন করা আবশ্যক।

দশম প্রকরণ।

তেঁতুলের আঁটী ৵০ আনা হিসাবে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

গো-দুগ্ধের গুণাগুণ বিচার

১। বালকদিগের আহারোপযোগী গরম দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন ভাগ তুলিয়া লইলে তাহা বিশেষ উপকারী হয়। ইহা লঘুপাক, পুষ্টিকারক, জ্বর এবং বায়ু পিত্ত কফ নাশক। পাশ্চাত্য দেশে বালকদিগের জন্য ইহা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। এক বৎসরের নূতন গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষনাশক, বলকারক ও তৃপ্তিকারক।

৩। বৎস ও গাভী একবর্ণের হইলে তাহার দুগ্ধ বিশেষ হিতকর এবং বহুগুণান্বিত হয়।

৪। অল্পভোজী গাভীর দুগ্ধ কফবর্দ্ধক, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, বলকারক এবং স্বাস্থ্যকারক হইয়া থাকে।

৫। বহুতৃণ বীজাদি ভক্ষিত গাভীর দুগ্ধ হিতকর ও গুণযুক্ত হয়।

৬। যে সকল গাভী ব্যায়াম করিতে পায় না তাহাদিগের দুগ্ধ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হিতকর নহে।

৭। গরম দুগ্ধ লঘুপাক, উষ্ণ অবস্থায় পান করিলে কফ ও বায়ু নাশ করে এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়।

৮। ধারোষ্ণ টাটকা দুগ্ধ বিশেষ বলকারক ও গুণকারী।

৯। কাঁচা দুগ্ধ চক্ষুরোগনাশক ও স্নিগ্ধ।

১০। জালের দ্বারা দুগ্ধ গাঢ় কিম্বা ঘন করিয়া পান করিলে গুরুপাক হয়।

১১। রাত্রে দুগ্ধ পান করিলে চক্ষুর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

১২। প্রাতঃকালের দুগ্ধ ভারী ও শীতল।

১৩। অপরাহ্নের দুগ্ধ শ্রান্তিহারক, চক্ষুর দীপ্তিকারক, ধৈর্য্যকর।

১৪। এক বলকের দুগ্ধ অশেষ উপকারী ও লঘু।

১৫। গো, মহিষ ও ছাগাদির অশৌচ কাল অন্তে দুগ্ধ পান করা যাইতে পারে। বালবৎসা ও হীনবৎসা গাভীর দুগ্ধ অপকারী। বসন্তাদি কোন প্রকার রোগগ্রস্ত পশুর দুগ্ধ পান করিলে নিজেকে রোগগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব এতদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া দুগ্ধ পান করিতে হইবে।

১৬। গাভীর আহারের তারতম্যানুযায়ী দুগ্ধের গুণভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৭। রসুন গন্ধ যুক্ত দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত দুগ্ধ কখনও উপকারী নহে।

দুগ্ধ টাটকা রাখিবার উপায়।

দুগ্ধ অনেকদিন পর্য্যন্ত সমভাবে রাখিবার প্রয়োজন হইলে ।৶০ সের পরিমিত দুগ্ধে এক চামচ পরিমাণ মিশ্রিত সালফেট্ অব সোডা মিশাইয়া রাখিলে উহা অনেকদিন পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিয়া যায়।

খড় দিয়া রাখিলেও দুগ্ধ অনেকদিন পর্য্যন্ত ঠিক থাকে, তাহার কারণ খড়ে সোডা বা ক্ষারের অংশ বেশী আছে।

মৃদু অগ্নুতাপে দুগ্ধ কিছু জল মিশ্রিত করিয়া চাপাইয়া রাখিলে শীঘ্র খারাপ হয় না।

—-—

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্ত বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

[২৩শে মে তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

এলাচি ও কফি।

(এস—১৯) যাহারা এলাচি ও কফি সরবরাহ করিতে পারেন তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্ত মাদ্রাজের এক ব্যবসায়ী আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

বালি ও কাঁকর।

(এস—২০) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী জল ফিল্টার করার কাজের উপযুক্ত বালি ও কাঁকর (Sand and Gravel) সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

[৩০শে মে তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

ইফিড্রা ভালগারিস্, পডোফাইলাম্ ইমোদি রুট।

(এস—২১) উপরোক্ত ধনৌষধি ক্রেতাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্ত রাউলপিণ্ডি (পঞ্জাবের) কোনও কারবারী সন্ধান চাহিয়াছেন।

কচুপাতা।

(এস—২২) ভারতবর্ষে যাহারা Buchu Leanes আমদানী করেন তাহাদের সন্ধান চাহিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের এক ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন;

উড্বিড়ালীর চামড়া

(এস—২০) ভারতবর্ষ হইতে যাহারা উড়ন্ত উড্বিড়ালীর (Flying fox) চামড়া বিদেশে চালান দিয়া থাকেন, জার্মানীর হামবুর্গ হইতে কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম তাহাদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

[৬ই জুন তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

পেপেন

(এস—২৪) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম পেপেন (Papain) বা পরিষ্কৃত পেপের আটা সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

সোপ ষ্টোন পাউডার

(এস—২৫) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম, সোপ ষ্টোন পাউডার ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

[২০শে জুন তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

হরিণের চামড়া

(এস—৩১) সকল রংএর কাঁচা হরিণের চামড়া বিদেশে রপ্তানীকারক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য নিউইয়র্কের কোনও ফার্ম সন্ধান চাহিয়াছেন।

আয়রণ এণ্ড ষ্টীল স্ক্র্যাপস্

(এস—৩২) ভারতবর্ষ হইতে যাহারা লোহা ও ইস্পাতের টুক্‌রা (Iron and Steel Scraps) বিদেশে চালান দিয়া থাকেন তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য জাপানের ওসাকা নামক সহর হইতে কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম সন্ধান চাহিয়াছেন।

[২৭শে জুন তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

ম্যাগ্‌নিসাইট ওর

(এস—৩৩) ম্যাগ্‌নিসাইট ওর (Magnisite ore) ক্রেতাদের সহিত পরিচয় করিবার জন্য মাদ্রাজের এক ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

RED WOOD বা বকম্ কাঠ

(এস—৩৪) মাদ্রাজের কোনও ব্যবসায়ী (Red wood) বা বকম্ কাঠের খরিদদার খুঁজিতেছেন। ইহা জলে ভিজাইলে গাঢ় লাল রং বাহির হয়।

ট্যান্‌টেলাইটওর

(এস—৩৫) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম হইতে ট্যান্‌টেলাইট ওর) Tantalite ore সরবরাহকারীদের সন্ধান চাওয়া হইয়াছে।

[৪ঠা জুলাই তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

এলাচি ও কফি

(এস—৩৭) এলাচি ও কফি সরবরাহকারী ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহিয়া মাদ্রাজ হইতে এক পত্র আসিয়াছে।

পেপেন।

(এস—৩৭) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম, পেপেন (Papain) সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৯ম বর্ষ } ভাদ্র ১৩৩৬ { ৫ম সংখ্যা

নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলনে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অভিভাষণ।

স্বাগত সমিতির সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত ভদ্রমণ্ডলী!

আমাদের জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আপনাদের সহিত এই শুভ পরিচয়ে আমি বিশেষ প্রীত। দেশের অর্থশক্তির মূলাধার আপনারা, তাই বাঙ্গালার আর্থিক দৈন্য দূরীকরণে, লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে স্বাধিকার সংস্থাপনের চেষ্টায়, আপনাদের সহিত এই মিলনের সুযোগ আমার বিশেষ ভাবেই অভিলষিত। তন্নিমিত্তই আজিকার এই সম্মিলনীর সভাপতিত্বের গুরুভার বহনের অক্ষমতা সত্বেও আপনাদের আমন্ত্রণ দ্বিধাশূন্যচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি। কারণ চারিদিককার এই ঘোর অমানিশায় তমসাময় রাজপুরীর তন্দ্রাতুর রাজকন্যার 'জীবন মরণ কাঠি' আজ অনেকটা আপনাদের অধিকারে। দীর্ঘ শত শতাব্দীর অবসাদের মলিনতা ঘুচাইয়া যার স্বজল পরশনে, নব জীবনের শুভ সঞ্চার ও আশার অরুণ কিরণ দেশকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে, সে পরম ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্টি ত আপনাদের সম্মিলিত শক্তিতেই সম্ভব। কারণ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বহুল

প্রসারই জাতির আর্থিক উন্নতির প্রধান উপকরণ একমাত্র সুসংবদ্ধ ও উন্নত প্রণালীর ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই অন্যান্য দেশে বাণিজ্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে যুগান্তরের অবতারণা হইয়াছে এবং আমাদের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর হইতে পারে।

কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক সমস্যায় ব্যাঙ্কিংএর সার্থকতা যেমনই সুমহৎ, আমাদের দেশে উহার অভাব এবং তজ্জনিত আমাদের দৈন্যও তেমনই গুরুতর। আমাদের মহাজন শেঠ, নিধি, চেটি প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ যে দেশীয় প্রণালীতে ব্যাঙ্কিং চালাইতেছেন, তাহা পৃথিবীর অন্যদেশীয় ব্যাঙ্ক-সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে উদ্ভাবিত সন্দেহ নাই। আমাদের হুণ্ডি কারবার এ প্রশস্তভাবেই আমাদের নিজস্ব ইহা অতি পুরাতন যুগ হইতেই কার্য্যকারিতায় উন্নত ব্যাঙ্কিং প্রণালীর সহিত সমতা রাখিয়া চলিয়াছে। তথাপি বর্ত্তমানে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিং যে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ তাহা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহের মাপকাঠিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান বলিয়াই, আজ তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন। প্রণালী-বিশেষের উৎকর্ষ বিচার না করিয়া, বিভিন্ন দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিং-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা, মূলধন ও আমানতের মোট পরিমাণ এবং লোক-সংখ্যার অনুপাতে ইহাদের তারতম্যের পর্য্যালোচনা করিলেই ব্যাঙ্কিংএ আমাদের দেশ এখনও কতটা নিম্নস্তরে তাহা সুস্পষ্ট হইবে।

অন্য দেশের তুলনায় ভারতীয় ব্যাঙ্কিং

প্রথমতঃ বিলাত, মার্কিণ এবং জাপানের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ধরা যাক্। ১৯২৪ সনে প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে বিলাতের মোট ব্যাঙ্ক সংখ্যা ১১,৯৭৭ মার্কিণের ৩০,০০০, জাপানের ৭১৬৫, ভারতবর্ষের কথঞ্চিৎ বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫৯৬টী মাত্র। কাজেই প্রতি দশ লক্ষ লোকের মধ্যে আমাদের দেশে গড়ে মাত্র দুইটী ব্যাঙ্ক দাঁড়ায়; অথচ ঐ অনুপাতে বিলাতে, মার্কিণ এবং জাপানে যথাক্রমে ২৮৫টি, ২৫৬টি, ও ৯২টি ব্যাঙ্ক আছে। এই সকল দেশের আর্থিক উন্নতির মূলে তাহাদের ব্যাঙ্কসমষ্টির সংখ্যাধিক্য, আর আমাদের দেশে ঐ সংখ্যার অল্পতা দেশের আর্থিক দুরবস্থারই অনুরূপ। এই ত গেল বাহিরের কথা; এখন বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের অর্থ-সম্পদের অনুপাতটা কি রকম দেখা যাক্।

ঐ বৎসর বিলাতের, মার্কিণের এবং জাপানের ব্যাঙ্কগুলির শুধু আদায়ী মূলধনই ছিল যথাক্রমে কিঞ্চিদধিক ১১ কোটি, ৬৬ কোটি ও ১৫ কোটি পাউণ্ড; পক্ষান্তরে তখন আমাদের দেশের আদায়ী মূলধন মাত্র এক কোটি পাউণ্ড। আমানতের হার মার্কিণের সর্ব্বোপরি মোট ১ হাজার ৩৭ কোটি পাউণ্ড; বিলাতের ও জাপানের ভাগে ২৫১ কোটি এবং ১০১ কোটি করিয়া। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বাদে আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ মোটে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ জনপ্রতি ৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং মাত্র। অথচ বিলাত, মার্কিণ ও জাপানের জনপ্রতি ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০ পাউণ্ড, ৮৭ পাউণ্ড ১৪ পাউণ্ড করিয়া। এই সকল দেশের তুলনায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ এতই অল্প যে উহার সমষ্টি বিলাতের বিগ ফাইভের যে কোনও একটী ব্যাঙ্কের আমানত হইতে ন্যূন।

এই ত গেল অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিংএর স্থাননির্ণয়। এইবার দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা

আবশ্যক। আজ দেশে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় জয়েণ্টষ্টক্ ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ঋণদান সমিতি প্রভৃতি একযোগে কারবার চালাইতেছে। ১৯২৪ সনে প্রকাশিত বিবরণ হইতে ইহাদের পরস্পরের আর্থিক অবস্থা নিম্নে তুলনা করা গেল। হিসাবটা লক্ষ টাকায় দেওয়া হইল।

	ইম্পিরিয়াল	জয়েণ্টষ্টক	এক্সচেঞ্জ	সমবায়ের	মোট
মূলধন	৫,৬০	৭,৬০	—	১,৭০	১৪৯০
রিজার্ভ	৪,৮০	৪,২০	—	৭০	৯,৭০
আমানত	৮৪,২০	৫৫,২০	৭০,৬০	১২,৫০	২২২,৫০

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রায় বিগত ৭০ বৎসর ধরিয়া এ দেশে ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে; এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক মাত্রেই বিদেশে গঠিত; কাজেই তাহাদের মূলধন বা রিজার্ভের কি পরিমাণ ভারতবর্ষে খাটান হয় তাহা প্রকাশিত হয় না। বিগত ইয়োরোপের মহাসমরের ফলে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে ১৯১৩ হইতে ১৯২৪এর মধ্যে নূতন নূতন দেশ ভারতে তাহাদের ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করে; বর্ত্তমানে এই বিদেশী ব্যাঙ্ক সংখ্যায় ১৯টী। এক্সচেঞ্জের কাজ যদিও ইহাদের বিশেষত্ব তথাপি দেশী ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতায় সাধারণভাবে ব্যাঙ্কিং কার্য্য ইহারা করিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের বাৎসরিক ৬০০ শত কোটি টাকার বহির্ব্বাণিজ্য ইহাদের হাত দিয়াই চলিতেছে। যুদ্ধের পর তাহাদের ভারতীয় আমানত বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। মোট ২২২ কোটি টাকার ভারতীয় ব্যাঙ্ক আমানতের মধ্যে ইহাই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অপর এক-তৃতীয়াংশ ৮০ কোটি টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে।

ইম্পিরিয়াল ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, এই দুই প্রতিষ্ঠানই বিদেশীয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন বলিয়া ইহাদের আমানতের টাকা ভারতীয় হইলেও তাহাদের নিকট ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এতদ্দেশীয়ের ঋণ লাভের ভরসা অল্পই। পণ্ডিত বিভাসাগর পাণ্ডে এবং স্যর বি, এন্, শর্ম্মা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 'পাবলিক ডিপজিট' যদিও ভারতীয় করদাতাগণের অর্থসম্ভূত, ইহা হইতে বিদেশীয় বণিকেরাই বেশীর ভাগ সাহায্য লাভ করে। পরন্তু এ দেশের অধিবাসীর আমানতের টাকা অনেক সময়েই এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি নিজের দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ভারতের বাহিরে দাদন করে, ইহাও সত্য।

ভারতীয় কোম্পানী বিধি অনুসারে গঠিত ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের উল্লিখিত পরিমাণ মোট ৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু এক কোটি টাকার উপর আমানত আছে এমন ব্যাঙ্ক দেশে বর্ত্তমানে মাত্র ৬টী—এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা, ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব্ মহীশূর, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ও পঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ৪টীই ইয়োরোপীয় কর্ত্তৃত্বাধীন বলিয়াই সর্ব্বাংশে ভারতীয় বলা চলে না। কাজেই হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতীয়-পরিচালিত দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানত ৪২ কোটি টাকার বেশী নহে; অর্থাৎ সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক-আমানতের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। ইহা হইতে পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে?

ধ্বংসের মধ্য হইতেই সৃষ্টি।

কিন্তু এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজনীয় জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্কিং আমাদের দেশে নূতন; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের এজেন্সি হাউস হইতে ইহার

উদ্ভব। হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক নামক এ দেশের সর্ব্ব-প্রথম যৌথ ব্যাঙ্ক আলেকজাণ্ডার কোং নামক এজেন্সি হাউস কর্ত্তৃক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত হয়। এই হাউসের সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যাঙ্ক ১৮৩২ সনে ফেল পড়ে। অতঃপর বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ও জেনারেল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া নামক দুইটী ব্যাঙ্ক ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনতিকালের মধ্যে ধ্বংস-মুখে পতিত হয়। এইবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে সরকারের প্রয়োজন এবং ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বাঙ্গালায় ১৮০৬, বোম্বাইতে ১৮৪০ এবং মাদ্রাজে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনটী প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক সৃষ্ট হয়। ১৮৯২ সালে রাজকৃষ্ণ দত্তের প্রতারণায় ফলে ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের দুরবস্থার একশেষ হয়, এবং সেই সময়েই কলিকাতায় কতকগুলি এজেন্সি হাউস ফেল পড়ায় ব্যাঙ্কের অবস্থা কিছুকালের জন্য এতটা কাহিল হয় যে, সেয়ারের মূল্য ৩০০০ হাজার টাকা হইতে নামিয়া ৫০০ টাকায় দাঁড়ায়। বোম্বাইতে কিন্তু প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ কর্ত্তৃক এইরূপ ভীষণ জালিয়াতির ফলে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে "ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই"কে একেবারে দরজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

এইরূপ নূতন নূতন সৃষ্টির ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া যৌথ প্রণালীর ব্যাঙ্কিংএর নীতি আমাদের গ্রহণ করিতে প্রায় একশত বৎসর কাটিয়া গেল। তাই পূর্ব্বোক্ত "হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দী পরে ভারতীয়ের ব্যাঙ্কস্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "আউদ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক" খোলা হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক (১৮৯৪), পিপল্‌স্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (১৯০১) এবং অমৃতসহর ব্যাঙ্ক (১৯১৪) প্রভৃতি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া আমরা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের যুগে আসিয়া পৌঁছাই। জাতীয়তার প্রথম উন্মেষে যে আন্দোলনে জাতির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাকে স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত করিয়া রাষ্ট্রে, সমাজে সাহিত্যে, শিল্পকলায় পরিস্ফুট করিয়াছিল, তাহা ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেও নব সৃষ্টির মহিমায় আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিল। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির অন্তরাত্মার সহিত সত্যকার পরিচয়ের ফলেই, স্বাদেশিকতার বিকাশ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে পূর্ণমাত্রায়ই ঘটিয়াছিল।

ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠার ফলে দেশের অর্থশক্তি সম্যক সংহত এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াই একমাত্র দেশের আর্থিক দৈন্য দূরীকরণ সম্ভব—এই সত্যকার দৃষ্টিই সেই সময়ে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন স্বদেশী ব্যাঙ্কের উদ্ভবের কারণ। আমাদের দেশে আজ যে আমাদেরই চেষ্টার ফলে, বাঙ্গালার প্রতি জেলায় বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে ক্রম-বর্দ্ধনশীল ছোট খাট ব্যাঙ্ক বা লোন অফিসগুলি জাতির সম্পদ্ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারও সূচনা সেই স্বদেশী যুগে। কিন্তু আবেগের মুখে যার সৃষ্টি, ভাবের আতিশয্যে বাস্তবকে সে প্রতিনিয়ত প্রতিহত করে বলিয়াই তার স্থায়িত্ব অনধিক। কাজেই ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত বৎসরত্রয়ব্যাপী ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের যে অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে, তাহাতে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা অনেকাংশে বিফলতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে সেই গৌরবময় যুগের কীর্ত্তি "বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক"ও নানা প্রতিকূল অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ১৯২৭ সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের পতন ও তাহার শিক্ষা।

বেঙ্গল ন্যাশান্যালের পতন বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক

ব্যবসায়ের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্য নিঃসন্দেহ। আমানতকারিগণের ক্ষতি ছাড়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্কিংএর ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে এই ব্যাঙ্ক যে কুঠারাঘাত করিয়াছে, সে অনিষ্ট আরও গুরুতর। তথাপি এই বিপদের মুখে দেশীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে পরস্পরের যোগাযোগের অভাবজনিত গোড়ার গলদ যে এত মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই অভিজ্ঞতার দিক্ হইতে পরম লাভ, এবং আজ এই সম্মেলনের অধিবেশনে বিভিন্ন জেলার ঋণপ্রতিষ্ঠানসমূহের পরস্পরের যোগসূত্রের উপর বাঙ্গালার ব্যাঙ্কিংএর বনিয়াদ নূতন গড়িবার যে শুভ চেষ্টা, তাহার সূচনা এইরূপ বিপ্লবের মধ্যেই সম্ভব। আজ ব্যক্তিস্বাভিমানের স্থলে আমাদের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে যে সংহতির বিকাশ, ইহাই বেঙ্গল স্যাশান্যালের বিলোপের শ্রেষ্ঠ দান। এই দুঃসহ বিপদকে এইভাবে গ্রহণ করিলেই বাঙ্গালার লুপ্ত সম্পদ বেঙ্গল ন্যাশান্যালের ব্যর্থতার মধ্যেই শুভ পরিণতি ঘটিবে। আজ অবসাদের জড়তা দূর করিয়া অতীতের অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সংহতি বিধান করিয়া বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক সঙ্ঘে মিলিত হইতে যে আপনারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ইহা বাঙ্গালার পক্ষে খুবই আশার কথা।

বেঙ্গল ন্যাশান্যালের পতনে বাংলার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস হ্রাস পাইয়াছে এবং আর্থিক ক্ষতিও হইয়াছে যথেষ্ট, এ সকলই মানি। কিন্তু তাই বলিয়া আজ পতনকে বড় করিয়া ধরিলে চলিবে না। উত্থান পতন প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী। পতনের সার্থকতা হয় তখনি—যখন উহার মধ্য হইতে সতর্কতা শিক্ষা করিয়া আমরা আরও অগ্রসর হই। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার আর যে কোন কারণই থাক না কেন, ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার (অরগ্যানিজেশান্) মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ না থাকা এবং অর্থসঙ্কটের সময় নিশ্চিত অর্থ সাহায্য করিতে পারে এরূপ যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ব্যাঙ্কের অভাবও অন্যতম কারণ।

বিশ্বাসের উপরই ব্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠা ; কাজেই কোনও সামান্য কারণে ব্যাঙ্কের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিলে ব্যাঙ্ক স্বভাবতই টলমল করে। সমস্ত আমানতকারিগণের টাকার চাহিদা মিটাইয়া আশঙ্কায় প্রশমিত করিতে প্রায়ই বাহিরের অর্থ সাহায্য প্রয়োজন হয় ; অনেক সময় ব্যাঙ্কের পক্ষে অন্যত্র সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেই সাধারণের আতঙ্ক কাটিয়া যায়। আমাদেরই মত ব্যাঙ্ক ফেলের মধ্য হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বর্ত্তমানে অন্য সকল দেশেই ছোট বড় অপরাপর ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য সঙ্ঘ ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক) গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ দেশের সমস্ত অর্থশক্তি একই ভাবে জাতির সাধারণ স্বার্থ-সংরক্ষণে সুনিয়ন্ত্রিত করিতেছে ; এবং ব্যাঙ্কিংকে শক্তিশালী করিয়া তাহার ক্রমোন্নতি সাধন করিতেছে। সংহতি শক্তি আজ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যুগান্তর আনিয়াছে। আর সেই শক্তির অভাবই আমাদের ব্যাঙ্কিংএর দুর্ব্বলতার গোড়ার কথা।

সহযোগিতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা প্রয়োজনীয়

১৯১৩ হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার মরশুম পড়িয়াছিল, তাহার কারণও পরস্পর সহযোগিতার অভাব। এই দ্বাদশ বৎসরে প্রায় ১৬০টা ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে ; তাতে শুধু আদায়ী মূলধনই নষ্ট হয় প্রায়

৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি পাউণ্ড; কাজেই ক্ষতির পরিমাণটা সহজেই অনুমেয়। এই ফেল পড়া ব্যাঙ্কগুলি প্রায়ই ছোট; ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮০টির মূলধন ১ লক্ষ টাকার কম। কাজেই নিজেদের মধ্যে বা কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে কেবলমাত্র সাময়িক কোনও প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা থাকিলে আমাদের দেশকে এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

ব্যাঙ্ক মাত্রেরই সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন মার্কিণও ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার ফলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। ব্যাঙ্কের ভিত্তি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত প্রথমে পরস্পরে মিলিত হইয়া ব্যাঙ্ক সেফটি ফাণ্ড নামক একটী রিজার্ভ ভাণ্ডার গঠিত করিল; কিন্তু বিপদের মুখে এই ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইলে দেশের সমগ্র ব্যাঙ্কিং অবস্থা একত্রীকরণের চেষ্টায় মার্কিণে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির উদ্ভব। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বর্ণের মালিক ছিল; তথাপি সেই সময়েই সারা দেশের ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা একান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হয়। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতার অভাবেই একস্থানের বাড়তি রিজার্ভ অন্যত্র প্রেরণ অসম্ভব ছিল, এবং চতুর্দ্দিকে ব্যাঙ্ক দুয়ার বন্ধ করিলে সর্ব্বসাধারণের আতঙ্কের মুখে সুদৃঢ় ব্যাঙ্কেরও মোটা উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়াছিল। পরস্পরের সাহায্যে যে আতঙ্ক প্রারম্ভেই প্রশমিত করা যাইত, মাত্র সঙ্কীর্ণতার জন্য তাহা দেশময় ছড়াইয়া ব্যাঙ্ক মাত্রকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। ইহার ফলেই ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যোগসূত্র সংস্থাপনের জন্য ১৯১৪ সনে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির প্রণয়ন। আমাদের দেশের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের যে বর্ত্তমান উন্নতি, তাহার মূলে কেন্দ্রীয় প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের সৃষ্টি এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার প্রবর্ত্তন।

ফেডারেশন ও ফেডারাল ব্যাঙ্ক

বাঙ্গালীকে আজ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। আজ পরস্পরের সাহায্যে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কিংএর ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই জন্য ফেডারেশন গঠন ও ফেডারেল ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব খুবই সময়োপযোগী সন্দেহ নাই। কারণ বিপদের মুখে অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য লাভের আশা আমাদের পক্ষে দুরাশা মাত্র। বড় বড় বিদেশীয় পরিচালিত ব্যাঙ্ক যে আমাদের ঋণ ব্যবসায়কে তাহাদের স্বার্থের বিরোধী এবং প্রতিযোগী হিসাবে দেখে, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে ক্যারনারি ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯২০ সনে ব্যাঙ্কের প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, "অ্যালায়ান্স ব্যাঙ্ক" এই দেশী ব্যাঙ্কটীর উপর এতটা বিরূপ ছিল যে, ইহার প্রতি চেক ভাঙ্গাইতে ১৲ টাকা করিয়া ফি আদায় করিত। ইহা ছাড়া এই ব্যাঙ্কটিকে কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউস্এ প্রবেশাধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছিল। "সিমলা অ্যালায়ান্স ব্যাঙ্ক" ১৯২৩ সনে ফেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহার দায় গ্রহণ করে, অথচ পঞ্জাবের "পিপল্‌স ব্যাঙ্ক" ১৯১৩ সনে যখন প্রায় একশত ব্রাঞ্চসহ ফেল পড়িল, তখন "ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল" কোম্পানীর কাগজের উপরেও টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হয়; উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, "অ্যালায়ান্স ব্যাঙ্ক" বিদেশীয় পরিচালিত এবং পিপল্‌স্ ব্যাঙ্ক" দেশীয় প্রতিষ্ঠান। এই

দেশীয় ব্যাঙ্কের আমানতীকারী প্রত্যেককে লিকুইডেটরগণ সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাময়িক সাহায্যের অভাবেই এত বড় জাতীয় প্রতিষ্ঠানটী বিধ্বস্ত হইল। আমাদের মধ্যে যদি কিছু দেশাত্ম-বোধ থাকে তবে এই কঠোর শিক্ষা যেন আমরা না ভুলি।

বর্ত্তমান যুগে সঙ্ঘ এবং সংহতি ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং প্রাণস্বরূপ বলিয়াই আমি এই বিষয়ে এত কথার অবতারণা করিয়াছি। ঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক দেশেই সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। এক লণ্ডনেই এমন ৫টী সঙ্ঘ আছে; (১) ব্রিটিশ ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশান্, (২) দি কমিটি অব লণ্ডন ক্লিয়ারিং হাউস [৩) দি ব্রিটিশ ওভারসিজ্ ব্যাঙ্কারস' এসোসিয়েশান (৪) দি ইন্‌ষ্টিটিউট অব ব্যাঙ্কারস (৫) দি ব্যাঙ্ক অফিসারস্ গিল্ড। জার্ম্মাণীর সেন্ট্রাল ফেডারেশান অব্ ব্যাঙ্কস অ্যাণ্ড ব্যাঙ্কারস এবং আমেরিকার ব্যাঙ্কারস এসোসিয়েশান রহিয়াছে; ক্লিয়ারিং হাউস ও কতকটা পরিমাণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখে।

অভারতীয় স্বার্থপ্রণোদিত বিদেশীয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাঙ্কের প্রতি যোগিতায় দেশীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রসারলাভ করিতে হইলে আমাদের পক্ষে যে এইরূপ ব্যাঙ্কসঙ্ঘ সংস্থাপন করা কত প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আত্মবিস্মৃত; অধঃপতিত জাতির একতা সুদুর্ল্লভ; তাই রাষ্ট্র ও সমাজে আমরা শতধা বিচ্ছিন্ন। অধিকন্তু হীন সাম্প্রদায়িকতার ভাব সমাজ-দেহ ছাড়িয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এক নূতন সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের মধ্যে আজ যে সন্দিগ্ধ বিরোধ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের একত্ব ক্ষুণ্ণ করিতেছে, তাহা যেমন ক্ষতিকর তেমনই নিরর্থক। সঙ্ঘ যেখানে অবিচ্ছেদ্য, সন্দিগ্ধতা সেখানে মঙ্গলকে পীড়নই করে। বিশেষতঃ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার স্থান মোটেই নাই। তাই আজ কলিকাতাও মফঃস্বলকে সম্মিলিতভাবে বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে নিজের যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে হইবে।

আপনাদের মধ্যে কোনরূপ ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার ভাব ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবে না, এ ভরসা আমার আছে। মাত্র সাময়িক বিপদে পরস্পরের সহায়তা ছাড়া এইরূপ সংঘগঠনের যে আরও উপকারিতা আছে, তাহার প্রতিও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এইরূপ ব্যাঙ্ক-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় পত্রিকা-পরিচালন, হিসাব রক্ষণ প্রণালীর পুস্তিকা প্রণয়ন, আধুনিক উন্নত প্রণালীর ব্যাঙ্কিং শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন বোধে ব্যাঙ্কিংএর উন্নতি-বিধায়ক আইন প্রবর্ত্তক প্রভৃতি কার্য্য ব্যাঙ্ক সঙ্ঘ উপযুক্ত সাহায্য পাইলে গ্রহণ করিতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটীতে দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা দাবী করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিবকে তার প্রেরণ করিয়া এবং ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া দেশীয় ব্যাঙ্কের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে সঙ্ঘ যাহা করিয়াছে তাহা প্রশংসার্হ। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস মাত্রেরই অর্থ সাহায্যের জন্য ফেডারেল ব্যাঙ্ক নামক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনও সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

এই ত গেল সঙ্ঘ সম্বন্ধে বক্তব্য; এখন

সাময়িক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। ঋণ প্রতিষ্ঠান ত দেশে বাড়িয়াই চলিয়াছে; বর্ত্তমান ইহাদের সংখ্যা অন্যূন ৬০০ শত। লভ্যাংশের উচ্চ হারেই প্রমাণ যে অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও ইহাদের সার্থকতা কতটা। ইহাদের মূলধন মোটের উপর ১০ কোটি টাকা ধরা যাইতে পারে। ইহাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই; তবে গত বৎসর ফেডারেশনের রিপোর্টে এ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানিতে পারা যায় ফেডারেশন যে ৫৭টী প্রিতষ্ঠানের সহিত পরিচিত আছে, তাহাদের আদায়ী মূলধনও রিজার্ভ সমেত মোট মূলধন ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকটি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। এই ৫৭টী প্রতিষ্ঠানর শুধু আমানতই ২ কোটি টাকার উপর।

কাজেই এ কথা আজ স্বীকার্য্য যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ফলে দেশে আপামার সাধারণের ভিতরও ব্যাঙ্কের সহিত লেন দেন করিবার অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে সমবায় ঋণ সমিতিগুলির কথাও উল্লেখ করা চলে, কারণ তাহাদের আমানতের পরিমাণও ক্রমেই আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে আমাদের তথাকথিত গুপ্ত সঞ্চিত ধনের কিয়দংশ ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিদেশীয়-পরিচালিত ব্যবসায়ে দেশের অবাধ শোষণ, চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্যের পীড়ন সত্ত্বেও ইংরেজ অর্থ নৈতিকগণের মুখে ভারতের সঞ্চিত ধনের কথা শুনিয়া আসিতেছি। লর্ড কার্জ্জনের উক্তিতে প্রকাশ যে, ইহার পরিমাণ ৮২৫ কোটি টাকা। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে দেশের বহু অর্থ ব্যবহারের স্থান হইতে দূরে পড়িয়া আছে। ব্যাঙ্কের প্রসার না হইলে এরূপ সব দেশেই হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকার কথা বলা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কের বহুল প্রসারের পূর্ব্বে তথায়ও এইরূপ অবস্থা ছিল। কাজেই পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের কিয়দংশ যে ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া ব্যবসায়ে খাটিতেছে, তাহা একান্ত আপনাদেরই কৃতিত্বে বলিতে হইবে।

এই ভাবে সংগৃহীত মূলধন দেশীয় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া যতই স্থানীয় কৃষিতে ও ব্যবসায়ে খাটে, ততই দেশের মঙ্গল। মফঃস্বলে এইসকল ব্যাঙ্ক-স্থাপনের ফলে চাষী অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা পায় এবং "ওয়াশীল ছুট' প্রভৃতি মহাজনের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে আমাদের ব্যাঙ্ক প্রভৃতির অন্যবিধ দাদনের তুলনায় চাষের জন্য দাদনের পরিমাণ কম; কাজেই মহাজনের সহিত প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা সামান্য। কারণ এফ, ডি, এস্কলি সাহেবের মতে প্রতি ১৫০ চাষীর মধ্যে মাত্র ১ জন ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পায় এবং যেখানে চাষের জন্য ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমাণ এক টাকা, সেখানে মহাজনের দাদন ২৫৮ টাকা। কাজেই চাষের জন্য দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত যে খুব বেশী কিছু করিয়াছে এমন কথা বলা যায় না।

বর্ত্তমান দাদন-প্রণালীর দোষ

অথচ মোটের উপর দাদনই আমাদের দেশীয় ভাগ; কিন্তু সে দাদন চাষীর কাছে ততটা নয়, যতটা জমীদারের কাছে। ফলে অনেক স্থলেই জমীদারি ব্যাঙ্কে পড়িয়া স্থাবর সম্পত্তি বাড়িতেছে বটে; কিন্তু ব্যাঙ্কের প্রধান অবলম্বন চলতি অর্থ যে ভাবে কমিয়া যাইতেছে তাহা বিশেষ আশঙ্কার

কথা। তা ছাড়া বিদেশীয় ব্যাঙ্কগুলি যেমন আমাদের সর্ব্বসাধারণকে কোনও সুবিধা না দিয়া কেবল বিদেশীয় বণিক্ বা মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠাবান লোকের সহিত কাজ কারবার করে, আমাদেরও অনেক প্রতিষ্ঠানেরই সেই অবস্থা। ব্যবসায় চলে শুধু ধনী ও জমীদারগণের সঙ্গে। কাজেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের আমানত মফঃস্বলের কৃষি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে অল্পই ব্যয়িত হয়। ইহাদের টাকা ঋণস্বরূপ জমিদারের হাতে গিয়া বিলাস-ব্যসনের নিমিত্ত ব্যয়িত হয় এবং সেই ঋণের সুদ প্রত্যক্ষভাবে জমিদারদের দিতে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা আসে মহাজন নিপীড়িত চাষীর গ্রাসাচ্ছাদন হইতে।

কিন্তু দুর্দ্দশার শেষ এখানেও নয়। দেশের চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য দেশের অর্থে পুষ্ট না হওয়াতেই দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের অধিকাংশই রেলী ব্রাদার্স প্রভৃতি বিদেশীয় বণিকের অর্থ পুষ্ট গোমস্তার অধীন। মূলধনবিহীন অপরাপর অনুন্নত দেশেরই মত,কাঁচা মালের খরিদ্দার বিদেশীই আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যেরমূলধন সরবরাহ করিতেছে। ইহার ফলে চাষীকে তৃতীয় দফার সুদ গুণিতে হইতেছে। কিন্তু এই দুষ্ট ব্যাধির কুফল আরও মারাত্মক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দেশের বাণিজ্য বিদেশী বণিকের অধীন বলিয়াই গ্রামে গোমস্তাদের নির্দ্দেশক্রমেই চাষবাস দেশের প্রয়োজন ক্ষুণ্ণ করিয়া বহির্ব্বাণিজ্যের প্রয়োজন মতই হইয়া থাকে। কাজেই ধান, গম প্রভৃতি খাদ্য শস্যের পরিবর্ত্তে পাট, তুলা প্রভৃতি রপ্তানির কাঁচা মালের চাষ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এদিকে ধান চালের রপ্তানিও বৃদ্ধি পাইয়া দেশে অন্নাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। বিদেশীয়ের অর্থে আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রণের এমনি বিষময় ফল; ইহা বিশেষ করিয়াই দেশীয় ব্যাঙ্কের উন্নতি-প্রয়াসী কর্তৃপক্ষগণের প্রণিধানযোগ্য।

মহাজনের দাদনের সুদের হার হইতে ব্যাঙ্কের হার কম বটে; তথাপি এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে,গরীব দেশের পক্ষে বর্ত্তমানে আমাদের ব্যাঙ্কের সুদের হার নিতান্ত কম নহে। কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত কৃষকদের সাধারণতঃ দাদনের সময়। শেষের দিক্‌টায় টাকার টানাটানি খুবই বেশী হয়; কাজেই হ্যাণ্ডনোট, মর্টগেজ প্রভৃতিতে সুদের হার যদিও গড়পড়তায় মাসিক ২৲ টাকা করিয়া পড়ে, অনেক স্থানেই সেই সময় মাসিক ৩৷৵০ সুদেও টাকা কর্জ্জ পাওয়া দায় হয়। এই হারে ২ বৎসর ৮ মাসের মধ্যেই মূলধন সুদের টাকায় দ্বিগুণিত হয়। এইরূপ মফঃস্বলে বার্ষিক শতকরা ৩৭৷০ সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া চাষবাস কি অন্ত কোনও ব্যবসায় সম্ভব কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়। অথচ ব্যাঙ্কিং ব্যতিরেকে যেমন ব্যবসায় বাণিজ্য অচল, তেমনি ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়াও ব্যাঙ্কিংএর প্রসার সম্ভব নয়। কাজেই দেশীয় ব্যাঙ্কিংএর পক্ষে সুদের হার অপেক্ষাকৃত কমাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের পোষকতা করিলে ব্যাঙ্কিংএর কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে দাদনের সুদের হার কমান যেমনি প্রয়োজন, ঋণ-প্রতিষ্ঠান হইতে বিশেষ করিয়া চাষেরই জন্য ঋণদানের ব্যবস্থাও তেমনি আবশ্যক। আমেরিকার ফেডারেল ফারম্ লোন এবং আমাদের সমবায় সমিতির রীতি অনুসারে, চাষী যাহাতে ঋণের টাকা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বৃথা ব্যয় না করিয়া একমাত্র কৃষিতেই ব্যয় করে, তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। এইরূপ

অপরিণামদর্শীর ন্যায় ব্যয়ে চাষীর ঋণের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে, অথচ পরিমিত ব্যয় হইলে যে টাকা চাষীর হাতে সঞ্চিত হইয়া মূলধন স্বরূপে ব্যাঙ্কে আসিত, তাহাও আসিবে না। ইহা দেশের পক্ষে যেমন অমঙ্গলকর ব্যাঙ্কের পক্ষেও তেমনি হানিজনক। ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি মেঘ রূপে পরিণত হইয়া অজস্র বারিবর্ষণে যেরূপ সমগ্র ভূখণ্ডকে উর্ব্বর করিয়া তোলে, সেইরূপ সামান্য সামান্য সঞ্চয়ে পুষ্ট ব্যাঙ্কের ভাণ্ডার হইতে মূলধন-রাশি যখন দেশের ও সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে জাতিকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তোলে, তখনই তাহার বাস্তবিক সার্থকতা।

খাঁটি ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং শিক্ষা

এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দেশে যাহাতে এইরূপ খাঁটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রচার হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্কটল্যাণ্ড দেশের গ্রামে গ্রামে এইরূপ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার ফলে তথাকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ব্যাঙ্ক নামে প্রায় ৬০০ শত ব্যাঙ্ক চলিতেছে বটে, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেকেরই অর্থ আদান প্রদানের রীতি তথাকথিত "বিধবার ব্যবসা"র নামান্তর মাত্র। ইহার আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এই চিরাচরিত মহাজনী কারবার ছাড়িয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন বর্ত্তমান কালের প্রয়োজন অনুসারে নূতন নূতন পথে তাহাদের অর্থ-শক্তিকে নিয়োগ করিতে হইবে। বাণিজ্য, সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন এবং অর্থ-বিনিয়োগের নব নব উপায় উদ্ভাবন,—ইহাই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রাণ।

আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মধ্যে যে ইহা নাই তাহার কারণ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ পরিচালকের অভাব। মিঃ কেইন্‌স এই মতের পোষকতা করেন এবং ভারতীয় ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশনও দেশীয় ব্যাঙ্কের দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ব্যাঙ্ক পরিচালন শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার এবং কমিশনের অন্যতম সভ্য পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ইহার প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জাপানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে জাপান আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যে এতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার মূলে পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যাঙ্কিং শিক্ষার প্রকৃত প্রচলন। প্রথমে প্রিন্স ইটো এই শিক্ষার নিমিত্ত আমেরিকায় প্রেরিত হন এবং তাঁহারই উপদেশক্রমে জাপানে আশাতীত ব্যাঙ্ক প্রভৃতির উদ্ভব।

পাশ্চাত্য দেশে এই ব্যাঙ্কিং শিক্ষার জন্য ব্যাঙ্কার্স্‌ ইন্‌ষ্টিটিউট গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে উপযুক্ত শিক্ষাদানের পর শিক্ষার্থীগণকে ডিপ্লোমা দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষা দিবার আর একটী প্রধান উপায় অর্থনীতি শাস্ত্রে শিক্ষিত যুবকগণকে ব্যাঙ্কের কার্য্যে নিয়োগ করা। ইহাতে একাধারে জ্ঞানলাভ ও কার্য্য-পরিচালনা শিক্ষা করিয়া ইহারাই পরে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠে এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতির নূতন পথ উদ্ভাবন করিতে পারে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের দেশেও এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে জানিয়া অনেকে আশান্বিত হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের উচ্চ পদে ভারতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ

করিবার যে কথা ছিল, তাহাতে ভারতীয় যুবকগণ এই শিক্ষায় যথেষ্ট সুযোগ পাইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতীয় কর্মচারীদিগের প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যেরূপ আচরণের কথা শুনা যায় তাহাতে নিরুৎসাহ হইতে হয়। ভারতীয় কর্মচারিগণের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের দায়িত্বপূর্ণ পদে বিলাত হইতে সদ্য আমদানি করা অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্ক ইংরাজ কর্মচারিগণ বহাল হইয়া থাকে ; অথচ ব্যাঙ্কের মক্কেলগণের সহিত সহজ মেলামেশার সুযোগ থাকায় কার্য্য-পরিচালনের যোগ্যতা ভারতীয় কর্মচারীর অনেক বেশী এবং কর্ম-কুশলতায়ও তাঁহারা কোন অংশে বিদেশীয় কর্মচারিগণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কাজেই ব্যাঙ্কিং শিক্ষার প্রচলন আমাদিগকে নিজের চেষ্টাতেই করিতে হইবে।

আপনারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কমার্স বা অর্থনীতি বিভাগের গ্রাজুয়েটগণকে আপনাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করিলে একটা উপায় হইতে পারে। ইহাদের উপযুক্ত বেতন দিতে যদি কিঞ্চিৎ ব্যয়াধিক্যও হয় তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না। ইহাতে আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের যেমন উপজীবিকার একটা ব্যবস্থা হইবে, ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ উন্নতিকল্পে আপনারাও তেমনি বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাইবেন। তাই এ ভার আজ আপনাদের গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাঙ্কার্স ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যাঙ্কসঙ্ঘ করিয়াছেন। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই।

টাকার বিজন চলাটানির ফলে আমাদের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা হয় তাহাও আজ আপনাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। দলগুলির গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে হইবে, এবং প্রয়োজন ও সুবিধামত দেশের সর্ব্বত্র পরস্পরের মধ্যে অর্থের অবাধ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করিলেই এই অসুবিধা কিছু কমিতে পারে বা প্রত্যেক লোন কোম্পানীর এই অভিজ্ঞতা আছে যে, চাষের সময় মফঃস্বলে টাকার টানাটানি হয় ; আর তখন কলিকাতায় টাকার বাজার মন্দা। আবার কাঁচা মালের রপ্তানির সময় কলিকাতা প্রভৃতি বন্দরে মফঃস্বলের অনুপাতে টাকার চাহিদা খুবই বেশী। তথাপি দেশময় ঋণদানের অবাধ বিস্তার নাই বলিয়াই পরস্পরের লেনদেনের চাহিদা মিটাইবার উপায় হয় না। চাই বিশ্বাস। বিশ্বাসের ফলে পাশ্চাত্য জাতিমাত্রেই ব্যাঙ্কের মূলধন দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া দুনিয়াময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার একান্ত অভাবেই আমাদের মূলধনের গতিবিধি একেবারে রুদ্ধ।

ফেডারেল ব্যাঙ্কের উপকারিতা

এই শোচনীয় পঙ্গুত্ব ঘুচাইতে পারিলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত হইবে আর এই অচল মূলধন সচল হইলে আপনারাও বিশেষ লাভবান হইবেন। প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যাঙ্কের সৃষ্টি আপনাদের এই পথের সহায়ক হইবে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলিকাতার কম সুদের টাকা মফঃস্বলে এবং মফঃস্বলের বাড়তি ভাণ্ডার কলিকাতায় সরবরাহ সহজসাধ্য হইবে। খুব অল্প ব্যয়ে টাকা চালান এবং হুণ্ডিও কাটা যাইবে। বিভিন্ন জেলার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এবং কলিকাতার ও মফঃস্বলের মধ্যে পরস্পরের টাকার আদানপ্রদান অতি সহজে এবং স্বল্পব্যয়ে এই ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া চলিতে পারে। কাজেই কলিকাতা প্রভৃতি

বড় সহরে বড় বড় ব্যাঙ্কের মধ্যে দেনা পাওনা যেমন টাকা আদান প্রদান না করিয়া শুধু ক্লিয়ারিং হাউজের খতিয়ানে দেনা পাওনার অঙ্কের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়াই চলে, তেমনি ফেডারাল ব্যাঙ্কের সাহায্যেও বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানসমূহের এই কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

ফেডারেল ব্যাঙ্কই পরস্পরের মধ্যে ক্লিয়ারিং হাউজের কাজ করিবে। গ্রাম্য ব্যাঙ্কের খাতকগণের দলিলপত্র বা অন্য উপযুক্ত সিকিউরিটি বন্ধক রাখিয়া ফেডারেল হইতে রি-ডিস্কাউণ্টের নিয়মানুসারে অনতিদীর্ঘকালের জন্য প্রতিষ্ঠানমাত্রেরই টাকা ধার পাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূল নীতি এই রি-ডিস্কাউণ্টিং প্রণালীই কলিকাতার টাকায় মফঃস্বলের আর্থিক দৈন্য দূর করিবার একমাত্র উপায়। ফেডারেল প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি বাংলার ৬০০ শত লোন আফিস ও ব্যাঙ্কের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাজেই কলিকাতায় মত টাকার বাজারে ফেডারেল ব্যাঙ্কের প্রেফারেন্স সেয়ার বিক্রয় বা আমানত-সংগ্রহ দুঃসাধ্য না হইবারই কথা। অতএব আজ ফেডারেল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় আপনারা বদ্ধ পরিকর হউন, ইহা আমাদের বিনীত নিবেদন।

এই সূত্রে দেশীয় ব্যাঙ্কের একটা অভাবের কথা আসিয়া পড়ে। প্রত্যেক দেশেই প্রয়োজন অনুসারে এক্সচেঞ্জ, কমার্শিয়াল, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল, রুর‍্যাল, ল্যাণ্ড মর্টগেজ প্রভৃতি ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে এক্সচেঞ্জের কাজও সম্পূর্ণ বিদেশীয়ের হাতে; বাণিজ্যও সেইরূপ বিদেশীয়-পরিচালিত এবং "ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক"এর অর্থে পুষ্ট। দেশীয় বড় ব্যাঙ্কও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেরই অনুকরণে কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। দেশের শ্রম-শিল্পের উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে কোনও ব্যাঙ্ক নাই। কৃষিতেও তথৈবচ। অথচ এই দুই পথেই বাংলার অন্তর্ব্বাণিজ্য অর্থশালী অ-বাঙ্গালীগণ দখল করিয়া লইতেছে। বিশেষ ভাবে এইজন্য দাদনের ব্যবস্থা না থাকিলে এদিকে কিছু করিয়া উঠা অসম্ভব।

চাষীর ঋণ-পরিশোধের জন্য চাষ হইতে ফসল বিক্রী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু সমবায় সমিতি বা আপনাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত বিশেষ কোন কৃষিব্যাঙ্কও আমাদের দেশে নাই। লোন আফিসের আমানত বেশীর ভাগ স্থির (ফিক্সড্) বলিয়াই, কৃষিতে দাদন কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবপর। কিন্তু উহাদের দাদন বেশীর ভাগ জমির উপর এবং সুদের হারও উচ্চ। কাজেই চাষীকে ফসল উঠিলে মন্দা বাজারের জন্য বাধ্য হইয়াই গোমস্তার হাতে গিয়া পড়িতে হয় এবং সেও দরের সুবিধা করিয়া নিতে ছাড়ে না।

ব্যাঙ্কের গুদামে ফসল জামিন রাখিয়া যদি চাষার পক্ষে ঋণ পাইবার ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহাকে গোমস্তার শরণাপন্ন হইয়া মন্দা বাজারে মাল ছাড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আর চাষীর মালের উপর বাজার দর হইতে কিছু হাতে রাখিয়া বক্রী টাকা দাদন করিলে ব্যাঙ্কের লোকসানের কোনও কারণ থাকে না। অথচ চাষীর মাল ধরিয়া রাখিয়া সুবিধা দরে বিক্রী হইলে, ব্যাঙ্কের সুদের টাকা সহজেই আদায় এবং ক্রমে চাষীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কেরও প্রসার সুনিশ্চিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এস্থলে সমবায় ঋণদান সমিতির কার্য্যের কথা উল্লেখ করিব। রাজসাহী জেলার নওগাঁ অঞ্চলে গাঁজা সমবায় প্রভৃতির কথা আপনারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন।

সমিতি প্রথমতঃ গাঁজা চাষের জন্ত টাকা ধার দিয়া থাকে এবং পরে স্থানীয় উৎপন্ন সমস্ত গাঁজা বিক্রয়ের ভার লইয়া দালালের হাত হইতে চাষীকে উদ্ধার করিয়াছে। পাটের চাষে ও ধান, রেশম এবং অন্তান্ত বিষয়ে সমবায় সমিতি দ্বারা এইরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সমবায় সমিতি যাহা করিয়াছে বা করিতেছে, আপনারা ভার লইলে আরও বিস্তৃতভাবে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে।

বাঙ্গালীর দৈন্ত ঘুচাইতে আপনাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। চাষার কাঁচা মাল ব্যাঙ্কের গুদামে রাখিয়া বিক্রয়ে লাভবান্ হওয়া সম্ভব ; বাঙ্গালী ব্যবসাদার আমদানী তৈয়ারী মালও ব্যাঙ্কের মারফতে ধারে ক্রয় করিতে পারে। ইহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবসায় ক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ লাভ করা সহজ হইবে। আজ বিশেষ করিয়া এইভাবে অন্তর্ব্বাণিজ্যে টাকা খাটাইয়া আপনারা প্রকৃত ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করুন।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটী

আমাদের বক্তব্যের শেষে বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের সম্মুখে যে সমস্তা আসন্ন হইয়াছে তাহারই আলোচনা করিতে চাই। আপনারা জানেন ভারতীয় ব্যাঙ্ক পরিচালন বিধিবদ্ধ করিবার জন্ত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এক তদন্তের প্রস্তাব হইয়াছে এবং তদন্ত কমিটি কিরূপ হইবে তাহাও প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছে। ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের যে সঙ্কটের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পরই দেশের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক তদন্ত ও তৎ-সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের কথা বিশেষ ভাবে উত্থাপিত হয়।

ব্যাঙ্কের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং আমানতকারীগণের স্বার্থ সংরক্ষণই হইল আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্ত। সুতরাং দেখা দরকার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসারের জন্ত আইনের বাস্তবিক আবশ্তকতা আছে কি না। পূর্ব্বোক্ত সঙ্কট সত্বেও ইহা সত্য যে, অন্তান্ত দেশের তুলনায় বিগত ২৫ বৎসরে আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কিংএর প্রসার খুবই আশাপ্রদ ; আর কোনও রকম আইনের সাহায্য ব্যতিরেকেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। বিখ্যাত ব্যাঙ্কার হার্টলী উইদার্সএর মতে আইন অপেক্ষা নিপুণ, নিষ্ঠাবান, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীই ব্যাঙ্কের উন্নতির অধিকতর সহায়ক। ডক্টর রজার্সও এই মতের পোষকতা করেন। আইনের সাহায্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাইবার চেষ্টা করিলে সাধারণের মধ্যে একটা নিশ্চেষ্টতার ভাব আসিবে এবং ক্ষমতাও পঙ্গু হইবে। অভিজ্ঞ, কর্ম্মকুশলএবং বিশ্বস্ত ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীরাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড। সরকারী বিধি-নিষেধে আর যাহাই হউক এইরূপ লোক সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

তবে আইনেরও প্রয়োজন আছে ; কিন্তু যে অবস্থায় প্রয়োজন হয়, সে অবস্থা আমাদের এখনও আসে নাই। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় এখন নানা রূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছে। ব্যাঙ্ক পরিচালনে আমাদের দেশের অবস্থার উপযোগী কোনো নিজস্ব প্রণালী এখনও আমরা সৃষ্টি করিতে পারি নাই। ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে তবেই তাহার স্থায়িত্ব বিধানের জন্য আইনের সাহায্য প্রয়োজন হইতে পারে। লর্ড মেষ্টনের মতেও জাতি মাত্রেরই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি স্বীয় চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতার ফলেই হইয়া থাকে। যাহাই হউক ব্যাঙ্ক তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না ; কিন্তু বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিকূলতা

যাহাতে ভারতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করিতে পারে তন্নিমিত্ত উক্ত কমিটিতে নিরপেক্ষ ভারতীয় সভ্যগণের প্রাধান্য থাকা আবশ্যক। অথচ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটি গঠনের যে প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাতে ভরসা বিশেষ নাই; কারণ তাহাতে অ-ভারতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এই তদন্ত এবং ইহার ফলে যদি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোন আইন প্রবর্তন হয় তাহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ব্যাঙ্ক জাতির ভাগ্যবিধাতা

যে কথা এতক্ষণ ধরিয়া বার বার বলিলাম উপসংহারে সেই কথারই পুনরুল্লেখ করিব। আপনাদের পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিব যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্চ হারে ডিভিডেণ্ড যোগাইবার যন্ত্র মাত্র নহে। আপনাদের কর্ত্তব্যকে এইভাবে সঙ্কীর্ণ করিবেন না। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ এবং জাতীয় জীবনে উহাদের দানও অতি মহৎ। মনীষী অধ্যাপক কোন্যাণ্ট যে আপনাদিগকে "জাতির ভাগ্যবিধাতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। আমাদের এই বিধ্বস্ত ও বিপ্রস্ত জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠন করিবার জন্য আমরা আপনাদের দিকেই চাহিয়া আছি। এই ঐশ্বর্য্য দেশের নষ্টশ্রী পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে, এই মহান্ লক্ষ্য লইয়াই আপনারা কাজ করুন।

যে ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ দিয়া এই স্বর্ণপ্রসূ ভূমির সম্পদরাশি বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, সেইপথেই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সে শক্তি আপনাদের হাতে আছে এবং সে দায়িত্বও আপনাদের হাতে আছে; আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে পুনর্গঠিত করিতে আপনাদের এই শক্তি যদি প্রয়োগ না করেন তাহা হইলে অচিরে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য এবং এই শোচনীয় পরিণামের দায়িত্ব হইতে ইতিহাস আপনাদিগকে মুক্তি দিবে না। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও অর্থ, অর্থনৈতিক জীবন গঠনের এই তিন উপাদানের মধ্যে প্রধান উপাদান অর্থ আপনাদের নিকট গচ্ছিত। আমার শেষ অনুরোধ আপনারা সেই অর্থ জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থ সাধনে নিয়োগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। দেশের ইতিহাসকে নূতন করিয়া গড়িতে সহায় হউন। বন্দেমাতরম্।

বাংলা দেশে যত বিদেশী পরিচালিত ব্যাঙ্ক আছে তাহার প্রায় সব গুলিতেই বাঙ্গালী ধনীরা লক্ষ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত রাখেন; ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ এই টাকা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগকে ধার দিয়া তাহাদিগকে আপদে বিপদে এবং ব্যবসা বিস্তারে সাহায্য করেন। দুই চারিজন নিতান্ত নামজাদা লোক ছাড়া সাধারণতঃ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ এই সকল ব্যাঙ্ক হইতে কাজ কারবার চালাইতে কোনও সাহায্য পায় না। স্বজাতীয়ের দুঃখ দুর্দ্দশা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি যে জাতির এতটুকু দরদ বা দূরদৃষ্টি নাই, সে জাতির স্বরাজ লাভের আশা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক।

চায়ের চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রায় প্রত্যেক চায়ের জমিতেই জৈব পদার্থের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়—এই জন্য ঐ সমস্ত জমিতে সার আকারে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন করে। অন্যান্য দ্রব্যেও জৈব পদার্থ থাকলেও গোবর ও চোনাতেই তা থাকে সবার চেয়ে বেশী—এবং এই কারণেই গোবর ও চোনার ব্যবহারই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

টাটকা গোবর, চোনা ও জঞ্জাল একত্রে মিশ্রিত করে তখনি সার রূপে ব্যবহার কর্ত্তেও চলতে পারে বটে, কিন্তু তবুও প্রায় কেহই তা ব্যবহার করে না; কেননা টাটকার চেয়ে পচা গোবর, চোনা ইত্যাদির শক্তি ও কার্য্যকারিতা ঢের বেশী। কিন্তু গোবর, চোনা প্রভৃতিকে যেমন তেমন অবস্থায় ফেলে রেখে দিলে চলবে না—সেগুলোকে রক্ষা কর্ত্তে হবে দস্তুর মত যত্ন সহকারে —অবশ্য যদি আমরা তাদিগকে সার রূপে ব্যবহার কর্ত্তে চাই।

সার হিসাবে গোবরের চেয়ে চোনার মূল্যই বেশী। কাজেই সার সংগ্রহ বা সঞ্চয় করবার সময় সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে একটু চোনা না নষ্ট হয়ে যায়। গোবর ও চোনার সহিত প্রয়োজন মাফিক জঞ্জাল মিশিয়ে দিলেই চোনা আর গড়িয়ে পালাতে পার্ব্বে না।

গোবর চোনা প্রভৃতি জমিয়ে রাখবার জন্যে সাধারণতঃ তিন চার রকমের পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথম ও সবার চেয়ে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে একটা সিমেণ্ট করা মেঝেবিশিষ্ট নীচু অবরুদ্ধ ঘরে ঐগুলিকে খড় কুটো জঞ্জালের সহিত একত্রে মিশ্রিত করে রাখা এবং মাঝে মাঝে গো-মহিষাদির পায়ের চাপে সেগুলিকে পিষ্ট ও কর্দ্দমাক্ত করে ফেলা। দ্বিতীয় এবং সকলের চেয়ে কার্য্যকরী উপায় হচ্ছে একটা আচ্ছাদিত গর্ত্তের মধ্যে মূত্র পুরীষাদি রক্ষা করে মাঝে মাঝে তার উপর শুক্‌না মাটি ও জঞ্জালাদি নিক্ষেপ করা। আর তৃতীয় এবং সহজ উপায় হচ্ছে—একটা অনাবৃত স্থানে রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে ঐগুলিকে স্তূপীকৃত করে রাখা। কিন্তু শেষের উপায়টি সর্ব্বাপেক্ষা সরল হলেও এ ভাবে মূত্র পুরীষাদি রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় নয় কেননা ঐ পদ্ধতিতে ঐ সমস্ত সারের সারত্ব বহুল পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। কি ভাবে সার রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত ও লাভজনক তাই দেখাবার জন্যে মাদ্রাজ প্রেসীডেন্সীর কৃষিকেন্দ্রের একটা পরীক্ষার ফলাফল আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করলাম। এই তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রেই পাঠক বুঝতে পার্ব্বেন মূত্রপুরীষাদি কী ভাবে রক্ষা কর্‌লে তাতে কী পরিমাণ সার পদার্থ বর্ত্তমান থাকে।

প্রথম পদ্ধতির ফলাফল।

	ছয় বছরের গড়	১৯১০-১১
জৈব পদার্থ *	৫৭-৫৫	৬৮-৬২
ফস্ফরিক এসিড্	·৯২	·৯৬
পটাশ	৩-৩	৩-৫৮
অদ্রবনীয় পদার্থ	২৯-১১	১৮-৮৭
নাইট্রোজেন *	১-৯৯	২-৩২

দ্বিতীয় পদ্ধতির ফলাফল

	ছয় বছরের গড়	১৯১০-১১
জৈব পদার্থ *	৪৪-২২	৬৭-৭৬
ফস্ফরিক্ এসিড	০-৭৯	০-৮১
পটাশ	২-২২	২-৮৩
অদ্রবনীয় পদার্থ	৪০-৩১	১৯-৩৭
নাইট্রোজেন্ *	১-২২	১-১২

তৃতীয় পদ্ধতির ফলাফল।

	ছয় বছরের গড়	১৯১০-১১
জৈব পদার্থ *	৩৬-৮০	৪৯-৭৫
ফস্ফরিক্ এসিড্	০৭০	০-৬৬
পটাশ	১-৫৬	১-২৬
অদ্রবনীয় পদার্থ	৫২-৮৫	৪১-০৩
নাইট্রোজেন্ *	০-৭৪	৬-৭৩

গোবর সার এমনি জমির উপরে ছড়িয়ে দিয়ে তারপর মাটি খুঁসে দিলেও চল্‌তে পারে। তবে সবার চেয়ে ভাল পদ্ধতি হ'ল প্রত্যেক দুইসারি চা-ঝোপের মাঝখান দিকে বরাবর লম্বা এক একটা ১৬।১৭ ইঞ্চি গভীর খাদ কেটে সেগুলিকে গোবর সারে পূর্ণ করে দেওয়া।

আরও একটা উৎকৃষ্ট সার হ'ল বীল-মাটি। গলিত উদ্ভিজ্জ বা পচা বোদ মাটিকেই বীল মাটি বলে। এই মাটিতে সাধারণতঃ শতকরা ১ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। সাররূপে যে বীলমাটি ব্যবহৃত হবে তা খুব উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ও যথেষ্ট জৈব পদার্থ পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ চা-বাগিচাতেই কাল রঙের যে তথা কথিত ভীল্‌মাটি ব্যবহৃত হয়—তা নিতান্তই অসার পদার্থ। সারের নামে এইরকম অসার পদার্থ প্রয়োগ কর্‌লে জমির উন্নতি ত হয়ই না বরং ঠিক তার উল্‌টা ফলই ফলে থাকে। বাগানে খাদ কেটে যে ভাবে গোবর সার প্রয়োগ করা হয়—সেই ভাবে ভীল মাটি বা পচা বোদ মাটি ব্যবহার কর্‌লেও মন্দ ফল পাওয়া যায় না।

এতক্ষণ আমরা প্রাকৃতিক সারের বিষয়ই আলোচনা কর্‌ছিলাম—এইবার কৃত্রিম বা রাসায়নিক সার পদার্থের কথা বলব। বলা বাহুল্য প্রাকৃতিক সার বলতে গোবর, বীলমাটি প্রভৃতিকেই বুঝায়, আর কৃত্রিম সার অর্থে বুঝা যায় নাইট্রেট, পটাশ, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতিকে।

প্রথম যেদিন কৃত্রিম বা রাসায়নিক সারপদার্থের উপযোগীতা উপলব্ধি করা হয়—তার পর থেকে বহুকাল চলে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐ সমস্ত দ্রব্যের বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই আজও মনে করেন যে কৃত্রিম সার ব্যবহার কর্‌লে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়। তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণা এমনই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে তর্ক বা যুক্তিতে হেরে গেলেও এবং মনে মনে তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও ঐগুলিকে নিঃশংক চিত্তে নিজেদের চাষের জমিতে প্রয়োগ কর্ত্তে সাহস করেন না। উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবই তাঁদের ইত্যাকার অদ্ভুত মনোবৃত্তির কারণ। কৃষকদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত

কৃত্রিম সার প্রাকৃতিক সারের শত্রু নয়—প্রাকৃতিক সারকে তুলে দিয়ে তার স্থানে বিদেশীর নিকট দাম দিয়ে কেনা কৃত্রিম সার ব্যবহারের পক্ষপাতী আমরাও নই। তবে আমরা ঐগুলোকে প্রয়োগ কর্ত্তে বলছি প্রাকৃতিক সারের পরিপূরক হিসাবে।

মজুর যে রকম দুর্ম্মূল্য ও অল্প, তাতে দিন দিন ক্ষেত্রের আয়তন বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। অথচ দুঃখের সহিত জানাতে হচ্ছে, অধিকাংশ চাষীরই ঠিক ঐ দিকেই একটা প্রবল ঝোঁক থাকতে দেখা যায়। মজুরের যোগান যেখানে কম সেখানে বিস্তৃত চাষের চেয়ে আত্যন্তিক চাষ বা intensive cultivationই ভাল।

খারাপ জাতের গাছ যদি বাগানে থাকে তাহলে সে গুলিকে উপড়ে ফেলে তার স্থানে ভাল জাতের গাছ রোপণ কর—জমির উৎপাদিকা শক্তির যদি কম হতে থাকে, উপযুক্ত সার প্রয়োগ ক'রে তার লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধার কর—পুরাতন জমিতে চাষের সকল রকম সুব্যবস্থা কর্ব্বার পূর্ব্বে নূতন জমিতে হাত দিও না—তবেই তুমি চা চাষ করে লাভবান হতে পার্ব্বে।

ব্যাপক ভাবে চাষ করার চেয়ে আত্যন্তিক চাষের একটা খুব বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, এতে খরচ পড়ে অপেক্ষাকৃত কম এবং নিজেদের সমস্ত বাগান পরিদর্শন কর্ব্বার ও যথেষ্ট সুবিধা হয়। কাজেই খারাপ ভাবে অনেক জমি চাষ করার চেয়ে ভাল ভাবে অল্প জমি চাষ করা সকল দিক দিয়েই শ্রেয়স্কর।

পূর্ব্বে প্রাকৃতিক সারের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কৃত্রিম সার সম্বন্ধে ও অনেক কথাই আমরা বলেছি। তথাপি আর একবার তাদের গুণাগুণ ভাল করে যাচাই করে দেখা দরকার।

নাইট্রোজেন্ চা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে ফস্ফরিক্ এসিড্ ও পটাশ প্রয়োগ না করে কেবল মাত্র নাইট্রোজেন ব্যবহার কর্লে হিতে বিপরীত হবারই সম্ভাবনা; কেন না সে ক্ষেত্রে গাছ গুলি সহজেই—ছাতা ধরা (fungaid diseases) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়।

নাইট্রোজেন্ জনিত সার পদার্থ সমূহের মধ্যে নিম্ন লিখিত দ্রব্য কয়টাই প্রধান। যথা—নাইট্রেট অব্ সোডা, নাইট্রেট্ অব্ পটাশ, নাইট্রেট অব্ লাইম, সালফেট্ অব এমনিয়া, নাইট্রোলিম্ খৈল, গোয়ানো (guano এক প্রকার পক্ষীর মলজাত সার বিশেষ) মাছের সার, শুক্না রক্ত, হাড় চূর্ণ ইত্যাদি।

উপরোক্ত সার কয়টীর মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ নাইটেট্ অব সোডা (সোডা মিশ্রিত যবক্ষার লবণ) নাইট্রেট অব পটাশ (উদ্ভিদ্ ক্ষার মিশ্রিত যবক্ষার লবণ) এবং নাইট্রেট অব-লাইম (চূর্ণক মিশ্রিত যবক্ষার লবণ) অতি সহজেই জলে গলে যায়। কাজেই যে সমস্ত স্থানে অধিক মাত্রায় বারিপাত হয় সে সমস্ত স্থানের বাগানে নাইট্রেট ব্যবহার না করে তার পরিবর্ত্তে সহজে দ্রবীভূত হয় না এমন সমস্ত সার পদার্থ ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সাল্ফেট অব এমনিয়া সহজে জলে দ্রবীভূত হয় না; অথচ গাছ পালা এই জিনিসটা অতি দ্রুত গ্রহণ কর্ত্তে পারে। নাইট্রোলিম্ প্রয়োগে ও যথেষ্ট সুফল পাওয়া যেতে পারে; কেন না এর ভিতর যে চুণের অংশ রয়েছে, সেই চুণ মাটিকে শক্তিশালী করে তোলে; অথচ নাইট্রোলিম্ থেকে নাইট্রোজেন্ গ্রহণ কর্ত্তে চা-গাছের আদৌ কোন কষ্ট হয় না।

খৈল, গোবর প্রভৃতি সারেও নাইট্রোজেন্ আছে কিন্তু ঐ নাইট্রোজেন্ গ্রহণ কর্ত্তে গাছেদের

একটু বিলম্ব হয় কেন না আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, রাসায়নিক বিশ্লেষণ আরম্ভ না হলে বা জীবাণুর কার্য্যকারীতায় একটা পরিবর্ত্তন না এলে ঐ গুলা থেকে কোন খাদ্যই গ্রহণ করা গাছ পালার সাধ্য নাই।

এই ত গেল নাইট্রোজেনের কথা। তারপর ফস্‌ফরিক্ এসিড। ফস্‌ফরিক্ এসিড প্রয়োগ করলে গাছ খুব তাড়াতাড়ি মোটা ও বড় হয়ে ওঠে কেন-না বৃক্ষদেহের অধিকাংশই প্রধানতঃ ফস্‌ফরিক্ এসিড দিয়ে তৈরী হয়। নাইট্রোজেনের জন্য যে সমস্ত সার পদার্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সে গুলির মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে ফস্‌ফরিক্ এসিড ও বর্ত্তমানে তাছাড়া নিম্ন লিখিত জিনিস কয়টীতে ফস্‌ফরিক্ এসিড দেখতে পাওয়া যায় সুপার ফস্‌ফেট, বেসিক্ প্র্যাগ, খণিজ বা ধাতব ফস্‌ফেট (mineral phosphates) এবং পশ্বাদির অস্থি চুর্ণ। ঐ কয়টী দ্রব্যের মধ্যে গুণের দিক দিয়ে সুপার ফস্‌ফেট ও বেসিক্ প্র্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুপারফস্‌ফেট হল একটা দ্রবণীয় পদার্থ। কাজেই এই জিনিসটা জলে গলে গিয়ে মাটির চারিদিকে সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সহজেই শিকড় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়ে গাছের কল্যান সাধন কর্ত্তে পারে। অনেকেই মনে কর্ত্তে পারেন তা হলে ত সুপারফস্‌ফেট অল্প বৃষ্টি পাতেই ধুয়ে ড্রেনের জলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়। কেন না ফস্‌ফরিক্ এসিড চুণ ও লৌহের সংস্পর্শে এলেই অদ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয়; এবং লৌহ ও চুণ—সকল মাটিতেই বর্ত্তমান। কাজেই ধোয়াটের সঙ্গে ফস্‌ফরিক এসিড বেরিয়ে যাবার কোন সম্ভব নেই।

বেসিক্‌প্র্যাগ জলে গলিত হয় না বটে, কিন্তু দুর্ব্বল এসিডের সংযোগে ইহা অতি শীঘ্রই দ্রবীভূত হয়। আবার ঐ ধরণের এসিড প্রায় সমস্ত বাগানের মাটিতেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে; কাজেই বেসিক্ প্র্যাগ থেকে ফস্‌ফরিক এসিড্ গ্রহণ করা বৃক্ষাদির পক্ষে নিতান্ত কষ্ট কর ব্যাপার নয়। বিশেষতঃ বেসিক্ প্র্যাগের মধ্যে চুণের অস্তিত্ব থাকায় অনেক চাষী সারের মধ্যে ঐ জিনিসটাকে খুব উচ্চ আসনই দিয়ে থাকে। তার পর পটাশ। গাছের দেহে যে কার্ব্বো—হাইড্রেট রয়েছে—সে এই পটাশ থেকেই উৎপন্ন হয়। পটাশের প্রয়োগে শুধু যে গাছের স্বাস্থ্যোন্নতিই হয়, তা নয় - চায়ের উৎকর্ষতা ও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ মিউরিয়েট এবং সাল্‌ফেট অব পটাশই সার রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঐ গুলি সহজেই দ্রবীভূত হয়ে মাটির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বলে পটাশ গ্রহণ করার পক্ষে গাছের খুব সুবিধা হয়।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি

[অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু, বি-এ]

বিদ্যাসাগর মহাশয়-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই জানেন, আর বলাও হয়েছে অনেক। চণ্ডী বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে প্রকাণ্ড জীবন-চরিত বের করেছেন, তাতে অনেক কথাই তাঁর সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলা হয়েছে। তবে তাঁর "আট পৌরে" জীবনের দু'একটা কথা আজ পাঠকদের কাছে আমি বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে কথা কইতে গেলে অনেক অবান্তর কথা এসে পড়বে, সেগুলো না বল্‌লে চল্‌বে না—কারণ সেগুলো আনুষঙ্গিক কথা।

আমার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে অনেকেই আমাকে এই সমস্ত কথা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপার গুলো যা' আমার জানা আছে,—তা প্রকাশ কর্‌তে বলেন বটে, কিন্তু আমার শক্তি ও সামর্থ্যের উপর আস্থা নাই, লিপিকুশলতার উপরও বিশ্বাস নাই ব'লে, এত দিন হ'য়ে ওঠে নি। আজ তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হ'লাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখবার সুযোগ আমার প্রথম হয়েছিল, যখন তাঁর বয়স আন্দাজ ৫০।৫২ বৎসর হবে। তখন আমি Duff College এ পড়ি। তবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কর্‌বার অবসর পেয়েছিলাম তাঁর শেষ জীবনের ১৬।১৭ বৎসর মাত্র, কেন না তিনি ১৮৯১ সালে মারা যান; আমি ১৮৭৪ কি ৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌বার প্রথম অবসর পাই, তখন তাঁর বয়স আন্দাজ ৬৪ কি ৬৫ বৎসর হবে। তাঁকে প্রথম দেখি আমাদের পাঠদশায়। সে সময়ে Calcutta Reading Room বলে এক পাঠাগার ছিল। সেখানে নানা সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রাদি থাক্‌ত। ভৈরব বাঁড়ুয্যে ম'শায় তার সম্পাদক ছিলেন। সেখানে এক দিন এক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি Mr. W. C. Bannerjee নামে বিশেষ পরিচিত, তিনি সে সভায় ছিলেন। তিনি এক জন সুপরিচিত বক্তা ছিলেন। ইংরাজী ভাষা তাঁর বিশেষরূপে আয়ত্ত ছিল, তাঁর ভাষার নৈপুণ্যও ছিল। তিনি অনর্গল সাধু ভাষায় এমন বক্তৃতা দিতে পার্‌তেন যে, অনেক সাহেব তাঁর বক্তৃতার সুখ্যাতি কর্‌তেন। শুধু বক্তৃতা কেন, ইংরাজী চলন-বলনও বেশ নিখুঁতভাবে অনুকরণ করে ছিলেন। তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ম'শায় বলেছিলেন, "ইংরাজী ধরণ এমন সম্পূর্ণভাবে নিতে বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেউ পারে নি। রুমালে নাকঝাড়াও হুবহু মত ইংরাজী কায়দায় কর্‌তেন। বিলাতে অন্যানর অধিকারের অধিকারী কর্‌বার জন্য তিনি এমন সব পন্থা অবলম্বন কর্‌তেন যাতে তাঁর

সন্তান বিলাতে ভূমিষ্ঠ হয়। বাস্তবিক পক্ষে তখন সাহেবিয়ানারই যুগ ছিল। আমাদের ছাত্র জীবনে আমরা তখন ইংরাজী ছাড়া বাংলা একরকম বলতামই না। কোথাও কিছু বলতে হলে সকলে মুখস্ত করে যেত, অন্ত অন্ত বই থেকে চুরি করে সকলে বলত। তাতেই খুব বাহবা পাওয়া যেত। অনেকেই অবশ্য নিজে নিজেই কিছু বলতে পার্‌তেন। এ হেন ইংরাজী-য়ানার যুগের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন—বিদ্যাসাগর মশায়। আমরা সব ইংরাজী-নবীশের দল সেখানে ছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছ থেকেও ইংরাজী শুনব। কিন্তু তিনি সবাইকে সেখানে হাসাতে আরম্ভ করলেন। এক এক জনের বক্তৃতা হয়ে যায় আর তিনি অন্ত এক জনকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, "এইবার তুমি একটু বল বাবা, বল তুমি একটু বল।" তাঁর বলবার এমনি ভঙ্গিমা যে প্রতি কথায় হাসির ধুম পড়ে যেতে লাগল। তাঁর জন্ত তামাক এল, তিনি মুহুর্মুহুঃ তামাক খেতেন। আমার কিন্তু খুব বিরক্তিকর হয়েছিল। মনে হ'ল ইনি পাগল না কি? সেই পোষাক, খেলো হুঁকো হাতে, উড়ের মত মাথা কামান, আর সেই লোকহাসা-বার ধুম। এমন কি Mr, W, C, Bannerjee ও বাঙালী যুবকে হাসতে লাগলেন। আমার কিন্তু তখন আশাভঙ্গ হয়েছিল, খুব নিরাশ হ'য়ে ফিরে এসেছিলাম।

এ ঘটনার এক বৎসর পরে "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌" এর বিদ্যাসাগর ম'শায়ের সংস্করণের একখানি বইয়ের জন্ত তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি অনেক কথার পর একটা দিন ঠিক করে আমাকে আসতে বলে দিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে দেখি তিনি অনেক লোকের সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করছেন। আমি সেটা উপযুক্ত সময় না বুঝে, অন্ত এক দিন দেখা করলাম; তাঁর কিন্তু স্মরণশক্তি এমন ছিল যে আমি সেই নির্দিষ্ট দিনে কেন আসি নাই সে কথা আমাকে দেখেই জবাব চাইলেন। আমি সব কথা বলতে আমায় বললেন, "বোকা ছেলে, কায হারাতে আছে কি? দেখা কর্‌লে তখনই তোমায় বই পে'ত।"

তারপর বি-এ পাশ করার পর এক দিন Metropolitan Schoolএর একজন শিক্ষক অনুপস্থিত হওয়ায় তাঁর জায়গায় কাজ করতে যাই। তখন সেখানে ছেলেদের মারবার নিয়ম ছিল না। আমি 4th Class কি 5th Classএ অঙ্ক কষাচ্ছি। এক ছেলে বড় গণ্ডগোল কর্‌ছিল; আমি হাতের বইখানা ছুঁড়ে তাকে মার্‌লাম। ছেলেটিও বেঁকে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আমাকে আপনি মারলেন?" আমি বল্‌লাম, "তোমায় মারলাম? —না বইখানা ছুঁড়ে দিলাম?" এ সময় তাঁর সঙ্গে এক আধবার দেখা হত।

যখন আমি এম-এ পড়ায় নিযুক্ত, সে সময় আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কষ্টে পড়েও পড়াশুনা ছাড়িয়ে দলে। এই সময়ে Metropolitan Collegeএ একজন শিক্ষকের মনঃসংযোগে যুক্ত হয়। আমি সেই পদে নিযুক্ত হলাম। F-A. Classএ ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, ও তর্ক-শাস্ত্র পড়াতে হ'বে। আমি কায দিলাম ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে। তখন ৩০ টাকা মাহিনা ছিল, প্রায় ১০০।১২০ ছেলে পড়ত। অনেকের বয়স আমার চেয়ে বেশী ছিল। সব ছেলেদের কাছে ইংরাজীতেই সব বলতে হত, আমার ও খুব কম হত।

পড়াতে পড়াতে শুন্‌তে পেলাম একটি ছেলে আমাকে লক্ষ্য করে বল্‌লে "গলাটি বেশ।" যাই হোক, সে কালে ছু'তার কথা আমাদের বলা অভ্যাস ছিল বলে ক্লাসে ইংরাজীতে পড়াতে বিশেষ অসুবিধা হ'ত না। সে সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত সুরেন্দ্রনাথও হন নি, Sir উপাধিও পাননি) এখানে সাহিত্য পড়াতেন, ২ ঘণ্টা করে। এখান থেকে তিনি তখন ২০০৲ টাকা করে পেতেন। ঠিক সময়ে তিনি রোজ গাড়ী করে আস্‌তেন,— যেন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া—ছুটে Libraryতে যেতেন, Webster's Dictionary সঙ্গে নিয়ে ছুটে ক্লাসে যেতেন। তিনি খুব ভাল রকম ইংরাজী বল্‌তে পারতেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও খুব ভাল ছিল। আদৌ অহঙ্কার ছিল না। কোনও বানান সন্দেহ হলে আমাদের কাছে "এটা কি হবে, ওটার কি বানান্" এ রকম জিজ্ঞাসা কর্‌তে দ্বিধা কর্‌তেন না। আমরা তাঁকে নেতা বলে মেনে নিতাম। সকলেই তাঁর মুখের কথা শুন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। ছেলেদের সভা সমিতির অধিবেশনে তিনিই সভাপতি হতেন। একটী ছেলে খুব মেধাবী ও প্রতিভা-সম্পন্ন ছিল। শ্যামপুকুর স্কুল থেকে সে প্রথম স্থান অধিকার করে, এখানে কলেজে পড়তে আসে; তার নাম ছিল দুর্গাচরণ সরকার; ছেলেটী একটু বোকা, একটু ময়লা ছিল। তারও বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। সুরেন্দ্রনাথের নীচেই তার স্থান দেওয়া হ'ত। দু'জনেরই বাক্য স্রোত অনর্গল ব'য়ে যেত।

এই সময়ে Metropolitan College F. A. তে প্রথম স্থান অধিকার কর্‌লে। তার ফলে রাশি রাশি ছেলে এসে কলেজে ভর্ত্তি হতে লাগল। তখনও B. A. পড়ার প্রথমে হত না; কেননা বাঙ্গালী দ্বারা B. A. ক্লাস চালান তখন এক রকম অসম্ভব ছিল। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু Free B. A. Class খুল্‌লেন। ছেলে এল ৩২ জন। অনেক বড় বড় ছেলে এসেও ভর্ত্তি হল। আমার চেয়ে ১০ বছরের বড় ছেলেকে পড়াতে বাস্তবিকই হৃৎকম্প হ'ত! তা ছাড়া আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এম্-এ পরীক্ষার জন্য বিষয় নির্ব্বাচন করেছিলাম,

Evidence of Christianity. ফলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হলাম। অথচ বি-এ ক্লাসের লজিক বিষয় পড়াবার ভার আমার উপর ন্যস্ত থাকায় খুবই ভয়ে ভয়ে কাজ কর্‌তে হ'ত। বড় বড় ছেলেদের পড়াতে হ'ত বলে খুবই সশঙ্কিত হ'য়ে থাকতে হ'ত। তা ছাড়া বিদ্যাসাগর মশায়ের এই ব্যবস্থা ছিল,—সেটা তাঁর দোষই বলুন আর গুণই বলুন—যে প্রত্যেক শিক্ষককে তিনি মাঝে মাঝে বল্‌তেন তাঁর ক্লাসের দুটি ভাল ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তিনি বাদুড়বাগানের বাড়ীতে তাঁর Libraryতে ছেলে দুটিকে নিয়ে গিয়ে নানা কথার মধ্যে কোন্ শিক্ষক কি ভাবে পড়ান্, তাঁর দোষ গুণ কি, এই সব ছেলেদের কাছ থেকে সব খুঁটি নাটি জেনে নিতেন। এক দিন আমি ঘটনাক্রমে সেখানে গিয়ে পড়ে দেখি একটী ছেলে আমাদের নামে নানান্ খানা করে বলে আমাদের টিটকারি কর্‌ছে। সে বক্তার ছেলে নয়, আমাকে সেখানে থাকতে দেখেও সে যে সুরে গান গাইতে আরম্ভ করেছিল সেই সুরেই গেয়ে যেতে লাগল? এমন কি N. Ghose মশা-য়েরও পরিত্রাণ ছিল না। সে ছেলেটির নাম আর প্রকাশ করবার দরকার নাই। কিন্তু যাই হোক বিদ্যাসাগর মশায় আমাকে তাঁর ছেলের চেয়েও বেশী ভাল বাস্‌তেন।

বিদ্যাসাগর মশায়ের Library তাঁর বড় প্রিয় জিনিষ ছিল। তিনি অনেক বহুমূল্য এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য বই বিলাত থেকে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে যত্ন করে Libraryতে রাখতেন। একদিন এক জমিদারের ছেলে তাঁর সঙ্গে এই Libraryতে বসে কথাবার্ত্তা বলছেন, এমন সময় একখানা বইয়ের বাঁধা লক্ষ্য করে খুব সুখ্যাতি করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, "হাঁ, এটা মরক্কো চামড়া দিয়ে বিলাত থেকে বাঁধিয়ে এনেছি, বাঁধাই খরচা ১০৲ টাকা পড়েছে।" ভদ্রলোকটি একটু অবাক্ হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা বইখানা বাঁধাতেই যখন ১০৲ টাকা পড়ল, তখন বইখানার দাম কত?" বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, "বইখানার দাম ৫৲ টাকা।" লোকটি তখন বল্লেন, "দেখুন অনেককে বলতে শুনেছি আপনার একটু পাগলামি আছে, এখন দেখছি কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। এক খানা বই বাঁধাতেই খরচ করলেন ১০৲ টাকা অথচ বইখানারই দাম মোটে ৫৲ টাকা!" বিদ্যাসাগর মশায় তখন তাঁর সঙ্গে এ-কথা সেকথা কইতে কইতে হঠাৎ এক টুকরা মোটা দড়ী কুড়িয়ে নিয়ে ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, বল ত বাপু এই দড়ীর টুকরাটার দাম কত হ'তে পারে?" তিনি বললেন, "ওর আর দাম কি হ'বে, এক টুকরা দড়ী বৈ ত নয়?"

বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, "তবুও চারটে পয়সা দিলে তবেত এ-রকম এক টুকরা দড়ী পাওয়া যেতে পারে? আচ্ছা বেশ। আর তোমার ঐ ঘড়ীর চেইন ছড়ার দাম কত হবে, ৫০০৲ টাকা? তা হ'লে বাপু, যে কাজ চার পয়সার খুব হতে পারে তার জন্তে ৫০০৲ টাকা খরচ করতে তুমি কুণ্ঠিত নও। তা হ'লেই বেশী পাগল কে হ'ল বাপু?"

তাঁর আর এক স্বভাব ছিল—সময়ে অসময়ে তিনি পাল্কী ক'রে কলেজে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের পড়ান নিজে শুনতেন। এমনি করে একদিন আমার পড়ান শুনছেন, আমি জানতে পারিনি। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পড়াচ্ছ না ছেলেদের দাবাড়ী দিচ্ছ?" আমি চীৎকার করে পড়াচ্ছিলাম, অনেক ছেলে কি না।

তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে প্রায়ই বলতেন, "বি-এ ক্লাস খুলেছ, কিন্তু তেমন ভাল লোক কই? শেষকালে কি মুখ হেঁট হ'বে?" তিনি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতেন, "কি রে পড়া শুনা কেমন হচ্ছে? এম-এ টেনে এনে দেব?" বাস্তবিক তখন বি-এর পাঠ্য এক হিসাবে শক্ত ছিল। ছেলেরা কিন্তু আমাকে ভালবেসে বলেছিল, "ওঁর কাছেই পড়ব।"

সে বার কলেজ থেকে ৩২টী ছেলে বি-এ পরীক্ষা দিতে যায়। বিদ্যাসাগর ম'শায় বললেন, "দেখ, পরীক্ষার ফল যদি ভাল না দাঁড়ায়, তা হলে সার্কুলার রোড ধরে বাগবাজার হ'য়ে ট্র্যাণ্ডরোড দিয়ে সেই যে কর্ম্মাটাঁড়ে চলে' যাব, কল্‌কাতায় আর মুখ দেখাব না।" দায়িত্ববোধ আমার খুবই ছিল। যাহোক পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশ হল, তখন দেখা গেল ৩২ জনের মধ্যে ১৯ জন ছেলে পাশ হয়েছে। এর মধ্যে "A" Course এ ২২জন ছেলে আর "B" Course এ ১০ জন ছেলে ছিল। তা দেখা গেল শুধু Philosophy "A" Course এর ২২ জনের মধ্যে ২১ জন পাশ হয়েছে। আমার আনন্দও খুব হয়েছিল, তাঁর নজরেও পড়েছিলাম। কিন্তু তখন আমার বেতন ছিল ৮০৲ টাকা মাত্র। আমি বেতন বৃদ্ধির জন্ত কথা তুলেছিলাম। বিদ্যাসাগর মশায় তাতে মুখে বলেছিলেন, ১০০৲ টাকা দিতে হবে না কি?" এখন

কিন্তু সে কথা মনে হলে লজ্জা করে। তাঁর কাছে এ সম্বন্ধে কিছু উত্থাপন করা খুবই আমার পক্ষে অশোভনীয় হয়েছিল, কেননা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আমার বেতন অনবরত বেড়ে বেড়ে অচিরে ২৮৫৲ টাকা হয়েছিল।

পরের বৎসর "A" Course এ ৬৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে যায়, তা'র মধ্যে Philosophyতে ৬২ জন পাশ করে। পরিশ্রম করে যত্ন নিয়ে পড়ালে ছেলেরা পাশ কর্‌তে পারে এ কথা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের এখানে বাস্তবিক পক্ষে তেমন পড়ান হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দোবস্তও সব সময়ে সব বিষয়ে ভাল বলে' মনে হয় না। টাকা জমা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে মায় পরীক্ষার ফল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় ৬ ছয় মাস কেটে যায়। তাতে ছাত্রদের অনেকটা সময় হাঙ্গাম', হুজুক আর উৎকণ্ঠায় কেটে যায়।

যা হ'ক এই সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম হ'ল, ছেলেরা বি- এ পরীক্ষায় Honoursএ পরীক্ষা দিতে পারবে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের কলেজ থেকে একটী ছেলে (নাম তার যোগেন্দ্র কুমার সিংহ) বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করে। আর সেই একটী মাত্র ছাত্রই সে বিষয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। আমার তাতে খুব উৎসাহ বেড়ে গেল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন "গফ" সাহেব—১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা তাঁর বেতন। তিনি নিজের কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইস্তাহার দিলেন যে তাঁর দেওয়া মনোবিজ্ঞানের "নোট" আর বাহিরে যেতে পাবে না। সকলে যেন সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকে। যেন ব্যাপারটা এই হচ্ছে এক বেসরকারী কলেজ যখন প্রথম হ'ল তখন তাঁর note নিশ্চয়ই out হয়েছে! কেননা তাঁর noteএর উপর নির্ভর না করে' কেউ প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে না।

এই সময় Students Associationএর আনন্দ মোহন বসু মহাশয় সিটি কলেজ খুলতে মনস্থ করেন। সুরেন্দ্রবাবু সেখানে ১ঘণ্টা করে পড়াবেন বন্দোবস্ত হয়। বেতন পাবেন মাসিক ১০০৲ টাকা। বিদ্যাসাগর ম'শায় কিন্তু একথা শুনে তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ বৈদ্যনাথবাবুকে বলে' দিলেন, "সুরেনকে বলো সিটি কলেজে সে পড়াতে পারবে না, আমি তাকে ৩০০৲ টাকা করে দেব। আর তা যদি না হয় আমার এখানে কাল থেকেই আসা বন্ধ করতে বল।" তাঁর নিজের শক্তি, ক্ষমতা ও কৃতিত্বের উপর এই রকমই বিশ্বাস ছিল। সুরেনবাবু কিন্তু এ কথা শুনে একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বলেছিলেন, "তিনি এ কথা বল্‌লেন, তাই ত—কিন্তু আনন্দমোহনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব আছে—তাকে কথা দিইছি—তাই ত।"

সুরেনবাবু চ'লে যাবার পর আমরা কিন্তু বড়ই মন-মরা হ'য়ে গেলাম। ছেলেরা ত বেশ মরে রইল। তাঁর যায়গায় এলেন সূর্য্যকুমার আচার্য্য মশায়—তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভুক্ ছিলেন, মনোবিজ্ঞান তিনি পড়াতে লাগলেন। আমাদের সকলেরই কিন্তু তাঁকে ভাল লাগত না, ছেলেদের ত কথাই নাই। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু বল্‌লেন, "এই কলেজে সুরেন্দ্র কতটুকু represent করে? সে যা পড়াত তাতে হিসাব ক'রে দেখলে, যে কটা paper হয় এক্‌জামিনের জন্যে তাতে সে মাত্র ⅛th represent করে। তা এত করে যদি সুরেন্দ্র না হ'লে কলেজ না

চলে, তা' হ'লে বল্‌তে হবে আমি কেউ নই, আমি তাহলে মরে গেছি! ছেলেদের বলে দাও সুরেন না থাকলে যারা এ কলেজে থাক্‌তে না চায় আমি তাদের সকলকে certificate দেব।" এমনিই তাঁর নিজের উপর বিশ্বাস ছিল।

তখন বড়লাট রিপণ সাহেবের আমল। দেশ বারস্তাসাহেবের হুজুকে খুব মেতে গেছে। সহর আলোতে বাজিতে জমজমাট হ'য়ে উঠল। সুরেন বাবু তাঁর নামে তখন রিপণ কলেজ খুলে দিলেন। বিদ্যাসাগর মশায় এ কথা শুনে বলেছিলেন, "সুরেনকে জিজ্ঞাসা কর, আনন্দ মোহনের প্রতি Sentiment এখন কোথায় গেল?"

একবার মেমারি ষ্টেশনে নেমে ৪ ক্রোশ দূরে এক জায়গায় যাবার দরকার হয়। গাড়ী ভাড়া কর্‌তে গিয়ে শুন্‌লেন তারা ৮৲ টাকা চায়। তিনি একজন মুটে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত রাস্তা হেঁটে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে এক জন নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আসার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে তর্ক কর্‌তে এসেছিলেন। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু "আমি তর্ক টর্ক কর্‌তে জানি না বাপু" বলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বড় আশায় নিরাশ করেছিলেন। সেখানে একটা ব্রাহ্মণের ছেলে ঘর পুড়ে যাওয়াতে তাঁর কাছে এসে দুঃখ জানায়। সে কতদূর পড়েছে, তার কে আছেন ইত্যাদি সব খবর নিয়ে তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে সংস্কৃতের টাইটেল পরীক্ষা দেওয়ান; পরে স্কুলে তাকে একটি ৩০৲ টাকার কাজ করে দেন।

চন্দননগরে একবার তিনি পথে দেখ্‌তে পান একটা পাগল ছেলে কেবল হাস্‌ছে। আর রাস্তার যত সব লোক তাকে নিয়ে খুব হাসছে। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু ছেলেটার অবস্থা দেখে নিজেকে সংবরণ কর্‌তে পার্‌লেন না। তাঁর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল বুক ফেটে গেল। উপস্থিত লোকেরা এই দেখে রং তামাসা বন্ধ করে' সব স্তম্ভিত হয়ে গেল! লোকের দুঃখে তাঁর প্রাণ এমনি করে চিরকালই কাঁদ্‌ত। তিনি সেই ছেলেটাকে কলকাতায় নিজের বাড়ীতে এনে বিধিমতে চিকিৎসা করাইয়াছিলেন।

একবার চন্দননগর থেকে আস্‌বার সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে দেখলাম খুব ভীড় হয়েছে। বাদুড়বাগানে আস্‌বার জন্য একখানা গাড়ী ভাড়া কর্‌তে গেলাম—তা ১॥০ টাকা ভাড়া চাইলে। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু অযথা খরচ কর্‌তে বড়ই নারাজ ছিলেন, এ ত সকলেরই জানা আছে। যা হ'ক লোকের ভিড়ের মধ্যেই গাড়ীর জন্য দর কষাকষি হচ্ছে এমন সময় তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে তিনি হারিয়ে গেলেন খুঁজে পেলাম না অনেক খুঁজলাম, "বিদ্যাসাগর মশায়" বলে চীৎকার করে' ত সেই ভীড়ের মধ্যে তাঁকে ডাকতে পারি না। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে আমি অগত্যা একা বাদুড়বাগানে চলে এলাম। এসে দেখি বিদ্যাসাগর মশায় সেখানে হাজির হয়েছেন। তিনি আমায় বল্লেন—"তুমি যে আস্‌বে তা আমি জান্‌তাম। কি জান—যখন ১॥০ টাকা ভাড়া চাইতে লাগল তখন তোমাকে কিছু না বলে, আমি আস্তে আস্তে সরে পড়লুম। পুলটা পার হয়ে এসে দুআনা পয়সা দিয়ে এক খানা গাড়ী ভাড়া করে' বাদুড়বাগানে চলে এলুম।

এক দিন দেখি শাহুলার জোত দিয়ে তিনি আসছেন, চাদরটী উঁচু হয়ে আছে।—আমাকে

বল্লেন—"এই খেরালদার ও দিকে গিয়েছিলুম, তা সেখানে কপি সস্তায় পেলুম, নিয়ে যাচ্ছি—সেরস্থালি ত কর্‌তে হয়। ওখানে (বাদুড়বাগানে) এগুলো ১৲ টাকা কি বারো আনা দাম হবে; কত'য় এনেছি জানো?—চার আনায়।"

আমার একবার পেটের ব্যায়রাম হয়েছিল। ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, প্রতাপ মজুমদারদের ওষুধও ঠিক লাগছিল না। বিদ্যাসাগর মশাই আমাকে দেখতে এসে বল্লেন—"থাক্‌বে?—না যাবে?" (বেঁচে থাক্‌তে চাও, না মর্‌তে চাও?) আমি একটু হাস্‌লাম। তিনি বই খুঁজে খুঁজে আমাকে ওষুধ দিলেন। ২।৩ বার খেয়েই সুস্থ হলাম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার চর্চ্চা তিনি বিশেষ রকমেই করেছিলেন। মহেন্দ্র ডাক্তারকে (মহেন্দ্রলাল সরকার) ত তিনিই এক রকম হোমিওপ্যাথিতে হাতে খড়ি দেন। লালবিহারী মিত্রের এক সময়ে লিভার এব্‌সেস্ হয়। মহেন্দ্র ডাক্তার দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে গেলেন। তারপর বিদ্যাসাগর মশাই এসে রোগীকে দেখে সে ওষুধ আর দিতে দিলেন না। তিনি নিজে দেখে শুনে ওষুধ খাইয়ে তাঁর দুরারোগ্য রোগ সারিয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় দেড় হাজার দু হাজার টাকার বই সংগ্রহ করেছিলেন। বড় বড় ওষুধের বাক্স তাঁর ছিল।

আমাকে এক সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখতে পরামর্শ দেন। আমার জন্ত বই আর ওষুধে দেড়শ টাকার এক ফর্দ্দ করেন। আমার সেটা বড় বিরক্তিকর বোধ হয়েছিল। এক রকম করে' সংসার চালাই, তাতে আমার মিছি মিছি দেড়শ' টাকা খরচ মোটেই ভাল লাগছিল না। তিনি যেন আমার মনের ভাব বুঝে বল্লেন—"টাকার জন্তে ভাবছিস্? আচ্ছা, তুই টাকা নিয়ে যা। দশ টাকা ক'রে কিস্তিতে শোধ দিস্। তাঁর মুখের উপর ত আর কথা বল্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু তিনি দেড়শ' টাকা দেনা ঘাড়ে চাপালেন—এটা তখন বড়ই অপ্রীতিকর হয়েছিল। এখন কিন্তু মনে হয়—কি উপকারই তিনি ক'রে গিয়েছিলেন। এলোপ্যাথিক ডাক্তারখানায় আমার বাড়ীর জন্ত এখন বছরে যদি ২০৲ টাকার বিল হয় ত খুব বেশী। আমি হোমিওপ্যাথিকেই বাড়ীর ছোট খাটো রোগ সারাই। আমার ছেলে হিরণ যার বয়স ২৫।২৬ হবে, এই গত বছরে মাত্র প্রথম এলোপ্যাথিক ওষুধ খায়।

চিকিৎসা-বিষয়ে লোককে তিনি সাহায্য ত কর্‌তেনই, আবার দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করবার জন্তে মাসে মাসে দেড় হাজার টাকা গুণে দিতেন।

কর্মাটাঁড়ে আমরা সাত আট ঘর বাঙ্গালী ছিলাম। তা আমরা সেখানে মাছ খেতে পেতাম না। বিদ্যাসাগর মশাইও এক সময়ে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন—এমন কি দুধ, সন্দেশ, ঘিএর জিনিষও খেতেন না, কেননা দুধটা বাছুরকে বঞ্চিত ক'রে নেওয়া হয় বলে। তিনি মুড়ি, নারকেল, গুড় এই সব খেতেন। যা হ'ক, কর্মাটাঁড়ে আমরা যখন তাঁকে বল্লুম—আমরা মাছ খেতে পাই না, তখন তিনি সেখানে খোঁজ নিলেন, নিয়ে শুন্‌লেন যে, বাবুরা দাম দেয় না বলে, এদিকে জেলেরা মাছ বেচে না। তখন থেকে তিনি নিজে মাছ কিনে নিয়ে ভাগ ক'রে বাড়ী বাড়ী পাঠাতেন। এই ব্যবস্থাটা এমন নিয়মমত হ'য়ে গিয়েছিল যে, বাড়ীর ছেলেরা সকাল সকাল ভাত খাবার জন্তে বায়না নিলে তাদের বলা হ'ত—ঈশ্বরে জেলে এখনো মাছ দিয়ে যায় নি, ভাত দেব কি? সেখানে পুজোর সময় সাঁওতালদের ৩।৪শ টাকার কাপড় কিনে দিতেন, বাঙ্গালীদের ত

প্রত্যেকের জন্যেই কাপড় দিতেন। কলকাতায় এসে নিজে এ সব কিন্‌তেন। পূজার সময় এক দিন এক দোকানে কাপড় কিন্‌তে এসে বসে তামাক খাচ্ছিলেন, এমন সময় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেখান দিয়ে গাড়ী ক'রে যাচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'রে যতীন্দ্রমোহন বল্লেন—"আপনাকে আমরা এত সম্মান করি, আর আপনার এই রকম দোকানের ঘরে বসে তামাক খাওয়া যেন কি রকম এক রকম ঠেকে।" বিদ্যাসাগর মশাই বল্লেন—"দেখ, ওদের নিয়েই আমাদের ঘরকন্না, ওদের কাছে তেল-নুন্‌ কিন্‌তে আস্‌তে হয়, কাপড় কিন্‌তে আস্‌তে হয়, রাজা-মহারাজাদের নিয়ে ত আর আমাদের ঘরকন্না নয়। তা যদি বল ত না হয় তোমার ওখানে আর যাব না। তোমাদের ছাড়তে পারি কিন্তু ওদের ছাড়তে পারি না।"

বাড়ীর চাকর-বাকরদের সঙ্গেও তাঁর আলাদা ব্যবহার ছিল না। তাদের জন্যে চাল কখন আলাদা কিন্‌তেন না, সবাই যা খেত তারাও তাই খেত। এক চাকরের একবার বসন্ত হয়েছিল, তিনি নিজে তার সেবা-শুশ্রূষা ক'রেছিলেন। তাঁর ঐ বাড়ী এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দেখলে কষ্ট হয়। ওটা তীর্থ-স্থান হওয়া উচিত ছিল। আমাদের দেশের কিন্তু কি দুর্ভাগ্য!

তখন কলেরা চিকিৎসায় Gold packing এর ব্যবস্থা ছিল। তিনিও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করি-তেন। একবার কিন্তু তাতে বিফল হওয়ায় তিনি এ ব্যবস্থা ত্যাগ করেন।

একবার বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ হয়। উলো, বারবাসিয়া প্রভৃতি গ্রাম একেবারে উজাড় হয়ে যাবার মত হয়। বিদ্যাসাগর মশাই সেখানে গিয়ে ছ' মাস থেকে চিকিৎসা করেন। গভর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালে কেউ বড় যেত না, কেননা এঁর কাছে লোক টাটকা ওষুধ পেত আর রোগীর প্রতি ডাক্তারের যে যত্ন সেটা খুবই পেত। কথাটা হচ্ছে এই যে, হাঁসপাতালগুলো হয়েছে নামকো-আস্তে, কামকে-আস্তে নয়।

তিনি লোকের বিপদে-আপদে সর্ব্বদাই সাহায্য কর্‌তেন বটে, কিন্তু লোকের কাছ থেকে পেতেন অকৃতজ্ঞতা। অবশ্য সব ক্ষেত্রে যে তাই, তা নয়। কিন্তু তা এত বেশী যে তিনি এই জন্যে মনে আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি বল্‌তেন যে আমা-দের দেশের লোককে দুটী বিশেষণ দেওয়া যেতে পারে—গরুখে আর বেহায়া।

একবার তিনি শুন্‌লেন সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধি-কারী মহাশয় বলেন যে—বিদ্যাসাগর মশাই না থাক্‌লে আমি ডাক্তার হতে পার্‌তুম না।" তিনি তাতে আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিলেন,—"আমি আশা করি নি যে, সে এ কথা বল্‌বে।" তাঁকে যদি বলা হ'ত—অমুক লোক তার নিন্দে কর্‌ছে তা হলে তিনি বল্‌তেন—"কই আমি ত কখনো তার উপকার করিনি যে, সে আমার নিন্দে কর্‌বে।" দেশে লোকের অকৃতজ্ঞতা পেয়ে পেয়ে তাদের প্রতি তাঁর এমনি বিতৃষ্ণা জন্মেছিল।

তিনি দান কর্‌তে কাতর হতেন না বটে, কিন্তু অপাত্রে দান পছন্দ কর্‌তেন না।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর খুব যোগ ছিল। অক্ষয় দত্ত যখন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন, তখন এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় চলে আসেন। তিনি যে কেবল পণ্ডিতী ভাষা লিখেছেন তা নয়, কথ্য ভাষাও তিনি লিখে গেছেন। "কস্যচিৎ ভাইপোস্য" নামক বইখানি তার নিদর্শন। "প্রভাবতীসম্ভাষণ" তাঁর আর

একটা বই, তার ভাষা অন্য ছাঁচের; এটা রাজকৃষ্ণ বাবুর মেয়ে প্রভাবতীর মৃত্যু উপলক্ষে লেখা, তাকে তিনি খুব স্নেহ কর্‌তেন। সহজ সরল বাংলাও তিনি লিখে গিয়েছেন—ছেলেদের বই—প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা তার উদাহরণ।

তাঁর ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তাঁর ধর্ম্মজীবন কর্ম্মগত ছিল। কাজেই তাঁর কাছে ধর্ম্ম। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন পাই। কিন্তু তিনি প্রথম বই লেখেন—"বাসুদেব-চরিত।" প্রতিমাপূজা তিনি লৌকিকভাবেই দেখতেন। কেননা বাড়ীতে ত কোন পূজা হ'তে দেখিনি। মোটের উপর মনে হয় তিনি Agnostic (সংশয়-বাদী) ছিলেন। তিনি বল্‌তেনও—"যেটা পার্‌বি সেইটে কর।" লোক সেবাই তাঁর ধর্ম্ম ছিল। তাঁর নীতি ছিল লোককে না ঠকানো। তিনি বল্‌তেন—"দুনিয়ার মালিক যদি অনন্ত-দয়ালু হ'ত ত এত কষ্ট সংসারে থাকৃত? লোকে এত কষ্ট পাচ্ছে, যন্ত্রণা পাচ্ছে,—দয়াময় হরি আছেন, আর ভাবনা কি?" আবার তাঁকে এও বল্‌তে শুনেছি—"যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম ভিন্নজায়গায় গিয়ে পড়েছে, ওটা আমাদের খাতে ঠিক মিশ খেতো। ইউরোপে গিয়ে পড়ে, এক রকম অপাত্রে পড়েছে।

এক সম্প্রদায়ের উপাসনা দেখে এসে তিনি বলেছিলেন—"তারা বল্‌ছে শুন্‌লুম আমরা—মূশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, ঈশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, শ্রীচৈতন্যেরও পায়ের ধুলো নিচ্ছি;—আরে বাপু,—ঈশা মূশা শ্রীচৈতন্য ম'রে ত ভূত হ'য়ে গিয়েছে—পায়ের ধুলো কি রে বাবা!" আর এক সময় তিনি বলে ছিলেন—"বয়স ঢের হয়েছে, ঈশ্বর বিশ্বাসী লোক একটি দেখি নি। সকলেই নীচের দিকে তাকায়, উপরের দিকে কেউ তাকায় না।" কেশব বাবু বলেন যে, তাঁ'তে ভক্তির দিকটা কম ছিল।

অনেক দিন এমন কেটেছে যে বিকেল থেকে তাঁর ঘরে বসে গল্পগুজব হ'তে হ'তে রাত হ'য়ে গেছে সেই খানেই খাবার টাবার এল, সকলের সঙ্গে তিনিও খেলেন; সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌তে ত দেখি নি।

শেষ জীবনে গার্হস্থ্য-ব্যাপারে মতের অমিল হওয়ায় স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুকালীন অসুখের সময় যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন ও তাঁর মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর চতুর্থী শ্রাদ্ধের দিন আমরা গিয়ে তাঁর চেহারা দেখে বুঝলাম যে, তাঁর মনে বেশ আঘাত লেগেছে। খেতে বসে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, কি রকম লাগছে, তিনি বল্‌লেন—রকম আর কি, ছাই ছাই লাগছে। দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে "কান্না যাবে, অন্ন খাবে অনায়াসে।"

তিনি বলতেন—"ইংরেজের সভ্যতা আমাদের দেশে তিনটা খারাপ জিনিষ এনেছে—সওদাগর এটর্ণি আর পাদ্রী।"

এক সময়ে কোন মোকদ্দমার সাক্ষী হিসাবে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। তাঁর কাছ থেকে কথা আদায় কর্‌তে হ'লে তাঁকে চটিয়ে দিলেই ঠিক হ'বে—এই মতলবে জেরার সময় ব্যারিষ্টার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনাকে চেনে কে?" তাতে তিনি বলেন,—"উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে কুমারিকা, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্ব্বত ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানের যাবতীয় ব্যক্তি আমাকে চেনে। ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা-মহারাজা নেই যার মাথায় আমার এই চটি-জুতো না বসাতে পারি!" এমনি তার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ছিল।

তাঁর পোষাকের মধ্যে ছিল দড়ি বাঁধা জামা বেনিয়ান্। তাঁর পোষাকি আর আটপৌরে বলে আলাদা কিছু দেখিনি—সেই চাদর আর চটি।

(পঞ্চপুষ্প)

কয়লার বাণিজ্য

১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে যত কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে যত কয়লা বিক্রয় হইয়াছে তাহার বিবরণ টণ হিসাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল। উত্তোলিত কয়লা হইতে বিক্রীত কয়লার পরিমাণ বাদ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,—কত টন কয়লা এখন জমা হইয়া রহিয়াছে। ভারতের খনি সমূহের চীফ ইন্সপেক্টারের রিপোর্ট হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল :—

প্রদেশ	উত্তোলিত	বিক্রীত
আসাম......	২৮৮৮৮	২১৩৮৩
বেলুচিস্থান...	১০৮৩	৮৯৩
বঙ্গদেশ (রাণীগঞ্জের খনি)......	৫৭৪০০২	৫২৮৮৯০

——

বিহার ও উড়িষ্যা—

রাণীগঞ্জ ...	৯৪৯৩১ ...	৮০৮২৪
ঝরিয়া ...	১০৬৯০১২ ...	১০২৫২৭৭
বকারো ...	১৮৬৪০৬ ...	১৮০৭৬৪
গিরীডি ...	৮৫৬৮২ ...	৭১২৮৪
জয়ন্তী ...	৪৩০৬ ...	৬৯১০
ড্যাল্টন গঞ্জ ...	১২৯ ...	....
হুটার ...	২০ ...	২১
হিঙ্গির রামপুর...	৩১৮০ ...	২৮০৬
করণ পুরা ...	৪০৯০৭ ...	৪০৮৪৭
মোট...	১৪৮৪৫৭৩ ...	১৪০৫৭২৮

মধ্য প্রদেশ :—

পেঞ্চ ভেলী (ছিন্দোয়ারা) ...	৫৩৭২০ ...	৫০৯১০
চান্দা ...	১৭৫১৮ ...	১৫৯৬৬
মোট ...	৭১২২০ ...	৬৬৮৭৬
পাঞ্জাব ...	৫৯৩২	৭৭৪৭
সর্ব্ব মোট ...	২১৬৫৬৯৮	২০৩৭৫১৭

কয়লার খনির অবস্থা

১৯২৯ সালের যে মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কয়লার খনি হইতে যত কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে এবং খনি হইতে যত কয়লা চালান দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ হইতে অন্যত্র প্রেরিত কয়লার পরিমাণ বাদ দিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, কত কয়লা খনিতে মজুদ রহিয়াছে। মোটামুটি টনের সংখ্যা দেওয়া গেল।

প্রদেশ	উত্তোলিত	অন্যত্র প্রেরিত
আসাম	২৬৬২২	২১২৭৩
বেলুচিস্থান	১৩৮০	১৩৩১
বঙ্গদেশ রাণীগঞ্জ	৫৬০৬৯৩	৫০০৮৩৭
বিহার ও উড়িষ্যা :—		
রাণীগঞ্জ—	৭৫২০৫	৭১৮২৫
ঝরিয়া—	১০১৬৩৪৫	৮৬৭২৬০
বোকারো—	১৫৮৪৯১	১৫২৮০৭
গিরিডি—	৮২৭৯০	৭৫৮৮৫
জয়ন্তী—	৩১২৫	২৭২৭
ড্যাল্টন গঞ্জ	১১০	......
হুটার	৫৪	১০৬
হিঙ্গির রামপুর	৩৮৯৩	৩০০৪
করণপুরা	৩১৩০১	৩৯৫১২
বিহার উড়িষ্যার মোট	১৩৭৯১৪৪	১২১২১২৮
মধ্য প্রদেশ :—		
পেঞ্চ ভেলী (ছিন্দোয়ারা)—	৬০৮২৮	৫৭০৫৫
চান্দা—	১৬৮২০	১৫০৬৯
মধ্য প্রদেশের মোট	৭৭৬৪৮	৭২৪২৪
পাঞ্জাব	৪৩২০	৪০১৯
সর্ব্ব মোট	২০৪৯৮০৭	১৮১৬০১২

ভারতে কফির চাষ

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কূর্গ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কোর ও কোচিন প্রভৃতি স্থানে কফির চাষ ও কফি প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। ১৯২৭-২৮ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়,—আলোচ্য বৎসরে ১৫৫৮৪৯ একর জমিতে কফির চাষ হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কফির চাষ শত করা ২ একর হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আনুমানিক ৩১৭৫৩৭ হন্দর পরিমিত কফি প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২৩২ লক্ষ টাকা মূল্যে ২৭৬৬৬৮ হন্দর পরিমিত কফি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ভারতে দুই প্রকার কফির চাষ হয়। যথা:—এরাবিকা ও রবস্টা। দক্ষিণ ভারতের সিদাপুর কৃষি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শেষোক্ত প্রকার কফিই অধিকতর লাভ-জনক। কারণ—ইহার উৎপন্নের পরিমাণ যেমন বেশী হয় তেমনি পোকাদি দ্বারা ইহার অনিষ্ট বিশেষ হয় না। কফির গাছে নানা প্রকার রোগ হয়। পিচকারী দ্বারা ঔষধ ছিটাইয়া দিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে।

কয়লার বাণিজ্য

১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে যত কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে যত কয়লা বিক্রয় হইয়াছে তাহার বিবরণ টণ হিসাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল। উত্তোলিত কয়লা হইতে বিক্রীত কয়লার পরিমাণ বাদ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,—কত টন কয়লা এখন জমা হইয়া রহিয়াছে। ভারতের খনি সমূহের চীফ ইন্সপেক্টারের রিপোর্ট হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল :—

প্রদেশ	উত্তোলিত	বিক্রীত
আসাম......	২৮৮৮৮	২৭৩৮৩
বেলুচিস্থান...	১০৮৩	৮৯৩
বঙ্গদেশ (রাণীগঞ্জের খনি)......	৫৭৪০০২	৫২৮৮৯০

বিহার ও উড়িষ্যা—

রাণীগঞ্জ ...	৯৪৯৩১ ...	৮০৮২৪
ঝরিয়া ...	১০৬৯০১২ ...	১০২৫২৭৭
বকারো ...	১৮৬৪০৬ ...	১৮৫৭৩৪
গিরীডি ...	৮৫৬৮২ ...	৭১২৮৪
জয়ন্তী ...	৪৩০৬ ...	৩৯১০
ডাল্টন গঞ্জ ...	১২৯	....
হুটার ...	২০ ...	২১
হিন্দির রামপুর...	৩১৮০ ...	২৮০৬
করণপুরা ...	৪০১০৭ ...	৪০৮৪৭
মোট...	১৪৮৪৫৭৩ ...	১৪০৫৭২৮

মধ্য প্রদেশ :—

পেঞ্চ ভেলী (ছিন্দোয়ারা) ...	৫৩৭২০ ...	৫০৯১০
চান্দা ...	১৭৫১৮ ...	১৫৯৬৬
মোট ...	৭১২২০ ...	৬৬৮৭৬
পাঞ্জাব ...	৫৯৩২	৭৭৪৭
সর্ব্ব মোট ...	২১৬৫৬৯৮	২০৩৭৫১৭

কয়লার খনির অবস্থা

১৯২৯ সালের যে মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কয়লার খনি হইতে যত কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে এবং খনি হইতে যত কয়লা চালান দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ হইতে অন্যত্র প্রেরিত কয়লার পরিমাণ বাদ দিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, কত কয়লা খনিতে মজুদ রহিয়াছে। মোটামুটি টনের সংখ্যা দেওয়া গেল।

প্রদেশ	উত্তোলিত	অন্যত্র প্রেরিত
আসাম	২৬৬২২	২৫২৭৩
বেলুচিস্থান	১৩৮০	১৩৩১
বঙ্গদেশ রাণীগঞ্জ	৫৬০৬৯৩	৫০০৮৩৭
বিহার ও উড়িষ্যা :—		
রাণীগঞ্জ—	৭৫২০৫	৭১৮২৫
ঝরিয়া—	১০১৩৩৪৫	৮৬৭২৬০
বকারো—	১৫৮৪৯১	১৫২৮০৭
গিরিডি—	৮২৭৯০	৭৪৮৮৫
জয়ন্তী—	৩৯২৫	২৭২৭
ড্যাল্টন গঞ্জ	১১০	......
হটার	৫৪	১৩৮
হিন্দির রামপুর	৩৮৯৩	৩০০৪
করণপুরা	৩১৩০১	৩৯৫১২
বিহার উড়িষ্যার মোট	১০৭৯১৪৪	১২১২১২৮
মধ্য প্রদেশ :—		
পেঞ্চ ভেলী (ছিন্দোয়ারা)—	৬০৮২৮	৫৭৩৫৫
চান্দা—	১৬৮২০	১৫০৬৯
মধ্য প্রদেশের মোট	৭৭৬৪৮	৭২৪২৪
পাঞ্জাব	৪৩২০	৪০১৯
সর্ব্ব মোট	২০৪৯৮০৭	১৮১৬০১২

ভারতে কফির চাষ

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কুর্গ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কোর ও কোচিন প্রভৃতি স্থানে কফির চাষ ও কফি প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। ১৯২৭-২৮ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়,—আলোচ্য বৎসরে ১৫৫৮৪৯ একর জমিতে কফির চাষ হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কফির চাষ শত করা ২ একর হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আনুমানিক ৩১৭৫৩৯ হন্দর পরিমিত কফি প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২৩২ লক্ষ টাকা মূল্যে ২৭৬৮৬৮ হন্দর পরিমিত কফি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ভারতে দুই প্রকার কফির চাষ হয়। যথা:—এরাবিকা কফি। দক্ষিণ ভারতের সিদাপুর কৃষি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শেষোক্ত প্রকার কফিই অধিকতর লাভ-জনক। কারণ—ইহার উৎপন্নের পরিমাণ যেমন বেশী হয় তেমনি পোকারি দ্বারা ইহার অনিষ্ট বিশেষ হয় না। কফির গাছে নানা প্রকার রোগ হয়। পিচকারী দ্বারা ঔষধ ছিটাইয়া দিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে।

ব্যবসায়ের সন্ধানে

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্ত বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

[১৮ই জুলাই তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

সিলিকা স্যাণ্ড

(এস ৪১) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম, সিলিকা স্যাণ্ড (silica sand) সরবরাহকারীর সন্ধান চাহিয়াছেন। এই জাতীয় বালী হইতে গ্লাস্ ও firebrichas তৈয়ী হয়।

হোয়াইট স্যাণ্ড

(এস ৪২) সাদা রংএর বালি (white sand) সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইবার জন্ত দিল্লীর কোন ও কারবারী ফার্ম সন্ধান চাহিয়াছেন। এই বালীর দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য হয়।

এ্যাণ্টিমণি ওর

[২৫শে জুলাই তারিখের টেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

(এস ৪৩) ভারতের মধ্যে যে সকল এ্যাণ্টিমণি ওর (Antimony Ore) সরবরাহকারী আছেন তাহাদের সন্ধান চাহিয়া বোম্বাইয়ের কোনও কারবারী পত্র দিয়াছেন। ইহা হইতে সুর্‌মা প্রস্তুত হয়।

এভারাম বর্ক

(এস ৪৪) এভারামের ছাল (Avaram Bark) ক্রয় কারীদের সন্ধান জানিবার জন্ত মান্দ্রাজের কোনও কার্য্য আগ্রহ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা চামড়া পাকানো (Ton করা) হয়।

চালমুগ্‌রা তেল

(এস-৪৫) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী পত্র দ্বারা চালমুগরা তেল ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

ইফিড্রা ভালগারিস

(এস-৪৬) ইফিড্রা ভালগারিস (Ephedra Vulgaris) ক্রয়কারীদের সন্ধান জানিবার জন্ত কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন।

মুরগীর ডিম

(এস-৪৭) ভারতবর্ষের যে সমস্ত ব্যবসায়ী মুরগীর ডিম সরবরাহ করেন তাহাদের সন্ধান জানিবার জন্ত মান্দ্রাজের কোন ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

বস্তা ও চট

[১৯২৯ সালের ১লা আগষ্ট তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

(এস-৪৮) ভারতবর্ষ হইতে যে সকল ব্যবসায়ী বিদেশে বস্তা ও চট (Jute Bags and Cloth) প্রেরণ করেন এবং যাহাদের কোনও প্রতিনিধি ইউরোপে এ পর্য্যন্ত নিযুক্ত হন নাই—এরূপ ব্যবসায়ীর সহিত পরিচিত হইবার অভিমত প্রকাশ করিয়া হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডম হইতে কোন ও ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

(এস-৪৯) ভারতের যে সমস্ত কারবারী বস্তা ও চট প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকেন এবং যাহারা ডেন্মার্ক, সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডে তাহাদের কারবার চালাইতে ইচ্ছা করেন এরূপ ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহিয়া ডেন্মার্কের কোপেন হেগেন হইতে একজন ব্যবসায়ী পত্র লিখিয়াছেন।

সরীসৃপের চামড়া

(এস-৫০) ভারতবর্ষ হইতে যে সকল ব্যবসায়ী সরীসৃপের (Reptile) কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানী করেন তাহাদের সন্ধান চাহিয়া বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌ হইতে একটি ব্যবসায়ী কার্য্য পত্র লিখিয়াছেন।

রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী।

ঘরবাড়ী করিয়া বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ধরণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে এমন কতিপয় জিনিষের প্রয়োজন হয়—যে গুলি আপাত দৃষ্টিতে অনেকটা অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়,—বাস্তব জীবনে এ গুলিকে বাদ দিয়া চলা সম্ভব পর হইলেও মোটের উপর লাভজনক নহে; ইহাতে বরং বিস্তর ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা পদে পদে বর্ত্তমান।

দৃষ্টান্ত স্থলে সাজ সজ্জা ও প্রসাধন প্রভৃতির কথা বলা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, আপনার দেহের সাজ সজ্জা, পরিপাটী ও প্রসাধন প্রভৃতি একান্ত সৌখীনতারই পরিচায়ক—ইহা রাজা রাজোয়াড়ার পক্ষেই শোভা পায়—গরীবের পক্ষে এইরূপ কার্য্য অমিত ব্যয়, এমন কি, অপব্যয়েরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার তাহা নহে। তাই আমরা দেখিতে পাই,—অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাজ সজ্জা ও প্রসাধণের বিধান রহিয়াছে। শরীর তত্ত্ববিৎ এবং দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন,—পরিপাটী বেশভূষা ও প্রসাধন প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মানসিক শান্তি বিধানের পক্ষে অপরিহার্য্য। শরীর ও মন ভাল না থাকিলে যে কোন কাজেই সাফল্য লাভ করা যায় না—একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

মানবদেহের প্রসাধনের ন্যায় ঘরবাড়ী ও আসবাব পত্রের সাজ সজ্জাও একান্ত প্রয়োজন। প্রথম কথা এই যে, ভগবানের রাজ্যে সৌন্দর্য্যের একটা প্রসার প্রতিপত্তি ও আকর্ষণী শক্তি নিশ্চয়ই আছে। ইহাকে অস্বীকার করিয়া কেবল বস্তুতন্ত্রতার দোহাই পাড়িয়া দিন চলে না। পেটের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি মনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য ও সাজ সজ্জা ও পারিপাট্যের প্রয়োজন। অনেকের মতে প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই ঘর বাড়ীতে রং করা এবং আসবাব পত্রে বার্ণিশ লাগানো'র প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইটি মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—এইটা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। রং ও বার্ণিশ ব্যবহার করার বিজ্ঞান সম্মত কারণ ও বিদ্যমান রহিয়াছে।

একটা জিনিষ যত বেশী দিন স্থায়ী হয় ততই মালিকের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের ফলে সকল জিনিষই অল্প বিস্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ক্ষয়ের পথে বাধা দিয়া জিনিষটাকে যথাসম্ভব টাট্‌কা অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য যখন মানুষের চেষ্টা, উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল তখন হইতেই বলিতে গেলে এই রং ও বার্ণিশের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও গৃহ সজ্জা ও পরিপাটীর কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য সহরে দোকানে এবং বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত রং ও বার্ণিশের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ও যে আমাদেরই

দেশে রং করার প্রথা ছিল তাহার নিদর্শন এখনও সুদূর পল্লীগ্রামে অজ্ঞাত অখ্যাত কৃষকের বাড়ীতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার একটু অবস্থা আছে সেও সখ করিয়া তাহার খড়ের ঘর খানিতে ও একটু লাল নীল রং লাগাইতে দ্বিধা বোধ করে না;—অবশ্য এই রং বেশী দিন স্থায়ী হয় না—দেখিতে দেখিতেই উঠিয়া যায়।

এরূপ বাজে রং না দিয়া যদি সাবধানে প্রস্তুত রং লাগাইবার ব্যবস্থা পল্লীবাসীরা করেন তাহা হইলে কেবল সখ নয়,—সত্যিকার উপকারও তাহা দের হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রং ও বার্ণিশ ব্যবহারের একটা স্বার্থকতা আছে। তাহাতে জিনিষটা অধিক দিন স্থায়ী হয়—এবং যত দিন টিকিয়া থাকে তত দিন ও বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে থাকিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রং ও বার্ণিশ লাগাইলে জিনিষগুলি কেন অধিক দিন স্থায়ী হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতু এবং কাঠ ইত্যাদি দ্বারা আমাদের প্রয়োজনীয় ঘর বাড়ী ও আসবাব পত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এ গুলিকে অনেক সময় রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যেই রাখিতে হয়। এই অবস্থায় এক বার জলে ভিজিয়া তার পর রৌদ্রে শুকাইয়া ধাতব পদার্থ গুলিতে মরিচা ধরে এবং কাঠের জিনিষ গুলি পচিতে থাকে। অপর কোন ও আবরণে আচ্ছাদিতকরিয়া রাখিবার উপায় করিতে পারিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। উল্লিখিত রং ও বার্ণিশ প্রকৃত পক্ষে এই আবরণ ও আচ্ছাদন ব্যতীত আর কিছুই নয়। তৈলের সহিত বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে রংএর সূক্ষ্ম গুড়া গুলি জিনিষের গায়ে লাগিয়া উহাকে আকড়াইয়া ধরে অথচ তৈলটা শুকাইয়া যায় বলিয়াই দেখিতে দেখিতে ঐ রং বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া কঠিন আবরণে পরিণত হয়। ফলে এই আবরণে রক্ষিত জিনিষ গুলি অধিক দিন কার্য্যকরী ও স্থায়ী হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রং ও বার্ণিশ একান্ত সৌখীনতা ও বিলাসিতার সামগ্রী নয়—বাস্তবিক পক্ষেই ইহার কার্য্যকারিতা আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে এই রং ও বার্ণিশ এখনও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে না। ফলে যাহারা রং ও বার্ণিশ ব্যবহারে ইচ্ছুক তাহাদিগকে বিদেশী মাল ক্রয় করিতে হইতেছে। ইহাতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা এদেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী বিবরণী পাঠে জানা যায়:—

১৯১৬ ১৭	খৃষ্টাব্দে	......১১২১৯০৮৫৲	টাকা
১৯১৭—১৮	"	......৯৪৬০৮১০৲	"
১৯১৮—১৯	"	......১২৩৫৯০৮৫৲	"
১৯১৯—২০	"	......১২৫৫০৩৩০৲	"
১৯২০—২১	"	......১৮৮৩৫১৯০৲	"
১৯২১—২২	"	......১২০৫৩১০৮৲	"
১৯২২—২৩	"	......১৩৩৯৬১৫৮৲	"
১৯২৩—২৪	"	......১২৭০৯৩৪০৲	"
১৯২৪—২৫	"	......১২০৭৫৯৭৬৲	"
১৯২৫—২৬	"	......১২৬৯৭৮৮৮৲	"
১৯২৬—২৭	"	......১৬৯৪৬১১৯৲	"

মূল্যের রং ও বার্ণিশ প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানী করা হইয়াছে। এখনও ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপক ভাবে রং ও বার্ণিশের প্রচলন হয় নাই; কিন্তু জনসাধারণ যতই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদির সহিত পরিচিত হইতেছে ততই এসমস্ত জিনিষের চাহিদা বাড়িয়া চলিতেছে। উপরোক্ত তালিকা হইতেই একথা অনেকটা

বুঝিতে পারা যায়। কারণ মোটের উপর হিসাব করিলে দেখা যায় যে, বিলাতী রং ও বার্ণিশ প্রভৃতি আমদানীর পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশে যদি প্রয়োজনের অনুরূপ পরিমাণে রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু তাহা করিবে কে?

আমাদের কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন,—

যাও সিন্ধু নীরে
ভূধর শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

দেশের অভাব অভিযোগ লক্ষ্য করিয়াই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কবির মুখ হইতে এই উপদেশ বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই উপদেশ আজও উপদেশই রহিয়া গিয়াছে—কেহই প্রকৃত পক্ষে তাহা গ্রহণ করে নাই; এবং করে নাই বলিয়াই জাতি হিসাবে ভারতবাসী আজ বিশ্বের দরবারে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। পদে পদে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পরমুখাপেক্ষী জাতির পক্ষে এই সার সত্যটি ভাবিয়া দেখিবার সময় কি এখনও আসে নাই?

সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ,—রং প্রস্তুতের বহুপ্রকার বিভিন্ন প্রণালী আছে, তৎসমস্তই অল্প বিস্তর এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সকল প্রকারের রং ও বার্ণিশই এদেশে কিছু না কিছু প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষে দামী ও কম দামী উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট—সকল প্রকারের রং ও বার্ণিশই আমাদের দেশে উৎপন্ন হইতে পারে। অথচ অতি অল্প পরিমাণে রং ও বার্ণিশই এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। নিম্নে যে তালিকাটি দেওয়া হইল তাহা হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, এবিষয়ে আমরা এখনও কত পশ্চাৎপদ রহিয়াছি :—

১৯১৭	খৃষ্টাব্দে	২৩৬১০০০৲ টাকা
১৯১৮	"	৩৮২০০০০৲
১৯১৯	"	৩১৮৬০০০৲
১০২০	"	৩০৫৩০০০৲
১৯২১	"	৩৩২৯১০০৲
১৯২২	"	৩২৮৫০০০৲
১৯২৩	"	৩২৫৯০০০৲
১৯২৪	"	৩৮৯৫০০০৲
১৯২৫	"	৫৩৯৭০০০৲
১৯২৬	"	৬৫৩৬০০০৲

মূল্যের রং ও বার্ণিশ ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য সকল উপাদানের মূল্য ধরা হয় নাই। প্রধানতঃ তিসির তেল, রজন ও তার্পিন তেল প্রভৃতির দর বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ এগুলি প্রদেশ হইতেই সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। তারপর এই তালিকা হইতে বিলাতী উপাদানের দাম বাদ দেওয়া হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে সাদা রংএর কথা বলা যাইতে পারে। বিদেশ হইতে সীসা আমদানী করিয়া এই রং প্রস্তুত করা হয়। অনেক সময় এ সমস্ত বিদেশী উপাদান শতকরা ৯২ ভাগ ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল্য বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রস্তুত রং ও বার্ণিশের পরিমাণ ও মূল্য যে আরও হ্রাস পাইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত একান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইবে —তাহা বলাই বাহুল্য।

অথচ মজার কথা এই যে, যে সমস্ত উপাদানে এই রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত হয়, তাহা ভারতবর্ষে যেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আর কোথাও তেমন পাওয়া যায় না। গ্রেট বৃটেন হইতেই ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ রং ও বার্ণিশ আম-

দানী হইয়া থাকে। কিন্তু রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের উপাদান এদেশে যতটা আছে বৃটেনে তাহার সিকি পরিমাণও আছে কিনা সন্দেহ। একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্য এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। কারণ সেদেশে পাহাড় পর্ব্বত ও খনি প্রভৃতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? কথায় বলে—মাছের তেলে মাছ ভাজা। গ্রেট বৃটেন তাই আমাদের কাঁচা মাল নিয়াই একটু নাড়াচাড়া করিয়া পুনরায় সেগুলি ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়া আমাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করে।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। এই রং ও বার্ণিশ শিল্পের কথাই ধরা যাক্। এগুলি প্রস্তুত করিতে তেমন বিরাট আড়ম্বর না করিলেও চলে। যে সমস্ত উপাদানে তাহা প্রস্তুত হয়, সে সমস্ত উপাদান অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের দেশে পাওয়া যায়। প্রকৃতি রাণী এদেশে সদা হাস্যময়ী—তাহার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত বলিলেই হয়। এদেশের আবহাওয়া প্রাকৃতিক অবস্থা এবং সস্তা মজুরী—এ সমস্তই শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। দূর হইতে এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা লক্ষ্য করিয়া বিদেশী বণিকের দল এদেশে বড় বড় কারবার পাতিয়া বসিয়াছেন। ভারতবাসী তথায় কুলী মজুর ও কেরাণীর কাজ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ মুদ্রা পাইতেছে। লভ্যাংশ সমস্তই বিদেশীরাই পাইতেছে—ফলে এদেশের দারিদ্র্য বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের উদ্ভাবনী শক্তি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে একান্তভাবে নিয়োজিত হইতেছে না—ততদিন আমাদের লাঞ্ছনা ও অপমান অবশ্যম্ভাবী।

রং প্রস্তুতের কথা বলিতেছিলাম—এ ব্যাপার তেমন কঠিন কিছুই নহে। সাধারণতঃ তিসির তেল, রজন বা ধূনা, তার্পিণ তেল এবং বিভিন্ন রংএর ধাতুর গুঁড়া—এ সমস্তের সংমিশ্রণেই রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে ওয়েল পেণ্ট (oil paint) বলে।

এমন কতিপয় তেল আছে যেগুলি খোলা বাতাসে রাখিলে তাহার উপর একটা সর পড়িয়া যায়। তিসির তেলই ইহাদের মধ্যে প্রধান। বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া এই তেলের উপর খুব শীঘ্র সর পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা শুষ্ক হইয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই তেলের সঙ্গে যদি অন্য কোন কঠিন পদার্থের খুব সূক্ষ্ম গুঁড়া মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে উপরোক্ত কঠিন পদার্থ আরও বেশী কঠিন হয় এবং যে জিনিসের উপর তাহা লাগান যায় তাহাকে একটা শক্ত আবরণ দিয়া ঢাকিয়া ফেলে। এই জন্যই রং লাগাইলে কড়ি বরগা, ঘর দরজা প্রভৃতি অধিকতর স্থায়ী হইয়া থাকে।

কাঁচা তিসির তেল ব্যবহার করিলে তাহা শুকাইতে বিলম্ব হয়। তাই রং মিশাইবার পূর্ব্বে ইহাকে একটু তারাম করিয়া লইতে হয় খুব সামান্য তারম করাই বাঞ্ছনীয়। ইহার সঙ্গে কোন কোন ধাতুর গুড়া (ইংরাজীতে যে গুলিকে Driers বলে) তাহা মিশাইলে ভাল হয়। ঈষদুষ্ণ তিসির তেলের উপর যে সর পড়ে তাহা অধিকতর কঠিন ও শক্ত হইয়া থাকে।

তারপর অভিপ্রায় অনুসারে লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি করিবার জন্য তদনুরূপ রংএর ধাতুর গুড়া (Pignenta) মিশ্রিত করা প্রয়োজন। এই গুড়ার পরিমাণের অনুপাতে রং পাতলা কিম্বা গাঢ় মিট্‌মিটে কিম্বা উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ সীসা, দস্তা, কাঁসা; বেরিস্ (Barytes—অতীব গুরুভার মৃত্তিকা বিশেষ) গ্রেফাইট (graphite কৃষ্ণবর্ণ ধাতু বিশেষ) ইত্যাদি হইতে রংএর উপযোগী গুড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ধাতু এদেশে পাওয়া যায়; তথাপি এ সমস্তের গুড়া বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। কারণ প্রচুর পরিমাণে গুড়া তৈয়ার করিবার উপযোগী কল কারখানা এখনও এদেশে বেশী হয় নাই। তবে অন্য প্রক্রিয়া অনুসারে গুড়া না করিয়াও রং প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং সেই রং বাস্তবিক উৎকৃষ্টই হইয়া থাকে। ধাতব পদার্থকে পিষিয়া তেলের সহিত মিশ্রিত করা সম্ভবপর। এই প্রণালীতে কোন কোন স্থলে রং প্রস্তুত হইতেছে।

দৃষ্টান্ত স্থলে ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের কথা বলা যাইতে পারে। তথায় সম্প্রতি অনেক পাকা বাড়ী ও দালান কোঠা নির্ম্মিত হইতেছে। মজুরীও সেখানে খুব সস্তা। দৈনিক ছয় পয়সায় এক একটি স্ত্রী মজুর কাজ করে। নিকটেই ময়ূরভঞ্জের পাহাড়ে গুড়া তৈয়ারীর উপযোগী নানা প্রকার ধাতু আছে। সেগুলি এই সস্তা মজুরের দ্বারা পিষাইয়া লইয়া ঈষদুষ্ণ তিসির তেলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চমৎকার রং প্রস্তুত হইতেছে। সস্তায় প্রস্তুত এই রং যে কোন বিলাতী রংয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

ঈষদুষ্ণ তিসির তেল ও রংএর গুড়া খুব ভাল করিয়া সমান অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া যে পদার্থ হয় তাহা অনেকটা গাঢ় হইয়া যায়। তাহা অপর জিনিষের উপর লাগাইতে গেলে খুব বেশী লাগে এবং তেমন সুবিধা জনক হয় না। অথচ তিসির তেল অধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিলে গাঢ়ত্ব টুকু নষ্ট হইয়া যায়—রং তখন নিতান্ত পাতলা হইয়া পড়ে। এই গাঢ়ত্ব বজায় রাখিয়া রংকে পাতলা করিবার জন্য অপর কোনও পদার্থের প্রয়োজন। সেই পদার্থ গুলিকে ইংরাজীতে (Thinners)—অর্থাৎ পাতলাকারী বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রধানতঃ তার্পিণ তেল এবং পেট্রোল হইতে প্রস্তুত হোয়াইট স্পিরিটই (White Spirit) এ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রং লাগালেই সঙ্গে সঙ্গেই এই তরলকারী পদার্থটি বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়,—ইহার সাহায্যে রংটী জিনিষের উপর বিস্তৃত হইয়া অনেক জায়গা জুড়িয়া বসিতে পারে মাত্র।

মোটামুটি এই টুকু জানা থাকিলেই রং প্রস্তুত করা যায়। তারপর বার্ণিশ। ইহা দুই প্রকার যথা:—তেলের বার্ণিশ ও স্পিরিটের বার্ণিশ।

ঈষদুষ্ণ তিসির তেলের সহিত রজন এবং Copal (এক প্রকার শক্ত আটা বিশেষ) মিশ্রিত হইয়া তেলের বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। তার্পিণ তেল অথবা মেথিলেটেড্ স্পিরিটের সহিত তরলীকৃত রজন (Solution of resins) মিশাইয়া স্পিরিট বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। কোনও জিনিষের উপর এই বার্ণিশ লাগাইলে তাহা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া যে সব পড়ে, তাহা খুব শক্ত, উজ্জল ও চক্চকে হইয়া থাকে। এইজন্য বাড়ীর আসবাব পত্র, গাড়ী, রেলের সাজ সরঞ্জামের উপর বার্ণিশ দেওয়া হয়। কোন কোন সময়ে রংএর উপর ও ব্যবহার হইয়া থাকে—এতদ্বারা রংএর চাকচিক্য বাড়ে এবং তাহা অধিকতর শক্তিশালী হয়।

আর এক প্রকার রং আছে—তাহাকে "এনামেল" বলে। উপরে যে বার্ণিশের কথা বলা হইল তাহার সহিত রংএর খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুড়া

মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। এইটি অন্যান্য পেন্ট হইতে অধিকতর পরিষ্কার, স্থায়ী এবং শক্তিশালী হইয়া থাকে। প্রধানতঃ দামী জিনিষপত্রের উপর তাহা ব্যবহার করা হয়ঃ যেমন মোটর কার প্রভৃতি। আমাদের দেশে অবশ্য এই শ্রেণীর রং এর তেমন প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে ভবিষ্যতেও যে ইহার চাহিদা দেখা দিবে না—এমন কথাও বলা যায় না। কারণ মোটরকার ও বাস প্রভৃতির সংখ্যা এখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে এবং সেগুলি সংস্কারের সময় এনামেলের প্রয়োজন হইবে।

যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক কর্মাভাবে বিমর্ষ হয়ে দিন কাটাইতেছেন তাহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বসিয়া বসিয়া দুঃখ বিলাপে সময় ক্ষেপ করিলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না—তজ্জন্য চাই বিপুল অধ্যবসায়, এবং অক্লান্ত পরিশ্রম। এ সমস্ত গুণের অধিকারী যাহারা বেকার সমস্যা তাহাদিগকে নিশ্চয়ই এড়াইয়া চলিবে।

খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল

স্বাস্থ্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত সে অসীম বিত্তশালী হইলেও তাহাকে নিঃস্ব বলা যাইতে পারে। জাতি হিসাবে যাহারা স্বাস্থ্যহীন তাহারা নিতান্তই দুর্ভাগ্য—জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তাহারা সহজে উন্নতি করিতে পারে না।

স্বাস্থ্যই সম্পদ। আবার স্বাস্থ্যই আর্থিক সম্পদ অর্জন করিতে মানুষকে সহায়তা করে। অর্থোপার্জনের পথ কোন কালেই সহজ নহে। আরাম কেদারায় শুইয়া থাকিলে টাকা কড়ি ধন দৌলত আপনা হইতেই ভাণ্ডারে আসিয়া জমা হইবে না। উপায় করিতে হইলেই পরিশ্রম করিতে হইবে। কিন্তু শরীরে প্রচুর শক্তি না থাকিলে যথেষ্ট পরিশ্রম করিবে কি করিয়া? কাজেই যে যে কোন কাজই করিতে যাও না কেন স্বাস্থ্যের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এমন কি ধর্মাচরণ করিতে গেলেও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন আছে। শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না। মন ভাল না থাকিলে ধর্ম কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাই শাস্ত্রকারগণের আদিম ব্যবস্থা হইতেছে।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনং।

বাঙালীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। এমনই বাংলার জলবায়ু এরূপ যে, এ দেশে থাকিলে

মানুষ সহজেই অলস ও নিষ্কর্মা হইয়া পড়ে, তাহার উপর ম্যালেরিয়া, কলেরা বসন্ত যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের মারাত্মক রোগ পদে পদে বাঙালীর রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে অকর্মণ্য ও পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালীর জীবনী শক্তি অসম্ভব রূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। গড়ে তাহার আয়ুকাল বাইশ বৎসর মাত্র।

খুব বেশীদিন নহে—বোধহয় দুই পুরুষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় নাই। তখনও যুবকদিগের দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল; ৫০।৬০ বৎসর বয়সে লোকে অকর্মণ্য হইয়া পড়িত না এবং সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে তখন অধিকাংশ লোকই বুড়া হইয়া মরিত। আজকাল বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু হয় কয় জনের? সকলেই ত দেখি অকালে প্রাণ হারাইতেছে। বস্তুতঃ natural death বা পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু আজ কাল আর নাই বলিলেই চলে।

দুই একজন নহে—দু দশ জন নহে—সমস্ত বাঙালী জাতিটাই রুগ্ন। পেট হইতে পড়িয়াই আমাদের চশমা ধরিতে হয়, তাহা না হইলে চোখে কিছুই দেখিতে পাই না। যে বাল্যকালে ছেলেদের ইট পাথর খাইয়া হজম করিয়া ফেলিবার কথা, সেই বাল্যকালে আমাদের দুই ঝিনুক ছানার জল ও সহ্য হয় না। তাহারপর বাল্য শেষ হইতে না হইতেই কাল ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগ আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে যৌবনেই জরাগ্রস্ত করিয়া দেয়।

এতকাল শুধু কেবল ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগ দেখা দিত; আজকাল তাহার উপর আবার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, বেরী বেরী, থাইসিস্ প্রভৃতি আরও সাংঘাতিক রোগ দেখা দিতেছে।

এখন কথা হইতেছে, ইহার কারণ কি? দিন দিন বাঙ্গালীর এরূপ স্বাস্থ্য হানি হইতেছে কেন?

জাতি হিসাবে আমরা যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে এই প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান আমাদিগকে করিতেই হইবে। দিন দিন মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, মৃত্যুর হরণ কমিয়া যাইতেছে, নানারূপ সাংঘাতিক রোগের আবির্ভাব হইতেছে—ইহা ত পরিহাসের কথা নহে। ১৯০০ সালে যাহাদের পরমায়ুর হার ছিল ৩২ বৎসর ১৯২১ সালে তাহাদের পরমায়ুর হার হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যদি ২২ বৎসরে পরিণত হয় তাহা হইলে পৃথিবীর যে কোন জাতিই চিন্তিত হইয়া পড়ে। ২১ বৎসরে পরমায়ুর হার দশ বৎসর কমিয়া গিয়াছে—এই হারে যদি কমিতে থাকে তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই বাঙ্গালী জাতীর নাম ধরা পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু ও সকল ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির কারণ নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী যে জীবনের প্রতি অধ্যায়ে দুনিয়ার সকল জাতি অপেক্ষা পিছাইয়া পড়িতেছে তাহার কারণ কি? আমার মনে হয় বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতাই তাহার অন্যতম কারণ।

শুধু ব্যবসায়ের কথাই ধরা যাউক। এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহা খুব অল্প মূলধন লইয়াই আরম্ভ করা যাইতে পারে,—আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ মূলধন না থাকিলেও চলিতে পারে। কিন্তু এই সকল ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে প্রচুর শ্রমশক্তির প্রয়োজন। বাঙ্গালীর ছেলেরা ওরূপ পরিশ্রম করিতে চাহে না এবং পারে না, তাই তাহারা পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যবসায়ের পথ ছাড়িয়া

আরাম দায়ক চাকুরীর পথ ধরিয়াছে। কিন্তু মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী প্রভৃতি পশ্চিমা লোকের দেহে যথেষ্ট শক্তি আছে; তাহারা প্রচুর পরিশ্রম করিতে পারে। তাই তাহারা নানাবিধ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বাধীন ভাবে অজস্র টাকাকড়ি উপার্জ্জন করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, বাঙ্গালীকে জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার বর্ত্তমান কালীন স্বাস্থ্যহানির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং সকলেই জানেন ৭০।৮০ এমন কি ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীরা এরূপ দুর্ব্বল ও রুগ্ন ছিল না। তবে অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ অধঃপতন হইবার কারণ কি?

অনেকেই জল বায়ুর দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা জল বায়ুর ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া নিজেরা নির্দ্দোষ সাজিতে চাহি না। গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে জল বায়ুর যে খুব বেশী পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা আমাদের মনে হয় না। প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়—**খাদ্যের অভাব এবং অখাদ্যের প্রাদুর্ভাবই বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির প্রধানতম কারণ।**

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে খাঁটি খাবার খাইত। কিন্তু এখন আর খাঁটী খাবার পাইবার যো নাই। বাজারে যাহা কিছু খাদ্য কিনিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই ভেজাল মিশ্রিত; কাজেই অখাদ্য। এই সকল অখাদ্য আহার করাতেই দেশে এত রোগের প্রাদুর্ভাব।

ভাতকে বাদ দিলে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ঘি, দুধ, সরিষার তৈল, ময়দা, ছানার সন্দেশ। রুগ্ন বাঙ্গালীর প্রধান পথ্য সাগু ও বার্লি। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় ঠিক ঐ কয়টী দ্রব্যেই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভেজাল মেশান হয়।

ঘির সহিত আজকাল এরূপ অধিক পরিমাণে ভেজাল মেশান হইতেছে যে যথেষ্ট দাম দিয়াও খাঁটি ঘি পাইবার উপায় নাই। সাধারণতঃ ঘিয়ের সহিত চর্ব্বি ও ভেজিটেবল প্রোডাক্ট মিশ্রিত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ইউরোপ হইতে এদেশে আমদানী হইতেছে। ইহা যে দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে গত কার্ত্তিকসংখ্যায় আমরা তাহার সম্যক আলোচনা করিয়াছি।

সরিষার তৈলেও নানাবিধ তৈলাক্ত পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। আগে কলুরা ঘানিতে সরিষা পিষিয়া তৈল প্রস্তুত করিত। তখন ভেজাল মিশাইবার তত সুবিধা ছিল না। কিন্তু আজকাল বড় বড় কলের প্রবর্ত্তন হওয়ায় যে কোন তৈল বীজ সরিষার সহিত কলে পিষিয়া উৎপন্ন তৈলকে সরিষার তৈল বলিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। এখন আরও এক বিপদ হইয়াছে ইউরোপ হইতে সস্তাদরে নির্গন্ধ mineral oil এর আমদানী হইয়া এই তেলে আজকাল বাজার ছাইয়া গেছে। ইহা আদপে কেরোসীন জাতীয় তৈল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইহাকে নির্গন্ধ ও নিষ্ক্রিয় করা হইয়াছে। ফলে ইহা সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া দিলে জনসাধারণ সহজে বুঝিতে পারে না। কিন্তু বুঝিতে না পারিলেও বিষ আপনার ক্রিয়া করিতে বিরত থাকিবে না।

খাঁটি সরিষার তৈলের রোগনাশিনী শক্তি আছে। ইহা বলবর্দ্ধক। কিন্তু ভেজাল সরিষার তেলের গুণ তদ্বিপরীত। ভেজাল সরিষার তৈল

আহারের ফলে আমরা ডিস্‌পেপসিয়া উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইতেছি।

আজকাল অনেকেই এক বেলা রুটি খাইয়া থাকেন। কিন্তু খাঁটি ময়দা বা আটা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ কেয়োলীন মাটি, গুদাম পচা গমের গুঁড়া প্রভৃতি ময়দার সহিত ভেজাল দেওয়া হয়।

এইরূপ সমস্ত খাদ্যই ভেজাল মিশ্রিত। কাহাকে ছাড়িয়া কাহার কথা বলিব ?

কলিকাতায় যাহারা খাদ্যের সহিত ভেজাল মিশ্রিত করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হয়, মাসের পর মাস "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পৃষ্ঠায় তাহাদের নামের একটী করিয়া তালিকা বাহির হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কোন্ কোন্ দ্রব্যে অধিক ভেজাল মিশ্রিত হইয়া থাকে—জন সাধারণকে তাহা জানাইয়া দেওয়াই এই তালিকা প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৯২৭ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" গুলির পৃষ্ঠা উল্টাইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম দণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ যে যে দ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়াছে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়টী ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—(১) সরিষার তৈল, (২) ঘৃত, (৩) দুধ, (৪) ছানা, মাখম ও সন্দেশ. (৫) সাগু ও বার্লি (৬) কচুরী, সিঙ্গাড়া প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী (৭) ময়দা। দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা ও জরিমানার পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ।

সরিষার তৈল

	সংখ্যা	জরিমানা
বাঙ্গালী হিন্দু	৫২	৩৫৫৫
অবাঙ্গালী হিন্দু	২৬	৯২১
মুসলমান	৭	২৪৪

ঘৃত

	৮৫	৪৫২০
বাঙ্গালী হিন্দু	১২	১২৩০
অবাঙ্গালী হিন্দু	২২	১৬৫৬
মুসলমান	১০	৪৯০
	৪৪	৩২৭৬

দুধ

বাঙ্গালী হিন্দু	৪২	১৩১৮
অবাঙ্গালী হিন্দু	৫	১২৩
মুসলমান	৩	৪
	৫০	১৪৪৫

ছানা, মাখম ও সন্দেশ

বাঙ্গালী হিন্দু	১০	৪০৫
অবাঙ্গালী হিন্দু	৯	৩২৩
মুসলমান	৩	৬৭
	২২	৭৯৫

সাগু ও বার্লি

বাঙ্গালী হিন্দু	১৯	১৪৯
অবাঙ্গালী হিন্দু	৬	১৫৪
মুসলমান	৩	২৬
	২৮	৩২৯

অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী

বাঙ্গালী হিন্দু	৯	১৬৯
অবাঙ্গালী হিন্দু	১২	৬২০
মুসলমান	২	১৩০
	১৩	৯১৯

ময়দা

বাঙ্গালী হিন্দু	২	৪৩

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে যাহারা খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশই ধরা পড়ে না। কেবল দুই চারি জন মাত্রই ধরা পড়ে। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের তালিকাও সম্পূর্ণ নহে। তথাপি ঐ অসম্পূর্ণ তালিকার মধ্যে ও কয়েকটী জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে।

তিনটী জিনিষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভেজাল চলিতেছে ; যথা সরিষার তৈল, ঘি এবং দুধ। সরিষার তৈলে যাহারা ভেজাল মিশ্রিত করে, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। অবাঙ্গালী হিন্দু অর্থাৎ মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতি লোকেরা ঘৃত এবং ঘৃত পক্ক দ্রব্যে অধিক পরিমাণে ভেজাল মিশ্রিত করে। ভেজাল দুধ বিক্রয়ের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা বেশী।

সে যাহা হউক যাহারা খাতে ভেজাল মিশাইয়া অযথা বড়লোক হইতে চাহে, তাহারা যে দেশের শত্রু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে তাহাদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; কিন্তু আমাদের মনে হয় ঐ দণ্ড আদৌ যথেষ্ট নহে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি একই ব্যক্তি একই অপরাধে চার পাঁচবার দণ্ডিত হইয়াছে। প্রতিবারে ৩।৪ শত টাকা জরিমানা দিয়াও পুনর্ব্বার ভেজাল মিশাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ঐ ধরণের অপরাধী ব্যক্তি অর্থদণ্ডকে আদৌ গ্রাহ্য করে না। বস্তুতঃ গ্রাহ্য করাও সম্ভব নহে। যাহারা অসদুপায়ে হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেছে তাহারা যদি মাঝে মাঝে ২।৪ টাকা বা দুই এক শত টাকা জরিমানা দিলেই নিরাপদে আপনাপন ব্যবসায় চালাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সে ব্যবসায় বন্ধ রাখিবে কেন? আমাদের মনে হয়, খাতে ভেজাল দেওয়ার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিবর্গকে আরও কঠোর ভাবে সাজা দেওয়া উচিত। অর্থদণ্ড যথেষ্ট নহে; জেল ও বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

চোর চুরি করিলে জেল খাটিতে বাধ্য হয়। একজনের কিঞ্চিৎ অর্থ অপহরণ করিয়াই সে ওই শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি খাতে ভেজাল মিশাইতেছে, সে একজনের নহে শত শত লোকের খাদ্য চুরি করিতেছে। তাহার অপরাধ কি আরও গুরুতর নহে?

এক ব্যক্তি যদি অপর একজনকে বিষ প্রদান করে তাহা হইলে ধরা পড়িলে তাহাকে জেল খাটিতে হইবে। এমন কি ভ্রমক্রমে বিষ প্রদান করিলেও সকল সময় অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। যে ব্যক্তি খাদ্যের নামে নানারূপ অখাদ্য বিক্রয় করিতেছে, আমাদের মনে হয়, সে ও ত সমানরূপেই অপরাধী? তফাৎ এইটুকু যে বিষ মানুষকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলে, আর অখাদ্যরূপ বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয় ধীরে ধীরে।

আজ যে থাইসিস্ ডিস্‌পেপসিয়া, বেরীবেরী প্রভৃতিতে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, এই সমস্ত মারাত্মক রোগে দলে দলে বাঙালী পলে পলে মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, ইহার জন্য দায়ী কে?

আমি বলিব—খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশাইয়া যাহারা বড় লোক হইতে চাহিতেছে যেই সমস্ত নর পশুই ইহার জন্য দায়ী। ইহারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, সমস্ত মনুষ্য সমাজের নিকট অপরাধী। আমি ইহাদিগকে হত্যাকারীর আসনে বসাইতেও দ্বিধা বোধ করি না। নামমাত্র অর্থদণ্ড নহে—জেল ও বেত্রাঘাতই ইহাদের উপযুক্ত শাস্তি।

বর্ত্তমানে যে সমস্ত আইন কানুন আছে, আমাদের মনে হয়, এই স্বার্থপর সমস্ত লোভী ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। গভর্ণমেণ্ট ও দেশের আইন সভার প্রতিনিধিগণ এই বিষয়ে কঠোরতর আইন প্রণয়ন করিলে দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন।

ভারতের যৌথ কারবার

১৯২৯ সালের মে মাসের বিবরণ।

১৯২৯ সালের মে মাসে ভারতের নানাস্থানে গড়ে ২৭ কোটী টাকার মূলধন লইয়া ৬৪ টি যৌথকারবার (Joint Stock Companies) রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ৮ কোটী টাকা মূলধন লইয়া ৭১টি কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের মে মাসে ২ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকার মূলধনযুক্ত ৪৮টি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই তো গেল সমস্ত ভারতের বিবরণ। তন্মধ্যে গত মে মাসে একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই ২৪টি কোম্পানী রেজিষ্টারী হইয়াছে এবং এগুলির মূলধন ২৬ কোটী টাকা।

পক্ষান্তরে ২৯ লক্ষ টাকার মূলধনযুক্ত কয়টি লিমিটেড্ কোম্পানী ১৯২৯ সালের মে মাসে কারবার গুটাইয়াছে, লিকুইডিসনে গিয়াছে কিম্বা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ১২ লক্ষ টাকার মূলধনযুক্ত দুইটী কোম্পানী ১লা মে তারিখের পূর্ব্বেই লিকুইডেসনে গিয়াছিল; মে মাসে এই দুইটিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া (finally dissolved) হইয়াছে।

সকল বিষয় হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, ১৯২৯ সালের মে মাসে ভারতের যৌথ কারবারগুলির মূলধন মোটের উপর ১৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২৯ সালের মে মাসে বাংলাদেশে যে সকল যৌথ কারবার রেজিষ্টারী করা হইয়াছে এবং বাংলার বাহিরে যে সকল ইন্‌সিওরেন্স এবং প্রভিডেন্ট কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

Class and Names	Names of agents, secretaries, etc., and situation of registered Office.	Objects	Authorised Capital.
1.—Banking, Loan and Insurance.			Rs.
Swaraj Bank (a) (i)	Dir., J. M. Ghose, 10 Canning St, Cal.	Banking buiiness	25,00,00,000
Ashuganj Sunlight Bank (a) (i)	Secy., Profulla Kumar Roy, Ashuganj. District Tippera.	"	1,00,000
Bank of Hindustan (a) (i)	Mg. Dir Pandit Vidyasagar Panday, Madras	"	25,00,000
Sengunthar Bank (a) (i)	Dir. V. S. Murugesa Mudali, Erode. Madras.	"	1,00,000
Kamalodayam Bank (a) (i)	Manager, Punkunnam, Travancore	" Chittics	5,00000
Catholic Little Flower Bank (a) (i)	Manager, Coonammavoo, Travancore.	" "	25,000
Kolpuram Bank (a) (i)	Manager, Koipuram, Travancore	" "	1,00,000
Little Flower Bank (a) (i)	Dir, Karimknnam Travencore	" "	25,000
Karukutty Bank (a) (i)	Mg, Dir., Karukutty, Travancore	" "	1,00,000
Provincial Service Bank (a) (i)	Manager, Niranam Travancore	" "	1,00,000
Kelpuram Union Bank (a) (i)	Manager, Kumbanad	" "	2,00,000
Gazna Mahajani Bank (a) (i)	Dir,. Syamapada Sircar, Gazna, Dt. Nadia, Bengal,	Money-lending business	30,000
Gaibandha Town Bank (a) (i)	Dir., S. K. Mittra, Gaibandha, Rangpur, Bengal.	" Loan business	50,000
Naldanga Loan Office (a) (ii)	Dir., S. K. Maitra, Naldanga, Rangpur, Bengal.	" "	50,000
Akkelpur United Bank (a) (ii)	Dir., M. Agarwala, Akkelpur, Bogra, Bengal.	" "	1,00,000

Class and Name *	Names of agents, Secretaries, etc, and situation of registered office,	objects	Authorised Capital
Wagers Loan Co. (a) (ii)	Dir., B. Banerjee, 3, Royal Exchange Place, Calcutta.	Money lending business	1,00,000
Land and Loan Cernoration (a) (ii)	General Mangon, M. Garudachary, Madras.	" "	2,00,000
Sholapur Loans Advancing Co.* (a) (ii)	Mg. Dir, Shakharam B. Chakhote, Mangalwarpeth, Sholapur, Bombay.	" "	20,000
Ambur Bharathi Bank (a) (ii)	Mg. Dir, N. Ramlinga Mndallar North Arcot, Madras.	Chit "	20,000
Walajubad Jauanukula Saswath Nidhi (a) (ii)	Dir., W. S. Muruglesa Mudallary, Chinglopnt, Madras.	Banking and Loan	20,000
Hukumchand Insurance Co (b) (ii)	Dir., R C. Jall, 30, Clive Street, Calcutta.	Insurance business	50,00,000
United National Insurance Co. (b) (i)	Managing Agents gind Industries Preedy Ruad Karachi Bombay.	"	500,000
Indian Commerce Industries and Manufactures (b) (i)	Mg. Dir., Y. B. Kulkarni 36 Hummum Street Fort, Bombay	" "	1,00,000
Andhra Provident Co (b) (ii)	Mg Dir, D, Veerataghaviah, Kistna, Madaas	Provident Insurance	20,000
Andhra National Live Stock Regn Bank (b) (ii)	Mg Dir, A, Dathathreeyaeu, Guntur, Madras	Live Stock insurance	1,00,000
Rayadrug National Live Stock Redgn, Bank (b) (iii)	Mg Agent, V K Lakshmana Mudaliar, Madras	" "	20,000
Burma Insurance Underwriters (b) (iii)	209, Bow Lane, Kandamgale Rangoon.	Insurance, business	10,000
Total, Banking, Loan and Insurance	...	...	26,00,00,000

*Private

Class and Name	Name of agents, secretaries, etc, and situation of registered office,	Objects	Authorised Capital
II.—Transit and Transport.			Rs
Dighapatiya Transport Co (a)	Dr, D, N, Maitra Dighapatiya, Rajshahi, Bengal	Motor Boat Service	50,000
Reform Taxi Cab Co' (c)	6, Tiljala, Road, cal	Motor manufacturing business.	3,00,000
Bombay Motor Sales (c)	Mg, Dir, Mohammed Abdulla and another, Rusi Mansion, Huges Road, Bombay	Dealing in moter cars and accessories, etc,	1,00,000
Bombay Automobiles (c)	Jubbulpore C· P	" "	1,00,000
Travancore Motors and General Engineering Co, (c)	Dir, Trivandrum	Conducting motor service	1,00,000
Total Transit and Transport ...		...	7,50,000
III.—Trading and Manufacturing,			
Bengal Pharmaceutical Co (c)	Dir, P C, Roy Chowdhury, Dacca, Bengal,	Manufacturing medicines, etc,	2,00,000
Calcutta Ayurvedic Pharmacy (c)	Dir, D, C, Mazumder, 4, Chakku Khansama Lane, Calcutta,	" "	1,00,000
Yoga Yati Oushadhalaya (c)	Dir, A B, Roy, 79, Swamibag Road, Dacca, Bengal	" "	20,000
Kashi Valdyamrita Works (c)	Jalanbar, Beneras citty, U P,	" "	1,00,00
Chemical Products (c)	67-69, Lewis Street, Rangoon	" "	10,00,000
Nadia Leathergoods Manufacturing Co, (f)	Dir, Kalidhan Chatterjee Krishnagar, Nadia, Bengal,	Manufacturing Leathergoods	20,000

Class and Name.	Names of agents, secretaries, etc, and situation of registered office.	Objects	Authorised Capital. Rs.
Fisk Tyre Co (India)* (a)	Mg. Dir., George Frankein Tucker, Hughes Road, Bombay.	Dealing in Rubber tyres	30,000
Lonavla Khandalla Electric Supply Co. (b)	Managing Agents, J. J. Maneckii & co. Sardar building Appollo Street, Fort, Bombay.	Supplying of electricity.	2,50,000
Nadiad Electric Supply Co., (h)	Mg. Agents, Parikh Shah & co., Richey Road, Ahmedabad, Bombay.		4,00,000
Sri Murugan Tile Works (i)	Mg. Agents, P. V, R. Veerappa Chettiar & Co., Ramnad, Madras.	Manufacturing tiles	5,00,000
Krishna Glass Works (j)	Hathras junction, E. I. Railway Aligarh, United Provinces.	Manufacturing of glass, etc.	1,00,000
New India Agency* (l)	Comilla Town. Bengal	Mg. agents business	9,600
Sind Industries* (l)*	Mg, Dir, Alim T. Gidwani, Preedy Road, Karachi, Bombay	Agency business	25,000
Bengal Medical Stores* (s)	Dinajpur Town, Bengal	Buying and selling of metalic substance and medicines.	20,000
Bakhtarpur Fishery Banking and Trading Co. (s)	Dir. R. B. Kar nakar, Bakhtarpur Siddhanla Bagmara, Pabna, Bengal,	Fishery business	75,000
Durga Daha Trading and Banking & Co (s)	Dir., Md M. Hossain, Durga Daha Hut, Radhikanagar, Dt, Bogra, Bengal,	Buying and selling of movable and immovable properties.	1,00,000
Anglo American Oil Products* (s)	P105, Russa Road South, Calcutta.	Business of all kinds of mineral products.	20,000

Class and Name	Names of agents, secretaries, etc, and situation of registered Office	Objects,	Authorised Capital, Rs,
Kanhia Lal & Co.* (s)	7a, olive Row, calcutta,	General merchants, brokers, dealers commi-sion agents.	5,00,000
Sri Meenacshi Importing Co (s)	Dir. C. V. Rajam Naidu, Madura, Madras.	General merchants.	25,000
Savale Trivedi & co.* (s)	Mg Dir, Lalitabai, Savale 58, Medows Street, Fort, Bombay.	Exporters and importers	1,00,000
III.—Trading and Manufacturing—contd.			
Hairoiline & Co*. (s)	36. Sheo Charan Lal Road, Allahatad,	Dealers in hair oils, etc.	20,000
J. D. Khosla & Co, (s)	Mg, Dir, Sauna Das Khosla, Lahore, Punjab.	Exporters and importers of raw materials.	2,00,000
Taj Company (s)	Mg. Dir, Enayetullab, Lahore, Punjab	requisltes toilet	1,00,000
Barnea & Co (s)	95-97, 36, th, St, Rangoon	General merchants	2,00,000
Total, Trading and Manufacturing	...	...	42,94,600
IV.—Mills and Presses.			
Shamshuddin Mian Ram Charittar Shah oil and Rice Mills (g)	Maha'la Delha, Gaya	Working oil and rice mills	1,98,000
Rangpur Hossiery (k)	Dir, B, B, Shaha Chowdhury, Mahiganj Dt, Rangpur, Bengal.	Manufacture of socks, sweater, etc.	1,25,000
Total, Mills and Presses...		...	3,23,000
V.—Tea and other Planting Companies.			
Baishakipunji Tea Co, (a)	Dir, U N. Mukherjee, Comilla Town, Bengal	Tea Planting business	3,00,000

*Private

Class and Name	Names of Agents, Secretaries, etc, and situation of registered office,	Objects	Authorised Capital Rs
Dibru Nudee Tea Co, (a)	Rehabari, Dibrugah, Assam	Tea Planting business	2,50,000
VI.—Mining and Quarries,		...	
Mitter's Mica* (f)	14, Ahiritola St, Cal,	Mica business	10,00,000
VII.—Estate, Land and Building			
Chatterjee Estates*	13A, Gour Mohon Mukherjee St, Cal.	Acquiring Estates Zemindaries etc.	51,000
XI.—Companies other than those specified above.			
Central Bank Executor and Trustee Co,*	Mg, Dir, S, N. Pochkhanawala, Esplanade Road, Bombay.	Acting as trustees	20,00,000
Surma Valley Stock	Silchar, Assam,	To carry on miscellaneous business.	10,00,000
Companies Limited by guarantee and associations not for profit.	...	...	Number of Members
Oxford Mission Trust Association (I) (a) (iii)	42, Cornwallis St, Cal,	Holding in trust properties for the benefit of the Oxford Mission.	7
Chota Nagpur Diocesan Trust Association I (a) (iii)	Dir, and Chairman Bishop of Chota Nagpur, Chota Nagpur Diocesan Office, St, Paul's Cathedral, Ranchi	Holding properties in trust for the benefit of Chota Nagpur or members of the Church.	20
Calcutta Country Spirit Opium and Drug Association	Secy, Mohitosh Shaw. 12-1. Old post Office Street, Calcutta,	Protecting the trade of country spirit, opium drug in Cal.	200

* Private.

Class and Names	Date of Registration	Capital Paid-up	Date of Liquidation	Final dissolution
III.—Trading and Manufacturing		Rs.		
Indian Steel Wire Products	23 May, 1927	[illegible]	...	13th May, 1929†
Ramjiban Roy	9th Sept. 1926		...	
& Co. Bengal.	25th Aug, 1926	14,425	...	16th May, 1929†
Byzur Rahamania Trading Co. Madras.				7th May, 1929.†
Pavarathy Trading Co, Madras	3rd Feb, 1920	7,201		
New Bombay Brush Manufacturing Co. Bombay.	29th Mar, 1920	66,654	24th May.	28th May, 1929.†
IV.—Mills and Presses.				
Ramdas Khimji Trading Co. Bombay	18th Oct. 1924.	10,00,000	23rd May 1929	...
Kaity Sri Jayalakshmi Vilasa Nidhi Madras.	23rd Feb., 1921	19,105	21st Apl, 1929.	...
Samastipur Co-operative Stores Association	18th Apl. 1895.	9,340	" "	...
Laxmi Electric Printing Press Co. Baroda	22nd Mar, 1920	78,6000	" "	...
Narayanganj Button Manufacturing Co. Bengal.	23rd May, 1921	26,290.	31st Dec., 1928	
Madura Firewood Trading Co, Madras.	11th Feb., 1924	39,600	26th Apl., 1929	...
Ocean Jute press	12th Dec, 1918.	...	18th Jan., 1929.	...
II.—Transit and Transport.				
Bombay and Africa Steam Navigation Co., Bombay,	25th July, 1919.	2,40,600	10th May, 1916.	28th May, 1629.
VI. Mining and Quarrying				
Sasaram Lime Bengal.	23rd Nov, 1920.	7,56,000 / 9,28,000	4th June, 1926.	23rd May. 1929.
GRAND TOTAL.				
Cooptus III (c) Benal.	19th Sept. 1924	1,000	27th Aug. 1928.	2nd Apl. 1929.
Paris Cinema and Varieties Bengal.	11th July, 1919	54,242	7th Dec, 1925.	30th Apl, 1229.

বছর যেমন তেমন করিয়া দিন কাটিয়াছে, কিন্তু এখন পূজার সময় ভাল জিনিষ পত্র কিনিয়া গৃহে সকলের মুখেই একটু হাসি ফুটাইতে হইবে। আজ বছর ত "হুতুতিসাতের" দিন গুজরান করিয়াছি; এখন পূজার এই দিন কয়টা একটু আনন্দে কাটানো যাক।

কলিকাতার দোকানী মহলে এখন হইতেই সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। আমরা মফঃস্বলের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য পূজার বাজার করিবার কতকগুলি জায়গার পরিচয় দিতেছি। আমাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলেই ইঁহারা সকলে আনন্দের সহিত আপন আপন দোকানের ক্যাটালগ, মূল্য তালিকাদি পাঠাইয়া দিবেন।

বাহারী কাপড় এবং কাটা কাপড়

পূজায় যাঁহারা বাহারী এবং নানারকমের ক্যাম্বিক কাপড়াদি কিনিতে চান তাঁহাদিগকে আমরা সর্বাগ্রে ক্যাল্কাটা স্টোর্স এবং কমলালয়ে পদার্পণ করিতে পরামর্শ দিতেছি। ঢাকাই, শান্তিপুরী, ফরাসডাঙ্গা, টাঙ্গাইল, বেনারসী, ভাগলপুরী মাদ্রাজী, মারহাট্টি, বোম্বাই, সিন্ধী, পার্শী ইত্যাদি সকল প্রসিদ্ধ আড্ডাএর নানারূপ ধুতি ও শাড়ীর এমন বিচিত্র সমাবেশ সহসা অন্যত্র দেখা যায় না। ইহা ছাড়া পূজায় ছেলে মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের জন্য ইঁহারা যে বিপুল আয়োজন করিয়াছেন তাহা দেখিলে চোখ ঝলসাইয়া যায়।

লোকে বলে "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে।" ক্যাল্কাটা স্টোর্স এবং কমলালয়ের পূজার আয়োজন দেখিয়া মনে হয় যে সত্য সত্যই ইহাদের দোকানে যাহা নাই তাহা বুঝি কলিকাতার বাজারে আর কোথাও নাই। ক্যাল্কাটা স্টোর্স এবং কমলালয়ের পরেই কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে পাল কোম্পানী, বৈকুণ্ঠ নাথ ভাই, বিশ্বনাথ কাশীনাথ এবং [illegible] ক্রেণ্ড্স সোসাইটী, ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী ও [illegible] স্টোর্সের নাম উল্লেখ যোগ্য; বড়বাজারে জহর লাল পান্নালাল এবং স্বদেশী যুগের প্রাচীন, লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী এ, বর্দ্ধনের নাম সর্বজন বিদিত। কাটাকাপড়ের জন্য যাঁহারা আজিও চাঁদনী'র মায়া এড়াইতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে আমরা সুপ্রসিদ্ধ রায় কোম্পানী এবং আহেল মোল্লার দোকানে পদার্পণ করিতে পরামর্শ দিতেছি।

মিলের কাপড়

ক্যাম্বিক এবং কাটা কাপড় ছাড়া পূজার কাপড় বলিতে সাধারণে মিলের এবং তাঁতের ধুতি শাড়ীই বুঝিয়া থাকে; কারণ আপামর সাধারণ পূজার সময় সকলকে মিল এবং তাঁতের ধুতি শাড়ীই সাধারণতঃ উপহার দিয়া থাকে। ইহার জন্য উপরোক্ত দোকান গুলি ছাড়া ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী, ক্রেণ্ড্স সোসাইটী যাদব বস্ত্রালয় প্রভৃতি বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল স্থানে গেলে ঠকিবার সম্ভাবনা নাই।

গন্ধ দ্রব্যাদি

কাপড়ের পরেই পূজার বাজারে গন্ধ দ্রব্য কিনিবার হিড়িক। এমন কোন হতভাগ্য নাই যে পূজার দিনে আপনার প্রিয় পরিজনের জন্য অন্ততঃ এক শিশি সুগন্ধি তৈল, একখানা সাবান এবং কোনও না কোন একটী এসেন্স না কিনিবে; সুগন্ধি তৈলের কথা উঠিলেই সকলের আগে অতি প্রাচীন, [illegible] গুণে ও গন্ধে অপরাজেয় জবাকুসুম তৈল। [illegible]

প্রস্তুত মস্তিষ্ক এবং কেশের প্রকৃত কল্যাণকর যে সকল সুগন্ধ সুন্দর কেশ তৈল বাজারে বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রফেসর ব্যানার্জীর কৃত বিহার মিসেলেনীর সুপ্রসিদ্ধ কষ্ট্যান হেয়ার অয়েল এবং প্যারী প্রত্যাগত বিখ্যাত কেমিষ্ট মিঃ জে, চক্রবর্তীর কুন্তেলিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। কারণ এই দুইটী কেশ তৈলের পশ্চাতে দুইজন বিখ্যাত কেমিষ্টের অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা এবং অধ্যবসায় নিহিত রহিয়াছে।

বাজারে বিহার মিসেলেনী আজ যে আদর এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার মূলে আচার্য্য পি, সি, রায় মহাশয়ের কৃতীছাত্র প্রফেসর মুকুন্দ ব্যানার্জীর অক্লান্ত সাধনা এবং নিষ্ঠা। এদেশের গন্ধ দ্রব্যের ব্যবসায় অগ্রনী ছিলেন পরলোক গত H. Bose যিনি কুন্তলীন বাহির করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন; তাঁহার প্রচারিত doggrel বা ছড়া একদিন বাংলাদেশের পথে ঘাটে বালক বালিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শোনা যাইত—

"কেশে মাখো কুন্তলীন্
রুমালেতে দেল্ খোস্
পানে খাও তাম্বুলীন্
ধন্য হবে এইচ্ বোস্।"

এইচ্ বোসের মৃত্যুর পর আর সে দেশব্যাপী Pnblicity এবং প্রোপাগাণ্ডার আয়োজন দেখিতে পাই না। তখন বাংলা দেশে এমন কোনও কাগজ ছিল না যেখানে H. Boseএর কুন্তলীন এবং দেল খোসের রকমারী বিজ্ঞাপন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিত। এখন আর কুন্তলীন ও দেলখোসের নাম কোথায়ও বড় একটা দেখিতে পাই না। বাজারে গন্ধ দ্রব্য কিনিতে বাহির হইলে লোকের মনে সে সময় কুন্তলীন আর দেল খোস ছাড়া আর কোন নামই সহসা মনে আসিত না, আর আজ প্রোপাগাণ্ডার অভাবে কুন্তলীনের নামই মনে পড়ে না।

যাক যে কথা বলিতেছিলাম তাই বলি। এইচ বোস নিজে কখন বিদেশে যান নাই। নিজের প্রতিভা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সাধনার বলে এদেশে থাকিয়াই কুন্তলীন ও দেলখোস বাহির করিয়াছিলেন। এইচ বোসের পর যে কয়েকজন বাঙ্গালী বিদেশে গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর শিখিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মিঃ জে, চক্রবর্তীর নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং সর্ব্বজন পরিচিত। কারণ তিনিই সর্ব্বপ্রথম এদেশ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া বিদেশে গন্ধ দ্রব্যের রসায়ন শিক্ষার্থ গমন করেন এবং দীর্ঘকাল প্যারী ও লণ্ডনে শিক্ষা লাভ করতঃ লণ্ডনে F. C. S. এবং প্যারীর M. S. C. উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর দেশে ফিরিয়া প্রথমে কবি প্রমথ নাথ রায় চৌধুরীর সাহায্যে Oriental Soap Factory স্থাপন করেন এবং পরে মহীশূর, বরোদা, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে বহুকাল যাবত কেমিক্যাল Adviserএর কার্য্য করেন।

তিনি এখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় কুন্তেলিয়া পারফিউমারী ওয়ার্কস নামে এক গন্ধ দ্রব্যের কারখানা খুলিয়াছেন এবং আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার কুন্তেলিয়া হেয়ার অয়েল এবং ধোবীরাজ সাবান বাজারে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। আমাদের ব্যবসায়ী গ্রাহকদিগের নিকট হইতে আমরা অনুযোগ পাই যে কুন্তেলিয়া এবং ধোবি-রাজের যথেষ্ট যোগান মেলে না। এই অভাব দূর করার জন্য মিঃ চক্রবর্ত্তী পার্ক সার্কাসে জমি নিয়া বাড়ী ও কারখানা তৈয়ারী করিতেছেন এবং

ভাঁহাদের যে পুরাণ পুর্ব্বেই বাণিজ্যতলা হইতে সেখানে কারখানা স্থানান্তরিত হইবে। এই সকল শিক্ষিত কৃতবিদ্য কেমিষ্টগণ গন্ধ দ্রব্যের আসরে নামায় পুরাণো সাবেকী ঢংএর কারবার আর বাজার দখল করিয়া থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

স্নেশ্‌মী

কেশ প্রসাধনের ব্যবসায়ে যুগান্তর আনিয়াছে স্নেশ্‌মী। স্নেশ্‌মী জিনিষটা যে কি অনেকে তাহা হয়ত জানেন না। ইহা গন্ধ তেল নহে, কিন্তু তেল যাহাতে মাখাইতে হয় সেই মাথা এবং মাথার শোভা কেশরাশি রক্ষা করিবার ইহা এক অপরিহার্য্য উপাদান। মাথায় কেবল তেল মাখিলেই হয় না। তেল বাহিরে গন্ধ বিস্তার করিয়া নিজের এবং অপরের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাথার আসল শোভা যে কেশ, তাহার যদি উপকার না করিতে পারে তবে সবই পণ্ডশ্রম হইয়া যায়।

সকলেই জানেন প্রত্যেক কেশের মূলে সাদা সাদা অতি ক্ষুদ্র গোল দানার স্থায় একটি sac বা থলি আছে। ঐ থলিটীর মধ্যে যে স্নেহ পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহার দ্বারাই কেশের কান্তি ও পুষ্টি সাধিত হয়। আমাদের দেহের রোমকূপগুলি যদি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তবে শরীর হইতে ঘাম নিঃসরণ হইয়া দেহের ক্লেদ যেমন সহজে বাহির হইয়া যায়, তেমনি গায়ের চামড়ারও যাহা খুঁটি থাকে এবং তাহাকে সর্ব্বদা মসৃণ রাখিয়া দেহের কান্তি ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু যদি অপরিচ্ছন্নতার জন্ত এই রোমকূপগুলি বন্ধ হইয়া যায় তবে শরীরও যেমন অসুস্থ হইয়া পড়ে দেহের কান্তি ও লাবণ্যও তেমনি নষ্ট হইয়া যায়।

কেশের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম মাথার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা প্রযোজ্য। চুলের গোড়ায় যদি ক্রমাগত ময়লা জমিয়া এই থলিগুলি হইতে স্নেহ পদার্থ নিঃসরণের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায় তবে অচিরকালের মধ্যেই চুলের রুক্ষা রুক্ষা হইয়া যায়। ইহার প্রথম লক্ষণই এই যে আঁচড়াইবার সময় গোছা গোছা চুল উঠিয়া যায় এবং যেখান হইতে চুল উঠিয়া যায় সেখানে আর নূতন চুল গজাইতে পারে না; কারণ সে রোমকূপ হইতে স্নেহ নিঃসারণের যে duct বা নালী আছে তাহা ময়লা জমিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পয়ঃপ্রণালী সাফ করার স্থায় যতদিন ঐ রাস্তা আবার পরিষ্কার করা না হইবে ততদিন সেখানে নূতন চুল উঠিবার আশা আকাশ কুসুমের স্থায় বিড়ম্বনা মাত্র। কেমন করিয়া চুলের গোড়ায় এই ময়লা জমে এইখানে সে সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাঁহারা সহর বাজারে বাস করেন তাঁহারা যে সর্ব্বদা ধুলা এবং ধোঁয়ার মধ্যেই বাস করিতেছেন একথা আশা করি কাহাকেও আর কষ্ট কল্পনা করিয়া বোঝাইতে হইবে না। রাস্তায় বাহির হইলে সামান্ত একটু দমকা বাতাস বহিলেই ধুলার ঝড় উঠে এবং সেই ধুলা দেহের সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত হয়। কলিকাতার স্থায় ধুমবহুল সহরে সকালে নাকে আঙুল দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন নাকের মধ্যে এক পরদা ধোঁয়ার স্তর পড়িয়া গিয়াছে। ধুলা এবং ধোঁয়া যেমন করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র স্তরে স্তরে জমিয়া যাইতেছে তাহা চোখে দেখিতে না পাইলেও অবিশ্বাস করার উপায় নাই; কারণ বাহির হইতে বাড়ী আসিয়া আমরা হাত দিলেই সকচ্‌ সকচ্‌ করিয়া বুঝি যে চুলের মধ্যে আমরা কিসের আমদানী করিয়া আসিয়াছি এবং ধোঁয়া যে বাতাসে মিশিয়া থাকে

আর কেশের গোড়া যদি ময়লা ও আবর্জনায় বোজা বন্ধ হইয়া যায় তবে হাজার সুগন্ধি তৈলই মাখনা কেন সবই পণ্ডশ্রম হইয়া যায়। তাই যাঁহারা সত্যসত্যই কেশের শ্রীবৃদ্ধি চান তাঁহাদের পক্ষে রেশ্মী অথবা এইজাতীয় Shampoo একেবারে অপরিহার্য্য।

রীঠা, বেশন ইত্যাদি দিয়া মাথা সাফ করিলে চলে সন্দেহ নাই। কিন্তু এযুগে যদি কেহ বলে যে নৌকা করিয়া ঢাকায় যখন যাওয়া যায় তখন আর অনর্থক রেলে চড়িয়া বেশী পয়সা দেই কেন, তবে সে যেমন out of date, out of time বলিয়া হাস্যাস্পদ হয়, তেমনি চুল সাফ করিবার অতি সহজ উপায় থাকিতে যাহারা প্রাচীন গরুর গাড়ী অথবা রেড়ীর প্রদীপের যুগে যাইতে বলে তাহারাও তেমনি out of date এবং out of time.

তাহা ছাড়া আর একটা কথা ভাবিবার আছে। রীঠা বা বেশম কেবলমাত্র চুলের তৈলাক্ততায় নষ্ট করিয়া দেয়, জটা ছাড়াইয়া দেয় এবং কেশ মূলের আবর্জনাও দূর করে সন্দেহ নাই। কিন্তু রেশ্মী তাহা ছাড়াও চুলের কান্তি ও পুষ্টিসাধনে সহায়তা করে, কারণ বিখ্যাত রাসায়নিকের চেষ্টায় ইহার সহিত কেশপরিবর্দ্ধক অন্যান্য উপাদানও মিশ্রিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। মানুষ সব বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে চাহে। ইংরাজীতে ইহাকে How, Why and Where fore এর যুগ বলে। শিশুও বিনাপ্রশ্নে সব কথা মানিয়া লইতে চায় না। তাহার "কেন্‌র" উত্তর দিতে দিতে অনেক সময় বিরক্ত হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং এইযুগে যে লোকে বিজ্ঞানের নানা তথ্য জানিতে আগ্রহান্বিত হইতেছে ইহা আশা ও আনন্দের কথা। "অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতেছে যখন Quack ও ঠগের রাজত্বের অবসান হইবে।

"এইরূপে কোন প্রসাধন সম্বন্ধে যতই নব নব তত্ত্বের কথা আলোচিত হইবে এবং লোক সমাজে প্রকৃত তত্ত্ব সকল প্রচারিত হইয়া জনমত গঠিত হইতে থাকিবে, ততই রেশমী জাতীয় বৈজ্ঞানিক তৈলাদির প্রসার ও প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িবে ইহাতে আমাদের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রচার এবং প্রোপাগ্যাণ্ডার দ্বারা কালীঘাটের পট, বটতলার ছাপা যেমন ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছে, গন্ধ দ্রব্যের রাজ্যেও তেমনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি যতই প্রচারিত হইতে থাকিবে ততই Quack এবং ঠগের রাজত্ব সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে। আমাদের উক্তি যে যথার্থ তাহা রেশ্মীর অসম্ভব কাটতি দেখিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। এ ঠিক যেন আলেক্‌জাণ্ডারের দিগ্বিজয়,—একেবারে যেখানে যান, Vini Vidi Vici.

কয়েকমাস হইল রেশ্মী বাহির হইয়াছে—কিন্তু যেদিকে যাই, যেখানেই যাই, সর্ব্বত্রই দেখি রেশ্মী—দেশের বাজার এবং সর্ব্বোপরি দেশের লোকের চিত্ত দখল করিয়াছে। জিনিষটা হইয়াছে খাঁটি; এখন যত ব্যাপকভাবে নাড়াচাড়া দিতে পারিবে ততই ইহার যশ দিগদিগন্তে পৌঁছিবে। আমরা আমাদের মফঃস্বলের ব্যবসায়ী, এজেণ্ট, ক্যানভাসার সকলকেই রেশমী ষ্টক করিতে পরামর্শ দিতেছি, কারণ রেশমী অচিরেই প্রসাধন জগতে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিবে।

জ্যাব্রাক্স।

চামেলি সাবানে ক্যানকাটা সোপের সহিত টক্কর দিতে পারে বেশী এমন কোনও সাবান বাজারে আর নাই। ইহাদের সবগুলি গন্ধ

সংখ্যায় আমরা বিশেষ পরিচয় দিয়াছি সুতরাং এবার আর নূতন করিয়া কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

গন্ধদ্রব্যাদি

দেশী এসেন্সের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যালের "অগুরু" এইচ বোসের "দেলখোস্" শর্মাব্যানার্জ্জীর হিমানী এবং পি, এম বাগ্‌চির এসেন্সই দেশের লোকের চিত্ত হরণ করিয়াছে।

বাদ্য যন্ত্রাদি

কাপড়, গন্ধতেল এবং গন্ধদ্রব্যের পরেই পূজার বাজারের প্রধান আকর্ষণ হইতেছে হারমোনিয়াম, গ্রামোফোন, ক্লারিওনেট আদি বাদ্য যন্ত্র। যে গৃহে এই সকল দ্রব্যের আয়োজন নাই সে গৃহ যেন শ্রীহীন, শোভাহীন। বৈঠকখানায় যদি একটী সুদৃশ্য হারমোনিয়াম অথবা গ্রামোফোন্ থাকে তবে ঘরখানির শোভাই যে শুধু বাড়িয়া যায় তাহা নহে, পরন্তু অবসর কালে চিত্তবিনোদনের এমন সহায় আর নাই। বিশেষতঃ যে গৃহে মেয়েরা সঙ্গীত কলাকুশলা সে গৃহে নিত্যই আনন্দের তুফান ছুটে। পূজার বাজারের তাই প্রধান আকর্ষণ সঙ্গীত যন্ত্রাদি। এরাজ্যে শোভা, সম্পদ এবং সুলভতায় বাংলা দেশে যাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডোয়ার্কিন এবং এম, এল সাহার নাম না জানেন এমন লোক বাংলা দেশে কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের দোকানে পদার্পণ করিলে বাঁশবনে ডোমকানার মত দশা হইয়া পড়ে। কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা কিনি তাই ভাবিয়া অস্থির হইতে হয়। এই সকল বাদ্য যন্ত্র ছাড়া আজকাল অতি দ্রুতগতিতে রেডিওর প্রচলন হইতেছে; এ সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতার Russa Engineering works Ld হইতে Philips-এর Radio Set, ড্যালহাউসী স্কোয়ারের Radio supply Stores হইতে এবং College Street হইতে Indian Radio Research Institute হইতে যে সকল রেডিও সেট বিক্রয় হইতেছে তাহা গুণে, সৌন্দর্য্যে এবং সস্তায় আর সকলকেই কানা করিয়া দিয়াছে। ইহাদের নাম ও ঠিকানা আমাদের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিতে পাইবেন এবং আমাদের নাম দিয়া পত্র লিখিলেই ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল সংবাদ এবং সচিত্র ক্যাটালগাদি পাইবেন।

বৈদ্যুতিক আলো

আজকাল অনেক সহরে বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় আলো এবং পাখার কোনও অসুবিধা নাই; কিন্তু সহরের বাহিরে অনেক ধনী, জমিদার, চা কর এবং অন্যান্য বড়লোক আছেন যাঁহারা আলো এবং পাখার অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। পূজার সময় পূজার মণ্ডপ, গানের আসর এবং সমগ্র বাড়ীটা যদি বিদ্যুতের আলো এবং বিজলী চালিত পাখার দ্বারা সজ্জিত করা যায় তবে সমস্ত বাড়ীটা যেন পরীমহল্ বলিয়া ভ্রম হয়। আমাদের কাগজে Delco Light নামক যে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে তাহা দ্বারা অতি সুলভে এই সকল কাজ সাধিত হইতে পারে। যাঁহারা এই কলের সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে চান তাঁহারা আমাদের নামোল্লেখ করতঃ পত্র লিখিলে সচিত্র বিবরণাদি সব পাইবেন। মফঃস্বলের দোকানদার এবং ব্যাবসায়ীদিগকেও আমরা এই লাইন ধরিতে পরামর্শ দিতেছি কারণ

লোকে ইহার স্বাদ্ পাইলে অনেক ফল বিক্রয় হইতে পারে।

জুতা

পূজার বাজারের আর এক আকর্ষণ হইতেছে জুতা। জুতা যে কতরকমের এবং কত প্যাটার্ণের হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বলিব? তার চেয়ে বলি যে কলেজষ্ট্রীট মার্কেটের জুতাপটী একবার ঘুরিয়া তবে জুতা কিনিবেন। যত দোকান ঘুরিবেন ততই নূতন নূতন জুতার ফ্যাসন্ দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যাইবে। সেই জন্য আমরা পরামর্শ দেই সকল দোকান ঘুরিয়া বাজারের ভাব দেখিয়া যেখানে যেরূপ জুতা পছন্দসই দেখিবেন তাহাই কিনুন।

পূজা আসিতেছে, আগমণীর বাদ্য সুরে বাজিতেছে; প্লাবন হউক, মহামারী হউক, দুঃখ, দৈন্য, বিপদ আসিয়া আমাদের গ্রাস্ করুক, তবুও এযে বাঙ্গালীর মহামহোৎসব—বাঙ্গালার দুর্গোৎসব; হ্যাঁথা ক্যাঁথা বেচিয়াও বাঙ্গালী পূজার বাজার করিবে। অতএব বুঝ সবে যে জান সন্ধান!

গৃহে সঙ্গীত যন্ত্রের স্থান।

গ্রামোফোন, রেডিও বা অন্যকৃত সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আপনি সামান্য একটু চেষ্টা করিয়া কোনও একটী সঙ্গীতযন্ত্র আয়ত্ব করুন ও উহার সাহায্যে সঙ্গীত চর্চ্চা করুন, দেখিবেন উহাতে যে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেন, তাহার তুলনায় পূর্ব্বকথিত আনন্দ কিছুই নয়। তা ছাড়া নিজে একটু সঙ্গীতজ্ঞ না হইলে অন্যকৃত সঙ্গীত ভালরূপ উপভোগ করিতে পারা যায় না।

আপনার নিজের যদি সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধা বা অবসর না থাকে, বাড়ীতে কয়েকটী সঙ্গীত যন্ত্রকে স্থান দিয়া পরিজনবর্গকে সঙ্গীত শিক্ষার ও চর্চ্চার সুবিধা করিয়া দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য। এখন সঙ্গীত যন্ত্রকে আর সখের জিনিষ মনে করা চলে না; গৃহের স্বাস্থ্য, শান্তি ও প্রফুল্লতা রক্ষার জন্য সঙ্গীতযন্ত্র অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। যাহার তেমন সঙ্গতি নাই তিনি অন্ততঃ ১৲ বা ২৲ টাকা দামের মত একটি পিতলের বাঁশী গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

সঙ্গীত শিক্ষা করিতে গেলে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে পারে ইহা মনে করা একেবারে ভুল। বরং সঙ্গীত চর্চ্চা করিলে মনের চাঞ্চল্য দূর হইয়া একাগ্রতা আসে ও বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়া পড়াশুনার সহায়তা করে; ইহা পরীক্ষিত সত্য। কলিকাতায় যে সকল প্রসিদ্ধ সঙ্গীত যন্ত্র বিক্রয়ের দোকান আছে তন্মধ্যে ডোয়ার্কিনের বাড়ী সঙ্গীতযন্ত্র পাইবার একটি প্রধান ও নির্ভরযোগ্য স্থান। আজ কাল যে হাত হারমোনিয়মের এত প্রচলন উহা ডোয়ার্কিনের বাড়ীর আবিষ্কার, ইহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। ৬০ বৎসরের এই পুরাতন ও বিশ্বস্ত কার্য্যের সঙ্গীতযন্ত্র গুলির উৎকর্ষতা সর্ব্বজন বিদিত ও উহাদের সুর ও গঠন একেবারে নিখুঁত বলিয়া ডোয়ার্কিনের যন্ত্র ব্যবহার করিয়া বেশী তৃপ্তি পাওয়া যায়, সুতরাং শিক্ষাকালীন উৎসাহ জন্মাইয়া শিক্ষার সহায়তা করে।

আমরা অবগত হইলাম যে ডোয়ার্কিনের পরিচালকগণ আগামী পূজা উপলক্ষ্যে অল্প কয়েক দিনের জন্য তাঁহাদের বিবিধ পণ্যদ্রব্যগুলি বিনা লাভে বিক্রয় করিবেন। গৃহের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য দুই একটি সঙ্গীত যন্ত্র সংগ্রহ করিবার এরূপ অপূর্ব্ব ও অসাধারণ সুযোগ আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

৮নং ডালহাউসি স্কোয়ার কলিকাতা, এই ঠিকানায় ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্সের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে বা সাক্ষাৎ করিলে উপরোক্ত সুবিধাতে ক্রয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ও নিয়মাবলী সমস্ত জানিতে পারিবেন।

হারমোনিয়ম, অর্গেন, বেহালা, এসরাজ, সেতার, পিত্তলের বাঁশী, কাঠের ফ্লুট ও ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট, ক্ল্যারিওনেট 'পদি' ও 'ডেকা' গ্রামোফোন প্রভৃতি যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র সুবিধাতে ক্রয় করিতে পারিবেন। আমাদের মনে হয় আগামী পূজার সময় প্রিয়জনকে উপহার দিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ কেহ উপেক্ষা করিবেন না।

ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি খাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন —যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট

মোং লাঙ্গল বাঁধ বাজার।

পোঃ আবাইপুর জেলা যশোহর।

ওজন ৬০, ৮০, ৮২৷৵০ আনার।

সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়, হাটে সমস্ত প্রকার জিনিষের আমদানী রপ্তানি হয়। নিকটে গড়াই নদীতে নৌকায় মাল দিয়া কুষ্টিয়া E. B. Ray ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হয়।

১। Shawrail Dass Estate জমিদার।
২। শ্রীপ্রাণনাথ মণ্ডল, কাপড় বিক্রেতা।
৩। উদ্ধবচন্দ্র কুণ্ডু, গুড়ের কাজ।
৪। শ্রীনগরবাসি কুণ্ডু, অশ্বিনীকুমার কুণ্ডু, বেনেতী মসলা।
৫। শ্রীসাধুচরণ সোণা রূপার কাজ।
৬। শ্রীমেনাজদ্দি বিশ্বাস, ধান্য বিক্রেতা।
৭। শ্রীব্রজনাথ কুণ্ডু, কাপড় বিক্রেতা।
৮। শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ডু, ডাঃ এলোপ্যাথিক
৯। শ্রীআর্কাসআলী বিশ্বাস, করগেট টীন।
১০। শ্রীগদাধর কুণ্ডু, পাট খরিদদার।
১১। শ্রীযজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু তেল লবণ বিক্রেতা,
১২। শ্রীবিপিনচন্দ্র কুণ্ডু, যুগলকিশোর কুণ্ডু বেনেতী, ধান, চাউল।
১৩। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ঐ
১৪। শ্রীতরণীকান্ত কুণ্ডু ঐ
১৫। শ্রীপুলিনবিহারী সাহা, নানারূপ কল।
১৬। ৺দীননাথ সাহা, পাট খরিদদার বেপার এবং টীন ও কাঠের আড়ত।
১৭। শ্রীরসিকলাল কুণ্ডু, ময়রা।
১৮। শ্রীরামচরণ কুণ্ডু ঐ
১৯। শ্রীমুকুন্দলাল কুণ্ডু, বেনেতী মসলা।
২০। শ্রীবসন্তকুমার কুণ্ডু, তৈল লবণ।
২১। শ্রীগুরুলাল কুণ্ডু, বিনোদবিহারী কুণ্ডু, নানাপ্রকার কাপড়।
২২। ৺গুরুচরণ কুণ্ডু, রঘুনাথ কুণ্ডু কলাই চাল, ধান বিক্রেতা।
২৩। শ্রীকুঞ্জচরণ কুণ্ডু, আশুতোষ কুণ্ডু, বড় বাসন, বালতী, কড়াই, লোহা ইত্যাদি।
২৪। শ্রীপঞ্চানন কুণ্ডু, পতিত পাবন কুণ্ডু,
২৫। শ্রীমদনচন্দ্র নাথ, স্বর্ণকার।
২৬। শ্রীকুলসিচরণ কুণ্ডু, গুড়ের কাজ।
২৭। শ্রীগদাধর কুণ্ডু, আলু, কমলা।
২৮। শ্রীকুলচরণ কুণ্ডু, বেনেতী মসলা।
২৯। শ্রীগৌরকিশোর কুণ্ডু, যুগলকিশোর কুণ্ডু, ধান্য, চাউল।

শ্রীগৌরকিশোর কুণ্ডু
মোং বিশ্বনাথ।

ডাউটিয়ার বাজার।

মোঃ খলহরা কেন্দ্র, জেলা যশোহর।

ওজন ৮০, ৬০, ৮২৷৵০

নিকটে গড়াই নদী, সেখান হইতে মাল নৌকায় আমদানী রপ্তানি হয়। সকল রকম মালের আমদানী আছে। সপ্তাহে দুদিন হাট হয়। মাইনার স্কুল আছে।

১। Sreejukta Babu Surendra Nath Ghose The Dawtia Estate জমিদার।
২। হৃদয়নাথ দাস, জানকিবল্লভ দাস বেনেতী মসলা
৩। শ্রীখোকাচন্দ্র পাল, কাপড় বিক্রেতা।
৪। শ্রীরাইচরণ কুণ্ডু, ভুবনচন্দ্র কুণ্ডু, চাউল তৈল লবণ।
৫। শ্রীগোপালচন্দ্র কুণ্ডু, কাপড় ও তৈল লবণ
৬। শ্রীগোপালচন্দ্র কুণ্ডু, রাধারমণ কুণ্ডু, পাটব্যবসায়ী ও কাপড়।
৭। শ্রীযদুনাথ কুণ্ডু, বেনেতী মসলা।
৮। শ্রীকর্ণধর কুণ্ডু, ভূষিমাল ও পাট।
৯। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু, গুড়ের কাজ।
১০। শ্রীবিপিন বিহারী কুণ্ডু, হরিপদ কুণ্ডু, বেনেতী মসলা

শ্রীগৌরকিশোর কুণ্ডু
মোঃ বিশ্বনাথ।

কে, সি, বসুর জীবনী

৺কে, সি বোসের বার্লি ও বিস্কুটের নাম শুনেন নাই এরূপ লোক আজকাল বাঙ্গলায় বিরল। বিগত ১৯২৬ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে সেই ৩রা আগষ্ট তারিখে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা ২নং কালা চাঁদ সান্ন্যাল লেনস্থ শ্যাম বাজার ষ্ট্রীট বিস্কুট বার্লি ফ্যাক্টরীতে ভারতে বিস্কুট ফ্যাক্টরীর সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কারক স্বর্গীয় কে, সি, বসু মহাশয়ের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ কাব্য তীর্থ, শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, মৃত কর্ম্মবীরের জীবনী আলোচনা করিয়াছিলেন।

এই সভায় কে, সি, বসুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ডাঃ নৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত তাঁহার একটী জীবনী পঠিত হইয়াছিল। কি প্রকারে সহায় সম্পত্তি বিহীনাবস্থায়, কেবল মাত্র আপন বুদ্ধিবলে কে, সি, বোস মহাশয় এই বার্লি ও বিস্কুটের কারখানা এরূপ বৃহদাকারে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং মৃত্যুর সময় অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নৃত্য গোপাল বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানিতে পারা যাইবে। প্রবন্ধটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই অনশনক্লিষ্ট, পরমুখাপেক্ষী, ধ্বংসোন্মুখ মসীজীবী বাঙ্গালী জাতির পক্ষে স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের একটা জলন্ত আদর্শ বড় কম কথা নহে। যে সকল চিরস্মরণীয় মহাত্মা শিল্প বাণিজ্য অধ্যবসায়ের আদর্শ স্থাপন করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে কর্ম্মবীর স্বর্গগত কালীকুমার বসু মহাশয় অন্যতম। দারিদ্র্যের কঠোর নাগপাশ ছিন্ন করিয়া প্রাণীমাত্রেরও মুখাপেক্ষী না হইয়া কি করিয়া কেবল স্বীয় বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে বড় হওয়া যায় কালীকুমার তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই কর্ম্মবীর মাহিলনগরের প্রসিদ্ধ বসুবংশসম্ভূত। খানাকুল কৃষ্ণ নগর ইঁহাদের আদি বাসস্থান। ইঁহার পিতামহ ৺কৃষ্ণপ্রসাদ বসু মহাশয় পর্য্যন্ত সেই স্থানেই বসবাস করেন। কিন্তু ইঁহার পিতা হুগলী জিলার অন্তর্গত বাদালপুরে বাস করেন, এই বাদালপুরই কালী কুমারের জন্মস্থান। তিনি ১২৫৯সালের ৩রা আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতামহ ৺কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক মহোদয় বাদালপুরের এক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত।

কালীকুমারের স্বাবলম্বনপ্রিয়তা তাঁহার নিজস্ব নহে। ইহা তাঁহার পৈতৃক সম্পদ। তাঁহার পিতা মাধবচন্দ্র বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও কোথাও চাকরী করেন নাই, এবং স্বাবলম্বনে জীবিকার্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কলিকাতা সহরের পোস্তায় একটী আড়ত করেন। আড়তে যে আয় [illegible]

পরিমিতভাবে ব্যয় হইলে স্বচ্ছন্দেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু মাধবচন্দ্র তাহা করিতে পারিতেন না। তাঁহার কলিকাতার বাসা অভ্যাগত ও অভাবগ্রস্থ আত্মীয় স্বজনে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। বন্ধুগণ তাঁহার এইরূপ ব্যয়ের প্রতিবাদ করিলে তিনি বলিতেন, "মাইনগরের বসুবংশে জন্মিয়াছি, যতদিন বাঁচিব পরের দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা করিব।" ইতিমধ্যে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মাধবচন্দ্রকে কলিকাতার বাস তুলিয়া স্বগ্রামে গমন পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টকাল কষ্টেই অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। চন্দ্রের কলিকাতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই কালীকুমারের ইংরাজী পাঠ শেষ হয় এবং তাঁহাকে পিতার সহিত বাদালপুরে বসবাস করিতে হয়।

যখন মাধবচন্দ্রের মৃত্যু হয়, তখন কালীকুমারের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর। যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই পিতার চিকিৎসায় নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িতে হয়। কোনরূপে পিতার আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়া কালীকুমার চাকরী করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করিলেন। হাতে পয়সা নাই, কলিকাতায় না আসিলে চাকরী

কর্ম্মবীর কালীকুমার বড়ই মেধাবী ছিলেন। প্রথমে তিনি বাগনান (M. E. School) এর ই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং একাদশবর্ষ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে চারি বৎসর কাল ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। মাধব হইবার আশাও কম; সুতরাং জনৈক প্রতিবাসীর নিকট হইতে আটটী টাকা ধার করিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্ব্ব পরিচিত এক পিতৃ-বন্ধুর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। উক্ত পিতৃ বন্ধুর চেষ্টায় একটী চাকরীও জুটিল; কিন্তু সপ্তাহ-

কাল গত হইতে না হইতে "চাকরী নহে ইহা দাসত্ব" এই কথা বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঐ পিতৃবন্ধুকে বলিলেন, "যাহাতে সামান্ত আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার একটি উপায় বিধান করুন।" পিতার সহিত অবস্থান কালে এই স্বাধীন প্রবৃত্তিতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া কালীকুমার পাঁচশত টাকা লইয়া রাসবিহারী ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত ব্যবসা করিবার মানসে পশ্চিমে যাত্রা করেন, পাঁচ মাস পরে তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়া ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার একটী উচ্চাশা ছিল যে, নূতন এমন একটা জিনিষ এদেশে আবিষ্কার করিতে হইবে যাহা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন অথচ এদেশে প্রস্তুত হয় না। তাই তিনি এই প্রথম সামান্ত অকৃতকার্য্যতায় মোটেই দমিলেন না। যাহা হউক, পিতৃ-বন্ধু রঘুরাম অষ্টাদশবর্ষীয় বালকের চরিত্রের শুচিতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, যুক্তিযুক্ত প্রার্থনা ও নির্ভীকতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ফলের দোকান করিবার জন্ত তাঁহাকে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন। এইরূপে কালীকুমার প্রথমে ফলের পরে জালানি কাঠের দোকান ইত্যাদি কয়েকটী সামান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শেষে কয়েকদিন বার্লো সাহেবের অধীনে দালালী কার্য্য শিক্ষা করেন। কিন্তু দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটা যেমন সর্ব্বদা উত্তরাভিমুখে থাকে কালীকুমারের উদ্দেশ্যও তদ্রূপ স্বাবলম্বনের দিকেই ছিল।

অবলম্বিত প্রত্যেক বিষয়ের এইরূপ উত্থান ও পতনের অভিজ্ঞতা লইয়া শেষে তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে "আরোগ্যম্ নাস্ত সংশয়:" নাম দিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী পেটেন্ট ঔষধ ও "কেশকল্পসার:" নামে একটী সুগন্ধি কেশ তৈল বাহির করেন। এই দুই দ্রব্যের কাট্‌তিও তখন উত্তমরূপই হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাপটীর অনেকগুলি পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্যবসায়ীর সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়; এবং তাঁহাদের সাহায্যে ইঁহার ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছিল। এমন সময়ে কতকগুলি নীচপ্রকৃতি, লোক ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইল ও যাহাতে ইঁহার ব্যবসায়ের অধঃপতন হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল; কালীকুমার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঔষধ ও তৈলের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ঔষধ ও তৈলের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কালীকুমার চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে কারি পাউডারের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ইহারও ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল।

এই সাফল্যের মূলে ছিল—অতুলনীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতুল কার্য্যতৎপরতা, অবিচলিত অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমশীলতা। তিনি বলিতেন, "যত্ন চেষ্টায় কি না হয়, যাহা ধরিব প্রাণান্তেও তাহা ছাড়িব না। জগতে ধন ছড়াইয়া আছে, কুড়াইয়া লইবার লোক অতি বিরল।" এইরূপ কয়েকটী সামান্ত সামান্ত ব্যবসায়ের পর অবশেষে বিধাতা তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন।

(ক্রমশঃ)

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৯ম বর্ষ } আশ্বিন ১৩৩৬ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতীয় রং ও বার্ণিশ শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা এবং এই দুইটি সামগ্রী প্রস্তুতের প্রণালীর কথা ইতঃপূর্ব্বেই সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, রং ও বার্ণিশের সকল উপাদানই প্রচুর পরিমাণে এই ভারতের নানাস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও ভারতবাসী আমরা, এই সমস্ত কাঁচা মালের সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। এস্থলে সেই সমস্ত উপাদানের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, অধ্যবসায়ী কর্ম্মী যুবকদের পক্ষে এখনও অর্থার্জ্জনের সকল পন্থা একেবারে রুদ্ধ হয় নাই—তাহারা ইচ্ছা করিলে এসমস্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া স্ব স্ব জীবিকার্জ্জনের পন্থা বাছিয়া লইতে পারেন।

মোটামুটি রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের উপাদান হইল—ড্রাইংওয়েল, থিনার্স, পিগ্‌মেণ্টস্‌ ও রেজিন প্রভৃতি।

ড্রাইং অয়েল।

এমন এক শ্রেণীর তেল আছে যেগুলিকে বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে দিলে তাহার উপর একটা পাতলা আবরণ বা সর (Film) পড়ে। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর তেলকে ড্রাইংঅয়েল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের উপযোগী ড্রাইংঅয়েলের মধ্যে তিসির তেলই সর্ব্বপ্রধান।

তিসি হইতেই তিসির তেল প্রস্তুত হয়। এই তিসি প্রধানতঃ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও রুসিয়াতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বঙ্গদেশ ও

বোম্বাই প্রদেশেই তিসির চাষ হয়। তন্মধ্যে উৎপন্নের পরিমান হিসাবে মধ্য প্রদেশকেই প্রাধান্য দিতে হয়। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তিসি উৎপন্ন হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এই মধ্য প্রদেশ হইতেই পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য সকল দেশেই উৎপন্ন তিসির পরিমাণ বৎসরে বৎসরে এত বেশী হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, মোটামুটি গড় বাহির করা সম্ভবপর নহে। এইজন্যই তিসির মূল্যও অপ্রত্যাশিতরূপে বর্দ্ধিত হয় কিম্বা হ্রাস পাইয়া থাকে। সে যাহা হউক, মোটামুটি প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে ৫০০০০০ টন তিসি উৎপন্ন হয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১৯০৮ সালে ভারতবর্ষে ১৬৩০০০ টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১২ সালের উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪১০০০ টন।

ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ তিসি রপ্তানী হয় তাহার অধিকাংশই গ্রেট বৃটেনে প্রেরিত হইয়া থাকে। এক সময়ে ভারতবর্ষই ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান তিসি উৎপাদনকারী দেশ। সে সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে যত তিসি উৎপন্ন হইত তাহার অর্দ্ধেকই ভারতবর্ষে উৎপাদিত হইত। কিন্তু ভারতের সে সৌভাগ্যের অবসান হইয়াছে। এখন আর প্রধান তিসিউৎপাদনকারী দেশ বলিয়া গৌরব করা ভারতের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে—আমাদের সেই চিরন্তন আলস্য এবং দূরদৃষ্টির অভাব।

তিসির তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশ, ভারতের সৌভাগ্যে ঈর্ষাপর হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিভিন্ন দেশে তিসির চাষ আরম্ভ হইয়া গেল। আর ভারতবর্ষ তাহার সনাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিল না। পিতা পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া চৌদ্দ পুরুষ যাহা করিয়াছেন সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নূতন কিছু করা - নূতনভাবে, নূতন উদ্যমে, বিস্তৃতভাবে চাষবাস করা তাহার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। তাই সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, ৩৫ বৎসর আগে যে পরিমাণ জমিতে তিসির চাষ হইত,আজও ভারতবর্ষে ঠিক সেই পরিমাণ ভূমিতেই তিসির চাষ হইতেছে। এদিকে তিসির তেলের কাটতি বাড়িয়াছে, দর বাড়িয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বাজারে তিসির তেল লইয়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে—এ সমস্ত কিছুতেই ভারতের ভ্রুক্ষেপ নাই। আমরা সেই গড্ডালিকা প্রবাহে চিরন্তন নীতিতে জীবনের পথে (—না মরণের পথে কে জানে?) অগ্রসর হইতেছি। এই সুযোগে অন্যান্য দেশ তাহাদের কাজ গুছাইয়া লইতেছে।

তিসির কথা বলিতেছিলাম। আজ আমেরিকার আর্জ্জেন্টাইন নামক দেশ তিসি উৎপাদনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কেবল তিসি নয়, অন্যান্য জিনিষ সম্পর্কেও ভারতবাসী সকলের পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। অথচ সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের ন্যায় সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা ভূমি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। এস্থলে পাটের কথা বলা যাইতে পারে। এখনও এই পাট ভারতের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের—একচেটিয়া উৎপন্ন দ্রব্য। পৃথিবীর আর কোথাও পাট উৎপাদিত হয় না। অবশ্য পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। নানা স্থলে পাট কৃষির চেষ্টা হইয়াছে বটে; কিন্তু সে চেষ্টা কিছুতেই সার্থক হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা কিছুতেই দমিবার পাত্র

নহে। পাট যে কাজে লাগে সেই কাজ অন্য কোনও সামগ্রী দ্বারা হয় কিনা—তাহারই পরীক্ষা চলিতেছে।

ইতিমধ্যেই নাকি ব্রটেক্স (Brotex) নামক এক প্রকার গুল্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ছাল হইতে যে আঁশ পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা পাটের কাজ চলিতে পারে। ইংলণ্ডে সম্প্রতি এই ব্রটেক্স চাষের ব্যবস্থা চলিতেছে। একটু অসুবিধা এই যে, পাটের ন্যায় এক বৎসরে এই ব্রটেক্সের ফসল হয় না। তজ্জন্য প্রায় দুই বৎসর সময় লাগে। ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত লাভ থাকে কি না—তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, লাভ হইবেই। কারণ এই গাছের ছাল দ্বারা পাট হইবে, ভিতরের কাঠ দ্বারা কাগজ তৈয়ারীর উপযোগী মণ্ড (Pulp) হইবে এবং গাছের বীজ হইতে গরুর খাদ্য হইবে। অর্থাৎ যত প্রকারে সম্ভব এই গাছকে কাজে লাগাইয়াও প্রতিযোগিতার বাজারে ব্রটেক্সকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে ভারতের পাটের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এই দারুণ প্রতিযোগিতার হাত হইতে পাটকে বাঁচাইয়া তাহার প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা হইতেছে কি? এই অবস্থায় ৫।৭ বৎসর না যাইতেই হয়ত দেখিব—বাঙ্গলার পাট সম্পূর্ণরূপে তাহার মর্য্যাদা হারাইয়াছে।

ঠিক এইভাবেই তো আজ আর্জ্জেণ্টাইন চিনি উৎপাদনে ভারতবর্ষকে হটাইয়া দিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কোন্ দেশে কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহার একটা বিবরণ—১৯২০—২৫ সাল পর্য্যন্ত নিম্নে দেওয়া হইল:—

দেশের নাম	কত হাজার টন					
	১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫
ইউরোপ	১৬৫	১৫৯	১৪৯	১৬২	১৮৩	২০৯
রুশিয়া	২৩০	২৫৪	২৭৬	৩৩৪	৪১৩	৬০৭
কানাডা	২০০	১০৩	১২৫	১৭৮	২৪২	২৩২
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	২৬৯	২০১	২৫৯	৪২৬	৭৯৩	৫৫০
বৃটিশ ভারত	৪১৯	২৭০	৪৩৬	৫৩৩	৪৬৩	৫৩১
আর্জ্জেণ্টাইন	১৫০০	৯০১	১১৮৯	১৪৮০	১১২৭	১৮৭০
মোট—	২৭৮৩	১৮৪৮	২৪৩৪	৩০৮৩	৫২২১	৪০৫

উপরে যে তালিকা দেওয়া গেল তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষ ১৯২০ সালে যেমন ছিল আজও ঠিক সেইস্থানেই রহিয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। দুনিয়ার আবহাওয়ার সহিত আমরা সম্পর্ক রাখি না। কৃষিকার্য্য করি বটে; কিন্তু সেই মান্ধাতার আমল হইতে যে নীতি ও পদ্ধতিতে ধান ও পাটের চাষ হইতেছে তাহার আর পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন নাই। নিজের চাহিদা কতটুকু এবং অপরের চাহিদাই বা কতটুকু—তাহার সন্ধান লইয়া সেই পরিমাণে শস্য উৎপাদনের কথা আমরা কেহই ভাবি না; অথচ বলি যে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও ভারতের কৃষক তাহার অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না, তাহার অভাব অভিযোগ ঘুচে না, শীতের সময় কাপড় জোটে না, রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা হয় না। কেন হইবে? দুনিয়ার পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহার দিকে মন না দিয়া পিতা পিতামহের লাঙ্গলের মুটি ধরিয়া থাকিলেই তো সকল সমস্যার সমাধান

হয় না; কারণ, সেই আমল হইতে তুলনায় যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই সাধারণ সত্যটি উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন?

ভারতীয় তিসির কথা বলিতে হইলে তাহার গুণের কথাও বলা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—গুণ হিসাবে ভারতীয় তিসি প্রথম স্থানীয় না হইলেও দ্বিতীয় স্থান ইহার নিশ্চয়ই প্রাপ্য। রুশিয়ার তিসিকে ইহারা প্রথম স্থান দিয়া থাকেন। কানাডায় যে তিসির চাষ হয়, তাহা কিন্তু আসলে রুশিয়ারই তিসি। তথা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া কানাডায় লইয়া গিয়া সেখানে এই তিসির চাষ করা হইতেছে। ইহার তেলও কম উপযোগী নহে। কিন্তু যে আর্জ্জেণ্টাইন অধুনা তিসি উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার তিসি একেবারে নিকৃষ্ট বলিলেই হয়। রুশিয়ার তিসি কিম্বা ভারতীয় তিসি হইতে যে তেল প্রস্তুত হয় তাহার সহিত আর্জ্জেণ্টাইন ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তিসির তেলের তুলনাই হয় না। অনেকে মনে করেন, এই যে তারতম্য তাহা বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর উপরই নির্ভর করে।

আর্জ্জেণ্টাইনের এই যে নিকৃষ্ট তিসি তাহাই প্রচুর পরিমাণে গ্রেটবৃটেনে প্রেরিত হয়। গ্রেট-বৃটেন আবার সেই তিসি হইতেই তেল প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষে চালান দেয়। দৃশ্যতঃ মনে হয় যে, নিজেদের দেশে তিসি না জন্মাইয়া এবং বিদেশ হইতে নিকৃষ্ট তিসি আমদানী করিয়া তাহা হইতে প্রস্তুত তিসির তেল ভারতবর্ষে প্রেরণ লাভজনক হইতে পারে না; কারণ ভারতবর্ষের তিসি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতের উৎপন্ন তিসির পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। কিন্তু অধ্যবসায়ী ও বিচক্ষণ বৃটিশ ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছেন। ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কি পরিমাণ বিদেশীয় তিসির তেল আমদানী হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। এই তেলের অধিকাংশই গ্রেটবৃটেন হইতে আমদানী করা হইয়াছে:—

বৎসর	কত গ্যালন	কত টাকা
১৯১৩—১৪	৪৩৯৪৮২	৮৮২২৫৫
১৯১৪—১৫	৩৬০৪৮৪	৭৪৬৭.৫
১৯১৫—১৬	২৬৭৬৮৭	৬৫৩৩২৫
১৯১৬—১৭	১৩৪৯২২	৪৪৩৫৫০
১৯১৭—১৮	৬২৭৯৫	২৭০৬৬০
১৯১৮—১৯	২৭৬০	৪৫৮০
১৯১৯—২০	১৫৪৯৬২	৬৪৫৭০০
১৯২০—২১	২৭৫০৬৯	১৫০৮১১০
১৯২১—২২	২৮৬৫৮৩	১১১০৮৭৮
১৯২২—২৩	২৬৮১৬৫	১০৭২০৪৩
১৯২৩—২৪	২৪৪৫৮৫	১০১৪৭৩৩
১৯২৪—২৫	২১১১৮০	৮৪১৮৭৮
১৯২৫—২৬	২৩১৬৭৫	৯৯২৪৭৫
১৯২৬—২৭	২৩,৮১৪	১০১১৭০৩

পক্ষান্তরে এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ তিসির তেল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। ভারতের তিসি উপাদেয়,—ইহার তেলও ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ বৃটেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময়ে শিল্প বাণিজ্যে মনোনিবেশ করার অবসর তাঁহাদের ছিল না। তাই ভারতে বৃটিশ তিসির তেল আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় তিসির তেলের রপ্তানীও বাড়িয়াছিল। কিন্তু ভারতের ব্যবসায়ীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে

পারেন নাই। পক্ষান্তরে গ্রেটবৃটেন পুনরায় তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অনেকে বলেন যে, ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য প্রসারের পথে বিঘ্ন অনেক। এ কথা অবশ্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এগুলি অতিক্রম করার আপ্রাণ চেষ্টা হইতেছে কি? এই তিসির তেলের কথাই ধরা যাক্। কেহ কেহ বলেন,—তিসি হইতে তেল বাহির করিয়া লইলে ইহার এক তৃতীয়াংশ মাল তেলে পরিণত হয় এবং দুই তৃতীয়াংশ মাল অর্থাৎ শতকরা ৬৬ ভাগ অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। এই শেষোক্ত মাল কাজে লাগাইবার সুবিধা ভারতবাসীর নাই। কাজেই এই মাল বিদেশে রপ্তানী করিতে হয় এবং তেল ও খোল—উভয়ই রপ্তানী করিতে গেলে লভ্যাংশ কিছুই থাকে না। মোটের উপর এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শতকরা ৩৩ অংশ তেল বাহির করিয়া লইলে তিসির যে ৬৬ অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে কাজে লাগান ভারতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নহে। অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিলে এই খোল দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

উপরে যে তিসির খোলের কথা বলা হইল তাহাতে শতকরা প্রায় দশভাগ তেল থাকিয়া যায়। দুই প্রকারে এই তেল নিষ্কাশন করা যাইতে পারে। Expeller নামক কলের সাহায্যে তেল বাহির করিয়া লইলে যে খোল অবশিষ্ট থাকে তাহাতে তেলের ভাগ খুব কমই থাকে। দ্বিতীয়তঃ কোন দ্রবনীয় পদার্থের (Solvents) সহিত এই খইল মিশ্রিত করিয়াও তেল বাহির করা চলে। এই প্রণালীর কথা ইতিপূর্ব্বেই "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" আলোচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

চর্ব্বি সংশোধন

সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে কতিপয় কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে চর্ব্বিই সর্ব্বপ্রধান সামগ্রী। এই চর্ব্বি (Tallow) বিশুদ্ধ না হইলে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করা যায় না, তাই সর্ব্বাগ্রে চর্ব্বির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাজারে সাধারণতঃ যে চর্ব্বি বিক্রয় হয়, তাহা নানা প্রকার ভেজালে পরিপূর্ণ থাকে—এমন কি পরিস্কৃত (Refined) চর্ব্বি বলিয়া যে সকল মাল বাজারে উপস্থিত করা হয়, তাহাদের মধ্যেও নানা প্রকার আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ থাকে; সুতরাং এই জিনিষ সাবান প্রস্তুতের কার্য্যে নিরাপদে ব্যবহার করা চলে না।

যাঁহারা উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে কাঁচা চর্ব্বি ক্রয় করিয়া নিজ হাতে সংশোধন করিয়া লওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাতে খরচাও অনেক কম পড়ে এবং

জিনিষও অধিকতর বিশুদ্ধ হয়। কি করিয়া কাঁচা চর্ব্বি সংশোধন (Refined) করিতে হয় তাহার প্রণালী মোটামুটি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

বাজার হইতে কাঁচা চর্ব্বি কিনিয়া আনিলে তাহার সহিত মাংস, রক্ত ইত্যাদি নানাপ্রকার আবর্জ্জনা মিশ্রিত থাকে। এই সমস্ত বাজে জিনিষগুলি খাঁটি চর্ব্বি হইতে পৃথক না করিলে সেই চর্ব্বি দ্বারা ভাল সাবান তৈয়ারী হয় না। চর্ব্বিকে পরিষ্কার করিবার জন্য একটি প্রকাণ্ড লৌহনির্ম্মিত কড়ার প্রয়োজন। যে পরিমাণ চর্ব্বি সংশোধন করিতে হইবে ঠিক সেই পরিমাণ জল দিয়া চর্ব্বিসহ কড়াটি উনুনের উপর বসাইয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে চর্ব্বি গলিয়া যাইবে। কড়ার মধ্যে বিভিন্ন স্তরে কতিপয় নল বসাইয়া রাখা দরকার। চর্ব্বি গলিয়া এই সমস্ত নলের ভিতর দিয়া অন্য পাত্রে গিয়া পড়িবে। কড়াটি নির্ম্মাণের সময়েই নলের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কড়াটি গরম হইতে আরম্ভ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে চর্ব্বিযুক্ত জলও ফুটিতে থাকিবে। চর্ব্বি তখন গলিয়া গিয়া জলের উপর সরের মতো ভাসিয়া উঠিবে। মাঝে মাঝে নাড়া চাড়া করিয়া সমস্ত জিনিষকে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। এই সময় মধ্যে চর্ব্বির মধ্যে যে সমস্ত আবর্জ্জনা থাকে তাহা সিদ্ধ হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। ময়লা, রক্ত ও মাংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি পর্য্যন্ত জলের সহিত মিশ্রিত হয় কিম্বা নীচে পড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে চর্ব্বির অংশ জলে ভাসিয়া উঠে। অতঃপর জাল দেওয়া বন্ধ করিয়া কড়াটি ঠাণ্ডা করিতে হয়। জলের উপর যে চর্ব্বি ভাসিয়া উঠে তাহা বক্র নলের ভিতর দিয়া কিম্বা খুব সাবধানে ময়লা জিনিষ গুলি নীচে রাখিয়া উপরের জলীয় অংশ পাত্রের ধার দিয়া অপর কোনও পাত্রের মধ্যে ঢালিয়া দিতে হয়। সেই পাত্রে থাকিয়া ঠাণ্ডা হইলে এই চর্ব্বি গাঢ় কঠিন পদার্থে (Solid) পরিণত হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত গেল চর্ব্বির মোটা অংশের কথা। এই প্রণালীতে চর্ব্বির মোটা অংশ পৃথক করিয়া লওয়া যায় বটে; কিন্তু কিছু চর্ব্বি ঐ জল ও জলের নীচে যে আবর্জ্জনাদি জমে তাহার মধ্যে থাকিয়া যায়। ব্যবসায়ে লাভবান হইতে গেলে এই শেষ অংশটুকুও বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়। তাই সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই শেষটুকু অপর কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্ণিত প্রণালীতে চর্ব্বির মোটা অংশ তুলিয়া লইলে যে জল ও আবর্জ্জনা অবশিষ্ট থাকে তাহা পৃথক করিয়া ঠাণ্ডা করা দরকার। ঠাণ্ডা হইলে আবর্জ্জনার উপর চর্ব্বির একটা স্তর পড়িবে। অন্যান্য আবর্জ্জনা হইতে এই স্তর যতটা সম্ভবপর তুলিয়া লওয়া চলে। তারপর যে আবর্জ্জনা থাকে তাহা আবার কড়ার মধ্যে দিয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আর এক দফা চর্ব্বি লইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আবর্জ্জনার সহিত যে চর্ব্বিটুকু লাগিয়া থাকে তাহা এই প্রণালীতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর। কিন্তু কড়ার সিদ্ধজলের সহিত চর্ব্বির যে অংশ মিশ্রিত থাকে তাহা কাজে লাগাইবার জন্য পৃথক প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

জল হইতে সংগৃহীত চর্ব্বি ঠিক চর্ব্বিরূপে পাওয়া যায় না—চর্ব্বির এই শেষাংশ টুকু সাবান রূপে বাহির হইয়া আসে। এই চর্ব্বিসহ সিদ্ধ করা জলের মধ্যে মাংসের কণা ভাসিতে থাকে। ঘন ঘন ছিদ্র সংযুক্ত ছাকনের সাহায্যে জল ছাঁকিয়া লইলে বড় বড় মাংসের কণা গুলি পৃথক হইয়া

যায়। উপরোক্ত মাংসের কণার মধ্যে এরূপ কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে যাহার ফলে সাবানের গুণাবলী বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা জন্মে। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে এবং সযত্নে মাংস কণা গুলি পৃথক করা একান্ত প্রয়োজন। উপরোক্ত জলের মধ্যে পশুর শিরা (Sinews) প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিরাগুলি কিন্তু সাবান প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাই এ গুলিকে পৃথক করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না।

মাংসের বড় বড় কণাগুলি ছিদ্রযুক্ত হাতলের সাহায্যে ছাকিয়া লইয়া পুনরায় জলটুকু জাল দিতে হয়। জাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ Caustic Soda Solution মিশাইতে হয়। এইরূপে সিদ্ধ হইয়া মাংসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ এবং শিরা উপশিরাগুলি গলিয়া যায়। চর্ব্বিটুকু তখন সাবান রূপে দেখা দেয়।

যে পর্য্যন্ত না লবণাক্ত ক্ষার পদার্থ (alkali) বিলুপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত Caustic Soda Solution ক্রমশঃ মিশ্রিত করিয়া ঐ জল জাল দিতে হয়। যখন দেখা যায়—ক্ষারের ভাগ দূরীভূত হইয়াছে তখন জাল দেওয়ার আর প্রয়োজন থাকে না। ক্ষার রহিয়াছে কিনা সহজেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। জল একটু জিহ্বায় দিলেই বুঝা যায় তাহার মধ্যে ক্ষার আছে কি না। ক্ষার থাকিলে জিভের উপর নিশ্চয়ই জ্বালা (Sensation) অনুভূত হইবে।

অতঃপর আবার এই জল সিদ্ধ করিয়া ইহাকে গাঢ় করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লবণ (Salt) মিশ্রিত করিতে হয়। লবণ মিশাইবার উদ্দেশ্য এই যে, এতদ্বারা সাবানের অংশ পৃথক হইয়া আসে। একদিকে যেমন লবণ মিশাইতে হয় তেমনি ক্রমশঃ এই জল সিদ্ধও করিতে হয়। প্রত্যেক বার লবণ দেওয়ার পূর্ব্বে একবার বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিতে হয়,—জলের উপর সাবানের ভাগ পৃথক হইয়া আসিয়াছে কিনা। যখন দেখা যায় যে, সাবানের অংশ পৃথক হইয়া জলের উপর ভাসিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই লবণ মিশ্রিত করা বন্ধ করিতে হয়। তবে আরও কিছু সময় জাল দিলেই সাবানের সমস্ত অংশ পৃথক হইয়া যায়।

এই অবস্থায় কড়াটি নামাইয়া লইয়া ইহাকে ঠাণ্ডা করিতে হয়। ঠাণ্ডা হইলে সাবানের অংশ জলের উপর ভাসিয়া উঠে। ক্ষারযুক্ত জলের মধ্যে সাধারণতঃ যে সকল ভেজাল পদার্থ থাকে তাহা এরূপ সাবানের মধ্যে দেখা যায় না। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই সাবানের মধ্যেও সহজে গলিয়া যায় এরূপ আবর্জ্জনার মাত্রা নিতান্ত কম থাকে না। এই জন্য উপরোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত সাবানকে ইচ্ছামত আকার দেওয়া যায় না।

সাবান আমাদের অনেক কাজে লাগে। গায়ে মাখা হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় পরিষ্কার পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে সাবানের প্রয়োজন হয়। সকল কাজে তেমন উৎকৃষ্ট সাবানের দরকার হয় না। উপরে চর্ব্বির আবর্জ্জনার মধ্য হইতে যে সাবান প্রস্তুতের কথা বর্ণিত হইল সেই সাবান তেমন উপাদেয় হয় না। তাই ইহাকে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট কাজে লাগান যাইতে পারে। অধিকন্তু সাধারণ চর্ব্বি সংশোধিত করিয়া যে পরিষ্কৃত চর্ব্বি পাওয়া যায় তাহা দ্বারা উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইতে পারে।

সরকারী গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে,—বাজার হইতে পরিষ্কৃত (Refined)

চর্ব্বি ক্রয় না করিয়া কাঁচা চর্ব্বি কিনিয়া তাহা যদি নিজের তত্ত্বাবধানে পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জিনিষ যেমন খাঁটি হয় দরও তেমনি কম পড়ে।

এক মণ কাঁচা চর্ব্বিকে সংশোধিত (Refine) করিলে ৩৯ সের পরিষ্কৃত চর্ব্বি পাওয়া যায়। এই সঙ্গে এক সের আড়াই ছটাক সাবানও প্রস্তুত হয়। এই সাবানটুকু প্রায় সাড়ে বার ছটাক চর্ব্বির সমান। তবে জ্বাল দেওয়ার সময় প্রায় অর্দ্ধ পাউণ্ড Caustic Soda এবং দুই পাউণ্ড লবণ মিশাইতে হয়। এই দুই জিনিষের মূল্য তেমন কিছুই নয়, অর্দ্ধ পাউণ্ড Caustic Soda /১০ পয়সা এবং দুই পাউণ্ড লবণ /০ আনায় পাওয়া যায়।

নিম্নে যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা হইতে দেখা যায় যে, চর্ব্বি সংশোধনে নিশ্চয়ই লাভ হয়। কাঁচা চর্ব্বি প্রতি মণ ২২৲ এবং পরিষ্কৃত চর্ব্বি প্রতি মণ ২৪৲ টাকা হিসাবে ধরা হইল :—

একমণ কাঁচা চর্ব্বি —৩৯ সের সংশোধিত চর্ব্বি—২৪ টাকা মণ দরে...........................	২৩৷৶০
সাবানরূপে প্রাপ্ত ৵১০ ছটাক চর্ব্বি— ২৪৲ টাকা মণ দরে...	৷৶৬
মোট	—২৩৸/৭
পরিষ্কার করার ব্যয় —প্রচুর পরিমাণে করিলে প্রতি মণ ৷৶০ আনা হিসাবে....................	৷৶০
	২৩৷৶৬
একমণ কাঁচা চর্ব্বি.........	২২৲
	১৷৶৬

সমস্ত ব্যয় বাদে একমণ কাঁচা চর্ব্বি সংশোধন করিলে ১৷৶৬ পাই লাভ হইতে পারে। যাহারা সাবান প্রস্তুত করেন তাহাদের পক্ষে এই প্রণালী অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে লাভের পরিমাণ যেমন বাড়িবে উৎকৃষ্টতর সাবান প্রস্তুতের পন্থাও তেমনি সুগম হইবে। বাজার হইতে পরিষ্কৃত চর্ব্বি ক্রয় করিয়া যাহারা সাবান প্রস্তুত করেন তাহারা এ কথা জোর দিয়া বলিতে পারেন না যে, তাহাদের সাবান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাজারে যে সকল চর্ব্বি পরিষ্কৃত চর্ব্বি বলিয়া বিক্রীত হয় সে গুলির মধ্যে নানারূপ ভেজাল মিশ্রিত থাকে। আজকাল আবার অধিক লাভের আশায় কোন কোন ব্যবসায়ী নির্ব্বিকার ভাবে যাহা খুসী তাহাই ভেজাল দিয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে বাজারের পরিষ্কৃত চর্ব্বির মধ্যে খনিজ তৈল (Mineral Greases) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কোন পদার্থ চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত থাকিলে সেই চর্ব্বি দ্বারা প্রস্তুত সাবান কখনও উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। উপরোক্ত প্রণালীতে চর্ব্বি সংশোধন করিয়া লইলে কোন প্রকার ভেজালেরই আশঙ্কা থাকে না।

চর্ব্বি সংশোধনের যে প্রণালী এস্থলে বর্ণিত হইল তাহা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের বিশিষ্ট কর্মচারী দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহাতে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি আগ্রহের সহিত এই প্রণালীতে চর্ব্বি সংশোধন শিক্ষা করিতে অভিলাষী

হন, তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের কর্ম্মচারীরা, তাহা হাতেকলমে দৃষ্টান্ত দ্বারা শিখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। অধিকন্তু চর্ব্বি সংশোধনের উপযোগী কলকব্জা ইত্যাদি কিরূপ ভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে, কিরূপে বসাইতে হইবে তাহার প্লান, পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। সাবান প্রস্তুতকারীরা এই সুযোগে চর্ব্বি সংশোধনের প্রণালী হাতেকলমে শিখিয়া লইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন—সন্দেহ নাই। অধিকন্তু এত দ্বারা ভারতীয় সাবান শিল্পেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

চায়ের চাষ

১৮৩৬ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত এই ৯১ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেছে যে লাভজনক কৃষি হিসাবে চায়ের চাষ কর্ত্তে গেলে রীতিমত ভাবে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা না কর্লে কিছুতেই চল্‌তে পারে না। যেমন তেমন ভাবে সার প্রয়োগ কর্লেই হবে না—সার প্রয়োগ দস্তুরমত বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে হওয়া চাই। বিজ্ঞানের নাম শুনেই হয়ত ঘাব্‌ড়ে যাবেন, কিন্তু এতে ভয় পাবার মত সত্যসত্যই কিছু নেই; বিজ্ঞান হচ্ছে বিশিষ্ট বা বিশেষ জ্ঞান। সার-বিজ্ঞান বল্‌তে মোটামুটি এই বুঝায় যে কোন্ জমিতে কোন প্রকারের সার কোন সময়ে কী ভাবে কত পরিমাণে ব্যবহার কর্লে সব চেয়ে বেশী ও ভাল ফসল পাওয়া যাবে। এক কথায় জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাবে কিসে?

অবশ্য এর উত্তর এক কথায় দেওয়া অসম্ভব কেননা সব জিনিসই নির্ভর করে স্থান, কাল ও পাত্রের উপর। সব জায়গার জমি এক রকম নয়—সব জায়গার জলবায়ু এক রকম নয় সব জায়গার মাটির পাট একরকম নয় ইত্যাদি। কাজেই প্রত্যেক জমির জন্যেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেক চা বাগানেই পরীক্ষা করে দেখা উচিত কী ভাবে সার প্রয়োগ কর্লে সকলের চেয়ে সুফল পাওয়া যাবে।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন তাতে নানান্ নট্‌খটি—নানান্ ঝঞ্ঝাট—কিন্তু একথাও তাঁদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে কষ্ট না কর্লে কোন উপায়েই কেষ্টকে মেলান যায় না। পরীক্ষা কার্য্যচালাব যে প্রথম প্রথম খড়ই অসুবিধাকর হবে সে কথা আমরা অস্বীকার করিনে, কিন্তু একবার এই প্রাথমিক অসুবিধাগুলা অতিক্রম কর্ত্তে পার্লে চিরকালের জন্য যে সুফল ভোগ করা যাবে তাতে আর একটুও সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষতঃ আমরা যে একটা নতুন কথা বল্‌ছি তা নয়, ইতিপূর্ব্বে বহু বাগানেই এই পরীক্ষা কার্য্য চালান হয়েছে এবং হচ্ছে। কাজেই পাঁচজনে যা পেরেছে এবং পাচ্ছে আর পাঁচজনের তা না পারবার যে কারণ কি তা আমরা আদৌ বুঝ্‌তে পারি না।

অনেক চাষীর ধারণা আছে বাগানের মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখলেই জানা যাবে মৃত্তিকায় কোন্ কোন্ পদার্থের অভাব বা অল্পতা আছে; আর সেই সেই পদার্থ প্রয়োগ কর্লেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে উঠ্‌বে। কিন্তু এই ধারণা যে কতবড় ভুল তা হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন ; প্রায় সকল জমিতেই বৃক্ষাদির খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান —কিন্তু ঐ সমস্ত খাদ্য বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকেনা এইটাই হ'ল মুস্কিল। কৃত্রিম সার প্রয়োগে এই দোষ দূরীভূত হয়—কেননা কৃত্রিম সার গাছের সরাসরি আহার্য্যরূপে ব্যবহার কর্ত্তে পারে। আবার ধরুণ নাইট্রোজেন্ প্রয়োগ চায়ের ঝোপ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে—এমন কি পাতাও বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। তথাপি রাশি রাশি নাইট্রোজেন্ ব্যবহার করা উচিত নয় কেননা তাতে চায়ের উৎকর্ষ চিরদিনের মতই নষ্ট হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ রাশি রাশি সার পদার্থ প্রয়োগের পক্ষপাতী তাঁরা বলেন অধিকন্তু ন দোষায়। কিন্তু তাঁদের জেনে রাখা উচিত রাশি রাশি সার ব্যবহার কর্লেই রাশি রাশি চা ফল্‌বে না—লাভের মধ্যে জমিটার সরকার একেবারে ঝর্ ঝরে হয়ে যাবে। "কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নয়—সারের বিষয়েও নয়" বাইরের লোকের পক্ষে এর বেশী উপদেশ দেওয়া অসম্ভব।

এই জন্যই আমরা প্রত্যেক বাগানের মালিককে একখণ্ড ক'রে পরীক্ষাক্ষেত্র রাখতে বলি। এর আগে যে সমস্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে সে সবই সাহেবে করেছে। তারা হ'ল ঝানু ব্যবসাদার কাজেই তারা জানে কেমন করে ব্যবসায় লাভ কর্ত্তে হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা চালাতে তাদের খরচ হয়েছে সত্য কিন্তু পরীক্ষার ফলে যে লাভ হয়েছে তা সেই খরচের চেয়ে সহস্রগুণ বেশী। যাহাহউক পাঠকের অবগতির জন্য আমরা কয়েকটা পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে উদ্ধৃত কর্লাম। আশা করি সেগুলো থেকেসারের কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানই পাওয়া যাবে।

ফার্গুসন্ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত।—

হালওয়াল টি কোম্পানী, আসাম। জে, পি,

জমির পরিমাণ	সারের পরিমাণ	একর প্রতি উৎপন্ন পাতা	একর প্রতি উৎপন্ন চা	সার প্রয়োগের পর বৃদ্ধির পরিমাণ	৯৳ আনা পাউণ্ড হিসাবে বৃদ্ধির পরিমাণ	একর প্রতি সারের মূল্য	প্রতি একরে মোট লাভ বা লোকসান
		পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	টা-আ-না	টা-আ-না	টা-আ-না
১ একর	৪০০ পাউণ্ড খৈল ৪৪ পাউণ্ড মিউরিয়েট অব্ পটাশ	৩৩৭০	৮৪২	১২০২	৬৭৸১০	২২৷/৫	×৪২৶/১৫
১ "	৬৮ পাউণ্ড পি, এন্ মিকশ্চার ৬২ পাউণ্ড সাল্‌ফেট অব এমনিয়া ৪০০ পাউণ্ড						

ঐ	৬৮ পাউণ্ড পি, এন্ মিকশ্চার						
	৬২ পাউণ্ড সাল্‌ফেট অব এমনিয়া	৩০৩২	৭৫৮	৩৬	২০।০	২২৶/১৫	—১৮৶/১৫
ঐ ৩	আদৌ সার ব্যবহার করা হয় নাই।	২৮৮৮	৭২২	...	...	...	...

বিহীটিং টি এষ্টেট্, আসাম। এল্, হোলা কর্ত্তৃক পরীক্ষিত—

১ একর	২৪০ পাউণ্ড অস্থি চূর্ণ ৫৬ পাউণ্ড মুরিয়েট অব পটাশ	২২২২	৭৩০	১৮০	১০১।০	১৬॥৵	+৮৪॥৵
২	২৪০ পাউণ্ড অস্থিচূর্ণ	১৯৫১	৬৫০	৯০	৬০।৵	১২।৵০	+ ৬৮।০
৩	আদৌ সার ব্যবহার না করিয়া	১৬৬৬	৫৬০	..	...	...	...

সানটক্ টি, এষ্টেট, আসাম, পরীক্ষক

ডব্লু, এল্ ডিকিল্‌সন।

জমির পরিমাণ	সারের পরিমাণ	প্রতি একরে উৎপন্ন পাতা	প্রতি একরে উৎপন্ন চা	একরে প্রতি চায়ের বৃদ্ধি	নয় আনা পাউণ্ড হিসাবে চায়ের মূল্য	সারের মূল্য	মোট লাভ বা লোকসান
		পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	টা-আ-না	টা-আ-না	টা-আ-না
১	খৈল ......২৪০ পাউণ্ড অস্থিচূর্ণ... ...১৬০ „ মুরিয়েট অব পটাশ ৪৪ „ সাল্‌ফেট অব এমনিয়া ৪০ চূর্ণ ... ... ৭৮৪ „	১৭১২	৪২৮	৮২	৪৬৶০	৩০॥/৫	+১৫॥০৭
২	খৈল......২৪০ পাউণ্ড অস্থিচূর্ণ...১৬০ „ সাল্‌ফেট অব এমনিয়া ৪০ „	১৫৫২	৩৮৮	৪২	২৩॥৶০	১৮ ১৶০	+৫৶০
	সার ব্যবহৃত হয় নাই	১৩৮৪	৩৪৬	...	...	...	...
	খৈল...... ২৪০ পাউণ্ড অস্থিচূর্ণ...১৬০	২০৭২	৫১৮	১৭২	৯৬৸০	২২॥৶০	৭৪৶০

সালফেট অব

এমনিয়া ৪০ „

সাল্‌ফেট অব

পটাশ ৪৪ „

তারাপুর টি, কোম্পানী কাছাড়। পরীক্ষক—

এ লায়ন্‌স্‌ ডেন্‌।

জমির পরিমাণ ও নম্বর	উৎপন্ন পাতা একর প্রতি	উৎপন্ন চা একর প্রতি	চায়ের বৃদ্ধি একর প্রতি	সাত আনা পাউণ্ড হিঃ বৃদ্ধির মূল্য	একর প্রতি সারের মূল্য	একর প্রতি মোট লাভ বা লোকসান
১। খৈল.........৪০০ পাউণ্ড মুরিয়েট অব পটাশ... ৪৪ „ সুপার ফসফেট (40%)...২৬ „ সালফেট অব এমনিয়া... ৮৪ „	৩৭১০ পাউণ্ড	৯১৯ „	৩১৮ „	টা ১৩৯-২-০	টা ২৪-৩-৯	+ „ ১১৪-১৪-৩
২। খৈল.........৪০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট (40%) ২৬ „ সালফেট অব এমনিয়া...৮৪ „	৩০৪০ পাউণ্ড	৭৫০ „	১৪৯ „	টা ৬৫-১-০	টা ২০-১৪-১	+ টা ৪৪-২-১১
৩। খৈল.........৪০০ পাউণ্ড মুরিয়েট অব পটাশ...৪৪ „ সালফেট অব এমনিয়া...৮৪ „	২৬৫৭ পাউণ্ড	৬৫৮ „	৫৭ „	টা ২৫-০-০	টা ২২-৪-২	+ টা ২-১১-১০
৪। সার আদৌ ব্যবহার করা হয় নাই।	২৪৭৫ পাউণ্ড	৬০১ „				

স্বর্ণা টি, এষ্টেট, সিলেট। পরীক্ষক ডি, ম্যাকিণ্টস্।

	জমির পরিমাণ ও প্লট নম্বর	সারের পরিমাণ	প্রতি একরে উৎপন্ন পাতা	প্রতি একরে উৎপন্ন চা	সার দেওয়া জমিতে ১ একরে চায়ের বৃদ্ধি	সাত আনা পাঃ হিঃ বৃদ্ধির মূল্য	প্রতি একরে ব্যবহৃত সারের মূল্য	প্রতি একরে মোট লাভ বা লোকসান
এক একর পরিমিত জমি	১।	খৈল.........২৪০ পাউণ্ড মুরিয়েট অব পটাশ...৫৬ ,, সুপার ফসফেট .. ১১২ ,, সালফেট অব এমনিয়া...৮৪ ,,	২০৮৫ পাউণ্ড	৫৮১ ,,	৯০½ ,,	টা ৩৯-৯-৬	টা ২৭ ৯-৯	+টা ১১-১৫-৯
	২।	খৈল.........২৪০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট... ১১২ ,, সালফেট অব এমনিয়া...৮৪ ,,	১৮২৪ পাউণ্ড	৪৫৮½ ,,	২৮ ,,	টা ১২-৪-০	টা ২৩-৫-৯	+টা ১১-১-৯
	৩।	সার ব্যবহার করা হয় নাই	১৭২২ পাউণ্ড	৪৩০½ ,,				

সেলিম হিল্ টি এষ্টেট। দার্জ্জিলিং। পরীক্ষক—জে, ম্যাকে।

	জমির পরিমাণ ও প্লট নম্বর।	সারের পরিমাণ	উৎপন্ন পাতা	উৎপন্ন চা	সার দেওয়ায় চায়ের বৃদ্ধি	দশ আনা পাউণ্ড দরে বৃদ্ধির মূল্য	সারের মূল্য	মোট লাভ বা লোকসান
এক একর জমি	১।	খৈল... . ...৪০০ পাউণ্ড মুরিয়েট অব পটাশ...৪৪ ,, পি, এল, মিক্সচার... ৬৮ ,, সালফেট অব এমনিয়া ৬২ ,,	১৪৬২ পাউণ্ড	৩৬৫½ ,,	৫৪½ ,,	টা ৩৪-০-০	টা ২৫-৯-৩	+টা ৮-৬-৯
	২।	আদৌ সার ব্যবহার করা হয় নাই।	১২৪৪	৩১১				

লণ্ডস্থণ্ড টি এষ্টেট। ১৯.২।

পরীক্ষক—এ, পি, ম্যাথিসন্।

(১৯১১ সালে যে সমস্ত জমিতে সার প্রয়োগ করা হয়েছিল ১৯১২ সালে সেই জমিতেই পরীক্ষা করা হয়।)

কোন জমিতেই সার প্রয়োগ করা হয় নি।	উৎপন্ন পাতা	উৎপন্ন চা	সারদেওয়ায় চায়ের বৃদ্ধি	।৵১০ সাড়েসাত আনা পাউণ্ড দরে বৃদ্ধির মূল্য	মোট লাভ বা লোকসান
১	২৭২০ পাউণ্ড	৬৮০ "	১১৯¾ "	টা ৫২-৬-৩	" ৫২-৬-৩
২	২৩৫৮ পাউণ্ড	৬৪৪ "	৮০½ "	টা ৩৬ ১০-৩	" ৩৬-১০-৩
৩	২৩৮৯ পাউণ্ড	৫৬০½ পাউণ্ড			

উপরে যে দশটা পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হইল তার মধ্যে শেষেরদুইটা অর্থাৎ লণ্ডস্থণ্ডের পরীক্ষার ফলাফলই বেশী শিক্ষাপ্রদ কেননা লণ্ডস্থণ্ড একই।

লণ্ডসুণ্ড টি এষ্টেট। আসাম। ১৯১১ সাল।

পরীক্ষক—এ, পি, ম্যাথিসন।

ভূমির পরিমাণ ও প্লটের নম্বর	প্রত্যেক প্লটে ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	উৎপন্ন পাতা	উৎপন্ন চা	সার দেওয়ায় চায়ের বৃদ্ধি	সাড়ে সাত আনা পাউণ্ড দরে বৃদ্ধির মূল্য	সারের মূল্য	মোট লাভ বা লোকসান
এক একর পরিমিত ভূমি ১।	খৈল………৪০০ পাউণ্ড পি, এন, মিক্সচার…৬৮ „ মুরিয়েট অব পটাশ…৪৪ „ সালফেট অব এমনিয়া…৬২ „	২৮০০ পাউণ্ড	৭০০ ঃ	৮০ ঃ	টা ৩৭-৮-০	টা ২৫-১৩-১	+ টা ১১-১০-১১
২।	খৈল………৪০০ পাউণ্ড পি, এন, মিক্সচার…৬৮ „ সালফেট অব এমনিয়া…৬২ „	২৫৩০ পাউণ্ড	৬৩২ ঃ	১২ ঃ	টা ৫-১০-০	টা ২২-৬-৫	+ টা ১৬-১২-৫
৩।	সার প্রদত্ত হয় নাই	২৪৪০ পাউণ্ড	৬২০ ঃ				

জমিতে পর পর দুইবৎসর ধরে পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন যে জমীতে সার প্রয়োগ কর্‌লে শুধু যে সেই বৎসরই ফসলের পরিমাণ বেড়ে যায় তা নয়—এমন কি তার পরের বৎসরও বেশী ফসল উৎপন্ন হয়।

মৃত্তিকায় আমরা যে সার প্রয়োগ করি, কেউ যেন না মনে করেন যে সেই সার ঠিক সেই অবস্থায় মৃত্তিকার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। সার পদার্থ মাটির সংস্পর্শে এলেই তার মধ্যে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়; এবং ফলে সারের দ্রবণীয় অংশ অদ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয়।

জমিতে সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ এমনিয়া প্রয়োগ কর্‌লে মৃত্তিকাস্থ চুণের সংস্পর্শে এসে ঐ সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ এমনিয়া, ক্যাল্‌সিয়াম্‌ সাল্‌ফেট্‌ ও এমনিয়াম্‌ কার্ব্বনেটে পরিণত হয়। ক্যাল্‌সিয়াম্‌ সাল্‌ফেট্‌ ধোয়াটের সঙ্গে ড্রেণের মধ্যে গিয়ে জমা হয়—আর এমনিয়াম্‌ কার্ব্বনেট্‌ ক্রমে ক্রমে নাইট্রেটে পরিণত হয়ে বৃক্ষাদিকে নাইট্রোজেন্‌ সরবরাহ করে। কিন্তু সর্ব্ববিধ নাইট্রেটই দ্রবণীয় পদার্থ। মাটিতে নাইট্রেট্‌ অব্‌ পটাশ্‌ প্রয়োগ কর্‌লে পটাশ্‌ মাটিতে থাকে কিন্তু নাইট্রেট্‌ অংশ ক্যাল্‌সিয়াম্‌ বা সোডিয়াম্‌ নাইট্রেট্‌ আকারে ধোয়াটের

সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এই জন্য যে সমস্ত প্রদেশে অতিরিক্ত পরিমাণে বারিপাত হয়ে থাকে সে সমস্ত স্থানের বাগানে নাইট্রেট্ অব্ সোডা বা সল্টপিটার প্রয়োগ করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। ফস্ফরাস্ মৃত্তিকাস্থ চুণ এবং লোহার সংস্পর্শে এলে অদ্রবণীয় ফস্ফেটে পরিণত হয়।

এই রকমে দেখা যায় প্রত্যেক সারই জমিতে প্রয়োগ কর্‌বার পর অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। জমিতে অনেক সময় মিশ্রিত সার ব্যবহার করা হয়। কয়েকটা সার মিশ্রিত কর্‌বার সময় ঐ পরিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত; কেননা তা নইলে ঐগুলির অপব্যবহার হবারই সম্ভাবনা বেশী। যেমন বেসিক্ স্লাগ্ সাল্‌ফেট্ অব্ এমনিয়ার সঙ্গে মিশ্রিত করা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা কষ্টিক্ লাইম্ এমনিয়াম্ সাল্‌ফেটের সংস্পর্শে এলে যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাতে এমনিয়া বাষ্পাকারে বহির্গত হয়ে যায়। সেই রকম আবার নাইট্রেট্ অব্ সোডা সুপার ফস্‌ফেটের সঙ্গে যোগান উচিত নয়। সুপার ফস্‌ফেট্, সালফেট্ অব্ এমনিয়ার সঙ্গে মিশ্রিত করাই যুক্তি সিদ্ধ। নাইট্রোজেন্ সম্পর্কীয় সারের মধ্যে কেবলমাত্র এক নাইট্রেট্ অব্ সোডাই বেসিক্ স্ল্যাগের সহিত মিশ্রিত করা যেতে পারে।

যাহা হউক্ সার সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা বলেই আমরা এ প্রবন্ধ শেষ কর্ব। গোবর বাঁদ্‌মাটি, পচাপাতাপাতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সার যে গুলা সে গুলা সাধারণতঃ খাদ কেটে তার মধ্যেই পূর্ণ করে দেওয়া হয়। নাই-ট্রোজেন্, পটাশ্ প্রভৃতি কৃত্রিম সার সমুদায়ও অনেক সময় ঐ ভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কৃত্রিম সারের বেলা অত ব্যবস্থা কর্‌লেই ভুল হয়। সারগুলি বাগানের চারিদিকে সমান ভাবে ছড়িতে দিয়ে একটু একটু ক'রে মাটি খুঁড়ে দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা সার প্রয়োগ সম্বন্ধে যে পন্থা অনুসরণ কর্ত্তে উপদেশ দিয়েছি, যদি ঠিক সেই উপদেশ মত কাজ করা যায়, তা হলে প্রত্যেক চায়ের বাগান থেকেই যে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট চা পাওয়া যাবে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কেন না আমরা যে সমস্ত কথার উল্লেখ করেছি, তার কোনটাই আন্দাজী বা পুঁথি থেকে পাওয়া বিদ্যে নয়—প্রত্যেক কথাটিই পরীক্ষিত এবং সত্য। উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেক সাহেব কোম্পানিই যথেষ্ট সুফল পেয়েছে; কাজেই ঐভাবে চাষ কর্‌লে কোন ভারতীয় কোম্পানীকে লোকসান দিতে হবে না এ কথা আমরা বেশ জোরের সহিত বল্‌তে পারি।

কে, সি, বসুর জীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কালীকুমার একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠকর্ম্মী অপর দিকে তেমনি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। একদিন তিনি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের একটী দোকানে সুবিখ্যাত গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের খাদ্য প্রস্তুতকারী কায়েম মিস্ত্রীর সহিত কারি পাউডার সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময় ঐ দোকান হইতে এক ভদ্রলোক এক টিন বিস্কুট কিনিয়া লইয়া গেলেন। কালীকুমার দোকানদারকে ঐ বিস্কুট সম্বন্ধে ২।১টি কথা জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার বিরক্ত হইয়া অবজ্ঞাচ্ছলে বলিল,—

"এ বিস্কুট এদেশের পাউরুটি বিস্কুটওয়ালার বিস্কুটের মত নয়; এদেশের বিস্কুটের সহিত ইহার তুলনা হয় না; ইহা বিলাতের বড় বড় ধনীলোকের কারখানায় অতি উৎকৃষ্ট মালমসলা দ্বারা প্রস্তুত ও টীনে ভরা হইয়া এদেশে আসে এবং বড় লোকেরাই ইহা ব্যবহার করে।"

কালীকুমার তখন কিছুই বলিলেন না; পরে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জনৈক সঙ্গীর সহিত ঐ বিস্কুট প্রস্তুত সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। বিলাতী বিস্কুট কিসে প্রস্তুত হয় তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য জনৈক বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে তিনি Imperial Libraryর সভ্য হইয়া বহু অনুসন্ধানের ফলে উপাদানগুলি এক প্রকার স্থির করিলেন।

পুরুষ-সিংহ-সাহেবগণ নানারূপ বৈজ্ঞানিক কল-কারখানার সাহায্যে যে বার্লি ও বিস্কুট নিজেদের দেশে প্রস্তুত করেন, কালীকুমার স্বীয় অসীম প্রতিভা বলে এখানে বসিয়াই সেই সকল জিনিষ ঠিক বিলাতের অনুকরণে করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে যেরূপ অনন্ত শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশাল বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কালীকুমার বাবুর কার্য্যসূচনা অতি সামান্য ও নগণ্য হইলেও তাহার ফল যে দেশব্যাপী হইতে পারে ইহা বর্ত্তমান K. C. Bose & Coর ব্যবসার অবস্থা দেখিয়া ধারণা করা যায়।

বিস্কুট প্রস্তুত করিতেই হইবে এই স্থির করিয়া প্রথমতঃ চাকতি ও বেলুনের সাহায্যে বেলিয়া ছুরিকা দ্বারা হাতে কাটিয়া একখানা করিয়া উনানে সেঁকিয়া বিস্কুট প্রস্তুত করা হইল। যখন দেখা গেল বিলাতী বিস্কুট গোলপানা হয়, তখন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া একটি শলাকা দ্বারা পশ্চাৎদিক হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া গোল বিস্কুট প্রস্তুত করা হইল। ইহা অতিশয় শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য দেখিয়া এই বিষয়ে অহোরাত্র কেবলই চিন্তা করিতে করিতে একদিন সন্ধ্যার সময় ভাড়াটিয়া গাড়ীতে যাইতে যাইতে কালীকুমার বাবু তাঁহার জনৈক সঙ্গীকে বলিলেন,—

"গাড়ীর বাতিটী যেমন একটু একটু

করিয়া গলিয়া যাইতেছে আর তলার স্প্রিংয়ের সাহায্যে আপনা হইতেই এক একটু করিয়া উঠিতেছে, আমাদের বিস্কুট-কাটারের পশ্চাদ্ভাগে যদি স্প্রিং যোজনা করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কাটারে বিস্কুট কাটার সঙ্গে সঙ্গেই উহা স্প্রিংয়ের শক্তিতে আপনিই চলিবে।” অনন্তর এইরূপ একটীর পর একটি করিয়া বিস্কুটের সমস্ত মেসিনারীই কালীকুমার স্বীয় অদ্ভুত প্রতিভাবলে উদ্ভাবন করিয়া প্রস্তুত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার দীর্ঘকাল পরে যখন বিলাত হইতে বিস্কুটের সমস্ত মেসিনারী আনা হইল তখন দেখা গেল যে, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত মেসিনগুলি সর্ব্বাংশেই বিলাতী মেসিনের অনুরূপ। বিলাতী মেসিনগুলি কেবল ফিনিসে শ্রেষ্ঠতর।

এইরূপে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কালীকুমারের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট প্রথম আবিষ্কৃত হয় ও কে, সি বসু এণ্ড কোং নামে কারবার স্থাপিত হয়। এই শিল্পই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইবে এ কথা ইহার পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। বিস্কুটের মেসিনারী প্রস্তুতের ন্যায় Oven অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত উনান তৈয়ারী করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইয়াছিল। দুই তিনবার অকৃতকার্য্যতার পর শেষবারে তিনি বলিয়াছিলেন, এইবারে যদি বিফলমনোরথ হইতে হয়, তবে উনানের মধ্যেই নিজদেহ বিসর্জ্জন দিব। বলিতে কি, এইবার তাঁহার oven বা উনন উত্তমই হইয়াছিল। যাঁহারা বলিবেন ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড ধন, তাঁহারা দেখিবেন যে, জনই প্রকৃত মেরুদণ্ড, ধন তাহার অনুগামী এবং কালীকুমার তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

বিস্কুট প্রস্তুত অপেক্ষা তাঁহার অকৃত্রিম পাম্প বার্লি ও পাউডার প্রস্তুতও কোন অংশে কম কৌতূহলোদ্দীপক নহে। তিনি দেখিলেন যে,

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রবিৎ চিকিৎসকগণ অশেষগুণসম্পন্ন যে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীদিগকে পথ্য দিতেন, সেই যবই একণে বিদেশে চূর্ণীকৃত ও টিনের বাক্সে পরিপূর্ণ হইয়া এদেশে আসিতেছে এবং রোগীর পথ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং সেই পাউডার যদি এদেশে প্রস্তুত করা যায় তবে উহার উপকারিতা অধিকই হইবে, কেননা এখানে উহা টাট্‌কা হইবে। যেমন চিন্তা—অমনই সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। কালীকুমার এই বার্লি পাউডার এক পাউণ্ড টিন-কেসে পূর্ণ করিয়া ২.৩ মাসের মধ্যে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রায় সকল চিকিৎসকের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই একযোগে কালীকুমারের উদ্যমশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিগত ১৯১৪ সালে ইউরোপের মহা-সমরের সময় কালীকুমার গভর্ণমেণ্টকে বহুপরিমাণে বার্লি ও ক্যাণ্ডী বিস্কুট সরবরাহ করিয়াছিলেন।

১২৯৫ সালে কালীকুমার সর্ব্ব প্রথম কারী পাউডার এর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'ন। এই কারী পাউডারের ব্যবসা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে মাদ্রাজের কয়েকজন ব্যবসায়ী লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন এবং এই বাংলা দেশেরই একজন বাঙ্গালী বিলাতে কারখানা স্থাপন করতঃ কারী-পাউডারের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। সে সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

কালী কুমার যখন এই কারী-পাউডারের ব্যবসায়ে হাত দেন সে আজ ৪১ বছর আগেকার কথা। বাংলা দেশে এই ব্যবসায়ে বোধ হয় তিনিই Pioneer বা অগ্রদূত। সে সময় দেশের মধ্যে কারী-পাউডার প্রচলন করার জন্ত তিনি যে গান এবং ছড়া রচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করতঃ ক্যান্‌ভাসারদের হাতে দিয়াছিলেন অনেকের নিকট তাহা চিত্তাকর্ষক এবং কৌতু-হলোদ্দীপক হইবে বলিয়া আমরা এখানে তাহা হুবহু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভূমিকা।

সন ১২৯৫ সাল হইতে এই কারি-পাউডার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া একণে ভিন্ন ভিন্ন ১৭ খানি মসলা এমন ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে যাহা ব্যবহার করিলে শরীর সবল এবং সুস্থ থাকিবে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়াছে। ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য; একবার সাধারণে ব্যবহার করিয়া দেখুন, ইহা গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক, কারণ শিল নোড়া ব্যবহার জন্ত জায়গা জোড়া ও পরি-শ্রম স্বীকার এবং দোকান হইতে মসলা ক্রয় করিয়া আনা প্রভৃতি কষ্টভোগ করিতে হইবে না; বিশেষতঃ কোন মসলা কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা ঠিক করা অতি কঠিন; ইহাতে সকল মসলাই ঠিক ভাগ মত আছে; এই পাউডারে পিঁয়াজ কিম্বা রশুন নাই। আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া যে কয়েকটি কার্য্য করিয়াছি তন্মধ্যে এইটাই আমার বিশেষ পরিশ্রমের ধন; আশা করি সাধারণে আমার কৃত এই কারি-পাউডার এক এক টিন ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। আরও বর্ত্ত-মানে অনেক লোকে অনেক রকম জিনিসকে বার্লী বলিয়া বিক্রয় করাতে লোকের বিশেষ অনিষ্ট হই-তেছে; কিন্তু সকলের জেনে রাখা উচিত যে বার্লী ইঞ্জিন ও মেসিন ভিন্ন প্রস্তুত হইতে পারে না। মেসিনের দ্বারা প্রথমতঃ পারলবার্লী প্রস্তুত হয় পরে উহাকে পাউডার করিতে হয়। পারল

বার্লী অর্থে যবকে মুক্তার ন্যায় সাদা ও গোলাকার করা ; এই কার্য্য মেসিন ভিন্ন হাতে কখনই হইতে পারে না এবং এই কার্য্যের উপযোগী মেসিন এক মাত্র আমিই বিলাত হইতে আনয়ন করিয়াছি ; আশা করি আমাদের বার্লি ব্যবহার করিতে কেহ সঙ্কুচিত হইবেন না ; ইচ্ছা করিলে বরাহনগর দর্জ্জী পাড়া ৪২ নং ভীনস্ মিলে আমাদের কল কারখানা দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

কলিকাতা
১০ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট } কে, সি, বসু এণ্ড কোং

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

এত দিনে বুঝি বিধি সদয় হইল।
হরিতে ললনা দুঃখ কারি-পাউডার আইল॥
শুনি লো সকলে বলে, বাটা বাটা গেল চলে,
ভাস্‌বো সুখে সবে মিলে, ধর্‌বোনা শিল নোড়া লো।
এড়াব শুরু গঞ্জনা, হলুদ মাখা হাত হবেনা,
ভাতার বশে ভয় রবেনা, হব রন্ধনে দ্রৌপদী লো॥

রাগিণী বাহার—তাল ঢিমে তেতালা।

কেয়া মজার কারি-পাউডার হয়েছে তৈয়ার।
ভাসিল সকলের আজ সুখ পারাবার॥
কালিয়া পোলাও আদি করি, রাঁধিতে হ'লেও চচ্চড়ি,
একটু দিলেই মজাদারী, হবে চমৎকার।
রেঁধে বেড়ে ঘুরে ঘোর মারবো লো বাহার॥
হিন্দু ম্লেচ্ছ যবন কাফ্রী, সবেতে সমান দরকারী,
লোক পটাতে এমন তর জিনিস নাইকো আর
মনের মত ব্যাঞ্জন পেলে কয়াব আহার॥

ধন্য কালী জন্মেছিলে, ভারতে কীর্ত্তি রাখিলে,
প্রায় উঠালে বিলাতী বার্লী কবুন্ ফ্লাউয়ার।
যে বিস্কুট কর্‌লে আবিষ্কার, অবাক হলো হণ্ট্‌লী পামার,
আশ্চর্য্য মানিল পিক্ ফ্রেন্ ওয়াকার॥
ভারতবাসী আছে যত, হয় যদি হে তোমার মত,
ঘুচিবে সবার দাসত্ব পরসেবা আর॥

ছড়া

শিল নোড়ার মুখে ছাই।
কারি-পাউডার অভাব নাই॥

শিলে ডাকি নোড়া কহে শুন প্রিয়তমে।
বড়ই দুঃখের লাঠি বাজিল মরমে॥
সৃষ্টি হতে এতকাল সুখে অতুলন।
দোঁহে মিলে অবিচ্ছেদে করিনু যাপন॥
স্বপনেও কভু প্রিয়ে ভাবি নাই মনে।
কাঁদিতে হইবে শেষে সারা নিশি দিনে॥
হিন্দু শিখ ম্লেচ্ছ আদি পাঠান্ যবন।
তাতার তুরস্ক রুষ ইংরাজ জর্ম্মণ॥
সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব লোকে মোদের স্মরণ।
লয়ে থাকে চিরকাল ভোজন কারণ॥
দেব যক্ষ নর রক্ষ যে যেখানে খায়।
মসলা বাটয়ে শিল নোড়ার কৃপায়॥
চিরদিন ছিল মোর মনে অহঙ্কার।
শরণ লইবে যেই করিবে আহার॥
স্মরিতে সে সব কথা বড় জ্বালা বুকে।
তোমাকে না বলিলেই বলিব বা কাকে॥
কোথা হতে এল প্রিয়ে এবে এতদিনে।
থাকিতে হইল মোরে তাহার অধীনে॥
অথবা জনম শোধ দিতে বিসর্জ্জন।
হবে তব সহযোগ কি আছে লিখন॥

কপালে আমার প্রিয়ে না জানি এখন।
বিধাতার লেখা কভি কে করে খণ্ডন॥
কোথা বা পড়িয়ে রব কোথা রবে প্রাণ।
প্রয়োজন বিনা কেবা করিবে সন্ধান॥
বড় আদরের ধন ছিনু মোরা লোকে।
বার্দ্ধক্যে জরাতে ক্লিষ্ট কিম্বা পুত্রশোকে॥
কাতর রমণী যবে হয় অনুক্ষণ।
সেইরূপ দশাতেও শিল প্রয়োজন॥
অথবা যৌবনে ভরা রূপের সাগর।
কুলবধূ কাছে এসে পাশরি নাগর॥
কোলে করি কতবার করে যে আদর।
এবে ভাঙ্গি গেল সেই সুখময় ঘর॥
"কারি-পাউডার" নাম ধুম ধাম ধরে।
সংপ্রতি প্রকাশ হয়ে টীনের ভিতরে॥
অবস্থান করে হরে দুঃখ সমাজের।
কি আর বলিব সীমা নাই আদরের॥
যথা তথা এই কথা শুনিবারে পাই।
কারি-পাউডার হলো এবে শিলের মুখে ছাই।
যতই আদর মোর ছিল এককালে।
সকলই হইল হত কপালের ফলে॥
পথে ঘাটে মাঠে বাটে সকলের মুখে।
হবে না বাটিতে বাট্না খাও ভাত সুখে॥
প্রবীণ কেরাণী হতে যুবক নবীন।
বেলে উঠে কিনি কারি-পাউডারের টীন॥
কহে বঁধু কি সুবিধা হ'লো অতঃপর।
বাট্না বাটা কষ্ট দূর করে পাউডার॥
প্রাতে উঠি ছুটাছুটী মনে ক'রে আসি।
সব কাজ ফেলে রাখি বাট্না বাটতে বসি॥
রন্ধন কাজের চেয়ে অধিক সময়।
মাথা ভাঙ্গি চলে পড়ে মসলা বাটায়॥
হাতের হলুদ তুলি যাই অতঃপর।
নাকে মুখে কভি কোনো পুরাই উদর॥
কুঠীর দিকেতে ছুটী অস্থির হইয়ে।
ভয় পাছে প্রভু খুনী হন গালি দিয়ে॥
এবার আপীসে বেলা হবেনাক আর।
কারি-পাউডারে খুসী যত অফিসার॥
নোড়া শিল ধরি এবে করি চুরমার।
নাক খত কাণ মলা কিনি যদি আর॥
পোলাও কালিয়া আদি ধনীর ব্যঞ্জন।
তাহাও রাঁধিতে শিল নাহি প্রয়োজন॥
চড়চড়ি ঝোল আদি দৈনিক আহারে।
কারি-পাউডার এবে সম গুণ ধরে॥
ধন্য কারি-পাউডার ঘুচালে জঞ্জাল।
আশীর্ব্বাদ করি বেঁচে থাক চিরকাল॥
হাটেতে বাজারে পথে ফিরে দলে দলে।
মহাহুলস্থুল এবে চাকরাণী মহলে॥
কেহ বলে ওলো বোন্ শুনিয়াছ আর।
বহিতে হবেনা আর বাটনার ভার॥
কোমর গিয়াছে দিদি বাটিয়ে বাটনা।
সহিয়াছি এতকাল কতই গঞ্জনা॥
আহা কি কাজ করিল যেই ক'রে আবিষ্কার।
এতকাল শুঁয়াইয়ে কারি-পাউডার॥
আর রামা বলে বোন্ ছিল যে চাকরি।
কারি-পাউডার মোর গলে মারে ছুরি॥
বাসাড়ের ঘরে বোন্ বাট্না বেটে খাই।
কি হবে আমার দশ এবে কোথা যাই॥
বাঙ্গালদেশের মেয়ে কালীঘাটে রয়।
যাত্রীদের বাসা এসে বাট্না বেটে দেয়॥
তারা শুনি বলাবলি করে সবে মিলে।
কি হইবে আমাদের কোথা যাই চলে॥
কোথা হতে এল বোন কারি-পাউডার।
দফা সেরে বাড়াইল দুঃখ পারাবার॥
লেজা লোচ্চা সোজা কোচ্চা ইয়ারের দলে।
কারি-পাউডার টীন করিয়া বগলে॥

বার্লী অর্থে যবকে মুক্তার ন্যায় সাদা ও গোলাকার করা; এই কার্য্য মেসিন ভিন্ন হাতে কখনই হইতে পারে না এবং এই কার্য্যের উপযোগী মেসিন এক মাত্র আমিই বিলাত হইতে আনয়ন করিয়াছি; আশা করি আমাদের বার্লি ব্যবহার করিতে কেহ সঙ্কুচিত হইবেন না; ইচ্ছা করিলে বরাহনগর দর্জ্জীপাড়া ৪২ নং ভীনস্ মিলে আমাদের কল কারখানা দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

কলিকাতা
১০ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট } কে, সি, বসু এণ্ড কোং

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

এত দিনে বুঝি বিধি সদয় হইল।
হরিতে ললনা দুঃখ কারি-পাউডার আইল॥
শুনি লো সকলে বলে, বাটা বাটা গেল চলে,
ভাস্‌বো সুখে সবে মিলে, ধর্‌বোনা শিল নোড়া লো।
এড়াব শুরু গঞ্জনা, হলুদ মাখা হাত হবেনা,
ভাতার বশে ভয় রবেনা, হব রন্ধনে দ্রৌপদী লো॥

রাগিণী বাহার—তাল ঢিমে তেতালা।

কেয়া মজার কারি-পাউডার হয়েছে তৈয়ার।
ভাসিল সকলের আজ সুখ পারাবার॥
কালিয়া পোলাও আদি করি, রাঁধিতে হ'লেও চচ্চড়ি,
একটু দিলেই মজাদারী, হবে চমৎকার।
রেঁধে বেড়ে ঘুরে ফেরে মারবো লো বাহার॥
হিন্দু ম্লেচ্ছ যবন কাফ্রী, সবেতে সমান দরকারী,
লোক পটাতে এমন তর জিনিস নাইকো আর
মনের মত মানুষ পেলে করাব আহার॥

ধন্য কালী জন্মেছিলে, ভারতে কীর্ত্তি রাখিলে,
প্রায় উঠালে বিলাতী বার্লী কর্‌নু ফ্লাউয়ার।
যে বিস্কুট কর্‌লে আবিষ্কার, অবাক হলো হণ্ট্‌লী পামার,
আশ্চর্য্য মানিল পিক্ ফ্রেন্ ওয়াকার॥
ভারতবাসী আছে যত, হয় যদি হে তোমার মত,
ঘুচিবে সবার দাসত্ব পরসেবা আর॥

ছড়া

শিল নোড়ার মুখে ছাই।
কারি-পাউডার অভাব নাই॥

শিলে ডাকি নোড়া কহে শুন প্রিয়তমে।
বড়ই দুঃখের লাঠি বাজিল মরমে॥
সৃষ্টি হতে এতকাল সুখে অতুলন।
দোঁহে মিলে অবিচ্ছেদে করিনু যাপন॥
স্বপনেও কভু প্রিয়ে ভাবি নাই মনে।
কাঁদিতে হইবে শেষে সারা নিশি দিনে॥
হিন্দু শিখ ম্লেচ্ছ আদি পাঠান্ যবন।
তাতার তুরষ্ক রুষ ইংরাজ ভর্ম্মণ॥
সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব লোকে মোদের স্মরণ।
লয়ে থাকে চিরকাল ভোজন কারণ॥
দেব যক্ষ নর রক্ষ যে যেখানে খায়।
মসলা বাটয়ে শিল নোড়ার কৃপায়॥
চিরদিন ছিল মোর মনে অঙ্গীকার।
শরণ লইবে যেই করিবে আহার॥
স্মরিতে সে সব কথা বড় জ্বালা বুকে।
তোমাকে না বলিলেই বলিব বা কাকে॥
কোথা হতে এল প্রিয়ে এবে এতদিনে।
থাকিতে হইল মোরে তাহার অধীনে॥
অথবা জনম শোধ দিতে বিসর্জ্জন।
হবে তব সংযোগ কি আছে লিখন॥

কপালে আমার প্রিয়ে না জানি এখন।
বিধাতার লেখা কভু কে করে খণ্ডন॥
কোথা বা পড়িয়ে রব কোথা রবে প্রাণ।
প্রয়োজন বিনা কেবা করিবে সন্ধান॥
বড় আদরের ধন ছিনু মোরা লোকে।
বার্দ্ধক্যে জরাতে ক্লিষ্ট কিম্বা পুত্রশোকে॥
কাতর রমণী যবে হয় অনুক্ষণ।
সেইরূপ দশাতেও শিল প্রয়োজন॥
অথবা যৌবনে ভরা রূপের সাগর।
কুলবধূ কাছে এসে পাশরি নাগর॥
কোলে করি কতবার করে যে আদর।
এবে ভাঙ্গি গেল সেই সুখময় ঘর॥
"কারি-পাউডার" নাম ধূম ধাম ধরে।
সংপ্রতি প্রকাশ হয়ে টীনের ভিতরে॥
অবস্থান করে হরে দুঃখ সমাজের।
কি আর বলিব সীমা নাই আদরের॥
যথা তথা এই কথা শুনিবারে পাই।
কারি-পাউডার হলো এবে শিলের মুখে ছাই।
যতই আদর মোর ছিল এককালে।
সকলই হইল হত কপালের ফলে॥
পথে ঘাটে মাঠে বাটে সকলের মুখে।
হবে না বাটিতে বাট্না খাও ভাত সুখে॥
প্রবীণ কেরাণী হতে যুবক নবীন।
রেলে উঠে কিনি কারি-পাউডারের টীন॥
কহে বঁধূ কি সুবিধা হ'লো অতঃপর।
বাট্না বাটা কষ্ট দূর করে পাউডার॥
প্রাতে উঠি ছুটাছুটী মনে ক'রে আসি।
সব কাজ ফেলে রাখি বাট্না বাটতে বসি॥
রন্ধন কাজের চেয়ে অধিক সময়।
মাথা তাতি চলে পড়ে মসলা বাটায়॥
হাতের হলুদ তুলি যাই অতঃপর।
যাহোক করিয়া কভু পুরাই উদর॥
কুঠীর দিকেতে ছুটী অস্থির হইয়ে।
ভয় পাছে প্রভু খুনী হন গালি দিয়ে॥
এবার আপীসে বেলা হবেনাক আর।
কারি-পাউডারে খুসী যত অফিসার॥
লোড়া শিল ধরি এবে করি চুরমার।
নাক খত কাণ মলা কিনি যদি আর॥
পোলাও কালিয়া আদি ধনীর ব্যঞ্জন।
তাহাও রাঁধিতে শিল নাহি প্রয়োজন॥
চড়চড়ি ঝোল আদি দৈনিক আহারে।
কারি-পাউডার এবে সম গুণ ধরে॥
ধন্য কারি-পাউডার ঘুচালে জঞ্জাল।
আশীর্ব্বাদ করি বেঁচে থাক চিরকাল॥
হাটেতে বাজারে পথে ফিরে দলে দলে।
মহাহুলস্থূল এবে চাকরাণী মহলে॥
কেহ বলে ওলো বোন্ শুনিয়াছ আর।
বহিতে হবেনা আর বাটনার ভার॥
কোমর গিয়াছে দিদি বাটিয়ে বাটনা।
সহিয়াছি এতকাল কতই গঞ্জনা॥
আহা কি কাজ করিল যেই ক'রে আবিষ্কার।
এতকাল শুঁয়াইয়ে কারি-পাউডার॥
আর রামা বলে বোন্ ছিল যে চাকরি।
কারি-পাউডার মোর গলে মারে ছুরি॥
বাসাড়ের ঘরে বোন্ বাট্না বেটে খাই।
কি হবে আমার দশ এবে কোথা যাই॥
বাঙ্গালদেশের মেয়ে কালীঘাটে রয়।
যাত্রীদের বাসা এসে বাট্না বেটে দেয়॥
তারা শুনি বলাবলি করে সবে মিলে।
কি হইবে আমাদের কোথা যাই চলে॥
কোথা হতে এল বোন কারি-পাউডার।
দফা সেরে বাড়াইল দুঃখ পারাবার॥
লেদা লোচ্চা সোবা কোচ্চা ইয়ারের দলে।
কারি-পাউডার টীন করিয়া বগলে॥

আনন্দে উৎফুল্ল মনে কালী ঘাটে ধায়।
পোলাও কালিয়া আদি যথা রুচি খায় ॥
কোন গোল নাহি নাহি কারও বা সহায়।
টীন খুলে গুঁড়া দিয়ে ব্যঞ্জন রাঁধায় ॥
গৃহস্থ বাটীতে লেগে গেছে মহাধুম।
ছেলে বুড়ো আদি কারো নাহি হয় ঘুম ॥
সর্ব্বদা পাউডার লয়ে ব্যঞ্জন রাঁধিয়ে।
মহা সমারোহ ক'রে আহার করিয়ে ॥
গৃহিণী আসিয়ে কহে কর্ত্তা মহাশয়।
এড়ায়েছি বড় জালা বাটনার দায় ॥
সর্ব্বদা দাসীরা আসি গোলযোগ করে।
এ বলে উহার পালা আমি যাই ঘরে ॥
এখন বাঁচিছু কারি-পাউডারের গুণে।
কায নাই মোর আর এত লোকজনে ॥
এরূপে প্রতি গৃহস্থ এক আধ করিয়া।
বাটনা বাটার দাসী দেয় ছাড়াইয়া ॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহস্থালী আর আছে যত।
যাহাতে যুবতীগণ বাটনাযুদ্ধে হত ॥
বাটনার ভাগ তারা বুঝিতে না পারে।
ব্যঞ্জনের মাথা খেয়ে দিত দফা সেরে ॥
কারি-পাউডার সব ভাগ মত কয়।
ইহাতে রাঁধিতে তার বোধ নাহি হয় ॥
কেবল লবণ ভাগ কিছু কিছু করে !
রন্ধন ব্যাপারে নারি দিতে যদি পারে ॥
প্রকৃত দ্রৌপদী বলে চলে যাবে লোকে।
তাহার গুঁজিবে ভাত নাকে মুখে চোখে ॥
এবে মহারথী সেজে রন্ধনশালায়।
দম্ভ করি সদা ধায় ভয় নাহি পায় ॥
কালে কালে কি হইল কালেরি এ গতি।
না পড়ে পণ্ডিত হলো যতেক যুবতী ॥
আরও যে হবিধা এক অপূর্ব্ব ঘটন।
হলুদ মাখা হাত আর হবেনা এখন ॥

অনেক যুবতী লজ্জা ভয়ে বাটিবারে।
পেট ব্যথা মাথা ধরা নানা ভাণ করে ॥
শাশুড়ী শাঁখিনী সম গর্জ্জিয়া আসিয়া ;
নব যুবতীকে কত দেয় শুনাইয়া ॥
এখন শাশুড়ী কোপ করিবে না আর।
ঘরে ঘরে কিনিয়াছে কারি-পাউডার ॥
সোণাগাছি রূপাগাছি মেছুয়াবাজার।
পাগল হইল বলি কারি পাউডার ॥
রাত্রি কাটে মহাসুখে আমোদের ঘোরে।
সকালে ভাবনা নাই বাটনার তরে ॥
পূর্ব্বে নাকি এইরূপ ছিল ব্যবহার।
একবেলা রাঁধিয়ে করে দুসন্ধ্যা আহার
এখন সে ভাবনা গেছে দুঃখ নাই আর ॥
কেনা আছে ঘরে যার কারি-পাউডার ॥
শুন প্রিয়তমে কহে লোচ্চা বাবু আসি।
কে মান রাখিবে ঘরে কিসে ভালবাসি ॥
ডিম্ব আনিয়াছি প্রিয়ে বহু যত্ন করে।
রাঁধিয়া করিবে চাট্ খাইব আদরে ॥
ইতিপূর্ব্বে মহাদুঃখে যুবতী পড়িতে।
এখন ত কোন ভয় নাহি লয় চিতে ॥
কারি-পাউডার গুণে তখনই যুবতী।
করিয়া বাজার এবে আনে শীঘ্রগতি ॥
ডিম্ব খেয়ে মহাসুখে লোচ্চা মহাশয়।
শত মুখে কারি-পাউডার গুণ গায় ॥
স্কুল কলেজে পড়ে যত ছেলের দল।
রান্নার জালায় হয়েছিল যে পাগল ॥
নিমের অম্বল করি কভু দেয় আনি।
দেখিবা মাত্রেতে কেঁদে উঠে মহাপ্রাণী ॥
কি করে তাহাই খেয়ে বিদ্যালয়ে ধায়।
অস্থির হইল প্রাণ রন্ধন জালায় ॥
কারি-পাউডার গুণ দেখিয়া হাসিয়া।
"জ্যাব গো টু হেল" বলে আনন্দে মাতিয়া ॥

পাচকে কেয়ার নাই যে হোক সে হোক।
ঝি যদি আইসে আসে না আসে তা হোক॥
কিছুতে শুমার নাই আনন্দেতে এসে।
কারি পাউডার টীন খুলে দেয় হেসে॥
পাচক না আসিলেও ক্ষতি বড় নাই।
আপনা আপনি রাঁধে উল্লাস সবাই॥
ভাগের হিসাব নাহি কিছু নিয়ে দিলে।
ব্যঞ্জন তৈয়ার হয় অনায়াসে চলে॥
এই দেখ দলে দলে পালে পালে ছেলে।
কারি পাউডার টীন করিছে বগলে॥
ইহাও দেখিয়া আশা হয় কি কখন।
জোড়ার শিলের কভু হবে প্রয়োজন॥
পাইব সে মান আর পাইব আদর!
রহিনু ডুবিতে চির দুঃখের সাগর॥
চির শত্রু মনে ভাবি রাখিলাম তোরে॥
মরমে অঘোত বড় দিলি তুই মোরে॥
শত্রু বটে কিন্তু গুণ অশেষ ধরিছ।
না বলি থাকিতে নারি সুখ বাড়ায়েছ॥
এত গুণ একাধারে কেমনে ধরিল।
একেবারে সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য করিলে॥
বলিহারি পাউডার ভুলিব না মনে।
ঝোল ডাল অম্বল সকলেতে মিলে॥
এত বলি শিল জোড়া উভয়ে মিলিয়া।
কি করি কোথায় যাই ভাবিয়া ভাবিয়া॥
সম দুঃখী নাহি দেখি সকলেই খুসী।
যে দিকে চাহিয়ে দেখে সকলেরই হাসি॥
কেবল দোকানদার ভাবিতেছে বসি।
গালে হাত কথা নাহি অন্তর উদাসী॥
সকলেই পাউডার কিনিছে বাজারে।
কেহই আসে না আর মসলার তরে॥
কি হবে কেমনে দিন চলিবে এবার।
বুঝিয়া উঠিতে হলো দৈশুক কারবার॥
যৌনি নাহিক হয় খুলিয়া দোকান।
খাইতে না পেয়ে বুঝি এবে যায় প্রাণ॥
এতক্ষণ শিল জোড়া আসি কহে ভাই।
কি করি উপায় নাই কোথায় বা যাই॥
পৃথিবীতে সম দুঃখী খুঁজিয়া না পাই।
সহানুভূতি যে করে এমন ত নাই॥
শুন বঁধু বহুকাল তোমাতে আমাতে।
কাটাইনু এতদিন বড় আদরেতে॥
এবে এত অপমান সহিতে না পারি।
চল ভাই গঙ্গাজলে ঝাপ দিয়া মরি॥
এত বলি তিন জনে হইয়া মিলিত।
দেখিতে দেখিতে গঙ্গাতীরে উপনীত॥
চমকিত হয় লোক এ সব দেখিয়া।
ডুবিল অতল জলে তিনেতে মিলিয়া॥
কারি পাউডারের রাজ্য হইল ধরায়।
হরি হরি বল সবে পালা হলো সায়॥

ইতি শিলদর্প চূর্ণ মহাকাব্যে জোড়া
শিলোৎসর্গো নামঃ প্রথম
সর্গো সমাপ্তঃ।

কালীকুমার স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষা জাতির ভিত্তি হইলেও, যে শিক্ষা কেবল দাসত্ব বৃদ্ধি করে সে শিক্ষা যতই উচ্চ হউক না কেন তাহাকে শিক্ষা বলা যায় না। পরন্তু যে শিক্ষা নৈতিক বল, আত্মসম্মান, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে সেই শিক্ষাই শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে শিক্ষা বর্ত্তমানে এদেশে নাই। কিরূপে শিক্ষা দিলে ভারতের লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনরুদ্ধার হয়, ভারতের ভাবী আশাস্থল বালকবৃন্দকে সেইভাবে শিক্ষা-প্রদানের উপায়োদ্ভাবনের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণী স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে তিনি অবসর পাইলেই স্মরণ করাইয়া দিতেন। যে চরকার ঘরে

ঘরে প্রতিষ্ঠাকে জগৎপূজ্য মহাত্মাজী বর্ত্তমান যুগে ভারতের বাঞ্ছিত ফললাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেই চরকার প্রচলনের জন্য কালীকুমার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দহইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এক্জিবিশনে তাঁহার বিস্কুট ও বার্লী ভিন্ন তিনি একটী চরকাও স্থাপন করেন। এই চরকার একটী করিয়া স্ত্রীলোক অনবরত সূতা কাটিত।

এই সকল বিষয় লইয়া বসুমহাশয়, স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সারদাচরণ মিত্র, ভূতনাথ পাল এবং উপেন্দ্রনাথ সাহু প্রভৃতি মহোদয় দিগের সহিত প্রায়ই কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং বলিতেন ইহা কি পরিতাপের বিষয় যে বৈদেশীক ব্যবসায়ীগণ আমাদের দেশের জিনিস লইয়া নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করতঃ অতি উচ্চ মূল্যে আমাদিগকে বিক্রয় করিতেছে; ইহাতেও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। যাহা হউক এখনও আমাদের কর্ত্তব্য এই অন্ন বস্ত্রবিহীন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবাসীর একটী পয়সাও যাহাতে বিদেশে না গিয়া দেশেই রক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত; তাহা হইলেই দৈন্য সমস্যার কতক পরিমাণে সমাধান হইবে এবং ভারতের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার হইবে।

ফলকথা এই অক্লান্ত কর্ম্মীর অবিচলিত উত্তম ও উৎসাহের সম্যক আলোচনা করিতে হইলে একখানি বড় পুস্তক হইয়া যায়।

১। যে বিস্কুট তিনি প্রথমে হাতের ছাঁচে এক এক খানি করিয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, তাহার বাৎসরিক বিক্রয় তাঁহার জীবদ্দশায় ৩০।৩৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দেখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ তারাপদ বসুর চেষ্টায় ও অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রস্তুত হওয়ায় সেই বিস্কুটের বাৎসরিক বিক্রয় এখন প্রায় লক্ষটাকা হইয়াছে। ইহার যেরূপ উত্তম ও শিষ্টাচার তাহাতে আশা করা যায় সত্বরই এই বিক্রয় যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

২। বার্লী পাউডার ও পারল বার্লী—যাহা প্রস্তুত ও প্রচলিত করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন এবং যাহাতে কলিকাতার লব্ধ প্রতিষ্ঠ বহু চিকিৎসক কি, হোমিওপ্যাথ—কি এলোপ্যাথ—কি কবিরাজ, কি হাকিম, সকলেই যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ সরকার, প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রশেখর কালী, রাধাগোবিন্দ কর, গনেন্দ্রনাথ মিত্র, কাশীদাস বিদ্যাভূষণ, যামিনীকান্ত সেন এবং বর্ত্তমান সময়ের ধন্বন্তরি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন প্রভৃতি। এই বার্লী তাঁহার জীবদ্দশায় যেরূপ বিক্রয় হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত তারাপদ বসুর যত্ন ও চেষ্টায় তদপেক্ষা অনেক বেশী বিক্রয় হইতেছে এবং আশা করা যায় যে যদি বর্ত্তমান মহানুভব চিকিৎসকগণের ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিকামী সমাগত মহাত্মাগণের অনুগ্রহ থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিশেষ বৃদ্ধিই হইবে।

মহাপ্রাণ কালীকুমার যে কেবল অসামান্য অধ্যবসায়ী ও কর্ম্মবীর ছিলেন তাহা নহে, তিনি দেশমাতৃকার একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। দেশের যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার যথাশক্তি সাহায্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ইটালী চাইল্ড-প্রেজেকেশার সেণ্টার, শ্যামবাজার দরিদ্র ভাণ্ডার, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি অনেকগুলি দেশহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার নিয়মিত মাসিক দান

ছিল। এতদ্ভিন্ন কেহ তাঁহাকে কোন দিন কোন প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতে দেখে নাই। এমন কি কালীকুমার যখন রাস্তায় পদব্রজে যাইতেন তখনও পথিপার্শ্বস্থ দুঃখী আতুর তাঁহার দানে বঞ্চিত হইত না। পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবনে নিরাশ্রয় নিরন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্যকল্পে এবং অ্যাম্বুলেন্স কোর্ ও বাঙ্গালী পল্টনের ব্যবহারের জন্য তিনি অনেক টাকার বিস্কুট ও বার্লি দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন গোপনে দান তাঁর অনেক ছিল। এত বড় বিস্কুটের ব্যবসায়ে অনেক পাওনা টাকা তাঁহার আদায় হইত না, কিন্তু তজ্জন্য তিনি কখনও কাহারও নামে আদালতে নালিশ করেন নাই। তাঁহার যুক্তি অকাট্য ছিল; যাহা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিতেন কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না।

কালীকুমার প্রথম বিবাহ করেন ১৭ বৎসর বয়সে মোক্ষদা নাম্নী ৯ বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে। সাতাশ বৎসর বয়সে কালীকুমারের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু চুয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কালীকুমারের আর কোনও সন্তান না হওয়ায় তিনি বংশলোপের ভয়ে ও আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়া, তারকেশ্বরের সমীপবর্ত্তী বেলীয়ার প্রসিদ্ধ সিংহ-বংশীয় ৺উপেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের কন্যা নলিনী সুন্দরীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী যথাসময়ে ৫টি পুত্র ও ২টি কন্যা প্রসব করিয়া ধনজন-পতিপুত্রে বিরাজমান বিপুল সংসারসুখ পরিত্যাগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কর্ম্মকুশল কালীকুমার কর্ম্মসূত্রে থাকিয়াও মাতৃহীন সন্তানগণের মাতৃপিতৃকৃত্য একাকী যথাবিধি পালনপূর্ব্বক তাহাদের লালন-পালনের সুচারু ব্যবস্থা করিয়া পুত্রগণকে শিক্ষিত করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত ও যোগ্য হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

জ্যেষ্ঠপুত্র কাত্যায়নীচরণ বসু একটী মাত্র কন্যা সন্তান রাখিয়া ২৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। উক্ত কন্যাটীর বয়স বর্ত্তমানে ৯ বৎসর হইয়াছে। কালীকুমার বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে কাতর হইয়া কার্য্যপরিচালনভার প্রতিভাবান সুযোগ্য দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ তারাপদ বসুর হস্তে সমর্পণ করিয়া—তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ শ্যামাপদ বসুকেও অল্প বয়সেই বেশ ধীর, স্থির ও কার্য্যক্ষম দেখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহযোগী করিয়া দিয়া স্বয়ং সামন্তভাবে পরিদর্শন-ভার গ্রহণ করেন। চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ বসু ও পঞ্চমপুত্র শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ বসুর ছাত্রজীবন এখনও অতিবাহিত হয় নাই।

মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তিনি ফ্যাক্টরীর কার্য্যে আর আত্মনিয়োগ করিতেন না। সমস্ত কার্য্যের ভার সুযোগ্য পুত্র তারাপদের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি একপ্রকার অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবসরকালে শাস্ত্রচর্চ্চা ও আদর্শ পল্লীগঠনের পরিকল্পনা লইয়াই সময় অতিবাহিত করিতেন। সেই অসামান্য অধ্যবসায়ী স্বাবলম্বনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত কালীকুমার আর ইহজগতে নাই। বিগত ১৯২৬ সনের ৩রা আগষ্ট তারিখে মধ্যাহ্নে পদস্খলনজনিত পতনে ৭৪ বৎসর বয়সে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া তিনি এই পঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।

একমাত্র আদর্শ পল্লীসংগঠনের পরিকল্পনা ভিন্ন কালীকুমারের সমস্ত সঙ্কল্পই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ভারতে বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া কালীকুমার যে অক্ষয় কল্পবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, দারিদ্র্য-নিপীড়িত ভারতবাসী অনন্তকাল ব্যাপিয়া ইহার ফলভোগ করিবে।

নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়

শিমুলের চাষ

[শ্রীবিরজানাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল, প্লীডার, মৌলবীবাজার—শ্রীহট্ট]

আজকাল ধুয়া উঠিয়াছে, গ্রামে ফিরিয়া যাও, চাষবাস কর, ৩০৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরির আশায় আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাথা খারাপ করিও না। বিশেষভাবে বেকার যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া আজকাল অনেক পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন:—

এম এ, বি-এ, পাশ করে
নোক্‌রী যদি নাহি মিলে,
কি লজ্জা? কিসের ভয়?
মিশে যাওনা চাষার দলে।

এইরূপে সোজাসুজি লাঙ্গল ধরিবার উপদেশ দেওয়া যত সহজ কার্য্যে তাহা পরিণত করা তত সহজ নহে। মানি—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; এদেশে অতি অল্পায়াসে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা এদেশের অধিবাসীদের অন্ততঃ বৎসর কয়েক অনায়াসে চলিতে পারে। কিন্তু তথাপি দুর্ভিক্ষ এদেশে লাগিয়াই আছে এবং অর্দ্ধেকের বেশী ভারতবাসী দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার করা কাহাকে বলে—তাহা জানেই না। কেন এমন হইতেছে? কেন ইহারা "উপোস করে দিন কাটাচ্ছে—থাক্‌তে মোদের ক্ষেতে ধান?" আজ যদি সমস্ত বেকার যুবক গ্রামে ফিরিয়া গিয়া মামুলী ধরণে ধান ও পাটের চাষে লাগিয়া যায় তাহা হইলেই কি ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে? এই যে শত শত বাঙ্গালী কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কোটি কোটি মণ পাট উৎপাদন করে তাহাদের দুঃখ দুর্গতি ঘুচে না কেন? হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়াও তাহারা অন্নের সংস্থান করিতে পারে না কেন?

যাহারা গোটা দেশকে চাষী হইবার জন্য উপদেশ দেন তাহারা বোধহয় আগ্রহের আধিক্য বশতঃ এ সমস্ত কথা ভুলিয়াই যান। আসল কথা হইল এই যে, মান্ধাতার আমলের রীতি অনুসারে বাপ দাদা চৌদ্দ-পুরুষের অবলম্বিত নীতিতে চাষবাস করিলে আমাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না, হইতে পারে না। চাষ যদি করিতে হয়, তবে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ধরণে, বাজারে যে শস্যের চাহিদা যত বেশী সেই জিনিষের চাষ আবাদ করিতে হইবে। মোট কথা দুনিয়ার সংবাদ রাখিতে হইবে,—কোথায় কোন্ জিনিষের কাটতি বাড়িয়াছে, কোন্ জিনিষ কত বেশীমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, এবং কোন্ জিনিষের চাষ আমাদের দেশে লাভজনক হইবে—এই সমস্ত বিষয় সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই সাধারণ বুদ্ধির লোকও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন। তাহা না করিয়া দুই চারি বিঘা ধান ও পাটের চাষ করিয়া আমাদের অভাব অভিযোগ হ্রাস পাইবে না—বরং উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে।

তারপর বর্ত্তমান প্রবল প্রতিযোগিতার বাজারে বিরাটভাবে কাজ না করিলে সাফল্যলাভ করা একরূপ অসম্ভব। পাশ্চাত্যের ধনী ব্যবসায়ীগণ তাই নানা শ্রেণীর যৌথ কারবারের সাহায্যে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি সম্পর্কে নিত্য নূতন লাভজনক ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিতেছেন। কৃষিকার্য্য-দ্বারা লাভবান হইতে হইলে এদেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। ভারতবর্ষে এমন অনেক জিনিষ উৎপন্ন হয় যেগুলি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না। সেই সমস্ত জিনিষ যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রচুরভাবে উৎপাদন করা যায় তাহা হইলে আশাতীত অর্থাগম হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে শিমুলের চাষের কথা বলা যাইতে পারে।

সম্প্রতি ভারতের কোথাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিমুলের চাষ হয় না। ভারতের বিভিন্ন স্থানের জঙ্গলে শিমুলের গাছ আছে—তথা হইতে অশিক্ষিত লোকেরা, ভাল মন্দ বাদ-বিচার না করিয়া, যাহা খুসি শিমুল তুলা সংগ্রহ করিয়া বাজারে ছোট ছোট দোকানদারের নিকট বিক্রয় করে। ইহারা আবার কোন কোন স্থলে ধুলা বালি মিশাইয়া এবং জলে ভিজাইয়া এই সমস্ত তুলা মিলের মালিকদের নিকট বিক্রয় করে। কলিকাতায় এই শ্রেণীর শিমুল তুলা ১৫৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রয় হয়।

তারপর মিলের মালিকেরা ঐ তুলা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া কলের সাহায্যে বীজ ছাড়াইয়া গদি এবং বস্তার ভর্ত্তি করিয়া বিদেশে চালান দেন। ইহাতেও প্রচুর লাভ থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে শিমুল তুলা উৎপন্ন হয় না,—কিম্বা হইলেও সমস্ত তুলা যথাসময়ে সংগৃহীত হয় না। তাই ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর পরিমাণে শিমুল তুলা এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে। যাহারা লাভজনক কৃষির সন্ধানে আছেন তাহারা এই শিমুলের চাষ সম্পর্কে চেষ্টা করিতে পারেন। ভারতবর্ষে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে শিমুলের চাষ হইতে পারে।

যৌথ কারবারের ভিত্তিতে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শিমুলের চাষ করিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী অপ্রত্যাশিতভাবে লাভবান হইয়েছেন। সেইরূপে যদি ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিমুলের চাষ হয়, তবে প্রচুর অর্থাগম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আসামের বনভূমিতে এবং বাঙ্গালার উচ্চ ভূমিতে শিমুলের ফসল খুব ভাল হয়। আসামের জমিতে ৩ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে সকল গাছেই তুলা ফলিতে আরম্ভ করে।

বর্ত্তমানে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলাগুলিতে, উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশে, লক্ষীমপুর অঞ্চলে শিমুলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা ঐ সমস্ত গাছ হইতে তুলা সংগ্রহ করে তাহাদিগকে একটা কর দিতে হয়। ইহার পরিমাণ প্রতিগাছে ৫৲ টাকার কম পড়ে না। তারপর একস্থলে প্রচুর পরিমাণে তুলা পাওয়া যায় না। নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইলে অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম উভয়ই অত্যন্ত বেশী লাগে। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই এক স্থানে বর্ত্তমানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিমুলের চাষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ শিমুলের তুলা অনেক কাজে লাগে। তুলার ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বিছানার আসবাবপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বসিবার কুশন, ইত্যাদি সব কাজে এই তুলা

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আজকাল আবার জাহাজের জীবন-তরী (Life buoy) নির্ম্মাণেও এই তুলা ব্যবহৃত হইতেছে। জলের উপর অধিকক্ষণ ভাসিয়া থাকা শিমুল তুলার একটি বিশেষত্ব। কোনও জীবন-তরীর টিউবের ভিতরে দুই পাউণ্ড অর্থাৎ এক সের তুলা ভর্ত্তি করিয়া দিলে উহা ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৫ সের ওজন লইয়া জলের উপর ভাসিতে পারে। ইহা ছাড়া আরও নিত্য নূতন ভাবে শিমুল তুলার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই তো গেল তুলার কথা। ঐ গাছের কাঠের মূল্যও কম নহে। অধুনা দেশলাইয়ের বাক্স প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে শিমুলের কাঠ ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতের নানা স্থানে যেরূপ-ভাবে দেশলাইএর কারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই কাঠের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। গুজরাটের পঞ্চমহাল অঞ্চলের পাহাড়ে যথেষ্ট শিমুলের গাছ ছিল। তথায় একটি দেশলাইয়ের কারখানা, ৮ বৎসরের মধ্যে সমস্ত শিমুল গাছ উজাড় করিয়া দিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, দেশলাই শিল্পের প্রচারের জন্যও রীতিমত এই শিমুল কাঠের চাষ আবাদ করা একান্ত প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত প্যাকিং বাক্সের জন্য শিমুল কাঠ সর্ব্বত্রই খুব ব্যাপকভাবে এদেশে ব্যবহৃত হয়। মাথাঘাজার, মুরগীহাটা, বেলেঘাটা, উল্টাডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলের শিমুল কাঠের আড়তের দিকে চাহিলে শিমুলের তক্তা যে কি বিরাট আকারে প্যাকিংএর কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটা ধারণা করা যায়।

তারপর ইহার মূলও ঔষধের জন্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান দিয়া থাকে। শিমুল তুলা হইতে কলের সাহায্যে বীজ ছাড়ান হয়। এই বীজও কাজে লাগে। এই বীজের তেল ১৪।১৫ টাকা মূল্যে বাজারে বিক্রয় হয়। সাবান প্রস্তুত-কারীরা এই তেল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। শিমুলের বীজ হইতে তেল বাহির করিয়া লইলে যে খোল অবশিষ্ট থাকে তাহাও মূল্যবান সামগ্রী। তৎসমস্তই ইউরোপে ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত হয়। তথায় এই খোল দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চাষ করিলে এক বিঘা জমিতে ১০০টি শিমুল গাছ জন্মিতে পারে। অত বেশী ধরিবার কাজ নাই;—কমপক্ষে যদি ৫০টি গাছও ফলপ্রসূ হয় তাহা হইলেও বৎসরে ২০ মণ তুলা পাওয়া যাইতে পারে। নিম্নে ২৷০ বিঘা জমিতে শিমুলের চাষের লাভ ক্ষতির হিসাব দেওয়া গেল:—

খরচ:—

কম পক্ষে ২০ মণ তুলা হইবে। প্রতি মণ ৷৶৯ পাই হিসাবে সংগ্রহ করার খরচ — ৩৫৷/৬ পাই

প্যাক করা, গাড়ী ভাড়া চালান দেওয়া, গুদাম ভাড়া ইত্যাদি— ২৬৷/০

মোট ৬০৵৬ পাই

লাভ:—

প্রতি মণ ২০৲ টাকা দরে
২০ মণের দাম—১০০০৲
উৎপাদনের ব্যয় ইত্যাদি—৬০৵৬ পাই

৯৩৯৸/৬ পাই

এই হিসাবের মধ্যে অবশ্য জমির খাজনা এবং চাষের খরচ ধরা হয় নাই। আসামের বন ভূমির প্রতি বিঘার খাজনা বেশী করিয়া ধরিলেও ১০৲ টাকার বেশী হইবে না এবং চাষের খরচও ১০০৲ টাকার বেশী প্রতি বিঘায় পড়িবে না। সুতরাং আড়াই বিঘার খরচ ২৮০৲ টাকার বেশী পড়িবে না। এই ব্যয় বাদে ও আড়াই বিঘায় কমপক্ষে ৬৫৯।/৬ পাই বার্ষিক লাভ হইবে—তারপর কাঠ ও বাঁশের মূল্যের হিসাব এখানে ধরা হয় নাই। তাহা হইতেও নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অন্যান্য দেশের অনুসরণে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ভাবে চাষ বাস করার চেষ্টা আমাদের দেশে হইতেছে কি? সকলেই কেবল চাষ কর—এই উপদেশ দিয়াই খালাস। প্রকৃতপক্ষে কোন প্রণালীতে কি জিনিষের চাষ করিলে, বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে লাভের সম্ভাবনা আছে তাহার কথা কত জন লোক ভাবিয়া থাকেন? আর কত জন ধন-কুবের ভারত বাসী এই শ্রেণীর লাভজনক কৃষি-ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে অগ্রসর হন? বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া নির্ব্বিবাদে দিন কর্ত্তন করা আমাদের দেশের ফ্যাসন হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন ইহার পরিবর্ত্তন না হয় ততদিন বেকার সমস্যার প্রতিকারের সম্ভাবনা কোথায়? দেশের অভিজ্ঞ, ধনী, ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহাতে একদিকে যেমন বহু সংখ্যক বেকারের কাজের সংস্থান হয় অপরদিকে তেমনি দেশের অর্থবল বৃদ্ধির পথও সুপ্রশস্ত হয়।

লাভজনক আলুর চাষ।

জলবায়ু :—আলু নাতিশীতোষ্ণ দেশের ফসল; কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশেও ইহার চাষ হয়। ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও জল পাইলেই আলু ভালরূপে জন্মে; সুতরাং এই দেশে শীতকালে জলসেচন করিয়া আলুর আবাদ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুফল পাওয়া যায়। কোনও কোনও স্থলে ইহার চাষ বৃষ্টিপাতের উপরই অনেকটা নির্ভর করে।

মৃত্তিকা :—অনেক রকম জমিতেই আলু জন্মে বটে, কিন্তু যে জমিতে লাঙ্গল দিলে মাটী সহজেই চূর্ণ হইয়া মিহি ধাতের হয় এইরূপ দো-আঁশ মাটিই আলু চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বেলেমাটিতেও আলু ভাল জন্মে; কেবল যে মাটিতে কাদার ভাগ অধিক তাহা আলু আবাদের পক্ষে অনুকূল নহে, উহাতে ভাল ফসল জন্মে না—বিশেষতঃ যদি নিম্নস্তরের মৃত্তিকাও কঠিন হয়।

যে পলিপড়া জমিতে জল সহজে যাওয়া আসা করিতে পারে সে মাটিতে কাদার ভাগ বেশী হইলেও ক্ষতি নাই। বালুকা বা প্রস্তরময় ভূমি আলুর উপযোগী নহে। মাটির মধ্যে জল আট্‌কাইয়া থাকিলে ফসলের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

আলুর ক্ষেত্রের সন্নিকটে জলাশয় থাকার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা অধিকাংশ অঞ্চলেই জল সেচন করিবার আবশ্যক হয়।

চাষ প্রণালী:—আলু আবাদের জন্য সকল ক্ষেত্রেই মৃত্তিকা গভীররূপে চাষ করিয়া ভাঙ্গিয়া নরম করিতে হইবে,—বর্ষার পরেই মাটি আট, নয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর করিয়া ভালরূপে চাষ করিতে হইবে। এক হাত হইতে দেড়হাত ব্যবধানে সারিগুলি থাকা দরকার।

বপন:—আলুর আবাদে ভাল বীজের উপকারিতার কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু ভাল বীজ সংগ্রহ করা কঠিন, কেননা ভাল জাতীয় পাহাড়ের বীজ নিম্নভূমিতে আসিলেই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। "নাইনিতাল" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় আলুর বীজের মূল্য অত্যধিক; এই কারণে ইহাদের সর্ব্বত্র প্রচলন নাই। প্রত্যেক কৃষক যদি নিজের জন্য বীজ বালুতে সংরক্ষণ করিয়া রাখে তবেই এই সমস্যার কতক মীমাংসা হইতে পারে। তবে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বীজের জাতি পরিবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয়। পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য যে সকল বীজ রক্ষা করিতে হইবে সেইগুলি সুস্থ ও ভাল প্রকৃতির হওয়া উচিত; এজন্য সেগুলি নীরোগ এবং সবল চারা হইতে নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। বীজ পরিবর্ত্তন আলুর চাষে যতটা আবশ্যক, অন্য ফসলের বেলা ততটা নহে। ভাল আলু ও পরিমাণে বেশী আলু উৎপন্ন করিতে হইলে বীজের জাতি মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন। কোনও এক প্রকার আবহাওয়াতে আলু উৎপন্ন করিয়া তাহা সেই প্রকার মৃত্তিকা ও আবহাওয়ায় রোপণ করিলে ফসল নিকৃষ্ট হয়। যে স্থানের মৃত্তিকা ও আবহাওয়া বিভিন্ন এমন স্থান হইতে নূতন বীজ আনয়ন করিয়া রোপণ করিলে ফসল ভাল হয়। উত্তরাঞ্চলের বীজ দক্ষিণাঞ্চলে, পাহাড়ের বীজ নিম্নভূমিতে, শক্ত মাটিতে উৎপন্ন বীজ নরম মাটিতে আবাদ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

ব্যয় সংক্ষেপের জন্য অনেক সময়ই আস্ত ছোট আলু বীজের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্ব্বল গাছ হইতে উৎপন্ন করিলে ফসলের অবনতি ছাড়া উন্নতি হইবে না। বড় আলু আস্ত বপন করিলে সবল চারা উৎপন্ন হইবে ও ফসলের বৃদ্ধি হইবে বটে, কিন্তু বেশী পরিমাণ বীজের আবশ্যক হয় বলিয়া ঐ প্রথা লাভজনক হইবে না। প্রত্যেকটী ৪ হইতে ৫ তোলা ওজনের মধ্যম আকারের আলু আস্ত বপন করিলেও ভাল পাওয়া যায়। বড় আকারের আলু খণ্ড খণ্ড করিয়া বপন করিলে যে ওজনে বীজের আবশ্যক হয়, মধ্যম আকারের আস্ত বপন করিলে তদপেক্ষা বেশী ওজনে বীজের আবশ্যক হয় না, কিন্তু ফলন অনেক বেশী হয়। কাজেই ঐ প্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক একটী আলুর যতগুলি চোক আছে তাহার প্রত্যেকটী হইতেই চারা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বপনের জন্য একটী আলু দুই কিম্বা তিনের অধিক খণ্ডে বিভক্ত হয় না। সাধারণতঃ আলু এমন দুই খণ্ডে দুইটী করিয়া চোখ থাকে। কর্ত্তিত স্থানগুলিতে চুণ মাখাইতে হয়, তাহাতে বপনের পরে আলুর খণ্ডগুলি শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায় না ও পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়, এবং বীজ অঙ্কুরিত না হইবার কোন কারণ

থাকে না। আস্ত আলু রোপণ করিবার পূর্ব্বে সেগুলিকে ঘরের মেঝের উপর ভিজা বালি বা খড়ের উপর ৮।১০ দিন রাখিয়া রোপণ করিলে শীঘ্র অঙ্কুর বাহির হয়। বীজের আকার অনুসারে প্রতি বিঘায় ৩।০ হইতে ৬৫০ মণ বীজ আবশ্যক হয়। বর্ষার শেষে অর্থাৎ প্রায় কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে আলুর বীজ বপন করা হয়।

আধহাত অন্তর নালা কাটিয়া তাহার মধ্যে দুই সারিতে প্রায় আধ-হাত তফাৎ তফাৎ আলু রোপণ করিয়া তাহা ঢাকা দেওয়াই দেশীয় প্রথা। দেশী আলু জন্মাইতে হইলে ঐ উপায়েই সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন "পাহাড়ী" প্রভৃতি বিদেশী আলুর বীজ বপন করা হয় তখন ১ হাত হইতে ১।০ হাত অন্তর নালা কাটিয়া প্রায় আধ হাত তফাৎ তফাৎ আলু রোপণ করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগ :—অপরাপর শস্য অপেক্ষা আলুর আবাদে অধিক সার দরকার হয় এবং অধিকাংশ স্থলেই প্রচুর সার প্রয়োগ করিলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। বিনা সারে আলুর আবাদ করিলে লাভ নাই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেশী ফলন হইলেই যে লাভ হইবে তাহা নহে—বরং উৎপন্ন আলুর প্রকৃতি কিরূপ হইলে বেশী দাম পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার; এ কারণ যে সে জিনিষ সারের জন্য ব্যবহার করিয়া ব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

তিন রকমে আলুতে সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে :—

১। বেশী পরিমাণে গো-মহিষাদির সার কিম্বা কেবলমাত্র রেড়ীর খইল ব্যবহার করিয়া।

২। অল্প পরিমাণ গো-মহিষাদির সার কিম্বা রেড়ীর খইলের সহিত উপযোগী রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া।

৩। কেবল রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া।

প্রথম উপায় দ্বারা অত্যধিক খরচ হইয়া পড়ে, আলুগুলি নিকৃষ্ট হয় ও আলুগুলির রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার শক্তি থাকে না।

২য় প্রথা অবলম্বন করিলেই বেশী ফলন ও উৎকৃষ্ট আলু এই দুইটী সম্ভব হয়।

৩য় প্রথা অনুযায়ী কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট আলু জন্মে বটে; কিন্তু ফসলের পরিমাণ কম হয়।

মাটী যদি শক্ত হয় বা তাহার রস ধারণ করিবার শক্তি কম থাকে তবে কতক গো-মহিষাদির সার, খইল অথবা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সার আলুর পক্ষে সকল মাটীতেই উপকারী। পুরাতন ও পচা গোময় বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে; কিন্তু গোময় টাট্‌কা হইলে তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে জমিতে চাষ করিয়া দিতে হইবে যেন আলু রোপণের পূর্ব্বে উহা জমিতে কতকটা পচিতে পারে। রোপণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই টাট্‌কা গোময় দিলে পোকার উপদ্রব ঘটে।

গো-মহিষাদির সার অথবা রেড়ীর খইল বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করিলে চারার অত্যধিক তেজ হইবার আশঙ্কা থাকে। এই সঙ্গে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন্‌-আত্মক রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে চারা আরও বড় হয়। এই প্রথাতে খরচও বেশী পড়ে। অর্দ্ধেক গোবর ও রেড়ীর খইলের সহিত তিন প্রকার রাসায়নিক সারের কিছু কিছু মিশ্রণ ব্যবহার করিলেই সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

যে সকল রাসায়নিক সার মিশ্রিত করিতে হইবে তাহাতে উদ্ভিদের খাদ্য নাইট্রোজেন, ফস্‌ফেট ও পটাশ এরূপ অবস্থাতে থাকা আবশ্যক যাহা শীঘ্র উদ্ভিদ চুষিয়া লইতে পারে। অস্থি-চূর্ণ

প্রভৃতি যে সকল সার উদ্ভিদ সহজে গ্রহণ করিতে পারে না সেগুলি জমিতে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রয়োগ না করিলে আলুর ন্যায় অল্পকালস্থায়ী শস্যের বিশেষ উপকারে আসে না। নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী হইলে আলুর পরিবর্ত্তে গাছের বৃদ্ধি হয় বটে; কিন্তু আলুর চাষে কতক পরিমাণ নাইট্রোজেন্ বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহা না পাইলে আলু জন্মিবে না।

আলুর ক্ষেত্রে কোন্ প্রকৃতির নাইট্রোজেন্-আত্মক সার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তৎসম্বন্ধে আমেরিকায় পরীক্ষা করা হয়—তাহার ফল এইরূপ হইয়াছিল:—

চারি রকমের নাইট্রোজেন্-আত্মক সার পরীক্ষিত হইয়াছিল—(১) চিলিয়ান নাইট্রেট্ অফ্ সোডা, (২) সাল্ফেট অফ্ এমোনিয়া, (৩) বাদুড়ের মল (গুয়ানো) ও (৪) কসাইখানার আবর্জ্জনা। বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন সার প্রদত্ত হইয়াছিল। কতকগুলি খণ্ডে নাইট্রোজেনের অর্দ্ধেক পরিমাণ চিলিয়ান নাইট্রেট্ অফ্ সোডার আকারে ও বাকী অর্দ্ধেক আর তিনটী সারের এক একটী দিয়া যোগান হইয়াছিল। আবার কয়েকটী খণ্ডে নাইট্রোজেনের চতুর্থ ভাগ চিলিয়ান নাইট্রেট্ অফ্ সোডারূপে, কিংবা সালফেট্ অফ্ এমোনিয়ারূপে অথবা নাইট্রোজেনের অর্দ্ধেক ভাগ গুয়ানোরূপে প্রয়োগ করা হয়। প্রত্যেক সার এরূপ ওজনে ব্যবহার করা হইয়াছিল যে পরীক্ষিত সব ক্ষেত্রেই নাইট্রোজেনের ভাগ তুল্য মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়।

ফলে দেখা গিয়াছিল যে, নাইট্রোজেন-আত্মক সারগুলির মধ্যে চিলিয়ান নাইট্রেট্ অফ্ সোডা প্রয়োগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল অর্থাৎ ৫ পাঁচ বৎসর ধরিয়া গড়ে প্রতি একরে ২৪১ বুশেল (ইংরাজী মাপের হিসাব) পাওয়া গিয়াছিল।

সাল্ফেট্ অফ্ এমোনিয়া প্রয়োগে সর্ব্বাপেক্ষা কম ফসল অর্থাৎ গড়ে প্রতি একরে ২১০ বুশেল মাত্র পাওয়া গিয়াছিল।

গোময়াদি সারের সহিত চিলিয়ান নাইট্রেট্ অফ্ সোডা প্রয়োগে আরও অধিক ফলন হইয়াছিল।

চিলিয়ান নাইট্রেট্ অফ্ সোডাতে শতকরা ১৫৷০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে; ঐ বস্তুর পরিমাণ হিসাবে চিলিয়ান নাইট্রেট্ খইল অপেক্ষা তিন গুণ ও গোবর অপেক্ষা ৪০ গুণ বলশালী। আবার চিলিয়ান নাইট্রেট্ অফ্ সোডার নাইট্রোজেন এইরূপ অবস্থায় থাকে যে তাহা উদ্ভিদ অবিলম্বে চুষিয়া লইতে পারে। গোবর, খইল, সালফেট অফ্ এমোনিয়া বা ক্যালসিয়াম সিয়ানামাইডে যে নাইট্রোজেন থাকে তাহা নাইট্রেট্ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইবার পর উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করে; এ জন্য ঐ সকল সার বিলম্বে কার্য্যকরী হয়। চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডার নাইট্রোজেন উদ্ভিদের পক্ষে শীঘ্র উপকারী হয়, আর ঐ নাইট্রোজেনের যোল আনাই ফলে উদ্ভিদের কাজে আসে। সুতরাং নাইট্রোজেনের উপযোগিতা হিসাবে চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডাই নাইট্রোজেন-আত্মক সারগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। এই বিষয়টী সকলেরই মনে রাখা উচিত।

আলুর আকারের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ করিতে হইলে পটাশযুক্ত পদার্থের প্রয়োজন হয়। কোন্ বস্তু পটাশ সারের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও বিবেচনা করা উচিত। সালফেট্ অফ পটাশ ব্যবহারে আলু সুস্বাদু হয় ইহাই সাধারণ মত। বাঙ্গলার পশ্চিম মাটিতে পটাশের অভাব

নাই বটে কিন্তু আলুর চাষের জন্য সার প্রয়োগ করিয়া পটাশের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়।

যদি জমিতে অম্ল বা হাজা দোষ থাকে বা ধৈঞ্চা জন্মাইয়া তাহা পচাইবার আবশ্যক হয় তবে প্রতি বিঘায় ২।০ চুণ ব্যবহার করা বিধেয়। যে জমিতে সাল্‌ফেট অফ্ এমোনিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে তথায় চুণ প্রয়োগের আবশ্যক; কারণ এমোনিয়া সারের দরুণ জমির হাজা অবস্থা দেখা দেয়; এই জন্যই ঐ সার ব্যবহারে মধ্যে মধ্যে চুণ প্রয়োগের আবশ্যকতা হেতু খরচ হয়। নাইট্রেট্ অফ সোডা প্রয়োগে এই আপদ উপস্থিত হয় না। আলুর জমিতে বেশী চুণ থাকিলে আলুর গায়ে একরূপ দাগ হয়। জমির তারতম্য অনুসারে চুণের পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি আবশ্যক। রোপণের অন্ততঃ ২ মাস পূর্ব্বে চুণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

কি পরিমাণে কোন্ সার প্রয়োগ করা উচিত তৎসম্বন্ধে কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, কেননা সমস্ত জমির অবস্থা এক রকম নহে। এক অঞ্চলের জন্য যাহা ঠিক হইবে অন্য অঞ্চলে তাহা না খাটিতেও পারে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সারগুলি অবস্থাভেদে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতি বিঘায় তাহাদের লিখিত পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে:—

সারের নাম	প্রতি বিঘায়
গো-মহিষাদির সার...	৫০/০ মণ কিম্বা রেড়ীর খইল ৫/০ মণ।
সাধারণ সুপার ফস্‌ফেট...	৮৫ সের কিংবা ডবল সুপার ফস্ফেট বা হাড়ের ছাই ।০ মণ।
সালফেট অফ পটাশ...	।০—।৮ সের।
চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডা...	৮০ ১/০ মণ।

গো-মহিষাদির সার জমি তৈয়ার করিবার সময় প্রয়োগ করিবে। বীজগুলি বসাইয়া মাটী ঢাকা দিবার পর মাটীর উপর. রেড়ীর খইল, সুপারফসফেট ও সালফেট অফ পটাশ মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হইবে; এই তিনটী একসঙ্গে মিশাইয়া প্রয়োগ করা যায়। "চারা যখন ৪ হইতে ৮ ইঞ্চি উচ্চ হইবে তখন আধাআধি ভাগে একবার ও কয় সপ্তাহ পরে আর একবার চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডা গুঁড়া করিয়া উহার তিন চারি গুণ শুষ্ক ঝুরামাটীর সহিত মিশাইয়া আলের উপর চারার নিকটে নিকটে দিতে হইবে—চারার গায়ে বা শিকড়ের উপর ফেলিবে না।" সুপার-ফসফেট ও হাড়ের ছাইএর অভাবে উহাদের দ্বিগুণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু এরূপস্থলে হাড়ের গুঁড়া বীজ রোপণের ২।৩ মাস পূর্ব্বে জমিতে দেওয়া আবশ্যক। যে সকল জমিতে আউস ধানের পরে আলু বপন করা হয় তথায় আউস ধানের জমিতে হাড় প্রয়োগ করিলে পরবর্ত্তী আলুর ফসলের কিছু উপকার হয়। সালফেট অফ পটাশের অভাবে প্রচুর পরিমাণে কাঠের ছাই, গোবরের ছাই, কলার বাসনার ছাই ও বিলাতী পানা বা জল কচুরীর পানা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অন্যান্য প্রক্রিয়া:—যথেষ্ট বৃষ্টি না হইলে রোপণের প্রায় ১০।১৫ দিন পরে জল সেচন আবশ্যক। অধিকাংশ পার্ব্বত্য অঞ্চলে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের কতক প্রান্তক স্থানে জলসেচনের কোন দরকার হয় না।

চারা জন্মাইবার পরে আগাছা পরিষ্কার

করিতে হইবে ও মাটী আল্গা রাখিতে হইবে। খুড়পি দিয়া অথবা হস্ত বা বৃষ-চালিত কর্ষণযন্ত্র দ্বারা ঐ কার্য্য সমাধা হইতে পারে।

চারাগুলি আধ হাত উচ্চ হইলে গোড়ায় মাটি দিতে হইবে, তিন চারিসপ্তাহ পরে দ্বিতীয়বার মাটী দেওয়া আবশ্যক। "মাটী তুলিবার সময় চিলিয়ান নাইট্রেট্ অফ সোডা দুইবারে দেওয়া যাইতে পারে।"

ইতিমধ্যে অন্ততঃ দুইবার জলসেচন করা প্রয়োজন। আর যদি আবহাওয়া অধিক গরম ও মৃত্তিকা নীরস হয় তবে অধিকবার জলসেচন করিতে হইবে।

ফসল সংগ্রহ:—পাতাগুলি যখন হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিয়া মরিতে সুরু করিবে এবং আলুগুলি যখন সহজে গাছ হইতে ছাড়ান যাইতে পারিবে তখনই আলু সংগ্রহ করার সময়। ক্ষেত্র হইতে যত্ন করিয়া আলু তুলিয়া লইতে হইবে। যেগুলিতে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে, সেগুলি শীঘ্র শীঘ্র ব্যবহার করিয়া ফেলাই ভাল। যেখানে বাতাস খেলিতে পারে ও অল্প অল্প আলোক যেথ নে য'য় এইরূপ ঠাণ্ডা ঘরে বাঁশের মাচার উপর ভাল আলুগুলি পাতলা ভাবে ছড়াইয়া রাখিতে হইবে।

আলু সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া বিহার প্রদেশের কোনও মহারাজকুমার লিখিয়াছেন—"আমি নাইট্রেট্ অফ সোডা ব্যবহার করিতেছি। আমার যতদূর স্মরণ পড়ে, তাহার অন্ততঃ সাত বৎসরের মধ্যে এমন ভাল ফসল পাই নাই একথা নিশ্চিত বলিতে পারি।"

পশ্চিম বঙ্গের কৃষিবিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার মিঃ এম্ স্মিথ, বি, এস্-সি "আলুর ক্ষেত্রে সার বিষয়ক পরীক্ষা" নামক বিবরণীতে লিখিয়াছেন:—

"প্রত্যেক কৃষকই আলুর ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রতি ৩ বিঘায় ২০০মণ গোময় ও ২০ মণ রেড়ীর খইল ব্যবহৃত হয়। কোনও উপযোগী রাসায়নিক সারের মিশ্রণ দ্বারা প্রচলিত প্রথায় আবাদের সমান ফল পাওয়া যাইতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য বর্তমান কৃষিক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা হইয়াছিল। রেড়ীর খইল অর্দ্ধেক ব্যবহার করিয়া অপরার্দ্ধের পরিবর্ত্তে সুপার ফসফেট এবং নাইট্রেট্ অব্ সোডা প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রতি ৩ বিঘায় সার।	প্রতি ৩ বিঘায় ফসল।	বৃদ্ধি	প্রতি ৩বিঘায় সারের ব্যয়।	ফসলের মূল্য
স্থানীয় পদ্ধতি।				
গোবর ... ২০০/০ মণ				
(ক) রেড়ীর খইল ... ২০/০ „	১২৪/০ মণ	...	৭০৶০ আনা	৩১০ টাকা
গোবর ... ২০০/০ „				
(খ) রেড়ীর খইল ... ১০/০ „	১৭০/০ „	৪৬/০মণ	৭৭৷০ আনা	৪২৫
সুপারফস্ফেট ২৷০/০ „				
নাইট্রেট অব্ সোডা ২৷০/০ „				

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ১৯১৬ সনের বিবরণীতে দার্জ্জিলিং আলু সম্বন্ধে পরীক্ষার নিম্নলিখিত ফল লিখিত হইয়াছে :—

ক্রমিক নম্বর।	প্রতি ৩ বিঘার সার।	জমির পরিমাণ।	প্রকৃত ফলন।	প্রতি ৩ বিঘার হিসাবে।	প্রতি ৩ বিঘার ফলনের মূল্য।	আবাদের খরচ।	লাভ।
১	কোন সারই নহে	... ২ কাঠা	৩/৫ সের	৯৩৸০ সের	১৬৯৸৵৯ পাই	২৪১৸৵০	—
	রেড়ীর খইল ১০/০ মণ	১৩ কাঠা					
২	সুপারফস্ফেট ২॥০ ,,	... ৫৳ ছটাক	৫৪॥০ মণ	২৪৫।০ সের	৪৪৪।৩ পাই	৩১৯।৵৩ পাই	১২৪৸৵০ আ০
	নাইট্রেট অফ সোডা ৬৮ সের						
৩	রেড়ীর খইল ২০/০ মণ	... ৬ কাঃ ১০ ছঃ	২০/০ ,,	১৮০/০মণ	৬২৬।০ আ	২৭৬৸/৯ পাই	২৯'৵৩ পাঃ

সাধারণতঃ চাষীরা প্রতি একরে ২০-৩০ মণ রেড়ীর খইল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অর্দ্ধেক রেড়ীর খইলের পরিবর্ত্তে নাইট্রেট অফ সোডা ও সুপারফস্ফেট ব্যবহার করিলে লাভ হইবে।

১৯১৫ ১৬ সালে বর্দ্ধমান সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ডেপুটী ডিরেক্টারের অধীনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে, সি, দে, আলুর চাষ করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :—

জমি	প্রতি ৩ বিঘায় সার		প্রতি ৩ বিঘায় ব্যয়	জমির পরিমাণ	প্রতি ৩ বিঘায় ফলন
১	কোন সারই নহে	...	...	৬ কাঠা	৫০/০ মণ
২	রেড়ীর খইল ২০/০মণ		৫০৲	১ বিঘা	১৫৬/০ মণ
	রেড়ীর খইল ১০/০মণ	২৫৲		১ বিঘা	
৩	নাইট্রেট অব সোডা ৩৸০ সের	৩২৲	৪৪॥০	(প্রথম খণ্ড)	
	সুপারফস্ফেট ২।৯ সের	৭॥০		১ বিঘা	১৮০/০ মণ
				(দ্বিতীয় খণ্ড)	

(ক) চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডা প্রভৃতি ব্যবহারে বিনা সার অপেক্ষা ফলনের বৃদ্ধি ১৩০/০ মণ।

(খ) শুধু রেড়ীর খইল ব্যবহারে ফলন অপেক্ষা নাইট্রেট অফ সোডা প্রভৃতি মিশ্রণে ফলনের বৃদ্ধি ২৪/০ মণ।

(গ) চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডা প্রভৃতির মিশ্রণের মূল্য রেড়ীর খইল অপেক্ষা ১৪॥০ টাকা বেশী; কিন্তু মিশ্রণ ব্যবহার দরুণ অতিরিক্ত ফসলের মূল্য ৭২৲ টাকা, অর্থাৎ মিশ্রণের দরুণ লাভ ৫৭'০ টাকা।

২৪ পরগণা বারাসতের জামালপুর নামক স্থানে বাবু জিতেন্দ্রনাথ বসু, জেলার কৃষিকর্ম্মচারী বাবু এস, কে, দত্তের তত্ত্বাবধানে এবং বাঙ্গালার ডেপুটী ডিরেক্টার অফ এগ্রিকালচার মহোদয়ের অধীনে আলুর চাষ করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাইয়াছেন। জামালপুরের নিকটবর্ত্তী তিনটী গ্রামে পরীক্ষা দ্বারা যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার পরিমাণ গড়ে উল্লেখ করা হইল :—

সার	জমির পরিমাণ	প্রতি বিঘায় সারের পরিমাণ	ফসলের পরিমাণ	প্রতি বিঘায় ফসল	প্রতি ৩ বিঘায় ফসল
১ রেড়ীর খইল ...	১০ কাঠা	৭/০ মণ	৩০/০ মণ	৬০/০ মণ	১৮০/০ মণ
রেড়ীর খইল ও নাইট্রেট অফ সোডা	ঐ	৬।০ মণ ।৬ সের	৪০/০ মণ	৮০/০ মণ	২৪০/০ মণ
					নাইট্রেট অফ্ সোডা ব্যবহারের দরুন ফসলের বৃদ্ধি ৬০/০ মণ

রেড়ীর খইল একটী সুপরিচিত সার; উহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আলুর চাষীদিগের নিকট আদৃত। রেড়ার খইল যখন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হয় তখন উহা অপেক্ষা অধিক উপযোগী সার দ্বারা উহার অভাব পুরণ করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়। আর একটী জ্ঞাতব্য বিষয়—এই রেড়ীর খইলে আজকাল প্রায়ই ভেজাল থাকে ও উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডার শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন থাকে তৎসম্বন্ধে বিক্রেতারা গ্যারণ্টি দিয়া থাকে।

দিনাজপুরের ডিষ্ট্রীক্ট এগ্রিকালচার অফিসার ১৯২৬-২৭ ও ১৯২৭-২৮ সালে আলুর ক্ষেত্রে নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ করিয়া যে ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

জমির নিশানা বা নম্বর	পরীক্ষায় নিযুক্ত জমির মাপ	একর হিসাবে (৩ বিঘায়) ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	সার প্রয়োগের তারিখ	একর হিসাবে (৩ বিঘায়) উৎপন্ন ফসলের ওজন
১। দিনাজপুর কৃষিক্ষেত্রে প্লট নং বি-২	৫ কাঠা	৩০ গাড়ী গোবর, নাইট্রেট অফ্ সোডা ১/৫	কার্ত্তিক মাসের প্রথমে	৭৫/৭৬/০ ছটাক
২। উক্ত প্লটের অনুরূপ।	ঐ	৩০ গাড়ী গোবর	....	৬১৫৯৬৩/০ছটাক

১। ব্লক৪ প্লট২। ৫ কাঠা গোবর ৩০০/০ সুপার অগ্রহায়ন মাসের
সারপ্লট ১। ফস্ফেট ॥৪ সের ঐ
সালফেট অফ্ পটাশ
॥৪ সের ঐ
নাইট্রেট অফ সোডা পৌষ মাসের
৩॥০ মণ মধ্য ভাগ ১০৬।০সের

২। উক্ত প্লটে সার অগ্রহায়ণ
প্রথ ২। ঐ গোবর ৩০০/০ মণ মাসে ৬৭৮২॥০

৩। উক্ত প্লটের সার- দ্বিতীয় দফা সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়
প্লট ৩। ঐ পরীক্ষা। সারপ্লট।
৪। উক্ত প্লটের সার- বিনা নাইট্রেটে দ্বিতীয় পরীক্ষা কেবল মাত্র গোবর
প্লট ৪। ঐ দফা ব্যবহার করা হয়। সারপ্লট

একর হিসাবে (৩ বিঘার) সারের মূল্য।	একর হিসাবে সার ব্যবহার হেতু মজুরী	একর হিসাবে উৎপন্ন ফসলের মূল্য।	নাই : সোঃ দ্বারা উৎপন্ন ফসলের মূল্য ও অন্য উপায়ে উৎপন্ন ফসলের মূল্যের জমা খরচ একর হিঃ লাভ বা লোকসান।	মন্তব্য
১৩২৬-২৭ সাল				দুইটি ক্ষেত্রে গোবর সমান পরিমাণ দেওয়া হয় ; এ কারণ উহার মূল্য ও প্রয়োগের খরচ বাদ দেওয়া হইল।
৯॥/০	২॥০	২২৫॥১০	২৭॥১৫
——	——	১৮৫h৶১৫	
১৩২৭-২৮ সাল				পরীক্ষাস্থলে নাইট্রেট অফ সোডার মূল্য ৮৲ প্রতি মণ
৩০৲	৪॥০	১৫৯৶০		সাধারণ সুপার
২৶৫	১॥০			ফস্ফেট ৪॥০ মণ
৫।/১০	৩৲		১৭।/১৫	সালফেট অফ
——	——			পটাশ ৮॥০ মণ
৬৫h৫	৯৲			আলু ১॥০ মণ
৩০৲	৪॥০	১০১॥৶১০	বিনা নাইট্রেট্ অফ সোডা
১এর অনুরূপ		১৫৫৶১০	
		২৭॥৶১৫
২এর অনুরূপ পরিমাণে ও সময়ে		৮৭৶০	

নারিকেলের কাতা প্রস্তুতের ব্যবসায়।

সাধারণতঃ আমরা নারিকেলের শাঁস ও জল খাইয়া তাহার ছোবড়াগুলি ফেলিয়া দেই। পল্লী গ্রামে ঐ গুলি চুলার মুখে পুড়াইয়া ফেলা হয়। কেহ কেহ কিছু কিছু তুলিয়া রাখে তামাক খাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া।

কিন্তু ছোবড়াগুলি এই ভাবে পোড়াইয়া নষ্ট না করিলে ইহা দ্বারা একটী উৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যবসায় গড়িয়া তুলা যাইতে পারে। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে আজও ইহার দ্বারা প্রচুর অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়—সেই ব্যবসায় নারিকেলের কাতা প্রস্তুতের ব্যবসায়।

নারিকেলের ছোব্ড়া পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেও আমাদের দেশের সকলেরই জানা আছে যে, নারিকেলের ছোব্ড়া হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১। প্রথমে সাধারণ ছোবড়ার কথাই ধরা যাউক। ইহা গদি প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ। সারা জগৎ জুড়িয়া এই ছোবড়ার ব্যবসায় চলিতেছে। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গদির ব্যবহার দিন দিন অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইতেছে। গদির বিছানা, গদির চেয়ার প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও পৃথিবীর বুকের উপর আজকাল যে অজস্র মোটরকার ছুটাছুটি করিতেছে উহাদের বসিবার আসন, রেল গাড়ীতে প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিবার আসন, ঘোড়ার গাড়ীর বসিবার আসন—এ সমস্তই নারিকেল ছোবড়া দিয়া তৈয়ারী হয়।

২। নারিকেলের ছোবড়া হইতে কাতা (coir) এবং কাতা হইতে দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেল দড়ির বিশেষ গুণ এই যে ইহা জলে ভিজিলে ইহার কোন ক্ষতি হয় না, বরং ইহাতে তাহা আরও শক্ত হইয়া উঠে। পাট ও শণ প্রভৃতি দড়ির এগুণ নাই। এইজন্ত জাহাজ বা নৌকা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত কাছি দড়ি ইত্যাদি সমস্তই নারিকেল কাতার তৈয়ারী।

আমাদের বর্ষাপ্রধান বাংলা দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এত অধিক যে গৃহাদি নির্ম্মাণে পাট বা শণের দড়ি ব্যবহার করিলেও উহা অল্পকাল মধ্যে পঁচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই ঐ উদ্দেশ্যে নারিকেল দড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পশ্চিমাঞ্চলে কূয়ার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; কেননা ঐ সকল দেশে পুষ্করিণী নাই বলিলেই চলে এবং পুষ্করিণী থাকিলেও সারা বৎসর তাহাতে জল থাকিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। পশ্চিমের লোকদিগকে এই জন্ত বালতি করিয়া কূয়া হইতে জল তুলিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে যে কাছি ব্যবহৃত হয় তাহা সকল ক্ষেত্রেই নারিকেল দড়ি দিয়া প্রস্তুত।

৩। নারিকেল দড়ি দিয়া আবার অনেক

প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে পাপোষ, ম্যাটিং প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাড়ীতে দুই চারিখানি পাপোষের প্রয়োজন। কলিকাতার আফিস গুলিতে পাপোষের ব্যবহার ত সর্ব্বত্র আছেই, তাহা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট আফিস বা বড় বড় বণিক আফিসে করিডরের উপর নারিকেল দড়ির ম্যাটিং ফেলা থাকে। উদ্দেশ্য করিডরের উপর দিয়া চলিয়া গেলেও জুতার মস্‌মস্ শব্দ হইবে না।

৪। নারিকেলের কাতা হইতে যে কত প্রকারের পণ্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌখীন শিরস্ত্রাণ, কারু কার্য্য খচিত ঝুড়ি, ব্রুস, ব্যাগ, থলি প্রভৃতি আরও অসংখ্য প্রকারের দ্রব্য ইহা হইতে তৈয়ারী হয়।

এই সমস্ত কারণে নারিকেল কাতার চাহিদা অত্যন্ত অধিক। প্রতি বৎসর বহু টাকা মূল্যের নারিকেল কাতা ও দড়ি বিদেশে চালান যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ, কোচীন ও মালাবার উপকূলেই বিস্তৃত ভাবে নারিকেলের চাষ হইয়া থাকে। কাজেই নারিকেল তেলের ন্যায় কাতার ব্যবসায়েও মাদ্রাজ ও কোচীন খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পুরাতন হিসাব পত্র ঘাটিয়া দেখিতেছিলাম—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এক মাদ্রাজ হইতেই ১২০৯৫৫৲ টাকা মূল্যের দড়ি ও ছোবড়া বিলাতে চালান গিয়াছিল। ঐ বৎসর সিংহল হইতে ২৮১২২ পাউণ্ড মূল্যের ছোবড়া এবং ১০১২১ পাউণ্ড মূল্যের দড়ি বিদেশে রপ্তানী হয়।

সিংহলে অজস্র নারিকেল গাছ জন্মিয়া থাকে। এইজন্য ঐ স্থানটী কাতাদড়ির ব্যবসায়েরও একটী প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ নারিকেল ছোবড়া ও নারিকেল দড়ি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে তাহা নিতান্ত অল্প নহে। সিংহল গভর্ণমেণ্টের সরকারী বিবরণী হইতে ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সালের রপ্তানীর পরিমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

	১৯২৫	১৯২৬
বৃষ্টল ফাইবার— (Bristol fibre)	১৫৫৪৬০ হন্দর।	১৫২৪৩২ হন্দর।
ম্যাট্রেস ফাইবার— (Mattress fibre)	২৯৮৩৭৫ হন্দর।	৩০২৭৯০ হন্দর।
ছোবড়া—	১২৮৪২৩ হন্দর।	১১০১৪২ হন্দর।
মোট	৫৮২২৬৯ হন্দর।	৫৬৫৩৬৪ হন্দর।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—কিরূপ বিরাট আকারে দুনিয়া জুড়িয়া নারিকেল কাতার ব্যবসা চলিতেছে। কিন্তু এই ব্যবসায় বাঙালীর স্থান কোথায়? অন্যান্য ব্যবসায়ের মত ইহাতেও তাহার স্থান নাই।

বাংলাদেশে নারিকেলের চাষ হয় না সত্য, কিন্তু বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অজস্র নারিকেলগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গাছে যে নারিকেল জন্মায় তাহার পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। অথচ ঐ সমস্ত ছোবড়া সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় চালাইবার ইচ্ছা কাহারও নাই। কলিকাতায় গদি প্রস্তুতের জন্য ছোবড়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই ছোবড়া প্রধানতঃ কোচীন হইতেই আমদানী হইয়া থাকে।

বাংলাদেশে যে আদৌ কাতা প্রস্তুত হয় না তাহা নহে। এদেশে জেলের মধ্যে কাতা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। জেলের কয়েদীগণ উহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু জেলের মধ্যে সাধারণতঃ কলের কোন সাহায্য লওয়া হয় না।

ফলে উৎপন্ন মালের মধ্যে অনেক খুঁত থাকিয়া যায়। এবং দামও পাওয়া যায় অল্প।

বর্ত্তমান যুগে কলের সাহায্য ব্যতীরেকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতায় টিকিয়া থাকা অসম্ভব বলিলেই চলে। অপর পক্ষে কলের সাহায্য লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য উৎকর্ষতার দিক দিয়া কোচীন প্রভৃতির সহিত অনায়াসেই সমানভাবে পাল্লা দিতে পারে। কেননা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও কোচীন প্রভৃতি স্থান নারিকেল চাষের প্রধান কেন্দ্র হইলেও উৎকর্ষতার দিক দিয়া বাংলার নারিকেল কোচীনের নারিকেল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তথাপি যে বাংলার নারিকেল তৈল বা কাতা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না তাহা কেবল প্রস্তুত-প্রণালীর দোষে ও আমাদের ঔদাসীন্যে।

বাংলায় আজ অন্নের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—কেননা প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যত ছেলে পাশ করিয়া বাহির হইতেছে গভর্ণমেণ্ট বা মার্চ্চেণ্ট আফিসে তত সংখ্যক কেরাণীর প্রয়োজন হইতেছে না। এ অবস্থায় শিক্ষিত যুবকগণ যদি অর্থোপার্জ্জনের স্বাধীন পন্থা আবিষ্কার ও অবলম্বন করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না।

অর্থোপার্জ্জনের স্বাধীন উপায় কৃষি ও ব্যবসায়। যাহাদের প্রচুর জমী আছে, তাঁহারা উন্নত প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের জমী জমা নাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন—ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করা।

ব্যবসায় বলিতে বাঙ্গালী যুবক কেবল চা ও ডায়িং ক্লিনিং বা ধোপার দোকান বুঝিয়া থাকেন। শিক্ষিত যুবক ব্যবসায় করিতে গেলেই দেখি কলিকাতায় ঐ দুয়ের দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন।

আমি ঐ দুই জিনিসের দোকান খোলা অন্যায় বলিতেছি না। তবে আমি বলিতে চাই—একটা জিনিসে একজন লাভ করিতেছে দেখিলে সকলেরই তাহাতে ঝুঁকিয়া পড়িবার প্রয়োজন কি? এই যে আমরা একটীর দিকে সকলে ঝুঁকিয়া পড়ি—ইহার অর্থ আমাদের স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। পাঁচজনে একটা ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে, আমরা সেই পাঁচজনের অন্ন মারিবার চেষ্টা না করিয়া আর পাঁচটা লাভজনক ব্যবসায়ের অনুসন্ধান করি না কেন? তাহাতে আরও পঁচিশ জনের উপকার হইবে।

ব্যবসায়ের বস্তু ত একটি নহে—অসংখ্য। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকিলে যে কোনও জিনিসকে অবলম্বন করিয়াই লাভজনক ব্যবসায় গড়িয়া তোলা যায়। তবে পরিশ্রম করা চাই—আর চাই অধ্যবসায় ও সৎসাহস। আমরা নারিকেল কাতার কথা বলিতেছিলাম। ইহার চাহিদা যে অফুরন্ত তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ভাল ভাবে organise করিতে পারিলে কাঁচা মাল সংগ্রহ করাও কঠিন নহে, কাজেই এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিলে অনেকগুলি যুবকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়।

১৯২৭-২৮ সালে ভারতবর্ষে ২১৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের লোহা ও ইস্পাত বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। এই সমস্ত লোহা ও ইস্পাতের মধ্যে দুই শ্রেণীর মাল আছে। যথা :—(১) অসংস্কৃত লোহার থাম এবং (২) লোহা ও ইস্পাত হইতে প্রস্তুত বিবিধ সামগ্রী।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত লোহা ও ইস্পাত আমদানী হয় তাহার অধিকাংশই গ্রেটবৃটেন হইতে আসে। তবে ভারতের বাজারে বৃটেন কিন্তু একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নহেন। জার্ম্মাণী ও বেলজিয়াম এবিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতে ছাড়েন না। সর্ব্বদাই ইহারা বৃটেনের অপেক্ষা সস্তা দরে মাল বিক্রয় করিয়া ভারতের বাজারে আধিপত্য করিতে চেষ্টা করেন। তজ্জন্য বৃটিশ ব্যবসায়ীরা আপ্রাণ চেষ্টায় লোহা ও ইস্পাতের দর কমাইয়া প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখেন—পাছে এত বড় একটা সুবিধা হাত ছাড়া হইয়া যায় এই দুর্ভাবনা পদে পদে তাহাদিগকে শঙ্কিত করিয়া থাকে।

১৯২৬ সালে একবার ইংলণ্ডের কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। ইহার ফলে লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ক্ষতির ধাক্কা সাম্‌লাইয়া লইতে কিন্তু বৃটিশ ব্যবসায়ীদের বেশী সময় লাগে নাই। ১৯২৭—২৮ সাল মধ্যে তাহারা পুনরায় লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৯২৬ সালে ইংলণ্ডে মাত্র ২৫০০০০০ লক্ষ টন অসংস্কৃত লোহা এবং ৩৫০০০০০ লক্ষ টন লোহা ও ইস্পাতের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৭ সালে তাহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া ৭০০০০০০ লক্ষ টন অসংস্কৃত লোহা এবং ৯০০০০০০ লক্ষ টন লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী ইংলণ্ডে উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯২৭-২৮ সালের প্রতি মাসে ভারতবর্ষে কত টন পরিমাণ অসংস্কৃত (Pig Iron) লোহা এবং লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী আমদানী হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল,—

অসংস্কৃত লোহা

মাসের নাম	কত টন		
	বৃটেন	বেলজিয়ম	জার্ম্মাণী
১৯২৭—			
এপ্রিল	৬৭২	—	—
মে	১০৫৩	—	—
জুন	৪৬৮	—	—
জুলাই	৯৯	১৫	—
আগষ্ট	৫৪	৪০	—
সেপ্টেম্বর	৩৫০	—	—
অক্টোবর	২৯৫	—	—
নবেম্বর	৩৩৮	—	—
ডিসেম্বর	৫৩	—	—

১৯২৮—			
জানুয়ারী	১০৭	—	—
ফেব্রুয়ারী	১৫৯	—	—
মার্চ্চ	৫২০	—	—
মোট	৪০৬৮	৫৫	—

লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী

মাসের নাম	কত টন		
	বৃটেন	বেলজিয়াম	জার্ম্মাণী
১৯২৭—			
এপ্রিল	৯৮০৯	৩৪৮০	৮০৯
মে	১৩৪৫৪	৩৯৪০	১০৩৪
জুন	১২৭৩০	২৯৪০	৮৭৯
জুলাই	১১৪৩৬	২৯৬৩	৯৯২
আগষ্ট	১১০৪৬	৩০৬৬	১০৮৭
সেপ্টেম্বর	১৩৮৩৯	৩০০৪	৯০৮
অক্টোবর	১৩৬৫৬	২৪৫৬	৬৫২
নবেম্বর	১২১৬২	৩১৯০	৮৮৪
ডিসেম্বর	১০৮৫০	২৮৮৮	৮০১
১৯২৮—			
জানুয়ারী	১১১৭১	৩১৭৬	১০৯৯
ফেব্রুয়ারী	১২৩৪৬	৩১৭১	১১১৭
মার্চ্চ	১১৮২৫	৪৩৭৫	১২১৭
মোট	১৪৫২২৪	৩৮৪৪৯	১১৪৭৯

ইহাতে দেখা যায়—মোটের উপর অসংস্কৃত ও পুরাতন লোহা বাদে কেবল লোহা ও ইস্পাতজাত দ্রব্য আমদানীর পরিমাণ পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় শতকরা ৪২ টন হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে ৮৩৮০০০ টন মাল আমদানী হইয়াছিল এবং তাহার দর পড়িয়াছিল ১৬৭১ লক্ষ টাকা। ১৯২৭-২৮ সালে আমদানী হইয়াছে ১১৯০০০০ টন এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ২১৩১ লক্ষ টাকা।

লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী আবার অনেক প্রকারের আছে। কোন্ জিনিষ কি পরিমাণ আমদানী হইয়াছে তাহার কথা এস্থলে আলোচনা করা হইল :—

ঢালাই লোহার পাত :—লোহা ও ইস্পাতের দ্রব্যাদির মধ্যে ঢালাইকরা লোহার পাতই খুব বেশী পরিমাণে আমদানী হয়। ১৯২৭-২৮ সালে যে সমস্ত লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী আমদানী হইয়াছে তাহার শতকরা ৩৮ ভাগই ঢালাই করা লোহার পাত। আলোচ্যবর্ষে মোটের উপর ৮০৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৩১০০০ টন লোহা ও ইস্পাতের মাল ভারতে আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ মালই বৃটেন হইতে আসিয়াছে। বৃটিশ মালের পরিমাণ ২৯৮০০০ টন এবং মূল্য ৭২৮ লক্ষ টাকা। এতদ্ভিন্ন বেলজিয়াম হইতে ৫৯ লক্ষ, জার্ম্মাণী হইতে ১৫ লক্ষ এবং আমেরিকা হইতে ১৬ লক্ষ টাকার মাল ভারতে আসিয়াছে।

টিনপ্লেট :—১৯২৭-২৮ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে ৮২ লক্ষ টাকার টিনপ্লেট ভারতে আমদানী হইয়াছে। মালের পরিমাণ ২৪৯০০ টন। ১৫২৬-২৭ সালে ৭৭ লক্ষ টাকা মূল্যে ২২২০০ টন টিনপ্লেট আমদানী করা হইয়াছিল। এই জিনিষের অধিকাংশই গ্রেটবৃটেন হইতে আসে। আলোচ্য বর্ষে গ্রেটবৃটেন হইতে ৫৭ লক্ষ টাকার টিনপ্লেট ভারতে আমদানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া জার্ম্মাণী হইতে ২৫ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে। বেলজিয়াম এবং জার্ম্মাণী হইতেও কিছু মাল আমদানী হইয়াছে বটে ; কিন্তু তাহার পরিমাণ বেশী নহে।

বার ও চ্যানেল :—১৯২৭-২৮ সালে ষ্টীলের বার ও চ্যানেল আমদানী হইয়াছে ১৮:০০০ টন। ইহার দাম পড়িয়াছে ১৮৩ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ১৪৮½ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫১০০০ টন মাল আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে বেলজিয়াম হইতে আসিয়াছে ১১১০০০ টন এবং ইহার দাম পড়িয়াছে ১০৩½ লক্ষ টাকা। গ্রেট-বৃটেন হইতে আসিয়াছে ৬৬ লক্ষ টাকার এবং ক্ষুদ্র লাক্সেমবার্গ রাজ্য হইতে আমদানী হইয়াছে ১৯ লক্ষ টাকার মাল।

এই লাক্সেমবার্গ ইউরোপের একটি অতিক্ষুদ্র রাষ্ট্র। সম্ভবতঃ বাঙ্গলাদেশের একটি জেলার আয়তন অপেক্ষাও ইহার আয়তন ক্ষুদ্র হইবে। তথাপি শিল্পে বাণিজ্যে এই সহর যে কত সমৃদ্ধ তাহার পরিচয় উপরোক্ত লৌহজাত সামগ্রী আমদানীর বিবরণ হইতেই পাওয়া যায়। মোট কথা, পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এবং প্রত্যেক নাগরিক মনে করে, ছুনিয়ার বাজার হইতে খাদ্য আহরণ করাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; কিন্তু আত্মভোলা এই ভারতবাসী—বিশেষ করিয়া এই বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী—মনে করে যে পিতৃপুরুষের ভিটে কামড়াইয়া উপবাসী থাকিলেও ক্ষতি নাই, ৩০ টাকার কেরানিগিরী পাওয়াই যেন তাহার জীবনের একমাত্র কামনার বস্তু। আদর্শবাদী বাঙ্গালীর এই কি শোচনীয় পরিণাম?

ইস্পাতের বার ও চ্যানেল ছাড়া প্রচুর পরিমাণে লোহার বার ও চ্যানেল ইত্যাদিও এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। ১৯২৭-২৮ সালে এই শ্রেণীর মাল ৪৯০০ টন আমদানী হইয়াছিল এবং দর পড়িয়াছিল ৯½ লক্ষ টাকা।

বিম, পিলার, গার্ডার, ব্রিজওয়ার্ক :—এই সমস্ত ১৯২৬-২৭ সালে যে পরিমাণ আমদানী হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে ১৯২৭-২৮ সালে আমদানী হইয়াছে। মোটের উপর আলোচ্য বর্ষে ১৮৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৪৪০০০ টন মাল ভারতে আমদানী হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭২০০০ টন মাল আসিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৯২৭-২৮ সালে গ্রেটবৃটেন হইতে আসিয়াছে ৯৯ লক্ষ টাকার মাল এবং বেলজিয়াম হইতে আসিয়াছে ৬২ লক্ষ টাকার মাল। তারপর জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মালও যে কিছু না আসিয়াছে এমন নয়।

রেল, চেয়ার, ফিস্‌প্লেট ইত্যাদি :—এই সমস্ত মাল (রেলের কাজে ব্যবহৃত মালও ধরা হইয়াছে) অধিকাংশই বৃটেন হইতে আমদানী হয়। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় ১৯২৭-২৮ সালে এই সমস্ত মাল আমদানীর পরিমাণ যথেষ্টরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালে ১১৩০০০ টন মাল আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ১৩৫ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ২৫½ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৩০০০ টন মাল আসিয়াছিল। এই শ্রেণীর জিনিষপত্র কিন্তু অধিকাংশই মাদ্রাজ প্রদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টিউব, পাইপ ও ফিটিং :—

ঢালাই করা টিউব, পাইপ ও ফিটিং ইত্যাদি ১৯২৭-২৮ সালে প্রায় ১৬০০০ টন আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দর পড়িয়াছে ৩৩ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে একা গ্রেটবৃটেনই ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬৪০০ টন মাল জোগাইয়াছে। তবে বেলজিয়ামও নিতান্ত কম জিনিষ প্রেরণ করে নাই। বৃটেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া বেলজিয়াম তাহের মালের দাম খুব কমাইয়া দিয়াছিল।

ইহার ফলে ভারতের বাজারে বেলজিয়ামের প্রস্তুত এই শ্রেণীর মাল বিক্রয় হইয়াছে ৬৪০০ টন। বৃটেন হইতে যে পরিমাণ মাল আমদানী হইয়াছে এই সংখ্যা তাহারই সমান। কিন্তু মূল্যের বেলায় বেলজিয়াম পাইয়াছে মাত্র ৮½ লক্ষ টাকা; অথচ বৃটেন তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী মূল্য আদায় করিয়াছে। এত গেল ভিতর ফাঁপা পাইপ ও টিউব ইত্যাদির কথা।

আর একপ্রকার নিটোল পাইপ ও টিউব ইত্যাদি আছে—যাহাকে লোহার ছড় বলে। তাহা ১৯২৭—২৮ সালে ভারতবর্ষে ৪৭০০০টন আমদানী হইয়াছে এবং দর পড়িয়াছে ১৩১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে গ্রেটবৃটেন হইতে ৮৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৮৬০০ টন মাল আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন জার্ম্মাণী ও বেলজিয়াম হইতে যথাক্রমে ১৮ লক্ষ টাকা এবং ১৬ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে।

Bolts and nuts, hoops and strips :—এই শ্রেণীর লৌহজাত সামগ্রীও এদেশে নিতান্ত কম ব্যবহৃত হয় না এবং তৎসমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। ১৯২৭-২৮ সালে ৩১ লক্ষ টাকা মূল্যের আন্দাজ ১০৩০০ টন Bolts and nuts এবং hoops and strips আন্দাজ ৩৩০০০ টন ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যে আমদানী করা হইয়াছে। মোটের উপর গ্রেটবৃটেন হইতে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বেলজিয়ামের আমদানীর পরিমান হ্রাস পাইয়াছে।

Nail, rivets and washers :—ইত্যাদি লোহার জিনিষ ১৯২৭-২৮ সালে ১৮৬০০ টন পরিমিত ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে এবং তৎসমস্তের দাম পড়িয়াছে প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা। একমাত্র গ্রেটবৃটেন হইতেই ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬৩০০ টন মাল ভারতের বাজারে উপস্থিত করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় বেলজিয়াম, নরওয়ে এবং সুইডেন হইতে আমদানীর পরিমাণ একটু বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু জার্ম্মাণীর মালের আমদানী একটু কমিয়া গিয়াছে। তারের দড়ি প্রায় সমস্তই গ্রেটবৃটেন হইতে আসে। ১৯২৭-২৮ সালে এই শ্রেণীর মাল প্রায় ৪২০০ টন আমদানী করা হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ২৫½ লক্ষ টাকা।

অসংস্কৃত লোহা

এ পর্য্যন্ত গেল লোহা ও ইস্পাত হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন জিনিষপত্রের কথা। তারপর অসংস্কৃত ও পুরাতন লোহাও এদেশে নিতান্ত কম আমদানী হয় না—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে এই শ্রেণীর মাল ১৬০০ টন মাত্র আমদানী হইয়াছিল এবং তাহার দর পড়িয়াছিল ২½ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯২২-২৮ সালে প্রায় ৫১০০ টন মাল আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দর পড়িয়াছে ছয় লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে একমাত্র বৃটেন হইতেই আন্দাজ ৪০০০ টন মাল ভারতের বাজারে আমদানী হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন খনি হইতেও অবশ্য অসংস্কৃত লোহা উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ এখনও চাহিদা মিটাইবার উপযুক্ত হয় নাই। তাই ভারতের নানা স্থানে কল কারখানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী লোহা ও ইস্পাত আমদানীর পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। তারপর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের বাজারে লোহা ও ইস্পাত বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার জন্ত বৃটেন,বেলজিয়াম, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং আমেরিকায় কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। ইহাতে বাধ্য হইয়া

ইংরাজ আপনাদের খুসী মত মূল্য আদায় করিতে পারিতেছেন না বটে ; তবে বাণিজ্যশুল্ক ও জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি যতটা সম্ভব সুলভ করিয়া দিয়া ভারতের বাজারে বৃটিশ লোহা ও ইস্পাতের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে ভারতকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করার উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই হইতেছে না। ভারতের খনি সমূহে প্রচুর পরিমাণে লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতি খনিজ পদার্থ থাকিলেও তৎসমস্তই এখন শাসন সরকারের কর্তৃত্বাধীন। শাসন কর্তারা তাহাদের খেয়াল মাফিক এ সমস্ত ব্যবহার করেন। যথারীতি ভারতীয় ধাতব পদার্থগুলি উত্তোলন করিয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে দাঁড় করাইবার এবং দেশের অর্থবল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা এসময়ে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে কোন দেশই ঘুমাইয়া নাই। সকলেই তাহার দেশের ধুলা মাটি পর্য্যন্ত সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া এবং নিত্য নূতন কাজে লাগাইয়া লাভবান্ হইবার চেষ্টা করিতেছে। এসময়ে হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন?

১৯২২—২৩ সালে ভারতবর্ষে ৬৮৪০০০ টন অসংস্কৃত লোহা উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ সালে ৭১১০০০ টন উৎপন্ন হয়। ১৯২৭-২৮ সালে ভারতবর্ষে আন্দাজ ১১৬২০০০ টন অসংস্কৃত লোহা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালের সহিত তুলনায় প্রায় ২০৫০০০ টন মাল বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশ হইতে যে সমস্ত মাল আসিয়াছে তাহার তুলনায় ইহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ১৯১৪ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত কোন্ দেশ হইতে কত টন লোহা ও ইস্পাত আমাদের দেশে আসিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় প্রদত্ত হইল :—

ভারতে লোহা ও ইস্পাত আমদানী

বৎসর	গ্রেটবৃটেন	জার্ম্মাণী	বেলজিয়াম	ফ্রান্স	আমেরিকার যুক্তরাজ্য	অন্যান্য দেশ	সর্ব্ব মোট
	টন	টন	টন	টন	টন	টন	টন
১৯১৩-১৪	৬০৯	২০০	১৭৩	২	২২	১২	১০১৮
১৯১৯-২০	২৬৯	১	১৩	...	১৩৫	৯	৪২৭
১৯২০-২১	৪৯৮	১৫	৬৯	২	১১৩	১৫	৭১২
১৯২১ ২২	২৮০	৬০	১৬০	৯	৮৪	২০	৬১৩
১৯২২-২৩	৩৫৯	৯০	২২৯	৭	৩৮	২৩	৭৪৬
১৯২৩-২৪	৪২৯	৬১	২১৭	৫	১৮	২৬	৭৫৬
১৯২৪-২৫	৪৩৯	৮৮	২৭৩	১৬	১৭	৩৬	৮৬৯
১৯২৫-২৬	৪৮৯	৬৯	২২০	৫৬	২৩	২৯	৮৮৪
১৯২৬-২৭	৪০৬	৭৯	২৫৭	৩৩	২৯	৪১	৮৪৫
১০২৭-২৮	৬৮৫	৭৯	৩৩৬	৪৮	১৬	৫৩	১১৯৭

ইহাতে দেখা যায়, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ মাল আমদানী হইত তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মাল অধুনা ভারতের বাজারে আমদানী হইতেছে। যে সময়ে সকল সুসভ্য দেশ স্বাবলম্বী হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে সেই সময়ে উত্তরোত্তর বেশী করিয়া পরমুখাপেক্ষী হওয়া ভারতের পক্ষে কি কলঙ্কের কথা নহে?

লিমিটেড্ কোম্পানীর কথা।

স্বরাজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্।

সম্প্রতি স্বরাজ ব্যাঙ্ক নামে কলিকাতায় একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দিন উদ্যোক্তাদিগের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। নিমন্ত্রণ পত্র এবং ব্যাঙ্কের অনুষ্ঠান পত্র পাঠে আমরা যেরূপ উৎসুক হইয়া গিয়াছিলাম, সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদের সে আশা ও উৎসাহ একেবারে উপিয়া গিয়াছে।

যে কয়েকটী কারণে আমাদের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা এখানে সমীচীন মনে করিতেছি।

এই ব্যাঙ্কের প্রস্তাবিত মূলধন পঁচিশ কোটী টাকা। পাঠক চমকাইবেন না। উদ্যোক্তাগণ বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধনে তৃপ্ত হন নাই—ক্রোড় টাকা মূলধনেও তাঁহাদের আশা মিটিবে না, তাই একেবারে পচিশ ক্রোড় টাকা মূলধন তুলিবার সঙ্কল্প লইয়া ইহারা কোম্পানী রেজেষ্টী করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় দৈন্য দিন দিন যেমন বাড়িতেছে কোম্পানী গঠনকারী ভাবুকের দলও সেই পরিমাণে শুভঙ্করী ভুলিয়া যাইতেছেন বলিয়া মনে হয়। তাই উদ্যোক্তাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি—কত হাজারে লাখ হয় এবং কত লাখে কোটী হয়—সে অঙ্ক কি ভুলিয়া গিয়াছ? -একশো হাজারে এক লাখ, এবং একশো লাখে এক কোটী হয়; এইরূপ ২৫ বার একশো লাখ জড় করিতে পারিলে তবে স্বরাজ ব্যাঙ্কের প্রস্তাবিত মূলধন সংগ্রহ হইবে। যে দেশে দশলাখ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে বকিতে বকিতে ক্যানভাসারদের মুখে ফেণা উঠিয়া যায় এবং চোয়ালে খিল ধরিয়া যায়, আর দুশ্চিন্তায় কর্ণধারদের শরীরের রক্ত আধা শুখাইয়া গিয়া জঠরস্থ বায়ু ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়—সে দেশে পঁচিশ কোটী টাকা মূলধন তুলিবার কল্পনা রহস্যজনক সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্কের নাম দেখিয়া আমাদের মনে একটা খট্কা লাগিয়াছে। স্বরাজ ব্যাঙ্ক বলিলে দেশের অজ্ঞ এবং সরল চিত্ত লোকদিগের মনে নানারূপ ধারণা আসিতে পারে। আমরাও নানারূপ ধোকায় পড়িয়াছিলাম। প্রথমে মনে হইয়াছিল—ইহা বুঝি স্বরাজ্য পার্টির ব্যাঙ্ক। যদি তাহাই হয় তবে জনসাধারণের মনে এই ব্যাঙ্কের প্রতি যে একটা প্রবল আকর্ষণ হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই; কারণ স্বরাজ্য পার্টিই বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গতিশীল ও নির্ভীক রাজনৈতিক দল; নানারূপ গলদ থাকা সত্ত্বেও দেশের লোক সব রকম ব্যাপারে তাহাদিগের প্রতিই বরাবর আস্থা দেখাইয়া আসিতেছে। সকল রকম রাজনৈতিক ব্যাপারে দেশের লোক যে দলের প্রতি নির্ব্বিচারে এবং অবিচলিতচিত্তে বছরের পর বছর নিজেদের বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়া আসিতেছে, একটা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেও (তাহার নাম যদি স্বরাজ ব্যাঙ্ক হয় যাহার মধ্যে অনেক অর্থ নিহিত আছে)

তাহারা হয়ত অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহার সেয়ার কিনিবে এবং টাকা জমা দিবে। এইজন্ত ব্যাঙ্কের নামের পরিকল্পনা দেখিয়া উত্তোক্তা দিগের বুদ্ধির তারিপ না করিয়া পারি নাই এবং স্বরাজ্য পার্টি এতদিনে একটা ব্যাঙ্ক গঠন করিতে মনোযোগী হইয়াছেন মনে করিয়া আশান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরিশেষে অনুষ্ঠান পত্র পড়িয়া হতাশ হইলাম। কারণ অনুষ্ঠান পত্রে স্বরাজ পার্টির Big five বা পঞ্চ প্রধানের মধ্যে কাহারও নাম ত দেখিলামই না, পরন্তু স্বরাজ্য পার্টির যাঁহারা নেতা, উপনেতা বা অধিনেতা। এমন এক জনেরও নাম দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং নামে স্বরাজ ব্যাঙ্ক হইলেও স্বরাজ্য পার্টির সহিত পরিচালক হিসাবে ইহার যে কোনও সংস্রব নাই অনুষ্ঠান পত্র হইতে তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল।

অতঃপর খট্‌কা লাগিল—স্বরাজ্য পার্টির ব্যাঙ্ক না হইলেও ইহার যখন নাম করা হইয়াছে স্বরাজ ব্যাঙ্ক তখন জনসাধারণের মনে হয়ত এই ভাব আসিতে পারে যে, স্বরাজ লাভ করার জন্য Men and Money অর্থাৎ জনবল এবং ধনবল অবশ্য চাই; তাই হয়ত স্বরাজ ব্যাঙ্ক-স্থাপন করা হইয়াছে একেবারে পঁচিশ কোটী টাকা মুলধন তুলিবার জন্ত—যাহাতে আগামী স্বরাজ সমরে অকাতরে টাকার যোগান দেওয়া যায়। সেয়ারের অংশও দেখিলাম তাই অতি সুলভ কিস্তিতে রাখা হইয়াছে—যাহাতে এদেশের দীনাতিদীন লোকও একটা অংশ কিনিয়া স্বরাজ লাভে সহায়তা করিতে পারে। সামান্ত একটা টাকা দিলেই অংশী হওয়া যায় এবং তারপর এইরূপ যৎসামান্ত কিস্তি দিয়া কয়েকবারে দেয় টাকা পরিশোধ করিতে হয়। দেশের লোকের প্রাণে সম্প্রতি স্বরাজ লাভের লোভ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সামান্ত কয়েকটি টাকা দিয়া যদি স্বরাজ লাভে সাহায্য করা যায় এবং অংশী হিসাবে কিছু লাভও ভবিষ্যতে পাইবার আশা থাকে তবে প্রস্তাবটি মন্দ কি?—একঘায়ে সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙিবে না, এ দিকে রথ দেখাও হইবে এবং কলা বেচাও হইবে।

বলা বাহুল্য জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ ধারণা হওয়া একটুও বিচিত্র নহে। ক্যানভাসারের মুখে এই ভাবটী আবার লতায়, পাতায়, পল্লবে, পুষ্পে এমন লোভনীয় আকার ধারণ করিতে পারে, যাহার মোহ এবং প্রলোভন জনসাধারণের পক্ষে এড়ানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং "স্বরাজ ব্যাঙ্ক" মানে যদি স্বরাজলাভ করার জন্তে এই ব্যাঙ্ক—এই হয় তবে দক্ষ ক্যানভাসারদিগের পক্ষে জনসাধারণের নিকট ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা করতঃ সেয়ার গাঁথিয়া আনা খুবই সহজ হইবে। এই ভাবিয়া এইরূপ নাম করণের জন্ত আমরা উত্তোক্তাদিগের বুদ্ধির একবার বিশেষ তারিপ করিলাম। কিন্তু তখনই আবার মনে এক খট্‌কা আসিল যে, স্বরাজ লাভের জন্তই যদি এই ব্যাঙ্কের "স্বরাজ ব্যাঙ্ক" নামকরণ হইয়া থাকে তবে এই অনুষ্ঠান পত্রে (?) স্বরাজ সমরের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি সব রথী মহারথীদের কাহারও নাম নাই কেন? মতিলাল, জহরলালকে অবাঙ্গালী হিসাবে বাদ দিলেও বঙ্গেশ্বর সুভাষ চন্দ্র কই? মন্ত্রী কিরণশঙ্কর কই?—মেয়র যতীন্দ্র মোহন কই?—স্বরাজ লাভের জন্ত যদি এই ব্যাঙ্ক হইয়া থাকে তবে স্বরাজ সমরের সর্ব্ব প্রধান যোদ্ধাদের বাদ দিয়া এ যেন হ্যাম্লেট্‌কে বাদ দিয়া হ্যাম্লেটের অভিনয়ের আয়োজন? সুতরাং যাহাদের এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান আছে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যেই যদি এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পরিচালনভার দেশ

প্রসিদ্ধ ধনাঢ্যদিগের কাহারও উপর নিশ্চয়ই ন্যস্ত হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া এই ব্যাঙ্কের পরিচালন ভার এমন সব লোকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে যাহাদিগকে দেশের কেহই জানে না, শোনে না এবং তাহাদের নামও সর্ব্বজন পরিচিত নহে। এইবার পরিচালক বর্গের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিব।

ব্যাঙ্কের প্রাণই হইল ক্রেডিট্‌ বা বিশ্বাস। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে কোনও বৃহৎ পরিবারে একজন লোকের উপর বাড়ীশুদ্ধ লোকের অগাধ বিশ্বাস। বাড়ীর চাকর বাকরেরা পর্য্যন্ত তাহাদের উদ্বৃত্ত টাকা তাঁহার নিকট যাইয়া গচ্ছিত রাখে; কারণ তাহাদের অগাধ বিশ্বাস যে,চাহিবামাত্রই তাহাদের টাকা ফেরৎ পাইবে, কখনও উহা মারা যাইবে না। এই বিশ্বাসের ফলেই পরিবারস্থ সকলের উদ্বৃত্ত টাকা যাইয়া তাঁহার থলিতে সঞ্চিত হয়।

ব্যাঙ্কও ঠিক এইরূপ একটা বিশ্বাসের থলী বা প্রতিষ্ঠান। কোথায়ও কোনও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে লোক সর্ব্বাগ্রে দেখে যে এ আবার কাহারা আসিল ?- যদি দেখে যে অনুষ্ঠানটীর মধ্যে এমন লোকদের নাম রহিয়াছে যাহাদিগকে দেশের আপামর-সাধারণ জানে, শুনে এবং চিনে এবং যে সকল অনুষ্ঠানের সহিত ইহারা লিপ্ত রহিয়াছেন. সে সকল অনুষ্ঠানই দেশের এবং দশের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছে তাহা হইলে সকলেই এই নূতন অনুষ্ঠানের প্রতি প্রথম হইতেই আস্থাবান হয় এবং দেখিতে দেখিতে তাহার সেয়ারও সব বিক্রয় হইয়া যায়—এবং Fixed deposit বা স্থায়ী আমানতও হু হু করিয়া আসিতে থাকে। আর যদি দেখে যে উদ্যোক্তাগণকে দেশের কেহই প্রায় জানে না, চেনে না—তবে হাজার হাজার টাকার সেয়ার তাহাদের হাতে তুলিয়া দিবে, লাখ লাখ টাকার স্থায়ী আমানত গচ্ছিত রাখিবে এমন আহাম্মক পৃথিবীর কোথায়ও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

স্বদেশী যুগে স্বদেশপ্রেমের বন্যায় যখন বাংলা দেশের আনাচ কানাচ ভাসিয়া গিয়াছে তখনও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকে বলাবলি করিয়াছিল—ইহার মধ্যে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর নাম নাই কেন ? অথচ এই ব্যাঙ্কের অনুষ্ঠান পত্রে মহারাজা দ্বারভাঙ্গা, ভাগ্যকুলের রায়েরা, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ দেশবিখ্যাত ধনীদিগের নাম যুক্ত ছিল। এই সকল দেশপ্রসিদ্ধ লোকের নাম এবং স্বদেশপ্রেমের দুকুলপ্লাবী বন্যার উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও—কুড়িলক্ষ টাকা মূলধন উঠাইতে উদ্যোক্তাদিগকে কয়েক বৎসর ধরিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া হিম্‌সিম্‌ খাইতে হইয়াছিল।

আর স্বরাজ ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তাগণ ২৫ কোটী টাকা লোকের নিকট হইতে সেয়ার চাহিতেছেন; কিন্তু জন সাধারণের কথা যাউক, আমরা দুই একজন ব্যতীত আর কোনও ডিরেক্টরের নামই এ পর্য্যন্ত শুনি নাই। বিশ্বাসই যদি ব্যাঙ্কের প্রাণ হয় তবে অজ্ঞাতকুলশীল,—লোকে যাহাদের জানে না, চেনেনা—এমন লোকের হাতে সহজে কি টাকা গচ্ছিত রাখিতে চায় ?—ব্যাঙ্কের যিনি প্রধান উদ্যোক্তা সেই যামিনী বাবুর ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিবার কোনও অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া আমরা জানি না। ইহার পূর্ব্বে কোনও ব্যাঙ্কের পরিচালক হিসাবে কৃতিত্ব দেখান দূরের কথা কোনও ব্যাঙ্কের সংস্রবেই তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার একমাত্র পরিচয় এই যে, তিনি বিজ্ঞহস্তে জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন এবং ভূপ্রদ-

শিপ করিয়াছেন বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বহু পর্য্যটকই ত আজকাল পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন; কেহবা মোটরে, কেহবা সাইকেলে আর কেহবা একেবারে নগ্নপদে! এই সেদিন কয়েকজন বাঙ্গালী যুবকই ত সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। কিন্তু পরিব্রাজক হইলে যে কোটী কোটী টাকার ব্যাঙ্কের পরিচালকও হওয়া যায়—এ তথ্য এবার এই নূতন শুনিলাম। যামিনী বাবু পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরিয়া আসিলেও কোনও বিষয়ে specialise করিয়া কিম্বা কোনও শিক্ষাকেন্দ্র হইতে খ্যাতি বা প্রতিপত্তি নিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই এ ঠিক যেন rolling stone that gathers no moss—ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁহার কি জ্ঞান আছে কিম্বা বহুদর্শিতা আছে তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

এই ব্যাঙ্কের অনুষ্ঠান পত্র বাহির করার পরেই যামিনী বাবুর নামে পুলিশ কোর্টে এক মোকদ্দমা দায়ের হইয়া তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়; অভিযোগে প্রকাশ যে তিনি কোন লোকের নিকট হইতে ধোকা দিয়া এই কোম্পানীতে সেয়ার বিক্রয় করিয়াছিলেন; শুনিলাম সে মোকর্দ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আবার একটী মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে শুনিলাম। ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্যাঙ্কটীকে পেঁচোয় পাইল নাকি?

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ।

উপরোক্ত ব্যাঙ্ক হইতে গত ১৯২৮ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে যে ব্যালান্স সীট বাহির হইয়াছে তাহার এক কপি আমাদের নিকট ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আমরা এই ব্যাঙ্কের অসাধারণ সাফল্য দর্শনে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছি। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৩ সালে অতি সামান্য ভাবে এই ব্যাঙ্কের কার্য্যারম্ভ করা হয়। এই কোম্পানীর প্রস্তাবিত মূলধন এক লক্ষ টাকা থাকিলেও গত ৫ বৎসরে মাত্র ২৮,১০৫ টাকার মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে—অর্থাৎ প্রস্তাবিত মূলধনের কিঞ্চিদধিক সিকি টাকার সেয়ার পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় বিক্রীত হইয়াছে। কিন্তু মূলধন সামান্য হইলেও গত ১৯২৮ সালে এই ব্যাঙ্কের আমানতী মূলধন প্রায় ১১০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দেশের লোক এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের প্রতি কি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নের তালিকা হইতে এই ব্যাঙ্কের ধারাবাহিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বৎসর	ডিপজিট বা আমানত জমা	রিজার্ভ ফণ্ড
১৯২৩—২৪	৬২,৩৫০৲	৮৫০৲
১৯২৪—২৫	২,১২,৩৬২৲	৪,৯০০৲
১৯২৫—২৬	৪,৩১,৩৭১৲	১২,০০০৲
১৯২৬—২৭	৭,৪৬,১৪২৲	২৪,১০০৲
১৯২৭—২৮	৯,৪৯,০০০৲	৫৩,০০০৲
১৯২৮—২৯	১৩,৩৭,০০০৲	৯০,০০০৲

১৯২৮—২৯ সালের ব্যালান্স সীট বাহির না হইলেও আমরা জানিতে পারিলাম যে, এই বছরে ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানতী মূলধনের পরিমাণ ১৩,৩৭০০০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং রিজার্ভ ফণ্ড ৯০,০০০ টাকায় উঠিয়াছে। যে ব্যাঙ্কের সেয়ার বিক্রয়লব্ধ মূলধন ৫০ হাজার টাকারও কম তাহাতে লোকে ১৩ লক্ষ টাকার উপর ডিপজিট রাখিয়াছে এবং তাহার রিজার্ভ ফণ্ড ৯০,০০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ মূলধনের দ্বিগুণ রিজার্ভ ফণ্ড হইয়াছে। এরূপ ঘটনা

অতীব বিস্ময়কর; ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ লাভের শত-করা ৭৫ টাকার উপর রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখিয়াছেন। এইরূপ দূরদৃষ্টি এবং সতর্কতার জন্যেই কুমিল্লার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দেশের আপামর সাধারণ সকলেরই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আপনাদের কর্মক্ষেত্র বাড়াইবার জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কলিকাতাতে একটী শাখা খুলিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, কুমিল্লার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অতি শীঘ্রই কলিকাতাবাসীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। শিবাস্তে পন্থানঃ।

কীর্ত্তিকোনা টী কোম্পানী।

আমরা গত আষাঢ় মাসে জানাইয়াছিলাম যে উকীল শান্তিবাবুর হাত হইতে বাগানের পরি-চালনা পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং এবার নাম ধাম সব বদলাইয়া সম্পূর্ণ এক নূতন নামে কোম্পানীর সেয়ার বাজারে বিক্রয় করা হইতেছে। যোগেশ বাবুর প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিকোনা টী কোম্পা-নীর নাম বদলাইয়া একণে The Chargola Valley Tea Estates Ltd নামে এক নূতন কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে; এই কোম্পানীর Prospectus হইতে দেখিলাম যে ইহার—

Anthorised Capital	৫,০০,০০০ টাকা
Issued Capital	৩,০০,০০০ টাকা
Subscribed Capital	৬১,৫২০ টাকা
Paid up Capital	৫৭,৬২৫ টাকা।

কোম্পানীর প্রত্যেক সেয়ারের দাম মাত্র ১০ টাকা দরখাস্তের সহিত ১ টাকা দিতে হয় এবং সেয়ার বিলি হইলে allotment এর সময় ১৷০ দিতে হয়। বাকী ৭৷০ টাকা ৫টি সমান কিস্তিতে দিতে হয়।

কীর্ত্তিকোনা টি কোম্পানী সম্বন্ধে গত ফাল্গুন মাসে আমরা এইরূপ লিখিয়াছিলাম:—

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে মিত্র এণ্ড সন্স ম্যানেজিং এজেন্সী ছাড়িয়া দেন বা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হ'ন। তা'র পর ১৯২২ হইতে ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন কোম্পানীর নব গঠিত ডিরেক্টর মণ্ডলী স্বয়ং; কিন্তু বারোয়ারী কাজে কাজ কখনও সুসম্পন্ন হয় না। আমাদের দেশে ভাগের মা গঙ্গা পায় না ব'লিয়া একটী প্রবাদ আছে। তার উপর যে সকল দায় সংযোগ এবং গোলমালজনক অবস্থায় নূতন ডিরেক্টর মণ্ডলী কার্য্যভার নিলেন তাহা এইরূপ বারোয়ারী ব্যাপার দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। এই জন্য ইঁহারা কীর্ত্তিকোনার অবস্থার কোনও উন্নতি করিতে পারিলেন না। অতঃপর ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত শান্তিনিধান রায় নামক জনৈক উকীল এই কোম্পানী পরিচালনা করার ভার গ্রহণ করেন।

শান্তি বাবু নিবার পর—বাগানের নাম বদ-লাইয়া Kirti Kona Tea co. Ld. এর জায় গায় Chargola Valley Tea Estate Ld. রাখা হইয়াছে এবং কোম্পানীর মূলধন কমাইয়া ৫৫,০০০ টাকায় পরিণত করা হইয়াছে। ১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসে অংশীদিগের এক Extraordinary General Meeting ডাকিয়া এই দুই কাজ করা হইয়াছে এবং বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট ও হাইকোর্টের অনুমোদন লওয়া হইয়াছে।

অংশীদিগের মূলধন এইরূপে কমাইয়া দেওয়ায় তাঁহাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে; কারণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে অংশীরা ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা সেয়ারের বাবদ দিয়াছিলেন; পরে

আবার মূলধন বাড়াইয়া যখন ৫ লাখ টাকা করা হয় তখন তাহাতেও অনেকে সেয়ার কিনিয়াছিলেন এবং টাকা দিয়াছিলেন। এই সম্মিলিত paidup Capital এর পরিমাণ ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার চেয়ে যে অনেক বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই ; অবশ্য আমরা ঠিক অঙ্ক দিতে পারিলাম না।

অংশীদিগের প্রদত্ত এই কয়েক লক্ষ টাকার সেয়ার কমাইয়া একেবারে কিঞ্চিদধিক ৫৫ হাজার টাকায় নাবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই সকল অংশীদারের প্রদত্ত বাকী সমুদয় টাকা একেবারে জলে গেল এবং অংশীদিগকে হারাহারি ভাবে এই ক্ষতি সহ্য করিতে হইল।

দেনার পরিমাণ।

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে ডিরেক্টরদিগের নিকট এই বাগানের Liabilities এর যে লিষ্ট দেওয়া হইয়াছিল তাহা এই :—

List of debts of the Kirtikona Tea Co. Ltd. Supplied to Mr. S. N. Roy by Mr. J. C. Dutta, represented by the then Board of Directors, on 8. 10. 26,

Bengal National Bank	(including interest).	Rs 11. 564-10-0
Prof. M. M. Bose	(without interest)	Rs 8, 000-0 0
Babu A. D, Auddy		Rs 4, 000-0-0
Garden rents	(Part of 1923. 1924, 1925)	Rs 4, 000-0-0
Office rents	(From Jan. to September)	Rs 387-0 0
Office establishments	(J. c, Dutta and others)	Rs 1, 600-0-0
Sashi Bhusan Bishwas	(Decreed in S. C. Courts) (with ut interest)	Rs 315-0 0
Lasmi Narayan Shadani	(without interest)	Rs 1, 600-0-0
Alpha Trading Company		Rs 500-0-0
Mitra & Co.		Rs 76-4-0
Auditors		Rs 20-0-0
Mr. H. N. Pal Chowdhury		Rs 60 0-0
Principal Maitra		Rs 50-0 0
Miscellaneous		Rs 200-0-0
	Total	Rs 33, 122-14-0

বাগানের কাজ চালাইলে মহাজনেরা অধিকাংশই দেনার পরিমাণ কতক ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে টাকা নিতে রাজী আছেন বলিয়া প্রকাশ।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম যে, শান্তিবাবু এখনও কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই; সুতরাং বাগানের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক এই দুই বছর বাগান পড়িয়া থাকায় তাহার আরও অবনতি হওয়া অনিবার্য্য এবং দেনার সুদও বাড়িতেছে। এই সকল দেনার উপর শান্তিবাবুর পারিশ্রমিক বাবদ যে টাকা প্রাপ্য হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে তাহাও বোঝার উপর শাকের আঁটির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শান্তিবাবু আজ প্রায় ২॥০ বৎসর যাবৎ এই কোম্পানীটির কর্ণধার হইয়াছেন; কিন্তু এক নাম বদলানো ও মূলধন কমানো ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি জলপাইগুড়ীর লোক; সেখানকার ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানীগুলি এইরূপ চা বাগানগুলিকে রক্ষা করিয়া শেষে সাধারণের মধ্যে সেয়ার বেচিয়া টাকা তুলিয়া লয়। এ যাবৎ জলপাইগুড়ি হইতে ইহার টাকার ব্যবস্থা করিতে না পারায় আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শান্তিবাবুর সেখানে তেমন প্রভুত্ব বা প্রতিষ্ঠা নাই। যোগেশবাবু বা তারিণীবাবু হাত দিলে এতদিনে বাগান হইতে ডিভিডেণ্ড দেওয়া সুরু হইত।"

এই বিবরণ বাহির হইবার পর আমরা অবগত হইলাম যে শান্তিবাবুর হাত হইতে বাগানের পরিচালনা ভার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এবং কাঁঠিকোনার নূতন নামে (The Chargola vally Tea Estates Ld, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দত্তের হাতে কাঁঠিকোনার পরিচালনা ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

এই নূতন প্রস্পেক্টাস্ বা অনুষ্ঠান পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহাদের প্রস্তাবিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ টাকার সেয়ার বাজারে বাহির করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৬৪,৫২০ টাকার সেয়ার স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ৫৪,৬২৫ টাকা আদায় হইয়াছে।

এইখানে আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। এই যে ৬৪,৫২০ টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া Prospectus এ উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা কি সব নূতন সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে?—না, শান্তিবাবুর আমলে অংশীগণ সেয়ারের বাবদ যে দুই লক্ষ তের হাজার টাকা দিয়াছিলেন তাহাই কমাইয়া ৫৫,০০০৲ টাকায় পরিণত করতঃ সেই সব পুরাতন অংশীদিগকে যে সেয়ার দিয়াছিলেন তাহাই এই প্রস্পেক্টাসোক্ত ৬৪,৫২০ টাকার সেয়ারের অন্তর্ভুক্ত? আমাদের সংবাদ এই যে প্রস্পেক্টাসে ৬৪,৫২০ টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে উহার মধ্যে ৫৫,৫০০ টাকার কোনও নূতন সেয়ারই বিক্রয় নহে, পরন্তু কাঁঠিকোনার পুরাতন অংশীগণ আপন আপন প্রদত্ত টাকার সেয়ার কমাইয়া যে reduced share লইতে রাজী হইয়াছিলেন এ সেই সেয়ার। বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেন্ট শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়—এই প্রস্পেক্টাসে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতেও বলিয়াছেন যে ২৯ সনের ২৩শে মে পর্য্যন্ত গত দুইবৎসরে মাত্র ৯১২খানি সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। প্রত্যেক সেয়ারের দাম দশটাকা হিসাবে দেখা যাইতেছে ২৭ সাল হইতে ২৯ সাল পর্য্যন্ত দুই বৎসরে মাত্র ৯১২০ টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। যে কোম্পানীর প্রস্তাবিত মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা এবং issued capital তিন লক্ষ টাকা তাহার পক্ষে দুই বৎসরের মধ্যে মাত্র

৯১২০ টাকার সেয়ার বিক্রয় করা আশাজনক বলিয়া মনে হয় না। তারপর এই ৯১২খানি ১০ টাকার সেয়ার বেচিতে ক্যানভাসারকে ৮৩৬৲ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৯ টাকার উপর কমিশন দিতে হইয়াছে।

অনুষ্ঠানপত্রের নিয়মানুসারে আমরা দেখিতেছি যে ৯১২ খানি সেয়ারের বাবদ ৯১২৲ টাকা কোম্পানীর তহবিলে আসিয়াছে; অতঃপর এই ৯১২ খানি সেয়ার allot করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ; সেয়ার allot করিলে অংশীদের নিকট হইতে ১৷৹ টাকা হিসাবে পুনরায় পাবার কথা। কিন্তু অনেকে আবার এই allotment এর সময় সরিয়া পড়েন; সুতরাং সকলের নিকট হইতে ১৷৹ হিসাবে সব টাকা আদায় না'ও হইতে পারে এবং পরবর্ত্তী পাঁচবার যে call হইবে তাহার টাকাও অনেকে না দিতেও পারে। বাংলাদেশের বহু লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালনার ব্যাপার দেখিয়া জানি যে, ভিক্ষার দানের মত এইরূপ দশ-টাকা পাঁচটাকার সেয়ারের অনেক অংশীই call এর টাকা দিবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় সেয়ারের টাকা সমস্ত উশুল না হইলে ক্যানভাসারের কমিশনের টাকা সব চুকাইয়া দিবার আমরা পক্ষপাতী নহি। কারণ দেখিতে হইবে ক্যানভাসার যে সেয়ার বেচিলেন তাহার টাকা কোম্পানীর ঘরে কি পরিমাণ উশুল হইয়া আসিল? কি ভবিষ্যতে আসিবে বা আসিতে পারে তাহা দেখিয়া বিশেষ লাভ নাই। প্রকৃতপক্ষে কতটা ঘরে আসিয়াছে তাহাই দেখিতে হইবে। কথায় বলে "শস্যম্ গৃহমাগতম্"। ঘরে উঠিলে তবে বলিব যে শস্য গোলায় আসিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কোম্পানীর তহবিলে ৯১২ টাকা আসার পর সেয়ারগুলি allot করিবামাত্র ক্যানভাসার ৮৩৬ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন; এখন allotment এর টাকা এবং ভাবী কালের বাকী পাঁচটী callএর টাকা সব আদায় হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত এবং ভবিতব্যই সে কথা বলিতে পারেন। যদি সব টাকা সুশৃঙ্খলায় আদায় হয় তবে ক্যানভাসার যে ৮৩৬৲ টাকা নিয়াছিলেন তাহাতে শতকরা ৯৲ টাকা টাকার উপর কমিশন পাইবেন, আর যদি অধিকাংশ টাকা আদায় না হয় তবে ক্যানভাসারের কমিশনের হার শতকরা ৯ টাকার যে কত বেশী হারে পড়িবে তাহা মনে করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই জন্য সেয়ারের টাকা উশুল না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের টাকা আগাম দিবার আমরা কখনও পক্ষপাতী নহি এবং কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপরিচালিত কোম্পানী শেয়ারের টাকা ঘরে না উঠা পর্য্যন্ত ক্যানভাসারকে আগাম কমিশন দিতে চাহে না। যে পরিমাণ সেয়ারের টাকা উশুল হইয়া আসিবে ক্যানভাসারও ঠিক সেই হারে কমিশন পাইবেন। এদিকে নব নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেণ্টের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

তারপর শান্তি বাবুর কার্য্যকালে আমরা কোম্পানীর যে সকল দেনার কথা দেখাইয়াছি সে সকল দেনার সম্বন্ধে নূতন কোম্পানী কী ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক র'হিলাম। শান্তি বাবুর আমলে বাগানের খাজনা বাকী পড়ার জন্য বাগানের মালিক কোম্পানীকে বেদখল করিতে ছিলেন; কিন্তু হেমেন্দ্র বাবুর নিকট শুনিলাম যে, তিনি নাকি নিজ হইতে টাকা দিয়া আগে বাগানটীকে জমিদারের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু

জমিদারের এই টাকাটা হেমেন্দ্র বাবুর নিজ পকেট হইতে যদি না দিতে হইত, পরন্ত শেয়ার বিক্রয় লব্ধ টাকা হইতে জমিদারের দেনা শোধ দেওয়া সম্ভব হইত, তবে খুব আশা ও আনন্দের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। নচেৎ কোম্পানী জমিদারের কবল হইতে মুক্ত হইল, বটে কিন্তু হেমেন্দ্র বাবুর নিকট দায়ীক হইল ; ঠিক যেন একটা ডোবা বুজাইতে আর একটা ডোবা কাটা হইল। তার পর এই কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং এজেন্টস্ মিত্র এণ্ড সন্স অনেকটাকার দাবীতে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানাইয়াছেন। হেমেন্দ্র বাবু আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন যে,সে দাবীটা ভুয়া ; সুতরাং ভয়ের কোনও কারণ নাই। মোকদ্দমা যখন বিচারাধীন তখন এ সম্বন্ধে আমরা কোনও আলোচনা করিতে চাহি না।

ফলে চারিদিক হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে—হেমেন্দ্র বাবু খুব কঠিন ব্যাপারে হাত দিয়াছেন। ডিরেক্টর দিগের মধ্যে দেশের সকলের শ্রদ্ধাভাজন সিটী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র মহাশয় এবং সর্ব্বজন পরিচিত শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র ও শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় মহেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর প্রভৃতি আছেন বলিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, ডিরেক্টর দিগের জ্ঞাতসারে কোনও Jobbery বা অন্যায় কাজ হইবে না। তবে এই নিমজ্জমান তরণীকে পুনরায় ভাসাইয়া তুলিতে যে বিরাট পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে বিষয়ে কিছু মাত্রও সংশয় নাই। আমরা বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত এই কোম্পানীর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছি।

ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান

বিদেশীর দল এদেশে আসিয়া ভারতের ঐশ্বর্য্য রাশি দুই হাতে লুটিয়া লইতেছে—এরূপ একটা আক্ষেপসূচক উক্তি অধুনা ছোট বড় অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই বলিয়া বেড়ান যে, এই যে আর্থিক শোষণ তাহা বন্ধ করিতে না পারিলে ভারতবাসীর আর পরিত্রাণ নাই। এসব কথাই যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য—তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই যে হা হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস—তাহাতে আমাদের কোন লাভ হইয়াছে কি? অহরহ বিদেশীর উপর গালি বর্ষণ করিয়া ভারতের দুর্দ্দশার প্রতীকার হইতেছে কি? কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছে। কৈ নেতাদের লম্বা চওড়া বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের অনলবর্ষী প্রবন্ধাদি তো কিছুই করিতে পারিতেছে না? জিজ্ঞাসা করি—তবে এই নিস্ফল আক্রোশ কেন? এরূপভাবে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপান অথবা গালিবর্ষণ করা কি অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে?

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। প্রকৃত বীর যে সেই একমাত্র দুনিয়ার ধন দৌলতের অধিকারী। শ্রী ও

লক্ষ্মী আপনা হইতেই তাহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আজ যদি বিদেশী বণিকগণ এদেশে আসিয়া সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে এদেশের ঐশ্বর্য্যরাশি হস্তগত করিয়া থাকেন তবে তাহাদের পক্ষে এমন কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে? এরূপ অপরাধ কি আর কেহ করে নাই? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণও কি অনুরূপ অপরাধে অপরাধী নহেন?

আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করতঃ আর্য্যগণের হিন্দুস্থান বিজয়ের কথা মনে করুন। আপনার শ্রেষ্ঠত্বের বলেই কি তাহারা অনার্য্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই? ভারতের বুকে স্থায়ী আড্ডা গাড়িয়া বসেন নাই? এককালে তো অনার্য্যগণই এই ভূভাগের অধিকারী ছিল। তাহাদের সেই অধিকার আর্য্য গণ কাড়িয়া লইলেন কেন?

আসল কথা হইল এই যে, Survival of the fittest—যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠাই এজগতের চিরন্তন নীতি—কখনও এনীতির ব্যতিক্রম হয় না। সুচতুর বিদেশী বণিক তাই আপনাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য হস্তগত করিয়া বসিয়াছেন। এগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য কেবল হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাসই যথেষ্ট নয়—তজ্জন্য চাই আমাদের আত্মোন্নতি, স্বজাতিপ্রেম, সংঘবদ্ধ আয়োজন-অনুষ্ঠান এবং বুদ্ধিবৃত্তির চরম বিকাশ। যতদিন পর্য্যন্ত এই বুদ্ধির লড়াইয়ে আমরা তাহাদিগকে হটাইতে না পারিব ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের দুর্গতির অবসান হইবে না—হইতে পারে না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বাঙ্গালীর একটা দেমাক ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই দেমাকই আমাদের কাল হইয়াছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় কেহই আমাদিগকে হটাইতে পারিবে না—এমনই একটা নির্ব্বোধ ভরসায় বুক বাঁধিয়া বাঙ্গালী জাতি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়াছিল। আর সেই সুযোগে ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, চীন, জাপানী -মায় মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী পর্য্যন্ত এদেশে আসিয়া তাহাদের কাজ গোছাইয়া লইয়াছে। আর আমরা এখন ঘুম ভাঙ্গিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছি,—তাই তো, আমাদের আর স্থান কোথায়? আমরা যে নিজবাসভূমে পরবাসী হইয়া গেলাম?

সুখের কথা এই যে, বিলম্বে হইলেও আজ ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর আত্ম-চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে। হয়ত বা বিগত ঔদাসীন্যের প্রায়শ্চিত্তের অবসানে এজাতি আবার উন্নতির মুখও দেখিতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য চাই ক্লান্তিহীন কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিরাট আয়োজন।

দেশের কথা ভাবিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে আর্থিক অনটনের কথাই মনে পড়ে। দীন দুঃখী ও কুটীরবাসী এই অর্থের অভাবেই খাইতে পায় না, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সমাজে চলাফেরা করিতে পারে না এবং কারবারীরা কারবার করিতে পারে না, শিল্পীরা কারখানা গড়িয়া তুলিতে পারে না, বড় বড় সওদাগরগণ বিদেশে মাল রপ্তানী করিতে পারে না। দীন দরিদ্র পথের ভিখারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাসাদবাসী লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকলেই আর্থিক অভাবে পীড়িত, —ইহাদের সকলেরই এক অভিযোগ এই যে, টাকা পাই না—টাকার অভাবে সব যাইতে বসিল। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, এদেশে টাকা একেবারেই নাই? প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারতো তাহা নহে। এই দেশ হইতেই তো প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা বিদেশী পরিচালিত ব্যাঙ্কে জমা হইতেছে। এ টাকাও কোনও ব্যক্তিবিশে-

শের সম্পত্তি নহে,—দেশের ও দশের খুদ কুঁড়া কুড়াইয়াই এই স্তূপীকৃত অর্থরাশির উদ্ভব হয়। আমরা ভুলিয়া যাই যে, এই টাকা। ভারতেরই টাকা—ভারতবাসীরই প্রদত্ত টাকা। এই টাকা দ্বারাই তো অধিকাংশ বিদেশীর কারকারবার চলিতেছে; অথচ ভারতীয় কারবারের বেলায় মূলধনের অভাব হয়।

এক একটী ব্যাঙ্কের অংশীদিগের প্রদত্ত মূলধন (ইংরাজীতে যাহাকে সেয়ার ক্যাপিট্যাল বলে) খুব বেশী নহে, কিন্তু আমানতকারীদিগের গচ্ছিত টাকার (ইংরাজীতে যাহাকে Fixed Deposit বলে) পরিমাণ লক্ষ লক্ষ। এই আমানতকারী বা ডিপজিটারদিগের গচ্ছিত টাকা খাটাইয়াই বিশ্বের যত ব্যাঙ্ক চলিতেছে এবং দিন দিন লাল হইয়া উঠিতেছে। আমানতকারীরা কেহবা এক বছরের জন্য, কেহবা দুই বছরের জন্য, কেহবা দীর্ঘকালের জন্য আপন আপন সঞ্চিত টাকা ব্যাঙ্কের নিকট অল্পসুদে গচ্ছিত রাখিয়া থাকেন, এই গচ্ছিত টাকা মেয়াদের মধ্যে কেহ তুলিয়া লইতে পারেন না। ব্যাঙ্ক আমানতকারীদিগের নিকট হইতে অল্পসুদে এই সকল টাকা ডিপজিট নিয়া বেশীসুদে অপরকে কর্জ্জ দিয়া যথেষ্ট লাভ করে। ডিপজিটের পরিমাণ যে ব্যাঙ্কের যত বেশী লাভের অঙ্কও সেই ব্যাঙ্কের তদনুপাতে তত বেশী হয়। এই বিষয় দেখা যাউক—কলিকাতা সহরে বিদেশী পরিচালিত যত ব্যাঙ্ক আছে তাহার ডিপজিটার কাহারা। একটু অনুসন্ধান নিলেই দেখা যাইবে যে, অতি অল্প কয়েকজন বিদেশী ডিপজিটর বাদ দিলে সকল ব্যাঙ্কের ডিপজিটররাই এদেশের লোক এবং তাহাদের সঞ্চয় একত্র করিয়াই সব ব্যাঙ্ক—কারবারীদিগের নিকট অধিক সুদে টাকা খাটাইয়া থাকে; বাংলা দেশের বিদেশী পরিচালিত ব্যাঙ্কের Tragedyর এইখানেই আরম্ভ। যেমন বিন্দু বিন্দু জল একত্র জমিয়া সাগরের সৃষ্টি হয়। তেমনি বহু লোকের বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় একত্র জমা হইয়াই ব্যাঙ্কের বিরাট তহবিল গড়িয়া ওঠে—প্রধানতঃ এই দেশের লোকের টাকা জমা রাখিয়াই ব্যাঙ্কে এই তহবিল বাড়িতে থাকে; কিন্তু এই জমা টাকা আবার যখন উক্ত সুদে অন্যান্য মহাজনের নিকট কর্জ্জ দেওয়া হয় তখন কোনও দেশীয় প্রতিষ্ঠান প্রায়ই এই টাকা হইতে কোনও সাহায্য পায় না, কারণ দেশীয় কারবারীদিগকে সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় না। বিদেশী ব্যবসায়ীরা হাত পাতিলেই অক্লেশে হাজার হাজার টাকা কর্জ্জ পায়, কিন্তু কোনও দেশীয় কারবারী সাহসা এই সকল ব্যাঙ্ক হইতে এক কপর্দ্দকেরও সাহায্য পায় না—যদিও আমানতী মূলধনের প্রায় ষোল আনাই এ দেশীয় লোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়।

এই যে সৃষ্টি ছাড়া বিসদৃশ ব্যবস্থা প্রণালী আমাদের দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ইহার জন্য ইংরাজ সরকার কিম্বা এই সকল ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গকে দোষী করা উচিত নহে; কারণ ইংরাজ সরকার বা ব্যাঙ্কের পরিচালক বর্গ তো তোমার আমার চুলের ঝুঁটী ধরিয়া বলিয়া দেন না যে তোমাদের সঞ্চিত টাকা গুলি এই সব বিদেশী পরিচালিত ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত রাখিতে হইবে কিম্বা তাহারা একথাও বলেন না যে তোমরা তোমাদের টাকা এমন সব ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখ যাহারা সাধারণতঃ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগকে কোনও accommodation বা সাহায্য দিবে না। তোমার দেশের লোক যদি বাছিয়া বাছিয়া এমন সব ব্যাঙ্কে টাকা ডিপজিট রাখে যাহারা পারত পক্ষে কখনও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগকে টাকা ধার দিবে না তবে

সে দোষ কাহার?—তোমার স্বজাতীয়দিগের, না বিদেশী ব্যাঙ্কওয়ালাদের? এই কলিকাতা সহরের উপরেই তো কতগুলি সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে—যাহাদের পরিচালনা পদ্ধতি, ব্যবসায় বুদ্ধি এবং সততার সম্বন্ধে অতি বড় শত্রুও কিছু বলিতে পারে না; ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন আজ প্রায় ৪৩ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল কত বড় ঝঞ্ঝা ইহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিমালয়ের ন্যায় উহা অচল অটল হইয়া সগর্ব্বে মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। ইহার বিজ্ঞাপণের মাথায় লেখা থাকে:—**১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীর মূলধনে প্রতিষ্ঠিত।**

কথাটা পড়িয়া বাঙ্গালীর প্রাণে কি একটুকুও আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয় না?—যদি না হয়, তবে সে জাতির "স্বরাজ" "স্বরাজ" করিয়া চেঁচানো একটা বিরাট ধাপ্পা। যদি বল ৪৩ বৎসরেও ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন চার্টার ব্যাঙ্ক, হংকং সাংঘাই ব্যাঙ্ক, কি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মত বিরাট আকারে গড়িয়া উঠিল না কেন?—তাহাদেরই বা প্রাসাদোপম গগনচুম্বী অট্টালিকা উঠিল কেমন করিয়া, আর তোমার ভবানীপুর ব্যাঙ্ক একটা একতালা কোঠায় দিন গুজরান করিতেছে কেন?—এই কেনর উত্তর এই যে তোমার দেশের লোক তাহাদের সঞ্চিত মূলধন লাখে লাখে এই সকল বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিতেছে, আর নিজের দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে অনাহারে অস্থিচর্ম্মসার করিয়া রাখিতেছে, অথচ নিজের দেশের লোকেরা যে অসাধু নয়, তাহারা যে ব্যাঙ্কের কাজ জানে এবং বোঝে তার প্রত্যক্ষ এবং অকাট্য প্রমাণ এই ৪৩ বৎসরের পরমায়ু। তুমি আমি বাঙ্গালী যদি আমাদের সঞ্চয়ের টাকা তাহার নিকট গচ্ছিত না রাখিয়া বিদেশীর ধন ভাণ্ডারে তুলিয়া দেই তবে তোমার আমার প্রদত্ত অর্থে বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলি হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—আর তাহারই অভাবে তোমার নিজের দেশের নিজের জাতি দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া শুখাইয়া যাইবে। কথাটা এত সোজা যে বুঝাইয়া বলিতেও লজ্জা হয়।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের ন্যায় কো অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক এবং বেঙ্গল সেন্টাল ব্যাঙ্কও বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালীর মূলধনে প্রতিষ্ঠিত; বছরের পর বছর ইহারা অংশীদিগকে অনেক টাকা ডিভিডেণ্ড দিয়া আসিতেছে; আত্মঘাতী পরশ্রীকাতর স্বজাতিবিদ্বেষী বাঙ্গালী ইহাদের বিরুদ্ধে নানা দুর্ণাম বর্ণনা করিতে ছাড়ে নাই, ইহাদের উপর run করিতেও কসুর করে নাই। কিন্তু ঈর্ষ্যা কাতর দুষ্ট লোকদিগের সকল হীন চেষ্টা ব্যর্থ করতঃ মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ইহারা আজ কত বৎসর ধরিয়া কলিকাতার বুকের উপর ধীরে ধীরে আপনার প্রভাব বিস্তার করতঃ এই যে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে ইহাকে বাঙ্গালী যদি তাহার হৃদয়ের রক্ত এবং প্রাণের ব্যাকুলতার দ্বারা পুষ্ট করিয়া না তোলে তবে অ-বাঙ্গালীরা কি এই কাজ করিবে?—লোকে আহাম্মকের ন্যায় আমাদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, মশায়, সবত বুঝিলাম, তাহারা অসাধু নয়, ব্যবসায়ও বোঝে, কিন্তু এত কালেও তেমন বড় হইতে পারিতেছে না কেন? তাহার সোজা উত্তর এই যে, তাহারা এত বৎসরে তাহাদের দক্ষতা এবং সততার যথেষ্ট প্রমাণ তোমাদের দিয়াছে এবং দিতেছে; কিন্তু ইহার কাজ বাড়ানো কিম্বা ইহাকে বড় করিয়া তোলা—সে সবই যে তোমাদের হাতে। তুমি

আমি যদি আমাদের সঞ্চিত মূলধন তাহাদের কাছে গচ্ছিত রাখি তবে তাই খাটাইয়াইতো ইহারা বড় হইবে এবং তোমাকেও তাহার অংশ দিবে। আর তুমি আমি যদি ঘর কাঁদাইয়া পর হাসাইবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াই তবে পরই চিরকাল তোমার অর্থে হাসিতে থাকিবে আর আপনার লোকের চোখের জল কোন কালেই ঘুচিবে না।

ব্যাঙ্কের বেলায় যাহা বলিলাম বীমার বেলায়ও ঠিক সেই কথা। কত বিদেশী বীমা কোম্পানী এদেশে বীমার ব্যবসায় চালাইয়া কোটী কোটী টাকার প্রিমিয়াম আদায় করিতেছে এবং এই সকল প্রিমিয়াম লব্ধ মূলধন দ্বারা নিজের দেশে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করিতেছে; আর আমাদের দেশীয় কোম্পানী গুলি সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে তেমন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি অনেক লেখক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলি ভারতবর্ষ হইতে নানা রূপ প্রিমিয়াম বাবদ গড়ে প্রায় পঞ্চাশ কোটী টাকা প্রতি বৎসর আদায় করিয়া লইতেছেন; এই টাকা তাহারা নিজেদের দেশে নানারূপ কার কারবারে খাটাইয়া দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলিতে এই যে প্রতি বৎসর এত কোটি টাকা আমরা প্রিমিয়াম বাবদ দিতেছি ইহা তো আমাদের স্বেচ্ছাকৃত দান— ইংরাজের কোনও আইন তো আমাদিগকে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার জন্য বাধ্য করে না; এবং আমরা নিজেরাই সখ করিয়া খাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। বছর বছর এই যে কোটী কোটী টাকার প্রিমিয়াম, ইহা যদি দেশীয় বীমা কোম্পানী গুলি পাইত তবে সেই টাকার সাহায্যে কত শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারিত এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইত। ব্যাঙ্ক এবং বীমার মূলধন দ্বারা সমগ্র সভ্য জগতের ব্যবসায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মানবদেহে রক্তসঞ্চালনের ন্যায় সমগ্র শিল্প জগতে ব্যাঙ্ক এবং বীমার টাকা দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হইতেছে বলিয়াই সভ্যজগত দিন দিন এত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। আর আমাদের দেশে টাকার এইরূপ অবাধ সঞ্চালন নাই বলিয়াই যে দুই একটী শিল্পানুষ্ঠান নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে তাহারাও জলাভাবে গাছের ন্যায় অকালে শুখাইয়া যাইতেছে এরূপ যে কেন হয় সেই কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিব।

সচরাচর দেখিতে পাই যে, অতি সামান্য টাকা মূলধন লইয়া কারবার করিতে বসিলে একটি বিদেশী কোম্পানীব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনায়াসেই অনেক টাকার accommodation বা সাহায্য পায়। সেই টাকা দ্বারা কারবার চালাইয়া রাতা রাতি অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভবান হওয়া বিদেশীর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা হয় কি? দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য কোন ব্যাঙ্ক প্রস্তুত: হয় কি? আসলে আমাদের নিজস্ব ব্যাঙ্কই যে নাই। ছিল এক বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক—যত দিন বাঁচিয়া ছিল ততদিন এই ব্যাঙ্ক অবশ্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতান্ত কম করে নাই। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আনুকূল্যে এদেশের অনেক ধ্বংসোন্মুখ শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা পাইয়াছে অথচ ব্যাঙ্কেরও বেশ দু'পয়সা আয় হইয়াছে। কিন্তু শেষ কালে অসাধুতার জন্যেই বাঙ্গালীর বড় আদরের এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। এই ব্যাঙ্ক কেন ফেল পড়িল— তাহার আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই আমরা "ব্যবসা

সে দোষ কাহার ?—তোমার স্বজাতীয়দিগের, না বিদেশী ব্যাঙ্কওয়ালাদের ? এই কলিকাতা সহরের উপরেই তো কতগুলি সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে—যাহাদের পরিচালনা পদ্ধতি, ব্যবসায় বুদ্ধি এবং সততার সম্বন্ধে অতি বড় শত্রুও কিছু বলিতে পারে না ; ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল কত বড় ঝঞ্ঝা ইহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিমালয়ের ন্যায় উহা অচল অটল হইয়া সগর্ব্বে মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। ইহার বিজ্ঞাপণের মাথায় লেখা থাকে:—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীর মুলধনে প্রতিষ্ঠিত।

কথাটা পড়িয়া বাঙ্গালীর প্রাণে কি একটুকুও আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয় না ?—যদি না হয়, তবে সে জাতির "স্বরাজ" "স্বরাজ" করিয়াচেঁচামো একটা বিরাট ধাপ্‌পা। যদি বল ৪০ বৎসরেও ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন চার্টার ব্যাঙ্ক, হংকং সাংঘাই ব্যাঙ্ক, কি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মত বিরাট আকারে গড়িয়া উঠিল না কেন ?—তাহাদেরই বা প্রাসাদোপম গগনচুম্বী অট্টালিকা উঠিল কেমন করিয়া, আর তোমার ভবানীপুর ব্যাঙ্ক একটা একতালা কোঠায় দিন গুজরাম করিতেছে কেন ?—এই কেনর উত্তর এই যে তোমার দেশের লোক তাহাদের সঞ্চিত মুলধন লাখে লাখে এই সকল বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিতেছে, আর নিজের দেশের ব্যাঙ্ক গুলিকে অনাহারে অস্থিচর্ম্মসার করিয়া রাখিতেছে, অথচ নিজের দেশের লোকেরা যে অসাধু নয়, তাহারা যে ব্যাঙ্কের কাজ জানে এবং বোঝে তার প্রত্যক্ষ এবং অকাট্য প্রমাণ এই ৪০ বৎসরের পরমায়ু। তুমি আমি বাঙ্গালী যদি আমাদের সঞ্চয়ের টাকা তাহার নিকট গচ্ছিত না রাখিয়া বিদেশীর ধন ভাণ্ডারে তুলিয়া দেই তবে তোমার আমার প্রদত্ত অর্থে বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলি হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—আর তাহারই অভাবে তোমার নিজের দেশের নিজের জাতি দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া শুখাইয়া যাইবে। কথাটা এত সোজা যে বুঝাইয়া বলিতেও লজ্জা হয়।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের ন্যায় কো অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কও বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালীর মুলধনে প্রতিষ্ঠিত ; বছরের পর বছর ইহারা অংশীদিগকে অনেক টাকা ডিভিডেণ্ড দিয়া আসিতেছে ; আত্মঘাতী পরশ্রীকাতর স্বজাতিবিদ্বেষী বাঙ্গালী ইহাদের বিরুদ্ধে নানা দুর্ণাম বর্ণনা করিতে ছাড়ে নাই, ইহাদের উপর run করিতেও কসুর করে নাই। কিন্তু ঈর্ষ্যা কাতর দুষ্ট লোকদিগের সকল হীন চেষ্টা ব্যর্থ করতঃ মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ইহারা আজ কত বৎসর ধরিয়া কলিকাতার বুকের উপর ধীরে ধীরে আপনার প্রভাব বিস্তার করতঃ এই যে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে ইহাকে বাঙ্গালী যদি তাহার হৃদয়ের রক্ত এবং প্রাণের ব্যাকুলতার দ্বারা পুষ্ট করিয়া না তোলে তবে অ-বাঙ্গালীরা কি এই কাজ করিবে ? --লোকে আহাম্মকের ন্যায় আমাদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, মশায়, সবত বুঝিলাম, তাহারা অসাধু নয়, ব্যবসায়ও বোঝে, কিন্তু এত কালেও তেমন বড় হইতে পারিতেছে না কেন ? তাহার সোজা উত্তর এই যে, তাহারা এত বৎসরে তাহাদের দক্ষতা এবং সততার যথেষ্ট প্রমাণ তোমাদের দিয়াছে এবং দিতেছে ; কিন্তু ইহার কাজ বাড়ানো কিম্বা ইহাকে বড় করিয়া তোলা—সে সবই যে তোমাদের হাতে। তুমি

আমি যদি আমাদের সঞ্চিত মূলধন তাহাদের কাছে গচ্ছিত রাখি তবে তাই খাটাইয়াইতো ইহারা বড় হইবে এবং তোমাকেও তাহার অংশ দিবে। আর তুমি আমি যদি ঘর কাঁদাইয়া পর হাসাইবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াই তবে পরই চিরকাল তোমার অর্থে হাসিতে থাকিবে আর আপনার লোকের চোখের জল কোন কালেই ঘুচিবে না।

ব্যাঙ্কের বেলায় যাহা বলিলাম বীমার বেলায়ও ঠিক সেই কথা। কত বিদেশী বীমা কোম্পানী এদেশে বীমার ব্যবসায় চালাইয়া কোটী কোটী টাকার প্রিমিয়াম আদায় করিতেছে এবং এই সকল প্রিমিয়াম লব্ধ মূলধন দ্বারা নিজের দেশে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করিতেছে; আর আমাদের দেশীয় কোম্পানী গুলি সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে তেমন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি অনৈক লেখক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলি ভারতবর্ষ হইতে নানা রূপ প্রিমিয়াম বাবদ গড়ে প্রায় পঞ্চাশ কোটী টাকা প্রতি-বৎসর আদায় করিয়া লইতেছেন; এই টাকা তাহারা নিজেদের দেশে নানারূপ কার কারবারে খাটাইয়া দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলিতে এই যে প্রতি বৎসর এত কোটী টাকা আমরা প্রিমিয়াম বাবদ দিতেছি ইহা তো আমাদের স্বেচ্ছাকৃত দান— ইংরাজের কোনও আইন তো আমাদিগকে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার জন্ম বাধ্য করে না; এবে আমরা নিজেরাই সখ করিয়া খখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। বছর বছর এই যে কোটী কোটী টাকার প্রিমিয়াম, ইহা যদি দেশীয় বীমা কোম্পানী গুলি পাইত তবে সেই টাকার সাহায্যে কত শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারিত এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইত। ব্যাঙ্ক এবং বীমার মূলধন দ্বারা সমগ্র সভ্য জগতের ব্যবসায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মানবদেহে রক্তসঞ্চালনের ন্যায় সমগ্র শিল্প জগতে ব্যাঙ্ক এবং বীমার টাকা দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হইতেছে বলিয়াই সভ্যজগত দিন দিন এত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। আর আমাদের দেশে টাকার এইরূপ অবাধ সঞ্চালন নাই বলিয়াই যে দুই একটী শিল্পানুষ্ঠান নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছে তাহারাও জলাভাবে গাছের ন্যায় অকালে শুখাইয়া যাইতেছে এরূপ যে কেন হয় সেই কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিব।

সচরাচর দেখিতে পাই যে, অতি সামান্য টাকা মূলধন লইয়া কারবার করিতে বসিলে একটি বিদেশী কোম্পানীব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনায়াসেই অনেক টাকার accommodation বা সাহায্য পায়। সেই টাকা দ্বারা কারবার চালাইয়া রাতা রাতি অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভবান হওয়া বিদেশীর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু আমা-দের পক্ষে তাহা হয় কি? দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্ম কোন ব্যাঙ্ক প্রস্তুতঃ হয় কি? আসলে আমাদের নিজস্ব ব্যাঙ্কই যে নাই। ছিল এক বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক—যত দিন বাঁচিয়া ছিল ততদিন এই ব্যাঙ্ক অবশ্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতান্ত কম করে নাই। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আনুকূল্যে এদেশের অনেক ধ্বংসোন্মুখ শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা পাইয়াছে অথচ ব্যাঙ্কেরও বেশ দু'পয়সা আয় হইয়াছে। কিন্তু শেষ কালে অসাধুতার জন্যেই বাঙ্গালীর বড় আদরের এই প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। এই ব্যাঙ্ক কেন ফেল পড়িল— তাহার আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই আমরা "ব্যবসা

বাণিজ্যে" করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য এই যে, নিজস্ব ব্যাঙ্ক না থাকিলে কোন ও জাতির নিজস্ব শিল্প বাণিজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এবিষয়ে বীমা কোম্পানীও যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

ব্যাঙ্ক ও বীমা আপাত দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও উভয়েরই গোড়ায় যথেষ্ট মিল আছে। প্রকৃত পক্ষে বীমার কারবার—ব্যাঙ্ক পরিচালনারই নামান্তর মাত্র। ব্যাঙ্ক যেমন প্রতিদিন চেকের টাকা শোধ দিয়া থাকে বীমা কোম্পানীও ঠিক তেমনি আপন আপন সভ্যের প্রাপ্য টাকা নির্দ্দিষ্ট দিনে শোধ দিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক ও বীমা এই উভয় কারবারেই একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের টাকা মজুদ করিয়া হাতে রাখিতে হয়। কখন যে টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না এবং প্রয়োজনের সময় টাকা দিতে না পারিলেই কারবার ফেল পড়িয়া গেল—এরূপ অভিযোগ অনিবার্য্য। তারপর ব্যাঙ্ক ও বীমা এই দুই প্রতিষ্ঠানের হাতেই শেষ পর্য্যন্ত দেশের সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকা ধীরে ধীরে আসিয়া জমা হয়। সমগ্র দেশের জল যেমন নদী নালা বাহিয়া পরিশেষে সাগরে গিয়া পড়ে দেশের উদ্বৃত্ত অর্থও তেমনি বিন্দু বিন্দু হইয়া জমা হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর হাতে গিয়া পৌছায়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের এই সত্যটি কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য এমন একদিন ছিল যখন ভারতের অধিবাসীরা অপরের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিতে রাজী হইত না—তাহারা বলিত যে—

> পুস্তকে স্থাপিতা বিদ্যা
> পরহস্তে গতং ধনম্।
> কার্য্যকালে সমুৎপন্নে
> ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

অর্থাৎ পরের হাতে জমা রাখিলে কাজের সময় টাকা পাওয়া যায় না। তাই তাহারা মাটির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া টাকা পুতিয়া রাখিত; কেহ বা অলঙ্কার পত্র ক্রয় করিয়া সিন্দুকে জমা রাখিত। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। ভারত বাসীর সেই ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিদেশীর দল এদেশে আসিয়া ব্যাঙ্ক ও বীমার কার্য্য প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছেন। তাই এখন দেশবাসী সর্ব্বসাধারণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ব্যাঙ্ক ও বীমার আশ্রয় লইলে বিপদে আপদে টাকা পাওয়ার কোনই বিঘ্ন হয় না এবং তদুপরি বেশ দু'পয়সা সুদও পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া আমাদের দেশের অধিবাসীরা পরমানন্দে অধুনা বিদেশীর ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতেছেন এবং বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা নিজে বিশেষ কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন না বটে কিন্তু সেটা দেশের ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। ব্যাঙ্ক ও বীমার কারবার যাহারা করেন প্রকৃত পক্ষে তাহাদের দুইটি উদ্দেশ্য থাকে। প্রথম—নিতান্ত অল্প হারে হইলেও নিশ্চিত লভ্যাংশের অধিকারী হওয়া দ্বিতীয় -দেশের শিল্প বাণিজ্যকে সাহায্য করা। তাই আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, একটা বড় শিল্প অথবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত এক কিম্বা একাধিক ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর প্রত্যক্ষ না হইলেও ঘনিষ্ট সংযোগ থাকে। কারণ বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে মোটামোটা মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে এই ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর আশ্রয় না লইয়া উপায় নাই। একমাত্র এই দুই প্রতিষ্ঠানই মূলধন যোগাইয়া একটা জাতির শিল্প বাণিজ্যকে জিয়াইয়া রাখিতে পারে।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ও বীমার কারবার

যাহারা করেন তাহারা যেন নিশ্চিত লভ্যাংশের উপরই বেশী জোর দিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য নিন্দার কথা নহে। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি একান্ত উদাসীন থাকাও তাহাদের পক্ষে শোভনীয় নহে। নিশ্চিত লভ্যাংশের ক্ষতি না করিয়া ও যদি দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের সহায়তা করা যায় তাহা হইলে কি প্রকারান্তরে নিজেরই লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা হয় না ? এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিবার অভিপ্রায় রহিল। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর কবলগ্রস্ত দেশকে অচিরে সম্যক সচেতন হইতে হইবে। তাহা না হইলে অর্থের অভাব আমাদের কিছুতেই ঘুচিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেশের যত সব অর্থ তিল তিল করিয়া জমা হইয়া ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর হাতে গিয়া পৌঁছে। আমানত কারীরা ব্যাঙ্কের হাতে টাকা জমা রাখেন। বীমাকারীরা রীতিমত কিস্তিতে কিস্তিতে প্রিমিয়ামের টাকা বীমা কোম্পানীকে দিয়া থাকেন। এই সমস্ত টাকা খাটে কোথায় ? কার কাজে লাগে ? হিসাব করিলে দেখা যায় যে, এদেশে এখনও বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বিদেশী বীমা কোম্পানীরই সংখ্যা বেশী। ইহারা সহজে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের সহায়তায় অগ্রসর হননা—এবং না হওয়াই স্বাভাবিক কেন না স্বজাতি প্রীতি বলিয়া যে একটা জিনিষ তাহা সকল জাতিরই আছে। কাজেই সর্ব্বাগ্রে স্বজাতীয় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মিটাইয়া যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে বিদেশী বীমা ও বিদেশী ব্যাঙ্ক সময় সময় দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে রাজী হন ; কিন্তু এমন সব সর্ত্তে টাকা দিতে চান যে তাহা পূর্ণ করা সত্ত্বাত দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে সম্ভব পর হয় না। ফলে বহু সংখ্যক দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অঙ্কুরেই শুকাইয়া যায়—আর বাজারে বাঙ্গালীর অক্ষমতার অপবাদ রটে।

এই তো গেল বিদেশী ব্যাঙ্কের কথা। বিদেশী বীমা কোম্পানীর তো কোন বালাই নাই। তাহারা প্রিমিয়াম রূপে প্রতি বৎসর কম পক্ষে ৫০ কোটী টাকা ভারতবাসীর নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। এই টাকা পয়সা যে বিদেশীর কারবারে খাটে। এদেশ বাসীর তাহাতে কোন দাবীই নাই। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, বীমার কারবার বড়ই দায়িত্ব পূর্ণ কারবার। ইহার টাকা যেখানে সেখানে খাটান চলে না। তজ্জন্য apporved securities প্রয়োজন। এই যে অনুমোদিত সিকিওরিটি তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ লইয়া আবার মতভেদ আছে। ভারতের বাহিরে কিন্তু এই approved security লইয়া বড় কেহ মাথা ঘামায় না। তাহারা নির্ব্বিবাদে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বীমার টাকা ধার দিয়া থাকেন—শুধু এইটুকু দেখেন যে, শেষ পর্য্যন্ত যেন টাকাটা মারা না যায়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রথা অন্যরূপ। এখানে approved security Govt security—এ ছাড়া আর কোন সিকিওরিটিই যেন পর্য্যাপ্ত নয়। কাজেই ভারতবর্ষে যে দুই চারিটি বীমা কোম্পানীর পত্তন হইয়াছে তাহারাও কারবারে টাকা খাটাইতে পছন্দ করেন না। সুখের কথা এই যে, ক্রমে ক্রমে এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইতেছে। দুই একটি বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ অধুনা একান্ত নিরাপদ ও নিশ্চিত কারবারে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা বুঝিয়াছেন যে, সব সময়ে Govt securityই একমাত্র approved security নয়। এই Govt seeurity ও যে সময় সময় ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে তাহা আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখাইব। এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই যে, ব্যাঙ্ক ও বীমা—এই দুইটি মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর হস্তগত না হইলে ভারতের আর্থিক উন্নতির পথ কিছুতেই সুগম হইবে না।

———

কলিকাতার বাজার দর

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৪শে সেপ্টেম্বর

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১৸৶১০
টাকশালে "	২১৷৶০
বড়ালের "	২১৷৵০
চিনাপাত "	২১৷৵০
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৫৩৲
ঐ খুচরা	৫৪০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স
২৮ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

ঘৃত

২৪ সেপ্টেম্বর

শ্রী—	৮১৲
নটকী—	৭৫৲
ভারতী—	৬৯৲
খুরজা—	৭৫৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৬৪৲
লক্ষ্মী—	৬৯৲
বালাসাগর —	৬১৲

শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত,
২৬ নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাজার দর—তৈল।

সরিষার তৈল খাঁটি (রাধা কৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর — ২৪৷০

ঐ ১ মণের দর	২৪৸০
ঐ খুচরা	২৭৷০
পুকরান	২৫৷০
মিশ্রিত	২০৲ হইতে ২৩৷০
নারিকেল তৈল	২১৲ " ২২৲
রেড়ির তৈল	১৬৲ " ১৭৲

রাধাকৃষ্ণ অয়েল মিল
১২১ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, নন্দনবাগান,
কলিকাতা।

বিনোদমার্কা খাঁটী সরিসার তৈল

২৪শে সেপ্টেম্বর

১০০ টীন বা ততোধিক প্রতিমণ	২৫৲
৬ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টী'নর কম	২৫৲
১১ টীন বা ততোধিক ১ গাড়ী কম	২৫৵০
খুচরা প্রতিমণ	২৬৲
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	২৸৶০

প্রাপ্তিস্থান—রায় সাহেব বিনোদবিহারী সাধু
২২।৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট ও ১৫৩ নং অপার
সারকুলার রোড কলিকাতা

আটা ময়দা সুজী।

পেটেণ্ট ময়দার প্রতিমণ	৮৲, ৮৶০
সিহি "	৭৸০, ৭৸৶০
গৃহস্থী "	৭৷০ ৭৷৶০
সুজী	[illegible] ৮৶০
আটা সি	[illegible] [illegible]
আটা ২নং	[illegible], [illegible]

আটা এল মার্কা ৭৲, ৭৶৹

আটা ওনং ৫৶৹, ৫।৹

উপরোক্ত মূল্য সত্তাসহ বুঝিতে হইবে।

কাসেম ও হর্ষারেল, ২১ নং আমড়াতলা গলি।

কেরোসীন তৈল।

১। আমেরিকান তৈল :—

মোরে্ফ	৮৸৵৹	প্রতিকেস
চেষ্টর	৮৷৵৹	”
বানর	৮/৹	”
ঐ টিন	৬৷/৹	”
বিলাতী	৬৷৵৹	দুইটিন
হাণ্ডী প্যাগন	৫৵১০	

ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। বর্ম্মা তৈল :—

কমল	৮৷/৹	প্রতিকেস
গ্লোব লাইট	৮৸৵৹	”
ভইওসর	৮৷/৹	”
চক্র	৬৷১০	দুইটিন
সূর্য্য	৬৷১৯	”
তারা	৬৷৵১০	”
ভিক্টোরিয়া	৩৸১০	”
হাস	৫৸১০	”
ছাগল	৬৷১০	”
মুর্গী ও চাবি	৫৷৵১০	”

মসলার দর।

হলদী (মহনি পত্তন)	১০৲, ১১৷৹
ঐ হিরোট	১২৷৵৹
ঐ (কড়পী)	১১৸৹
সুপারী (যাবারি)	১৭৷৹, ১৯৲
ঐ [illegible]না (ঐ)	১৮৷৹, ১৯৷৹
ঐ [illegible]	১৯৲, ১৯৷৹
ঐ ছোট	১৬৷৹, ১৮৲
ঐ (জাহাজী)	১২৷৹, ১৪৲
ঐ (দোকানী কাটা)	১৬৲, ১৮৲
ধনিয়া	৪৸৹, ৫৲
গোলমরিচ (কানানোরী)	৭০৲
ঐ (অলপী)	৬৬৲
লবঙ্গ	১৯৶৹, ২০৲
এলাচি (বড়)	২৫৲, ২৬৲
ঐ (ছোট)	৪৷৹
সাগুদানা	৮৸৶৹
এরারুট	৮।৹, ৮৷৹
পিপুল (বড়)	৬৮৲, ৭০৲
ধুনা (জাহাজ)	৭৲, ৮৲
ঐ (রেঙ্গুন)	১৩৲
বাদাম (কাগজী)	৩৭৲ ৪০৲
ঐ (কাটিয়া)	২৫৲
মনক্কা	১৬৷৹
কিসমিস	২৭৲
গোরা	১৩৲
রজন	১৩৲
সোহাগা (বিলাতী)	১৷৹
আবীর গুলাল)	৬৷৹, ৭৲
হরিতাল	৪৮৲
জায়ফল (বড়)	১৷৵৹
জায়ফল (ছিক্কাদার)	৩২৲, ৪০৲
নিশাদল	১৯৲
সুর্ম্মা	১৫৷৹
জয়ত্রী	৭৷৹, ৫৲
গুগ্গুল	১৮৲
তুঁতিয়া	১৮৲
চন্দন (খাঁটী)	৭৷৷৹
মুসব্বর	২৭, ৩৪৲

মাজুফল	৬৩৲
ফিটকারী	৫।০
পচাপাতা	২২৲
মাধ	১২৪৲
সীসা	১১।০
দারুচিনী	১২।০
মুত্রাশখ	২৬৲
সিন্দুর (ভেলী)	১০৲, ১৫৲
ঐ (জক্সন্)	২৫৸০
বংশ লোচন	৮৲ ১১৲ ২২।০
মলাভরী	১২।০
কর্পূর (ভেলা)	১৫৫৲
শুঁঠ (দেশী)	২৪৲
তার্পিন	২৪৲
মিশ্রী (১—২নং)	৯৸০, ১০।০

শ্রীশ্যাম মনোহর বিশ্বনাথ, ৯৪ নং লোয়ার চীৎপুর রোড কলিকাতা।

করগেট ও লোহা

কলিকাতা ২৪শে সেপ্টেম্বর

২২ গেজ করগেট সিট দর			১২॥০	হন্দর
২৪	”	”	১২৲	”
২৬	”	”	১৪৲	”
২৪	”	আর পি ডি	১২॥৵০	
জয়েষ্ট	” (কড়ি)	”	৬৲	”
বর্গা	” (টী)	”	৮৲	”
পাটী	”	”	৭।০	”
বল্টু	”	”	৭।০	”
কাটাতার	”	”	১২॥০	”
মটকা		”	৶০ পিস	

গঙ্গানারায়ন পাল এণ্ড সন্স
৩নং বড়বাহাটা ষ্ট্রীট,

মেটাল ও পেণ্ট

২৪শে সেপ্টেম্বর

ব্লক টীন পেনাঙ ছাপ	১৫৯।০	হন্দর
আর, টি তামার ইনগট	৬৬৲	”
অষ্ট্রেলিয়ান ঐ	৬৪	”
স্পিগলেড, বি, এম, মার্কা	১৯৸০	”
ঐ দেশী প্রস্তুত	১৬.০	
এর্ণ্টম্যান, এ, এস, পি মার্কা	৬৮।০	
ঐ অন্যান্য মার্কা	৩৬।০	
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	১২৬৲	
পিতলের চাদর ৪ × ৪	৬৮৲	
পিতলের ছড়	৬৪৲	
কপার সিট ৬ × ৬	৭১৸০	
কপার রড	৯৩৲	
সীসার সিট	২৬৲	
(জিঙ্ক ইনগট বিলাতী)	২১৸০	
” দেশে প্রস্তুত)	২০৸০	
হাববাক্স হোয়াইট জিঙ্ক পেণ্ট	৪১৶০	
” হোয়াইট লেড পেণ্ট	৩৬৲	
” গ্রিন পেণ্ট	২৬।০	
” রেড অক্সাইড পেণ্ট	২৬৵০	
হাবাকের তারপিন প্রতি ড্রাম	২০॥৶০	
রংয়ের তৈল পাকা	১৩৸৶০	
ঐ কাঁচা	১৩৲	
সিমেণ্ট মাটী দেশী প্রতি টন	৫৩৸০	
ঐ বিলাতী প্রতি ব্যায়েল	১১।০	

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
মার্চেণ্ট ৮৬ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১ম বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩৩৬ { ৭ম সংখ্যা

রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয়বার তৈল বাহির করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা গরুর খাদ্যরূপে এবং সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতের বাজারে সারের কাট্‌তি নিতান্ত কম নহে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার রাসায়নিক সার বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইতেছে। প্রচুর পরিমাণে তিসিজাত খোল যদি ভারতে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আর বিদেশীর নিকট হইতে সার ক্রয় করার প্রয়োজন থাকে না। ইহাতে একদিকে যেমন খোলের ব্যবহারের একটা পন্থা হয় অপরদিকে তেমনি বৈদেশিক শোষণের পথও বন্ধ হয়। তারপর গরুর খাদ্যও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। সাধারণতঃ একবার তেল বাহির করিয়া যে খোল থাকে তাহাই গরুকে খাইতে দেওয়া হয়। সেই খোলের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ করিয়া তেল থাকে বলিয়া গরুর পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী খাদ্য হয় না; অনেক সময় এরূপ খোল খাইয়া বরং অনিষ্ট হয়। দ্বিতীয় বার তেল বাহির করার পর যে খোল অবশিষ্ট থাকে তাহা গরুকে খাইতে দিলে কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তিসির তেল, খোল ইত্যাদি সমস্তই ভারতের কাজে লাগিতে পারে; একটু অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিলেই সমস্ত জিনিষ বিদেশে চালান দেওয়ার জন্ত আর ব্যস্ত হইতে হয় না।

তিসিকে সামান্ত গরম করিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিয়া হাইড্রলিক প্রেসের (Hydraulic

Press) সাহায্যে সাধারণতঃ তেল বাহির করা হয়। ইহাতে একদিকে তেল বহিয়া যায় এবং অপরদিকে খোল বাহির হইয়া আসে। গরম না করিয়াই কাঁচা তিসি হইতে তেল বাহির করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এইরূপেই তেল বাহির করা হয়—ইহাতে তেল একটু কম পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, কাঁচা তিসি গরম না করিয়া যে তেল বাহির করা যায় তাহা অপেক্ষা কৃত একটু উপাদেয় হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, গরম করা তিসির তেলের সহিত ইহার বড় বেশী প্রভেদ নাই।

প্রথমঃ তিসির তেল খুব পরিষ্কার থাকে। কিন্তু যতদিন যায় ততই ইহা ঘোলা হইতে থাকে। এই তেলকে পরিষ্কার করার জন্য কোনও পাত্রের মধ্যে জমা করিয়া রাখা হয়। ইহাতে অপরিষ্কৃত জিনিষ গুলি তেলের নীচে তলানী পড়িয়া জমা হইয়া থাকে এবং উপরের তেল পরিষ্কার হইয়া যায়। বার্ণিশ প্রস্তুতের জন্য যে তিসির তেলের প্রয়োজন হয় তাহাকে এইরূপে দীর্ঘ দিন জমা রাখিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। তবে অধিকাংশ স্থলেই এত দিন অপেক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। তাই অন্য উপায়ে তেলকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

সাদা রংএর জন্য যে তিসির তেল দরকার হয় তাহাকে সামান্য সালফিউরিক এসিড দিয়া গরম করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় রৌদ্রের মধ্যে এই তেল রাখিয়া দিলেও পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহাকে ইংরাজীতে Refined oil (পরিষ্কৃত তেল) বলে।

রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের জন্য তিসির তেলকে একটু সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাকে Boiled oil—অর্থাৎ সিদ্ধ তেল বলে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তিসির তেলকে সিদ্ধ করা হয় না;—একটু গরম করা হয় মাত্র। 150C পর্য্যন্ত গরম করিয়া তাহার সহিত drier মিশ্রিত করিতে হয়। সীসা, দস্তা,মেঙ্গানিস প্রভৃতি কতিপয় ধাতু আছে--ইহাদের অতি সূক্ষ্ম গুড়া তেলের সহিত মিশ্রিত করিলে সেই তেল খুব শীঘ্র শুকাইয়া যায়। এই জন্যই উক্ত ধাতব পদার্থ গুলিকে drier অর্থাৎ শুষ্ককারী বলা হয়। ভারতে যে Boiled oil প্রস্তুত হয় তাহাতে হাজার করা এক ভাগ মাত্র drier থাকে। অন্যান্য দেশের তেলে অবশ্য বেশী মাত্রায় drier দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

কাঁচা ও সিদ্ধ তিসির তেলের মধ্যে গুণের তারতম্য অনেক। সিদ্ধ তেলের মধ্যে যে কেবল drier থাকে তাহা নয়; অধিকন্তু তেল অনেকটা ঘন এবং কাল হইয়া যায়। এই তেলের উপর যে সর পড়ে তাহা অধিকতর ঘাতসহ এবং স্থায়ী হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে Boled oil এর সহিত Zinc Sulphate মিশান হয়। ইহাতে তেলের উপর যে সর পড়ে তাহা খুব বেশী পরিমাণে শক্ত হয়।

উপরে তিসির তেল সিদ্ধ করার যে প্রণালী বর্ণিত হইল তাহার অনেকানেক বিধান আছে। সেই বিধান অনুযায়ী তেলের গুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রণালীতে Boiled তেলের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা:—Double Boiled oil, Pale Boiled oil ইত্যাদি। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট double boiled oil শুকাইতে ছয়ঘন্টা,Pale boiled oil শুকাইতে ১২ঘন্টা এবং কাঁচা তিসির তেল শুকাইতে দুই দিন সময় লাগে। মোট কথা যে দেশের উত্তাপ যত বেশী সেই দেশে তত শীঘ্র এই সমস্ত তেল শুকাইতে পারে।

এস্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে Stand oil এর কথা বলা

যাইতে পারে। আসলে ইহা তিসির তেল ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিক সময় ধরিয়া গরম করার ফলে উহা ঘন হইয়া যায় এবং তাহার গুণের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া এই ঘন তেল যখন শুকাইয়া যায় তখন তাহার চাক্‌চিক্য প্রকাশিত হয়। সাধারণভাবে Boiled তিসির তেল হইতে ইহার সরও অধিকতর শক্ত (hard) হইয়া থাকে। অধিকাংশ Stand Oilই বার্ণিশ ও এনামেল প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া Lithographic varnish নামে পরিচিত stand oil ছাপাখানার উপযোগী কালী প্রস্তুতে লাগান যায়।

সমস্ত প্রকারের তিসির তেলই অল্প বিস্তর ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া কলিকাতার আশে পাশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলিকাতায় যে কয়েকটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তথায় আধুনিকতম বিজ্ঞানসম্মত কলকব্জার সাহায্যে তেল প্রস্তুত করা হয়। তাহা ছাড়া ছোট ছোট কারখানায় ভারতের নানা স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় বলদে টানা ঘানিতে তিসির তেল প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় প্রস্তুত তিসির তেল বিদেশী তেল হইতে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ। বিদেশ হইতে যে তিসির তেল এখানে আমদানী করা হয় তাহা নানা দিক দিয়াই নিকৃষ্ট। তবে ছোট ছোট কারবারীরা যে তেল বিক্রয় করেন তাহা সকল সময়ে পরিষ্কার হয় না।

Boiled oil অর্থাৎ সিদ্ধ করা তিসির তেল সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে প্রয়োজন। কেননা ছোট ছোট কারখানায় প্রস্তুত এই শ্রেণীর তেল তেমন ভাল হয় না। অনেক সময় ইহাদের তেল সন্তোষজনক ভাবে শুকায় না এবং ইহার উপর যে সর পড়ে তাহাও তেমন কার্য্যকরী হয় না। এস্থলে অভিজ্ঞতার অভাব আছে বলিয়া মনে হয়। যাহারা Boiled oil প্রস্তুত করেন তাহাদের পক্ষে আধুনিকতম প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা এবং তদনুরূপ কল আমদানী করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইবে।

তিসির তেল সম্পর্কে মোটামুটি সব কথাই আলোচনা করা হইল। এখন ইহার ভেজাল সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কাঁচা তেলের সহিত অপর কোন পদার্থ মিশাইয়া বিক্রয় করা বিশেষ লাভজনক নহে। তাই কাঁচা তিসির তেল বড় বেশী ভেজাল হয় না। কিন্তু সিদ্ধ করা (Boiled oil) তেলে প্রায়ই ভেজাল থাকে। ইহার একটি কারণ এই যে, সিদ্ধ করা তেলের মধ্যে যে drier (তেল শুকাইতে সাহায্যকারী) পদার্থ থাকে তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন —সিদ্ধ তেলের সহিত অপর জিনিষ মিশাইয়া দিলেও তাহা সহজে ধরা পড়িবে না। যাহারা বেশী লাভ করিতে চায় তাহারা এই বিশ্বাসেই সাধারণতঃ সিদ্ধ করা তেলের মধ্যে ভেজাল দিয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ স্থলেই পেট্রোলিয়াম মিশ্রিত করা হয়। প্রচুর পরিমাণে ইহা তিসির তেলের সহিত মিশাইলেও আপাততঃ ভেজাল ধরা পড়ে না। তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা সহজেই আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সকল সময়ে ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ রাসায়নিক পরীক্ষা করাও সম্ভবপর হয় না। এরূপ ভেজাল তেল কিন্তু রং প্রস্তুতের কাজের পক্ষে একেবারে অযোগ্য।

কোন কোন সময়ে Reduced oil অথবা

paint oil নাম দিয়া ভেজাল তিসির তেল সস্তা দরে বাজারে বিক্রয় হয়! ইহা দ্বারা রং প্রস্তুত করিলে সেই রং মোটেই কার্য্যকরী হয় না। বিদেশ হইতে যে সমস্ত তেল এদেশে আমদানী হয় তাহার মধ্যেও ভেজাল থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশী তেলের ভেজাল একেবারে বন্ধ করা সম্ভবপর নহে। কারণ এদেশে কাষ্টম সম্পর্কে যে আইন প্রচলিত আছে তাহা দ্বারা ভেজাল দ্রব্য আমদানী বন্ধ করা যায় না। তাই ভেজাল তেলের উপর "খাটি" মার্কা দিয়া প্রচুর বিলাতী তিসির তেল ভারতের বাজারে বিক্রয় হয়।

(ক্রমশঃ)

নারিকেলের কাতা প্রস্তুতের ব্যবসায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যবসায়ের কথা শুনিবামাত্র মস্ত কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। ব্যবসায় যেমন বড়ও হয় তেমনি ছোটও হয়। বিশেষতঃ নারিকেল কাতার ব্যবসায় খুব অল্প মূলধনে খুব ছোট ভাবেই আরম্ভ করা যাইতে পারে। নারিকেল ছোবড়া হইতে কি ভাবে কাতা প্রস্তুত করিতে হয় আমরা এইবার সেই কথাই আলোচনা করিব।

নারিকেলের গা হইতে ছোবড়া ছাড়াইয়া লইলেই উহা দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করা যায় না। নারিকেলের ছোবড়ার আঁশে এক প্রকার গুঁড়া লাগিয়া থাকে। সেই গুড়া আঁশ হইতে পৃথক করিয়া লইয়া ঐ আঁশে কাতা প্রস্তুত করা হয়।

অনেকেই বোধহয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—বাজারের কোন কোন নারিকেল কাতার দড়ীতে ভাল পাক বাধে না এবং দড়ী কোথায়ও সরু আবার কোথায়ও বা মোটা থাকিয়া যায়। যে নারিকেলের আঁশ হইতে এই সব লাল গুঁড়া ভাল করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় নাই সেই সকল আঁশ হইতে দড়ী পাকাইলে এইরূপ অসরল এবং আলগা পাকের দড়ী হইয়া যায়। এই সকল দড়ী কোথাও সরু কোথাও মোটা হওয়ায় সর্ব্বত্র সমান শক্ত হয় না। যেখানে দড়ী সরু হইয়া গিয়াছে সেখানে হয়ত সহজেই ছিড়িয়া যাইতে পারে; আবার যেখানে মোটা হইয়াছে সেখানে দড়ীর পাক সহজেই আলগা হইয়া যায়।

ইহার কারণ বলিতেছি। আঁশ গুলির গায়ে যদি গুঁড়া লাগিয়া না থাকে তবে দড়ী পাকাইবার সময় যে কয় তারের দড়ী পাকাও না কেন, সে তন্তু গুলি পরস্পরের গায়ে লাগিয়া থাকায় পাক দেওয়া হইয়া গেলে সব গুলি আঁশ একত্রে পাকাইয়া যাওয়ায় দড়ী খুব শক্ত ও মজবুত হইয়া যায়। কিন্তু এই আঁশ গুলির গায়ে যদি লাল গুঁড়া লাগিয়া থাকে তবে পাকাইবার সময় আঁশ গুলি সব গায়ে গায়ে লাগিতে পারে না; ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই গুড়াগুলি থাকায় হাজার পাকাইলেও প্রত্যেক আশের মধ্যে এই গুড়া সব রহিয়া যায়; এই গুড়া গুলি আবার সব সমান আকারের নহে; কোনটা বড়, কোনটা মাঝারী, আবার কোনটা বা একেবারে ছোট; এই জন্যই দড়ী যখন পাকানো হয় তখন তাহা কোথাও খুব মোটা, কোথাও মাঝারী, আবার কোথাও বা খুব সরু দেখায়।

তারপর এই গুঁড়া গুলির স্বভাব ঠিক স্পঞ্জের মত অথবা কাপাস তুলার মত। এইরূপ পাকানো দড়ী যদি জলে ভিজে তবে ফুলিয়া যায় এবং দড়ীর পাকও ঠিক থাকে; কিন্তু যদি রৌদ্রে থাকে তবে এই সব গুঁড়া যাহা জল পাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল তাহাই আবার রৌদ্রে শুখাইয়া একেবারে চিমসিয়া যায় এবং সেই জন্যই দড়ীর পাকও সহজেই আল্‌গা হইয়া যায়।

এখানে আমরা গুঁড়ার সম্বন্ধে এত বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম এই জন্যে যে, ইহার উপরই নারিকেলের দড়ীর দাম, গুণ ইত্যাদি সবই নির্ভর করে। Principle বা মূল ব্যাপারটা জানা থাকিলে সব কাজ ঠিক মত করা যায় এবং ইচ্ছা থাকিলে বাজারের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মালও বাহির করা যায়। বাজারে যে নানা রকমের কাতা দেখিতে পাওয়া যায় এই গুঁড়াই তাহার সর্ব্বপ্রধাণ কারণ। কাতা প্রস্তুত করিতে দুই রকম কাজের প্রয়োজন হয়:—

(ক) গুঁড়াগুলিকে নরম করিবার জন্য ছোবড়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়; এবং (খ) আঁশ হইতে গুঁড়া ছাড়াইবার জন্য ছোবড়া গুলি মুগুর দিয়া পিটিতে হয়।

ইহার জন্য দুই প্রকার প্রণালী অনুসরণ করা যাইতে পারে।—

প্রথম। প্রণালী হইতেছে—ছোবড়াগুলিকে জলে এত বেশী সময় ভিজাইয়া রাখা যে গুঁড়াগুলি নরম হইয়া অল্প পিটুনীতেই ঝরিয়া পড়ে।

দ্বিতীয়। অন্য প্রণালীতে ছোবড়াগুলি জলে অল্প সময় ভিজাইয়া গুঁড়াগুলিকে পিটুনির চোটে ছাড়াইয়া ফেলা।

ভিজা কাতা প্রস্তুত করিতে বেশী সময়ের আবশ্যক, কিন্তু মজুরী কম লাগে। অপর পক্ষে শুষ্ক কাতা প্রস্তুত করিতে অল্প সময় লাগে বটে, কিন্তু অত্যধিক মজুরী পড়িয়া যায়।

আমরা প্রথমে ভিজা কাতা ও পরে শুষ্ক কাতা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণনা করিব।

১। ভিজা কাতা।

নারিকেল হইতে ছোবড়া খুলিয়া লইয়া ঐ গুলিকে নদীর ধারে গাড়া গর্ত্ততে পুতিয়া রাখিতে হয়। যে সমস্ত নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল, সেই সমস্ত নদীর বেলা ভূমিই ছোবড়া পুতিয়া রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। ভাঁটার সময় নদীর খোলে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্ত্তগুলির মুখ পর্য্যন্ত ছোবড়ায় ভর্ত্তি করিতে হয় এবং তাহার পর উহাদের উপর নারিকেল পাতা, ইট, পাথর, ঘাসের বড় বড় চাপড়া চাপা দিয়া গর্ত্তগুলিকে এমন

করিয়া ভর্ত্তি করিতে হয় যাহাতে উহার উপর দিয়া জলস্রোত চলিয়া গেলেও ছোবড়াগুলি ভাসিয়া না উঠে। তাহার পর জোয়ারের জল আসিয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলে মাটীর ভিতর ছোবড়াগুলি ধীরে ধীরে পচিতে থাকে। এইরূপ পচা ছোবড়া হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বর্ণের কাতা প্রস্তুত হয়। এই আঁশকে কিঞ্চিৎ রক্তিমাভ করিতে হইলে যেখানকার জল সারা বছরই লবণাক্ত থাকে, ছোবড়াগুলিকে এইরূপ নদীর গর্ত্তে পুতিয়া রাখা আবশ্যক।

যেখানে জোয়ার ভাঁটার জোর বেশী এবং যাহার জল লবণাক্ত তাহাতে ছোবড়া ভিজাইলে উহা হইতে যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আঁশ পাওয়া যায় একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জলের সহিত যদি মাটি ভাসিয়া আসে তবে আরও সুবিধা হয়। যে সব খারাপ গ্যাসে আঁশগুলির রং নষ্ট করিয়া দেয়, স্রোতে সেই সব গ্যাস ধুইয়া লইয়া যায়। গাঁজলায় আঁশের জোর কমিয়া যায়; জলে লবণ থাকিলে গাঁজলা হইতে পারে না। আবার জলে মাটি থাকিলে জল গরম হয় এবং তাহাতে ছোবড়াগুলি সহজেই পচিয়া উঠে।

আমরা ছোবড়াগুলিকে মাটিতে পুতিয়া রাখিতে বলিয়াছি, কিন্তু উহা যে মাটিতেই পুতিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ছোবড়াগুলি বাঁশের বড় বড় খাঁচা বা ঝুড়িতে করিয়া জলে ভাসাইয়া রাখিলেও চলে।

আবার যে সমস্ত স্থান সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নহে বা যেখানে নদনদীর অস্তিত্ব নাই সেখানে খালের ধারে গর্ত্ত কাটিয়া উহা ছোবড়ায় ভরিয়া উপরে চাপা দিয়া ভিতরে জল চালিয়া দিতে হয়। তবে আমরা ঐগুলিকে পুকুরের জলে পচাইবার পরামর্শ দিতে পারি না। কেননা তাহাতে পুকুরের জল ও মাছ উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়।

ছোবড়া যত বেশী দিন জলে ভিজান থাকিবে আঁশের উৎকর্ষতাও তত বাড়িয়া যাইবে। তাই বলিয়া উহাদিগকে ২।৩ বৎসর গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। সাত আট মাস ভিজাইয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইল, প্রয়োজন হইলে বার হইতে আঠার মাস পর্য্যন্তও ভিজাইয়া রাখা যায়। কিন্তু ঐ সময়ের পরও জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে ছোবড়াগুলি অনেকটা নষ্ট হইয়া যায় বলিতে হইবে। কেননা উহার আঁশগুলি কম জোরাল ও সরু হইয়া যায় এবং নীলবর্ণ ধারণ করে। বাজারে উহার দাম নিতান্ত অল্প এবং সেই অল্প মূল্যেও উহা বিক্রয় করা দায় হইয়া উঠে।

খুব বেশী সময় ভিজিলে আঁশের যেরূপ জোর থাকে না, খুব কম সময় ভিজিলেও সেইরূপ আঁশগুলি হইতে গুঁড়াগুলি পৃথক করা কঠিন হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গিয়াছে ৭।৮ মাস গর্ত্তের মধ্যে থাকিলেই ছোবড়া সমূহ উপযুক্ত মত পচিয়া উঠে। কাজেই ৭।৮ মাস কাল ভিজাইয়া রাখাই বাঞ্ছনীয়।

এইখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। লোণা জলের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার জলে ছোবড়া ভিজাইয়া রাখিলে উহা হইতে যে কাতা তৈয়ারী হয় তাহা তত শক্ত বা রংদার হয় না।

যাহা হউক, ছোবড়া গুলিকে গর্ত্ত হইতে তুলিয়া তিন চার দিন টাটকা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। ইহাতে ইহার দুর্গন্ধ অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার পর মুগুর দিয়া পিটিয়া গুড়াগুলিকে ছোবড়া হইতে ছাড়াইয়া ফেলিলেই কাতা বা coir প্রস্তুত হইয়া যাইবে:—

দক্ষিণ ভারতই যে কাতা ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র একথা বলা হইয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলে ছোবড়া হইতে ঠিক কি পদ্ধতিতে কাতা প্রস্তুত করা হয় এইখানে তাহা বর্ণনা করিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাজেই এখন সেই কথার অবতারণা করিব।

ছোবড়া গুলি গর্ত্ত হইতে তোলা হইয়া গেলে কাতা ব্যবসায়ী সে গুলি গ্রামের বুড়ী ও বিধবাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। তাহারা নাম মাত্র মজুরী লইয়াই উহা পিটিয়া কাতা প্রস্তুত করিয়া দেয়।

একখণ্ড কাঠের উপর কতকগুলা ছোবড়া রাখিয়া, একখণ্ড ছোট অথচ ভারী মুগুর দিয়া পিটিতে হয় এবং মাঝে মাঝে জলের আছাড়া দিয়া সেগুলিকে সর্ব্বদাই ভিজা রাখিতে হয়। এই রূপে পিটিতে পিটিতে ছোবড়ার আঁশগুলি ছাড়িয়া আসে এবং ধুলার মত সূক্ষ্ম অংশগুলি ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তখন আঁশগুলিকে উত্তম-রূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় কাতা ব্যবসায়ী আঁশগুলি বাড়ী বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায় এবং অল্প অল্প ভিজা থাকিতে থাকিতেই তাড়া বাঁধিয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠাইয়া দেয়। অপেক্ষাকৃত বড় ব্যবসায়ী যাহারা তাহারা একেবারে প্রেসে Press চড়াইয়া গাঁইট বাঁধিয়া ফেলে। এইরূপ কাতাই জাহাজ বোঝাই হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

এতক্ষণ ভিজা কাতার কথাই বলা হইয়াছে। এইবার শুকনা কাতার কথা বলিব।

শুক্‌না কাতা।

শুকনা কাতা তৈয়ার করিতে অল্প সময় লাগিলেও তাহাতে খুব বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন। ছোবড়া গুলি নারিকেল হইতে ছাড়াইয়া লইলেই উহা কাজে লাগান যাইতে পারে, কিংবা প্রথম ছয়মাস কাল উহাদিগকে তুলিয়া রাখিলেও ক্ষতি নাই। যদি তুলিয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে শুকনা জায়গায় রাখিয়া দেওয়া উচিত।

প্রথমতঃ ছোবড়া গুলিকে কাঠের উপর রাখিয়া ভারি কাঠের মুগুর দিয়া পিটিয়া উহার উপরকার শক্ত ছাল আলগা করা আবশ্যক। তাহার পর ঐ ছাল ছিঁড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিতে হয়। তাহার পর ছোবড়ার টুকরাগুলি কতকগুলি বাণ্ডিলের আকারে বাঁধিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সাধারণতঃ ৩।৪ দিন ভিজাইয়া রাখিলেই চলে। বর্ষার দিন ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলেই যথেষ্ট। ইহার পর ছোবড়াগুলি জল হইতে তুলিয়া আঁশ হইতে গুঁড়া ছাড়াইবার জন্য আবার পিটিতে হয়।

যে জলে ছোবড়াগুলি ভিজান হয় তাহা খালের মিঠা জলও হইতে পারে, কিম্বা খালের মিঠা বা লোণা জল হইলেও ক্ষতি নাই। খালের জলই ভাল। যে পুকুরের জল পান করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় সে পুকুরে কিছুতেই ছোবড়া ভিজান উচিত নহে। খালের ধারেই কাতা তৈয়ারী করা সুবিধা জনক, কেননা জল পথে মাল বহিয়া লইয়া যাইতে খরচ অনেক অল্প হয়।

ছোবড়া পিটান হইয়া গেলে আঁশ গুলি ঝাড়িয়া, খুব ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইতে দিবে। ছোবড়ার ছালের গায়ে যে লম্বা পুরু ও খোঁচার মত আঁশ থাকে তাহা অন্যান্য আঁশ হইতে পৃথক্ করা খুব ভাল।

আঁশগুলি শুকাইলে উহার সমস্ত ময়লা এবং উহাতে তখনও যে গুঁড়া থাকে তাহা দূর করিবার

জন্ত দুইটি কাঠির ডগা দিয়া উহাদিগকে উপর নীচু করিয়া নাড়া চাড়া করিতে হয়। আঁশ যত পরিষ্কার হইবে, উহার দামও তত বাড়িবে।

ইহার পর বিশেষ রকমের চরকায় বা হাতে কাটিয়া আঁশ হইতে সুতলী করা হয়। ইহা হাতে করা হইলে আঁশগুলিকে প্রথমে দুই হাতের মধ্যে বা মাদুরের উপর পাকাইয়া ১ ফুট করিয়া লম্বা করা হয়। এরূপ লম্বা সুতলী যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ার করা হইলে, উহার দুইটা লইয়া, প্রথম যে দিকে পাকান হইয়াছে তাহার উল্টাদিকে পাকান হয় এবং অপরগুলি আবশ্যক মত উহার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সুতলী লম্বায় ১২০ ফুট করিতে হয়।

ভিজা কাতাই সব চেয়ে ভাল। ইহার রং ফিকে, ইহাতে মোটেই গুঁড়া থাকে না, এবং ইহা শুক্‌না কাতার চেয়ে শক্ত। এই সকল গুণেই কাতার দামের কম বেশী হয়। ইহাতে অসুবিধা এই যে, ছোবড়াগুলিকে কয়েক মাস পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিতে হয় বলিয়া উহার জন্য যে টাকা খরচ হয় বহু দিন তাহার বদলে কিছু পাওয়া যায় না।

শুক্‌না কাতার রং তত ভাল নয়, উহা হইতে গুঁড়া কখনও একেবারে দূর হয় না, এবং উহা তত শক্তও হয় না; সুতরাং ইহার দামও কম, এবং ইহা প্রস্তুত করিতে বেশী পেটা দরকার হয় বলিয়া মজুরীও বেশী পড়ে। কাতা প্রস্তুত এই প্রদেশে একটী নূতন ব্যাপার; অতএব লোকে কাতা তৈয়ারী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কয়েক মাস ধরিয়া কেবল ভিজাইয়া রাখিবার জন্ত ছোবড়া কিনিতে পয়সা খরচ করিতে রাজী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের প্রথম উৎসাহ থাকিতে থাকিতেই তাহারা সত্ত্ব সত্ত্ব ফল লাভ করিতে চাহিবে। এই জন্ত প্রথমে শুক্‌না কাতা প্রস্তুত করিবার প্রণালী চালাইবার চেষ্টা করা ভাল—পরে লোকে যখন দেখিবে যে ইহা প্রস্তুত করায় লাভ আছে, তখন বেশী লাভের কাজ ভিজা কাতা তৈয়ারী করিবার জন্ত নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বেশী উপদেশ দেওয়ার দরকার হইবে না। ইহাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—যেহেতু বৎসরের সব সময় নারিকেলের ছোবড়া সমান সস্তা থাকে না। কোন লোক যদি সস্তার সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ ছোবড়া কিনিয়া, যে কয়মাস ছোবড়ার দর বেশী থাকে সে কয় মাস রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ ছোবড়া শুক্‌না অবস্থায় রাখিবার জন্য একটী ঘর তৈয়ারী করার খরচের চেয়ে, উহা জলে ভিজাইয়া রাখাই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

৩। কলের সাহায্যে কাতা প্রস্তুত :—

এদেশে সাধারণতঃ ছোট ছোট মুগুরের সাহায্যেই আঁশ ছাড়ান হয়; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও কলের সাহায্য লইলে ঢের বেশী ফল পাওয়া যাইবে। সচরাচর একজন লোক গড়ে একদিনে ১০ পাউণ্ড ছোবড়া পিটিতে পারে —কিন্তু কলের সাহায্য লইলে একজনের পক্ষে দৈনিক আধ মণ ত্রিশ সের ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করা কিছুমাত্র কষ্টকর নহে।

অবশ্য কল কারখানার প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক টাকা মূলধনের প্রয়োজন। কাজেই এখনই যে কেহ প্রকাণ্ড একটী মিল খুলিয়া বসিবেন এমন আশা আমরা করিতে পারি না। তথাপি ১৩৩৪ সালের 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' এসম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছিল আমাদের নূতন গ্রাহকদিগের সুবিধার জন্ত তাহার কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, ছোবড়ার কারখানায় কোন জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না—সমস্ত কল কজাই খুব সহজ এবং অশিক্ষিত সাধারণ মজুরই অনায়াসে সে সমস্ত কল চালাইতে পারে। কারখানার মালিকের পক্ষে ইহা নিতান্ত অল্প সুবিধার কথা নহে। শিক্ষিত এবং দক্ষ মজুরের কেবল যে মাহিনাই বেশী তাহা নহে, আমাদের দেশে অনেক সময় মাহিনা দিলেও উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না। ছোবড়ার কারখানা খুলিতে গেলে নিম্ন লিখিত জিনিষ কয়টীর প্রয়োজন হয়।

১। ছোবড়া ভিজাইবার জন্ত কয়েকটী লোহার ট্যাঙ্ক বা ইটের চৌবাচ্চা।

২। একটী রোলার ক্রাসার মিল (crusher mill)। এই মিলের দ্বারা ছোবড়াগুলিকে থুড়িয়া আঁশ বাহির করিবার উপযোগী করা হয়।

২। ব্রেকিং ডাউন মিল। ইহার দ্বারা ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করা হয়।

৪। একটী উইলি মিল (willy mill) ইহাদ্বারা বিভিন্নগুণবিশিষ্ট আঁশগুলিকে আলাদা করিয়া ফেলা হয়; আঁশের মধ্য হইতে ধুলা ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকারের জঞ্জাল দূর করিয়া দেওয়া হয়।

৫। একটী হাইড্রলিক প্রেস। ইহার দ্বারা আঁশগুলিকে চাপিয়া গাঁটবাঁধা হয়।

৬। এতদ্ব্যতীত স্যাফটিং (Shafting) পুলি, চামড়ার বেল্টিং প্রভৃতি কয়েকটী খুচরা জিনিসের আবশ্যক।

সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কলকজা স্থাপিত হইলে ঐ সমস্ত কল বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালান যাইতে পারে। পল্লীগ্রামে একটী আট অশ্বশক্তি বিশিষ্ট অয়েল এঞ্জিনের প্রয়োজন।"

উল্লিখিত কারখানায় দৈনিক ১০০০ পাউণ্ড বা ১২।১৩মণ ছোবড়ার আঁশ বাহির করা যাইবে। সাধারণতঃ ৪০.৪২টা মাঝারি আকারের নারিকেল হইতে ছয় পাউণ্ড বা /৩সের ছোবড়া পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে উক্ত মিল দৈনিক প্রায় ৮০০০ নারিকেলের ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করিবে।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

[৮ই আগষ্ট তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

ফল

(এস—৫১) যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত আলমোড়া হইতে কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম্ম মেওয়া বা ফলের খরিদ্দারের সন্ধান চাহিয়াছেন।

Hydnocarpus Alpina Seeds :—

(এস—৫২) Hydno-carpus Alpina (Vernacular :—Kastel, Maratatti, Toratti, Sannasolti) যাহারা সরবরাহ করিতে পারেন এরূপ ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহিয়া বোম্বাইয়ের কোনও বড় কারবারী পত্র দিয়াছেন।

[১৫ই আগষ্ট তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে সংগৃহীত]

ANNATTO SEEDS

(এস—৫৩) কলিকাতার কোনও বড় কারবারী Annatto seeds বা লটকান্ ফলের বীজ সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন। এই বীজের ল্যাটিন নাম—Bixa Ovellana, দেশীয় ভাষায় ইহাকে সিঁদুরিয়া বা লটকান্ বলে।

জয়পাল

(এস—৫৪) কলিকাতার কোনও ফার্ম্ম, জয়পাল সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

পেপেন

(এস-৫৫) দক্ষিণ ভারতের ডেনাভুর (Denavur) নামক স্থানের কোনও কারবারী পেপেন বা পেঁপের রস ক্রয়কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন।

[১৯২৯ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

BECHE DE MER OR TRIPANG.

(এস ৫৬) দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের কোলাচেল হইতে জনৈক ব্যবসায়ী Beche de Mer or Tiprang (Sea Slings, Sea Leeches, Holothuria) বা সামুদ্রিক জোঁকের ক্রেতার সন্ধান চাহিয়াছেন।

বিভিন্নপ্রকার লাক্ষা

(এস-৫৭) কলিকাতার কোনও বড় ব্যবসায়ী Seed lac এবং Stick lac এর ক্রেতার সন্ধান চাহিয়াছেন।

তামার টুক্‌রা

(এস—৫৮) প্যারিসের কোনও ব্যবসায়ী, তামার টুক্‌রা-টাক্‌রা বিদেশে রপ্তানিকারী ব্যক্তিগণের সহিত পরিচিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

নীলের কাঁচা পাতা

(এস-৫৯) লণ্ডনের কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম্ম, নীলের কাঁচা (সেকা নয়) পাতার সরবরাহে নিযুক্ত কারবারীর অনুসন্ধান করিয়াছেন।
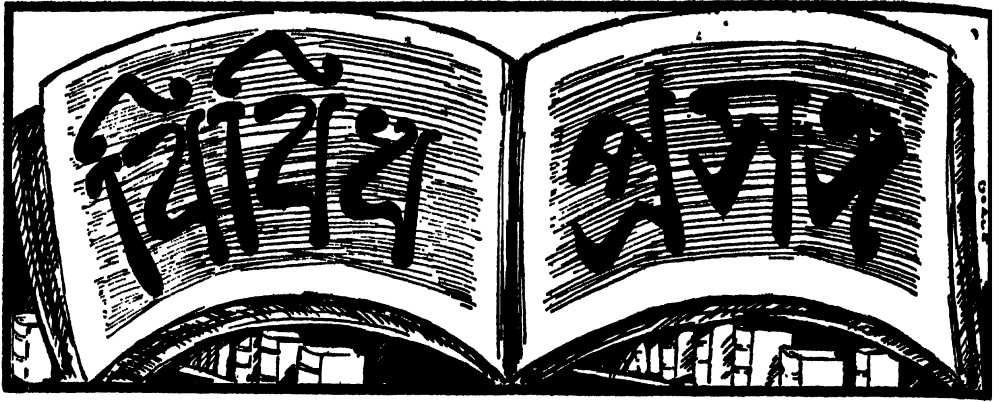
স্যার গঙ্গারামের সৎকার্য্য

১৯২৫ সালে স্যার গঙ্গারাম Kt., C. I. E., M. V. O., R. B., পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট ২৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া জানাইয়াছেন যে, এই টাকার সুদ হইতে একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাঞ্জাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যিনি কোন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন কিম্বা কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন তাঁহাকেই এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। কেবল ভারতবর্ষ নহে—ভারতের বাহিরের অধিবাসীরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষেও ইহা নিষিদ্ধ নহে; তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। ১৯২৬ ও ২৭ সালে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নাই। তাই দরখাস্ত প্রেরণের সময় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাঞ্জাবের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট আবেদন করা চলিবে। মোটামুটি পুরস্কারের পরিমাণ ৩০০০৲ টাকা হইবে। একটি ম্যানেজিং কমিটি এই পুরস্কারের বিধি ব্যবস্থা করিবেন। ইহারা ইচ্ছা করিলে এবং প্রতিযোগীদের আবিষ্কার ও প্রস্তাব সন্তোষজনক না হইলে এবার পুরস্কার নাও দিতে পারেন।

বরদার একটি সিমেণ্টের কারখানা

বরদা রাজ্যের ১৯২৭।২৮ সালের শাসন বিবরণীতে একটি সিমেণ্টের কারখানার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার নাম দ্বারকা সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী। ১৯২৬ সালে বরদার রাজ সরকার স্বয়ং এই কারখানা ক্রয় করেন। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে এই কারখানা বিক্রয়ের প্রস্তাব উঠে। ওখা সিমেণ্ট ওয়ার্কস লিমিটেড নামক একটি যৌথ কারবার খুলিয়া এই কারখানা ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে, এই কোম্পানীর মূলধন ১৩½ লক্ষ টাকা।

বরদা রাজ্যে লবণ প্রস্তুতের কারখানা

বরদা রাজ্যের ১৯২৭-২৮ সালের শাসন বিবরণীতে দেখা যায় ওখামণ্ডল তালুকে লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য মিঃ কপিল রাম ভকিলকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ফলে তিনি ১০০০০০০ টাকা মূলধনের একটি যৌথকারবার খুলিয়াছেন। কোম্পানী আইন অনুসারে বোম্বাই নগরীতে এই

কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই যে টাকা উঠিয়াছে তাহ'তে কারখানা নির্ম্মাণ অনায়াসে চলিতে পারিবে। আলোচ্য বর্ষে কলিকাতায় ২৩১৭ টন লবণ চালান দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে কোম্পানী লাভবান হইয়াছেন। আরও বেশী পরিমাণে লবণ প্রস্তুতের আয়োজন চলিতেছে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের জরিমানা

নর্থ ইণ্ডিয়া টি এণ্ড ফাইনান্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ এন, এন, মৈত্র, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকট যথারীতি ১৯২৬-২৮ সালের ব্যালেন্স সিট (Balance Sheet) মূলধনের বিবরণ (Summaries af Capital) এবং অংশীদারগণের তালিকা ইত্যাদি পেশ করেন নাই বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলে তাহার প্রতি ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ঐ টাকা পরিশোধ না করিলে ইহাকে তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শুনানীর সময় সরকারী উকীল বলেন,—এই ভদ্রলোক অনেক কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনটির সম্পর্কে এস্থলে অভিযোগ আনীত হইয়াছে। এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত(Paid up) মূলধন হইতেছে ৬৯৪২৮ টাকা মাত্র। এই মৈত্র মহাশয় কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টও বটেন। ডাইরেক্টার, ম্যানেজিং এজেণ্ট ইত্যাদি সমস্তই এক ব্যক্তি—এ যেন এক ব্যক্তির অভিনয়।

নন্দিনা টি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরও এই মৈত্র মহাশয়। সেই কোম্পানীর ১৯২৬-২৮ সালের ব্যালেন্স সিট, মূলধনের বিবরণ ও অংশীদারগণের তালিকা ইত্যাদি যথা সময়ে পেশ করেন নাই বলিয়া ইহার প্রতি আরও ২৫০৲ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

নন্দিনা টি কোম্পানীর আদায়ীকৃত (Paid up) মূলধনের পরিমাণ ৬৬৮৯৪ টাকা।

ইহার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযোগ ছিল। সব গুলিই যৌথ কারবার সম্পর্কিত। মৈত্র মহাশয়ই দি টি এজেন্সী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। এই এজেন্সীর সভায় বিগত ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে একটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবের প্রতিলিপি যথা সময়ে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করেন নাই বলিয়াও ইনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জরিমানার টাকা পরিশোধ না করিলে এক মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

কোম্পানীর আইনের ২০৬ ধারা অনুসারে ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের বিশেষ প্রস্তাব সম্পর্কিত নোটীশ যথারীতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করেন নাই বলিয়াও মিঃ এন, এন, মৈত্র অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারক এই অপরাধে তাহাকে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। টাকা পরিশোধ না করিলে তজ্জন্য এক মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

এই সমস্ত শাস্তি একত্র করিলে দেখা যায় যে মিঃ এন, এন, মৈত্রের প্রতি ৭৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। জরিমানার এই সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে তাহাকে ৮ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সাধারণের অর্থে লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করিয়া এই সকল কোম্পানী গঠনকারী কি দুঃসাহসের সহিত আইন ভঙ্গ করে এই ঘটনা তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ !

ইউরিয়া ষ্টিবামাইন

কলিকাতার শশীভূষণ সেন লেনের শ্রীহরিপদ সেন গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি সম্প্রতি চুরি করা ইউরিয়া ষ্টিবামাইন নামক কালাজ্বর প্রতিষেধক ঔষধ রাখার জন্য আদালতের বিচারে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ডাঃ ব্রহ্মচারীর গবেষণায় এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ ব্রহ্মচারীর ঔষধালয় হইতে কিছু জিনিষ পত্র চুরি যায়। তার পর ভেটি হইতে মরফাইন (Morphine) চুরি যাওয়ার পর কলিকাতার পুলিশ যখন সেই মালের সন্ধান করিতেছিল, তখন ঘটনাচক্রে হরিপদ সেনের বাড়ী হইতে উপরোক্ত ইউরিয়া ষ্টিবামাইন বাহির হইয়া পড়ে। যে মাল চুরি গিয়াছিল এগুলি তাহারই অংশ বিশেষ বলিয়া যথারীতি সেনাক্ত করা হয়।

বিচারক তাহার রায়ে বলেন যে, ইউরিয়া ষ্টীবামাইনের ন্যায় গুরুতর ঔষধ অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা প্রযুক্ত হইলে রোগীর জীবন মরণের প্রশ্ন উঠে। অনভিজ্ঞ লোকের হাতে এরূপ ঔষধ থাকা কিছুতেই নিরাপদ নহে। এই বলিয়া তিনি আসামীকে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ইহার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ছিল। তাহা এই যে, সে ইউরিয়া ষ্টিবামাইনের ট্রেড মার্ক জাল করিয়াছে। তাহার নিকট ঐরূপ কতিপয় লেবেলও পাওয়া গিয়াছিল। এই অপরাধে বিচারক তাঁহাকে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড দান করেন।

আসামী হরিপদ সেনের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই ছিল যে, সে মেসার্স হাওয়ার্ড এণ্ড সন্সের ঔষধের লেবেল ও জাল করিয়াছে। এই অপরাধেও তাহার প্রতি ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তবে শেষোক্ত কারাদণ্ড সে পূর্ব্ববর্ত্তী দণ্ডের এক সঙ্গেই ভোগ করিতে পারিবে।

যে রক্ষক সেই ভক্ষক

ই, বি, রেলের গার্ড ক্যাম্পবেল ও ফায়ারম্যান দিনাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আহাম্মেদউল্লা কর্ত্তৃক প্রত্যেকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মামলার বিবরণ এই যে আসামীদ্বয় যাত্রীগাড়ীর সন্নিহিত একটী ব্রেকভ্যান হইতে মাখন চুরী করিতেছিল। এমন সময় কলিকাতা পুলিশের জনৈক সাব ইনস্পেক্টর কর্ত্তৃক উহারা ধৃত হয়। উক্ত সাব ইনস্পেক্টর আসামীদিগকে পার্ব্বতীপুর রেল পুলিশের হস্তে প্রদান করেন।

—ফ্রী প্রেস

বিষপানে পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা

কলিকাতা জোড়াবাগানের রঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটী ছাত্র, বিষ পান করায় মেয়ো-হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত হয়।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ :—বালকটী গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল। সে পরম্পরা শুনিতে পায় যে সে এক বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ইহাতে তাহার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। তাহারই ফলে সে গভীর রজনীতে বিষ পান করে। বাড়ীর লোকজন তাহাকে পীড়িত মনে করিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করে। তথায় সোমবার সকালে তাহার মৃত্যু হয়। পরীক্ষা পাশ করার কি যে মোহ দেশের যুবকদিগকে গ্রাস করিয়াছে তাহা ধারণা করা যায় না।

প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ীর মৃত্যু

প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত এন, সি, সরকার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। অতি সামান্য ভাবে তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় ভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহার উপর সুপ্রসন্ন হইয়া উঠেন এবং যুদ্ধাবসানের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অন্যূন পক্ষে প্রায় ২০টি কোল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীত্ব ও ম্যানেজিং এজেন্সী লাভ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ১৯১৪—২৩ পর্য্যন্ত ৮ বৎসর ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভাপতি ছিলেন। তিনি কিছুকালের জন্য কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের সদস্য ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শ হইতে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সহঃ সভাপতি ছিলেন। ১৯২২—২৩ সালে যখন আইন সভার মধ্য দিয়া মাইনিং এক্ট পাশ হয় তখন শ্রীযুক্ত সরকার উহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রায় বৎসরাধিক পূর্ব্বে তিনি ব্যবসাক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সমাজে শুভ লক্ষণ

এদেশে বিধবারা এতকাল হয় পিতৃ গৃহে আর না হয় স্বামীগৃহে সকলের গল গ্রহ হইয়া জীবন কাটাইতেন; এই সকল বিধবার আবার বয়স অল্প হইলে সমাজের নানা আড্ডায় কত রকমের যে কানাঘুসি হইত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই সকল আড্ডায় কথার পরিবর্ত্তে ইসারাই অনেক রোমান্সের সৃষ্টি করিত। কবি যাহাকে বলিয়াছেন

"নয়ন কহিল কথা
নয়ন দিলেক সায়"।

কিন্তু এখন বিধবারা নানারূপ শিক্ষা লাভ করতঃ কেহ মাষ্টারী, কেহ ডাক্তারী কেহবা নানারূপ শিল্প কাজ শিক্ষা করতঃ সসম্মানে দিন গুজরান করিতেছেন। কিন্তু তথাপি পাড়াগাঁয়ের মজলিস্ গুলির আলোচনা হইতে ইহারা নিষ্কৃতি পান না।

সম্প্রতি মেদিনীপুরের কোনও লেডী ডাক্তারের চরিত্র এবং চাল চলনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া স্থানীয় কোনও লোক ড্যামেজ, ডিফামেশন এবং আইনের নাগপাশ বাঁচাইয়া আত্মগোপন করতঃ সংবাদ পত্রে একপত্র দিয়াছিলেন; সেই পত্র পড়িয়া Dispensary কমিটীর মেম্বরগণ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ প্রায় ১৪।১৫ জন আপনাপন নাম স্বাক্ষর করতঃ সেই সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন :—

"এরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণ মহিলার কার্য্যাবলীর এরূপ সমালোচনা করা বিদ্বেষ ও ঈর্ষামূলক। আলোচ্য সংবাদে তাঁহার সমাজের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষপাত ও সর্ব্ব সাধারণের সহিত মেলামেশার বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাগণের যে সমাজ, তাঁহারও সেই সমাজ; তিনি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের সহিত মেলামেশা তাঁহার পক্ষে দোষনীয় নহে। সমাজের অনুশাসন যাহাই হউক না কেন জীবন যাপনের কঠিন সংগ্রামে সৎপথে থাকিয় সদুপায়দ্বারা জীবিকার্জ্জনের প্রচেষ্টা কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না। তিনি বিধবা এবং অভিভাবকহীনা, অবলম্বন যাহা জীবিকা উপার্জ্জনক্ষমা বিধবাগণের প্রতি সমাজ চিরকালই এইরূপ অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে। এবং তাহারই অনুশাসনের দোহাই দিয়া সংবাদ দাতা মহাশয় এই অসহায়া মহিলাকে নির্য্যাতিত

করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আমরা আশা করি সংবাদ দাতা মহাশয় তাঁহার অলীক মন্তব্য গুলি প্রত্যাহার করিয়া সৎ সাহসের পরিচয় প্রদান করিবেন। আশা করি আমাদের প্রেরিত এই প্রতিবাদ আপনার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।"

অন্যায় আক্রমণ এবং সামাজিক গ্লানি হইতে একজন লেডী ডাক্তারের সম্মান রক্ষা করার জন্য এতগুলি ভদ্রলোক স্বাক্ষর করিয়া এমন দেশের সহিত সংবাদ পত্রে সত্যকথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। সমাজ সংস্কারক এবং ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রণীদিগের জীবন ব্যাপী আন্দোলন যে সুফল প্রসব করিতে সুরু করিয়াছে দিকে দিকে আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি।

জার্ম্মাণীর বৃত্তিলাভ

সম্প্রতি মিউনিক (জার্ম্মাণী) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কার্য্য পরিচালিত করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত কালি পদ বসু ও যাদবপুর ন্যাশনাল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শ্রীযুত ত্রিগুণাচরণ সেন মিউনিক জার্ম্মাণ একাডেমী হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জার্ম্মাণীর এই বাঙ্গালী প্রীতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বাঙ্গালীকে সব জাতিই আজ কোন্ ঠাসা করিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে; এ সময়ে যাহারা বাঙ্গালীকে কোল দিবে,আমরা তাহাদিগের ভালবাসা ভুলিতে পারিব না।

হিতবাদীর নূতন আকার

ইংরাজীতে একটা কথা আছে Customs die hard অর্থাৎ অভ্যাস মানুষের এমনই মজ্জাগত যে সহজে মানুষ উহা ছাড়িতে পারে না। কিন্তু এই অভ্যাস যখন অঙ্গের বালাই হইয়া দাঁড়ায় তখন চেতনার সঞ্চার হয় এবং মানুষ তেড়ে ফুঁড়ে উঠে তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলে।

হিতবাদীর কলেবর পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদের সেই কথা মনে পড়িতেছে। হিতবাদী যে আকারে বাহির হইত, তাহা ঠিক বিছানার চাদরের ন্যায় বৃহৎ; স্বর্গীয় কবিরাজ উপেন্দ্র নাথ সেন এবং পণ্ডিত কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ আমাদিগকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; আমরা অনেক বার হিতবাদীর এই অসুবিধাজনক আকারের সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট অভিযোগ করিতাম এবং বলিতাম যে হিতবাদী পড়িবার জন্যই লোকে নেয়, বিছানায় পাতার জন্য নেয় না ত! তবে আপনারা কাগজের আকারটা এমন সৃষ্টি ছাড়া করিলেন কেন যে পড়িতে গেলে, পাতা উল্টাইতে গেলে, ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতে হয়। তার উপর যদি হাওয়া বহিতে থাকে কিম্বা ট্রেণে পড়িবার দরকার হয় তবেত আর রক্ষা নাই। বাতাসে বিরাট কাগজ খানি বিছানার চাদরের ন্যায়ই পত্ পত্ করিয়া উড়িতে থাকে এবং এখানে সেখানে ছিঁড়িয়া যায়। ফলে ভুক্ত ভোগী পাঠকেরা আপনাদের মাঝে মাঝে যা সম্বোধন করে তা আদৌ শ্রুতি সুখকর কিম্বা সভ্যতা সঙ্গত নহে। তখন বসুমতী সবে নূতন আকারে বাহির হইয়াছে সেই কাগজ নিয়া তাঁহাদের দেখাইয়া বলিলাম দেখুন এই রকম আকারের কাগজ নাড়িতে, চাড়িতে, এবং পড়িতে কত সুবিধা। সে আজ প্রায় ২০।২১ বছর আগেকার কথা বলিতেছি, তারপর কত "নদী গেল সাগরে মিশি" কিন্তু তবু ও এই সংস্কার টুকু হইল না; এতকাল পরে মনোরঞ্জন ভায়ার দেখিতেছি সুমতি হইয়াছে। হিতবাদী খোলস্ বদলাইয়াছে; সকলের আগে আমাদের মুখে হাসি ফুটীয়াছে, কারণ হিতবাদীর সহিত আমাদের যৌবন কালের অনেক স্মৃতি জড়িত।

সিঙ্গাপুর হইতে লাক্ষা রপ্তানী

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ মালয়ের বাহিরে যে পরিমাণ লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

দেশের নাম	পরিমাণ	মূল্য
ইউনাইটেড কিংডম্	২'৫০	২২০০
আমেরিকার যুক্ত রাজ্য	১০'৯৩	৮৯৭৮
ফরাসী ভারত	১'৯৬	১৯৮০
জার্ম্মাণী	৮'০০	৬৭৭৯
কলিকাতা	১৫৯ ০২	১৩০৩২২
মাদ্রাজ	০'৮৮	৭৩৪
মোট	১৮৩'২৯	১৫০৯৯৩

মালের পরিমাণ টন হিসাবে এবং মূল্যের পরিমাণ ডলার হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। ১০০ ডলার = ১৫৩½ টাকা।

ব্যাঙ্কক্ হইতে লাক্ষা রপ্তানী

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক্ হইতে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দেশের নাম	পরিমাণ	মূল্য
সিঙ্গাপুর	৩০৫২'৬০	১৬১০৮৩
নিদারল্যাণ্ডস্	১৬'৮০	১৬৮০
জার্ম্মাণী	১৮৬৩৩	১৮৫৭৮
ইউনাইটেড কিংডম	১৫৯'৭৮	২৪৪০৩
বেলজিয়ম	৮৪'৪৪	৪৬২০
হং কং	৮'০০	৪৮০
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	১৬৮'০০	১৬৮০০
মোট	১৮৭৫'৫১	২২৭৭৩৪

উপরোক্ত মালের পরিমাণ শ্যাম দেশের প্রচলিত ওজন পিকালে দেওয়া হইয়াছে। এক পিকাল = ১৩৩⅓ পাউণ্ড। মূল্য দেওয়া হইয়াছে শ্যাম দেশের প্রচলিত মুদ্রা টিকাল অনুসারে। ১০০ টিকাল = প্রায় ১২১⅘ টাকা।

সৈগন হইতে ধান ও চাউল রপ্তানী

১৯২৮ সালে সিগন বন্দর হইতে বিভিন্ন দেশে প্রায় ১৬৬৬০০০ টন ধান ও চাউল প্রেরিত হইয়াছে। ১৯২৭ সালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় ২০০০০ টন বর্দ্ধিত হইয়াছে। হং কংই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

মাল ক্রয় করিয়াছে। কোন দেশে কত ধান ও চাউল প্রেরিত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

দেশের নাম	কত টন
ফ্রান্স	২৫৭০০০
ইউরোপ	১৮১৫০০
ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ	১৫০৫০০
জাপান	১১০০০০
সিঙ্গাপুর	৮৪০০০
ফিলি পাইন	৫১০০০
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৪৮০০০
অন্যান্য দেশে	৩০০০০

ভারতবর্ষে ১০০০০০ টনের অধিক মাল প্রেরিত হইয়াছে। এই সমস্ত চাউল প্রায় সমস্তই কোচিন, চায়নায় উৎপন্ন হয়। তবে এক পঞ্চমাংশ আন্দাজ ক্যাম্বোডিয়া হইতে পাওয়া যায়। তথায় প্রচুর পরিমাণে ভূট্টার চাষও হইয়া থাকে।

বিভিন্ন ধাতু ও ধাতু নির্ম্মিত জিনিষ আমদানী।

১৯২৭-১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে ২১৪৪ লক্ষ টাকার লোহা ও ইস্পাত বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। তাহা ছাড়া অপরাপর ধাতুও নিতান্ত কম আমদানী হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ৬৯৬ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধাতু ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। এই ধাতুর পরিমাণ প্রায় ৬২০০০ টন।

এলুমিনিয়াম:—১৯২৭-২৮ সালে প্রায় ১৩৫৯০০ হন্দর পরিমিত এলুমিনিয়াম ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ১১৮½ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৯৫ লক্ষ টাকা মূল্যে ৯৭০০০ হন্দর মাল ভারতে আসিয়াছিল।

পিতল:—আলোচ্য বর্ষে বিদেশ হইতে প্রায় ৫০৮০০০ হন্দর পিত্তলের মাল ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ২৩৩¾ লক্ষ টাকা। ১৯২৬-২৭ সালে কিন্তু ২৫৬½ লক্ষ টাকা মূল্যে ৫২৯০০০ হন্দর পরিমিত পিত্তল এদেশে আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে গ্রেট বৃটেন হইতে আসিয়াছে ১৬৮০০০ হন্দর এবং ইহার দাম পড়িয়াছে ৭৫ লক্ষ টাকা। জার্ম্মাণী হইতে আসিয়াছে ১৯৫০০০ হন্দর এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ৮৭½ লক্ষ টাকা।

তামা:—পিত্তল আমদামী হইয়াছে ২৬১০০০ হন্দর এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ১২৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে সাদা পিত্তল আসিয়াছে ১৭ লক্ষ টাকার এবং পিত্তলের জিনিষপত্র ১১০ লক্ষ টাকার।

সীসা—১২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪৮০০ হন্দর পরিমিত সীসা আমাদের এদেশে আসিয়াছে। তন্মধ্যে সীসার পাত ও পাইপ ইত্যাদি আসিয়াছে ৫½ লক্ষ টাকার।

টিন:—৬৫৮০০ হন্দর পরিমিত টিন ১১২ লক্ষ টাকা মূল্যে আমদানী হইয়াছে।

দস্তা:—১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে দস্তার উপর যে আমদানী শুল্ক লওয়া হইত তাহা রহিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে আমদানীর পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৭-২৮ সালে ১০৬০০০ হন্দর পরিমিত দস্তা এদেশে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ২০ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে মাত্র

৩৭০০০ হন্দর দস্তা আসিয়াছিল এবং তাহার দাম পড়িয়াছিল ৮½ লক্ষ টাকা।

জার্ম্মাণ সিলভার:—১৯২৭-২৮ সালে ১৭২০০ হন্দর পরিমিত জার্ম্মাণ সিলভার ও নিকেল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ১৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জার্ম্মাণী হইতে আসিয়াছে ৭ লক্ষ টাকার, অষ্ট্রিয়া হইতে ৫ লক্ষ টাকার এবং গ্রেট বৃটেন হইতে ২ লক্ষ টাকার।

পারদ:—১৯২৭-২৮ সালে ১৬৮০০০ পাউণ্ড পরিমিত পারদ ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দর পড়িয়াছে ৬০৮০০০ টাকা। তন্মধ্যে ইটালী হইতে ৪½ লক্ষ টাকা মূল্যের ১২৩০০০ পাউণ্ড এবং গ্রেট বৃটেন হইতে ৭৪০০০ টাকা মূল্যের ২১০০০ পাউণ্ড পারদ আসিয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে যে সমস্ত মাল বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মোটামুটি বিদেশী মাল আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় ৭.৪২ কোটী টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল—এপ্রিল মাসে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৮.৩৮ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে কলিকাতা হইতে মাল রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। মার্চ্চ মাসে ৯.২৯ কোটী টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল; কিন্তু এপ্রিল মাসে হইয়াছে ৯.১০ কোটী টাকার মাল। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, আমদানীর পরিমাণ ১.১২ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে ১.১৪ কোটী টাকা।

আমদানী:—১৯২৮ সালের সহিত তুলনায় ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসের আমদানী বাণিজ্য কত কম বা কত বেশী হইয়াছে তাহার বিবরণ বিয়োগ চিহ্ন (—) কিম্বা যোগ চিহ্ন (+) ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসের সংখ্যার পশ্চাতে জুড়িয়া দিয়া দেখান হইল:···

জিনিষের রকম	কত লক্ষ টাকা
তুলাজাত দ্রব্য	২৬৫+১১
লোহা ও ইস্পাত	৮১+২৮
কলকব্জা ও মিল	৬৯—১১
চাউল, দাল ও ময়দা	৬২+৫৯
চিনি	৪৩+১৮
তেল ও খনিজ দ্রব্য	৪২—১২
অন্যান্য ধাতু	২৬+৬
লোহা লক্কড়	১৬ (প্রায় সমান)
ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি	১৩—২
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	১২+৩
কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড	১১+৩

বিলাতী সূতা আমদানীর পরিমাণ ৪১২০০০ পাউণ্ড হইতে ১১৭৭০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে ৫.৯৬ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ।

বিলাতী কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ ৯৭০০০০০০ গজ হইতে ১০০০০০০০০ গজে পরিণত হইয়াছে। মূল্যের পরিমাণ ২২৮ লক্ষ হইতে ২৪১ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। এপ্রিল মাস অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৬১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪৩০০০ টন গম আমদানী হইয়াছে। যাবা হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি আমদানী হইয়াছে। পরিষ্কৃত চিনির পরিমাণ ১৩০০০ টন হইতে ২৫০০০ টনে

পরিণত হইয়াছে। মূল্য বাড়িয়াছে ২৫ লক্ষ হইতে ৪২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত। তবে খনিজ তেল আমদানীর পরিমাণ ১২ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

রপ্তানী —১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসের সহিত তুলনায় ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে যত মাল কম বা বেশী রপ্তানী হইয়াছে তাহা ১৯২৮ সালের এপ্রিলের সংখ্যার সহিত বিয়োগ চিহ্ন (—) অথবা যোগ চিহ্ন + জুড়িয়া দিয়া দেখান হইল :—

জিনিষের রকম	কত লক্ষ টাকা
পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্য	৩৯২—১৫
কাঁচা পাট	১৮৯ + ৪৮
লাক্ষা	৭৬+৩৮
পরিস্কৃত ও অপরিস্কৃত চামড়া	৫১—১
চাউল, ডাল ও ময়দা	৪১+২২
লোহা (অসংস্কৃত ঢালাই)	২৯+১৪
অভ্র	১০+৫
চা	৯০-১

পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির জন্ত ১৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে বটে ; কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে ৬৪০০০ টন হইতে ৬৫০০০ টন। কারণ বাজারে ইহার চাহিদা বেশী ছিল না বলিয়া দর ও কমিয়া গিয়াছিল। যে সমস্ত বস্তা রপ্তানী হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই যাবা দ্বীপে গিয়াছে এবং চট প্রায় সমস্তই আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ক্রয় করিয়াছে। কাঁচা পাটের চাহিদা মন্দ ছিল না—ইহার সমস্তই গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সে গিয়াছে। লাক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যই তাহা সাদরে ক্রয় করিয়াছে। অপরিস্কৃত চামড়া প্রায় সমস্তই জার্ম্মানীতে এবং পরিস্কৃত চামড়া সব আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে গিয়াছে। অভ্রের চাহিদা বাড়িয়া ছিল এবং প্রায় সমস্তই যুক্ত রাষ্ট্রে গিয়াছে। চাউল যত রপ্তানী হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বাহেরিন দ্বীপে গিয়াছে।

স্বচ্ছ সাবান

(শ্রীঅবনী নাথ ঘোষ)

তেজাল শূন্য নিশ্চল সাবানকে স্পিরিট মদসার, চিনির জল, সোডার জল ইত্যাদি দ্বারা জাল দিয়া স্বচ্ছ সাবানে পরিণত করিতে হয়। তবে চিনি ও সোডা মিশ্রিত স্বচ্ছ সাবান কাল ক্রমে ভয়ানক খারাপ হইয়া যায় ও বর্ষার দিনে "ঘামিতে" আরম্ভ হয়। অতি উত্তম ট্রান্সপেরেণ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে শুধু স্পিরিট ও মদসার ব্যবহার করাই ভাল।

স্বচ্ছ সাবান বানাইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

(১) তৈল, চর্ব্বি ও কষ্টিক সোডা খুব পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। তৈল ও চর্ব্বি উপযুক্ত গরম করিয়া দুই তিনবার ছাকিয়া লইতে হইবে, কঃ সোডা গরম করিয়া খুবঘন কাপড় সাহায্যে অতি দ্রুত ছাকিয়া লওয়া দরকার। কাপড়ের দ্বারা কাজ না হইলে খুব মিহিন চালুনি বা কাচ পশম দ্বারা কঃ সোডা ছাকিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

(২) সমুদয় তৈল সমষ্টি যাহাতে পূর্ণভাবে সাবানে পরিণত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অর্থাৎ সোডা ও তৈল সমষ্টিকে অন্ততঃ ৫।৬ ঘণ্টা চাপা আগুনের উপর রাখিয়া জ্বাল দিতে হইবে। স্বচ্ছ সাবানে যদি তৈলের ভাব বেশী থাকে, তাহা হইলে সাবানের স্বচ্ছতা ম্লান হইয়া যায়।

(৩) ট্রান্সপারেন্ট সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে একটি ওয়াটার বাথ এর যোগাড় করিতে হইবে। সাধারণ খোলা চুল্লাতে সাবান জ্বাল দিলে মসলার সহজেই ডুবিয়া যায়।

(৪) স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত করিবার সময় উহাতে কঃ সোডার ভাগ একটু বেশী রাখিতে হয়। সময় সময় বদ্ধ কটাহের ঢাক্না খুলিয়া কঃ সোডার তারতম্য পরীক্ষা করা দরকার। পরিপক্ক সাবানে সর্ব্বদাই একটু কঃ সোডার জালা থাকা দরকার।

(৫) সাবান পাক হইয়া গেলে উহাকে অতি দ্রুত "জমাইয়া" লইতে হয়। স্বচ্ছ সাবান "জমাইবার" জন্য কারখানায় এক প্রকার টিনের চুঙ্গি সারি সারি সাজান থাকে এবং উহাদের চতুর্দ্দিকে শীতল জল চলাচলের বন্দোবস্ত থাকে, যাঁহাতে অতি শীঘ্র সেই চুঙ্গির সাবান জমিয়া যায়। স্বচ্ছ সাবান যারা যে ভাবে সেই চুঙ্গি গুলি পূরণ করা হয়, তাহা সাধারণতঃ মোমবাতি প্রস্তুতের মত। কলিকাতা ইটালিস্থ "ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানীতে ট্রান্সপারেন্ট সাবান প্রস্তুতের সর্ব্ববিধ আয়োজন বর্ত্তমান আছে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে উহা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে পারেন। অবশ্য সাধারণ ভাবে সাবান জমাইলেও কাজ চলিবে, দ্রুত দ্রুত জমাইতে পারিলে একটু ভাল ফল হয় বলিয়া আমার মনে হয়।

(৬) চিনি পুড়িয়া যে রং প্রস্তুত হয়, তাহাকে "ক্যারামেল' বলে। স্বচ্ছ সাবানে সাধারণতঃ এই পোড়া চিনির রং মিশাইতে হয়, অন্যথা "সোপ ব্রাউন" নামক সাবানের রং সামান্য জলে গুলিয়া তাহাতে মিশাইলেই চলিবে। রং মসলারের সহিত মিশাইয়া সাবানে প্রয়োগ করিলেও মন্দ হয় না।

টান্সপারেণ্ট সাবান প্রস্তুত করিবার নিয়ম

তৈল সমষ্টিকে শতকরা ৫০ ভাগ কঃ সোডা দ্বারা পূর্ণভাবে পাক করিতে হইবে। ৩৫০—৩৫০ ডিগ্রি তেজের সোডা সলিউশান লইলেই চলিবে। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর যখন সমুদয় তৈলসমষ্টি সাবানে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন সাবান পূর্ণ পাত্রটিকে "ওয়াটার বাথে'র উপর চাপাইয়া দিয়া উহাতে ১০/০ শোধিত মদসার ও ১০/০ গ্লিসারিণ ঢালিয়া দিয়া পাত্রটির মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পাত্রের ঢাক্না খুলিয়া দেখিতে হইবে, উহা যেন উথলিয়া না পড়ে। কঃ সোডার ভাগও ঠিক আছে কিনা তাহা জিহ্বা বা ফিনফথালিন্ দ্বারা, দেখিয়া লইতে হইবে। অনেক সময় জলের ভাগ কমিয়া যায়, তাহাতে সাবান গাঢ় হইয়া যায়; তখন তাহাকে অতিরিক্ত

জল সংযোগে পাতলা করিয়া দিয়া আবার পাত্রটির মুখ ঢাকিয়া দিতে হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে, সাবানে "কঃ সোডার জালা" না থাকিলে তাহাতে অতিরিক্ত জল মিশান অবিধেয়। ৫।৬ ঘণ্টা জাল দিবার পর দেখা যাইবে, সাবানের উপরিভাগে একরাশ ফেনা জমিয়া আছে ও তাহার নিম্নে পাৎলা স্বচ্ছ সাবানের রস টলটল করিতেছে তখন সেই সাবানের খানিকটা কোন কাচ পাত্রের উপর রাখিলে যদি দেখা যায়, উহা শুকাইলে স্বচ্ছ ও শক্ত হইয়া যায়, তবেই বুঝিতে হইবে যে উহা উপযুক্ত ভাবে পাক হইয়াছে। পাত্রটিকে তখন ওয়াটার বাথ হইতে নামাইয়া ৭০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করিতে হয়। অতঃপর তাহাতে প্রয়োজন মত সুগন্ধ মিশাইয়া পূর্ব্ববর্ণিত টিনের চুঙ্গাঃঢালিয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয়। পরদিবস সাবান জমিয়া গেলে, চুঙ্গিগুলিকে খুলিয়া লইয়া বিক্রয়োপযোগী ওজনের টুক্‌রা হইতে একটু অধিক ওজনের করিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা কাটিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। স্বচ্ছ সাবান শুকাইতে অনেক সময় লাগে, পরে ওজনের হ্রাস হয় বলিয়া পূর্ব্বে কাটিবার সময় সাবানকে একটু বেশী ওজনের করিয়া কাটিতে হয়। শুনিয়াছি, বিলাতে পেয়ার্স সোপ শুকাইতে এক মাস সময় লাগে। স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত করিবার একটি কার্য্যকরী দ্রব্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অতি উত্তম স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত করিবার উপাদান

অতি উত্তম চর্ব্বি—	৩ সের
কোচিন নারিকেল তৈল—	৬ সের
অতি পরিষ্কৃত রেড়ীর তৈল—	১ সের
কঃ সোডা ৩৪ বোমে তেজের—	৫ সের

—প্রথমতঃ এই ৪টী তৈল সমষ্টিকে বিনা জালে বা অর্দ্ধ জালে পূর্ণভাবে সাবানে পরিণত করিয়া লইতে হইবে। (ক)

গ্লিসারিন ২৮ বোম তেজের—১২ ছটাক শোধিত মদসার ৯৬—২ সের—পূর্ব্বোক্ত (ক) চিহ্নিত দ্রব্যের সহিত ইহাদিগকে মিশাইয়া ওয়াটার বাথের উপর ৫।৬ ঘণ্টা রাখিয়া জাল দিতে হইবে। (খ) ক্যারামেল বা সাধারণ "সোপ ব্রাউন" রং (জলে বা মদসারে গুলিয়া)—অতি সামান্য মদসারের সহিত মিশাইতে হইবে।

সুগন্ধ

লেভেণ্ডার—	২০ সি, সি
দারুচিনি তৈল—	৫ " "
বারগামট " —	১০ " "
কারাওয়ে " —	৫ " "
ভারবেনা " —	১০ " "
মুস্ক টিংচার—	৫ " "
ইওনোক্সেসিডিও—	৫ " "

একুনে ৬০ সি, সি—আনুমানিক ২ আউন্স (প্রায় ৩০ সি, সিতে ১ আউন্স হয়)।

—পাত্রটিকে ওয়াটার বাথ হইতে নামাইয়া কতকটা ঠাণ্ডা করিয়া সুগন্ধ মিশাইতে হইবে—২ আউন্স সস্তা ট্রান্সপেরেণ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে গ্লিসারিণ একেবারেই বাদ দিতে হইবে, শোধিত মদসারের পরিবর্ত্তে মেথিলেটেড্ স্পিরিট ব্যবহার করিতে হইবে, ৩০ চিনি ও সোডার জল, সামান্য জলে মিশ্রিত ব্রাউন রং ও ২ আউন্স আম আদার গন্ধ দিয়া পূর্ব্ববৎ ৫।৬ ঘণ্টা জাল দিয়া ক্রমে ২৪ ঘণ্টার জন্য ঢাকিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

(স্বদেশী বাজার)

পল্লী পশুর ক্ষতরোগ

(শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত জি, বি, ভি, সি।)

বঙ্গদেশে পল্লীগ্রামের বহু গরুর গায়ে নানা রকম ঘা দেখিতে পাওয়া যায়। অচিকিৎসা ও যত্নের অভাবে পশুগুলি কেবল যে কষ্ট পায় তাহা নহে অনেক অল্প অকালে প্রাণত্যাগ করে। সচরাচর নিম্নলিখিত ঘা গুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) পরস্পর লড়াই করিয়া শিংয়ের গুতায় যে ঘা হয়।

(খ) লাঙ্গলের খোঁচায় পেছনের পায়ের গোড়ালিতে ঘা হয়।

(গ) যোয়ালির কাঁধে এক প্রকার ঘসায় ঘা হয়।

(ঘ) শিং ভাঙ্গা ঘা।

(ঙ) হঠাৎ পড়িয়া বা চোট লাগিয়া কাটিয়া বা থেৎলাইয়া ঘা হয়।

(চ) শূকর, শৃগাল, বা সর্প দংশনজনিত ঘা হয়।

(ছ) পায়ে পেরেক বা কাঁটা বিধিয়া ঘা হয়।

(জ) পোকা ধরা ঘা (মাছির ডিম হইতে পোকা জন্মে)

এতদ্ব্যতীত খুরাপীড়াতে পায়ে ও মুখে এক প্রকার ঘা হয়।

ঘা চিকিৎসা।—ইহার আয়তন, শরীরের স্থান বিশেষ এবং গভীরত্ব ইত্যাদি অনুসারে ও পোকাযুক্ত পচাধরা বিষাক্ত (Septic) ইত্যাদি ভেদে বিশেষ চিকিৎসা প্রয়োজন। তবে মোটামুটি কতকগুলি নিয়ম সমস্ত ঘা চিকিৎসাতেই প্রযোজ্য। যথা—

প্রথমতঃ ঘা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া সুসিদ্ধ ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লইবে। গায়ে আলগা ময়লা বা কোন প্রকার বাজে জিনিষ থাকিলে (কুটাকাটা ইত্যাদি) উঠাইয়া ফেলিবে। নিম পাতা সিদ্ধ জল ছাঁকিয়া লইয়া ঘা ধোয়াইতে পারা যায়। যদি বিশেষ রক্তস্রাব যুক্ত হয় তবে যথেষ্ট পরিমাণ তুলা বা পরিষ্কার নেকড়া দ্বারা চাপ দিয়া রক্ত বন্ধ করিবে। সহজে বন্ধ না হইলে গেঁদা ফুলের পাতার রস দিবে বা ডাক্তারী টিংচারষ্টীল পাইলে লাগাইবে—অন্যথায় ডাক্তার দেখাইবে। পরে যাহাতে দূষিত না হইতে পারে বা পঁচা না লাগিতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। ঘায়ে যেন মাছি না বসে। পাওয়া গেলে টিংচার আইওডিন তুলা দ্বারা লাগাইবে এবং পট্টিদ্বারা বাঁধিয়া দিবে। সর্ব্বতোভাবে বিশ্রামে রাখিতে পারিলে ও ঔষধ যথানিয়মে লাগাইয়া রাখিতে পারিলে শীঘ্র আরাম করা যায়।

গরু সাধারণতঃ নিকটস্থ দেওয়াল খুঁটি ইত্যাদিতে ঘসিয়া ঘা শুকাইতে দেয় না এবং পোকার যন্ত্রণায়ও অনেক সময় শুকাইতে দেরী হয়। এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা

আবশ্যক। ঘসিয়া ফেলিলে বা পেছনের পা দ্বারা চুলকাইলে গলায় একটা বাঁশের মালা পরাইয়া দিবে। ঘায়ে আলগা চামড়া বা মাংস পেশীর অংশ সুতার মত ঝুলিয়া থাকিলে পরিষ্কার কাঁচি দ্বারা তাহা কাটিয়া ফেলিবে। সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে যেন ঘায়ের উপরিভাগ গোলাপী লালবর্ণ ও ক্ষুদ্র রেণুকাযুক্ত থাকে। ইহাই শুখাইবার লক্ষণ। সাদা বা অতিরিক্ত লালবর্ণ যুক্ত বা মাংস বৃদ্ধিযুক্ত থাকিলে খারাপ হইতেছে বুঝিতে হইবে। বেশী উঁচা মাংসখণ্ড দেখিলে উহা তুঁতিয়া ঘসিয়া সমান করিয়া দিবে।

অবস্থা ভেদে উহা কারবলি তৈল, তারপিন মিশ্রিত তৈল বা নিমপাতা তিলতৈলে ভাজিয়া সেই তৈল ঘায়ে লাগাইতে হইবে। কাঁটা বা পেরেকবিদ্ধ ও অন্য প্রকারের সরু মুখ বিশিষ্ট ঘায়ের গভীরতা প্রথমে সাবধানে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিবে এবং যাহাতে ভিতরের পুঁজ ও ময়লা ইত্যাদি সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে সেই ব্যবস্থা করিবে। আবশ্যক হইলে ঘায়ের মুখটা চিরিয়া বাড়াইয়া দিবে। অন্যথায় ভিতরে পুঁজ জমিয়া নালী হইতে পারে। ভিতরের অবস্থা পরীক্ষা করিতে কোন ভোতা শলাকা আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইবে। যদি তাহাতে রক্তের চিহ্ন থাকে তবে ঘা ভাল আছে বুঝিবে। আর সাদা রেণুর মত স্রাবযুক্ত হইলে ভিতরে পচা ধরিতেছে বুঝিবে। পিচকারী দ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া এক টুকরা সরু নেকড়াতে টিংচার আইওডিন, কার্ব্বলিক তৈল বা তারপিন মিশ্রিত তৈল মাখাইয়া এক অংশ ভিতরে দিবে ও এক অংশ ক্ষত স্থানের মুখে রাখিবে যেন সহজে টানিয়া বাহির করা যায়।

ঘায়ের চতুষ্পার্শে ফুলা থাকিলে গরম জলের শেক বা নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা বারংবার ধৌত করিবে। পোকাযুক্ত ঘায়ে বিশুদ্ধ তারপিন বা নোনা পাতার রস ২.৩ দিন দিবে, পরে পোকা মরিয়া গেলে পিচকারী দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া কার্ব্বলিক তৈল ইত্যাদি সাধারণ ঘায়ের মত চিকিৎসা করিবে। চক্ষু ইত্যাদি নরম স্থানের নিকট তারপিন দিবে না। কুকুর শৃগাল প্রভৃতির দংশন জনিত সত্ত ঘা তৎক্ষণাৎ ষ্ট্রং কার্ব্বলিক এসিড নাইট্রিক এসিড, পটাশ পারমেঙ্গেনাশ, আয়রেন টাইন নাইট্রাশ ইত্যাদি কষ্টিক দ্বারা অথবা উত্তপ্ত লোহ শলাকার দ্বারা উত্তমরূপে পোড়াইয়া দিবে। সর্পদংশন জনিত ঘায়ের মুখ চিরিয়া পটাশ পার ম্যাঙ্গেনাশ লাগাইবে ও উপরে তাগা বাঁধিয়া দিবে।

যোয়ালির সংঘর্ষে একপ্রকার স্ফোতন ঘা হইয়া থাকে। তাহা প্রায়ই অযত্নে একপ্রকার শুষ্ক ও শক্ত পরদাযুক্ত হইয়া সহজে শুকায় না। কখনও বা ছোট ছোট গুটুলির মত গঠিত হয়। কখনও বা দাঁদের মত চুলকানিযুক্ত হয়। এই প্রকারে ঘা টিংচার আইওডিন দ্বারা বেশ শুকাইয়া যায়। অন্যথায় অক্সাইড্ অব্ জিঙ্ক ও বোরিক এসিড সমভাগ লইয়া ৮ গুণ পরিমাণ ভেজলিন বা চর্ব্বি সহ মলম করিয়া লাগাইবে। ঘা লালবর্ণযুক্ত ও পরিষ্কার থাকিলে কাঠকয়লা চূর্ণ সহ এক চতুর্থাংশ মাত্রায় ফিটকিরি চূর্ণ মিলাইয়া লাগাইলে ভাল হয়। গুটলি থাকিলে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক। সত্ত জ্বালিগেরর ঘা প্রথম অবস্থাতেই নেকড়া পোড়া ছাই দ্বারা বাঁধিয়া দিলে বেশ সহজে শুকায়। যদি ভিতরের হাড় না ভাঙ্গে—কেবল উপরের শক্ত আবরণ

উঠিয়া যায়—তবে পাটের আঁশ আলকাতরা সহ জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে সহজে সারে। অন্যথায় বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

হঠাৎ পড়িয়া গিয়া কোন স্থানে থেৎলাইয়া গেলে ঠাণ্ডাজলের ধারা অনবরত ২৪ ঘণ্টাকাল লাগাইবে। সম্ভব হইলে কিছু টিংচার আর্ণিকা ঐ জলে মিশাইয়া লইবে। পরে কাঠ কয়লা ও ফিটকারী চূর্ণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সুবিধাজনক ঔষধ না পাওয়া গেলে নূতন, পুরাতন, সমতল, গভীর সমস্ত প্রকার ঘা ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা করিয়া (২০ ভাগ জল ১ ভাগ লবণ) মিশাইয়া ধোয়াইয়া দিবে। ইহা পূঁজ যুক্ত পুরাতন ঘায়ে বিশেষ উপকারী।

জাল, জুয়াচুরী ও প্রতারণার কাহিনী

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঠগ এবং জুয়াচোরেরা নানারূপ ফাঁদ পাতিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে এ দেশেও এই জাতীয় লোকের অভাব নাই। কেমন করিয়া ঠগেরা সরল চিত্ত লোক দিগকে ঠকাইয়া তাহাদের বিত্ত অপহরণ করে, আমরা এখানে আজ তাহার কয়েকটী বিবরণ প্রদান করিলাম। এই সকল প্রতারণার কাহিনী পাঠ করিলে জন সাধারণ ঠগীদিগের ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে পরিচিত হইতে পারিবেন এবং ইহাদিগের মায়াজাল হইতে সাবধান হইতে পারিবেন। ঘটনাগুলি সবই সত্য এবং বিভিন্ন সংবাদ পত্রাদি হইতে সঙ্কলিত।

ডাক্তারের নোট ডবল করা।

চট্টগ্রাম হাট হাজারী থানার ক্ষীরোদ চন্দ্র নাথ ডাক্তারী ব্যবসা করিত। ঐ থানার ফতেয়াবাদ গ্রামের আবদুল আজিজের একটী ছেলের অসুখ হওয়ায় সে ঐ ক্ষীরোদ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। ডাক্তার যথারীতি ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করতঃ আবদুল আজিজকে কথা প্রসঙ্গে বলে, তুমি যদি

আমাকে ১০৲ টাকার একখানা নোট দিতে পার আমি এখনই উহা ডবল করিয়া দিতে পারি। আবদুল এক খানা ১০ টাকার নোট বাহির করিয়া ডাক্তারের হাতে দেয়। ডাক্তার ঐ নোট হাতে করিয়া ফুৎকার ইত্যাদি দিয়া তখনই দুই খানা ১০ টাকার নোট বাহির করিয়া আবদুল আজিজের হাতে দেয়। আবদুল আজিজ তাহাতে একেবারে বিস্মিত হইয়া যায়। কয়েক দিন পরে হঠাৎ আর এক দিন ডাক্তার আবদুল আজিজের বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে বলে, নোট ডবল করিবার যে সমস্ত ঔষধ তাহার কাছে ছিল, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। যে সামান্য ঔষধ আছে, তাহাতে ১০০ টাকার ৩ খানি মাত্র নোটকে ডবল করা যাইতে পারে, সুতরাং এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় নষ্ট করিবার নয়। ডাক্তার তাহাকে যে কোন উপায়ে ১০০ টাকার ৩খানা নোট সংগ্রহ করিয়া দিতে বলে। সে হ্যাণ্ডনোট দিয়া ধার করিয়া প্রতিবেশী প্রসন্ন মহাজনের নিকট হইতে ১০০ টাকার তিন খানা নোট আনিয়া ডাক্তারের হাতে দেয়। ডাক্তার সেই নোট অন্য কতকগুলা বাজে কাগজের সঙ্গে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে করিতে নোটগুলি লুকাইয়া ফেলে। ঐ বাজে কাগজগুলো ভাজ করিয়া একটি বাঁশের চুঙার মধ্যে ভরিয়া দেয় এবং ঐ চুঙাটি আবদুল আজিজের ঘরের ভিতর মাটিতে পুতিয়া তিন দিন পরে উঠাইয়া দিবে বলিয়া প্রস্থান করে। কিন্তু ৩ দিন পরে ডাক্তার আসিল না দেখিয়া সে ডাক্তারের বাড়ীতে যায়। তখন ডাক্তার তাহাকে বলে, ওষধ আদেশ হইয়াছে দশ দিন পরে চুঙা উঠাইতে হইবে। কিন্তু ৬ দিন পরেও ডাক্তার আসিল না দেখিয়া সে নিজেই চুঙাটি উঠাইয়া দেখে যে উহার মধ্যে নোট নাই কেবল কতকগুলা বাজে কাগজ রহিয়াছে। তখন সে এই ঘটনা প্রতিবেশীদিগকে জানায় এবং ফৌজদারী কোর্টে নালিশ ডাক্তারের জুয়াচুরী সম্বন্ধে মকদ্দমা দেয়। বিচারক ডাক্তারের এই জুয়াচুরির বিচার করিয়া তাহার প্রতি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ও এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এইরূপ নোট ডবল করার কাহিনী প্রায়ই সংবাদপত্রে পড়া যায়, তবুও লোকে সাবধান হয় না।

গহনা চুরীর নূতন ফন্দী

দিল্লীর পুলিশ এক অভিনব চুরির বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, একব্যক্তি জনৈকা ব্রাহ্মণ মহিলার বাড়ীতে যাইয়া বলে, তাহার মনিবের বাড়ীতে পূজা, তাঁহাকে পৌরহিত্য করিতে তথায় যাইতে হইবে। মহিলাটি ইহাতে সম্মত হন, এবং তাঁহার অলঙ্কারগুলি পরিয়া রওনা হন। লোকটি তাঁহাকে অলঙ্কারগুলি পরিতে মানা করে; বলে, তাহা হইলে তাহার মনিব মহিলাটিকে ধনী মনে করিয়া উপযুক্ত দক্ষিণা দিবে না। তাহার কথা শুনিয়া মহিলাটি তাঁহার সমস্ত গহনা খুলিয়া বাক্সের মধ্যে পুরিয়া লোকটির সঙ্গে রওনা হন। লোকটি তাহার মনিবের বাড়ীতে পৌঁছিয়াই মহিলার গৃহে ফিরিয়া আসে এবং তাহার সমস্ত গহনা লইয়া চম্পট দেয়।

ট্রেণের যাত্রীকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা

ঈশ্বরদী ষ্টেশনের গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ গুলু ছলিয়া নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, সে নাকি ট্রেণের যাত্রীকে প্রায়ই বিষ-প্রয়োগ করিয়া থাকে। আবদুলাপুর ও মালদা ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে ১১নং আপ শ্যা...

ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী গাড়ীর জনৈক ব্যক্তিকে পায়ের সহিত ধুতুরার বীচি দিয়া খখন খাইতে দিতেছিল, তখন সে ধরা পড়ে।

আড়ম্বর করিয়া প্রবঞ্চনা

অমূল্য শঙ্কর সেন এবং অপর ১২ জন ব্যক্তি প্রবঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। হাই কোর্ট সেসনে এই মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। আসামীগণ নিজদিগকে নির্দোষ বলে এবং কোর্টের কৃপাভিক্ষা করে; বিচারপতি আসামীগণকে প্রথম অপরাধী বলিয়া গণ্য করেন ও অমূল্য শঙ্কর সেন প্রমুখ ১০ জন আসামীর প্রত্যেককে ৩ বৎসরের সচ্চরিত্রতার কড়ারে ১০০০ টাকার দুইখানা করিয়া জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ করেন। হবিবর রহমান ১ দিনের কারাদণ্ড ও ২০০ টাকার অর্থ দণ্ড অন্যথায় ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অপর দুইজন আসামী শশাঙ্ক রায় চৌধুরী ও শম্ভু ব্যানার্জ্জি নিজদিগকে নির্দোষ বলে। সরকার পক্ষও উহাদের উপর হইতে অভিযোগ তুলিয়া লওয়ায় তাহারা উভয়ে মুক্তি লাভ করে। ইহাদের মধ্যে একজন আসামী রাজা এবং অপরে তাহার ম্যানেজার সাজিয়া ৬৩নং আপার সার্কুলার রোডের একখানা বাড়ীতে নিজেদের আড্ডা লয়। বাড়ীর অতিমাত্রায় চাকচিক্য দ্বারা সুসজ্জিত এক খানা ঘরে বিভিন্ন বড় বড় কারবারী লোকদিগকে কারবার এবং ব্যবসায়ের লোভ দেখাইয়া লইয়া যাইত এবং রাজা বাবু একজন অতি মাত্রায় বে-হিসাবী ও অমিতব্যয়ী লোক এই ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিত। এই সময়ে এক-জন খেলোয়াড়ের প্রাদুর্ভাব হইত। সে রাজা বাবুর সহিত তাসের জুয়া খেলিতে বসিয়া যাইত, খেলায় রাজা ভীষণ ভাবে হারিয়া যাইত। ইহার পর নবাগতকে কারবারের চরম চুক্তির জন্য বেশী করিয়া টাকা লইয়া আসিতে বলিত। নির্দিষ্ট দিনে উক্ত ব্যবসায়ী বড় কারবারের লোভে মোটা টাকা লইয়া যাইত। তথায় রাজা তাহাকে তাহার সহিত সেই জুয়া খেলিতে প্ররোচিত করিত। প্রথম দুইবার রাজা ভীষণ ভাবে হারিত। আর পরের বারে নবাগতের যথাসর্ব্বস যাইত। ইহার পর আসামীগণ তাহাকে দিয়া লেখাইয়া লইত যে, সে স্বেচ্ছায় জুয়া খেলিয়া সমস্ত হারাইয়াছে।

স্বামী-স্ত্রী একজোটে

শশিভূষণ ও কাঞ্চনমণি নামে দুইটী লোককে গোপী রায় লেনের খগেন্দ্রনাথ রায় ১৪০ টাকা প্রবঞ্চনার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছে। প্রকাশ যে, আসামী কোন পূজার জন্য উক্ত খগেন্দ্র নাথ রায়ের বাসায় গমন করে। তথায় খগেন্দ্রের শিশু পুত্রকে অতি মাত্রায় রুগ্ন দেখিয়া সে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারে যে, ছেলেটী অনেকদিন হয় ভুগিতেছে এবং বহু চিকিৎসায়ও আরোগ্য হইতেছে না। আসামী তখন বলে যে, সে একটী সন্ন্যাসিনীর খোঁজ জানে, তিনি খোসখারা বালকটীর রোগ আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন। পরদিন আসামী গেরুয়া বস্ত্র পরিহিতা কাঞ্চনকে ঐ বাড়ী লইয়া যায়। কাঞ্চন ছেলেটিকে দেখিয়া একটী ঘরে যোগে বসে। কিছুকাল পরে সে ধ্যানস্থ অবস্থায়ই বলে যে, নিকটস্থ ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটী শাঁক আছে। ২৫০ দিয়া ঐ শাঁকটী আনিলে বালকের রোগ আরোগ্য হইবে। ফরিয়াদী তখন ১ম আসামীকে শাঁকটী আনিবার জন্য ১৪০ টাকা দেন এবং বাকী টাকা পরে দিবেন বলেন। টাকা পাইবার পর কাঞ্চন ও ১ম আসামী উভয়েই কোথায় সরিয়া পড়ে। ঐ দিনই বৈকাল

বেলা ১ম আসামী আসিয়া করিয়াদীকে বলে যে, বাকী টাকা এখনই না দিলে শাঁকটী পাওয়া যাইবে না। এই কথায় করিয়াদীর সন্দেহ হয়। তিনি তখনই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ তদন্ত করিয়া জানিতে পারে যে, দ্বিতীয় আসামীটি প্রথম আসামীরই স্ত্রী এবং উহারা ঐ ভাবে বহু লোককে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। আসামীদ্বয় বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

অদ্ভুত নূতন চুরি

১। একটী বৃদ্ধা মুদির দোকানে আসিয়া বলিল, "আমার এক পাউণ্ড মাখন, আধ পাউণ্ড চা, এক পাউণ্ড চিনি ও এক পাউণ্ড পনির চাই" বৃদ্ধা সঙ্গে করিয়া একটী পাত্র আনিয়াছে। দোকানদার যেমন এক একটী দ্রব্য কাগজে মুড়িয়া বৃদ্ধার হাতে দিতে লাগিল বৃদ্ধা সে গুলিকে সেই পাত্রের মধ্যে রাখিতে লাগিল। সকলগুলি দেওয়া হইয়া গেলে বৃদ্ধা পাত্রটীর মুখে ঢাকনি আটীয়া দিয়া পয়সার জন্ত পকেটে হাত দিল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"এই যা! টাকার থলি যে বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছি। মহাশয়! আচ্ছা এই জিনিষ রহিল, আমি এখুনি টাকা আনিয়া দিতেছি।"

কিছুক্ষণ কাটীয়া গেল, কেহ পয়সা লইয়া ফিরিয়া আসিল না। দোকানদার তখন জিনিষ গুলি বাহির করিয়া লইবার জন্ত ঢাকুনীটি খুলিল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পাত্রের তলদেশ একেবারেই নাই। দোকানদার মাথায় হাত দিয়া বসিল।

২। একটী যুবক ক্ষিপ্রপদে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমাদের ঐ কেকটী চাই। অবিলম্বে ঐ কেকটী আর নোটের ভাঙানি ৯টী টাকা 'ক' নামক বিখ্যাত হোটেলে পাঠাইয়া দিন। —আমার দাঁড়াইবার সময় নাই, আমি চলিলাম। এই বলিয়াই ক্ষিপ্রপদে সে চলিয়া গেল, দোকানদার তাহার সাজ পোষাক দেখিয়া স্থির করিল, হোটেলের কোন কর্ম্মচারী হইবে। তখুনি একটি ভৃত্যের হাতে প্রার্থিত দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিল। ভৃত্য হোটেলের দরজায় পৌছিয়া দেখিল, সেই যুবক দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে। ভৃত্য নিকটে যাইতেই সে বিনা বাক্যে আগ্রহে তাহার হাত হইতে জিনিষ ও টাকার ভাঙানি লইয়া ভিতরে খাজাঞ্চির নিকট হইতে দাম লইতে বলিয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিল। ভৃত্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া খাজাঞ্চির নিকট মূল্যের কথা জানাইতে সে এই প্রকার কোন অর্ডার প্রেরণ অস্বীকার করিল। ভৃত্য তখন পূর্ব্বোক্ত যুবককে ডাকিয়া আনিতে বাহিরে আসিল। কিন্তু তখন সে যুবক অর্থ ও কেক্ লইয়া কোথায় কতদূর যে চলিয়া গিয়াছিল তাহার কোন ঠিকানা ছিল না। জানা গেল, সে কোন দিন সেই হোটেলের কর্ম্মচারীই ছিল না।

জাল সরকারী কর্ম্মচারী

১১ই আগষ্ট নোয়াখালীর প্রভাতচন্দ্র ভৌমিক নামক একজন ভদ্রবংশীয় যুবক কিরূপ অসৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহা প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু কানাইলাল ব্যানার্জ্জির এজলাসে একটী মামলায় প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত যুবকটীকে সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া নিজেকে মিথ্যা পরিচয় দান এবং প্রতারণার অভিযোগে ৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী নিজেকে একজন ইন্‌কম ট্যাক্স অফিসার পরিচয় দিয়া অনেক দাদন ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁহাদের আয়কর কমাইয়া দিবে এই প্রলোভন দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায় করে।

আসামী যখন জগৎপুর গ্রামে একজন মহাজনের বাড়ীতে উপস্থিত হয়, সেই সময়ে রামগঞ্জের পুলিশ কোন প্রকারে সংবাদ পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

আসামী নিজের দোষ স্বীকার করে এবং দারিদ্র্য ও কোন চাকুরী না পাওয়ার দরুণেই সে এই কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। হাকিম তাহাকে উপরোক্ত মত দণ্ড দিয়াছেন।

কয়লার খনির অবস্থা।

ভারতীয় কয়লার খনিগুলির অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। দেশীয় কয়লার কাটতি এত কমিয়া গিয়াছে যে, খনিতে খনিতে প্রচুর কয়লা জমা হইয়া রহিয়াছে। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের বিভিন্ন কয়লার খনির অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে পাঠকবর্গ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। খনি সমূহের প্রধান ইন্সপেক্টর কর্ত্তৃক প্রদত্ত সরকারী রিপোর্ট হইতে এই হিসাব সঙ্কলিত হইল :—

খনির নাম	উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ (টন হিসাবে)	বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত মালের পরিমাণ (টন হিসাবে)
আসাম	২৪৭৯৪	২৩১২৭
বেলুচিস্তান	১১২৬	১২৯১
বেঙ্গল রাণীগঞ্জ	৪২৯১১২	৪১৪৭২১
বিহার উড়িষ্যা		
রাণীগঞ্জ	৫৪৮৩৪	৫২৯৬১
ঝরিয়া	৭৫৪৮১১	৭২৩৬১৮
বকারো	১৪৪৪৭৮	১৪২৯২৫
গিরীডি	৫৭৮৯৫	৬১২৪৫
জয়ন্তী	৬৮৮	১৫২৬
ডেল্টানগঞ্জ (পালামৌ)	১৫৪	
হিঞ্জির রামপুর (সম্বল পুর)	২১১২	১৮০৮
করণপুরা	৩৫৬২০	৫৪২২৬
	১০৩১৫৯৩	১০১৮৩০৩
মধ্য প্রদেশ		
পেঞ্চভেলী (ছিন্দোয়ারা)	৫১০৩৬	৪৫৫৮১
চান্দা	১৪২২০	১২১৩৬
	৬৫২৫৬	৫৭৭১৭

পাঞ্জাব	৮৫২	৯১২
সর্ব্ব মোট	১৫৫৩৭৩৩	১৫১৬০৭৪

এই তো গেল মাত্র একটি মাসের হিসাব। এইরূপ প্রতি মাসে যদি খনিতে খনিতে কয়লা জমা হইতে থাকে, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কোটী কোটী টন মাল অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। প্রকৃত পক্ষে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্যাপার তাহাই হইতেছে। এদেশের খনির মালিক ও পরিচালকবৃন্দ নানাদিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। কয়লার বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক কোন প্রকারে টিকিয়া থাকাই অনেক কারবারীর পক্ষে দায় হইয়াছে। ভারতীয় কয়লার এই যে দুর্গতি —ইহার প্রকৃত কারণ কি ?

সকলেই জানেন যে এদেশে রেল ও জাহাজের ভাড়া এমনই ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, যাহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং ওয়েলসের কয়লা যে মাশুলে বা খরচায় এদেশে আনয়ন করা যায় সে খরচে বাঙ্গালার কয়লা বোম্বাইয়ে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয় না। তাহাদের মতে এই বৈষম্য মূলক ব্যবস্থাই ভারতের কয়লার বাণিজ্যকে দাবাইয়া রাখিয়াছে। একথা সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু এইটুকু বলিলেই সব সত্য কথা বলা হইল না। কয়লার ব্যবসা কেন মাথা তুলিতে পারিতেছে না তাহার মূলে আরও অনেক কথা আছে! তবে একথা সত্য যে প্রধানতঃ রেল ও জাহাজের অসুবিধাই ভারতীয় কয়লার বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রথমে রেলের কথাই ধরা যাক্। বিদেশী কয়লার সুবিধার জন্য যদি ভারতের রেল কোম্পানীগুলি, ভাড়ার হার কমাইয়া দিতেন এবং এদেশের কয়লার ভাড়া বৃদ্ধি করিতেন তাহা হইলে তাহাদিগকে কিছুতেই মার্জ্জনা করা যাইত না। ভারতীয় রেল কোম্পানীগুলি তো তাহা করেন নাই,—বরং ভারতীয় কয়লার ভাড়া বহু পূর্ব্বে যাহা ছিল নানা আন্দোলনের ফলে তাহা একটু হ্রাস করাই হইয়াছিল। তবে বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতীয় কয়লাকে দাঁড় করাইতে হইলে যতটুকু সাহায্য, সহানুভূতি এবং কয়লার মাশুল কমানো প্রয়োজন ততটা রেল কোম্পানী গুলি করেন নাই। তার পর আরও অভিযোগের কথা এই যে, সম্প্রতি ভারতের অনেক রেল পথই সরকার পক্ষের পরিচালনাধীনে আসিয়াছে; এবং সরকার নিজেই এই সব রেল পথের মালিক হইয়াছেন। প্রতি বৎসর এই সমস্ত রেল পথ হইতে ভারত সরকার কোটী কোটী টাকা লাভ করিতেছেন। এই লভ্যাংশের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়াও যদি ভারতীয় কয়লার বাণিজ্যকে দাঁড় করান সম্ভবপর হয় তাহা হইলে সে চেষ্টা করা সরকার পক্ষের কর্ত্তব্য নহে কি ?

আজ যদি শাসন কার্য্যের ভার দেশের নিজস্ব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের হাতে থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চই আইন করিয়া এদেশের বাজারে বিদেশী কয়লার আমদানী বন্ধ করিয়া দিতেন এবং বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে দেশী কয়লা যাহাতে স্থান পায় তাহার চেষ্টা করিতেন। বিদেশী শাসন সরকারের নিকট এতটা আশা করা বোধহয় সঙ্গত হইবে না।

অর্থাপি রেলের ভাড়া কমাইয়া দিয়া যে টুকু সাহায্য করা সম্ভবপর তাহা তো সরকার পক্ষ অনায়াসেই করিতে পারেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-গণের মনোযোগ এবিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা জোর করিলে সরকার পক্ষ বোধহয় রেলের ভাড়া হ্রাস করিতে রাজী না হইয়া পারিবেন না। এইখানে আর একটী বিষয়ও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ওয়েলস্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা এদেশে আসার পূর্ব্বে বাংলা দেশের কয়-লাই বোম্বাইয়ের ক্ষুধা নিবারণ করিত।

ভারতের অধিকাংশ কল কারখানাই বোম্বা-ইয়ে অবস্থিত; সুতরাং কয়লা খনির প্রায় বারো আনা মালই বোম্বাইয়ের কল ওয়ালারা নিত। এই কয়লা নেওয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শুধু যে কয়লার খনির মালিকেরাই মরিতে বসিয়াছে তাহা নহে। পরন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা রেলপথ বহিয়া বোম্বাই যাইত তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় রেল কোম্পানীরও বহু লক্ষ টাকা ভাঁড়ার বাবদ লোকসান হইতেছে। পূর্ব্বে এই সকল রেলপথ যখন প্রাইভেট কোম্পানী সমূহের ছিল, তখন তাহাদের এই ভাঁড়া নষ্ট হওয়ায় ক্ষতি বৃদ্ধিতে দেশের লোকের কিছুই যাইত আসিত না। কিন্তু এই সকল রেলপথ এখন State owned হইয়াছে। অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট নিজেই এখন এই সকল রেলপথের মালিক হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট মানেই দেশের জনসাধারণ; সুতরাং ওয়েলস এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সস্তায় কয়লা আমদানী হওয়ায় শুধু যে কয়লাওয়ালারাই মরিতে বসিয়াছে তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণ-মেণ্টের রেলের ভাড়া বাবদ বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে; অথচ রেলের freight বা মাশুল যে পরিমাণ কমাইয়া দিলে কয়লা খনির মালিক-গণ এই সকল বিদেশাগত কয়লার সহিত বোম্বাই-য়ের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারেন, সেই পরিমাণ ভাড়া কমাইয়া দিলে ভারতের কয়লার ব্যবসায়টীও রক্ষা হয় এবং গভর্ণমেণ্টও এক্ষণে ভাড়ার বাবদ যে টাকা ক্ষতি সহ্য করিতেছেন তাহা হইতে বাঁচিয়া যান। ওয়েলস এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশ হইতে বোম্বাইয়ে যে পরিমাণ কয়লা যাইত, তাহার অঙ্ক সরকারী দপ্তরখানা হইতেই সংগ্রহ করা যায়; এবং সেই মাল বোম্বাই পৌঁছা-ইয়া দিবার জন্য রেল কোম্পানী যে ভাড়া পাইতেন তাহাও সরকারী দপ্তর হইতে উদ্ধার করা কঠিন নহে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু Coal king উমেশ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যদি এই সকল statistics সংগ্রহ করতঃ মাইনিং ফেডারেশন্ হইতে সর-কারকে চাপিয়া ধরেন এবং এসেম্ব্লীর সভ্য-গণ চারিদিক হইতে কলরব করিয়া বলেন যে ভারতের কয়লাখনি গুলিকে রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের একটী শিল্পও বাঁচিবে না এবং এর জন্য যদি ভারতের রেলপথ গুলি আধা ভাড়াতেও বোম্বাইয়ে কয়লা পৌছাইয়া দেয়, তাহাতে দেশের লোক রাজী আছে তাহা হইলে মনে হয় সরকারের এই ঔদাসীন্য দূর হইতে পারে। তোমরা যখন নিজের জাত ভাইয়ের প্রেরিত কয়লার উপর আমদানী শুল্ক বসাইবে না, ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের চোখ রাঙানীর ভয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপরেও কোন আমদানী শুল্ক বসাইতে পারিবে না, তখন ভারত বাসীকে বাঁচিতে হইলে, সকল শিল্পের মূলাধার

কয়লা খনি গুলিকে রক্ষা করিবার জন্ত এই কয়লার মাশুল অত্যন্ত drastic রূপে কমানো চাই। তাহাতে যে ক্ষতি হইবে, দেশের লোককে বাধ্য হইয়া চোক, কান বুজিয়া সে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে।

তার পর জাহাজের ভাড়ার কথা—প্রকৃতপক্ষে এই জাহাজের সস্তা ভাড়াই ভারতীয় কয়লাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়েছে। কথাটা একটু বিশ্লেষণ করা দরকার; মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বহু সংখ্যক মালবাহী জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সময় এই সকল জাহাজ পৃথিবীর নানা দেশ হইতে অস্ত্র শস্ত্র, গোলা, বারুদ সৈনিকের পোষাক পরিচ্ছদ এবং রসদ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যখন ইউরোপের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল, মালবাহী জাহাজের সংখ্যা এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে, এগুলিকে কাজে লাগান আর সম্ভবপর হইতেছে না। এদিকে জাহাজের মালিকগণ লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিয়া এইসব জাহাজ তৈয়ার করিয়াছেন—তাঁহাদের এ সমস্ত অর্থই জলে পড়িল ভাবিয়া তাঁহারা আকুল হইলেন।

এই অবস্থায় কয়লার খনির মালিকদের সহিত তাঁহাদের একটা বোঝাপড়া হইল। জাহাজ পরিচালনার ব্যয় বাদে সামান্ত একটা লাভ লইয়া কয়লা বহন করিবেন বলিয়া বিদেশী জাহাজ কোম্পানী গুলি রাজী হইলেন। ইহাতে জাহাজের ভাড়া অপ্রত্যাশিতরূপে কমিয়া গেল। সেই সুযোগেই নেটাল ও ওয়েলসের কয়লা আসিয়া ভারতের বাজার দখল করিয়া ফেলিল।

১৯২৬ সালে ইংলণ্ডের কয়লার খনিতে সাধারণ ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। ইহার ফলে ১৯২৬-২৭ সালে গ্রেট বৃটেন হইতে খুব বেশী কয়লা বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। ১৯২৭-২৮ সালে কিন্তু বৃটিশ ব্যবসায়ীরা তাহার শোধ তুলিয়া লইয়াছেন। এই বৎসরে ৫৮½ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৬৩০০০ টন পরিমিত কয়লা ভারতের বাজারে আমদানী করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৬-১৯২৭ সালে কিন্তু ১৪২০০০ টনের বেশী বৃটিশ কয়লা এদেশে আসে নাই এবং সেই কয়লার দাম পড়িয়াছিল ৩১¾ লক্ষ টাকা মাত্র। ইহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে আমদানী কয়লার পরিমাণ শতকরা ৮৫ এবং মূল্যের পরিমাণ শতকরা ৮৬ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯২৬-২৭ সালে নেটাল হইতে ৮৬০০০ টন পরিমিত কয়লা ভারতের বাজারে আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্যবর্ষে তাহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া ১৫৫০০০ টনে দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া ১৯২৭-২৮ সালে গ্রেট বৃটেন হইতে ৫২০০০ টন, পর্ত্তুগীজ ইষ্ট আফ্রিকা হইতে ৩৫০০০ টন কয়লা এদেশে আমদানী হইয়াছে। তবে মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশে অষ্ট্রেলিয়ার কয়লার তেমন চাহিদা ছিল না—তথায় বাঙ্গলার কয়লাই অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জাহাজের সস্তা ভাড়ার সুযোগ হইতে বাঙ্গলার কয়লা এস্থলে বঞ্চিত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মালবাহী জাহাজের ভাড়া যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সেই সস্তা ভাড়ায় বাঙ্গলার কয়লা কলিকাতার বন্দর হইতে সোজাসুজি

মাদ্রাজ এবং রেঙ্গুন যাইতে পারে। কাজেই এই দুই স্থলে বিদেশী কয়লার সহিত প্রতিযোগিতা করা বাঙ্গলার কয়লার পক্ষে অনেকটা সম্ভবপর। বোম্বাইয়ের বাজারে কিন্তু তাহা সম্ভবপর হয় না,—কারণ রেলপথে বাঙ্গলা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত কয়লা প্রেরণ করিতে হইলে ভাড়া খুব বেশী লাগে। জাহাজ পথে কলিকাতার বন্দর হইতে মাদ্রাজ, টিউটিকোরিন, কন্যাকুমারী হইয়া সমস্ত ভারতের উপকূল ঘুরিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত পৌছিতে হইলে অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়। এই দীর্ঘ পথের ভাড়া দিয়া বাঙ্গলার কয়লা বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। ইহার ফলেই বিভিন্ন দেশের কয়লা আসিয়া তথায় আধিপত্য বিস্তার করে।

সাধারণতঃ কোন্ কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ কয়লা ভারতের বাজারে আমদানী হয় তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

দেশ	১৯২৬-২৭	১৯২৭—২৮
গ্রেট বৃটেন	১৩০০০ টন	৫২০০০ টন
নেটাল	৮৬০০০ টন	১৫৫০০০ টন
জাপান	১০০০ টন	৬০০০ টন
পর্ত্তুগীজ ইষ্ট আফ্রিকা	২৬০০০ টন	৩৫০০০ টন
অষ্ট্রেলিয়া	১৩০০০ টন	৯০০০ টন

মোটের উপর বোম্বাইয়ের বাজারে ১৯২৭-২৮ সালে বাঙ্গলা, ওয়েলস্ এবং নেটাল এই তিন দেশের কয়লা বিক্রয় হইয়াছে। গড়ে প্রতি টন কত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহার একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	বাঙ্গলা	ওয়েলস্	নেটাল
১৯২০	৩২ ৶৮	—	—
১৯২১	৩৩।০	৩৯।০	৪৬৲
১৯২২	৩৩॥০	৩১ ৴২	৩০॥৵০
১৯২৩	৩০ ॥৮	৩৬ ॥৶৪	২৭৶০
১৯২৪	২৮ ৸৶২	৩৪ ৵০	২৬৷০
১৯২৫	১৯ ।৵৩	২৯ ৶০	২১৸৶৩
১৯২৬	১৮ ॥৵	২৪ ।৵৫	১৯৴২
১৯২৭	২০ ৶০	২২ ॥৵১	১৮৸৶৯
১৯২৮	১৮ ।৴৪	২১ ॥৵১১	১৬॥৵১০

উপরোক্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, নেটালের কয়লা সর্ব্বদাই বাঙ্গলার কয়লা অপেক্ষা সস্তাদরে বোম্বাইয়ের বাজারে বিক্রয় হয়। জাহাজের সস্তা ভাড়াই ইহার প্রধান কারণ। তবে নেটালের কয়লা কিয়ৎ পরিমাণে সরকারী (Bounty) পাইয়া থাকে। ভারতের কয়লার পক্ষে সেই সুবিধা পাইবার উপায় আছে কি?

আর একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ওয়েলসের কয়লা বেশী মূল্যেও বিক্রয় হইয়া থাকে। রেলের বড় বড় উৎকৃষ্ট ইঞ্জিন, মেল গাড়ীর ইঞ্জিন প্রভৃতি চালাইবার জন্য উৎকৃষ্ট কয়লার প্রয়োজন। সেই শ্রেণীর কয়লা সাধারণতঃ এদেশের খনি সমূহে খুব বেশী পাওয়া যায় না। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার খনি হইতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট কয়লা উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা রেল কোম্পানীর চাহিদা মিটে না। তাই তাহারা ওয়েলসের কয়লা ক্রয় করিতে বাধ্য হন। ওয়েলসের কয়লা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই বেশী মূল্যেও ভারতের বাজারে ওয়েলসের কয়লা বিক্রয় হইয়া থাকে।

এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতের কয়লা

কিছু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। তবে এই রপ্তানীর পরিমাণ মোটেই সন্তোষ জনক নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, ১৯২৭-২৮ সালে মাত্র ৭৬ লক্ষ টাকা মূল্যে ৬৩১০০০ টন কয়লা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে কিন্তু ৮১ লক্ষ টাকা মূল্যে ৬৪৩০০০ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় যে, মূল্যের দিক দিয়া শতকরা ৬ এবং পরিমাণের দিক দিয়া শতকরা ২ হিসাবে কয়লার রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে।

উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল তাহার মধ্যে জাহাজ চালনার উপযোগী (Bunker) কয়লার হিসাব ধরা হয় নাই। ১৯২৭-২৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে এই শ্রেণীর কয়লা ১৩১৩০০০ টন বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে গিয়াছে ৮৮৬০০০ টন, বোম্বাই হইতে ১২৯০০০ টন, করাচী হইতে ১২৭০০০ টন. মাদ্রাজ হইতে ২৯০০০ টন এবং রেঙ্গুণ হইতে ১৪৩০০০ টন।

মোটের উপর ১৯২৭ সালে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে ২২০৮২০০০ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে হইয়াছিল—২০৯৯৯০০০ টন। আরও লক্ষ লক্ষ টন কয়লা এদেশের খনি হইতে উত্তোলিত হইতে পারে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে রপ্তানীর ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রধানতঃ সিংহল এবং ষ্ট্রেট সেটেলমেন্টই ভারতের কয়লা ক্রয় করিয়া থাকে। ১৯২৭-২৮ সালে ইহারা যথাক্রমে ৩৮৩০০০ টন এবং ১৫৮০০০টন কয়লা ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলোচ্য বর্ষে ২৬০০০ টন পরিমিত কয়লার একটি চালান চীন দেশের হংকং এ প্রেরিত হইয়াছে। এরূপ ভাবে চীনে কয়লা চালান দেওয়া ভারতের পক্ষে একরূপ নূতন উদ্যমই বলিতে হইবে। অবশ্য ১৯২৬ সালে যখন ইংলণ্ডের খনিতে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল তখনও ২০০০ টন কয়লার এক চালান চীন দেশে গিয়াছিল। চীন দেশে কয়লার একটা বড় বাজার রহিয়াছে এবং একা ইংরাজই তাহা দখল করিয়া আছেন। এই বিরাট বাজারটি দখল করিতে পারিলে ভারতীয় কয়লার ব্যবসায়ের বর্ত্তমান দুর্গতি ঘুচিতে পারে। কিন্তু তার জন্যে চাই জাহাজ—বাঙ্গালীর নিজস্ব জাহাজ। কবি দ্বিজুরায় বড় ক্ষোভেই গাহিয়াছেন—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণবপোত
ভ্রমিল ভারত সাগর ময়
সন্তান যার তিব্বত ও চীনে
জাপানে গড়িল উপনিবেশ
তার কি না এই ধূলায় আসন
তার কিনা এই ছিন্নবেশ !"—

বাংলা যেদিন সিংহল বিজয় করিয়াছিল, যাভা দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল সেদিন বাঙ্গালীর জাহাজ ছিল—অর্ণবপোত ছিল—ভারত মহাসাগরে পীত সাগরে, প্রশান্ত মহাসাগরে বাঙ্গালী লস্কর—বাঙ্গালী খালাসী "গাজী" "বদর বদর" রবে মহাসাগর হেলায় পাড়ি দিত। বাঙ্গালী আবার কি সত্য সত্যই সেই দিন ফিরাইয়া আনিতে চাও ? তবে জাহাজ গড়—জাহাজ গড়।

বিল্ব

বিল্বকে বাঙলায় বেল বলে। বেলের মত পবিত্র বৃক্ষ হিন্দুর নিকট আর নাই। বিশেষতঃ শৈব ও শাক্তদিগের নিকট। মহাশক্তির আবাহন বিল্বমূল ভিন্ন অন্যত্র সংসাধিত হয় না। শিবপূজার ও মহামায়ার পূজায় সচন্দন বিল্বপত্রই প্রধান উপাদান।

ঔষধার্থেও ইহার ফল, পত্র, ত্বক ও মূল ব্যবহৃত হয়।

বেল ধারক, অগ্নিদীপক, আমের পাচক, কটুকষায়, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ, বায়ু ও কফ নাশক।

চরক মতে,—

জর রোগীর মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হইলে ক্ষীর পরিভাষানুসারে পক্ক বেল শুঁঠের কাথ পান করাইলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

অর্শরোগী বলির শূলে কাতর হইলে ঈষৎ উষ্ণ বিল্বমূলের কাথ বসাইয়া রাখিলে যন্ত্রণা দূর হয়।

চক্রদত্ত মতে—

১। অতিরিক্ত ঘাম হইয়া যাহার শরীরে দুর্গন্ধ হয়, বিল্বপত্ররস তাহার গাত্রে মর্দ্দন করিলে সেই দুর্গন্ধ দূর হয়।

২। গ্রহণীরোগাক্রান্ত রোগীকে বেলশুঁঠ চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুন্ঠীচূর্ণ পুরাতন ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিতে দিবে এবং তৎপরে ঘোল পান করিতে দিবে।

৩। বিল্বমূলত্বকের কাথ শীতল করিয়া তাহাতে মধু দিয়া পান করিলে বমন প্রশমিত হয়।

৪। বেলশুঁঠের কাথ সেবন করাইলে রক্তার্শ রোগ আরোগ্য হয়।

৫। বিল্বপত্রের রস মরিচচূর্ণ সহ পান করিলে শোথ আরোগ্য হয়।

৬। বেলশুঁঠ গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক তৎকল্ক এবং ছাগদুগ্ধসহ যথাবিধি তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিলে বধিরতা দূর হয়।

কাঞ্জিকা সহ বিল্ব পানে অগ্নিবৃদ্ধি করে, হৃদ্য রুচিকর এবং আমবাত বিনাশ করে।

ভাবপ্রকাশ মতে—

কাঁচা বেল পোড়াইয়া গুড়ের সহিত খাইলে আমাতিসার আরোগ্য হয় এবং কুক্ষিরোগ বিনষ্ট করে।

সুশ্রুত মতে—

১। অপস্মারাক্রান্ত শিশুকে বিল্ব কণ্টকের মালা ধারণ করাইলে আরোগ্য হয়।

২। বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু চাউলের জলে পেষণ করিয়া চিনি ও মধুযোগে পান করিলে পিত্তরক্তোত্থিত অতিসার আরোগ্য হয়।

বঙ্গসেন মতে—

বিল্বমূল ত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত চিনি ও খৈচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন ও অতিসার আরোগ্য হয়।

বিল্বমূলে ত্রিদোষ নাশ করে,—মধুর, লঘু ও বাত নাশ করে। ইহার পত্রে কফ, বাত শূল নাশ করে, এই পত্র রুচিকর ও গ্রাহী। বিল্ব-পুষ্পে অতিসার, তৃষ্ণা ও বমি নাশ করে।

বিল্বমজ্জা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাতে বাত নাশ করে এবং তাহা উষ্ণ।

মুষ্টিযোগ :—

১। বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল ও গিনিয়ারি—ইহাদের কাথ বাতজ্বরে বিশেষ উপকারী। ইহা দীপন, বাত ও কফনাশক। ইহাকেই বৃহৎ পঞ্চমূল বলে।

২। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর—ইহাদের কাথে বাত ও পিত্ত নাশ হয়।

৩। দশমূল, চিরতা, মুথা, শুলঞ্চ ও শুঁঠের কাথ পান করিলে সন্নিপাত জ্বরে উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কার আবশ্যক হইলে উহাতে তেউড়িচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে।

৪। বেলপাতার রস গোলমরিচ চূর্ণসহ কামলা রোগে ব্যবহার্য্য।

৫। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মুথা ও আতিস—ইহাদের কাথ সেবনে পিত্তাতিসার আরোগ্য হয়।

৬। বেলপাতার রস মধুসহ সেবন করিলে অম্ল নাশ করে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।

বিল্ব তৈল প্রস্তুত প্রণালী—

বেলশুঁঠ—১০০ পল, জল,—৬৪ সের সহ পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং, তিলতৈল ৪সের, দুগ্ধ ৪সের, ধাইফুল, কুড়, শুঁঠ, রাস্না, পুনর্ণবা, দেবদারু, বচ, মুথা, লোধ ও মোষরস প্রত্যেকটী ৩সের দিয়া তৈল পাক করিতে হয়।

ডাক্তারী মতে—

১। যাঁহাদের প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহাদের পক্ষে সুপক্ক বেল বিশেষ উপকারী।

২। পাকা বেলের পানা গ্রহণীরোগে উপকারী।

৩। বেলের মোরব্বা—অতিসার ও রক্তাতিসারের মহৎ ঔষধ।

৪। বেলপাতার রস—পিত্ত ও অম্লনাশক।

৫। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় প্রত্যহ বেলের পানা সেবনে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না।

৬। ইহা সেবনে অর্শরোগ উপশম হয়। এমন কি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়।

৭। বেল খাইয়া জলপান নিষিদ্ধ।

৮। পুরাতন জ্বরে বেল নিষিদ্ধ।

বেলের সরবৎ—

কাঁচা বেল কুটিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে মিছরি মিশাইয়া পাক করিলে সরবৎ প্রস্তুত হয়। ইহা বলকারী ও পেটের বিশেষ উপকারী।

গন্ধবণিক

পাটের Final Forecast বা

সর্ব্বশেষ পূর্ব্বাভাষ

আসাম বঙ্গ ও বিহারের আনুমাণিক উৎপন্নের পরিমাণ

আসাম, বঙ্গ ও বিহারের কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক ১৯২৯ সালের পাটের সর্ব্বশেষ পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল :—

১৯২৯ সালে আসাম, বঙ্গ ও বিহারে সর্ব্ব সমেৎ ৩৩১৬৬০৫ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ১৯২৮ সালে যত একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়,—আলোচ্য বর্ষে মোটের উপর ১৭২২০৫ একর বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। কেহ কেহ পাটের চাষ হ্রাসের আন্দোলন চালাইয়া ছিলেন। ইহাতে কোন ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় হয় না।

আসাম, বঙ্গ এবং বিহারের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টরগণ মনে করেন যে, ১৯২৯ সালে ৯১৬৭২৭০ গাইট পাট উৎপন্ন হইবে। ১৯২৮ সালে যে পরিমাণ পাট উৎপাদিত হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়,—এবার মোটের উপর ১৮৮৯৩০ গাইট পাট কম উৎপন্ন হইবে। নিম্নে ১৯২৮ সাল এবং ১৯২৯ সালের তুলনা মূলক একটি তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশের নাম	একর হিসাবে জমির পরিমাণ			গাইট হিসাবে পাটের পরিমাণ		
	১৯২৮	১৯২৯	দুই বৎসরের তারতম্য	১৯২৮	১৯২৯	দুই বৎসরের তারতম্য
বাঙ্গলা (কুচবিহার ও স্বাধীন ত্রিপুরার সহিত)...	২১০২৩০০	২৯৪৬৭০৫	+২৪৪৪০৫	৮৫৮৯০০০	৮৭২৯৫৭০	+১৪০৫৭০
বিহার উড়িষ্যা	২৪৭০০০	২৩১৪০০	--১৫৬০০	৭৪৩০০০	৭২৫০০০	--১৮০০০
আসাম......	১৯৫১০০	১৩৮৫০০	-৫৬৬০০	৬২৪২০০	৩১২৭০০	—৩১১৫০০
মোট	৩১৪৪৪০০	৩৩১৬৬০৫	+১৭২২০৫	৯৯৫৬২০০	৯৭৬৭২৭০	—১৮৮৯৩০

দ্রষ্টব্য ঃ—১৯২৮ সালে এবং ১৯২৯ সালে বিহার ও উড়িষ্যার উৎপন্নের সে সংখ্যা দেওয়া হইল তাহার মধ্যে নেপালের উৎপন্ন পাটও ধরা হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশের বিস্তৃত বিবরণ

১৯১৭-২৮ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় লইয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে যত পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহার শত করা ৮৬'১ ভাগই বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১৯২৯ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গলার আবহাওয়া পাট চাষের পক্ষের অনুকূলই ছিল। তবে উত্তর বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থানে একটু জলাভাব হইয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসে বারিপাত হওয়ায় এই অভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত হয়।

পূর্ব্ব বঙ্গে উৎপন্নের পরিমাণ মন্দ হইবে না। তবে বন্যার ফলে ময়মনসিং ও ত্রিপুরা জেলায় পাট ক্ষেতের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। কেহ কেহ অকালে পাট কাটিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে আশানুরূপ পাট পাওয়া যাইবে না। অন্যান্য সকল জেলায়ই মোটের উপর উৎপন্নের পরিমাণ সন্তোষজনক।

১৯২৮ সালে বাঙ্গলা দেশে ২১০২৩০০ একর পরিমিত জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর আশা করেন যে, বিভিন্ন বিভাগের জমিতে প্রতি একরে গড়ে নিম্নলিখিত হারে পাট উৎপন্ন হইবে :—

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ	৩'৭ গাইট
রাজসাহী বিভাগ	৩'৫ „
প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ	৩'২ „

এই হিসাবে বর্ত্তমান বৎসরে ৮৭২৯৫৭০ গাইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯২৮ সালে কিন্তু ৮৫৮৯০০০ গাইটের বেশী পাট বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হয় নাই। ইহাতে দেখা যায় যে, ১৯২৯ সালে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৪০৫৭০ গাইট পাট বেশী উৎপন্ন হইবে। কোন জিলায় কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইতে পারে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

জেলা	কত একর	কত গাইট	মন্তব্য
২৪শ পরগণা	৬৮০০০	১৮৮৭৩০	আবহাওয়া ভাল ছিল বলিয়া কৃষি ভাল হইয়াছে।

জেলা	কত একর	কত গাইট	মন্তব্য
নদীয়া—	৬৩৭০০	১৭৮৬৬০	দুইবার হিসাব লওয়া হইয়াছে। পতঙ্গের উপদ্রবে কৃষির কিছু ক্ষতি হইয়াছে। যথেষ্ট বৃষ্টি না হওয়ায় পাট ভিজাইবার সময় অসুবিধা হইয়াছে।
মুর্শিদাবাদ	৩৩০৯০	১১০৮৮০	......
যশোহর	১০০০০০	৩২০০০০	......
খুলনা	৩২০০০	১০৫৪৫০	.. ...
বর্দ্ধমান	৩০০০	৯২১৬	......
মেদিনীপুর	৭৪২২	২১২২৬	দুইবার হিসাব লওয়া হইয়াছে।
হুগলী	২৭৫০০	৮৫২৫০	জুলাই মাসের মধ্যভাগ হইতে আবহাওয়া পাটের পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল। আরামবাগ অঞ্চলে আন্দাজ তিন আনা পাট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।
হাওড়া	৬৭০০	৮৫২৫৯	জুলাই মাসের পর হইতে আবহাওয়া অনুকূল হইয়াছিল।

জেলা	কত একর	কত গাইট	মন্তব্য
রাজসাহী	৯৬৬০০	২৬৮৬৩২	পাট কাটিয়া ভিজাইবার সময় কিছু অসুবিধা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পতঙ্গের উপদ্রব দেখা দিয়াছিল।
দিনাজপুর	৭১০০৮	২৩৭১৪৯	......
জলপাইগুড়ী	৪২০ ০	১০৫০০০	বীজ বুনিবার সময় অনিয়মে বারিপাত হইয়াছিল। ইহাতে কিছু ক্ষতি হইয়াছে। তারপর পাট ভিজাইবার সময়ও কতকটা অসুবিধা হইয়াছে।
দার্জ্জিলিং	৩৫০০	১৩১০৭	সময় মত বারিপাত হইয়াছিল এবং সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করা হইয়াছিল বলিয়া উৎপন্নের পরিমাণ একটু বেশী হইয়াছে।

জেলা	কত একর	কত গাইট	মন্তব্য
রংপুর	৩২০০০০	৯৮৫১৮১	যথেষ্ট বৃষ্টি না হওয়ায় পাট ভিজাইতে ও পরিষ্কার করিতে দেরী হইয়াছে।
বগুড়া	১০০০০০	২৮০০০০	কোন কোন থানায় বন্যার ফলে কথঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে।
পাবনা	১৫৫০০০	৪৬৪০০০	উচ্চ ভূমিতে পতঙ্গের উপদ্রবে কিছু ক্ষতি হইয়াছে। নিম্নভূমিতে জুন মাসের বন্যায় কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে।
মালদহ	৩৮০০০	৬৬০০০	......
ঢাকা	৩৪৭০০০	১০৪১০০০	প্রথম দিকে বন্যা ও পতঙ্গের উপদ্রব হইয়াছিল। শেষ দিকে আবার কোন কোন স্থলে জলাভাব দেখাদেয়। ইহার ফলে উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।
ময়মনসিং	৬৯০০০০	১৯৩২০০০	চাষের সময়ে অতিরিক্ত বারিপাত এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা মহকুমায় বন্যার দ্বারা পাট চাষের ক্ষতি হইয়াছে।
ফরিদপুর	৩০০০০০	৯৯০০০০	উচ্চভূমির পাট জলাভাবে ভিজানের সময় বিস্তর অসুবিধা হইয়াছে
বাখরগঞ্জ	৫০০০০	১৬৯৯৭৭	......
চট্টগ্রাম	৩০০	১১০০	দুইবার হিসাব লওয়া হইয়াছে। এখানে কেবল নিজ নিজ প্রয়োজনের জন্যই পাটের চাষ হয়।
ত্রিপুরা	৮০০০০০	৮৭০০০০	বন্যার ফলে চাষের ক্ষতি হইয়াছে। বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় উৎপন্নের পরিমাণ কম হইয়াছে।
নোয়াখালী	৬২০০০	১৮৬০০০	.. ...
বাং মোট	২৯১৩৭২২	৮৬৫৬৮৩৯	......
কুচবিহার	৩০১০০	৬৯৫৩১	......
ত্রিপুরা রাজ্য	২৮৮৩	৩২০০	দুইবার হিসাব লওয়া হইয়াছে।
সর্ব্বমোট	২৯৪৩৭০৫	৮৭২৯৫৭০	

বিহার ও উড়িষ্যার বিবরণ

১৯২৭-২৮ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড় লইয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৮'০ ভাগ পাট বিহার ও উড়িষ্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রদেশের ৭টি জেলায়ই প্রধানতঃ পাটের চাষ হয়। এই সাতটি জেলায় এবার ১৯৫৭০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। অন্যান্য জেলায়ও কিছু কিছু পাটের চাষ হয়। ইহাতে এবার সর্ব্বমোট ২৩১৪০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ১৯২৮ সালে কিন্তু ২৪৭০০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে প্রতি একরে ৩⅓ গাইট করিয়া পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়। সর্ব্বমোট ৬৭৫০০০ গাইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে—১৯২৮ সালে ৬৭১০০০ গাইট পাট উৎপাদিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া নেপাল হইতে আরও ৫০০০০ গাইট পাট আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহাতে বিহার ও উড়িষ্যার উৎপন্নের পরিমান ৭২৫০০০ গাইট ধরা হইয়াছে।

আসাম প্রদেশের বিবরণ

১৯২৭-২৮ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড় লইয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র বৃটিশ ভারতে যত পাট উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৪'৭ ভাগ আসামে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯২৯ সালে প্রচুর পরিমাণ বারিপাত এবং ভীষণ বন্যার ফলে আসামে পাটের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এবার তথায় পাটের বড় দুর্ব্বৎসর। বিভিন্ন জেলার ডেপুটী কমিশনার গণ যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে জানা যায়,—এবার ১৩৮৫০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে ১১৫১০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। প্রধানতঃ আবহাওয়ার অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়াই জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আশা করা যায় যে, এবার আসামে ৩১২৭০০ গাইট পাট উৎপন্ন হইবে। ১৯২৮ সালে ৬২৪২০০ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় এবার আসামে উৎপন্নের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

অতঃপর বর্ত্তমান সময়ে পাটের বাজার দর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংবাদ দিয়া আমারা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সমগ্র বাংলা দেশে নারায়ণ গঞ্জই পাটের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মোকাম। আমরা স্থানীয় পত্রিকা পল্লীমঙ্গল হইতে নারায়ণগঞ্জে পাটের বেচা কেনার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

নারায়ণগঞ্জের পাট

বিগত জুলাই ও আগষ্ট মাসে নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব, চাঁদপুর, মাদারীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে যতমণ পাট রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব।:—

	১৩২৯ সন		১৩২৮ সনের	১৩২৭ সনের	১৩২৬।২ মাস
			২ মাস	২ মাস	
	জুলাই	আগষ্ট			
নারায়ণগঞ্জ—	৩৩৯৯৪৪	১১১৮৬৩৩	১৪৪২৮২৭	১০১০৮৭০	১৩৩৫৬৬৭
ধলেশ্বরী স্টিম—	১৫৪১১	১৬২১৮৮	১৪০৬৫৩	১০১৬৭৬	১০৫৭৫১
ভৈরব—	১৮৯২	১১২৩৭৯	১৭৯৬১৫	১০৪৫৯৯	৯১৬৪৮
সিরাজগঞ্জ—	৪৭৭২৬	২১১২৬১	৩৭৫৬৮৭	৫৬২৯৮০	৩৪২৪৬৫
জগন্নাথগঞ্জ—	১১০৫৫৯	৪০২৮৭৫	৫২৭২৫৬	৪১৭৯৫৮	৪০৩০৬৬
গোয়ালন্দ ষ্টেশন—	৪২০৬৯	৭৫৯০২	৯১৯৮৮	৭৭৫৯৩	৩০২
চাঁদপুর—	১০৮৭৬৪	৬৭৫৮৮৫	৮০৩১৬০	৫০৪৭৭৮	৬০৯২৫৫
খুলনা—	১০৬০৮	৩২৯৭৮	২১০৬৮	১৯৭৩৯	২৭৮৪৫
মাদারীপুর—	১৭০১১৫	০২১২৩২	৫২০৫৭৭	৬৩১৩৯৩	৬৪৬৬৬৮
ভায়া কুলচুরি—	৪৩২৫৮	১৫২০৩৭	৩৩৬৪৮৪	৪১৪৮৫৪	৫৮১১৮০
ভায়া সান্তাহার—	১৬২২৪৩	৫৩৭৫৮৫	৮১৪৩৩৮	১০২৭৯৯৮	৩১৮২৮৪
ভায়া পার্ব্বতীপুর—	১৩৯০৩৪	৬৩৬৪৪৭	৪৬৭২৫৬	৪৬৬৬৪৫	৩১৭০৬৯
ভায়া শান্তাহার পার্ব্বতীপুর সেকসন—	৭৬৬২৮	২৮৯৬৫৮	৪৭৫৪৭৮	৪১৯৮৪০	৬৪৯৯৮

পাটের বাজার পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। সকল আফিসে দৈনিক খরিদের পরিমাণ গড়ে ৪৬২২ মণ। দর ৮।৴ টাকা হইতে ১০।৹ টাকা : বাজার আমদানি ২০০০০/ দাদন ৩০০০/ মজুদ ২০০০০০/ চাহিদা মন্দা।

পাটের সংবাদ

বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে পাটের দৈনিক গড়ে খরিদের হিসাব ও দর :—

এম জেভিড—২৯০২ ঐ শীতলক্ষা ২৮৪৭ মণ। রেলি—৪০০ মণ। নারায়ণগঞ্জ কোং—১৭৭৫, এম সার্কিস—২৩৭, লেভেস—১৫০ হাওয়ার্থ—২১৬, ইউনিয়ান জুট—৪০, সেন কোং—৩৩, বালমুকুন্দ—১০৭৬, গৌরাঙ্গ রায়—৮০০ তুলারাম—১২৯২, জহরমল—৯০০। মোট—১১৮৫৮ মণ।

কয়ালের দর—

ঘালিয়াপাড়া ১০৶০—১০৷৶৩ বগাই ১১৵০ বিক্রমপুর ১০৻৩ বেলাবো ১০৷৵০ গোমতী ১০৻৩ ১০৵৩ নারায়ণপুর ১০৻৩ শিবগঞ্জ ১১৵৩ কিশোরগঞ্জ ১০৶৩ ছটিয়ান ৯৸৩ ভৈরবনাথপুর ১১৻৩ সুরনগর ১১৶৩ বক্তাবলী ১০৸৶৩।

বাজার আমদানী ৭০০০ মণ; দাদন৬০০০ মজুদ ২৫০০০৴ দর কমের দিকে, চাহিদা মন্দা।

১৯২৯ সনের উৎপাদিত পাটের আনুমানিক যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় - গত সন অপেক্ষা এবার ১৭২২০৫ একর জমীতে বেশী পাট দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পাট উৎপন্ন হইয়াছে গতসন অপেক্ষা এবার ১৮৮৯৩০ বেল কম।

পাটের হিসাব বাহির হওয়ায় পর পাটের দর কমিয়া গিয়াছে। স্থানীয় কোন আফিসের টানবাজার এজেন্সির সমস্ত কর্ম্মচারী বরখাস্ত হইয়াছে। পাটের দর না থাকাতে গৃহস্থেরা পাট ছাড়িতেছে না। তাহারা বলে—পাট উৎপাদন করিতে প্রায় ১২ ১৩ খরচ পড়িয়াছে, এখন ৯।৮০ বেচিতে হইলে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হইবে।

পাটের বাজার মন্দা হওয়াতে স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা এবার বড়ই মন্দা। পাটের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের সকল ব্যবসা বাণিজ্য জড়িত। পাটের দর বেশী হইলে গৃহস্থগণ ঘর বাড়ী করে, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য কিনে, জমীদারের খাজনা ও মহাজনের টাকা দেয়। এবার যে দরে পাট বিক্রি হইতেছে তাহাতে গৃহস্থের উৎপাদনের খরচাও পোষায় না। সুতরাং গৃহস্থের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। দেশের ব্যবসা বা শিল্প নষ্ট হইতেছে। কারণ এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি এবং কৃষকদের উপরই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। পাটের চাষ কমাইয়া উহার দর বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশের নেতৃবৃন্দ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল হইতেছে না। মোট কথা পাটের ব্যবসায় বিদেশীয় বণিকদের হাতে একচেটিয়া। তাহারা পূর্ব্ব হইতে ঠিক হইয়া থাকে যে বেশী দর দিয়া পাট কিনিবে না। গৃহস্থেরাও অভাবের তাড়নায় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং পাটের দর বাড়িতে পারে না। দেশে সমবায় সমিতিতে গৃহস্থগণকে সংগঠিত করিয়া পাট রক্ষা করিয়া সুবিধামত দরে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে পাটের দর কিছু বর্দ্ধিত হইতে পারে।

কলিকাতার বাজার দর

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল,ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে,তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের চলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটীর আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

সোনা ও রূপা।

কলিকাতা, ৮ই নবেম্বর

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১৸১০
টাকশালে „ „	২১।৵০
বড়ালের „	২১।/০
চিনাপাত „	২১।০
রূপা পাইকারী ১০ ভরি	৫২৵০
ঐ খুচরা	৫১৵০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স।
২৮ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ঘৃত

৮ই নবেম্বর

শ্রী—	৮০৲
মটকী—	৭৫৲
ভারী —	৬৭৲
খুরজা—	৭৫৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৬৪৲
লক্ষ্মী –	৬৭।০
বাদসাগর—	৫৯৲

বাজার দর—তেল

সরিসার তৈল ঘাটী (রাধাকৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর		২৪।০
ঐ ১ মণের দর		২৪৸০
ঐ খুচরা		২৭।৯
কানপুর		২৫।০
মিশ্রিত	২০৲	হইতে ২১৲
নারিকেলতৈল	২১৲	„ ২২৲
রেড়ীর তৈল	১৬৲	হইতে ১৭৲

বিনোদমার্কা খাঁটী সরিসারতৈল

৮ই নবেম্বর

১০০ টীন বা ততোধিক প্রতিমণ ২৫৲
১ গাড়ীর বা ততোধিক ১০০টীনের কম ২৫/০
১১টীন বা ততোধিক ১ গাড়ী কম ২৫৵০
খুচরা প্রতিমণ৩২৲
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ ২৸০

আটা ময়দা সুজী

পেটেণ্ট ময়দার প্রতিমণ	৮৲, ৮৵০
মিহি	৭৸০, ৭৸৵০
গৃহস্থী	৭।০ ৭।৵০
সুজী	৮/, ৮৶
আটা "বি"	৭৸০ ৸৵০
আটা ২নং	৭৵০ ৭০
আটা এস মার্কা	৭৲, ৭৵০
আটা ৩নং	৫৵০, ৫।০

কেরোসিন তেল

১। আমেরিকান তৈল :—

মোচ্লক	৮৶০	প্রতিকেস
চেষ্টার	৮।৶০	
বানর	৮/০	
এচিন	৬।/০	„
বিলাতী	৬৶০	দুইটিন
হাতী	৫৶১০	

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং

২। বর্ম্মাতৈল—

কমল	৮।/০	প্রতিকেশ
গ্লোব লাইট	৮৸৶	
উইণ্ডসর	৮।/০	

চক্র	৬৷১৩	হুইটিন
সূর্য্য	৬৷১০	"
তারা	৬৶১০	"
ভিক্টোরিয়া	৬৸১০	"
হাঙ্গ	৫৸১০	"
ছাগল	৬৷১০	"
মুর্গী ও চাবি	৫৸৶১০	"

মসলার দর

হলদী মহিলী পত্তন	৯৲, ১১৲০
ঐ হিমোট	১২৷৶০
ঐ পকন্তী	১১৸০
সুপারী (মাজারী	১৭৲, ১৮৴
ঐ বড়দানা (ঐ)	১৮৷০ ১৯ ০
ঐ পাবনী	১৭৷০ ১৮৸০
ঐ (ছোট)	১৭৷০, ১৮৸০
ঐ (জাহাজী)	১৫৲, ১৬০
ঐ দোকানী কাটা	১৫৲ ১৫৲
ধনিয়া	৪.০, ৪৷০, ১১৲
গোলমরিচ বা মাদ্রোজী	৬৯৲
ঐ অলপী	৬৪৲, ৬৫৲
লবঙ্গ	১৷৶০, ১৷৶০
এলাচি (বড়)	২২৲, ২৩৲
ঐ (ছোট)	৪৸০, ৫৲ সের
এরারুট	৮৸০ ৯৲
পিপুল (বড়)	৬৫৲ ৭৮৲
সাগুদানা	৯৸০
ধুনা (জাহাজী)	৭৲, ৮৲
ঐ রেজুনী	১৩৷০ ১৩৲
বাদাম (কাগজী	৩৭৲ ৪০৲
ঐ ছাটিয়া	২৫৲
মনাক্কা	২৭৲ ২৯৲
কিসমিস	২৭৲ ৩০৲
সোরা	১৪৷০, ১৫৲
রসুন	১২৲
সোহাগা (বিলাতী)	৯৲
আবীর গুলাল	৬৷০ ৭৲
হরিতাল	৪৮৲
জায়ফল (বড়)	১৷৶০
জায়ফল (ছিদ্রাদার)	৩২৲ ৪০৲
নিশাদল	১৯৲
সুর্ম্মা	১২৲
জয়ত্রী	৪৸০ ৫৷০
গুগগুল	১৫৲ ১৬৲
তুঁতিয়া	১৭৷০
চন্দন (খাটী)	৭৮৲
কুসকুর	৩২৲
মাজুফল	৬৩৲
ফিটকারী	৫৷০
পচাপাতা	২২৲
রাং	২৪৲
সীসা	১১৷০
দারুচিনী	১২৷০
মুত্রাশঙ্খ	২৬৲
সিন্দুর ভেলী	১২৲ ১৪৲
ঐ অবুসন	২৭৲
বংশলোচন	৮৲ ১১৲ ১২৷০
মহাভরী	১৪৷০
কর্পূর ভেলা	৯৫০৲
শুঁঠ দেশী	৩০৲
তার্পিন	২৪৲
মিশ্রী ১—২নং	৯৸০ ১০৸০

করগেট ও লৌহ

কলিকাতা ৮ই নবেম্বর

২২ গেজ	করগেট সিট দর	১২৸০ হন্দর
২৪ "		১২৲
২৬ "		১৪৲
২৪ "	আর পি ডি	১২৸৵
জয়েষ্ট	কড়ি	৬৲
বরগা	ঐ	৭৸০
পাটী		৮৲
বল্টু		৮৲
কাটাতার		১১৲
মটকা		৷৵০ পিস

মেটাল ও পেণ্ট

৮ই নবেম্বর

ব্লক টীন পেনাঙ্গ ছাপ	১৪৭৸০ হন্দর
আর, টী তামার ইনগট	৬২'০
অষ্ট্রেলিয়ান ঐ	৬৪৷০
পিগলেড বি, এম, মার্কা	২৯৸০
ঐ দেশী প্রস্তুত	১৬৷০
ঐ ম্যানি এ; এস পি মার্কা	১৫৷৵০
ঐ অন্যান্য মার্কা	১৫৷০
সফরব্রঞ্জ ইনগট	১২৩৷০
পিত্তলের চাদর ৪ × ৪	৬৫৷০
পিত্তলের ছড়	৬৫৷০
রূপার সিট ৪ × ৪	৭০৸৵০
রূপার রড	৮৫৸০
সীসার সিট	২৫৷০
জিঙ্ক ইনগট বিলাতী	২১৸০
দেশে প্রস্তুত	১৯৷০
হাবাক্স হোয়াইট জিঙ্ক পেণ্ট	৪২৷০
হোয়াইট লেড পেণ্ট	৪০৷০
গ্রিন পেণ্ট	২৭৷০
রেড অক্সাইড পেণ্ট	২৭০
হাবাকের তারপিন প্রতি ড্রাম	২১৷০
রংএর তেল পাকা	১৫৲
ঐ কাচা	৫৭৲
সিমেণ্ট মাটী দেশী প্রতি টণ	৫৩৷০
ঐ প্রতি ব্যারেল	১১৷০

গোপাল চন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
মার্চ্চেণ্ট, ৮৬ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা

ডাল যব গম

অড়হর গোটা	৪৸০ হইতে ৪৸৵
খেসারী বড়দানা	৪৷০ ৪৷৵০
মুশুরী গোটা	৬৷০ ৬৷৵০
গম কৈজাবাদী	৬৷৵০
ঐ কানপুরী	৫৷০ ৫৷৵০
ছোলা গোটা এলাহাবাদী	৫৷৵০
সরিসা	৯৷৷০ ৯৸০
ঐ ছোট	৮৷০ ৮৸০
রাই সরিসা ছোটদানা	৭৷০, ৮৷০
ঐ বড়	৮৷০ ৮৸০
রেড়া ভেরেণ্ডা এলাহাবাদ	৬৷৵০ ৬৸০
কাল মটর	৫৷০ ৫৵০
ঐ ছোট	৪৸০ ৪৸৵০
ঐ সাদা	৫৲ ৫৵০
তিল সাদা	৭৷০ ৮৲
মুশুরী খাড়ী ডাল	৯৷০ ৯৷০
পোস্ত দানা	১৯৷০ ২০৲
মটর সাদা	৫৷০
মুগ গোটা	৮৷৵০
ঐ	৪৲ ৪৸০

স্বদেশী মিলের কাপড়

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

১৩৯৯	নং	৯ গজা	ফিতা	২/১০
১১৭০	নং	৯।	„ „	২।৵০
২০১৫	নং	১০	চুল	২॥৵১০
৯৯৫	নং	১০	শাড়ী	২৸/০
১৯৫	নং	১০	হাতা	৩৶/০

১২৫৫ ১৩৯৯ নং নিখি ধুতী
৫—৯ গজা ১৶০

মোহিনী মিল

৭৫ নং চুল ফিতা বা সাদা ১০ গজ	৩৵০
৭৬ নং ঐ ঐ	৩৲
২১০ নং চুল পাড় ১০ গজা	৩।০
৪৭ নং হাতী শাড়ী ১০ গজা	৩।০
৫০০ নং ঐ ঐ	৩।৶০

রাম পুরিয়া মিল

২০৬০ নং চুল ১০ গজা	২৸/০
১৯৭ নং চুল জরীপাড় ১০ গজা	৩৶০
৪৩৮৪ নং শাড়ী ১০ গজা	৩৶০

জলপাইগুড়ীর চার দর

২২ নং নীলাম

৪।৫ নবেম্বর ১৯২৯

বাগান	মত বাক্স	গড় দর
আমবাড়ী	২২১	।/১১
অমরাবতী	২২৩	।৶
অমৃতপুর	৫৬	।৴
আটারবাড়ী	২০৪	।/৩
আলীমাবাদ	২০	৶০
খয়েরবাড়ী	১৩০	।/৬
	৯৫	॥৵০
গৌরনিতাই	১৬৭	॥৵১১
গোপালপুর	১৯৫	॥৵১০
গুড উইল	৯৪	×
	১১৩	।/১১০
চামুর্চ্চি		
ডায়না	৪৯	॥৫
ডুয়ার্স ইউনিয়ন	১৩২	।৭
	৫০	'৵১০
তারা বাড়ী	১৫	৶৬
নদীয়া	১৩৩	।/৬
নিউ আসাম	৯৯	।/২
নর্থ ইষ্টার্ণ	৬৭	॥১০
পলাশ বাড়ী	১৪৪	।/৪
ব্রহ্মপুত্র	৭২	৶২
ভাণ্ডারপুর	৮৪	॥১০ ×
মনমোনীপুর	১৩৫	।৩
মুজনাই	১০৩	॥৯
মেরিভিউ	৫৮	॥৮
মালনদী	১০৮	॥১১
লক্ষ্মী	১০৯	॥৭
শিকারপুর	১০৯	॥৵৪
	১১৫	॥৵২
সারদা	২০৮	।/৬
	২২৩	+
	১৩২	।/৬
সরস্বতীপুর	১০৩	।৶৮
যাদবপুর	২৪	॥৶১০
বিজয় নগর	৭৯	৶৫

সেয়ার মার্কেট

কলিকাতা ১২ই নবেম্বর

অদ্য চা বাগানের সেয়ারের কাজ হয় নাই।

অদ্য পাটের কলের সেয়ারের কাজ খুব কম হইয়াছে এবং দরও মন্দা গিয়াছে। কারণ ক্রেতাগণ অদ্য সকলেই এই বিভাগে কাজ না করিয়া কয়লার খনির সেয়ারের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছিল। বাজারের ভাব মন্দা রহিয়াছে।

কয়লার খনির সেয়ারের অদ্য চাহিদা যেমন বেশী ছিল দরও আবার সেইরূপ অনেক স্থানে বাড়িয়াছে, তবে রাণীগঞ্জের দর একটু মন্দা হইয়াছে।

চা বাগানের সেয়ারের কাজ অদ্য মোটেই হয় নাই।

নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ারের সামান্য কাজ হইয়াছে এবং তাহাতে উল্লেখ যোগ্য কিছুই নাই।

কোম্পানীর কাগজের দর মন্দা গিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

১২ই নভেম্বর

৩॥০ সুদে কাগজ		৬৮৵০, ৬৮৵০
৪৲ সুদের বর্জ্জ	(১৯৬০-৭০)	৭৭৵
৫৲ সুদের „	(১৯৩৯-৪৪)	৯৬॥৵০
৫৲ সুদের „	(১৯৩৫)	৯৭৸৵০

ডিবেঞ্চার

৪৲ সু.দর (১৯১৪-৭৪) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ৮৫৸০, ৭৬৲

৬৲ সুদের (১৮৯৯-১৯৩০) ডানবার কটন মিল ডিবেঃ সমান সমান (at par)

৫॥০ সুদের (১৯১৩-২৭ ৩২) এম্পায়ার জুট মিল ডিবেঃ ১০০৲, ১০০॥০

৫৲ সুদের বর্জ্জ (১৯৪৫—৫৫) ১০১৵০

৬৲ সুদের বণ্ড (১৯৩১২

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক	২৫।০

রেল কোম্পানী

ময়মনসিংহ ভৈরব বাজার রেল

দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেল (প্রেফা) ৮৭৲, ৮৮৲

রিবেট ৮০৲ ৮৯৲

কাপড় ও সুতার কল

বেঙ্গল নাগপুর	৫৩।০
কেশোরাম	৫৵০ ৫৵০

কয়লার খনি

আম্বী	৬৯৲
এমালগেমেটেড	১৭৵০, ১৭।০ ১৭।৵০
বাঁশদেওপুর	২৩॥৵ ২৩৸৵০ ২৪৲
বেঙ্গল	৫০৮৲ ৫১১৲
„ ভাংদি	৬৸০
„ গিরিধী	১১৶/১ ১৫৸৵০
ভালগোড়া	৬।০, ৬৸০, ৬৵০
ভুলানবাহারী	২৫।০
জয়ন্তা	২।৵০ ২।০
মিণ্টো	১২৲ ১২০
„ মানভূম	৪৪।০
ভুলা বরারী	২৫।০
বোকারো	১৯৲

বড়যেমো	১৩৮০ ১৩৮৶০	বজবজ	৫০৮৲ ৫১৪৲
বরাকর	১৬৷০ ১৬৮০	চাঁপদানী	১৬৮৲ ১৭০৲
সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড	১৭৷০ ১৭৷৵০	ক্লাইভ	৩৫৮৶০ ৩৬৮৶০
বেরহলী	১৯৷০	ক্রেগ	৪৷০
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	২৮৴০	ডেল্টা	৫১১৲
ইকুইটেবেল	২৮৶ ৩০৮০	এম্পায়ার	৬০, ৬১৲
খুসিক ওয়ান্নরা	১৷৴০ ১৩৮০	গৌরিপুর	৩৯৫৲ ৪০৭৷০
গোবিন্দপুর	৩৮৶০ ৪৲	গোঁদলপাড়া	১০৭৫৷০
হড়িলাদে	১৪৪৷০	হাওড়া	৫৫৮৶০ ৫৬২
কালীপাহাড়ী	২৪৮০ ২৫৲	হুকুমচাঁদ	২৭৮৶০
মেরিণ "এ"	৯৮০ ৯৲	কামারহাটী	৬০২৲ ৬০৭৷০
ঐ "বি"	৮৴০ ৯৲		৬০৫৲
নাজিরা	১৫৶০ ১৫৷৴০	ডাল্‌হাল	২৯৶০, ২৯৮৶০, ২৯৷০
নিউ বীরভূম	১৯৷০	নদীয়া	৫০৲ ৫১৲
"কেন্দা	৪৶০ ৫৲	প্রেসিডেন্সি	১০৶০ ১০৷০
নোদিহা	৭৵ ৭৶০	রিলায়েন্স	৮৫৲
নর্থ দামুদা	৭৷০ ৬৷৴০	ষ্ট্যাণ্ডার্ড	৪০৭৷০
পেঞ্চ ভেলী	৪০৷০ ৪০৮০	**পাটের কল**	
রাণীগঞ্জ	৪১৮০ ৪১৲ ৪২৷০	এলবিয়ন	৩৯৫৲
সাল্লাকালয়ারী	১০৲ ১৷০	এলায়েন্স	৪৭৬৲, ৪৮০৲
সাতপুকুরিয়াও আসানসোল	২৶৪	কলকাতা	২৮৪৷০ ২৮৫৷০
আত্রা	২০৴০, ২০৷৴০	বেলীভাণ্ডার	৫৭০৲
সিয়ারসোলি	২৶০	বিরলা	৫৭৷০
সাউথ করনপুরা	৮৷০ ৮০	ক্যানডোনিয়ান (প্রেফা)	১২০৲
ষ্টাণ্ডার্ড	৬৪৷০	চিভিয়ট	৩১২৲
ইউনিয়ন	২৪৷০ ২৪৮৶০	হুগলী	১০২৲
ওয়েষ্ট জামুরিয়া	১৩৶০ ১২৷০	কাঁকিনাড়ী	৫০৯৲ ৫১০৲
পাটের কল		কিনিসন	১০০০৲
আদমজী	১২৷৴, ১২৮৴০	ল্যান্স ডাউন	২৬৩৲, ২৬৪৷০
এংলো ইণ্ডিয়া	৪০৭৲ ৪০৯৲	নর্থব্রুক	৬০৲
বালী	২৮৲, ৩৩৲, ৩২৲	ইউনিয়ন	৬২৮৲ ৬৩৩৷০
বরানগর	৭৪৲ ২৭৫৷০	ওয়েভালী	৮৲, ৮৷০

চা বাগান		নমুনা	৶,৷৹
মহিমা	১৬৷৹	বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়ার্ হাউস	
নানাবিধ কোম্পানি		"বি" সেয়ার	১২৫৲
বি, আই, কর্পো অর্ডি	২৲৹	বর্ম্মা কর্পোঃ	১২৵৹, ১২৷৹
বেরেলী ইলেক্‌ট্রিক	১০৸৹	কলিকাতা ল্যাণ্ডিং ও সিপিং	১৹৶৹
বেঙ্গল টেলিফোন অর্ডি	১৩৲	কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং	২৸৹, ২৸৵৹
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টিল	১৫৵৹, ১৫৷৹	মির্জ্জাপুর ইলেকটিক	৷৵৹ (প্রিমি)
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ প্রেস্	৮৯৲	মদন থিয়েটার	৩৷৵৹, ৩৸৶৹
	৯০৲	মেদিনীপুর জমিদারী	১০১৲ ১৩২৲
আইভ্যান জোনস	৬৴৹ ৬৵৹	মার্শাল	২৷৵৹ ২৷৹
জব্বলপুর ইলেকট্রিক	১৪৷৹	পোর্ট সিপিং	২২৷৹
পাটনা ইলেকট্রিক	১৭৸৹	ষ্টুয়ার্ট এণ্ড কোং	২৲৹
থর্নী ক্রফট	১৷৹	রবার কোম্পানী	
অপার গ্যাঞ্জেস ইলেকট্রিক	প্রিমি	কেম্পাস	২ ড ৯২৷৹ সেণ্ট

শোক সংবাদ

স্বর্গীয় মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী আর ইহ-জগতে নাই। সমস্ত বাংলার বক্ষে শেলাঘাত করিয়া তিনি অনন্ত লোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। বুধবার ভোরের কাগজে অতি সংক্ষেপে দুই তিন ছত্রে মহারাজার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়; শেষ রাত্রে দেহত্যাগ হওয়ায় মহারাজার লোকান্তর গমনের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশের স্থান খবরেরকাগজে ছিল না; তাই কয়েক লাইনেই এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা প্রত্যূষে প্রচারিত হয়; মুহূর্ত্তের মধ্যে দাবানলের ন্যায় এই সংবাদ কলিকাতার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং সহরের নানা দিক হইতে লোক দলেদলে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে নিমতলার দিকে ধাবিত হয়। সেখানে যাইয়া যখন জানা গেল যে মহারাজার শবদেহ কাশীমিত্রের ঘাটে নেওয়া হইয়াছে অমনি সকলে আবার সেই দিকে ছুটিতে লাগিল। সকলের মুখে হায়, হায়, শব্দ। সকলেই বলিতেছে বাংলাদেশে ইন্দ্রপাত হইয়া গেল।

বিদ্যাসাগরের পর এমন পরদুঃখকাতর মহাপ্রাণ বাংলাদেশে আর জন্মে নাই। বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ার সাগর, আর মনীন্দ্র নন্দী ছিলেন একাধারে দানবীর এবং দয়ার সাগর।

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর বিস্তীর্ণ জমিদারী প্রাপ্ত হন; সেই সময় হইতে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাংলা দেশে এমন কোনও জন হিতকর অনুষ্ঠান হয় নাই—যাহা এই দানবীরের অর্থ সাহায্যে পুষ্ট এবং উপকৃত হয় নাই।

বাংলা দেশে এমন কোনও বিদ্যায়তন বা দুঃস্থ ছাত্র নাই যে বিদ্যাদান অথবা বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের সাহিত্য সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য—যে দিকে তাকাই সেইদিকেই এই—মহাপ্রাণ দানবীরের মুক্তহস্তের ছাপ দেখিতে পাই; জাহ্নবীর স্রোত ধারার ন্যায়—তাঁহার অফুরন্ত দান জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে উপকৃত করিয়াছে। আজ তাঁহার অভাবে তাই বাংলাদেশে বাঙ্গালী-জাতির মর্ম্মস্থল হইতে হাহাকার উঠিয়াছে।

আজ যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং রমেশ ভবন বাংলা দেশে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে। তাহা কাশিম বাজারের মহারাজা এবং লাল-গোলার রাজার দানের ফল। মনীন্দ্র চন্দ্রের প্রদত্ত জমির উপরেই সাহিত্য পরিষদ এবং রমেশ ভবন দাঁড়াইয়া আছে। শুধু কি তাই?—যে সকল বহুমূল্য প্রাচীন গ্রন্থরাজি আজ সাহিত্য পরিষদের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ তাহার অধিকাংশই মহারাজার অর্থানুকুল্যে এবং আপ্রাণ চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে; বাংলাদেশে এমন কোনও দুঃস্থ এবং দরিদ্র সাহিত্য সেবী নাই যিনি বা যাঁহারা মনীন্দ্র চন্দ্রের নিকট দুরবস্থার কথা জানাইয়া নিরাশ হইয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া গিয়াছেন।

ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাঁহাকে যেরূপ wreckless ভাবে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া সকল শিল্পানুষ্ঠানে অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে দেখিয়াছি বাংলাদেশে কিম্বা সমগ্র ভারতবর্ষে তাহার তুলনা নাই। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্

তাঁহারই দানশীলতার ফল। এই পটারী ওয়ার্কসের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব জাপান হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন অর্থাভাবে পটারীর কারখানা খুলিতে পারিতে ছিলেন না, তখন মহারাজাই অগ্রণী হইয়া নিজে বহুলক্ষ টাকা দিয়া এই কারখানাটীকে দাঁড় করাইয়া দেন। বহু বৎসর যাবৎ পটারীর কারখানায় কোনও লাভ না হওয়ায় এবং জিনিষ পত্রও পছন্দ মত তৈয়ারী না হওয়ায় কত লোক সত্যসুন্দরকে কারখানা হইতে সরাইয়া দিবার জন্য মহারাজাকে প্ররোচিত করিয়াছে, কিন্তু আশ্রিত বৎসল মনীন্দ্র চন্দ্র কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া সত্যসুন্দরকে বার বার জাপান, জার্ম্মাণী এবং ইউরোপের নানাস্থানে পাঠাইয়া দিয়া Ceramic Industryতে expert করিয়া আনেন।

কো- অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক এর তিনি ছিলেন প্রাণ। এই ব্যাঙ্ককে দাঁড় করাইবার জন্ত তিনি যে কি অকাতরে পরিশ্রম এবং অর্থ দু কুল্য করিয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিলে সমুদয় দেশী ব্যাঙ্কের উপর প্রবল ধাক্কা পতিত হয় এবং বহু স্বদেশী অনুষ্ঠান সেই প্রবল ধাক্কায় টল্ মল্ করিয়া উঠে; এই সময় মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র এবং গৌরীপুরের স্বনাম ধন্ত জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর ছুটীয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং ব্যাঙ্কের পশ্চাতে পর্ব্বতের ন্তায় অটলভাবে দণ্ডায় মান হন। নন্দীরায় কোম্পানী ব্যাঙ্কের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেই লোকের চিত্ত চাঞ্চল্য থামিয়া গেল এবং আমানত কারীগণ নিশ্চিন্ত হইলেন। আজ সেই হিমালয়ের ন্তায় ধীর, স্থির, অচল, অটল এবং মহাত্যাগী মহেশ্বরের ন্তায় আত্মভোলা, সর্ব্বত্যাগী, রিক্ত হস্ত দানবীর মনীন্দ্রচন্দ্রকে হারাইয়া ছোট বড় কত শিল্পানুষ্ঠান যে প্রমাদ গণিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী কাগজখানা যখন অর্থের অভাবে উঠিয়া যাইতে বসিল তখন আর কাহারও প্রাণ কাঁদিল না; বাংলা দেশে মনীন্দ্র চন্দ্রের অপেক্ষা অনেক বড় ধনী ছিলেন এবং আছেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এবং ল্যাণ্ডহোল্ডারস এসোশিয়েসনের সভ্য দিগের মধ্যে এমন অনেক ধনী জমিদার এবং ব্যবসায়ী আছেন যাঁহাদের প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে বেঙ্গলীর ন্তায় এক একখানি দৈনিক কাগজ চালাইতে পারিতেন এবং এখনও পারেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রায় সকলেই কেবল বচন বিন্যাশ এবং লাট বাড়ীতে ছুটাছুটী করিতেই পরিপক্ব; কাশিমবাজারের মহারাজার বচন ছিল না, লাট বেলাটের নিকট আপনার প্রভুত্ব বাড়াইবার প্রয়াস বা বিড়ম্বনা ছিল না। তাঁহার কাছে অগ্রসর হইবামাত্র সেই যে তিনি সম্পূর্ণ এবং সমগ্র দায়ীত্ব ঘাড়ে করিয়া নিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত আনন্দ চিত্তে তাহার সব ক্ষতি অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন।

আজ আর তাঁহার কর্ম্ম জীবনের কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না। বাংলাদেশ আজ যে কি রত্ন হারাইল তাহাই কেবল মনে জাগিতেছে— আর মনে হইতেছে বাংলার বৈষ্ণবগণ আজ সত্য সত্যই কাঙ্গহারা কাঙ্গাল হইলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রকৃত বৈষ্ণবের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে— তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ যে সমস্ত গুণই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। এমন বিনয়ী, অমায়িক, সহৃদয়, সৌজন্যের অবতার

আমরা আর দেখি নাই। 'অমানিনা মানদেন'—এতো তাঁহার প্রকৃতির একটা বিশেষ লক্ষণই ছিল। অতি সামান্য দরিদ্র ব্যক্তিকেও তিনি তুচ্ছ করিতেন না, তাহারও সঙ্গে সমপদস্থ বন্ধু আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহার গৃহে হাজার হাজার লোককে প্রায় নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইত। তাঁহার ভাগিনেয়ের প্রতি এই সকল ভূরি ভোজনের আয়োজনের ব্যবস্থা থাকিত সত্য, কিন্তু আহারের সময় মহারাজা স্বয়ং নগ্নপদে করযোড়ে অতিথি অভ্যাগতদিগের আসনের নিকট গমন করিয়া কোথাও কোন ত্রুটী বিচ্যুতি হইতেছে কি না তাহা দেখিতেন এবং দীনাতিদীনকেও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেন। বাংলা দেশে কোনও বাঙ্গালীর বাড়ীতে এমন মহামানবতার প্রতীক মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই এবং আর কখনও যে দেখিব সে ভরসাও রাখি না।

শ্মশানঘাটে পুষ্প শয্যায় শায়িত তাঁহার চিরনিদ্রিত মুখে যে শান্তি, পুণ্য এবং পবিত্রতার ছবি দেখিয়াছি জীবনে সে দৃশ্য কখনও ভুলিব না। চিরকাল পরার্থে সাধুজীবন যাপন করতঃ শুভ্র, স্নিগ্ধ প্রভাতী ফুলের ন্যায় গন্ধ বিকীর্ণ করিতে করিতে ঘুমন্ত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অজাতশত্রু মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বজননীর ক্রোড়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। পদতলে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া অনন্ত সাগরে ছুটীয়া চলিয়াছে। চন্দন চর্চ্চিত প্রশস্ত ললাটদেশে কোন চিন্তা, কোন ক্লেশ, কোন গ্লানির রেখামাত্র নাই। সে কি শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌম্য মূর্ত্তি! শুধু আমরা নই, সেদিন এই আশ্চর্য্য মুখচ্ছবি যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে এবং আবেগভরে বলিয়াছে ঠিক! সাধুজীবনের শেষগতিরই উপযুক্ত মুখচ্ছবি—মৃত্যু তাঁহার মুখে মরণ যন্ত্রণার একটীও রেখা আঁকিয়া দিতে পারে নাই। ধন্য মণীন্দ্রচন্দ্র! ধন্য! তুমি মৃত্যু শয্যাতেও একটা আদর্শ রাখিয়া গেলে।

আজ কেবলই মনে হইতেছে এমন মানুষকেও সেদিন দেশের কতকগুলি অর্ব্বাচীন পরমত অসহিষ্ণু যুবক টাউন হলে কি অপমান এবং লাঞ্ছনাই না করিয়াছে! আমাদের অপেক্ষা বেশী অগ্রগামী সংস্কারক এবং সর্দ্দাবিলের সমর্থক বোধহয় সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোনও সম্প্রদায় নাই। কিন্তু আমরা পরমত অসহিষ্ণু নহি এবং অপর পক্ষের যুক্তি তর্ক শ্রদ্ধার সহিত সহিত শুনিতে চাই। কারণ আমরা জানি যে যুক্তি কাহারও বাঁধা গোলাম নহে। সত্য যে দিকে যুক্তিও সেই দিকে। আজ হউক কাল হউক মানুষ সত্যকে আশ্রয় এবং অবলম্বন করিবেই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে একদল সর্ব্বধ্বংসী তরুণের পাল মুসোলিনীর হাস্যাস্পদ অভিনয় করিতে সুরু করিয়াছে তাহারা সকলকেই একঘাটে মাথা মুড়াইবার জন্য লাঠিবাজী সুরু করিয়াছে। কাউন্সিল সেবার ইলেকসনের সময় একদল রাজনৈতিক বালখিল্য দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে দারুণ অপমান করিয়াছিল; সেই অপমানের কিছু দিন পরেই সুরেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রকেও একদল বালখিল্য সেদিন টাউনহলে নিদারুণ অপমান করিয়াছিল; তাহার মাস খানেক বাদেই মহারাজ দেহত্যাগ করিলেন। আমাদের মনে হইতেছে উভয়ের চিতাগ্নি হইতে বাঙ্গলাদেশের সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া আগুনের হরপে কে যেন লিখিয়া দিয়াছে Ungrateful Country.

—

ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাকচী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ 'পাঁচ ফুলের সাজি'র মত নানা সংবাদে ভরা। ইহাতে প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দোকানের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle Parts আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন—যাহারা এই সকল মাল খরিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন এ কাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টারী বাহির করিলে তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা; কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টারীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতি আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যেএকটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সংকল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্থে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

——:০:——

মোকাম ভগবান গোলা আমদানি রপ্তানি ও ব্যবসায়ীদিগের নাম

মাননীয়

শ্রীযুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়

আপনার বাঙ্গলার ডাইরেক্টরীতে নিম্নলিখিত, সংবাদ প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট জিয়াগঞ্জ মোকামের সংবাদ পাঠাইয়া ছিলাম।

ভগবান গোলা স্থানটী ব্যবসায় পক্ষে বেশ সুবিধাজনক স্থান; কারণ এখানে সাধারণতঃ অনেক ব্যবসায়ী দিগের বাসস্থান। এবং এখানে বহু জিনিষ (কাঁচামাল) আমদানী হইয়া থাকে। ইহার প্রায় ৪ ক্রোশ উত্তরে পদ্মা নদী ও নদীর চর; এই জন্য এখানে প্রধানতঃ কলাই, পটল, ছোলা খুব বেশী পরিমাণে জন্মে। ভগবান গোলার বাজারের পূর্ব্বদিক দিয়া E. B. R. রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। ষ্টেশন নিকটে বলিয়া মাল আমদানি ও রপ্তানির পক্ষে খুব সুবিধা। এখানকার বাজার ওজন ৮২।৵০

পোঃ ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ জিলা।

মহাশয়

জিয়াগঞ্জ মোকামের তালিকা পাঠাইবার সময় নিম্নোক্ত খাবারের রপ্তানিকারকের নাম পাঠাইতে ভুলিয়া যাই; অনুগ্রহ পূর্ব্বক নামটী প্রকাশ করিবেন।

নানা প্রকার আচার, মোরব্বা, উৎকৃষ্ট পাপর ও অন্যান্য মাড়োয়ারীর খাদ্য রপ্তানি কারক :—

(ক) পাপর :—মুগের, বরবটী, (বোয়া) কলাই ইত্যাদির—

(খ) আমের আচার ও নানা প্রকার মুখ রোচক খাদ্য :—উৎকৃষ্ট আমসত্ব (আমতা) আমের হালুয়া, আমের কাফিয়া ও মোরব্বা ইত্যাদি

(গ) চাল কুমড়ার হেলুয়া।

(ঘ) বাদাম ও পেস্তা, নারিকেলের কাজলি মালায়ের বরফি রপ্তানি কারক :—

শ্রীকালী দাস মজুমদার
জিয়াগঞ্জ

১। পাট আমদানী ও রপ্তানি কারক :—

(ক) শ্রীনাথ পোদ্দার।
(খ) " ননী গোপাল বন্দোপাধ্যায়।
(গ) " ব্রজেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায়।
(ঘ) " গোপাল চাঁদ ভুঁয়া।
(ঙ) " ফুল চাঁদ পোদ্দার।

২। পিঁয়াজ, রসুন, কাগজিনেবু, সূর্য্য কুমড়া, পটল, কলাই, চাল, গম, ছোলা ইত্যাদি আমদানী ও রপ্তানি কারক :—

(ক) শ্রীআপসার সেখ।
(খ) " রমজান মণ্ডল।
(গ) " এব্রাহিম সেখ।
(ঘ) " জিন্নত সরকার।

৩। মুরগী ও ডিম এবং বাঁশ ও কাঠ আমদানি ও রপ্তানি কারক :—

(ক) শ্রীআবদুল হোসেন সেখ।
(খ) " জান মহম্মদ সেখ।
(গ) " গোলাপ সদ্দার।

৪। মাছ আমদানি ও রপ্তানি কারক :—

(ক) শ্রীহাজি আবদুল আজিজ, পরামাণিক।

শ্রীকালী দাস মজুমদার
জিয়াগঞ্জ

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৯ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ { ৮ম সংখ্যা

রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

Drying oil এর মধ্যে তিসির তেলই সর্ব্ব প্রধান—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া টুং অয়েল, মাছের তেল Soya Bean oil (চীন দেশ জাত বরবটী জাতীয় এক প্রকার বীজের তেল) এবং Poppy Seed oil (আফিং বীজের তৈল) প্রভৃতি ও Drying oil রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টুং অয়েল :—Drying oilএর মধ্যে তিসির তেলের পরেই Tung oil এর স্থান। ইহার গুণাবলী কিন্ত তিসির তেল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে তিসির তেল যে ভাবে রং প্রস্তুতের কাযে ব্যবহৃত হয়, Tung oil সে ভাবে হয় না। কাঁচা অবস্থায় টুং অয়েল অবশ্য খুব শীঘ্র শুকাইয়া যায়। কিন্ত তাহার উপর যে থার পড়ে তাহা মোটেই কার্য্যোপযোগী হয় না; অন্ততঃ রং প্রস্তুতের পক্ষে এই সব নিতান্ত অযোগ্য বলিলেই হয়। তবে টুং অয়েলকে সামান্ত ভাবে গরম করিলে তাহা রং ও বার্ণিশের ব্যবহার করার উপযুক্ত হয়।

সম্প্রতি টুং অয়েলের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইতি পূর্ব্বে এই তেলের বিশেষ সমাদর ছিল না; তখন এই তেলকে তিসির তেলের সহিত ভেজাল দেওয়া হইত কিম্বা তিসির তেল না পাওয়া গেলে তাহার পরিবর্ত্তে এই টুং-অয়েল ব্যবহার করা হইত। কিন্ত আজ কাল নানা কাজে এই টুং অয়েল রীতিমত ব্যবহৃত

হইতেছে। ইহার গুণাবলী বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সর্বত্র প্রচার করা হইতেছে। ফলে টুং অয়েলের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার দামও বাড়িয়াছে প্রচুর। এখন এই তেল, তিসির তেলের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়।

রং প্রস্তুতের কাজে টুংওয়েল যতটা লাগে, তার চাইতে অনেক বেশী লাগে বার্ণিশ প্রস্তুতের কাজে। বিশেষ ভাবে আমেরিকায় যে সকল বার্ণিশ প্রস্তুত হয় তাহাতে এই টুং অয়েলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টুং অয়েলের একটা বিশেষত্ব এই যে,স্বাভাবিক হইতে একটু বেশী গরম করিলেই গাঢ় হইতে হইতে একেবারে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এইজন্য যেমন ইচ্ছা এই তেল ব্যবহার করা চলে না। আবহাওয়া শুষ্ক না হইলে তিসির তেল শীঘ্র শুকায় না ; কিন্তু টুং অয়েল ভিজা আবহওয়া-তেই ভাল করিয়া শুষ্ক হয়। তারপর টুং অয়েলের উপর যে সর পড়ে তাহাতে জল পড়িলেও বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না। জলের আঘাত সহ্য করিবার এই ক্ষমতা টুং অয়েলের সরের আর একটি বিশেষত্ব।

দুই রকমের টুং অয়েল আছে। যথা:— চীনা তেল ও জাপানী তেল। কেবল চীনা তেলই রং প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ইহাকে "চীনা কাঠের তেল" বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে চীন দেশে জাত বৃক্ষ বিশেষের ফল হইতে এই তেল প্রস্তুত হয়। ফলকে ভাজিয়া গুড়া করিয়া পরে তেল বাহির করা হয়। জাপানী তেল কিন্তু স্বতন্ত্র গাছের ফল হইতে পাওয়া যায়। গুণাবলীর দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, জাপানী তেল, হইতে নিকৃষ্ট। সম্প্রতি কেবল চীন দেশ হইতেই টুং অয়েল রপ্তানী হয়। পৃথিবীর আর কোথাও এই তেল উৎপন্ন হয় না। যে গাছের ফল হইতে টুং অয়েল পাওয়া যায়, সেই গাছ অনায়াসে ভারতবর্ষে জন্মান যাইতে পারে। কিন্তু সেদিকে এখনও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। অন্যান্য সভ্য জাতিরা হয়ত ইতিমধ্যেই চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীর সে চেষ্টা কোথায় ?

মাছের তেল :—যে সকল গুণ থাকিলে তেল বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া শুকাইয়া যায় ও তাহার উপর সর পড়ে সেই সমস্ত গুণ অল্প বিস্তর মাছের তেলের মধ্যে ও রহিয়াছে। তাই মাছের তেলকে Drying oil এর পর্য্যায় ভুক্ত করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের মাছ হইতে মাছের তেল প্রস্তুত হয় ; ফলে বিভিন্ন মাছের তেলের মধ্যেও তারতম্য হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে এই তেল রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া তিসির তেলের সঙ্গে এই মাছের তেল ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। প্রধানতঃ সাবান নির্ম্মাণের জন্যই মাছের তেলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নানাদিক দিয়া যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত মাছের তেলের ব্যবসায় আশানুরূপ ভাবে গড়িয়া উঠে নাই।

অধিক দূরে গিয়া লাভ নাই। এই গোয়ালন্দেই প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির উপযুক্ত ব্যবহার হয় কোথায় ? অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এই সকল মাছের তেলের পরিমাণ একেবারে অপর্য্যাপ্ত। এই মাছ খাইয়া অনেকের পীড়া হয়। আমরা জানি এক এক সময় গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী প্রভৃতি ইলিশ মাছের কেন্দ্রে গাড়ী

গাড়ী পচা ইলিশ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ঠিক সময়ে বরফ না পাবার জন্যে কিম্বা মাছের নৌকা সকল ঠিক সময়ে ষ্টেশনে না পৌঁছিতে পাবার গাড়ী চলিয়া যাওয়ার দরুণ গাড়ী গাড়ী ইলিশ মাছ পদ্মার চরে পড়িয়া পচিতে থাকে। শুঁটকী মাছ বা smoked fish করার প্রথা না জানার জন্যে জেলেরা এই সকল মাছের কোনও সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। অথচ ইহা হইতে রংয়ের উপযোগী তেল বাহির করিয়া নিয়া বাকী মাছ এবং কাঁটাকুটী (Fishbones) হইতে অতি মূল্যবান Fish manure বা মৎস্যসার তৈরী করা যায়—যাহার চাহিদা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া, এবং কলিকাতাতেও ইহার বড় বড় ইউরোপীয় Export firm রহিয়াছে। শিক্ষিত লোক এই সব ব্যবসায়ে হাত না দেওয়ায় এবং জেলেরা লেখাপড়া না জানায় এমন মূল্যবান আয়ের পথ সব নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

পচা মাছের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ভাবিবার আছে। গোয়ালন্দ হইতে বিভিন্ন স্থানে এই মাছ চালান দিতে যে সময় লাগে, তাহাতে অনেক মাছ পচিয়া যায়। এদিকে কর্তৃপক্ষ নিয়ম করিয়াছেন যে, পচা মাছ কোথাও চালান যাইতে পারিবে না। অবশ্য জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। তথাপি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই পচা মাছগুলি একেবারে বৃথাই নষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোন দেশেই জিনিষের এরূপ অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের প্রত্যেক জিনিষ—তাহার প্রত্যেক অংশ পর্য্যন্ত যাহাতে কোন না কোন কাজে লাগাইয়া অর্থার্জন করা যায়—সেই চেষ্টাই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের বিশেষত্ব। কিন্তু সেই বিশেষত্বের দিনে আমাদের মোটেই লক্ষ্য নাই। তাই এই গোয়ালন্দে গাড়ী ভর্ত্তি করা ইলিশ মাছ পচা বলিয়া পদ্মার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; অথচ আমরা একবারও এগুলিকে কাজে লাগাইবার কথা চিন্তা করি না। এদিকে কিন্তু বেকার সমস্যা চরমে পৌঁছিয়াছে—গলা ফাটাইয়া প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় আমরা এই বেকার সমস্যার প্রতিকার খুঁজিয়া থাকি। কিন্তু এ সমস্ত ছোট খাটো বিষয় হইতে যে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে, একটা নিজস্ব শিল্প এদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে—একথা একবারও আমাদের মনে জাগে না। গলদ যত ঐ জায়গায়ই। যত দিন পর্য্যন্ত আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি আমাদের না হইবে, ততদিন এদেশের বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ প্রতিকার হওয়াও একান্ত দুষ্কর।

মাছের তেলের ব্যবসার কথা বলিতেছিলাম। মাদ্রাজের উপকূলে কিছুকাল হইতে এরূপ একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এরূপ বহুসংখ্যক কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মাছের তেল এবং মাছের সারের চাহিদা ও মূল্য যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়।

গোয়ালন্দে একটি মাছের তেলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। তাহাতে গোয়ালন্দের সকল মাছ (পচা ও টাটকা) কাজে লাগান চলিবে; অধিকন্তু রেল ও ষ্টীমার যোগে অন্যান্য স্থান হইতেও যথেষ্ট মাছ এখানে আমদানী করা যাইবে। এই সমস্ত মাছ দ্বারা একটি কারখানা অনায়াসে চলিতে পারে।

Soya Bean Oil :—Soya bean এক প্রকার মটর বা বরবটী জাতীয় শস্য। সুদূর

প্রাচ্য দেশে অর্থাৎ চীন, জাপান, শ্যাম, মালয় প্রভৃতি দেশেই প্রধানতঃ ইহার চাষ হয়। ভারতেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে Soya bean উৎপন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যে কোনও Oil man Store বা মুদীখানায় অনুসন্ধান করিলে Soya bean দেখিতে পাইবেন। ইহা আকারে দেখিতে ঠিক বরবটীর মত। সমস্ত ইউরোপীয় হোটেলে soya bean ব্যবহৃত হয়; ইউরোপীয়েরা তাদের ডাল অতি আগ্রহের সহিত ইহা খাইয়া থাকে; কারণ ইহা অতি পুষ্টিকর। আমরা দেও-ঘরের বাগানে সয়াবীন চাষ করিয়া দেখিয়াছি, এক একটি গাছে অপর্য্যাপ্ত ফল হয় এবং ইহার ডালও খাইতে বেশ সুস্বাদু।

যাক্, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি; সয়াবিন হইতে যে তেল প্রস্তুত হয় সেই তেলও বাতাসে রাখিয়া দিলে শুষ্ক হয় এবং তাহার উপর সর পড়ে। তবে তিসির তেল হইতে এই তেল অনেক নিকৃষ্ট। যখন তিসির তেলের দাম খুব বেশী বাড়িয়া যায়; তখন এই তেল রং প্রস্তুতের কাজে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তবে সাবান প্রস্তুতের কাজে Soya bean oil প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Poppy seed oil:—এদেশে poppyকে খসতিল বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রধানতঃ ফ্রান্স, ভারতবর্ষ এবং অদূর প্রাচ্যের তুরস্ক, আরব প্রভৃতি দেশেই poppy উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফ্রান্সেই কেবল Poppy seed oil প্রস্তুত হয়। ভারতে যে পরিমাণ Poppy seed উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডে রপ্তানী হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ চিত্রশিল্পীরা যে রং তুলি দ্বারা ব্যবহার করেন সেই রং প্রস্তুতেই Poppy seed oilএর প্রয়োজন। তিসির তেল অপেক্ষা ইহার রং অনেকটা সাদা, তবে তিসির তেলের ন্যায় যেমন সত্বর এই তেল শুকায় না। অধিকন্তু Poppy seed oilএর দামও তিসির তেল অপেক্ষা অনেক বেশী। এইজন্যই Poppy seed oilএর ব্যবহার বেশী হয় না। খাইবার জন্যই এই তেল অধিকাংশ স্থলে বিক্রয় হইয়া থাকে।

Thinners থিনার্স—
বা
তরলকারী পদার্থ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সিদ্ধ-করা তিসির তেলের সঙ্গে অতিশয় সূক্ষ্ম বিভিন্ন ধাতুর গুঁড়া ঠিক অনুপাতে মিশ্রিত করিলেই রং প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই রং সাধারণতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাঢ় হইয়া যায়। ফলে ইচ্ছামত এই রং সকল জিনিষের উপর লাগান যায় না। বেশী করিয়া তেল মিশাইলে আবার রং বেশী পরিমাণে পাতলা হইয়া পড়ে। রংটি গাঢ়ই থাকিবে অথচ যথাসম্ভব বেশী জায়গা জুড়িয়া ইহাকে লাগান যাইবে—এরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্যই Thinners—অর্থাৎ তরলকারী পদার্থের প্রয়োজন হয়।

তার্পিন তেল:—এই শ্রেণীর তরলকারী পদার্থের মধ্যে তার্পিন তেলই প্রধান। তার্পিন তেল প্রস্তুত হয় বিভিন্ন শ্রেণীর দেবদারু (Pine) গাছের রজন (আটা) এবং কাঠ এই দুই জিনিষ হইতেই। দেবদারু গাছের প্রকার ভেদে তাই তার্পিনের গুণাবলীর ও তারতম্য হইয়া থাকে। অধিকাংশ তার্পিন তেলই দেবদারু গাছের আটা চুয়াইয়া প্রস্তুত করা হয়। কাঠের তার্পিন হইতে পৃথক করিয়া দেখাইবার জন্য রজন হইতে প্রস্তুত তার্পিনকে "গাম তার্পিন" (gum Turpentine)

বলে। সেইরূপ কাঠ চুয়াইয়া প্রস্তুত করা তার্পিনকে "কাঠের তার্পিন" আখ্যা দেওয়া হয়। এই দুই প্রকারের তার্পিনের মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। তারপর চুয়াইবার প্রণালীর উপরও ইহার গুণাবলীর তারতম্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

তার্পিন চুয়াইবার আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইল Steamএর (বাষ্প) সাহায্যে চুয়ান। এই প্রণালীতে প্রস্তুত তার্পিন যেরূপ খাঁটি হয়, পুরাতন পদ্ধতিতে জলের মধ্যে ফেলিয়া সিদ্ধ করিয়া চুয়ানো তার্পিন যেমনটি হয় না। ফলে এই উভয় প্রকার তার্পিনের মূল্যের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

আসলে তার্পিন তেল জিনিষটি দেবদারু গাছের মধ্যে তাহার রজন কিম্বা কাঠের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে মিশিয়া থাকে। ইহাকে পৃথক করিয়া লইবার জন্যই চুয়ানের প্রয়োজন হয়। পুরাতন প্রণালীতে জলে সিদ্ধ করিতে গেলে তার্পিনের সঙ্গে অন্যান্য জিনিষও বাহির হইয়া আসে এবং এই সমস্ত জিনিষ একত্রে মিশিয়া তার্পিনের মৌলিকত্ব নষ্ট করে। ফলে যে তার্পিণ পাওয়া যায় তাহা খাঁটি তার্পিন হয় না। পক্ষান্তরে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ষ্টীম দিয়া চুয়াইয়া প্রকৃত তার্পিন তেল বাহির করা যায়। কাঠ কিম্বা রজন—এই দুইয়ের যে কোন একটিতে আগুনের তাপ না দিয়া কেবল ষ্টীম প্রয়োগ করিলে সর্ব্বাগ্রে তার্পিন বাহির হইয়া আসে,—অন্যান্য জিনিষ এত শীঘ্র বাহির হয় না। কারণ অত্যল্প সময়ের মধ্যে বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়াই তার্পিনের বিশেষত্ব। তাই ষ্টীমের আশ্রয় পাইলেই অন্যান্য জিনিষের সহিত মিশ্রিত হইবার পূর্ব্বে তার্পিন তেল বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া আসে। পরে এই ষ্টীম বা বাষ্পকে একটী Condenserএর মধ্যে ধরিয়া ঠাণ্ডা করিলেই বিশুদ্ধ তার্পিন তেল পাওয়া যায়। ইহার সহিত অপর জিনিষের ভেজাল থাকে না।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়া হইতে নানা দেশে প্রচুর পরিমাণে তার্পিন তেল প্রেরিত হইত। আমেরিকার তার্পিনের সঙ্গে তখন রুশিয়া তার্পিনের প্রতিযোগিতা চলিত। রুশিয়ার তার্পিন পুরাতন প্রণালীতে প্রস্তুত হইত বলিয়া তেমন বিশুদ্ধ হইত না—ইহাতে যথেষ্ট ভেজাল থাকিয়া যাইত। আমেরিকার তার্পিণ কিন্তু আধুনিকতম বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ষ্টীমের সাহায্যে প্রস্তুত হইত। তাই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে আমেরিকার তার্পিনই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। ইহার দামও ছিল রুশিয়ার তার্পিন হইতে প্রায় দ্বিগুণ বেশী। প্রকৃতপক্ষে তখনকার রুশীয় "তার্পিন" আখ্যা দেওয়াই চলিত না। কিন্তু আজকাল অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আধুনিক প্রণালীতে প্রচুর তার্পিন তেল এখন রুশিয়াতেও প্রস্তুত হইতেছে। আজকাল দেখা যাইতেছে যে কাঠ হইতে ষ্টীমের সাহায্যে বিচক্ষণতার সহিত চুয়ানো উৎকৃষ্ট তার্পিন তৈল এবং রজন হইতে প্রস্তুত তার্পিন তেলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। তবে দেবদারু গাছের প্রকারভেদে তার্পিনের ও প্রকারভেদ হইয়া থাকে একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আমেরিকার প্রস্তুত "গাম তার্পিনের" মধ্যে পিনিন (pinene) নামক পদার্থই বেশীর ভাগ থাকে। বাজারে ফরাসী তার্পিনের ও যথেষ্ট চল আছে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে এই তার্পিন আমেরিকার "গাম তার্পিনের" সমকক্ষ হইতে পারে না; তবে মোটের উপর ফ্রান্সের তার্পিনকেও একান্ত নিকৃষ্ট বলা যায় না। পরীক্ষা

করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অন্যদের তার্পিনও আমেরিকার তার্পিন হইতে বিশেষ নিকৃষ্ট নহে।

ভারতবর্ষে নানা প্রকারের দেবদারু গাছ আছে; ইংরাজীতে এগুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। যেমন P. longifolia, P. excelsa, P. khasya, P. merkusii প্রভৃতি P. longifolia গাছকে এদেশে "চীর গাছ" বলে। সমগ্র পাঞ্জাব, কাশ্মীর, এবং উত্তর পশ্চিমসীমান্তের পার্ব্বত্য প্রদেশে এই চীর গাছের জঙ্গল দেখা যায়। বিহার এবং উড়িষ্যার জঙ্গলে যেমন শাল গাছের অরণ্য দেখা যায়, উত্তর পশ্চিম সীমান্তে তেমনি চীর গাছের জঙ্গল দেখা যায়; এই গাছের ফল বড় আকারের এবং মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের পাঞ্জাবী ফল বিক্রেতাদের দোকানে "চিলগুজা" নামে বিক্রয় হয়, ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু, ইহার রং কালো এবং আকারে সরু ও লম্বা, অনেকটা পাখা বা খর্জ্জুরের বীজের মত কিন্তু তদপেক্ষা লম্বা ও মোটা।

এই চীর গাছে এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ তেল ও রজন আছে যে, তাহা দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি রাত্রে পিণ্ডী অঞ্চলের পার্ব্বত্য পাহাড়িয়া অন্ধকার রাত্রে চলাফেরা করিতে হইলে চীর গাছের ডাল জ্বালাইয়া চলা ফেরা করে। ইহা ঠিক মশালের ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে; এক এক খানি ডাল আগুনে ধরাইয়া তাহাই হাতে করিয়া মশালের আলোর ন্যায় পথ আলোকিত করিয়া তাহারা গন্তব্য স্থানে যায়।

চীরগাছে অপর্য্যাপ্ত তেল আছে বলিয়াই উহার কাঠ চেঁছিয়া উহাতেই তার্পিন তেল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে সমস্ত তার্পিনই এই গাছের রজন অথবা কাঠ হইতে প্রস্তুত হয়। উপরে অন্যান্য প্রকারের যে সমস্ত দেবদারু গাছের নাম করা হইল, সেগুলি হইতে তার্পিন তৈয়ার করার ব্যবস্থা এখনও রীতিমত প্রচলিত হয় নাই। এপর্য্যন্ত ভারতে মাত্র দুইটি তার্পিনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাও গবর্ণমেন্টের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাবধি অনেকটা সরকারী সাহায্যেই চলিতেছে। দেশের যাঁরা ধনী, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহারা এখনও এবিষয়ে একেবারে উদাসীন। এইটি অবশ্য অল্প মূলধনের যোগ্য কারবার নহে। প্রচুর মূলধন খাটাইয়া একটা বিরাট ব্যবসায় গড়িয়া তুলিবার সুযোগ এবং সকল সুবিধাই এখানে রহিয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে, অপর দিকে তেমনি বহুসংখ্যক বেকার ভারতবাসীর কাজের সংস্থান হইতে পারে। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কৃপা দৃষ্টি একবার এই সমস্ত ছোটখাট বিষয়ে পড়িবে কি?

সম্প্রতি ভারতের তার্পিন শিল্পে কেবল চীর গাছই ব্যবহৃত হইতেছে। এই গাছ পাঞ্জাবে ও সীমান্ত প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নূতন করিয়া এগুলি জন্মাইবার চেষ্টা কেহ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না, কেবল জঙ্গলের গাছগুলি কাটাইয়া উজাড় করা হইতেছে। ইহার ফলে আর কয়েক বৎসর পরে হয়ত এই চীর গাছ ভারতবর্ষ হইতে একেবারেই অদৃশ্য হইবে। এমনিভাবেই লাল রকম কাঠ (Red wood) ভারতবর্ষ হইতে প্রায় একরূপ অদৃশ্য হইয়াছে। এক সময়ে ভারতে নানা স্থানে এই কাঠের বড় বড় বন ছিল। মধ্য ভারতের কিম্বা হিমালয়ের পাদদেশে দুই চারিটি মাত্র ঐ জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাঠ হইতে গাঢ় লাল রং,

প্রস্তুত হয়—এরূপ রং আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। বিদেশী ব্যবসায়ীরা ইহা লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দয়ভাবে বকম কাঠ কাটিয়া সমস্ত বনগুলি উজাড় করিয়া দিয়াছে; তখন কেহই ইহাদিগকে বাধা দেয় নাই। তারপর এই মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মাইবার কোন চেষ্টাই আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষ হইতে করা হয় নাই। দিনের পর দিন এই ভাবে ভারতের খনিজ, কৃষিজ এবং বনজ সম্পদের অপচয় হইতে থাকিলে দুনিয়ার হাটে কাঙাল সাজিয়া বাহির হওয়া ছাড়া ভারতের আর উপায় কি? এরূপ নির্ম্মম অপচয়ে কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য না হইয়া পারে না।

চীর গাছের কথা বলিতেছিলাম। ইহা যে কত মূল্যবান তাহা তার্পিণের দরের প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়। এই কাঠের মধ্যে তেলের মাত্রা এতবেশী যে, দরিদ্র লোকেরা তেল কিনিতে অসমর্থ হইয়া রাত্রিকালে এই কাঠ জ্বালাইয়া আলোকরূপে ব্যবহার করে। চীর গাছের একটি টুক্‌রা জ্বালাইয়া রাখিলে তাহা প্রায় মশালের মত জ্বলিতে থাকে। অধুনা ভারতীয় তার্পিণের জন্য এই চীর গাছই একমাত্র ব্যবহৃত হইতেছে। পাঞ্জাবের জালো (Jallo) এবং যুক্ত প্রদেশের ক্লাটারবাকগঞ্জ (clutter buckganj) নামক স্থান দুইটিতে সম্প্রতি দুইটি তার্পিণের কারখানা চলিতেছে।

(ক্রমশঃ)

নুনের ব্যবসা।

নুন কেবল মানুষের অপরিহার্য্য খাদ্য নহে—পশুর পক্ষেও ইহা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশের শাসন সরকার এখানে নুন তৈরী করার পথে এমন সব আইন কানুন এবং বাধা বিঘ্ন রচনা করিয়াছেন, যাহার ফলে দরিদ্র ভারতবাসীরা আজ প্রয়োজনের অনুরূপ নুনও জুটাইতে পারিতেছে না। গবাদি পশুকে যে পরিমাণ নুন খাওয়ান প্রয়োজন তাহা তো জুটেই না; এমন কি দীন দুঃখীরা নিজেরাই এই নুন কিনিয়া খাইতে পারে না। অথচ মজার কথা এই যে, এক সময়ে এদেশেই প্রচুর পরিমাণে নুন উৎপন্ন হইত। আজও যে তাহা হইবার উপায় নাই—এমন নহে। কিন্তু সরকারী আইন যে দুর্ভেদ্য বিধি নিষেধ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে তাহার

ফলেই প্রধানতঃ ভারতবর্ষে নুন প্রস্তুত হইতেছে না। ভারতবর্ষের তিন দিক দিগন্তব্যাপী লবণাম্বু রাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত ; স্মরণাতীত কাল হইতে সমুদ্রতীর বাসী লোকেরা সমুদ্রের বেলা ভূমিতে জল বাঁধিয়া রাখিয়া সূর্য্যের তাপে সেই জল শুকাইয়া নুন তৈয়ারী করিত। ইহাদিগকে সচরাচর "নুনিয়া" বলে। ভারতের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বহু পল্লীতে "ধীবর" এবং "নুনিয়া" জাতি বাস করিত ; এদের পেশা ছিল সমুদ্রের মাছধরা এবং অপরের পেশা ছিল নুন তৈরী করা। কিন্তু ইংরাজ অধিকারের পর নুন তৈরী করার একচেটিয়া অধিকার কেবল গভর্ণমেণ্টেরই হাতে রহিল এবং সেই হইতে আইনের দ্বারা অপর কাহাকেও নুন তৈরী করা নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। এই আইনের বলে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে এ যাবৎ কাল কত লোক যে জেলে গিয়াছে,জরিমানা দিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। সরকারের "নিমক মহল"একটা বিরাট ব্যাপার। যাহা হউক, এইরূপে নুনের অবাধ ব্যবসা এদেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে এবং "নুনিয়া" জাতির অস্তিত্বও নুনের ব্যবসা হিসাবে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

একথা সকলেই জানেন যে, লবণাক্ত সাগরের জল সিদ্ধ করিলেই নুন পাওয়া যায় ; কিন্তু এরূপ ভাবে নুন প্রস্তুত করা আইন বিরুদ্ধ। গোপনে নুন তৈয়ারী করার অপরাধে নানা স্থানে দরিদ্র ভারতবাসীর দণ্ড হইয়াছে। বরিশালের মুন্সাকান্দুর স্মৃতি এখনও দেশবাসীর মনে জাগরুক রহিয়াছে ! নিরক্ষর কতিপয় অধিবাসী ছয় সের মাত্র নুন তৈয়ারী করিয়াছিল। তাহার ফলে যেন বৃটিশ সিংহের টনক নড়িয়া উঠিল। সুদূর সেই পল্লীগ্রামে রক্তপাত অবধি বাকী রহিল না। যে সমস্ত কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবে। মোটকথা, ভারতের বিভিন্ন সমুদ্র তীরে নুন প্রস্তুতের অধিকার তো এদেশ-বাসীর নাই-ই ; অধিকন্তু রাজপুতনার পাহাড়ে যে নুন আছে তাহাও ব্যবহার করিবার পথ নানা কারণে রুদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এই সমস্ত দেশীয় নুন আনিবার রেলভাড়া এরূপ বর্দ্ধিত হারে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে যে, তদপেক্ষা অল্পমূল্যে বিলাতী নুনই এদেশে আনয়নকরা যাইতে পারে। তারপর লবণের উপর ভারত সরকার যে শুল্ক বসাইয়াছেন, তাহার ফলে এই বিলাতী নুনের দামও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। এই শুল্ক রহিত হইলে কিম্বা হ্রাস পাইলে আর কিছু না হউক সস্তায় একটু নুন কিনিয়া ভারতবাসী জনসাধারণ অন্ততঃ দু'টি ভাত খাইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতেও নারাজ। ইতিপূর্ব্বে ভারতবাসী ব্যবস্থা পরিষদে এই লবণ শুল্ক লইয়া আন্দোলন, আলো-চনা ইত্যাদি কম হয় নাই। দেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি যাঁহারা—তাঁহারা ভোটের বলে এই শুল্ক রহিত করার প্রস্তাবও পাশ করিয়া ছিলেন ; কিন্তু পরিশেষে বড়লাট তাঁহার অতিরিক্ত]ক্ষমতার বলে এই সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দেন।

সে যাহাই হউক অধুনা আবার সরকার পক্ষ হইতে কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। ইহা সদস্য গণের উপর ভার পড়িয়াছে। ভারতে নুন প্রস্তুত করা সম্ভবপর কিনা তাহাই তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে। এই কমিটি কিরূপ মন্তব্য করিবেন— তাহা বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, এই ভারতবর্ষে এদেশের চাহিদার অনুরূপ লবণ প্রস্তুত করা সম্ভবপর। এমন কি, এদেশ হইতে বিদেশে নুন রপ্তানি করাও একান্ত অসম্ভব হইবে না। যাহারা এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন

তাঁহারা বলেন যে, বিলাত অপেক্ষা অনেক কম খরচে এদেশে নুন প্রস্তুত করা যাইতে পারে; কিন্তু তৎসত্বেও বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ বিদেশীরা বড় ষ্টীমার ভাড়া দিয়া বিলাত হইতে ভারতবর্ষে যত নুন আমদানী করেন, এদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রেলভাড়া দিয়া সেই পরিমাণ নুন আনাইতে হইলে দ্বিগুণের ও বেশী ব্যয় পড়ে। ভাড়া সম্বন্ধে এই যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা—তাহাই কয়লার ব্যবসার ন্যায় ভারতীয় নুনের ব্যবসায়ের অন্তরায় হইতে উঠিয়াছে। ইহার ফলে ভারতে প্রস্তুত নুনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং বিলাতী নুন আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে।

১৯২৭-২৮ সালে সর্ব্বসমেৎ ভারতবর্ষে ২০৪৯ ৫০০ টন নুনের কাট্‌তি হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫৯৬০০০ টন নুনই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৫৪২০০০ টন মাল আমদানী হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় আমদানীর পরিমান শতকরা ১০ টন হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে দুই প্রকারের নুন ব্যবহৃত হয়। যথাঃ—সাদা পরিষ্কার গুড়া করা নুন এবং অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কৃত টুকরা নুন। শেষোক্ত প্রকারের নুন আমাদের দেশেই উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে স্বদেশী নুন বলিয়া থাকে। বিদেশ হইতে যে নুন আমদানী হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগই পরিষ্কৃত গুড়া করা নুন। বাঙ্গলাদেশ ও ব্রহ্মদেশেই এই নুনের কাট্‌তি বেশী। ১৯২৬-২৮ সালে বাঙ্গলা দেশে প্রায় ৪৯৭০০০ টন অর্থাৎ শতকরা ৮৩ ভাগ বিলাতী নুন ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে হইয়াছে ১৯০০০ টন অর্থাৎ শতকরা ১৭ ভাগ। আলোচ্য বর্ষে এডেন হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নুন এদেশে আমদানী হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালে এডেন হইতে ১৮০০০০ টন নুন এদেশে আসিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে আসিয়াছিল ৫৩ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে পাইয়াছিল ৩৯½ লক্ষ টাকা।

তাহা ছাড়া মিশর হইতে ৩৩¾ লক্ষ টাকা মূল্যের ১২৩০০০ টন নুন আমদানী হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন হইতে ৮১০০০ টন, স্পেন হইতে ৪৩৫০০ টন, জার্ম্মাণী ৫৬১০০ টন এবং ইটালীর অধিকৃত পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ৫৬২০০ টন নুন আলোচ্য বর্ষে ভারতে আমদানী হইয়াছে। মোটের উপর ১৯২৭।২৮ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে ৫৯৬২০০ টন নুন ভারতে আসিয়াছে। কোন দেশ হইতে শতকরা কত ভাগ নুন আসিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

এডেন—	শতকরা	৩০'২
মিশর—	"	২০'৭
গ্রেট বৃটেন —	"	১৩'৬
স্পেন—	"	১৪'০
জার্ম্মাণী—	"	৯'৫
ইটালীর অধিকৃত পূর্ব্ব আফ্রিকা	"	৯'৪
অন্যান্য দেশ—	"	২'৬
		১০০

ইহা হইতে দেখা যায় যে,সস্তা জাহাজ ভাড়ার সুযোগ পাইয়া বিদেশী নুন ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। অথচ রেল ও ষ্টীমারের ভাড়া কমান হইতেছে না বলিয়াই বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে ভারতের বাজারেও

দেশীয় নুন ক্রমেই হটিয়া যাইতেছে গত আশ্বিন মাসের বাঙ্গলা ও বাণিজ্যে ভারতে জলপথে ব্যবসায় কিরূপে সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে এই রেঙ্গুন বরাবর জাহাজ ভাড়া সম্বন্ধে আমরা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। পাঠকদিগকে আমরা তাহা পুনরায় পড়িতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গলায় অবশ্য বোম্বাই অঞ্চল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে দেশীয় নুনও আমদানী করা হয়। ১৯২৭-২৮ সালে এই দেশীয় নুন ৩২০০০ টন কলিকাতায় আসিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সালে, কোন মাসে—কি দরে—কোন স্থানের নুন প্রতি১০০ বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মাস	লিভারপুল,	স্পেন,	বোম্বে
১৯২৭ :—			
এপ্রিল	১২৫৲	১০৩৲	৬৫৲
মে	১২৫৲	১১০৲	৬৫৲
জুন	১২৫৲	১১৮৲	৬৫৲
জুলাই	১২৫৲	১২১৲	৭৫৲
আগষ্ট	১২৫৲	১১৮৲	৭৫৲
সেপ্টেম্বর	১২৫৲	১১৮৲	৭৫৲
অক্টোবর	১২৫৲	১১৮৲	৭৫৲
নবেম্বর	১১০৲	১০৩৲	৭৫৲
ডিসেম্বর	১১০৲	......	৭০৲
১৯২৮ :—			
জানুয়ারী	১১০৲	......	৭০৲
ফেব্রুয়ারী	১১০৲	১০৩৲	৭০৲
মার্চ	১১০৲	১০৩৲	৭০৲

উপরে যে হিসাব দেওয়া গেল তাহাতে দেখা যায় দেশীয় নুন সর্ব্বদাই সস্তা দরে বিক্রয় হইয়াছে, কিন্তু এই দর কেবল বোম্বাইয়ের গোলায় দর। অন্যত্র এই দরে নুন পাওয়া যায় নাই। বোম্বাই হইতে অপর স্থানে চালান দিতে হইলেই প্রচুর পরিমাণে ভাড়া লাগে। তাই বোম্বাইয়ের বাহিরে অন্যত্র সস্তা দরে দেশীয় নুন বিক্রয় করার উপায় নাই। এই যে বিসদৃশ ব্যবস্থা ইহার আশু প্রতীকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যতদিন স্বাবলম্বী হইয়া আমরা নিজের জাহাজ গড়িতে না পারিব এবং অন্ততঃ উপকূল বাণিজ্য হইতে—বিদেশী জাহাজ কোম্পানী সমূহের শত্রুতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বীতা বন্ধ করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের এই সকল শিল্প কিছুতেই মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে পারিবে না।

রেলের সময় নির্দ্দেশ

হাওড়া ষ্টেশন

(কলিকাতার সময় লিখিত)

ট্রেণের নাম		ছাড়ে		পৌঁছে	
বি, এন, আর—					
মাদ্রাজ মেল্		বৈকাল	৫-১২	মধ্যাহ্ন	১১-৪
বোম্বাই মেল্		বৈকাল	৪-০	সকাল	৭-৫৪
পুরীএক্সপ্রেস্		রাত্রি	৮-২৫	সকাল	৭-৩০
রাঁচি এক্সপ্রেস টাটা নগর হইয়া		রাত্রি	৯-১৪	সকাল	৬-২৪
হাওড়া পুরুলিয়া কাষ্ট	প্যাসেঞ্জার	রাত্রি	৯-২৪	সকাল	৭-১
হাওড়া মেদো	প্যাসেঞ্জার	সকাল	৭-১	রাত্রি	৯-৮
হাওড়া পুরী	প্যাসেঞ্জার	মধ্যাহ্ন	১২-০	ভোর	৫-২০
		রাত্রি	১০-৪৪	বেলা	২-৫০

হাওড়া নাগপুর
প্যাসেঞ্জার্ সকাল ৮-৫৪ মধ্যাহ্ণ ১১-৩
রাত্রি ১০-১৩ রাত্রি ৭-৪
গমো প্যাসেঞ্জার্ রাত্রি ৯-৫৪ সকাল ৭-০
ই, আই, আর :—
মোকামা প্যাসেঞ্জার্—
সকাল ৬-৩০—রাত্রি ১০-৩৭
কিউল প্যাসেঞ্জার্ ভায়া লুপ—
সকাল ১০-৯—রাত্রি ৯-১৪
কাণপুর প্যাসেঞ্জার্ ভায়া গ্র্যাণ্ডকড—
বেলা ১০-৩৪—বিকাল ৫-৫৮
দিল্লী এক্সপ্রেস্ ভায়া মেইন লাইন—
বেলা ১১-৩০—সকাল ৮
দানাপুর প্যাসেঞ্জার্—
বেলা ১-৩৯—বিকাল ২-৪৪
মুঙ্গের প্যাসেঞ্জার্—
বেলা ২-২৪—বেলা ২-৫
লাহোর এক্সপ্রেস্ ভায়া আগ্রা সিটি -
বিকাল ৩ ৪৫—রাত্রি ৮-১৪
আগ্রা ক্যাণ্ট তৃতীয় শ্রেণী এক্সপ্রেস—
বিকাল ৪-৫৪ —বেলা ১১-১৯
বোম্বাই মেল্—
রাত্রি ৭-৩০—বেলা ১১-৪০
ডেরাদুন এক্সপ্রেস্—
রাত্রি ৮—সকাল ৬ ৪৪
কাশী এক্সপ্রেস্ ভায়া সাহেবগঞ্জ—
রাত্রি ৮-১২—সকাল ৭-১০
পাঞ্জাব মেল্—
রাত্রি ৮-৩০ সকাল ৭-১০
দানাপুর এক্সপ্রেস্—
রাত্রি ৮-৪৫—সকাল ৬-৩০
গয়া প্যাসেঞ্জার্—
রাত্রি ১০-৩০—সকাল ৬-২০
মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার্—
রাত্রি ১০-৪০—ভোর ৫-৫

কাটোয়া লাইন

সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার্—
সকাল ৬-৫৪ বিকাল ৪
আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার্ শনিবার ছাড়া
—বেলা ১-৯—রাত্রি ৮-৫০
কাটোয়া প্যাসেঞ্জার্ শনি ও রবি ছাড়া—
—বিকাল ৩-৩০৯-৩৯
কাটোয়া প্যাসেঞ্জার্ রবিবার ছাড়া—
সন্ধ্যা ৬-৪—সকাল ৯-৩৬
ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার্—
রাত্রি ৭-৩৯—সকাল ৬-৩২

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই, বি' আর :—
দার্জ্জিলিং মেল্—
রাত্রি ৮-১৪—সকাল ৭ ২৪
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস্—
রাত্রি ৯-২৪—সকাল ৭-২৪
আসাম মেল—বেলা ৮-২৪ সকাল ১০-২০
কাটিহার প্যাসেঞ্জার্—
রাত্রি ৯-৪—সকাল ৭৫৪
চট্টগ্রাম মেল—
সকাল ৭—রাত্রি ৭-৪৪
সিরাজগঞ্জ ঘাট প্যাসেঞ্জার্—
রাত্রি ৮-৩৪—সকাল ৫৩৪
ঢাকা মেল—
রাত্রি ১০-২৪—সকাল ৫-৩৪
পার্ব্বতীপুর প্যাসেঞ্জার্—
সকাল ১১-১৯—ভোর ৪-৯
কাটিহার প্যাসেঞ্জার্—
বেলা ২-১০—বেলা ২-৩১
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার্—
সন্ধ্যা ৬-৫৪—সকাল ১০-৩৪
রাজসাহী প্যাসেঞ্জার্—
রাত্রি ১১ ২৪—ভোর ৪-৫৯
সান্তাহার প্যাসেঞ্জার্—বেলা ৩-৩৪
দিল্লী এক্সপ্রেস ই, আই, আর—
রাত্রি ১০-১৪—সন্ধ্যা ৬ ১৪

খুলনা লাইন

খুলনা প্যাসেঞ্জার্—
সকাল ৯-৩০—বিকাল ২-৪
ঐ বেলা ৮-১৪—রাত্রি ৯-২০
ঐ রাত্রি ৯-৪৪—ভোর ৫-৫৯
বরিশাল এক্সপ্রেস্—
বেলা ২-৪—বেলা ১০-৫

করাতের গুঁড়া

আমাদের এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জিনিষের যেমন অপচয় হয়, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ হয় না ;- একথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, সকলেই নিজ নিজ দেশের লতা পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ম্লায় ধুলা বালি পর্য্যন্ত কোন না কোন কাজে লাগাইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলেই আজ বিভিন্ন সভ্য জাতিরা প্রবল প্রতিযোগিতার বাজারে আগাইয়া চলিতেছে ; আর আমরা—এই শস্যশ্যামলা, নদীমেখলা এবং বনরাজি বহুলা ভারতভূমির অধিবাসী হইয়াও—দুঃখ দুর্দ্দশার অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছি ; অথাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। ভবিষ্যৎ আমাদের ক্রমেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

সে যাহাই হউক, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে আমরা একটি সামান্য জিনিষের ব্যবহারের কথা আলোচনা করিব। আমাদের এদেশে কিন্তু এই জিনিষটির কোনই আদর নাই—ইহাকে কোনমতে ঠেলিয়া বিদায় করিতে পারিলেই ভারতবাসীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, অথচ এই জিনিষটিকেই কাজে লাগাইয়া পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা আজকাল নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিতেছেন। ইহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান করিবার যে প্রবৃত্তি এবং উৎসাহ—তাহাই আজ পাশ্চাত্য জাতিকে এতটা বড় করিয়া দিতেছে।

আমরা এই প্রবন্ধে করাতের গুঁড়ার কথা আলোচনা করিব। এদেশের বিভিন্ন কাঠের কারখানায় এ জিনিষটি নিতান্ত অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সময় সময়ে ইহা পচিয়া ইহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং তন্মধ্যে নানা প্রকার পোকা জন্মে। সেই পোকা সবল সতেজ হইয়া কাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঠ খাইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে সেই কাঠকেও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। তারপর পচা করাতের গুঁড়া দ্বারা অনেক সময় কাঠের কারখানা নোংরা ও কদর্য্য হইয়া

উঠে। এই অবস্থায় প্রতিকারের জন্ত মজুরী দিয়া অনেক কারখানার মালিক করাতের গুঁড়া গুলিকে দূরে ফেলিয়া দিয়া থাকেন। আর কোন ব্যক্তি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া এই সমস্ত গুঁড়া লইয়া যায়—তাহা হইলে কারখানার মালিক তাহাকে শত ধন্তবাদ দেন—যেন এই করাতের গুঁড়া কারখানার একটা জঞ্জাল, যেন ইহা একেবারেই অকর্ম্মণ্য, যেন এই জিনিষটির দ্বারা কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই, সুতরাং কারখানা হইতে বিদায় হইলেই মঙ্গল।

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই জিনিষটিকে কাজে লাগাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে, অন্ততঃ পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে, এই করাতের গুঁড়া আজকাল মূল্যবান্ সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এদেশেও এখন কোন কোন কাজে সামান্ত পরিমাণে করাতের গুঁড়া ব্যবহৃত হইতেছে বটে; কিন্তু ইহার অধিকাংশই অনর্থক পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই অপচয় নিবারণ করিয়া করাতের গুঁড়া কাজে লাগাইবার অনেক পন্থা রহিয়াছে। সে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইলে উপার্জ্জনের পথও প্রশস্ত হইতে পারে।

করাতের গুঁড়া একপ্রকার নহে; ইহার মধ্যে অনেক প্রকারভেদ আছে। তারপর সকল কাঠের গুড়ার রং সমান নহে। কোনটি লাল, কোনটি কালো এবং কোনটি সাদা হইয়া থাকে। বড় বড় স মিলে (Saw mills) যে গুড়া উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণতঃ মোটা আঁশ যুক্ত এবং প্রায়ই এই গুঁড়ার সহিত কাঠের টুকরা ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। কাঠ যদি পাকা (Seasoned) না হইয়া কাঁচা হয় তাহা হইলে চিরিবার সময় এই কাঠ হইতে যে গুড়া উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই ভিজা হইয়া থাকে।

যে সমস্ত কারখানায় বড় বড় কাঠ চেরা হয়, তৎসমস্ত স্থানেই গুড়াগুলি মোটা, অসমান এবং অনেকটা কদাকার হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে ছোট করাতের সাহায্যে কাষ্ঠ খণ্ড গুলি চিরিয়া বিভিন্ন আসবাব পত্রাদি তৈয়ারী হয়। তথায় খুব ভাল গুড়া পাওয়া যায়। এই গুড়া গুলি সূক্ষ্ম হয় এবং ভিজা হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

ইহা ছাড়া আরও এক প্রকার কাঠের গুঁড়া আছে—তাহা আরও সূক্ষ্ম, মোলায়েম এবং চমৎকার। বিভিন্ন আসবাব পত্র তৈয়ারী হইবার পর সেগুলিকে শিরিশ কাগজ ইত্যাদি দ্বারা পালিশ করিবার সময় এই গুড়া উৎপন্ন হয়। এগুলি অনেকটা ময়দার ন্যায়।

এই সমস্ত করাতের গুড়া যাঁহারা কাজে লাগাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যেখানে খুসি করাতের গুঁড়া ফেলিয়া রাখিলে সেগুলি পচিয়া যায় এবং তাহাতে যে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা অপর কাজের বিঘ্ন জন্মে। করাতের গুঁড়া গুলিকে যথাসম্ভব পরিষ্কার ভাবে রক্ষা করিতে হইবে—দেখিতে হইবে যেন ইহার সহিত ধুলা বালি ইত্যাদি মিশ্রিত হইয়া গুঁড়াগুলিকে অকেজো করিয়া না ফেলে। তার পর এই সমস্ত গুড়ার সহিত কাঠের টুকরাগুলি মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনাও দূর করিতে হইবে। কারণ এরূপ কাঠের টুকরা যদি মিশিয়া যায় তাহা হইলে পরে সেগুলিকে পৃথক না করিয়া করাতের গুড়া কোন কাজেই ব্যবহার করা যায় না।

সুতরাং গোড়ায় সতর্ক হওয়া প্রয়োজন—ইহাতে অনেক অর্থের সাশ্রয় হয়। ইহা ছাড়া আর একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—তাহা এই যে, কোন প্রকারেই যেন করাতের গুঁড়াগুলি জলের সংস্পর্শে না আসে। একবার এই সমস্ত গুঁড়া জলে ভিজিয়া গেলে তাহা শুষ্ক করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয় এবং শুষ্ক হইলেও এই গুঁড়ার গুণাবলীর তারতম্য না হইয়া পারে না। বিশেষ সতর্কতার-সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে এবং শুষ্ক অবস্থায় করাতের গুঁড়া জমাইয়া রাখিতে পারিলে তাহা অনেক কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। নিম্নে মোটামুটি কয়েকটি কাজের কথা উল্লেখ করা গেল :—

(১) জ্বালানী কাঠ ও কয়লার পরিবর্তে এই করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে একটু অসুবিধা আছে। সাধারণ কাঠ ও কয়লা যে ভাবে জ্বালাইতে পারা যায়—করাতের গুঁড়া ঠিক সেই ভাবে উনুনের মধ্যে দিয়া জ্বালান যায় না। তবে কাঠ কিম্বা কয়লার আগুনের উপর অল্প অল্প করিয়া শুষ্ক করাতের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে তাহা ধীরে ধীরে জ্বলিতে পারে। এক সঙ্গে বেশী দিলেই বিপদ—আগুন তাহা হইলে চাপা পড়িয়া নিভিয়া যাইতে পারে। বায়ু চলাচলের পথ না থাকিলে সাধারণতঃ আগুন জ্বলিতে পারে না। করাতের গুঁড়ার স্বভাব এই যে, সেগুলি একত্র জমাট হইয়া বাতাসের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলেই আগুন নিভিয়া যায়। তাই অনেক সময় কাঠি দ্বারা নাড়া চাড়া করিলে ফল পাওয়া যায়—অর্থাৎ করাতের গুঁড়া দিলেও উনুনের আঁচ নিভিয়া যায় না। সাধারণতঃ আমাদের বাড়ীতে রান্না করিবার সময় এই প্রণালীতে করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গুঁড়ার পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত উনুন আমদানী করা যাইতে পারে। যেমন ধুনী করাতের গুঁড়া দিয়া আগুন জ্বালাইবার জন্য, অধুনা নানা প্রকারের বিলাতি সমস্ত উনুন তৈয়ারী হইয়াছে। সেই সমস্ত উনুনের মধ্যে করাতের গুঁড়া ব্যবহার করিতে হইলে কোনও বেগ পাইতে হয় না।

আর একটি প্রণালীতে এই করাতের গুঁড়াকে জ্বালানি কাঠে পরিণত করা যাইতে পারে। মোটের উপর এই করাতের গুঁড়া গুলি কাঠ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই গুঁড়া গুলিকে একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাপ দিয়া এক প্রকার কৃত্রিম কাঠ তৈয়ার করিতে পারা যায়। সেই কাঠ অনায়াসে কয়লার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। তবে এই প্রণালীতে করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা লাভ জনক হইবে কি না—তাহাই বিবেচ্য।

(২) করাতের গুঁড়াকে প্রথমতঃ জ্বালানি কাঠ রূপে ব্যবহার করিয়া পরে ইহার ছাই গুলি চুয়াইয়া নানা প্রকার জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে। এক্ষেত্রে সমস্ত করাতের গুঁড়াগুলিকে জ্বালাইয়া একেবারে ভস্ম করিতে পারা যায় না; অর্থাৎ জ্বলিবার পূর্বেই ছাই গুলিকে পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। এই ছাই চুয়াইয়া acetic acid, wood spirit, acetone ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে। কেবল করাতের গুঁড়া নয়—এই প্রণালী অবলম্বনে কাঠের টুকরা, আবর্জনা এবং রথের কারখানা হইতে ফেলিয়া দেওয়া নিক্ষিপ্ত কাঠের অংশগুলি পর্য্যন্ত কাজে লাগান যাইতে পারে—তাহা হইতে নানা বিধ দরকারী Spirit এবং মিথ্যাল প্রস্তুত হইতে পারে।

করাতের গুঁড়ার সাহায্যে এক প্রকার জ্বালানী

কাঠ তৈয়ারী হইতেছে তাহাকে পাশ্চাত্য দেশে coal Brickette বা কয়লার ইঁট বলে। অনেকেই জানেন যে প্রত্যেক কয়লার খনিতে কয়লা বোঝাই করার সময় (loading unloading) যে গুঁড়া পড়ে তাহারা সঞ্চিত হইয়া বাদে বাদে পর্ব্বতাকার স্তূপ হইয়া থাকে। এই গুঁড়ার কোনও ব্যবহার হয় না বলিলেই হয়। অনেক বৃহৎ বাড়ীতেও রাঁধিবার কয়লা ভাঙ্গিবার সময় যে গুঁড়া পড়ে তাহাও ঘরের আবর্জ্জনা স্বরূপ ফেলিয়া দেওয়া হয় ; কেবল যে বাড়ীতে গরু আছে এবং সুগৃহিনী আছেন সেইখানেই এই কয়লার গুঁড়া গোবরের সহিত মিশাইয়া গুল তৈয়ারী করা হয় এবং তাহাই কয়লার বদলে উনুনে দিয়া গৃহস্থালীর অনেক সাশ্রয় করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে এই কয়লার গুঁড়ার সহিত করাতের গুঁড়া মিশাইয়া এবং তাহার সহিত যে কোনও রকমের Gummy বা আঠা জাতীয় একটী binding element মিশাইয়া এই মিশ্রিত তালটিকে ছাঁচে ঢালিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। এই ছাঁচগুলি আকারে চতুষ্কোন অথবা ষটকোণের চৌকার মত করা হয় এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থে ২"x২" বা ৪"x১" ইঞ্চি করা হয় যাহাতে সহজে উনুনের মধ্যে অনেকগুলি একত্রে সাজানো যায়। উনুনে সাজাইবার সময় প্রত্যেকখানি Brickette বা কয়লার ইঁট এমনভাবে সাজানো হয় যাহাতে প্রত্যেক ইঁটের মধ্যে বায়ু চলাচলের যথেষ্ট জায়গা থাকে ; নচেৎ চুলা সহজে ধরে না এবং ধরিলেও নিভিয়া যায়। যে সকল সস্তা দামের সহজ প্রাপ্য Binding element ব্যবহার করা যাইতে পারে আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি।

১। Bran বা ভুষি। প্রত্যেক চাউল এবং ময়দার কলে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে গমের এবং চাউলের ভুষি পাওয়া যায়। ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া খুব পাতলা এবং গরম গরম অবস্থায় উপরোক্ত কয়লা ও করাতের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া কাদার তালের মত করিয়া পরে ছাঁচে ঢালিয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

২। চিটেগুড়ের কারখানায় যে খোল্‌গুড় পাওয়া যায় তাহা অথবা মদ চোলাইয়ের কারখানায় যে waste matter বা আবর্জ্জনা থাকে তাহাও উৎকৃষ্ট binding cement.

৩। খয়েরের জল ও তাল binding cement.

(৩) আস্তর করা কিম্বা বাঁধাই করার সময় গুঁদ, এলবুমিন ও রজন প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সমস্ত আস্তর করার মাল মসলার সহিত মিশাইলে করাতের গুঁড়া এক প্রকার কৃত্রিম কাঠে পরিণত হয়। বহু প্রাচীন কাল হইতেই পাশ্চাত্য দেশে এই প্রণালীতে করাতের গুঁড়া ব্যবহৃত হইতেছে। তবে সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়া এই প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে। আজকাল আস্তর করার উপযোগী বিভিন্ন সামগ্রীর সহিত করাতের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া যে কৃত্রিম কাঠ উৎপন্ন হয়, তাহা সাধারণ কাঠের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট হয় না। এই কৃত্রিম কাঠ অতিরিক্ত গরমে কিম্বা জলে ভিজিয়া কোন প্রকারে তাহার রূপ পরিবর্তন করে না—ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে। অনেক সময় এই সামগ্রীর উপর বিভিন্ন রং দিয়া ঘরের মেঝে ইত্যাদি সুন্দররূপে বাঁধান চলে।

(৪) Blasting powder and Gun powder (বারুদ) তৈয়ারী করিতে অনেক সময়

করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা হয়। ইহা হইতে বাক্স তৈয়ারীর চেষ্টা এখনও চলিতেছে। তবে এই প্রণালীতে করাতের গুঁড়া কাজে লাগান লাভজনক বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন না।

(৫) Oxalic acid একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আজ কাল নানা কাজেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত করাতের গুঁড়াই এই acid প্রস্তুতের প্রধান উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

(৬) কালি শুকাইবার জন্য অনেকে ধুলা অথবা বালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে জমিদার সেরেস্তায় ব্লটিং কাগজের স্থলে আজিও অনেকে এই ধুলা বা বালীর পুঁটুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফ্রান্স দেশে ধুলার পরিবর্ত্তে করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা হয়। কারণ ইহাতে একটু সুবিধা আছে। তাহা এই যে, করাতের গুঁড়া দ্বারা পুস্তক, কলম এবং লিখিবার টেবিলের কোনই অনিষ্ট হয় না। তারপর বালি দিয়া কালি শুকাইলে চিঠিপত্রের ওজন বাড়িয়া যায়। তাহাতে ডাক খরচা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে। করাতের গুঁড়া ব্যবহার করিলে ওজনে ভারী হইবার কোনও আশঙ্কা থাকে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সকল প্রকারের করাতের গুঁড়া দ্বারা কালি শুষ্ক করা চলে না। তজ্জন্য খুব সূক্ষ্ম, পরিষ্কার এবং শক্ত কাঠের গুঁড়ার প্রয়োজন হয়। অনেকে আবার সখ করিয়া রঙ্গীন এবং সুগন্ধযুক্ত অতি চমৎকার করাতের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(৭) কাঠের মধ্যে কতকগুলির নিজস্ব রং আছে। তাহা হইতে লাল, হলুদে এবং কাল রং বাহির করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাঁঠাল ও মেহগিনি কাঠের কথা বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর মূল্যবান কাঠের গুঁড়া পৃথকভাবে জমাইয়া রাখিলে পরে তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া চমৎকার রং উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেই রং অন্যান্য কাজে লাগিতে পারে।

(৮) কাঠ দ্বারা বিভিন্ন আসবাব পত্র তৈয়ারী করিতে গেলে দেখা যায়—অনেক সময় কাঠের মধ্যে খুঁৎ রহিয়া গিয়াছে। কাঠের গায়ের সেই সমস্ত গর্ত্ত এবং অসমান স্থান অপর কোন কিছু দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া দিতে হয়। তজ্জন্য মিস্ত্রীরা সাধারণতঃ পুটিন জাতীয় সমগ্র (Plastic Cement) ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সিমেণ্টের মধ্যে করাতের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে ভাল হয়। যে শ্রেণীর কাঠের খুঁৎ সারিতে হয়, সেই শ্রেণীর কাঠের গুঁড়া ব্যবহার করিলেই রং এর বৈষম্য থাকে না—একেবারে ঠিক ঠিক মিলিয়া যায় এবং সহজে আর খুঁৎ ধরা পড়ে না।

(৯) তারপর যে সকল জিনিষ ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলি প্যাক করিয়া কোথাও পাঠাইতে হইলে করাতের গুঁড়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে কাঁচের জিনিষের কথা বলা যাইতে পারে। যে করাতের গুঁড়াতে ধুলা মাটির লেশ পর্য্যন্ত নাই, এবং যাহা একেবারে ঝরঝরে শুকনা—তাহা দ্বারা কাঁচের জিনিষ প্যাক্ করিলে ভাঙ্গিয়া যাইবার কোনও আশঙ্কা থাকে না। অধিকন্তু পার্শ্বেলের ওজন ও কম হয়। মোটের উপর করাতের গুঁড়া জিনিষটি তেমন ভারী নহে।

(১০) অনেক সময় বাস করিবার ঘরের, খাবার ঘরের কিম্বা রান্না ঘরের মেঝে ইত্যাদি স্যাঁৎ সেঁতে (Damp) এবং পিচ্ছিল হইয়া যায়। এই অবস্থা নিবারণের জন্য করাতের গুঁড়া বিছাইয়া দিয়া ঘরটিকে রাখিয়া দিলে উহা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়।

(১১) তুঁষ দিয়া আমাদের দেশে ডিম রক্ষা করা হয়। তুঁষের পরিবর্ত্তে করাতের গুঁড়া অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনেক সময় তুঁষ ভিজা থাকে এবং তাহা হইতে কদর্য্য গন্ধ বাহির হয়। তাহা ছাড়া তুঁষ, কুঁড়া প্রভৃতি গরু এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুর অতি প্রিয় এবং মূল্যবান খাদ্য; ডিম রক্ষা করার জন্য এই মূল্যবান খাদ্যগুলি ব্যবহার করিলে অন্যদিকে পশুদিগের আহার নষ্ট করার জন্য একটা মহা অপচয় হয়। এ যেন ঠিক robbing Peter to pay Paul অর্থাৎ একের ভাতমারিয়া অপরের পেট ভরানো ব্যাপার। এইজন্য করাতের গুঁড়ার মধ্যে ডিম রাখিয়া প্যাক করিলে সব দিকেই সুবিধা হয়। বিশুদ্ধ এবং শুষ্ক করাতের গুঁড়ার মধ্যে ডিম রক্ষা করিলে কোনদিক হইতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা থাকে না, অধিকন্তু করাতের গুঁড়া দ্বারা প্যাক্ করিয়া ডিমকে যেখানে খুসী প্রেরণ করা যায়।

কলিকাতায় মুরগীর ডিমের যেরূপ অসম্ভব দাম এবং টান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মফঃস্বল হইতে ডিম চালান দিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা নাই। এ সময় কলিকাতায় মাঝারী রকমের ডিমের জোড়া আট পয়সার কমে পাওয়া যায় না। আমরা কলেজ ষ্ট্রীট বাজার হইতে মুরগীর ডিমের জোড়া সাত পয়সায় এবং হাঁসের ডিমের জোড়া ছয় পয়সায় কিনিয়েছি; অথচ পূজার সময় দেওঘরের মত জনবহুল স্বাস্থ্যকর স্থানেও আমরা চার পয়সায় বেশ বড় ডিমের জোড়া কিনিয়াছি। যখন হাওয়াখোরেরা দেওঘরে থাকেন না এবং লোকের ভিড়ও কমিয়া আসে, তখন মুরগীর ডিম প্রচুরতর তিনপয়সা জোড়ায় এবং কখনও কখনও দুইপয়সা জোড়ায় বিক্রয় হয়। এ হ'চ্ছে সহরের উপরে বাজারের দর। দেহাৎ বা দূর পল্লীসমূহ হইতে সংগ্রহ করিলে আরও সস্তায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশেরও অনেক স্থান হইতে আমরা মাঝে মাঝে পত্র পাই যে সেখানে ভদ্রলোকেরা মুরগীর ডিম খান না বলিয়া খুব সস্তায় প্রচুর ডিম সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু এই মুরগীর ডিম পাঠানোর সুবিধা নাই বলিয়া অনেকে ইহাতে হাত দেন না। কিন্তু কেরোসিনের প্যাকিং বাক্সে করাতের গুঁড়ায় প্যাকিং করিয়া অনায়াসে দূর দেশান্তরে ডিম পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমরা বেকার যুবকদিগকে এবিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

(১২) লোহা, তামা প্রভৃতির বড় বড় কড়া এবং বাসনপত্র পরিষ্কার করার জন্য করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিশেষভাবে রং প্রস্তুতের সরঞ্জাম গুলি পরিষ্কার করিবার সময় ইহার প্রয়োজন খুব বেশী অনুভব করা যায়। করাতের গুঁড়া দ্বারা মাজিয়া ঘষিয়া যত সহজে সেগুলি পরিষ্কার করা যায় অপর কোন উপায়ে তাহা করিতে পারা যায় না।

(১৩) বরফ রক্ষা করিবার জন্য করাতের গুঁড়ার ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ইহার যথেষ্ট প্রচলন আছে। বরফ প্যাক্ করিয়া অন্যত্র প্রেরণ করিতে হইলে করাতের গুঁড়া না হইলে চলে না।

(১৪) বিলাতের অনেক বাগান বাড়ীতে খুব বেশী শীতলাগে। তথায় শীত নিবারণের জন্য করাতের গুঁড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার প্রধান বৈজ্ঞানিক হেতু এই যে

করাতের গুড়া Non Conductor বা "তাপবাহী" নহে। যদি কোনও জিনিষকে পুরু করিয়া করাতের গুড়া দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখা যায়, কোথাও কোন ফাঁক বা অনাবৃত স্থান না থাকে, তবে বাহিরের তাপ যেমন উক্ত জিনিষের ভিতর সহজে ঢুকিতে পারে না, তেমনি ঐ জিনিষের নিজস্ব যে তাপ আছে তাহা সহসা বাহির হইয়া যাইতে পারে না। অন্ততঃ অনেক বিলম্ব লাগে। করাতের গুড়ার এই গুণ থাকার জন্যই সাধারণতঃ করাতের গুড়ার মধ্যেই বরফ প্যাক করিয়া আনা নেওয়া হয়। এই জন্যই শীত প্রধান দেশে দুই দেওয়ালের মাঝখানে ফাঁক রাখিয়া উক্ত ফাঁকের মধ্যে করাতের গুড়ার প্যাকিং করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে asbestos অপেক্ষা অনেক কম খরচে—নাম মাত্র খরচে বলিলেই হয়—সুন্দর ফল পাওয়া যায় বলিয়া শীত প্রধান দেশে করাতের গুড়ার এত আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৫) এতদিন পর্য্যন্ত Linoleum নামক প্রসিদ্ধ জিনিষটি কর্কের আবর্জ্জনা পিষিয়া তাহার সহিত তিসির তেল মিশাইয়া প্রস্তুত করা হইত। বর্ত্তমানে অনেক স্থলে কর্কের স্থলে করাতের গুড়া ব্যবহার করা হইতেছে। তবে যাঁতার সাহায্যে এই গুড়া গুলিকে খুব ভাল করিয়া পিষিয়া লওয়ার প্রয়োজন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, খুব সস্তাদরে linoleum প্রস্তুত হইতে পারে।

(১৬) কাগজ প্রস্তুতের উপাদান রূপেও কোন কোন স্থলে এই করাতের গুড়ার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, কাগজ প্রস্তুতের কাজে খনিজ পদার্থের পরিবর্ত্তে করাতের গুড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(১৭) বিভিন্ন অনুপাতে করাতের গুড়া—আলকাতরা হইতে উৎপন্ন রজনের সহিত মিশ্রিত করা যায়। অতঃপর এই মিশ্রিত পদার্থকে গরম করিয়া ছাঁচে ফেলিয়া যথেষ্ট চাপ দিলে কাঠের ন্যায় শক্ত একটি জিনিষ উৎপন্ন হয়। ইহা খুব শক্ত হয় এবং পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই পদার্থটিকে কাঠের ন্যায় কর্ত্তন করা যায়, সমান করা যায়, পালিশ করা যায় এবং ইহার মধ্যে ছিদ্র করা যায়। এই প্রণালীতে করাতের গুড়া কাজে লাগাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেগুলিকে আগুনের তাপ দিয়া জলশূন্য করিয়া লইতে হয়।

(১৮) জলা জায়গায় নির্ম্মিত বাড়ীর দেওয়ালের যে অংশ damp proof করিবার দরকার হয়, সেই অংশে asphaltএর সহিত করাতের গুড়া মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অনেক কাজ হয়।

(১৯) করাতের গুড়া, গ্লু এবং Water glass হইতে Wood cement প্রস্তুত হয়। তাহা অনেক কাজে লাগে।

(২০) ইষ্টক নির্ম্মাণের উপযোগী কাদার সহিত করাতের গুড়া মিশাইয়া অনেক সময় এক প্রকার ইট তৈয়ারী হয়। এই ইট ওজনে তেমন ভারী হয় না। বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী partition wall তৈয়ারী করিবার পক্ষে এই ইষ্টক বিশেষ উপযোগী। করাতের গুড়ার বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্য দিয়া উত্তাপ সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং করাতের গুড়া যে দেওয়ালে আছে সে দেওয়াল ভেদ করা উত্তাপের পক্ষে

সহজ নহে। শীতপ্রধান দেশে তাই এই শ্রেণীর ইটকের বিশেষ আদর দেখা যায়।

(২১) খুব সামান্য কাদার সহিত যথেষ্ট পরিমাণে করাতের গুড়া মিশাইয়া kiln burn প্রণালীতে এই মিশ্রিত দ্রব্যকে পুড়াইয়া লইলে এক প্রকার Filtering material উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা জল প্রভৃতি ফিল্টার করা চলে। এই জিনিষটির মধ্যে কাঠের ছাই থাকে বলিয়া এতদ্বারা Disinfectant এর কাজও হয়।

(২২) কালো রঙের কাদার পাইপ প্রস্তুত করিতে হইলে কাঁচা মাটি দ্বারা পাইপ তৈয়ারী করিয়া তাহাকে করাতের গুড়া দ্বারা পুড়াইতে হয়। প্রথমে এক পরত করাতের গুড়া বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর এক সারি পাইপ দিতে হয়। তার উপর আবার করাতের গুড়া বিছাইয়া দিয়া আবার এক সারি পাইপ দিতে হয়। এইরূপে এক স্তুপের মধ্যে পাঁচশত কিম্বা ছয়শত পাইপ সাজাইয়া চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিয়া ১০ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পুড়াইতে হয়। এই সময়ের মধ্যে করাতের গুড়াগুলি ছাই হইয়া যায় এবং তাহা হইতে Distillation product বাহির হইয়া আসে। পাইপগুলি তখন এই Product শুষিয়া লয়। তাহার ফলেই পাইপগুলি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিতে হইলে এই অবস্থায় পাইপগুলিকে খড় কুটোর ধোঁয়ার মধ্যে বসাইয়া দিতে হয়। অতঃপর মোমের সাহায্যে ইহাকে পালিশ করিয়া বুরুশ দিয়া পরিষ্কার করিলেই কালো চকচকে পাইপ উৎপন্ন হয়।

(২২) Wall paper প্রস্তুতের উপকরণ রূপে ইতিপূর্ব্বে কাটা লোম ব্যবহৃত হইত। এই লোমের পরিবর্ত্তে আজকাল অনেক স্থলে করাতের গুড়া ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্বারা খুব সস্তায় নিম্ন শ্রেণীর Wall paper প্রস্তুত হইতে পারে। কাগজের গায়ে কোনও প্রকার আঠা লাগাইয়া তাহার উপর রঙীন করাতের গুড়া ছড়াইয়া দিতে হয়। গুড়াগুলি তখন শক্ত হইয়া কাগজের গায়ে আঁকড়িয়া ধরে। ইহাতে খুব উৎকৃষ্ট Velvet paper তৈয়ারীও হয়।

(২৪) আরও কয়েকটি জিনিষ নির্ম্মাণের জন্য কাটা লোমের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম এবং রঙীন করাতের গুড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে কৃত্রিম পরাগ প্রস্তুতের জন্য কেবল কাটা লোমই ব্যবহৃত হইত। আজকাল রঙীণ করাতের গুড়া ব্যবহার করা হইতেছে।

(২৫) সাধারণতঃ ঘোড়ার আস্তাবলে gypsum বিছাইয়া দেওয়া হয়। মলমূত্রাদি বহুল পরিমাণে এই gypsum এর মধ্যে শুষিয়া যায় বলিয়া আস্তাবল অনেকটা শুষ্ক থাকে। সম্প্রতি এই gypsum এর স্থলে করাতের গুড়া ব্যবহার করা হইতেছে। তবে ইহার সহিত একটু Sulphuric acid মিশাইয়া লওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ একভাগ Sulphuric acid এর সহিত ১৫ ভাগ জল মিশাইয়া সেই জলের মধ্যে করাতের গুড়া ভিজাইয়া লইতে হয়। অতঃপর অতিরিক্ত জল ফেলিয়া দিয়া শুষ্ক করতঃ সেই করাতের গুড়াগুলি আস্তাবলে বিছাইয়া দিতে হয়। প্রত্যেক তিন দিন অন্তর একবার করিয়া এরূপ করাতের গুড়া পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। মল মূত্রের সহিত যে করাতের গুড়া আস্তাবল হইতে বাহির হয় সেগুলিকে ফেলিয়া না দিয়া সারের গাদায় জমা করিতে হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা পচিয়া গিয়া উত্তম সার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গরুর গোয়ালে অনেক সময় লতাপাতা এবং

খড় বিছাইয়া দেওয়া হয়। এইস্থলেও করাতের গুড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে গরুর মূত্র শুষিয়া লয় এবং ঘর শুষ্ক রাখে। গরুর মল মূত্র সহিত যে করাতের গুড়া পাওয়া যায় সেগুলিও কাযে লাগে; জমাইয়া রাখিলে সেগুলি পচিয়া উত্তম সার উৎপন্ন হয়।

(২৬) Hot bed প্রস্তুতের জন্যও আজকাল করাতের গুড়া ব্যবহৃত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে কেবল tan দ্বারাই একার্য্য সম্পন্ন হইত। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, করাতের গুড়া দ্বারা নির্ম্মিত Hot bed এর উত্তাপ বেশী হয় এবং তাহা এক বৎসর কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। তবে করাতের গুঁড়া সহজেই একত্র হইয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া যায়। ইহার প্রতিকার কল্পে কাটা খড় খানিকটা এই গুড়ার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(২৭) খুব বেশী ঘন সামগ্রীকে অনেকটা হাল্‌কা করিয়া লইবার জন্য করাতের গুড়া মিশ্রিত করা হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে Laming's mixture এর কথা বলা যাইতে পারে। Illuminating গ্যাস সংশোধনের জন্য ইহার প্রয়োজন হয়। এই mixture কিন্তু অত্যন্ত ঘন (dense); ইহাকে অনেকটা হালকা করিয়া লইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে করাতের গুড়া ব্যবহার করা হয়। coal gas সংশোধনের জন্যও অনেক ক্ষেত্রে করাতের গুড়া ব্যবহার করা যায়।

(২৮) করাতের গুড়া মিশাইয়া এক প্রকার সুরকী (Mortar) প্রস্তুত হয়। ভিজা দেয়ালের জলীয় অংশ দূর করিবার জন্য এই সুরকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে এরূপ যে সুরকী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে:—সাধারণতঃ চূণ মিশাইয়া সুরকী প্রস্তুত হয়, তাহার সহিত বেশী জল মিশাইয়া একটু তরল করিয়া লইতে হয় এবং বালির পরিবর্ত্তে করাতের গুড়া তাহাতে মিশ্রিত করিতে হয়। দেখিতে হইবে—যেন চূ'ণের আকর্ষণী শক্তি (binding power) অব্যাহত থাকে। ইহার সহিত Water glass solution কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রিত করিলে আরও ভাল হয়।

(২৯) করাতের গুড়ার সহিত melted coaltar, flowers of Sulphur, finely powdered hydraulic lime প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া যে পদার্থটি প্রস্তুত হয় তাহাকে ছাঁচে ফেলিয়া Slabs তৈয়ার করা যাইতে পারে। এই slabs গুলি উৎকৃষ্ট roofing material রূপে ব্যবহৃত হইতেছে!

(৩০) জল শুষিয়া লওয়া করাতের গুড়ার একটি বিশেষ গুণ। এজন্য যে সকল শীত প্রধান দেশে বরফ পড়িয়া রাস্তা ঘাট একান্ত পিচ্ছিল হইয়া যায়, তথায় দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য কোন কোন বিশেষ স্থলে করাতের গুড়া বিছাইয়া দেওয়া হয়। তারপর বাস ট্রাম প্রভৃতি সার্ব্বজনীন, যান বাহনের মেঝের উপর অনেক সময় করাতের গুড়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে আর বাসে ও ট্রামে জল জমিয়া থাকিতে পারে না। কলিকাতার অনেক বড় বড় আপিসে এবং ব্যাঙ্কের মেঝে পরিষ্কার করার জন্য করাতের গুঁড়ার সহিত ফেনাইল জল মিশ্রিত করিয়া গুঁড়া গুলিকে সামান্য ভিজাইয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ গুঁড়া গুলিকে damp করা হয় মাত্র কিন্তু একেবারে জল জব্‌জবে করা হয় না। তারপর এই ভিজা বা damp করাতের গুঁড়া ঘরের মেঝেতে ছড়াইয়া দিয়া ঘর ঝাট দেওয়া হয়। তাহাতে ঘর

ঝাট দেবার সময় আদৌ ধুলা উড়ে না এবং ঘরও disinfect করা হয়।

এস্থলে আমরা করাতের গুড়ার কয়েকটি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিলাম। সকল গুলির কথা উল্লেখ করা সম্ভবপর হইল না। পাশ্চাত্য দেশে আরও নানা প্রণালীতে এই করাতের গুঁড়া কাজে লাগানো হইতেছে। তারপর অনেকে আবার গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। সেই গবেষণার ফলে করাতের গুড়ার নিত্য নূতন ব্যবহার প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে। মোটের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, করাতের গুঁড়া একান্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নহে—ইহা দ্বারা অনেক কাজ হয় এবং ভবিষ্যতে ইহা একটি মূল্যবান্ সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

ইনকুবেটার বা ডিম ফোটাইবার কল

বর্ত্তমানকাল হইল যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ—বিবিধ যন্ত্র পাতির ব্যবহারই এ যুগের বিশেষত্ব। আগেকার যুগের মানুষ 'গতর খাটাইয়া' যে সকল কাজ আদায় করিত এযুগের মানুষ তৎসমস্ত কাজ—এমন কি অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ—কেবল 'কল টিপিয়াই আদায় করিয়া লয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—বিংশ শতাব্দীতে "কল টেপাই" পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের গতর খাটানোর স্থান অধিকার করিয়াছে—একথা আমরা বহুবার বহু প্রসঙ্গে বলিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, ষ্টিম ইঞ্জিন ও মোটর গাড়ীর যুগ ছাড়িয়া যখন গরুর গাড়ীর যুগে ফিরিয়া যাইবার উপায় আর নাই—তখন এই—কল কব্জার আসল রহস্য, ইহাদের ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি জানিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

কিন্তু কেন জানি না—এই কল কব্জার প্রতি এদেশবাসীর একটু অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস একেবারে মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই উত্তর আসে—"মশায়, এই কল কব্জার কথা আর বলিবেন না। যে কোন একটা কল কিনিলেই বিপদ—দু'দিন না যাইতেই এটা ওটা বিগড়ায়; তারপর সারাইতে গিয়া হৈ হৈ রৈ রৈ

ব্যাপার। অর্থব্যয়, সময় নষ্ট, মনোকষ্ট!! বাবা! টাকা দিয়াও এমন ফ্যাসাদ সব ঘরে আনে?" এই বলিয়াই অনেকে একেবারে সটান সরিয়া পড়ে,— পারত পক্ষে আর কল কব্জার ছায়াও মাড়ায় না। ইহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না যে, একটা ভ্রান্ত ধারণাই যত অনর্থের মূল!

মোটের উপর কল কব্জার ব্যবহার নিতান্ত সহজ। ইহাতে হাতী ঘোড়া কিছুই লাগে না। একবার একটু অনুধাবন সহকারে কল কব্জার গোড়ার কথাটা ভাল করিয়া শিখিয়া লইলেই আর কোন গোল থাকে না; তখন আপনা হইতেই কলটি কাজ করিয়া যায় এবং কলের মালিক পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া দিব্যি আরামে হুকা টানিতে পারে, গল্প করিতে পারে, সর্ব্বোপরি নিজের শরীরের মধ্যে যে জীবিত কল কাজ করিতেছে সেইটিও অক্ষুন্ন রাখিতে পারে। কিন্তু গোড়াতে যে টুকু অভিনিবেশ ও শিক্ষার দরকার সে টুকু অবহেলা করিয়াই অধিকাংশ লোক মারাত্মক ভ্রম করে এবং গতর খাটাইয়া কাজ করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রধান কথা এই যে, কলের সঙ্গে হাতের প্রতিযোগিতা অসম্ভব— চক্ষের উপর দিনরাত একথার প্রমাণ হইতেছে। এক একটা কল দৈত্য দানবের মত কাজ করিয়া যায়— মানুষের সাধ্য কি তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করে? তারপর নিজের দেহপাতের কথাটাও একেবারে উড়াইয়া দিবার নহে।

মানুষের শরীর একটা জীবন্ত কল। অতিরিক্ত দৈহিক শ্রমে এই কল অকালে ভাঙ্গিয়া পড়ে কিম্বা অতি মাত্রায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়ের হস্ত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত কল কারখানার সৃষ্টি। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সভ্যতার প্রয়োজনই এই সমস্ত কল কারখানার উদ্ভাবনের প্রেরণা দান করিয়াছে এবং এখনও দান করিতেছে। প্রাচীন কালে যুদ্ধের প্রধান উপকরণ ছিল মানুষ;—তখন মানুষই সৈন্যভুক্ত হইয়া অপর সৈন্য শ্রেণীর সম্মুখীন হইত, উভয় পক্ষে কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিত। কিন্তু এ যুগের যুদ্ধের প্রধান সরঞ্জাম হইয়াছে—কল কব্জা আর বৈজ্ঞানিক দ্রব্য সমূহ। এখন আর দুই বাহিনীতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বড় একটা হয় না বলিলেই চলে। একটি সৈন্য সামন্তের সহিত দেখা নাই—তথাপি কেল্লা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে—এমনও দেখা যায়। কোথায় কোন্ পরীখার অভ্যন্তরে একদল সৈন্য ওৎপাতিয়া বসিয়া আছে। আকাশে ভ্রাম্যমান্ বিমানপোত হইতে বেতার বার্ত্তার সাহায্যে আদেশ আসিল—অমুক দিক্ লক্ষ্য করিয়া কলের কামান ছুড়িতে হইবে। অমনি আরম্ভ হইল গুলি বর্ষণ। ইহার ফলে হয়ত ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী শত্রুর শিবির একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইহাই তো বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাস!

কেবল সমর ক্ষেত্রে নহে, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কল কব্জা অঘটন ঘটাইয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত গল্পে অনেক দৈত্য দানবের কাহিণী শুনিতে পাওয়া যায়। সে যুগের অনেকে তন্ত্র মন্ত্রের বলে এ সমস্ত দানবকে বশীভূত করিয়া রাতারাতি রাজপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া লইত বলিয়া প্রবাদ আছে। এ সমস্তের মূলে কোন সত্য আছে কিনা—তাহা আমরা জানি না, তবে এটুকু পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, কলের দানবকে সাধিতে পারিলে মানুষের শক্তিতে যাহা কুলায় না, এমন অনেক কাজ অনায়াসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়। সুতরাং সমস্ত

অশ্রদ্ধা, সমস্ত অবিশ্বাস, সমস্ত অসহিষ্ণুতা সবলে দূরে সরাইয়া দিয়া—মন হইতে ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিয়া এই কল বজ্ঞারূপী যে বিংশ শতাব্দীর দানব—তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। ইহা তো কঠিন কাজ নয়, ইহাতে আজীবন তপস্যার কোন প্রয়োজন হয় না,—একটু অভিনিবেশ সহকারে গোড়ার কথাগুলি জানিয়া লইলেই কল কব্জার উপর খুবই আধিপত্য করিতে পারা যায়।

আজ আমরা একটি কলের কথা আলোচনা করিব। ইহার নাম "ইনকুবেটার।" আজ কাল ইহার মূল্য যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। মাত্র ৫০ টাকা ব্যয় করিলেই ছোট খাটো একটা "ইনকুবেটার" পাওয়া যায়। সময় সময় প্রয়োজন বোধে ইহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে একটি "ইনকুবেটার" কম পক্ষে ৫০ বৎসর কাজ দেয়। বেশী দামের "ইনকুবেটার"ও আছে। সে গুলি আরও অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং কাজও অনেক বেশী পাওয়া যায়।

"ব্যবসা ও বাণিজ্যের" জন্মাবধি গত ৯বৎসর কাল ধরিয়া আমরা "ইনকুবেটারের" কথা আলোচনা করিতেছি। মুরগীর ডিম ফোটাইয়া বাচ্চা জন্মানই "ইনকুবেটারের" প্রধান কাজ। যাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে লাভজনক মুরগীর চাষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে এই যন্ত্রটি অপরিহার্য্য। তাহা ছাড়া সাধারণ গৃহস্থেরাও এই যন্ত্রটি ব্যবহার করিয়া লাভবান হইতে পারেন। যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহারা জনে জনে এক একটি করিয়া "ইনকুবেটার" ক্রয় করিতে পারেন। যাঁহারা—তাহা পারেন না,—তাঁহারা পাড়া প্রতিবেশী কয়েক জনে মিলিয়াও একটি "ইনকুবেটার" কিনিতে পারেন এবং ইহাতে লাভ হওয়া অনিবার্য্য।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের মুসলমানগণ প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর মুরগী পুষিয়া থাকেন। তাহাতে যে ডিম উৎপন্ন হয় সেগুলি অল্প মূল্যে বাজারে বিক্রয় করাই সাধারণ প্রথা। তবে কেহ কেহ ডিম ফোটাইয়া বাচ্চা উৎপাদনের চেষ্টাও করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। মুরগীর ডিম অপেক্ষা বাচ্চা যে অধিক দরে বিক্রয় হয় একথা বলাই বাহুল্য। তথাপি অনেকে বাচ্চা উৎপন্ন করিতে অগ্রসর হন না কেন? প্রধান কারণ এই যে, যে প্রণালী অবলম্বনে পাড়াগাঁয়ে ডিম ফোটান হয় তাহা আদৌ লাভ জনক হইতে পারে না। একটী মুরগীকে ডিমে তা' দিবার জন্ত বসাইয়া দিলে সে অবশ্য একসঙ্গে ৮।১০টা হইতে ১৫।২০টি ছানাও বাহির করিবে; কিন্তু অন্ততঃ ছয় মাস কাল আর সে কিছুতেই ডিম দিবে না। এই ছয় মাস কাল ডিম না পাওয়ার যে টুকু ক্ষতি তাহা এই ১৫।২০টি মুরগীর ছানা দ্বারা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব এইজন্যই অনেকে মনে করেন, ছানায় আর দরকার নাই—মুরগীর অণ্ডাই যথেষ্ট।

একটা "ইনকুবেটার" থাকিলে উভয় কাজই এক সঙ্গে চলিতে পারে। মুরগী যতই ডিম দিতে থাকিবে "ইনকুবেটার" ততই ছানা বাহির করিতে পারিবে। এরূপ না করিলে মুরগী পালনের ব্যবসায় লাভ জনক হওয়া বড়ই দুষ্কর। পাশ্চাত্য দেশে—বিশেষ ভাবে আমেরিকায় আধুনিকতম বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে মুরগীর চাষ হইতেছে। তথায় হাজার হাজার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। —এই সমস্ত স্থানে কেবল কলের সাহায্যে মুরগীর ডিম ফোটান হইয়া থাকে। সেই সমস্ত

বল কারখানার ছিত্র দেখিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইতে হয়। কি প্রকাণ্ড এক একটি কারখানা — কত হাজারে হাজারে মুরগীর ছানা এক একটি ইনকুবেটার হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে!

হতভাগ্য এদেশ—এদেশে কিন্তু এখনও যেমন কারখানা গড়িয়া ওঠা দূরের কথা, ইনকুবেটার যন্ত্রটিই ব্যাপকভাবে কোথাও ব্যবহার হইতে দেখি না। কিছুদিন হইল বাঙ্গালোরে মিসেস কর নাম্নী জনৈক ইংরাজ মহিলা সরকারী সাহায্য লইয়া একটি ফার্ম খুলিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মুরগীর চাষের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে তিনি এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। যাঁহারা একবার তাহা মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন যে, ব্যাপার অতি সহজ। তথাপি এদেশের লোক এই লাভজনক ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন না। সুতরাং আমাদের দুঃখ কেন ঘুচিবে—জিজ্ঞাসা করি? কিছু করিব না—হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব; না হয় মান্ধাতার আমলের সংস্কারকে আঁকড়িয়া ধরিয়া চৌদ্দপুরুষের ভিটেমাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিব—এই যদি আমাদের অবস্থা হয় তাহা হইলে এজাতির উন্নতি কোন কালেও হইবে না,—হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইনকুবেটার ব্যবহার করা মোটেই কঠিন কাজ নহে। একবার ইহার ব্যবহার প্রণালী শিখিয়া লইলে তাহিতে আর কোনই গোলমাল [illegible] থাকে না। সাধারণতঃ ইনকুবেটার মেশিন কিনিবার সময় ইহার সহিত এক খানি ছাপান পুস্তক দেওয়া হয়। এই পুস্তিকাতে উক্ত মেশিন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই লিপিবদ্ধ থাকে। তারপর এই মেশিন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমেই ব্যবহার কারীর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় এবং তখন ইনকুবেটার সম্পর্কিত খুঁটি নাটি সমস্ত তথ্যই তাহার আয়ত্ত হইতে পারে। এই এই মেশিনটি কেন এবং কিরূপে আবিষ্কৃত হইল— তাহা জানা থাকিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে মোটের উপর ইহাতে মেশিনের জটিলতা কিছুই নাই। প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের ফলেই ইনকুবেটারের আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসিরা ব্যবসায় দ্বারা লাভবান্ হইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র—এবিষয়ে তাহাদের বিরাম নাই। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, ডিমে তা' দেওয়ার জন্য একটি মুরগীকে বসাইয়া দিলে অন্ততঃ পক্ষে ছয় সাত কাল আর তাঁহার নিকট হইতে ডিম পাওয়া যায় না তখন তাঁহাদের খেয়াল হইল, এইটি তো লাভজনক পন্থা নহে। তাঁহারা তখন অপর পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেল যে, ২১ দিন আন্দাজ সময় ডিমের উপর বসিয়া থাকিয়া এক একটি মুরগী কেবল উত্তাপের সমতাই রক্ষা করে—এর বেশী আর কিছুই তাহারা করে না। তবে মধ্যে মাঝে সে এক একবার বাহির হইয়া যায় এবং যাহা কিছু হউক ভক্ষণ করিয়া তাড়াতাড়ি 'কক্ কক্' করিয়া পুনরায় ডিমের উপর আসিয়া বসে। বৈজ্ঞানিকগণ তখন ভাবিতে লাগিলেন,—এই ব্যাপার অতি সহজ, মুরগী যাহা করে অপর কোন কৃত্রিম প্রণালীতেও তাহা করা যাইতে পারে।

উত্তাপের সমতা রক্ষা করার জন্য, যাহার ভিতর দিয়া উত্তাপ বাহির হইতে পারে না (non con-ductor) এমন একটি আধারের মধ্যে ডিমগুলি বসাইয়া রাখিলেই হয়। [illegible] এই

ভাবিয়া তাঁহারা ইনকুবেটার যন্ত্র নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনকুবেটারের মূল কথা হইল—**উত্তাপের সমতা রক্ষাকারী আধার।** সেই বাক্সের মধ্যে ডিম রাখিলেই যথাসময়ে তাহা ফাটিয়া গিয়া মুরগীর ছানা বাহির হইয়া আসে।

সর্ব্বপ্রথমে যে ইনকুবেটার নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে এই non-conductor বায়ু ও উত্তাপ দানকারী ল্যাম্প ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার পর দেখা গেল যে ইহাতে নানা অসুবিধা ঘটে। কোন কোন সময়ে ল্যাম্পের পলিতা বাড়িয়া উঠিয়া উত্তাপ বেশী হইয়া যায়। তাহাতে ডিম গুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কেরোসিনের ল্যাম্পের পলিতা হঠাৎ বেশী জোরে জ্বলিতে থাকিলে বাক্সের মধ্যের উত্তাপও বাড়িয়া ওঠে এবং তখনই আবার পলিতা কমাইয়া না দিলে উত্তাপ হয়ত এত বেশী হইয়া পড়ে যে, ডিমের মধ্যস্থ বাচ্চা মরিয়া যায়। উত্তাপ যদি ১০৫ ডিগ্রির উপর উঠে তাহা হইলে ডিম একেবারে সিদ্ধ হইয়া যায়—সে ডিম হইতে ছানা বাহির হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

সুতরাং উত্তাপের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ (regulate করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে Capsule নামক যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইল। ইহা এক প্রকার ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত। এই Capsule এর সহিত একটী লোহার rod বা তার সংযুক্ত থাকে; সেই তারের মুখ ইনকিউবেটরের উপর যে চিমনি থাকে তাহার ঢাক্নীর সহিত সংযুক্ত থাকে। বাক্সের মধ্যে উত্তাপ খুব বেশী হইলে capsule টি expanded বা প্রসারিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে লোহার rod টী চিম্নীর মুখের ঢাকনীটিকে ঠেলা দিয়া খুলিয়া দেয় এবং এইরূপে বাক্সের মধ্যস্থিত অতিরিক্ত উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। কোন্ অবস্থায় কতটুকু উত্তাপের প্রয়োজন হয়—তাহা পরে বলিতেছি।

এইরূপে ধীরে ধীরে ইনকুবেটারের দোষ একটি একটি করিয়া ধরা পড়িতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই নূতন নূতন প্রতিকারের পন্থাও আবিষ্কৃত হইল। আজ কাল বাজারে যে ইনকুবেটার পাওয়া যায় তাহা একেবারে নিখুঁত বলা যায়। ইহাতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নাই বলিলেই হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, মুরগী দ্বারা ডিমে তা' দিয়া ছানা উৎপাদনের সময় যে সকল অসুবিধা ঘটে, ইনকুবেটার সে সমস্ত অসুবিধাই দূর করিয়াছে। অধিকন্তু ডিম পরীক্ষার জন্য Perfection egg teste r নামক যে যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ফলে ডিমের অপব্যয় নিবারিত হইয়াছে।

সকল ডিম হইতে ছানা বাহির হয় না। মুরগী যে সকল ডিম প্রসব করে তাহার সবগুলি হইতে বাচ্চা বাহির হয় না। যে ডিমের মধ্যে living germ বা spermatozoa আছে কেবল সেই ডিম হইতেই বাচ্চা বাহির হয়। ইংরাজীতে এই সকল ডিমকে fertile eggs বলে; আর যে ডিমের মধ্যে এই জীবন্ত germ নাই তাহা হইতে বাচ্চা বাহির হয় না। তাহাকে unfertile eggs বলে। এদেশে তাহাকে বাওয়া ডিম বলে। বাওয়া ডিম তা'য়ে বসাইলে তাহা হইতে বাচ্চাও বাহির হয় না অথচ ২১ দিন যাবত মুরগীর পেটের তলায় থাকায় উহা পচিয়া যায়; তখন তাহা খাওয়াও যায় না কিম্বা বেচাও যায় না।

অধুনা ডিম পরীক্ষার কল আবিষ্কৃত হওয়ায় ডিম তা'য়ে বসাইবার আগে এই

কলের দ্বারা দেখিয়া লওয়া হয় যে ডিম জীবন্ত না বাওয়া। যদি বাওয়া ডিম হয় তবে তখনই তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয় সুতরাং কোনও লোকসান হয় না।

ইতিপূর্ব্বে এরূপ ডিম বাছিয়া লইবার কোনই উপায় ছিল না। বাধ্য হইয়া ভালমন্দ নির্ব্বিচারে সব ডিমই তা' দেওয়ার জন্য মুরগীকে ছাড়িয়া দিতে হইত। তন্মধ্যে কয়েকটি হইতে ছানা বাহির হইত এবং অপরগুলি পচিয়া যাইত— সেগুলি দ্বারা কোনই কাজ হইত না। Egg tester এই অপচয় নিবারণ করিয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমেই ভাল এবং বাওয়া ডিম অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যায়। বাওয়া ডিম গুলি হইতে ছানা বাহির হয় না বটে; তবে সেগুলি খাদ্য রূপে বাজারে বিক্রয় করা চলে। এইরূপে বাওয়া ডিম গুলি হইতেও কিছু আয় হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পুরাতন প্রণালীতে মুরগীর সাহায্যে ডিম ফোটাইবার ব্যবস্থা না করিয়া ইনকুবেটারের সাহায্যে একাজ সম্পন্ন করাই সর্ব্বতোভাবে লাভ জনক। বড় বড় ব্যবসায়ীর পক্ষে তো কোন কথাই নাই—যাহারা কয়েক শত মাত্র মুরগীও পুষিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের পক্ষেও ইনকুবেটার পরম উপযোগী এবং লাভ জনক। কাজেই কলের নাম শুনিয়া আঁৎকাইয়া ওঠা একান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। একণে ইনকুবেটার কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় বারান্তরে আমরা তাহারই বর্ণনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কানপুরের পত্র*

মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়! প্রবন্ধ লিখিবার আমার তেমন হাত নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ে ইহা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া লিখিতেছি। যদি আবশ্যক বোধ করেন তাহা হইলে আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় উহা স্থান দিয়া বাধিত করিবেন। বাঙ্গালাদেশে থাকিতে আপনার পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক ছিলাম। ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকা খানি বহু সংখ্যক পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, এবং উহা যে কালোপযোগী তাহা যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন।

কানপুর একটা বিরাট ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র; এখানে সকল রকমেরই জিনিষ আমদানি ও রপ্তানি হয়।

বাঙ্গালাদেশে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা খুব অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া এখানে চালান দিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

ওখানকার বৈদ্যবাটী ভাণ্ডারকুলী প্রভৃতি বাজারে প্রচুর চাঁপা, মর্ত্তমান প্রভৃতি কলা পাওয়া যায়। এখানে ভাল কলার যথেষ্ট আদর আছে;

বিশেষ করিয়া মাড়োয়ারী ও ইংরাজ ভদ্রলোকগণ ইহা বড়ই পছন্দ করেন। তাহার পর নারিকেল; এক একটী নারিকেল দুই আনা, ছয় পয়সার কমে বিক্রয় হয় না। আনারসের সময় আনারসের বিশেষ আদর; কারণ এগুলি এ দেশে উৎপন্ন হয় না, ইহার এক একটী সাত আট আনা দরে বিক্রয় হয়।

তাহার পর এখানেও এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহার দর এখানে যথেষ্ঠ সস্তা এবং কলিকাতায় উহার মূল্য আছে। এখানে খুব ভাল চটী পাওয়া যায়, (নূতন ফ্যাসানের পাঁঠ চেরা চটী) যাহার দর সাত আঠ আনার বেশী নহে। কলিকাতায় ইহার দর ১৲ এক টাকার কম নহে। এখানে ঘৃতও যথেষ্ঠ সস্তা, খাঁটী ভয়সাঘৃত ॥৶ এগার ছটাক ১৲ এক টাকায় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিশেষ করিয়া গরম কাপড় ও মশলা, কলিকাতার অপেক্ষা অনেক সস্তা পাওয়া যায়। এখানে সুগন্ধি তৈল দেশীয় প্রথায় যথেষ্ট তৈয়ারী হয়, এবং উহার মূল্যও অল্প।

এদেশে গ্রামোফোনের ও বাদ্য-যন্ত্রের কাটতি বেশ সন্তোষজনক। কলিকাতা হইতে কোন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী যদি এখানে ব্রাঞ্চ খোলেন এবং নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাহা হইলে যে বিশেষ লাভবান হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহাছাড়া বেঙ্গল কেমিকেলের জিনিষ গুলির এখানে আদর আছে, কোনও উদ্যোগী যুবক যদি বেঙ্গল কেমিকেলের ও শর্ম্মা ব্যানার্জ্জীর হিমানী সোর এজেন্ট হইয়া আসেন তাহা হইলে তিনিও বিশেষ প্রসার করিতে পারিবেন।

অদ্য এই পর্য্যন্তই লিখিলাম; যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে এখানকার খুঁটীনাটী ব্যবসায়ের আরও তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি এবং এখানকার ভাল ভাল ব্যবসায়ীর নাম ঠিকানাও সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি।

গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে নিম্ন ঠিকানায় জানাইয়া বাধিত করিবেন নিবেদন ইতি।

K. P Das
C/o Mukherjee & Co.
Karachi Khanna
Cawnpur.

---

০ যে সকল বাঙ্গালী এযাবত বাংলার বাহিরে যাইয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহারা হয় চাকুরে, না হয় ডাক্তার, আর না হয় ব্যবহারজীবি; দুই এক জন যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে ধন, মান এবং যশ অর্জ্জন করেন নাই এমন কথা বলি না; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অথচ বাংলাদেশে দেখিতেছি যে সকল অবাঙ্গালীরা আসিয়া বাংলার হাঠ, মাঠ, ঘাট দখল করিয়া বসিয়াছে এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যশ এবং মানও অর্জ্জন করিতেছে তাহারা প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীকে বাঙ্গলার বাহিরে যাইয়া এই ব্যবসায় ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতে আমরা পরামর্শ দিতেছি। পত্রলেখক কানপুরের সহিত কয়েকটী জিনিষের ব্যবসায়ের সন্ধান দিয়াছেন। যাঁহারা লাখ্ টাকার স্বপ্ন দেখেন না এবং একেবারে রাতারাতি বড়মানুষ হইবার কল্পনায় মোহগ্রস্ত হন নাই, এইরূপ ধীর, স্থির, অধ্যবসায়ী যুবকদিগকে আমরা এই পত্র লেখকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। পত্র লেখকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও পরিচয় না থাকিলেও তিনি যে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার যে যথেষ্ট ক্ষেত্র কানপুরে আছে তাহা আমরাও নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জানি।

সম্পাদক

হোসিয়ারী দ্রব্য ধোলাই করা প্রণালী

সম্প্রতি আমাদের দেশে নানা স্থানে গেঞ্জি ও মোজা প্রভৃতি হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা বড়ই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও এই সমস্ত কারখানা সব দিক দিয়া আত্ম নির্ভর শীল হইতে পারে নাই। অনেক জিনিষের জন্যই ইহাদিগকে বিদেশীর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা দূরীভূত না হয় ততদিন দেশীয় কল কারখানার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। যাঁহারা কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এসব কথা ভাবিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিদেশ হইতে মাল কিনিয়া আনিয়া দেশীয় কলে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করিলে অনেক সময় তাহা বিদেশী জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যায়; আর যদিইবা কোন রকমে দাঁড়াইতে পারে তাহা হইলেও লাভের পরিমাণ খুব কম হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্থলে গেঞ্জি ও মোজার কারখানার কথা ধরা যাইতে পারে। অনেক হোসিয়ারীর কারখানায় ধোলাই করা বিলাতী সূতা দ্বারা গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয়। দেশীয় সূতা দ্বারা যদি সে কাজ চালান সম্ভবপর হইত তাহা হইলে অভিযোগের আর কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু যে স্থলে তাহা হইবার উপায় নাই সে স্থলে বাধ্য হইয়াই বিদেশী জিনিষ ক্রয় করিতে হয়। তবে হোসিয়ারীর কারখানার মালিকেরা একটি বিষয়ে বিদেশী বর্জ্জন করিতে পারেন—তাহা এই যে, অপরিষ্কৃত বিদেশী সূতা ক্রয় করিয়া তাহা দ্বারাই গেঞ্জি মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন। অতঃপর সেই সমস্ত মাল ধোলাই করিয়া লইলেই, ধোলাই করা বিদেশী সূতার প্রস্তুত মালের তায় বস্তুরূপে জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাতে এক দিক দিয়া মাল যেমন উৎকৃষ্ট হইবে অপর দিক দিয়া ব্যয়ও তেমনি কম পড়িবে। কারণ অপরিষ্কৃত সূতার দাম ধোলাই করা সূতা হইতে অনেক কম এবং অপরিষ্কৃত সূতার প্রস্তুত গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদি ধোলাই করিতেও বেশী কিছুই খরচ পড়ে না।

তারপর ধোলাই করার ব্যাপারও নিতান্ত সহজ—ইহাতে বিশেষ কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কি করিয়া অপরিষ্কৃত সূতার প্রস্তুত গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদি ধোলাই করিয়া লইতে হয় তাহার প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল:—

অপরিষ্কৃত সূতার মধ্যে সাধারণতঃ তৈলাক্ত ময়লা পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ইহা পৃথক করিবার জন্য প্রথমতঃ Sodium Carbonate

এর দ্রাবের (Solution) মধ্যে গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদি হোসিয়ারী দ্রব্যকে সিদ্ধ করিতে হয়। তারপর জল নিংড়াইয়া লইয়া এই সমস্ত জিনিষ Sodium Hydrochlorite এর Solution এর মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কিছু সময় এই অবস্থায় থাকার পর গেঞ্জি মোজাগুলি তুলিয়া লইয়া Sodium bisulphite অথবা Oxalic acid দ্বারা পরিশোধিত করিলেই গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদি পরিষ্কার হইয়া তাহার চাক্‌চিক্য বাহির হয়।

এইরূপ মাল বিদেশী ধোলাই করা সূতায় প্রস্তুত হোসিয়ারী হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট হয় না; বরং অনেক দিনেই ইহা টাট্‌কা মাল বলিয়া মনে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মোটামুটি এই ধোলাই কার্য্যকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে. যথাঃ—(১) Sodium carbonate Solution দ্বারা অপরিষ্কৃত তৈলাক্ত পদার্থ পৃথক করা (২) Sodium hydrochlorite এর Solution দ্বারা পরিষ্কার করা এবং (৩) Sodium bisulphite অথবা oxalic acid দ্বারা বর্ণহীন করা।

(১) প্রথমতঃ অপরিষ্কৃত গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদির ওজনের শতকরা ২ ভাগ হিসাবে Sodium carbonate বা সোডার কাচ মিশ্রিত করিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিতে হয়। আন্দাজ এক ঘণ্টা সময় জ্বাল দিলেই তৈলাক্ত পদার্থ এবং অপরাপর ময়লা পদার্থ বাহির হইয়া আসে। ইহার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ সাবান দিয়া হোসিয়ারী দ্রব্য সিদ্ধ করেন। তাহাতে কাজ ভাল হয় না। কারণ গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদির চাক্‌চিক্য ইহাতে নিষ্ট হয়। এই অবস্থায় প্রথম বারে সিদ্ধ করার সময়ে সোডা দেওয়াই সমীচীন।

(২) সিদ্ধ করার পর কাচিয়া লইলেই কাপড়ের রং সাধারণতঃ পরিষ্কার হইয়া যায়। অতঃপর যথার্থ ধোলাই (Bleaching) করিবার সময় আসে। তখন Sodium hydrochlorite-এর দ্রাবের মধ্যে পরিষ্কৃত মালকে ৫০ হইতে ৬০ মিনিট পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, Sodium hydrochlorite এর দ্রাবের মধ্যে যেন শতকরা ½ ভাগ এর বেশী chlorine না থাকে। কারণ পরিমাণের অতিরিক্ত chlorine থাকিলে কাপড়ের শক্তি কমাইয়া দেয় এবং ধোলাই করা কাপড় বেশী দিন স্থায়ী হয় না। আবার পরিমাণ কম হইলেও কাজ ভাল হয় না; কারণ তাহাতে সময় বেশী লাগে।

Sodium hydrochlorite এর দ্রাবের মধ্যে বার বার করিয়া গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদি ভিজাইতে থাকিলে chlorine এর মাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। তখন একটু strong Solution মিশাইয়া দিতে হয় এবং দেখিতে হয় যে, Chlorine এর মাত্রা শতকরা ½ এর বেশী যেন না হয়। বার বার কাপড় কাচিয়া লওয়ার পর দ্রাবের জল ঘন এবং ঘোলা হইয়া আসে। তখন ইহা ফেলিয়া দিয়া আবার নূতনভাবে জলের সহিত Solution মিশাইতে হয়।

এস্থলে কেহ কেহ হয়ত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, Sodium carbonate ও Sodium hydrochlorite আমরা পাইব কোথায়? এই জিনিষ কি তৈয়ারী করা চলে না? Sodium carbonate মোটামুটি সোডা ছাড়া আর কিছুই নহে। বাজারের প্রায় সর্ব্বত্রই এই জিনিষ বিক্রয় হয়। তবে Sodium hydrochlorite সর্ব্বত্র পাওয়া

না। এই জিনিষ আমাদের দেশের কল কারখানায় নিশ্চয়ই তৈয়ারী হইতে পারে। মোটামুটি দুইটি উপায়ে এই Sodium hydrochlorite উৎপন্ন হয়। যথা:—(ক) Electrolytic process এবং (খ) Chemical process.

(ক) Electrolytic process অনুসারে Sodium hydrochlorite তৈয়ারী করিতে হইলে কিছু কল কব্জার দরকার হয়। বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট পেলের মধ্যে বাজারের সাধারণ নুন জলে গুলিয়া সেই জল Electrolyse করিতে হয়। তবে ইহাতে Sodium hydrochlorite-এর যে Solution পাওয়া যায় তাহা খুব বেশী strong হয় না—ইহাতে শতকরা ১-২ মাত্র chlorine থাকে; এই প্রণালীতে Sodium hydrochloriteএর Solution তৈয়ারী করাই সস্তা—কারণ তাহাতে খরচ খুব কম পড়ে। বিশেষভাবে যেখানে অল্প মূল্যে Bleaching powder পাওয়া যায় না সেখানে এই উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়। এই প্রণালীতে উৎপন্ন Sodium hydrochlorite এর Solution জলে মিশাইয়া তৎক্ষণাৎ কাজে লাগান যায়—কেবল লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, মিশ্রিত জলের মধ্যে Chlorine এর মাত্রা শতকরা ½ ভাগ এর বেশী যেন না হয়।

(খ) Chemical process অনুসারে Sodium hydrochlorite প্রস্তুত করিতে হইলে Bleaching powder এর কাথের সহিত Sodium carbonate অর্থাৎ সোডা মিশাইয়া জাল দিতে হয়। ইহার ফলে Calcium carbonate এর অংশ জলের নীচে জমিয়া যায় এবং জলেরমধ্যে কেবল Sodium hydrochloriteই থাকে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পেঁজি মোজা প্রভৃতির ন্যায় কোমল সূতার জিনিষ পরিষ্কার করিবার পক্ষে calcium hydrochlorite এর Solution উপযোগী নহে; কারণ এই Solution এত বেশী শক্তিশালী যে তাহাতে সূতাগুলিকে একেবারে পচাইয়া দেয়। এইজন্যই Bleaching powder এর মধ্যে যে পরিমাণ calcium hydrochlorite আছে তাহাকে Sodium hydrochlorite এ পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন।

Bleaching powder সাধারণতঃ এক এক পিপার মধ্যে এক হন্দর পরিমাণ ভর্ত্তি করা থাকে; এইরূপ এক একটি পিপা ক্রয় করিতে হয়। এই powder বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই পিপা খুলিয়াই যত সম্ভব শীঘ্র এই powder কাজে লাগাইতে হয়।

Bleaching powder হইতে Sodium hydrochlorite তৈয়ার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই Bleaching powder এর একটি Solution তৈয়ার করিতে হয়। অল্প স্বল্প হইলে এই powder জলে গুলিয়া দিলেই কায হইয়া যায়। কিন্তু কোনও কারখানায় খুব বেশী পরিমাণে Bleaching powder এর Solution তৈয়ারী করিতে হইলে অন্য পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। একটা লোহার পাত্রের তলদেশ ছিদ্রযুক্ত করিয়া তাহার উপর powder গুলি ছড়াইয়া দিতে হয়—যেন একটা পাতলা স্তর পড়ে। অতঃপর অপর একটি পাত্রের মুখের উপর ইহাকে বসাইয়া দিয়া তাহাতে জল দিয়া এক রাত্রি রাখিয়া দিতে হয়। সারারাত্রি এই জল powderএর সহিত মিশিয়া ও চুয়াইয়া নীচের পাত্রে গিয়া পড়িবে এবং তাহাতেই প্রয়োজনীয়

Solution পাওয়া যাইবে। এইরূপে পর পর কয়েক রাত্রি Bleaching powderএর উপর জল দিয়া তাহা চুয়াইয়া লওয়া চলে। Powder-এর মধ্যে যখন আর কোন সার থাকে না তখন ইহা ফেলিয়া দিতে হয়।

এইরূপে Bleaching powderএর solution তৈয়ারী করিয়া তাহার সহিত সোডা মিশাইয়া জ্বাল দিতে হয়। এস্থলে শতকরা ২০ ভাগ Sodium Carbonate থাকা দরকার। লোহার কড়ার মধ্যে জ্বাল দিলে Calciumএর অংশ নীচে জমাট হইয়া আসিবে। যখন দেখা যাইবে যে, Calcium আর নীচে গিয়া জমাট হইতেছে না, তখন সোডা মিশান বন্ধ করিতে হইবে। এইরূপে জ্বাল দিয়া যে জলটুকু পাওয়া যাইবে তাহা ঠাণ্ডা করিয়া ছাকিয়া লইলেই Sodium hydrochlorite পাওয়া যায়।

ধোলাই করিবার কাজে এইরূপ Sodium hydrochloriteএর প্রয়োজন হয়। গেঞ্জি মোজা ইত্যাদি এই Solutionএ বেশী সময় রাখা উচিত নয় এবং ৫০-৬০ মিনিটের মধ্যে তাহা তুলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার জলে ধুইয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ অধৌত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে Bleaching powderএর দ্বারা সুতাগুলির অনিষ্ট হয়।

(৩) তারপর তৃতীয় দফায় Sodium bisulphite অথবা oxalic acid দ্বারা ঝকঝকে করা। ইহাতে পরিষ্কৃত হোসিয়ারী দ্রব্য আরও পরিষ্কৃত হইয়া তাহার আসল চাক্‌চিক্য প্রকাশ পায়। প্রথম শ্রেণীর মাল উৎপন্ন করিতে হইলে বিশেষ নিপুণতার সহিত এই তৃতীয় দফার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। ব্যাপার তেমন জটিল কিছুই নহে।

শত করা ২ অংশ সম্বলিত Sodium bisulphite অথবা oxalic acidএর Solutionএর মধ্যে কাপড় ভিজাইয়া ১৫ মিনিট আন্দাজ জ্বাল দিতে হয়। বেশী সময় ধরিয়া oxalic acid সহ হোসিয়ারী দ্রব্য সিদ্ধ করিলে সুতাগুলি নরম হইয়া যায়। ফলে এই মাল বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তজ্জন্যই ১৫ মিনিটের বেশী সময় জ্বাল দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। একই solution কয়েকবার ব্যবহার করা চলে। তবে জল যখন অপরিষ্কার ও ঘন হইয়া যায় তখন ইহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপে জ্বাল দিয়া গেঞ্জি মোজা ইত্যাদি পুনরায় পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে হয় তারপর যথারীতি শুষ্ক করিয়া ইস্তরী (Iron) করিয়া এই মাল বিক্রয়ার্থ সজ্জিত করা যাইতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, sodium bisulphite অপেক্ষা oxalic acid এ চাকচিক্য একটু ভাল হয়।

উপরে বর্ণিত প্রণালিতে হোসিয়ারী দ্রব্য পরিষ্কার করিতে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন। ইহাদের মূল্য তেমন কিছুই বেশী নহে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই টুকু ব্যয় করিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে। নিম্নে উপরোক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে একটি হিসাব দেওয়া গেল :—

Bleaching powder :—১০ পাউণ্ড ওজনের হোসিয়ারী দ্রব্য পরিষ্কার করিতে হইলে যে টুকু Sodium hydrochlorite Solution এর দরকার হয় তাহা ১.০২ পাউণ্ড Bleaching powder এবং ৪.৮ পাউণ্ড Sodium Carbonateহইতে পাওয়া যায়।

প্রতি হন্দর Bleaching Powder ৯৲ টাকা হিসাবে
১'০২ পাউণ্ডের মূল্য............./৩'৭

প্রতি হন্দর Sodium
Carbonate এর দর
৯৲ হিসাবে ৪'৮ পাউণ্ড
জিনিষের মূল্য......................।১'৩
Sodium hydrochlorite
প্রস্তুতের ব্যয় আন্দাজ............./০
বস্ত্রকে পরিষ্কার উপযোগী
রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য........./০
মোট ।/৫

ইহাতে দেখা যায় যে, ১০ পাউণ্ড ওজনের ৮০-৯৫ খানা গেঞ্জি ও মোজা ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে যে পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহার মূল্য ।/৫ পাই যায়।

এই তো গেল Chemical Process এর সাহায্যে Bleaching powder হইতে Sodium hydrochlorite এর Solution তৈয়ারী করার খরচের হিসাব। আর একটি উপায়ে কিন্তু এই Sodium hydrochlorite তৈয়ারী করা চলে—সেইটি হইল Electrolytic process—তাহাতে ১০ পাউণ্ড ওজনের গেঞ্জি মোজা প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য ।৫ পাই আন্দাজ পড়ে। কাজেই শেষোক্ত প্রণালী অধিকতর সুবিধাজনক বলিতে হইবে।

যে সকল কারখানায় প্রচুর হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে তাহা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়, সেই সকল স্থলে Electrolytic Process অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে যে কল কব্জার প্রয়োজন হয় তাহা নানা প্রকারের আছে। কারখানার প্রয়োজন হিসাবে ছোট, বড় কিম্বা মাঝারি রকমের কল আমদানী করা যাইতে পারে। Messrs. Siemens & Halske A. G. সর্ব্বাপেক্ষা ছোট আকারের কল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইহার দাম ৪০০৲ টাকা মাত্র। অন্যান্য কোম্পানীর নিকটও ইহা পাওয়া যায়।

এস্থলে হোসিয়ারি দ্রব্যাদি পরিষ্কার করার যে প্রণালী বর্ণিত হইল তাহা সরকারী শিল্প বিভাগের কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরীক্ষিত প্রণালী। পরীক্ষার ফলে সন্তোষজনক ফল হইয়াছে। কোনও কল কারখানার মালিক যদি আগ্রহ সহকারে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করেন তবে গবর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রী বিভাগের কর্ম্মচারীরা হাতে-কলমে হোসিয়ারী দ্রব্য পরিষ্কার করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে পারেন; অধিকন্তু ইহারা নানাস্থানে গমন করিয়া হোসিয়ারীর কারখানার উপযুক্ত কল কব্জা ইত্যাদি বসাইয়া ফিট করিয়া দিতেও রাজী আছেন। গেঞ্জি মোজা ইত্যাদির কারখানা চালাইয়া যাঁহারা লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে না পারিলে সুচারুরূপে কাজ চালান বড়ই কঠিন। কাজেই এই সুযোগে প্রয়োজনীয় কল কব্জা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা ইহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। Director of Industries 40/1 A Free School Street, Calcutta এই ঠিকানায় আমাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলে এ সম্বন্ধে সকল বিষয়ের উত্তর পাইবেন।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

B.P.—৫

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাঁহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1. Council House Street,
Calcutta.

[১৯২৯ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

আনাটো বীজ

(এস—৬০) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী কার্ম্ম অনন্ত বীজ ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Annatta Seeds, Lat. Bixa Orellana; Vernacular—Venduria, Lat Kan,

হিং—ASAFOEDITA

(এস—৬১) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী হিং—(Asafoetida) সরবরাহকারীর সন্ধান করিয়াছেন।

MOTHER-OF-PEARL SHELLS

(এস—৬২) শ্রীহট্ট (আসাম) হইতে এক ব্যক্তি পত্র লিখিয়া Mother of-Pearl Shell ক্রয়কারীর সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

কুচিলা—NUX VOMICA

(এস—৬৩) কাশী হইতে কোনও ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন যে, কুচিলা ক্রয়কারীদের সহিত পরিচিত হইতে তিনি ইচ্ছা করেন।

ZANTALUM ORE

(এস—৬৪) কলিকাতার কোনও কার্ম্ম পত্র দ্বারা Zantalum Ore ক্রেতাদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

YAK HAIR

(এস—৬৫) আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়া হইতে কোনও ব্যবসায়ী কার্ম্ম লিখিয়াছেন,—১০", ১২" এবং ১৪" ইঞ্চি লম্বা Yak Hair ধূসর বর্ণ এবং বাদামী বর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে সজ্জিত অবস্থায় যাহারা সরবরাহ করিয়া থাকেন, তাহাদের সন্ধান জানা আবশ্যক।

[৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

BARBERIS ARISTATU

(এস—৬৬) যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত দই-ওয়ালা (Doiwala) নামক স্থানের কোনও কারবারী পত্র দ্বারা Berberis Aristatu ক্রয়-কারীর সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন। এই জিনিষকে দেশীয় ভাষায় রসুত, দার-হলদি, ঝারকি হলুদ বলে।

গাঁজা

(এস—৬৭) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত বরমুলা (Burmulla) নামক স্থান হইতে কোনও ব্যবসায়ী, গাঁজা (Cannabis Indica) সরবরাহকারী এবং বিদেশে প্রেরণকারীর সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

আখরোট ও ফিন্দুক ফল

(এস-৬৮) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত জম্মুতই (Jammu Tawi) নামক স্থানের কোনও ব্যবসায়ী পত্র দ্বারা আখরোট ও ফিন্দুক ফল (Walnut and Hazelnut) ক্রয়কারীর সন্ধান চাহিয়াছেন।

[১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

AJWAN SEED

(এস—৭৪) পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত অমৃতসরের কোনও কারবারী Ajwan Seed (বা জোয়ান) সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন।

BUCHU LEAUES

(এস—৭৫) পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত অমৃতসরের কোন ও বড় কারবারী শুষ্ক Buchu Leaves (বা পাতা) সরবরাহকারীর সন্ধান জানিতে ইচ্ছা করেন।

GUM MYRRH

(এস—৭৬) পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসরের কোনও কারবারী Gun Myrrh সরবরাহ-কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন।

শটির পালো

মহাশয়—

আপনাদের ওখানে "পালো" খরিদ করিবেন এরূপ কোন লোকের ঠিকানা আছে কি? যদি থাকে তবে দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

নিবেদন ইতি

Bibhuti Bhusan Mitra
Ramjhora Bazar.
Hantu Para PO.
Jalpaiguri
31|10|29

কলিকাতায় ভয়াবহ মৃত্যু সংখ্যা

হেলথ অফিসারের রিপোর্ট

১৯২৭ সনের বিবরণ

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ্ অফিসার ১৯২৭ সনের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে শিশু মৃত্যু এবং অল্প বয়স্কা মেয়েদের মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এইরূপ ভয়াবহ শিশু মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হেলথ অফিসার মহাশয় কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে পিতামাতার অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং বাসস্থানের দুরবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের মধ্যে অকালে মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী। তাহার কারণ—অপুষ্ট আহার, বাল্যবিবাহ এবং পর্দ্দা প্রথা।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে মোট ৩৬৮২০ জন লোক মারা গিয়াছে ইহার মধ্যে খাস কলিকাতায় ৩০,২১৬জন অর্থাৎ হাজার করা ৩৮,৩ জন এবং সংযোজিত স্থান সমূহে ৬,৬০৪ জন অর্থাৎ হাজারকরা ৩৯ জন লোক মারা গিয়াছে।

বিভিন্ন রোগে মৃত্যু

প্লেগ:—আলোচ্যবর্ষে মাত্র একজন লোক প্লেগে মারা গিয়াছে।

কলেরা:—কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা ১৯২৬ সন অপেক্ষা ১৯২৭ সনে বেশী। খাস সহরে এই রোগে মারা গিয়াছে মোট ১,৭৩৭। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ১০২৬ সংযোজিত অঞ্চল সমূহে মারা গিয়াছে ৪৩৪ জন।

বসন্ত:—এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা ২,২৭৮। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ৩,৭১৭, সংযোজিত অঞ্চল সমূহে এই রোগে মারা গিয়াছে ৫৮২ জন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা:—ইনফ্লুয়েঞ্জায় খাস কলিকাতায় মারা গিয়াছে ৪৩৭জন; পূর্ব্ববৎসরের সংখ্যা ৫১২; সংযোজিত স্থান সমূহে মারা গিয়াছে ৬৩ জন। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ৩৬।

স্ত্রী ও পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা

আলোচ্যবর্ষে স্ত্রীলোক মারা গিয়াছে মোট [illegible] জন, আর পুরুষ মারা গিয়াছে ১৬৫১৬

জন ; পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা দুই গুণ বেশী। কাজেই দেখা যাইতেছে সংখ্যানুপাতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মৃত্যুহার অনেক বেশী। পুরুষদের মৃত্যুহার হাজার করা ২৬.৭, স্ত্রীলোকদের হাজার করা ৪৭·২।

সম্প্রদায় হিসাবে মৃত্যুহার

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুহার কিরূপ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সম্প্রদায়	জনসংখ্যা	মৃত্যুহার
হিন্দু	৬৫১৭৬৫	৩৩·৪
মুসলমান	২০৯০৬৬	৩৫·২
খৃষ্টান	২৫৫৬২	২০·৭
খৃষ্টান (দেশীয়)	১৩৫৯২	৩৩·৭
অন্যান্য	৭৮৬৬	১০·৪

বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা

রোগ	সহর	উপকণ্ঠ
কলেরা	১৭৩৭	৪৩৪
বসন্ত	২২৭৮	৫২৮
হাম	১০৮	২৮
প্লেগ	১	...
আন্ত্রিক জ্বর	৭৫৫	১০২
কালাজ্বর	৪৯৩	৮৯
ম্যালেরিয়া	৯৮৯	৪৭১
ইনফ্লুয়েঞ্জা	৪৩২	৬৩
অন্যান্য জ্বর	১৫৩৭	৩১১
যক্ষ্মা	২৬৩৪	৫৮১
শ্বাস যন্ত্রের পীড়া	৫৯৯০	১২৫৫
আঘাত	৬৫৪	১৩৬
আমাশয় ও উদরাময়	২৯৮	৯৩৭
অন্যান্য কারণে	৯৭০০	১৮০৭
মোট	৩০,২১৬	৬,৬০৪

শিশু মৃত্যুর কারণ

আলোচ্য বর্ষে দেখা যায়, খাস সহরে হাজার করা ৩২৪টি শিশু এবং সমগ্র সহরে ৩২৯৭ জন শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। খাস সহরে শিশু মৃত্যুর মোট সংখ্যা ৪,৫৮০। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ৫,৪১৬

শিশু মৃত্যুর সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যেই বেশী। ইহার প্রধান কারণ—এই সম্প্রদায়ের গরীব লোকদের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার। বস্তীগুলির মধ্যেও অতি কঠোর পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত। ধাত্রী এবং মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণও ইহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে গেলে—ইহারা অনেক সময়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে।

জন্ম সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে খাস কলিকাতায় ১৪,১১৫টি শিশুর জন্ম বিবরণ রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, উক্ত বর্ষে হাজার করা ১৫·৫টি শিশুর জন্ম হইয়াছে। সংযোজিত অঞ্চল সমূহের জন্ম সংখ্যা ২,৬২৫।

কলিকাতায় পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ। কাজেই জন্মহার হইতে এখানকার স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় না।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যানুপাতে জন্ম সংখ্যা কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে। এই সংখ্যা মোট জন সংখ্যার অনুপাতে এবং স্ত্রীলোকদের জন-সংখ্যানুসারে যথাক্রমে দেওয়া গেল। হিন্দু ১৬৬, ৫৭·০ ; মুসলমান ১১·৭০ ৪৫·২, ফিরিঙ্গী ও এশিয়ার

বাহিরের অধিবাসী—২০.৩, ৪১'৮, ভারতীয় খৃষ্টান ১৫১-১, ৩৯৯,

ক্ষয় রোগের মৃত্যুহার

১৯২১ সন হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ক্ষয়রোগে হাজার করা কত লোক মারা গিয়াছে—নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :—

সন	হাজার করা
১৯২১	২.৪
১৯২২	২-৪
২৯২৩	২-৩
১৯২৪	২ ৫
১৯২৫	২.৪
১৯২৬	২ ৭

ত্রিদোষনাশক ত্রিফলা

[শ্রীকল্পতরু বন্দ্যোপাধ্যায়]

১। ভায়া হে, পুরাকালে মানব যখন অগ্নি জ্বালাইয়া রন্ধন করিতে শিখে নাই, তখন আম দ্রব্যই ভোজন করিত। তৎপরে মানুষ দেখিল যে, কোন্ কোন্ খাদ্য রন্ধন করিয়া খাইলে অধিকতর মুখরোচক হয়। এজন্য জিহ্বার লালসে ক্রমশঃ তৈল, লবণ ও মশলা সহযোগে অসংখ্য প্রকার ব্যঞ্জন প্রভৃতি সভ্য-সমাজে প্রচলিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-যন্ত্রও সহসা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও উত্তেজিত হওয়ায় কালক্রমে লোকে আস্তে আস্তে বলহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল।

রোগ শোক, সাংসারিক নানা অসুবিধার তাড়নে মানব পুনরায় আমখাদ্যের উপকারিতা যেন একটু একটু উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। বানর, গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতির স্বাভাবিক সনাতন খাদ্য বিচার হইতে আধুনিক অভিজ্ঞ মনীষীরা এই মত প্রকাশ করিতেছেন :—খাদ্য অগ্নি-সংযোগে পাক করিলেই উহার জীবনী শক্তিপ্রদ সূক্ষ্ম সারাংশ (vitamin) বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। মুড়ি, খই ও অন্যান্য ভাজাপোড়া দ্রব্যে আমরা ইহার প্রমাণ পাই। অত্যধিক তাপে ইহাদের সারাংশ উড়িয়া পুড়িয়া যায় এবং ইহারা দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে। ভ্যাজাল তেলে ও ঘিয়ে ভাজা ভোজ্য সামগ্রী আজকাল হাটে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহাদের অতিরিক্ত ব্যবহারে রোগও সভ্য জগতে ক্রমবিস্তার লাভ করিতেছে।

২। আজিকার এই mechanical & chemical age বা যন্ত্রকল ও রসায়নের যুগে মানুষ কলের কৃত্রিম ও শাঁচবিশালী সৃষ্টি—সুন্দর খাবার বেশী মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ব্যাধির কবলে অধিকতর নিপতিত হইতেছে। পূর্ব্বে খেতখামারের প্রকৃতিদত্ত টাটকা খাদ্য খাইয়া লোকে কেমন সুস্থ ও নীরোগ থাকিতে পারিত; আর এখন নানাদিকে কৃত্রিম ভেজাল ভোজ্যের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মানুষের সুখশান্তি তিরোহিত-প্রায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও চিনি বড়লোকের ব্যবহার্য্য একটা সৌখীন বিলাস-বস্তু ছিল; লোকে তখন মধু ও গুড় খাইত বলিয়া কথায় কোমল মিষ্ট সরস ও মাধুর্য্যময় ছিল। আর এখন কারখানায় চিনি প্রস্তুতের পর হইতে ঘরে ঘরে শ্বেত শর্করার আবির্ভাব; চিনি না হইলে একদণ্ডও চলেনা। তাই কি সেটা গুড়ের মত চমৎকার, না মধুর? চিনিও যে স্বার্থ-সেবী আত্মভরি বণিকের হস্তে পড়িয়া এমন গৌরবর্ণ অথচ মিষ্টতাহীন হইবে, তাহা ত স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই। অধুনা অনেক মিউনিসিপ্যাল্ সহরের রাস্তার মিটমিটে আলোক যেমন বাড়ী হইতে লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া গিয়া দেখিতে হয়, তেমনি আজি-কার বাজারের চিনিও কিঞ্চিৎ গুড় দিয়া খাইলে তবে ইহার একটু মিষ্টাস্বাদ পাওয়া যায়। ধন্য মায়াময় কপট যুগ!

অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় (শ্রীভগবান্ করুন যেন সত্য না হয়) যে, চা-(Tea) কর ও চা-সওদাগরদের সহিত এই চিনি ব্যবসায়ীদের নাকি একটা চুক্তি আছে; উহার মর্ম্ম এইরূপ—'তারা, তোমরা যত বেশী চা প্রচলন করিতে পারিবে, আমরাও শোধন প্রণালী দ্বারা চিনির স্বাদ কমাইয়া উহার কাটতি বাড়াইতে চেষ্টা করিব।' পূর্ব্বে যেখানে এক চামচ চিনি লাগিত, এখন তথায় দুই তিন চামচ চিনি না দিলে মিষ্টতা হয় না। কাজেই চা-খোরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যে চিনির ব্যবহার বাড়িবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তাই চা-কর ও চা বণিকগণ চিনি বিক্রেতা-দের সহিত হাতে হাতে মিলাইয়া উভয়ে বেশ দুপয়সা লাভ করিয়া স্বাস্থ্যহীন বাবুদের প্রসাদে শর্করার মাত্রা বাড়াইয়া Diabetes বা বহুমূত্র রোগ-বিস্তারের কিছু সহায়তা করিতেছেন—বলিলে বোধ হয় খুব অন্যায় হইবে না। যাহা হউক যুগটা বড় অদ্ভুত! মানুষের মুখে মধু নাই, প্রাণে মিষ্টতা নাই, আচরণে মাধুর্য্য নাই, চিনিতে মিষ্টতা নাই, অথচ মধুমেহগ্রস্ত চতুর বাবুদের প্রসাদে চিনি কোথা হইতে আসে? রসহীন অপ্রেমিক অর্থ গৃধ্নু ভোগ লোলুপ সভ্য ও শিক্ষিত মস্তিষ্ক চালকের অন্দর মহলে এত খেজুর রসের প্রাচুর্য্যের কারণ কি? মাননীয় বিশেষজ্ঞ তাঁরা, আশা করি, এদিকে একটু চিন্তা করিবেন।

৩। চাউল ও ময়দা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। ইহারা কলে পড়িয়া সাবান-মাখা বাবুদের মত বেশ সাদা ধবধবে ফরসা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সার নাই। সভ্য সমাজে যে এত বেরি-বেরি, বাত, অম্ল, মধুমেহ, হৃদরোগ প্রভৃতির প্রাবল্য, ইহার অন্যতম কারণ—অন্তঃসারশূন্য (Vitaminless), কলে-প্রস্তুত, ধবল খাদ্যের প্রচলন। সার না থাকায় দ্রব্যটী বেশী পরিমাণে খাইতে হয় এবং ইহাতে পাকস্থলী ভারাক্রান্ত হওয়ায় কালক্রমে দমিয়া এলাইয়া পড়ে। কি কারণে জানি না—আজকাল অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ভদ্রসমাজে গোদ ও কোষের বৃদ্ধি হইয়াছে। স্ত্রীলোকের পায়ে গোদ পুরুষের অণ্ডকোষ—এ দুটি যেন

তখন ঘরের অন্নের আকাল। যাহা হউক, যখন দেশ জাগিয়াছে, তখন যে নিজ নিজ অন্নের প্রতি চাহিয়া রোগ নির্ণয় পূর্ব্বক উহার নিদান উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইবেন, এ আশা বোধ হয় দুরাশা নহে।

কলে ছাঁটা চাউল ও ময়দার বিরুদ্ধে একটা বিশ্বব্যাপী অভিযোগ উঠিয়াছে, ইহাও একটু আন্দোলন করিতে হইবে। তবে এখনও ক্রিয়ার অনেক বাকী, এজন্য প্রতিক্রিয়ারও বহু বিলম্ব। জলে পড়িয়া মাটি না ঠেকিলে কি কেহ ভাসিয়া উঠে! সেইরূপ কলকারখানার কৃত্রিম খাদ্যের কুফল চরম অবস্থায় উপনীত হইলে, তবে আবার সত্যযুগের সেই পূর্ব্বতন স্বাভাবিক অকৃত্রিম ফলমূল ও শাকসব্জীগুলিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিবে। এখনও অনেক দেরী, কারণ কলের নেশা ত কাটে নাই। কল আগে পৃথিবী ছাইয়া ফেলুক, মানুষ রোগে ভুগিয়া বুকে হাঁটুক, আর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ুক, তারপর আবার ঢেঁকিতে ছাঁটা কুঁড়ামিশ্রিত মোটা চাউলের কেঁকসমেত ভাত খাইবে এবং বাড়ীতে গিন্নী-মেয়েদের জাঁতায় ময়দা পিষাইয়া খোসাশুদ্ধ মিষ্টি মোলায়েম রুটি খাইয়া সুস্থ, সবল ও সরস হইবে।

স্বাস্থ্য সমাচার।

প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসা জ্ঞান

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল্‌-এ-এম্‌-এস্‌।

প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসাজ্ঞানের কিছু কিছু পরিচয় ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন। দ্রব্য বিজ্ঞান এবং পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোটকা চিকিৎসায় তাঁহারা বহু উৎকট অসুখ ভাল করিতে পারিতেন। আজ প্রাচীনা মহিলাদের ব্যবহৃত কয়েকটি ঔষধের কথা বলিব। আমরা এই ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়া অতি সুন্দর উপকার পাইয়াছি। বলিতে কি, এই ঔষধগুলি এমনই বিশেষভাবে পরীক্ষিত যে, মন্ত্রশক্তির মত কাজ করিয়া থাকে। পাঠক পাঠিকারা এই ঔষধগুলি অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পারেন।

পরিণাম শূলের চিকিৎসা

ভুক্ত বস্তুর পচ্যমান অবস্থায় যে শূল বেদনা হয়, তাহাকে পরিণাম শূল বলে। এইরূপ শূল বেদনায় নিম্নলিখিত ঔষধটি বিশেষ উপকারী—

(১) একটি জলপূর্ণ নারিকেলের মধ্যে যতটা সৈন্ধব লবণ ও যোয়ান (দুইটি দ্রব্য সমান ভাগে লইবে) প্রবেশ করিতে পারে, তাহা প্রবেশ করাইয়া নারিকেলের মুখটি একটি ছিপি দিয়া

বন্ধ করিতে হইবে, পরে মাটি ও কাপড়ের লেপ দিয়া শুকাইয়া লইয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া লইবে। তাহার পর কাদার লেপটি তুলিয়া ফেলিয়া সব জিনিষ একত্র গুঁড়া করিয়া প্রত্যহ দুইবার আহারের পর শীতল জল সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পরিণাম শূলে ইহা তো মহৌষধ বটেই, ইহা ভিন্ন অম্লশূলেও ইহাতে উপকার দর্শিয়া থাকে। অম্লশূলের বহু রোগীকে আমরা এই ঔষধ ব্যবহার করিতে দিয়া সুন্দর ফল পাইতে দেখিয়াছি। ইহার মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত।

(২) তেঁতুল গাছের চটা ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায়—ডাবের জল অথবা শীতল জল সহ পরিণাম শূল বা অম্ল শূলের বেদনার সময় সেবন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যদি একবার সেবন করাইয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে বেদনার উপশম না হয়, তাহা হইলে আর একবার সেবন করিতে দিবে।

বাতের চিকিৎসা

(১) সজিনাছাল ও উইমাটি সমান ভাগে গোমূত্রে বাটিয়া গরম করিয়া বেদনার স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনার শান্তি হয়।

(২) আতপ চাউল ও আদা সমান ভাগে বাটিয়া লইয়া গরম করিয়া বেদনার স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হইয়া থাকে।

(৩) সজিনার ছাল, সৈন্ধব লবণ ও রসুন সমান ভাগে লইয়া রেড়ির তৈলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার দ্বারা মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

(৪) কাঁচা এরণ্ড মূল, গুলঞ্চ, দেবদারু ও ও শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ ক্বাথ সকালে অর্দ্ধেক ও বৈকালে অর্দ্ধেক সেবন করিলে সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জাগত, এবং সর্ব্বপ্রকার আমবাত প্রশমিত হয়।

(৫) রসুন, শুঁঠ ও নিসিন্দার ছাল—প্রত্যেক দ্রব্য এগার আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সকালে ও বিকালে সেবন করিলে আমবাতের বিশেষ উপকার হয়। উপরি লিখিত একটি পাচন সেবন ও একটি তৈল মর্দ্দন একসঙ্গে করিলে বাতে বিশেষ উপকার হয়।

(৬) প্রমেহজনিত বাতে—এক তোলা অশ্বগন্ধা ও এক তোলা শ্বেত বেড়েলা একসঙ্গে বেশ করিয়া থেঁত করিয়া লইয়া দেড়পোয়া জল ও আধপোয়া দুগ্ধে একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে সুন্দর ফল দর্শিয়া থাকে।

হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা

আজকাল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হিষ্টিরিয়া রোগটির বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগের চলিত নাম মূর্চ্ছা। এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ গর্ভাশয়ের বিকৃতি, রজোনিঃসরণের অভাব বা অল্পতা, শোক, স্বামীর অস্নেহ বা স্বামী কর্ত্তৃক নিষ্ঠুরাচরণ, কিম্বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে অক্ষমতা। আমরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, অভাবের অনুভূতির জন্য মানসিক দুর্ব্বলতাই এই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ; আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে যুবতী স্ত্রীগণই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হন। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য পুরুষেরাও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছাগ্রস্থ রোগীর স্থায়ী উপকারের জন্ত নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটি বিশেষ উপকারী—

(১) জটামাংসী একতোলা পরিমাণে লইয়া এক ছটাক জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া সেই জল পান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

(২) ছাঁচি কুমড়ার জল সহ যষ্টিমধু দুই আনা পরিমাণে বাটিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে সুন্দর ফল দর্শিয়া থাকে।

সাধারণতঃ কবিরাজ মহাশয়েরা হিষ্টিরিয়া রোগে চিন্তামণি চতুর্মুখ' বা 'কৃষ্ণচতুর্মুখ'—নামক ঔষধটি জটামাংসী ভিজান জল বা ত্রিফলা ভিজান জলসহ (হরিতকী ১টী,বহেড়া ১টি,আমলকী ১টী আঁটি বাদ দিয়া রাত্রিতে ১ ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া লইয়া ঐ জলসহ) অথবা মিছরী ভিজান জল ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিয়া থাকেন এবং মধ্যম-নারায়ণ তৈল প্রভৃতি কোন একটি বায়ুনাশক তৈল মর্দ্দন করিতে দিয়া থাকেন। ইহাতে হিষ্টিরিয়া রোগে আশু উপকার হইয়া থাকে। সুগন্ধি তিল তৈল মস্তকে মাখিয়া স্নান করিলেও হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছা রোগে উপকার হইয়া থাকে।

হিষ্টিরিয়া রোগীর সর্ব্বদা মানসিক প্রফুল্লতা লাভের জন্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশুক। রোগীর যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে—

জাঙ্গী হরীতকী গব্য ঘৃতে মাখাইয়া ভাজিয়া লইবে; পরে উহা বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে ঐ জাঙ্গী হরীতকী চূর্ণ আধতোলা ও আধতোলা চিনি গরম জলের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

শ্বাসরোগের চিকিৎসা

আজকাল শ্বাসরোগের এক প্রকার চুরুট বা সিগারেট আবিষ্কার হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সিগারেট ব্যবহার করিলে শ্বাসরোগীর আশু শ্বাসকষ্ট নিবারিত হইয়া থাকে এমনও দেখা গিয়াছে। কিন্তু বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্ত এই প্রকার সিগারেটের ধূম লওয়ার প্রচলন আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে বহু প্রকার দ্রব্যের ধূম লওয়ার ব্যবস্থা আছে। শ্বাসকষ্ট নিবারণের ডাক্তারী সিগারেট আবিষ্কার হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীনা মহিলারা শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্ত ধূম লওয়ার ব্যবস্থা জানিতেন। আমরা নিম্নে কয়েকটি শ্বাসকষ্ট নিবারণের ধূমের পরিচয় দিতেছি—

(১) কনক ধুতুরার ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। ঐ শুষ্ক দ্রব্য কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূম প্রবল শ্বাসের সময় গ্রহণ করিতে দিবে। তাহাতে সদ্যঃ শ্বাসকষ্ট নিবৃত্তি হইবে।

(২) খানিকটা সোরা জলে ভিজাইয়া সেই জলে এক টুক্‌রা কাগজ ডুবাইয়া শুকাইয়া লইবে। তাহার পর ঐ সাদা কাগজ নলের মত করিয়া পাকাইয়া উহার ধূমপান করিতে দিবে। ইহাতেও শ্বাসরোগের সদ্যঃ উপশম হয়।

(৩) দেবদারু, শ্বেতবেড়েলা ও জটামাংসী সমান ভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া তাহার দ্বারা একটি সচ্ছিদ্রবর্ত্তী প্রস্তুত করিবে এবং উহা শুষ্ক করিয়া সেই বর্ত্তীতে ঘৃত মাখাইয়া চুরুটের ন্তায় ধূমপান করিতে দিবে। ইহাতেও শ্বাসকষ্ট আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

উপরিলিখিত ঔষধগুলি শ্বাসকষ্ট নিবারণে আশু উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু স্থায়ী উপকারের জন্ত নিম্নলিখিত ঔষধটি বিশেষ উপকারী—

শুলফ, শুঁঠ, বামনহাটি, কন্টীকারী ও তুলসী—এক একটি চারি আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথে এক আনা পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিবে।*

*উপরিলিখিত ঔষধগুলি সম্বন্ধে কাহারো কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকিলে চিত্তরঞ্জন দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়, পোঃ পুরুলিয়া (মানভূম)—এই ঠিকানায় লেখকের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

ইনসিওরেন্স এজেণ্টের আবশ্যকীয় গুণাবলী।

আমাদের দেশে যাঁহারা জীবন বীমা, বিবাহ বীমা, অগ্নি বীমা, প্রভৃতির জন্য মক্কেল সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ বীমার এজেণ্ট (Insurance Agent) নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাঁরা দোকানের বিক্রয়কারী কর্ম্মচারীর ন্যায় বীমা বিক্রয়কারী ছাড়া আর কিছুই নহেন। বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলেন যে, সুদক্ষ বীমার এজেণ্ট হইতে হইলে দোকানের বিক্রয়কারী কর্ম্মচারীর সমস্ত গুণাবলীই অর্জ্জন করা প্রয়োজন।

কোনও জিনিষ ক্রয়ের উদ্দেশ্য লইয়া ক্রেতা সাধারণতঃ বাজারে উপস্থিত হয়। মোটামুটি জিনিষ সম্পর্কে একটা ধারণা তাহার গোড়া হইতেই থাকে। এই অবস্থায় তাহাকে দশটা জিনিষ দেখাইয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে পারিলেই অনায়াসে কাজ হাসিল করিয়া লওয়া যায়। এস্থলে ক্রেতার মন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকে—এই প্রস্তুত ক্ষেত্রে সুযোগ বুঝিয়া বীজ বপন করিতে পারিলেই আশাতীত সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ক্রেতা হয়ত একটি জিনিষ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্য লইয়া

দোকানে প্রবেশ করে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অজন থানেক জিনিষ তাহাকে গছাইয়া দেওয়া যায়।

অবশ্য ক্রেতার মন পাইবার জন্য অভিজ্ঞতা ও কৌশলের কম প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয়—সে কি প্রকৃতির লোক, তাহার কোন বিশেষ খেয়াল আছে কিনা এবং জিনিষ দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইতেছে কিনা। তারপর দর দস্তুরের সময় যাহাতে তাহার মনে কোনও প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইবার অবকাশ না ঘটে, তৎপ্রতি ও সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ দেশের দোকানগুলিতে অনেক সময় দেখা যায়—জিনিষ পছন্দ হইল, কিন্তু তারপর দরদস্তুর লইয়া সন্দেহ বাধিল। যিনি বিক্রয় করেন হয়ত তিনিই ইহার সঠিক দর বলিতে পারিলেন না। তখন অপর আর এক ব্যক্তির নিকট হাকাহাকি আরম্ভ হইল। ইহাতে অনেক ক্রেতার মন বিগড়িয়া যায়। সে হয়ত তখন মনে করে যে, ইহারা দর ঠিক জানে না। ক্রেতার মনের গতি বুঝিয়া দাম হয়ত বাড়াইয়া বলিবে এই মতলব করিতেছে। এইরূপ সন্দেহ একবার ক্রেতার মনে জাগিলে, তাহা দূর করা সহজসাধ্য হয় না।

সেই জন্যই যিনি যাহা বিক্রয় করিবেন সেই জিনিষ সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞান থাকা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। সেই জিনিষ কোথা হইতে আসে, কাহারা প্রস্তুত করে, কি কি উপাদানে তাহা প্রস্তুত হয়, নকল হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা, কি পরিমাণ দরে কোথায় কি অবস্থায় বিক্রয় হয় এবং তাহার নিজের দোকানে হাল চাল কি, এই সমস্ত সংবাদ বিক্রয়কারীর নখাগ্রে থাকা চাই। ক্রেতার মুখ হইতে প্রশ্ন বাহির হওয়া মাত্রই যাহাতে বেশ গুছানো উত্তরটি বিক্রেতা দিতে পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কোনও জিনিষ ক্রয় করিতে গিয়া অনেক সময় ক্রেতারা অনাবশ্যক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অজস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করা সুদক্ষ বিক্রেতার লক্ষণ নহে। ধৈর্য্য ধরিয়া সকল কথা শুনিতে হইবে এবং ক্রেতার মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গুছাইয়া গাছাইয়া এমন সুন্দর ভাবে উত্তরটি দিতে হইবে যাহাতে সে সন্তুষ্ট না হইয়াই পারে না ; এবং তাহা করিতে হইলেই ব্যবসায় সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরটুকু পর্য্যন্ত তাহার জানা থাকা চাই ; এবং এই সংবাদ সময় বুঝিয়া গুছানো ভাবে প্রকাশ করিবার যে কৌশল (Art) তাহাও আয়ত্ত করা বিক্রেতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। গোড়া হইতে প্রস্তুত না হইয়া দোকানে গিয়া আসর জমাইয়া বসিলেই ভাল বিক্রেতা হওয়া যায় না এবং সেই জন্যই অনেক দোকান ভাল বিক্রেতা বা Salesman এর অভাবে ফেল পড়িয়া যায়।

বীমা সংগ্রহের কাজ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই সমস্ত কথা খাটে। বীমা সংক্রান্ত সকল সংবাদই তাঁহাদের জানা দরকার। বিশেষতঃ আমাদের এদেশে এখনও বীমা করার উপকারিতা সকলে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যাঁহারা বীমার ব্যবসা করিয়া লাভবান্ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে জোর প্রচার কার্য্য চালাইয়া ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে জনমত সৃষ্টি করা একান্ত কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, শতকরা ৯৯ জনেরই এ পর্য্যন্ত বীমা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। দুই চারি জনের যাহা এক আধটু আছে তাহাও বীমায়

অনুকূল নহে। বরং নানা দিক দিয়াই প্রতিকূল। এই অবস্থায় আমাদের দেশে বীমা সংগ্রাহকগণের কর্ত্তব্য যে খুবই জটিল এবং কষ্টসাধ্য—তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য দেশেও বীমা সংগ্রহ করা একান্ত সহজ কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না—হইতে পারেও না।

দোকানের জিনিষ বিক্রেতার কর্ত্তব্য হইতে বীমা সংগ্রাহকের কর্ত্তব্য অধিকতর কষ্টকর। কারণ দোকানে যাহারা জিনিষ ক্রয় করিতে আসে তাহারা গোড়াতেই কতকটা ধারণা লইয়া আসে—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মোটের উপর এস্থলে ক্ষেত্র প্রস্তুতই থাকে—কেবল সুযোগ বুঝিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীমা সংগ্রাহকের বেলায় ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে না—তাহা আগাছা ও আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ থাকে। সেই সমস্ত আবাদ করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়; অন্যথা বীমা সংগ্রহকারীর পক্ষে সাফল্য লাভের কোনই আশা থাকে না। কাজেই দোকানের জিনিষ বিক্রেতা অপেক্ষা বীমার পলিসি বিক্রেতাগণের পক্ষে অধিকতর অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বোপরি অমায়িকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমেই তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, আমার জন্য দ্বার কোথাও উন্মুক্ত নাই। সকলের বাড়ীর গেটই প্রথমতঃ বীমার এজেন্টের নিকট রুদ্ধ থাকে। এই রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া বাড়ীর মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করার সুযোগই হয়তঃ অনেকের ঘটে না। কারণ বীমার এজেন্টের নাম শুনিলেই অনেক শিক্ষিত লোকও বিরক্তি বোধ করেন এবং দূর হইতে এই আপদকে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বীমা সংগ্রাহক যদি ইহাতে বিরক্ত হইয়া চলিয়া যান তাহা হইলে সাফল্য লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রাথমিক প্রত্যাখ্যানে নিরুৎসাহ হওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নহে। James S. knox নামক একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলেন—"The average person surrounds himself with a wall of resistane to every salesman, no matter what he sells, and the salesman, therefore must have a ladder that will enable him to get over the wall"—অর্থাৎ সাধারণ লোক সর্ব্বদাই তাহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ওজর আপত্তির প্রাচীর তুলিয়া বিক্রেতার প্রস্তাবকে বাধা দেয়, সেই সমস্ত বাধা বিঘ্নের প্রাচীর টপকাইয়া ক্রেতার নিকট পৌঁছাইতে হইলে প্রত্যেক বিক্রেতার নিকট একখানি করিয়া সিঁড়ি থাকা দরকার।

এই যে সিঁড়ির কথা বলা হইল—তাহা অভিজ্ঞতা, অমায়িকতা, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা দ্বারা তৈয়ারী। এই সমস্ত গুণাবলীর সাহায্যেই ক্রেতার সমস্ত বাদ প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারা যায়। যেরূপেই হউক না কেন, সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রথমতঃ অনেক আপত্তি উঠিবে, হয়ত এজেন্টের প্রস্তাব মোটেই আমল পাইবে না, যাহার নিকট প্রস্তাব করা হইবে তিনি ইহাতে আদৌ মনোযোগ দিবেন না। কিন্তু ইহাতে অধৈর্য্য হইলে চলিবে না। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—শ্রোতাটির মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে কিনা। যখনই তিনি বলিবেন—"না মশায়, ইহাতে আমার কাজ নাই, ইহাতে লাভের সম্ভাবনা কোথায়? এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া বীমার টাকা দিতে পারিব না"—

ইত্যাদি ইত্যাদি—তখনই বুঝিতে হইবে যে, ঔষধ ধরিয়াছে এবং কাজ করিতেছে, শ্রোতাটি অন্ততঃ মনোযোগ দিয়াছেন এবং প্রস্তাব সম্পর্কে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি তাঁহার মেজাজ ভাল না থাকে তাহা হইলে সেদিনকার মত তাঁহাকে সেখানেই ছাড়িয়া দিয়া এবং সমগ্র বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার অনুরোধ করিয়া চলিয়া আসিলে কোনই ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে।

ইহার পর সুযোগ বুঝিয়া আর একদিন তাঁহার নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি হয়ত বলিবেন, না মশায়, চিন্তা করিয়া দেখিলাম—আমাদ্বারা হইবে না। তখনই বলিতে হইবে—"এইটি আপনার ভ্রান্ত ধারণা। যাঁহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনাশীল, তাঁহাদের পক্ষেই এরূপ কাজে হাত দেওয়া সঙ্গত। কারণ যাঁহারা সমস্ত দিক না দেখিয়াই ঝোঁকের মুখে কাজ করিয়া বসেন তাঁহারা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কাজ চালাইতে পারেন না—এই অবস্থায় অনেক বীমা অযথা নষ্ট হয়। আপনি যখন আগে হইতেই সব কথা ভাবিয়া দেখিতেছেন তখন আপনার পক্ষেই বীমা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

এইরূপ ভাবে আরও নানা কথা বলিতে হইবে। নিম্নে দুই একটি নমুনা দিতেছি :—

"মশায়, আগে আমার কথা না শুনিয়ে আপনি নিষেধ করিবেন কিরূপে? আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা দয়া করিয়া শুনুন। তারপর না হয় আপনার ইচ্ছা হইলে দশটা গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিবেন।"

"আমরা যদি পরস্পরের প্রস্তাব ভাল করিয়া বুঝিতে পারি তাহা হইলে মশায়, আপনার পক্ষেই বীমা করিতে রাজী হইবেন—তখন আর আমাকে নাছোড়বান্দা হইয়া এতটা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইবে না।"

অতঃপর হয়ত দরদস্তুর সুরু হইবে। তখন কথা উঠিবে—আপনার কোম্পানীতে যে বীমা করিব তাহাতে আমার বিশেষ সুবিধা কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আপনার কোম্পানীর বিশেষত্ব কি এবং অপরের তুলনায় ভাল কিসে?

এস্থলে তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োজন এবং তাহা করিতে হইলেই বাজারের নামকরা সকল বড় বড় বীমা কোম্পানীর সুযোগ সুবিধার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানা থাকা চাই। যাঁহারা বীমা সংগ্রহের কাজ করেন তাঁহাদের পক্ষে এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল যাঁহারা এই কারবার করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এই সকল জ্ঞান থাকে না; এমন কি নিজের কোম্পানীর সুযোগ সুবিধা সম্পর্কেই তাঁহাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বীমা সংগ্রহের কাজ বুদ্ধিমান লোকের কাজ—ইহাতে যথেষ্ট বিচক্ষণতার প্রয়োজন। সেই বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা অর্জ্জন না করিয়া এ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

তারপর বদমেজাজী লোকের পক্ষে ইন্সিওরেন্সের দালালী করিতে যাওয়া কখনও উচিত নহে; তাহাতে তিনিও কোন কাজ বাগাইতে পারিবেন না।

পরন্তু যে বীমা কোম্পানীর কাজ তিনি করিবেন, সেই কোম্পানীর প্রতিও লোকে বীতশ্রদ্ধ হইয়া যাইবে। কর্কশ কথা বলিয়া লোককে মেজাজ চটাইয়া দিলে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজই মাটি হইয়া যায়।

এই তো গেল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বীমা-সংগ্রহের কথা। এবারে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত গণের কথা ধরা যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বীমার উপকারিতার কথা ইহারা একদম বোঝে না—এ সম্পর্কে তাহাদের কোনও ধারণাই নাই। যদি বা কাহারও কিছু থাকে তাহা হইলে সেই টুকু অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূলই হয়। পল্লীগ্রামের লোকের একটা ধারণা এই যে, বীমা করিলেই লোক শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া যায়; তাই তাহারা এইটিকে অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া মনে করে। তারপর ধাপ্পাবাজীর ভয়ও আছে। সর্ব্বপ্রথম যখন স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে এদেশে বীমার ব্যবসা আরম্ভ হইল, তখন দেখিতে দেখিতে দেশের সর্ব্বত্র ব্যাঙএর ছাতার ন্যায় বীমা কোম্পানী সমূহ গজাইয়া উঠিল। সে সময়ে কড়াকড়ি কোন আইন কানুন ছিল না। তাই অনেক বীমা কোম্পানী জাল জুয়াচ্চুরি করিয়া পল্লীগ্রাম হইতে দুই হাতে টাকা লোপাট করিলেন। সেই সময়ে কিন্তু স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল—তাই অনেক অনাথা বিধবা পর্য্যন্ত বীমা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কতিপয় দেশীয় কোম্পানীর অসাধুতার ফলে অনেক পল্লী বিধবা এবং দুঃস্থলোক, যাহারা না খাইয়া অতিকষ্টে বীমার টাকা দিয়াছিল—তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। আজকাল অবশ্য নূতন আইন কানুন হইয়াছে। তাহার ফলে বীমার টাকা লোপাট করিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু সেই যে একটা বিকৃত ধারণা পল্লীর সহজ, সরল, বিশ্বাসী লোকের মনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এখনও দূরীভূত হয় নাই। এই ধারণা দূরীভূত করিবার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা চরিত্রের প্রয়োজন। পাড়াগাঁয়ে যাঁহারা বীমা সংগ্রহ করিতে গমন করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম এই অসুবিধারই পড়িতে হয়। পল্লীর অধিবাসীরা প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে অসাধু প্রকৃতির লোক বলিয়া সন্দেহ করিতে পর্য্যন্ত ছাড়ে না।

এইরূপ অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাইয়া কাজ হাসিল করা সহজ সাধ্য নহে। তবে ইহারা সাধারণতঃ কুতর্ক করে না—এইটুকু যা সুবিধা আছে। বীমার উপকারিতার কথা সরলভাবে এবং ধৈর্য্য ধরিয়া বুঝাইয়া দিলেই সরলবুদ্ধি পল্লীর অধিবাসীকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারা যায়। এই সম্পর্কে ভবিষ্যতে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান-সমিতি।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ হইতে একটী কমিটী নিযুক্ত হইয়া তাহার অনুসন্ধান এবং অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের স্বার্থনাশ হইতে পারে ভাবিয়া "বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী সমিতির" পক্ষ হইতে কিছুকাল পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী আবেদন প্রচার করা হইয়াছিল।:—

"ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি ও ঋণদান প্রথার সম্প্রসারণ কিরূপে হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে যদি সরকার পক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করেন তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, নানা কারণেই "বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের" এই আন্দোলন দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির বিরোধী।

প্রথম কথা এই যে, নিরাপদ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার এবং আমানতদারগণের সুবিধার জন্য চেম্বারের পক্ষ হইতে আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রাথমিক তদন্তের উদ্দেশ্য যদি এই টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইবে এবং বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের যে প্রয়োজন তাহার কোনই সাহায্য হইবে না। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রাচীন পদ্ধতির সহিত আধুনিক পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধান না করিয়া যদি কেবল আধুনিক প্রথায় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে এদেশের ব্যাঙ্ক সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

"চেম্বার অব কমার্সের" সভাপতি সার জর্জ্জ গডফ্রি এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা দেশীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে মারাত্মক। এরূপ মন্তব্যের যে কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বোঝা কঠিন। তিনি বলেন যে, দেশীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে অনেকগুলিই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। চেম্বার যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন- তাহাতে দেখা যায়,—যে ব্যাঙ্কের মূলধন অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকা নহে তাহাকে ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। সরকার পক্ষ যদি এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে একমাত্র বাঙ্গলা দেশেরই ৬০০ শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কারণ ইহাদের মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা হইতে কম।

আরও ভাবিবার কথা এই যে, ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাধারণ ভাবে তদন্তের কথা উত্থাপন না করিয়া কেবল ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের আইন প্রণয়নের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের সর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টারের আশ্বাসবাণী সত্বেও আমরা কোনই ভরসা পাইতেছি না। কারণ সার জর্জ্জ গডফ্রি বলিয়াছেন যে, ভারত সরকারের রাজস্ব সচিবের সঙ্গে বে-সরকারী ভাবে তাহার আলোচনা হইয়াছে এবং তাহার পরই তিনি

"[illegible] অব কমার্সের" অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই অবস্থায় বঙ্গীয় ব্যাঙ্কগুলির ভবিষ্যৎ যে সঙ্কটময় হইয়া উঠিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। মিলিতভাবে যদি চেষ্টা হয় তাহা হইলে প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা আছে। বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলিকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে,—তাঁহারা যেন এ সময়ে "বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী সমিতির" সহিত মিলিত হন এবং যে ভাবে তদন্তের কথা উঠিয়াছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সকলের সমর্থন পাইলে বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে তদন্ত হওয়ার জন্ত আমরা প্রার্থনা করিতে পারি।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত জে, এন, লাহিড়ী এই বিষয়ে সে সময় খুব স্পষ্টভাবে দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী দিগের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

প্রস্তাবিত তদন্ত সমিতি নিয়োগের ঘোষণার সময় হইতে প্রায় এক বৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাংলাদেশের লোন কোম্পানী এবং ব্যাঙ্ক সমূহ একযোগে এ পর্য্যন্ত কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা অবগত নহি।

এই অনুসন্ধান সমিতির Questionaire বা প্রশ্নাবলী ছাপান হইয়াছে। এই সকল প্রশ্নাবলীর মধ্যে আরও অনেক রকমের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাহা আমাদের মতে এদেশে ব্যাঙ্ক গঠন এবং তাহার উন্নতি সাধনের মূলে দারুণ পরিপন্থী রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ [illegible] ব্যবসায়ী এদেশের ব্যাঙ্ক এবং লোন কোম্পানী গুলিকে সংঘবদ্ধ করার জন্ত গত দুই বৎসর যাবত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন; আমরাও আমন্ত্রিত হইয়া কয়েকবার এই সকল সভায় উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালী জাতির ললাটে বিধাতা যে দারুণ অভিসম্পাত দিয়া রাখিয়াছেন তাহারই ফলে বাঙ্গালী কোনও ব্যাপারে মিলিয়া মিশিয়া তেয়াত্রির একত্র থাকিতে পারেনা। এমন স্বজাতি নিন্দুক, আত্মঘাতী এবং স্বজন—দ্রোহী [illegible] জাতি সমগ্র ভারতে আর দ্বিতীয় নাই; তাই বাঙ্গালী সংঘবদ্ধ ভাবে ব্যবসা করিতে পারে না। ইহারা দেশোদ্ধার করিতে গেলেও সেখানে দলাদলি, মারামারি, এবং রক্তারক্তি হয়। বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠান এমন যে বিপি, সিসি, সেখানেও সুভাষচন্দ্র এবং কিরণ শঙ্কর বনাম সেনগুপ্ত এবং যোগেশ গুপ্তের মধ্যে যে ভীষণ দলাদলি লাগিয়াছে তাহা মিটাইবার জন্ত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মান্দ্রাজ হইতে এক স্পেশ্যাল কমিশনার নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু স্বাধীনতা কামী বাঙ্গালী নেতৃদ্বয়ের দুইটি দলকে মিলাইতে পারিলেন না।

ছেলেদের মধ্যে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনী গত দুই বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে না উঠিতেই দুই দল হইয়া এখন এমন প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে যে সে দিন এলবার্ট হলে ছাত্রদের কন্ফারেন্সে মারামারি রক্তারক্তি হইয়া গেল এবং এখন খবরের কাগজে দুই দল কবির লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে।

এক বাঙ্গলাদেশ ব্যতীত ভারতের আর কোনও প্রদেশে আত্মঘাতী কলহের এমন শোচনীয় দৃশ্য সহসা দেখা যায় না। যাহ্ [illegible] কথা বাড়াইতে চাই না, যে কথা বলিতেছিলাম

তাই বলি। ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতির প্রশ্নাবলীর মধ্যে আরও নানারূপ প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা উচিত; কিন্তু এই Demand বা দাবী যদি ব্যাঙ্কার দিগের একটী সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয় তবে তাতে অনেক জোর হয় এবং কাজ হয় যাহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রস্তাবে হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। সেই জন্য দুঃখের সহিত বল্‌ছিলাম যে জোতিশ দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্কারদের যে একটা সংঘ গ'ড়ে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলেন সেটা যে তেমন জমে উঠল না, তাহা এই বাংলা দেশেরই দুর্ভাগ্যের একটা বিশেষত্ব। এটাও গড়ে না উঠার একমাত্র কারণ দেখলাম ব্যক্তিগত ঈর্ষা, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং স্বজাতির প্রতি মমতার অভাব।

এই ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির সৃষ্টি হবার পর দেশের মধ্যে এ সম্বন্ধে নানারূপ আন্দোলন এবং আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা প্রথমে নিজেদের বক্তব্য বলিয়া সেই আলোচনা গুলির মর্ম্ম প্রকাশ করিব।

আমাদের বক্তব্য।

এদেশের ব্যাঙ্ক পরিচালনার বিষয় তদন্ত করিবার জন্য ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Commitee) গঠন করিয়াছেন। এই সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য এক একটি করিয়া প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত কমিটির কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন :—

ইতিপূর্ব্বে যে প্রণালীতে ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইয়াছে তৎসম্পর্কিত প্রাচীন দলিল পত্র (Past records) এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থার [illegible] হইবে। [illegible] বিভিন্ন সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থার সংস্কারও এই তদন্তের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

অধিকন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করা সম্ভবপর, সমীচীন এবং অভিপ্রেত তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে :—

(ক) স্বদেশী, সমবায় এবং যৌথ কারবার মূলক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি এবং সম্প্রসারণ। শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি কার্য্যের অভাব অভিযোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে।

(খ) জন সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যাঙ্ক পরিচালনের ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করণ।

(গ) সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত স্বদেশী ব্যাঙ্কের প্রয়োজন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই অভাব দূরীকরণের উপযোগী জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া যাহাতে যথেষ্ট সংখ্যক ভারতবাসী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত শিক্ষার বন্দোবস্ত।

প্রাদেশিক কমিটি সমূহ কি কি বিষয়ে তদন্ত করিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়া কতিপয় প্রশ্ন প্রস্তুত (Questionaire) করা হইয়াছে। ভারত সরকার সেগুলি প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই সঙ্গে উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রাদেশিক তদন্ত কমিটির হস্তে এই সমস্ত প্রশ্নাবলী প্রেরণ করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের ব্যাঙ্ক পরিচালনার মধ্যে স্থানীয় রীতি অনুসারে কিছু কিছু বিশেষত্ব থাকিতে পারে। সেই সমস্ত বিশেষ অবস্থা বিষয়ক কোন তথ্য সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে প্রাদেশিক কমিটি সমূহ ইচ্ছা করিলে অতিরিক্ত প্রশ্ন জুড়িয়া দিতে পারিবেন।

[illegible] প্রাদেশিক তদন্ত

কমিটি সমূহের কাষ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে এই সমস্ত প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্ট সমাপ্ত করিতে হইবে।

প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্ট গুলিতে যে সমস্ত উপাদান থাকিবে, কেন্দ্রীয় কমিটি তৎসমস্তই বিবেচনা করিবেন। অধিকন্তু প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্টে যদি উপরোক্ত বড় বড় প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ না থাকে তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় কমিটি সে গুলির বিষয় স্বয়ং তদন্ত করিবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির মন্তব্য গ্রহণ করিয়া চূড়ান্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আর একটি কাজের বন্দোবস্ত সরকার পক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন। ইংলণ্ড অথবা অপর যে দেশে গ্রাম্য অধিবাসীদিগকে ধার দেওয়া সম্পর্কিত ব্যাঙ্ক এবং শিল্প বিষয়ক ব্যাঙ্ক সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে সেই দেশ হইতে কতিপয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সহিত ইহাদের আলোচনা হইবে। পরামর্শ দাতা হিসাবে ইহাদের সাহায্য, কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করিতে পারিবেন। যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বিশেষজ্ঞগণ একটি স্বতন্ত্র রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

এরূপ স্বতন্ত্র রিপোর্ট পাইলে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁহাদের নিজস্ব রিপোর্টের সঙ্গে বিশেষজ্ঞগণের রিপোর্টও দাখিল করিবেন। অতঃপর ভারত সরকার তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

এই কার্য্যক্রম এবং আলোচ্য বিষয়ের তালিকা মোটের উপর অসন্তোষজনক নহে। ব্যাঙ্কের কারবার সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত ব্যাপারই ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। এ দেশের [illegible] ও কোন [illegible] দুর্দ্দশার সীমা নাই— নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া বর্ত্তমান প্রবল প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়া থাকাই অনেক ব্যাঙ্কের পক্ষে দায় হইয়াছে। তারপর এই ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া তো অনেক দূরের কথা। ভারতবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তথাপি ইহারা নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া কায় ক্লেশে কারবার চালাইতেছেন। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের এই অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিলেও দেশীয় ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা নিরাশ হইতেছি।

"ব্যবসা ও বাণিজ্যের" জন্ম হইতে আমরা দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথা আলোচনা করিতেছি। বার বার আমরা দেখাইয়াছি যে, দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসার প্রতিপত্তির উপর সমস্ত স্বদেশী শিল্প, বাণিজ্য এবং কল কারখানার উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, দেশের যাঁহারা শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে না। রাজনীতিক নেতারা বড় বড় আদর্শের দোহাই পাড়িয়া এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ও ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের কচ্‌কচি করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। পাকে চক্রে দেশের সমস্ত অর্থ সম্পদ যে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে সেদিকে কিন্তু তাঁহাদের নজর পড়িতেছে না।

অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমাদের এই যে দুর্দ্দশা— ইহার প্রতিকারে মনোযোগী হওয়া সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই চেষ্টা চলিতে পারে। ইহাতে বিশেষ কোন কাষ হউক আর নাই হউক—[illegible]

অনেক গলদের কথাই প্রকাশিত হইবে। এইটুকুও নিতান্ত কম লাভের কথা নহে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনাই হইতেছে না। এদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির কাজ সুরু হইয়াছে। এই কমিটির রিপোর্ট আগামী মার্চ্চ মাস মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া যাইবে। এ সময়ে ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত অভাব অভিযোগের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক।

তদন্ত কমিটীর বিবেচ্য বিষয়ের তালিকার মধ্যে দেশীয় ব্যাঙ্কের কারবার বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের কথা রহিয়াছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এইটি উত্তম প্রস্তাব, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রস্তাবের গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। দেশীয় ব্যাঙ্কের কারবার যে বৃদ্ধি পাইবে—তাহার টাকা আসিবে কোথা হইতে? আগে প্রচুর টাকা ব্যাঙ্কের হাতে আসিলে, সেই টাকা শিল্প বাণিজ্যে ও কল কারখানায় খাটাইয়া তবে এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু সে পথে যে অন্তরায় অনেক, কার্য্যকারণে স্বয়ং গবর্ণমেণ্টই যে দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রবল প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের ফলেই আজ বহু সংখ্যক দেশীয় ব্যাঙ্ক আমানতের অভাবে উপবাসী এবং অর্দ্ধ উপবাসী থাকিতে বাধ্য হইয়েছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি কায়ক্লেশে প্রাণ বাঁচাইয়া মিটিমিটি জ্বলিতেছে। দেশের যাঁহারা ধনী, মানী, এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদের সাহায্য বা সহানুভূতি এগুলির প্রতি একরূপ নাই বলিলেই হয়। সকলেই বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে কাল কাটাইবার পক্ষপাতী; ইঁহাদের এই বিরূপ আচরণের ফলে দেশবাসী জন সাধারণও স্বদেশী ব্যাঙ্কের প্রতি আস্থাহীন। সময় সময় এমন কথাও শুনিতে পাই যে, দেশীয় ব্যাঙ্কে টাকা আমানতকারীদের পদে পদে শঙ্কার কারণ বিদ্যমান্। দেশীয় ব্যাঙ্কের কথা তুলিলেই কেহ কেহ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে প্রশ্ন করেন,—মশায়, টাকা গুলি কি জলে ফেলিব? দেখিলেন না—এই তো সেদিন বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কত দীন দুঃখীর টাকা লোপাট করিয়া অতলে তলাইয়া গেল। যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক এখনও মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে সেগুলিও যে কালে অদৃশ্য হইবে না—তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?"

এই তো আমাদের স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের অবস্থা! মোটের উপর এগুলির উপর দেশবাসীর তেমন আস্থা কিম্বা আগ্রহ দেখা যায় না। এই অবস্থায় ভারতের টাকা প্রায় সমস্তই বিদেশী ব্যাঙ্কে গিয়া জমা হয়। ৫০ বৎসর কারবার করিয়াও ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রচুর পরিমাণে টাকা পায় না। আমানতের টাকা কিম্বা অংশ বিক্রয়ের টাকা—কোন দিক দিয়াই ভারতীয় ব্যাঙ্ক তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। আসলে টাকাই যদি না থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্কের প্রসার প্রতিপত্তি ও কারবার বৃদ্ধি হইবে কি করিয়া?

আমাদের দেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে। কোনও শিল্পী সর্ব্বদাই তাহার বাড়ীতে কয়খানা ঘর থাকিবে, কতখানা দরজা জানালা থাকিবে এবং কি কি আসবাব পত্র থাকিবে—ইত্যাদির পরিকল্পনায় মসগুল থাকিতেন, সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে এ সমস্তের বর্ণনা শোনা যাইত। অথচ মজার কথা এই যে, তাহার নিজের কোন বাড়ীই ছিল না এবং বাড়ী ঘর নির্ম্মাণের উপযোগী অর্থ সামর্থ্য ও তাহার ছিল না। এই ক্ষেত্রেও হইয়াছে তাহাই। ব্যাঙ্কের হাতে টাকা নাই; অথাপি

তাহার কারবার বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে। এ যেন ঠিক ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িয়া দেওয়ার বিধান।

দেশীয় ব্যাঙ্কের উন্নতি সাধনের প্রকৃত অভিপ্রায় থাকিলে সর্ব্বাগ্রে যাহাতে ইহার হাতে প্রচুর টাকা আসে সেই পন্থাই খুজিতে হয়। কিন্তু অন্তরায় অনেক। সেগুলি অতিক্রম না করিলে ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য মৌখিক সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া কোনই লাভ নাই।

বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা এবং স্বদেশীয় ব্যাঙ্কের প্রতি দেশবাসীর আস্থার অভাব—এই দুইটি অন্তরায়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে স্বয়ং সরকার পক্ষ প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন। কথায় বলে,—"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।" এক বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতার টিকিয়া থাকাই দেশীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রাণান্তকর; তার উপর যদি সরকার পক্ষ আসিয়া ভাগ বসাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে বেচারী দেশীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকগণের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখে তাহারা প্রধানতঃ দুইটি সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই দুইটি যেখানে পাওয়া যায়, সেইখানেই টাকা জমা রাখা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রথম কথা হইল—আমানতের টাকা নিরাপদে রাখা। আমানতকারীরা গোড়াতেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে চাহে যে, ভবিষ্যতে এই টাকা মারা যাইবার যেন কোন আশঙ্কা না থাকে। দ্বিতীয়তঃ টাকার লভ্যাংশের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া চাই। এই দুই দিক দিয়াই বিদেশী ব্যাঙ্ক, দেশীয় ব্যাঙ্কের উপর টেক্কা মারিবার চেষ্টা করে। তাই প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা দিয়া বিদেশীয়ব্যাঙ্কে জমা হয়। কিন্তু ভারতীয় ব্যাঙ্কের অংশে ইহার শত ভাগের একভাগও পড়ে না। ইহার উপর আবার সরকার পক্ষ এখন বেশী বেশী সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

ইউরোপীয় মহা যুদ্ধের পূর্ব্বে শতকরা সাধারণতঃ তিন টাকা সুদে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় হইত। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় শতকরা ৬ টাকা ৬॥০ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিয়াও গভর্ণমেণ্ট নানা ভাবে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার উপর আবার ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের টাকা মাপ করায় এবং কিনিবার মুখে ডিস্‌কাউণ্টে কাগজ বেচায় লভ্যাংশ কোন কোন স্থলে শতকরা ৭৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল ওয়ারবণ্ড প্রত্যেকখানা এক শত টাকার নীচে ছিল না। সুতরাং সরকারী ঋণে টাকা খাটাইতে গেলে এককালীন অন্ততঃ একশত টাকা জোগাড় করিতে হইত; খরচ খরচা জোগাইয়া হাতে এক শত টাকা খাটাইবার মত saving বা জমা এই গরীব দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও অনেকের নাই। অথচ দেশের আপামর সাধারণ সকল লোকের নিকট থেকেই তাহাদের savings বা জমান টাকা সরকারী ঋণে invest করানো চাই।

এই গরীব দেশে একশত টাকা এককালীন লোকে জমাইতে পারে না সত্য, কিন্তু পাঁচটা টাকাত জমাইতে পারে?—অতএব সরকারী অর্থসচিব ফন্দী আঁটিলেন যে পোষ্টাপিসে ৫৲ পাঁচ টাকার Cash Certificate বিক্রয় করা হউক, তাহা হইলে রাস্তার মুটে মজুর হইতে প্রাসাদবাসী ক্রোড়পতিকে পর্য্যন্ত এই সরকারী ঋণের জগত জোড়া জালের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলা যাইবে। যেমন সংকল্প তেমনি কাজ; অমনি পোষ্টাপিস সমূহ হইতে রাশি রাশি ক্যাস সার্টি-

ফিকেট বিক্রয় শুরু হইল এবং তাহার ফলে দেশের দুটো মহাযুদ্ধেও পর্যন্ত এই ক্যাশ সার্টি-ফিকেট কিনিয়া নিজেদের সঞ্চয় কোনও দেশীয় প্রতিষ্ঠানে না খাটাইয়া সরকারী ঋণ ভাণ্ডারে প্রদান করিতে লাগিল। এই পোষ্টাফিসের ক্যাশ সার্টিফিকেট কেমন করিয়া অষ্টোপাসের মত বাহু দ্বারা দেশের ধনী দরিদ্র সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে এবং প্রতিদিন ফেলিতেছে তাহা প্রতি সপ্তাহে সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ক্যাশ সার্টি-ফিকেট বিক্রয় হইতেছে তাহা পড়িলেই সহজে অনুমিত হইবে।

ক্যাশ সার্টিফিকেটে টাকা খাটানোর কয়েকটী সুবিধা আছে। প্রথম, কোম্পানীর কাগজ বা অন্যান্য কিনিতে গেলে কলিকাতায় গিয়া কোনও কোম্পানীর কাগজের দালাল বা ব্যাঙ্কের শরণা-পন্ন না হইলে কেনা বেচার আর কোন উপায় নাই এবং তাহাতে দস্তক করা প্রভৃতির ঝঞ্ঝাটও কম নয় এবং অনেক সময় দালালের হাতে ঠকারও ভয় আছে। কিন্তু ক্যাশ সার্টিফিকেটে সে সব বালাই কিছুই নাই। পোষ্টাফিসের সেভিং ব্যাঙ্কের মত ইহা সহজ। ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনিতে বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় যেতে হয় না এবং কোনও দালাল বা ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইতে হয় না। নির্দিষ্ট সময়ে পোষ্টাফিসে টাকা জমা দিলেই সার্টিফিকেট পাওয়া যায় এবং দরকার হইলে টাকা তোলাও যায়।

ভারতবর্ষের প্রতি শত গ্রামে পোষ্টাফিস আছে। এইজন্য এই সকল পোষ্টাফিসের সাহায্যে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষের জন সাধারণের মধ্যে পোষ্টাফিসের ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়া সরকারী ঋণ ভাণ্ডারে দেশের টাকা কুড়াইয়া তুলিবার এক বিরাট সুসংবদ্ধ (organised effort) ব্যবস্থার পাকা আয়োজন করা হইয়াছে সে বিষয়ে আমরা সর্বাগ্রে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েউৎসাহি-কামী গভর্ণমেণ্ট এবং সেই সঙ্গে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী দিগকে একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আমানতের টাকা নিরাপদ রাখার বিষয়ে সরকারী ঋণই যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—সে-কথা বলাই বাহুল্য। দেশের অধিবাসীরা তাই নির্ব্বিকার চিত্তে সরকারী ঋণের জন্য টাকা ঢালিয়া দিতেছে; ইহাতে দুই দিক দিয়াই তাহাদের সুবিধা। টাকা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ জায়গায় থাকিতেছে; অথচ মোটা লভ্যাংশও মিলি-তেছে। এত সুবিধা পাইলে কেন লোকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে এবং অল্প লাভে দেশীব্যাঙ্কের নিকট টাকা রাখিতে যাইবে?

তারপর ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকার পক্ষ বিশেষভাবে প্রচার কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সংবাদ পত্রের মারফতে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ভারতবাসীকে বোঝান হইতেছে—সরকারের নিকট টাকা রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক। আফিসে, আদালতে, রেল ষ্টেশন সমূহে, থানায় থানায় হাটে, বাজারে, বন্দরে, ডাকঘরগুলিতে সরকারী বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে। এরূপ ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্য চালাইবার সুযোগ সামর্থ্য এবং অর্থ দেশীয় ব্যাঙ্কের নাই। অফিসের সাধারণ খরচ চালানই ইহাদের পক্ষে প্রাণান্তকর, তাহার উপর আবার প্রচার কার্য্যের জন্য টাকা দিবে কি করিয়া?

দেশীয় ব্যাঙ্ক যদি বড় জোর শতকরা ৩৲ কি ৩৷৲ টাকার বেশী সুদ দিতে পারেনা, আপন প্রচার বিজ্ঞাপন দিতে পারে না এবং সর্বোপরি

তাহার উপর দেশবাসীর তেমন আস্থা নাই। এতগুলি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় বিদ্যমান স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলি বাঁচিবে কি করিয়া? সরকার পক্ষ তাহার কারবার বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন; এদিকে কিন্তু সে আমানতের অভাবে মরিতে বসিয়াছে। আগে সে এই সমস্ত দারুণ প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচুক, তারপর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হইবে।

সরকার পক্ষ অধুনা যে সকল নিত্য নূতন ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। দেশের বিন্দু বিন্দু যাহা কিছু সঞ্চয় সমস্তই ধীরে ধীরে একত্র হইয়া সাগরগামী নদীর স্রোতের ন্যায় ব্যাঙ্কের দিকে ধাবমান হয়। সরকার পক্ষ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বাঁধ সৃষ্টি করিয়া এই অর্থস্রোত নিজের তহবিলের দিকে টানিয়া লইতেছেন, সুতরাং অন্যান্য নদীনালা যাহা আছে তাহা সব জলের অভাবে শুখাইয়া যাইতেছে। এই বিসদৃশ ব্যবস্থা যতদিন বিদ্যমান থাকিবে ততদিন দেশের সঞ্চয় স্রোত কখনই দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহের দিকে প্রবাহিত হইতে পারিবে না ফলে হইয়াছেও তাহাই; সরকারী মহাল যতই শস্যশ্যামল হইয়া উঠিতেছে, দেশীয় মহাল ততই ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে।

একদিকে দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের অল্প মূলধন, অনিশ্চিত অবস্থা, অল্প সুদ বা লাভের ব্যবস্থা, সর্ব্বোপরি দেশের লোকের অনাস্থা (তা তারা সত্যাগ্রহীরা যতই স্বাধীনতা এবং স্বরাজ বলিয়া চেঁচাক না কেন) আর অপর দিকে স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট তাহার আমানত-Credit অদ্ভুত Organisation দ্বারা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অক্টোপসের ন্যায় ভারতের সমগ্র শরীরে আষ্টেপৃষ্ঠে জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, এবং ভারতব্যাপী প্রচার, প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা উচ্চহারে সুদের প্রলোভন দিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এ যেন ঠিক স্যাণ্ডোর সহিত সদ্যজাত শিশুর লড়াই; ইহার পরিণাম ফল যে কি তাহা আর লোককে বুঝাইবার দরকার করে না। ব্যাঙ্কতদন্ত কমিটি ইহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি?

এই উপলক্ষে মুদ্রা বিনিময়ের হারের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রতি বৎসর ২০।২৫ কোটী টাকা এই ব্যাপারে ভারতবাসীর ক্ষতি হইতেছে। অপর কোন সভ্য দেশেই এরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা দেখা যায় না। ভারতবর্ষ একটা সৃষ্টিছাড়া দেশ কিনা—তাই এখানে যত সব যুক্তি তর্ক হীন প্রস্তাব আমল পায়। দেশীয় ব্যাঙ্কের হাতে টাকা আসিবার যত উপায় আছে তাহার প্রায় সমস্তই ইতিমধ্যে বন্ধ হইয়াছে এবং এখনও নিত্য নূতন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইতেছে। আগে এই সমস্ত পথ উন্মুক্ত না হইলে ব্যাঙ্কের উন্নতি, সম্প্রসারণ, কারবার বৃদ্ধি ইত্যাদি বড় বড় গালভরা বুলির কোন অর্থই হয় না। তদন্তের সময় যাহাতে কর্তৃপক্ষ এই সকল অভাব অভি-যোগের কথা এড়াইয়া যাইতে না পারেন তজ্জন্য দেশীয় প্রতিষ্ঠান গুলির পক্ষ হইতে সমবেত ভাবে এবং ব্যাঙ্ক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষ চেষ্টা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এদেশীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকগণ আর একটী গুরুতর অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। সেই অসুবিধার কথাও বর্ত্তমান তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই ব্যবসায়ের মূল হইল পারস্পরিক বিশ্বাস। আমানতকারীরা বিশ্বাস করেন বলিয়াই তাহাদের নিকট টাকা জমা

রাখেন। সেই বিশ্বাস যদি কোন প্রকারে বিপন্ন হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের আর রক্ষা নাই। তখনই হাজার হাজার লোক আসিয়া তাহাদের আমানতের কোটি কোটি টাকা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠাইয়া লইতে চায়। এই রূপ অবস্থায় বড় বড় ব্যাঙ্ক হউক না কেন—একসঙ্গে সমস্ত আমানতের টাকা ফিরাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কারণ আমানতকারীদের নিকট হইতে যে টাকা জমা আসে ব্যাঙ্ক সে সমস্তই যদি লোহার সিন্দুকে ভরিয়া রাখিয়া কেবল যক্ষের ন্যায় দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকে, তাহা হইলে আমানতকারীদিগকে সুদের টাকাই বা দিবে কি করিয়া এবং কারবার করিয়া তাহার লাভই বা হইবে কোথা হইতে ?

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মোটামুটি সাধারণ রীতি হইল এই যে, প্রতিদিনের আদান প্রদানের জন্য শতকরা হিসাবে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা হাতে রাখিয়া বাকী সমস্ত আমানতের টাকাই সুনিশ্চিত লাভ জনক ব্যবসায়ে খাটাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সকল সভ্যদেশের ব্যাঙ্কই এই রীতি অনুসারে কাজ করে। এই অবস্থায় যদি একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে সমস্ত আমানতদার আসিয়া এক সঙ্গে আমানতের সকল টাকা তুলিয়া লইতে ব্যগ্র হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের বিপদ হওয়া অনিবার্য্য।

এই প্রসঙ্গে ভবানীপুর ব্যাঙ্কের অতীত ইতিহাসের কথা মনে পড়িতেছে। এই ব্যাঙ্কটি বিগত ৩০ বৎসর কাল ধরিয়া নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সহিত অবিরত লড়াই করিয়াও টিকিয়া আছে এবং দিন দিন অবস্থার উন্নতি করতঃ দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি করিয়াছে। [illegible] কার্য্যকলাপের দিক হইতে অবশ্য ভবানীপুর ব্যাঙ্ক অনেক বিদেশী ব্যাঙ্কেরই সমকক্ষ নয়; কিন্তু ব্যবসায়ের সততার দিক হইতে এইব্যাঙ্ক যে কোন ব্যাঙ্কের সহিত তুলনামূলকপ্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। প্রাচীন নিয়ম অনুসারে আজও এই ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় সকালে এবং বিকালে খোলা থাকে। ইহাতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী যাঁহারা এখনও পূর্ণমাত্রায় সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই তাঁহাদের পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হয় তাহা বলাই বাহুল্য। মোটের উপর নানা দিক দিয়া যতটা সম্ভব দেশীয় ব্যবসায়ী ও আমানতকারীদিগকে সুযোগ সুবিধা দেওয়াই এই ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

এই ব্যাঙ্কটির উপরও একবার Run হইয়াছিল। তখন স্বর্গীয় দেশবন্ধু দাশ মহাশয় বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ভবানীপুর ব্যাঙ্ক সেবার বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কোনও কারণে ভবানীপুর ব্যাঙ্কের উপর বিরক্ত হইয়া এক দল লোক ইহার দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হয়। ব্যাঙ্কের অপরাধ ছিল এই যে, কম পক্ষে ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক ছয় লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিল। এই উপলক্ষ্য করিয়া ঈর্ষ্যাপরায়ণ একদল লোক রটাইতে থাকেন যে, অমূল্যবাবুর অবস্থা টলটলায়মান্। তিনি যে টাকা ধার নিয়াছেন তাহা আদায় হইবার কোনই আশা নাই; কাজেই ভবানীপুর ব্যাঙ্ক আর বাঁচিবে না,—শীঘ্রই তাহাতে লালবাতি জ্বলিয়া উঠিবে।

এই গুজব মুখে মুখে কলিকাতা নগরীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে কাতারে কাতারে লোক তাহাদের খাতাপত্র লইয়া ভবানীপুর ব্যাঙ্কের দরজায় উপস্থিত হয়; সকলের মুখেই এক কথা, সকলেরই এক অনুরোধ, "আমার আমানতের টাকা এখনই ফেরত চাই।"

স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ এই ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর ছিলেন। দাশ মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিবা মাত্র তিনি স্বয়ং ব্যাঙ্কের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হন এবং হাত জোড় করিয়া সন্দেহগ্রস্ত আমানতকারীদিগকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলেন। স্বয়ং দেশবন্ধুর মুখে যখন তাহারা শুনিতে পাইল যে, ব্যাঙ্কের কারবার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার টাকা মারা যাইবার কোনই আশঙ্কা নাই, তখন সকলেই শান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দেশবন্ধুর ন্যায় অমন বিরাট ব্যক্তিত্বশালী একজন লোক বিপদের সময় সাহায্য করিতে বাহির হইয়াছিলেন বলিয়াই সেবারে এই স্বদেশী ব্যাঙ্কটি রক্ষা পাইয়াছিল—তাহা না হইলে ব্যাপার যে কিরূপ দাঁড়াইত তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ মজার কথা এই যে, যাহারা নিরর্থক দুর্ণাম রটাইয়া ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগিল না।

এরূপ দুষ্ট প্রকৃতির লোককে শাস্তি দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য সভ্য দেশে এরূপ আইন কানুন ইতিমধ্যেই প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার কোনই বিধান নাই। ইউরোপ,আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে কোনও ব্যাঙ্ক কিম্বা বীমা কোম্পানীর আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে অপরাপর ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী কি ভাবে টাকা দিয়া সাহায্য করে এবং দুর্ণাম রটনাকারীরা কিরূপ ভাবে দণ্ডিত হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ব্রুকলিন আমেরিকার একটী সুপ্রসিদ্ধ সহর। এই বৎসরের গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে সেখানকার জনৈক অধিবাসী দশহাজার ডলার (১ ডলার=৩ টাকা) মূল্যের একটী বাড়ী বন্ধক রাখিয়া সেখানকার কোনও একটি ব্যাঙ্কে ১৩ হাজার ডলার কর্জ্জ করিতে গিয়াছিল। বলা বাহুল্য ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ কম মূল্যের সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বেশী টাকা কর্জ্জ দিতে অস্বীকার করেন। লোকটী তখন ব্যাঙ্ককে জব্দ করার জন্য এক মতলব আঁটিল।

সে স্থানীয় হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলিতে দুই এক পেগ মদ খাইবার অছিলায় বসিয়া সাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের নামে নানা কাল্পনিক খারাপ investment এর গল্প রটাইতে লাগিল এবং শীঘ্রই ব্যাঙ্ককে payment বন্ধ করিতে হইবে এরূপ কথাও বলিতে সুরু করিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্রুকলিন সহরের সর্ব্বত্র রটিয়া গেল যে সেখানকার সর্ব্বপ্রধান ব্যাঙ্কের অবস্থা টলমল করিতেছে। এ ব্যাপারের কথা এই যে নারীর সতীত্ব এবং ব্যাঙ্কের Credit বা সুনাম সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা যে রটনাই হউক না কেন, একবার কোনও একটা গুজব রটাইতে পারিলে তাহা লোক মুখে বাতাসের ন্যায় দ্রুত-গতিতে ছড়াইয়া পড়ে।

একে ব্যাঙ্কের দুর্ণাম, তাতে আবার আমেরিকার ন্যায় হুজুগে সহর, সুতরাং সপ্তাহ পার না হইতেই ব্যাঙ্কের উপর run বা টাকা তুলিয়া নেবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল এবং ব্যাঙ্কের দরজায় জন সমুদ্রের ন্যায় ডিপজিটর বা আমানতকারীদের ভিড় জমিয়া গেল। হাজার হাজার লোক টাকা দাও টাকা দাও করিয়া পাগলের ন্যায় চেঁচাইতে লাগিল। অবিলম্বে পুলিশ আসিয়া ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইল। রয়টারের তারের সংবাদে প্রকাশ যে দুই ঘণ্টার মধ্যে ব্যাঙ্ককে এক কোটী চল্লিশ লক্ষ ডলার এই উন্মত্ত ডিপজিটরদিগকে বাহির করিয়া দিতে হয়।

কিন্তু ডিপজিটরগণ যখন দেখিল যে ব্যাঙ্ক অম্লান বদনে এই টাকা meet করিল এবং তাহাদের এই

ছিলেন কলিকাতার অন্যান্য সব ব্যাঙ্কাররা মিলিত হইয়া তখনও গাড়ী গাড়ী ডলার ব্যাঙ্কের এই run meet করার জন্য পাঠাইয়া দিতেছে, তখন তাহাদের চমক ভাঙ্গিল; তাহারা বুঝিল যে এই রটনা ব্যাঙ্কের কোনও শত্রুর কাজ। ডিপজিটরগণ তখন শান্ত হইল এবং যে টাকা লোক তুলিয়া নিয়া গিয়াছিল তাহা আবার একসপ্তাহের মধ্যে ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু যবনিকা এইখানেই পড়িল না।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমেরিকায় যে আইন আছে তাহাতে এই ব্যবস্থা আছে যে কোনওলোক ব্যাঙ্কের নামে অযথা দুর্নাম রটনা করিলে তাহার এক বৎসর সশ্রম কারাবাস এবং এক হাজার ডলার অর্থদণ্ড হইবে। তাহা ছাড়া civil court এ damage পাইবার ব্যবস্থা আছে। পুলিশ এখন এই লোকের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে।

আমাদের দেশেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ মিথ্যা গুজব রটাইবার ফলে অনেক দেশী ব্যাঙ্কের উপর run বা হুড়াহুড়ি হয়, কিন্তু এদেশের দেশীয় ব্যাঙ্কারদের মধ্যে তেমন দরদ, সহানুভূতি এবং সাহচর্য্য না থাকায় তাহারা তখন হাবুডুবু খাইতে থাকে এবং আইনেও তেমন কোনও সহজ প্রতীকার না থাকায় দুর্নাম রটনাকারীদিগকেও ব্যাঙ্ক জব্দ করিতে পারে না। তাহারা যে আগুন নিয়া খেলা করিতেছে এবং এই আগুনের ফুলকি যে ব্যাঙ্কগুলিকে নিমিষে ভস্মসাৎ করিয়া দিতে পারে সে দায়ীত্বের কথা বুঝাইয়া দিবার মত কোনও সহজ সরল আইন এদেশে নাই। ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির সদস্যগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে কি?

অতঃপর দেশের সংবাদ-পত্রাদিতে এ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ বা চিঠিপত্রাদি বাহির হইয়াছে তাহার বিবরণ আমরা প্রকাশ করিলাম।

গত ভাদ্রমাসের বঙ্গবাণীতে শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লোন কোম্পানী পরিচালনা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন আমরা তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম। ইহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু আমাদের মন্তব্য পরে প্রকাশ করিব।

বঙ্গদেশে বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের কয়েকটী জেলায় যে হিসাবে লোন আফিস বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না ভাবিবার বিষয়। লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা সহজে টাকা কর্জ্জ পাইতেছে, এজন্য লোকের কর্জ্জ করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। অংশীদারদের সুবিধা এই যে, সম্পূর্ণ টাকা একযোগে দিতে হয় না; অথচ তৎসত্ত্বেও প্রতি বৎসর কিছু কিছু লভ্যাংশ পাওয়া যায়।

অংশীদার ও খাতক

কিন্তু লোন আফিসের সঙ্গে অংশীদার ও খাতক বাদে আর একদল লোকের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত এবং অংশীদার অপেক্ষা ইহাদের স্বার্থই বেশী দেখা যায়। এই দল হইতেছে ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণ। কোম্পানীর সংখ্যা-বৃদ্ধির একটী কারণ বোধ হয় যে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে টাকা আমানত করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ইহা অবশ্য সুখের বিষয়। এতদ্বারা দেশে ধনবৃদ্ধির সূচনা হইতেছে।

আমানতকারী না হইলে লোন কোম্পানীর কোন আশা থাকিত না। অংশীদারদের শতকরা বার্ষিক ৩০২ হইতে ৮০২ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া কেবল আমানতকারীদের জন্যই সম্ভব হয়।

[illegible] আমানতী টাকার উপর সাধারণতঃ শতকরা বার্ষিক ৪৲ হইতে ১২৲ পর্য্যন্ত সুদ পাইয়া থাকেন। আর অংশীদার হইলে তাঁহার শতকরা ১০০৲ টাকার বাবদ বার্ষিক ৩০৲ হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ পাইয়া থাকেন। ইহাতে অবশ্য অংশীদারগণের কোন দোষ দেখা যাইতেছে না; তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমানতকারিগণের নিজের বিষয় ভাবিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার লোন আফিসগুলির উপর লোকের আস্থা বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা একটু কমিয়াছে এবং এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

আমানতকারী ও অংশীদার

একটী ব্যাঙ্ক বা লোন আফিস ফেল হইলে অংশীদারগণের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহার চেয়ে আমানতকারিগণের ঢের বেশীগুণে ক্ষতি হয়। অংশীদার লভ্যাংশ হিসাবে নিজের দত্ত টাকা ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই নিজের হাতে ফেরত পান। আর আমানতকারী আমানতীর সুদ হিসাবে যে টাকা পান তাহা অতি সামান্য; তাহা ছাড়া আসল টাকাও কোম্পানীতে থাকিয়া যায়। কোনও কোম্পানী ফেল হইলে আমানতকারীর সাধারণতঃ সমস্ত টাকাই নষ্ট হইয়া যায়। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে আমানতকারিগণের কত টাকা নষ্ট হইয়াছে আর অংশীদারদের কত টাকা নষ্ট হইয়াছে, তাহা তুলনা করিলে আমানতকারীর নিঃসহায় অবস্থা অনায়াসে বুঝা যায়।

কোম্পানীগুলি বর্ত্তমানে যে নিয়মে পরিচালিত হয় তাহাতে অংশীদারগণের মধ্য হইতেই কোম্পানীর ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়া থাকেন; অংশীদারগণ [illegible] কোম্পানী কি ভাবে চলিতেছে তাহা দেখিতে পারেন; ইচ্ছা করিলে বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া কোম্পানীর কার্য্যাদির বিশদভাবে আলোচনা করিতে পারেন। ইহা ছাড়া আমানতকারিগণের আর কি প্রতিকার আছে? তাঁহাদের না আছে কোন প্রতিনিধি, না আছে কোন কোম্পানী পরিচালক সভা, না আছে কোন সুবিধা। কি ভাবে কোম্পানী পরিচালিত হইতেছে তাহা জানিবার বা বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া কোম্পানীর কার্য্যাদি আলোচনা করিবার কোনও অধিকার তাঁহাদের নাই।

আমানতকারীর অসুবিধা

কোম্পানীর ব্যালান্স সিট, আয় ব্যয়ের ও ডিরেক্টারগণের রিপোর্টে কোম্পানীর কার্য্যাদি কি ভাবে হইতেছে, বৎসর বৎসর অংশীদারগণ তাহা জানিতে পারেন। কিন্তু আমানতকারিগণের ঐরূপ কোন সুবিধা নাই। ফলে কোম্পানীর ফেল হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমানতকারী কোম্পানীর কার্য্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকেন। অনেক সময় আমানতকারী কোম্পানীর পরিচালকবর্গের উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। বিশ্বাস করা অবশ্যই ভাল, কিন্তু অন্ধভাবে কোন জিনিষ বিশ্বাস করা ভাল নয়; সাধারণতঃ কোম্পানী কি ভাবে পরিচালিত হয় অনেক ক্ষেত্রে তাহা জানা যায় না। নির্দ্দিষ্ট কয়েক ব্যক্তি বৎসরের পর বৎসর ডিরেক্টর হিসাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। পুরাতন লোক হইলে একপক্ষে যেমন কাজ করিবার সুবিধা হয়, সেইরূপ এক দল লোক কোন কোম্পানীকে একচেটিয়া করিয়া রাখিলে একচেটিয়ার যে সমস্ত দোষ আছে তাহাই হয়।

বর্ত্তমানে অনেকের পেশা হইতেছে কোম্পানীর ডিরেক্টরী করা; ২।১টী জেলায় এরূপ দেখা যায় যে একদল লোক জেলাস্থ সমুদয় কোম্পানী

তাদির কর্তৃত্বতায় হস্তগত করিয়া বসিয়া আছেন। A closely packed body placed in absolute control of local business in a district can hardly behave in a way beneficial to the interest of all concerned.

সাধারণতঃ কোন কোম্পানী স্থাপিত হইলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ক্ষমতাশালী কোন ডিরেক্টরের আত্মীয় স্বজন, যেমন পুত্র, ভ্রাতা, জামতা বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী ইত্যাদি নিযুক্ত হইয়া থাকে। ভালভাবে দেখিলে ইহাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার যেরূপ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়ে কাজ করিতে পারেন, অন্যদিকে সেইরূপ কোম্পানীকে ফেল করাইতেও অনায়াসে পারেন।

কর্তব্য কি ?

এরূপ অবস্থায় আমানতকারীগণ বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিলে নিজেদের ভাল হয়। নিজের ভাল সকলেই বুঝে। এখন আমানতকারীদিগকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কি করা উচিত ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। কিসে নিজেদের স্বার্থ-রক্ষা হয়, তাহা ঠিক করিয়া সেই অনুসারে কাজ করা উচিত।

ধরুণ একটী লোন আফিস ৬০ হাজার টাকা মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করিল। অংশের টাকা সমস্তই যদি অংশীদারগণের নিকট হইতে আদায় হইয়া গিয়া থাকে, তবে অংশীদারগণের আর কোনরূপ দায়িত্ব থাকে না; এরূপ একটি কোম্পানী যদি ২০ লক্ষ টাকা আমানত লইয়া থাকে তবে তাহার আমানতকারিগণের অবস্থা কি? যদি কোম্পানী ভাল ভাবে চলিতে থাকে তাহা হইলে কিছু বলা যায় না; কিন্তু [illegible] ম্যানেজিং [illegible] যদি আত্মীয়স্বজন লইয়া ডিরেক্টার সভা গঠিত ও উপরিতন কর্মচারী নিযুক্ত হন, বা a closely packed body of Directors হন, তবে তাঁহাদের দ্বারা ভালমন্দ উভয় রকমেরই অনেক কাজ হইতে পারে। যদি এরূপ কোন কোম্পানী খারাপ হয়, তাহা হইলে অংশীদারগণ, আমানতকারিগণের নিকট আমানতী টাকা নষ্ট করার জন্য দায়ী হন না।

টাকার হিসাব

আমানতী টাকা আদায় হইতে কোম্পানীর আসবাব-পত্র দালান কোঠা সমুদয় বিক্রয় করিয়াও হয়ত আমানতকারিগণ কিছু পান না। ঋণ গ্রহণ করিতে আসিলে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা হয়—তাহার দেনা শোধ করিবার ক্ষমতা আছে কি না? তাহার সম্পত্তির পরিমাণ কি? তাহার স্বভাবচরিত্র কিরূপ? কিন্তু আমানতকারী যখন কোন ব্যাঙ্কে আমানত করিতে যান তখন যে ব্যাঙ্কে আমানত করেন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে এভাবে তদন্ত করা হয় না। বিশ্বাসের উপর আমরা আমানত দিয়া থাকি। কিন্তু অনেক সময় এজন্য ঠকিতে হয়।

যে লোকের ৬০ হাজার টাকার সম্পত্তি আছে তাহাকে ২০ লক্ষ টাকা কর্জ দিতে কেহই মত দিবেন না। আর যদি টাকা দেওয়া হয় তাহা হইলে উক্ত টাকা নষ্ট হইবে জানিয়াই কর্জ দেওয়া হয়। কোন আফিস বা ব্যাঙ্ক যখন কোন টাকা আমানত লয়, তখন সেও খাতকের পর্য্যায়ে থাকে। এরূপ কোন ষাইট হাজার টাকার কোম্পানী যদি কুড়ি লক্ষ টাকা আমানত পাইয়া থাকে, তবে তাহার আমানতি টাকা আদায়ের সম্বন্ধে আমানতকারী একটু ভাবিয়া দেখিবে [illegible] বুঝিতে পারেন।

এই চুক্তি মত আমানতের টাকার সিকি অংশ যদি কোন আমানতকারী কোন সময়ে উঠাইয়া লয়, তাহা হইলেই এই কোম্পানী ফেল হওয়া ভিন্ন কি উপায় আছে? সাধারণতঃ দেশী কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক হিসাবে অন্য কোন বড় ব্যাঙ্ক তাহাদের পশ্চাতে থাকে না; সুতরাং হঠাৎ যদি কোন কোম্পানীকে আমানতের অধিক পরিমাণ টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে ফেল পড়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না।

ধার দেওয়ার নিয়ম

পূর্ব্বে যখন লোন আফিসের সংখ্যা কম ছিল তখন অবস্থা খাতক দেখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইত। এখন লোন আফিসের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় খাতক অত বাছাই করা চলে না। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শুনা যায় যাঁহারা টাকা যোগাড় করিয়াছেন তাঁহারা কমিশন পাইয়া থাকেন। ঘটকের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে অনেক সময় ধোঁকা খাইতে হয় বা ঠকে লইতে হয়; সেইরূপ দালাল দ্বারা টাকা কর্জ্জ লাগাইলে এইরূপ অপারগ খাতককে টাকা কর্জ্জ দিতে হয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমানতকারীর সাবধান হওয়ার সময় আসিয়াছে।

একটি উদাহরণ

বগুড়া জেলার লোন কোম্পানীগুলি আমানতকারীদের স্বার্থের দিকে কিরূপ উদাসীন, তাহা দুইটী ব্যাঙ্কের গত বৎসরের (১৩০৪ সালের) ব্যালেন্স সিট আলোচনায় দেখাইব। ইহার একটী মফঃস্বলে আর একটী সহরে। একটী ব্যাঙ্কে গত বৎসরের ডিরেক্টার রিপোর্টে দেখা যায়, মোট মুনাফা ১০২১৪৪৶৹ আনার মধ্যে শতকরা ৩০৲ [illegible] টাকা ডিভিডেণ্ড দিয়া অবশিষ্ট ৮৩১৯৶৹ মধ্য হইতে ৮০০৲ টাকা মাত্র রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিবার জন্য ডিরেক্টারগণ প্রস্তাব করেন এবং বোধ হয় সাধারণ সভা সেই অনুসারে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্ত কোম্পানীতে ঐ সময় পর্য্যন্ত আমানত ১১১২৯৩/১৫ ছিল, রিজার্ভ ফণ্ড ঐ সময় পর্য্যন্ত ৭৪৩৫৮৶/১৫+৮০০৲ মাত্র ছিল; উক্ত রিজার্ভ ফণ্ড মধ্যে আবার উক্ত ব্যাঙ্কেই ৬৪৩৫৮৶/১৫ আমানত ছিল মাত্র। হাজার টাকা এবং ১৩০৪ সালের মঞ্জুরী ৮০০৲ টাকা অন্যত্র আমানত রাখা হইয়াছে মনে হয়। এই ব্যাঙ্কের মূলধন আশী হাজার টাকা; তন্মধ্যে ৪১২৫০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। ৩৮৭৫০৲ টাকা অংশীদারের নিকট পাওনা আছে।

যদি এই কোম্পানীটী কোন কারণে লিকুইডেসানে যায়, তাহা হইলে অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ৩৮৭৫০৲ টাকার মধ্যে লিকুইডেটরের আদায়ী খরচ বাদে যাহা থাকিবে তাহা ও অনত্র আমানতী ১০০০৲ টাকা মাত্র আমানতকারিগণ তাহাদের আমানতি পৌণে দুই লক্ষ টাকার উপর অংশ মত পাইবেন; তাহাতে আমানতকারীকে আমানতি টাকার এক-চতুর্থাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এইত গেল আমাদের জেলার মফঃস্বলের একটি লোন আফিসের আমানতকারিগনের অবস্থা; আর এই জেলারই একটী লোন আফিস (যাহা জেলার সর্ব্বপ্রধান লোন আফিস premier bank বলিয়া গর্ব্ব করে) তাহার ১৩০৪ সালের ব্যালেন্স সিটে কি দেখা যায়?

অপর দৃষ্টান্ত

বিজ্ঞাপিত মূলধন ৫১০৩০৲ টাকা সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে; আমানত ঐ সময় পর্য্যন্ত ১১৮০০,

৭০॥৶০, রিজার্ভ ফণ্ডে ৪০১৪৫॥০ টাকা ছিল। ডিরেক্টার সভা গতবৎসর ৪০৲ হারে ডিভিডেণ্ড বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে লাভ ৪১৭৮৪৶৫ মধ্যে ডিভিডেণ্ড কর বেশী ৩৫॥১৮৲ বাদ দিয়া কিঞ্চিদধিক ৬৫০০৲ রিজার্ভ ফণ্ড বাবদ থাকিতে পারে। পূর্ব্বের রিজার্ভ ফণ্ড লইয়া রিজার্ভ ফণ্ড বোধ হয় ৪৭০০০৲ টাকা হইতে পারে। আর সেখানে আমানত প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা। ইহা ফেল হইলে ইহার আমানতকারিগণের অবস্থা কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দুই কোম্পানীর অবস্থা হইতে বুঝিতে পারিবেন আমানতকারিগণের দিকে দৃষ্টি দিবার কেউ নাই। আমানতকারিগণ যদি নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে এখন হইতেই সাবধান হউন।

Banking Enquiry Committee বসিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সাধারণ লোন আফিসের সংখ্যাই বেশী; সুতরাং Banking Enquiry committee লোন আফিসের কার্য্যাদি সম্বন্ধেও তদন্ত করিবেন। আমানতকারীগণ কমিশন সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ বক্তব্য মৌখিক বা লিখিত ভাবে জ্ঞাপন করুন। আপনাদের কি অসুবিধা হইয়াছে, কি করিলে সুবিধা হয় তাহা জানান। অপরে প্রতিকার করিবে এবং আমি কি করিব এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; আমার মনে হয় আমানতকারীগণ এই কয় বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন;—

প্রতিকার ব্যবস্থা

(১) ডিরেক্টার সভায় আমানতকারীগণের উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিনিধি থাকা চাই।

(২) আদায়ী মূলধন যে পরিমাণে হইবে তাহার সম পরিমাণে বা দ্বিগুণ টাকা লোন কোম্পানি আমানত লইতে পারিবে।

(৩) জীবন বীমা কোম্পানীগুলিকে যেমন গভর্ণমেণ্টের নিকট টাকা আমানত দিতে হয়; সেইরূপ লোন কোম্পানিদিগকেও আমানতের অনুপাতে [illegible]

[illegible]

অতঃপর এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাস যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় "মফস্বল ব্যাঙ্কে আমানতকারিগণের অবস্থা" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমর্থন যোগ্য; ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলিকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তিনি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন শুধু আমি তাহারই কতিপয় বিষয়ের সমালোচনা করিব।

ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস

ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলির কার্য্য-প্রণালী ও ফেল পড়ার সুযোগের মধ্যে মূলতঃ অনেকটা প্রভেদ আছে; কাজেই শাল বৃক্ষের সহিত অশ্বত্থ বৃক্ষের তুলনা করা সমীচীন মনে হয় না। ঝড়ে বড় গাছই বেশী পড়ে। আমি মফঃস্বলের লোন আফিসগুলির সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করিব। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বা পিপল্‌স্ ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার ইতিহাস যাহারা জানেন, তাহাদিগকে আর এই প্রকার ফেল পড়ার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যদিও আমি সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না তথাপি লোকের ভুল ধারণা ও দুর্ব্বলতা দূর করিবার পক্ষে এইমাত্র বলিতে চাই যে, জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এমন ২।৪টী কোম্পানী ফেল পড়াই স্বাভাবিক, তাই বলিয়া হতাশ হইলে চলিবে কেন? অন্যান্য স্বাধীন দেশের তুলনায় ফেল পড়ার মাত্রা আমাদের দেশে অত্যধিক নহে একথা বলাই বাহুল্য। তবে আমরা নব্য যাত্রী, শিক্ষানবীশ মাত্র। এমতাবস্থায় আমাদের ২।১টী গেলেই সবে ধন 'নীলমণির' অভাব অনুভব করি।

অতঃপর আমাদিগকে এমনভাবে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, যাহাতে আবশ্যকীয় প্রতীকার সম্ভব হয়, অথচ এই সমস্ত ব্যবসায় সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস ও ধারণা নষ্ট না হয়।

[illegible]

[illegible], অপরদিকে সহজ পরিচালনায় যথেষ্ট লাভ পাওয়া যায় বলিয়া অনেকেই এই পথ অবলম্বন করিতেছেন। ইহার অত্যধিক লাভের পরিমাণ দেখিয়া বাহিরের লোক ঈর্ষা প্রকাশ যে না করেন এমন নহে, কিন্তু যাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে আমানত দিয়া অংশত গ্রহণ করেনই না, অধিকন্তু নানা বাজে কথার প্রসঙ্গ তুলিয়া খনার বচন আওড়াইয়া থাকেন।

আইন বন্ধনের বিপদ

আমার মতে সবদিকে আইনের কবলে বাঁধিয়া দেশী ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসগুলিকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করার চেয়ে উহাদিগকে কতকাংশে স্বাধীনতা দিয়া আমানতকারিগণের পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া কার্য্য করাই যুক্তিযুক্ত। এ সম্বন্ধে আমার অভিমত পরে প্রকাশ করিতেছি।

রিজার্ভ ফণ্ড

রিজার্ভ ফণ্ড সম্বন্ধে বিদেশী কোম্পানীগুলির সঙ্গে তুলনা করিবার সময় আমাদের এখনও আসে নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমরা নব্য শিক্ষানবীশ; বিদেশী কোম্পানীগুলি আমাদের কোম্পানীগুলির চেয়ে বয়সে অনেক প্রাচীন, তাহারাও অল্প সময়ে এত অধিক পরিমাণ রিজার্ভ ফণ্ড গঠন করিতে পারেন নাই; তথাপি তাহাদের অনাদায়ী মূলধনের চেয়ে আমানতের পরিমাণ অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষিত ও রাজানুগ্রহলাভে পরিপুষ্ট। আমাদিগকে নানা প্রকার বাধা বিপত্তির মধ্য হইতে কার্য্য করিতে হয়। এমতাবস্থায় লাভের লোভ একটু বেশী পরিমাণে না দেখাইলে উহাদের মন দেশী কোম্পানীর দিকে আকৃষ্ট হইবে কেন? উহাদিগকে দেশী কোম্পানীগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করাইয়া, উহাদের অর্থ বিদেশী কোম্পানীগুলিতে না খাটাইয়া যাহাতে উহারা দেশী কোম্পানীগুলিতে খাটাইতে [illegible] হয়েন এরূপ ভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

লোন আফিসগুলি [illegible] [illegible] শ্রেণীর, [illegible] আমানত-কারীগণের অধিকাংশই স্থানীয় বা নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক। তাহারা বাহির সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই আমানত দিয়া থাকেন; ব্যালেন্স শিট প্রভৃতিও যে প্রকারান্তরে না পাইয়া থাকেন এমন নহে, এবং মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধানও করিয়া থাকেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে আসল দিকটা দেখিবার সুযোগ পান না। কিম্বা অল্প বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জানিয়া শুনিয়াও—প্রচলিত রীতি অনুসারে আমানত দিয়া থাকেন;

ময়মনসিংহ জেলায় লোন আফিসের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক। ঐ সমস্ত লোন আফিসগুলির আমানতের পরিমাণ উত্তোক্তাদিগেরই বেশী; তাহাদের স্বার্থ অধিক বলিয়া কোম্পানী যাহাতে ফেল না পড়ে তাহারা সর্ব্বদাই সেই চেষ্টাই করিয়া থাকেন। সচরাচর এই জেলার এই শ্রেণীর কোম্পানীগুলি ফেল পড়ে না বলিয়া তাহারা এত সাহস করিয়া আমানত রাখিয়া থাকেন; তথাপি প্রত্যেক আমানতকারিরই বিশেষ জানিয়া শুনিয়া কার্য্য করা সঙ্গত; তবে শ্রীযুত কুণ্ডুমহাশয় যে দুইটী কোম্পানীর আমানতের ও রিজার্ভ ফণ্ডের নমুনা দেখাইয়াছেন তাহা যদিও দেশের আদর্শ নহে তথাপি উহাদের পরিচালকবর্গের অদূরদর্শিতাই প্রমাণ করিতেছে।

টাকা মারা যাইবার আশঙ্কা

ব্যাঙ্ক নানাভাবে নানা ব্যবসায়ে টাকা খাটাইয়া থাকেন; তাহাতে টাকা মারা পড়িবার আশঙ্কা বেশী; দ্বিতীয়তঃ দেনা পাওনায় সুনাম রাখিতে না পারিলেও উহা যে কোন সময়ে উপযুক্ত মূলধন থাকা সত্ত্বেও ফেল পড়িতে পারে; কিন্তু লোন অফিসগুলির মধ্যে যেগুলি গ্রাম্য লগ্নি ব্যবসায় করিয়া থাকেন, উহাদের ফেল পড়িবার আশঙ্কা কম; কিম্বা যদিও কোনও অনিবার্য্য আইন সঙ্গত কারণে ফেলও পড়ে, তথাপি উহার আমানতের টাকা সম্পূর্ণ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। কারণ তাহাদের সম্পূর্ণ টাকা দায়নেই থাকিয়া যায়। অধিক কোম্পানীর পরিচালকবর্গ তাঁহাদের টাকা কোন অনুপযুক্ত খারাপ লোকের নিকট [illegible] করিয়া থাকে না। তাঁহারাও বেশ জানেন,

ইহা তাঁহাদের লাভজনক স্থায়ী ব্যবসায়। কোম্পানী ফেল হইলে তাঁহাদেরও প্রভূত ক্ষতি। অর্থ স্থলে অনেক কথাই উঠিতে পারে এবং তাহার মীমাংসাও আছে। একই প্রকার উপমা সর্ব্বত্র খাটে না।

আমার মনে হয় যদি আমানতকারিগণ আইনসঙ্গত উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে কোম্পানীর পরিচালকবর্গও যথারীতি প্রতিকার ও সংস্কার করিতে বাধ্য হইবেন। এ ক্ষেত্রে আইনের বেড়াজালে ফেলিবার কোন আবশ্যক করে না।

তদন্ত কমিটীর উদ্দেশ্য

যে ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটী বসিয়াছে, উহার মূল উদ্দেশ্য কি তাহা কে বলিতে পারে? গভর্ণমেণ্টের এই প্রকার কমিটী কমিশন প্রভৃতি যাহা দেখিতেছি প্রত্যেকেরই একটা না একটা গূঢ় রহস্য আছে। "বিনা স্বার্থে বেনিয়া না নড়ে এক পা"। আমরা আজীবন মাকাল দেখিয়াই ভুলিতেছি। কে বলিতে পারে এই তদন্তের পিছনে বিরাট বিদেশী ব্যাঙ্কের সূচনা না আছে? কে জানে Rural Bankএর শেষ পরিণতি কোথায়?

আমি অনুরোধ করি, এই সময় সকলকে মিলিতভাবে খুব সাবধানে কাজ করিতে হইবে; নিজেদের মরিবার কল নিজেরা তৈয়ার করিতে বিরত থাকিয়া যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যের আঘাতে দলিত ও নিষ্পেষিত না হইতে পারে তাহার জন্য আমানতদাতা ও গ্রহিতার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে হইবে। উভয়কেই উভয়ের স্বার্থ দেখিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক ও শিল্পোন্নতি

অনেকে অনুযোগ করিয়া থাকেন, এই সকল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলি কোন শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন না ইত্যাদি। কোন কোন ব্যাঙ্ক যে কতিপয় দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যানুসারে সাহায্য প্রদান না করিতেছেন এমন নহে। অনেক স্থানে তাহা-দিগকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেও হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৮।১০ বৎসরের মধ্যে এই সকল লোন আফিসগুলি দাদনের কার্য্যে সুবিধা ও আশানুরূপ লাভ না দেখিয়া কিম্বা উত্তরোত্তর লোন আফিসের সংখ্যাধিক্য বশতঃ গ্রাম্য দাদন নিরাপদ নহে বুঝিয়া সঙ্ঘবদ্ধ বা পৃথকভাবে বিরাট ব্যাঙ্কের সৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন লাভজনক শিল্প বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইবেন। ইতিমধ্যেই এই জেলায় কয়েকটী লোন আফিস দাদনের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বেশ উন্নতি দেখাইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ ।

[illegible] বর্ষ.] পৌষ ১৩৩৬ [৯ম সংখ্যা

বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের সুবিধা

[illegible] দেশেই মানুষের পক্ষে অশনের পরই [illegible] প্রয়োজন। সেই জন্য যে দেশ অশনের জন্য [illegible] মুখাপেক্ষী সে দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে [illegible] জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী সে দেশেরও [illegible] দুর্ভাগ্য। আর সেই জন্যই বস্ত্রশিল্পকে অর্থ- [illegible] সাবে দেশের ও জাতির মেরুদণ্ড বলা [illegible]। যতদিন এ দেশের বস্ত্রশিল্প সমুন্নত ছিল সেই যথেষ্ট হইবে যে, কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, রাজনৈতিক অত্যাচার অবলম্বন না করিলে ইংলণ্ড কখন ভারতের সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প নষ্ট করিতে পারিত না। বর্ত্তমানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত না করিলে সেই শিল্পের পুনরুন্নতি সাধন সম্ভব হইতে পারে না।

এই কার্য্যে বোম্বাই ভারতে অগ্রণী হইয়াছে।

ভারতবর্ষে লোকপ্রতি ব্যবহৃত কাপড়ের পরিমাণ লোকের আর্থিক অবস্থার অর্থাৎ কিনিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ এই ২৫ বৎসরের গড় হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, লোক প্রতি ৮৮০ গজ হইতে ১৬২৮ গজ কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছে। গড়ে ধরিলে বলা যাইতে পারে, এ দেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে ১২৫ গজ কাপড় ব্যবহার করে। বাঙ্গলায় ৫ কোটি লোক প্রত্যেকে ১২০৫ গজ কাপড় কিনিলে বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর ৬২০৫ কোটী গজ কাপড় বিক্রীত হয়। কাপড়ের দাম যদি প্রতিগজ ৪ আনা ধরা যায় তবে এই কাপড়ের জন্য বঙ্গদেশকে বৎসরে প্রায় ১৫০৬২ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই টাকা আমরা বাঙ্গালায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালাতেই রাখিতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা হইতেছে না। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর কাপড়ের কল বর্ত্তমানে ৩টি মাত্র। সেগুলির উৎপন্ন কাপড়ের বার্ষিক মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

বঙ্গলক্ষ্মী	২৮ লক্ষ টাকা
ঢাকেশ্বরী	১১ " "
মোহিনী	১৩ " "

অর্থাৎ বাঙ্গালার লোক বিশেষতঃ বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টাকরিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালার জন্য প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় ১৫০৬২ কোটি টাকার কাপড়ের মধ্যে মাত্র প্রায় ৫০লক্ষ টাকার কাপড় বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর কলে প্রস্তুত হয়।

ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয়, বস্ত্র-বিনিময়ে বৎসর [illegible] যে কোটি কোটি টাকা বঙ্গদেশ হইতে বাহির [illegible] যাইতেছে, তাহাতেই বঙ্গদেশ পঙ্গু হইয়া পড়ি[illegible] বাঙ্গালার [illegible] [illegible]

নহে; পরন্তু বহ্বায়াসসাধ্য। পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশেই এত বস্ত্র উৎপন্ন হইত যে, দেশের লোকের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াও বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করিয়া বাঙ্গালার তন্তুবায় ও ব্যবসায়ী লাভবান হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা শ্রেণীর লোক তাহাতে অর্থার্জ্জন করিতে পারিত। এই বাঙ্গালার মসলিন এক দিন রোমের সম্রাটগণের অঙ্গ আবৃত করিত এবং মিশরে বস্ত্রের বিশেষ আদর ছিল। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দেও মালদহ হইতে শেখ ভিক নামক এক ব্যবসায়ী ৩ জাহাজ মালবাহী কাপড় পারস্যোপসাগরের পথে রুসিয়ায় রপ্তানী করিয়াছিলেন। আর আজ বঙ্গদেশের কোন না কোন জিলায় দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট লাগিয়াই আছে; আর সকল জিলাতেই লোক দারিদ্র্যহেতু পুষ্টিকর আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দারিদ্র্যসঞ্জাত নানা রোগে কষ্ট পাইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেকালে বাঙ্গালা "স্বর্ণপ্রসূ" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তখন বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্প ও তাহার কৃষিকার্য্যাদির সমবায়ে লোক সমৃদ্ধ হইত। আজ বাঙ্গালায় সেই সমৃদ্ধ অবস্থা স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। বাঙ্গালী আজ নিরন্ন—বৃত্তির অভাবে দীন—"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ।"

কিসে এই অবস্থার প্রতীকার করা যায়? প্রতীকারোপায় চিন্তা করিলে বুঝা যায়, বাঙ্গালায় শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বাঙ্গালীর বাঁচিবার উপায় হইতে পারে না। আর এই সব শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প সর্ব্ব-প্রধান। কারণ, এই শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের ক্রেতাও বাঙ্গালায়। অন্যান্য শিল্পে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ভিন্ন দেশে যাইতে হয়। বঙ্গদেশে যে পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও বিদেশে বিক্রীত হয় এবং সেই সব স্থানে বিক্রয়ের [illegible]

বস্ত্রশিল্পের পণ্যের ক্রেতা বঙ্গদেশেই মিলিবে। বোম্বাই কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিয়া কত লাভবান হইয়াছে, তাহা বাঙলার দরিদ্র অধিবাসীদিগের সহিত বোম্বাইয়ের অধিবাসীদিগের অবস্থার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে বৎসরে ১৫২৬ কোটী টাকার কাপড় আমদানী বন্ধ করিয়া সেই টাকা ঘরে রাখিতে পারে। তাহাতে বাঙ্গালা আবার "সোণার বাঙ্গালা" হইতে পারে, বাঙ্গালী আবার সবল সুস্থ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে ভারতে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারে।

বিলাতের লোক যখন আইন করিয়া এ দেশের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশ সাধন করে, তাহার পর হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড়েরই একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল, বলা যায়। তাহার পর বোম্বাইয়ে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে মোট ৩৭টী কল ছিল। সেই সময় হইতে ৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে কাপড়ের কলের সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার একটা মোটামুট হিসাব দিলে মোট উন্নতির পরিমাণ পরিমাপ করা হইতে পারে। এই হিসাব দেখিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩টির অধিক নহে এবং সেজন্য বাঙ্গালীর লজ্জিত হওয়া উচিত।

বৎসর	নিজ বোম্বাই সহরে কল	ভারতের অন্যত্র কল
১৮৮৩	৩৭	৩১
১৮৮৮	৫০	৪৯
১৮৯৩	৫৬	৬৭
১৮৯৮	৭৪	৯৩
১৯০৩	৭৭	১০৬
১৯০৮	৭৯	১৪৫
১৯১৩	৮১	১৫৯
১৯১৮	৮৪	১৫৬
১৯২৫	৭৯	১৯৫,

ইহার পর কয় বৎসরে কলে তাঁত ও টেকোর সংখ্যা কিরূপ ছিল, দেখা যাউক :—

বৎসর	বোম্বাইয়ে তাঁত	বোম্বাইয়ে টেকো	ভারতের অন্যত্র তাঁত	ভারতের অন্যত্র টেকো
১৮৮৩	১১,৯৮৫	১,১০,৮৬৬	৪,১৭৭	০,২৮০৪৫
৮৯০০	২১,২৭৪	২,৪১৩,০৮৩	১৮,০৮৫	২৩৩৪২০৬
১৯১৫	৫২,৬৬৯	২,৬৪৫,৯১৯	৫৪,৯৩৪	৩৮০১ ০৩
১৯২৫	৬০৭৫৩	৩৩৭৮৩৬৬	৭৭,৮৫৯	৪৮,১৫৪৩৭

ভারতবর্ষে কল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথম প্রথম উৎপন্ন সূতার ৪ আনা মাত্র দেশীয় কলে কাপড় বুনিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। আর ৪ আনা হাতের তাঁতের জন্য বিক্রীত হইত। অবশিষ্ট ৮ আনা অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ চীন, আফ্রিকা, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত। কেননা তখন এদেশে দেশীয় কলের কাপড়ের তত কাটতি হয় নাই। সেই বৎসর দেশীয় কলে প্রস্তুত ২০ কোটী গজ কাপড়ের মধ্যে ১১ কোটি ২০ লক্ষ গজ বিদেশে বিক্রীত হইয়াছিল।

তাহার পর হইতে ভারতে দেশীয় কলের কাপড়ের আদর বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে বিদেশী কাপড়ের আমদানী কমিতেছে এবং দেশীয় কলের কাপড় বিদেশী কাপড়ের স্থান অধিকার করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখিবার কাজে সাহায্য করিতেছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাবে তাহা প্রতিপন্ন হইবে—

ভিন্ন ভিন্ন কাপড়	১৯০ খৃষ্টাব্দে	১৯২৫ খৃষ্টাব্দে
দেশী কলের কাপড় শত করা	৯ ভাগ শত করা	৪২ ভাগ
হাতের তাঁতের কাপড় " "	২৭ " " "	২৮ ভাগ
বিদেশী কাপড় " "	৬৪ " " "	৩০ ভাগ

তবেই দেখা যাইতেছে, গড়ে ২৫ বৎসরে দেশী কলের কাপড়ের ব্যবহার যেমন প্রায় ৫ গুণ বাড়িয়াছে, বিদেশী কাপড়ের আমদানী তেমনই অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে।

ইহাতে দেশের কত উপকার হইয়াছে, ধনসম্পত্তির কত সাহায্য হইয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। এই কার্য্য প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে। যখন আমরা মনে করি, বিদেশ হইতে আমাদের প্রয়োজনের শতকরা ৩০ ভাগের জন্ত যে কাপড় আমদানী হয়, তাহারই মূল্য ৬৬ কোটি টাকা, তখন বুঝিতে পারা যায়, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই ২৫ বৎসরে কত কোটি টাকা এ দেশ হইতে চলিয়া যাইত। সেই টাকা দেশে থাকায় দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আজ আর ভারতবর্ষকে বিদেশে কাপড় বা সুতা বিক্রয় করিবার জন্ত ব্যস্ত হইতে হয় না। ভারতের ৩১ কোটি লোক দেশীয় কাপড় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। তাহাদের প্রয়োজন মিটানই দেশীয় কলের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই সময় বাঙ্গালা কি করিতেছে? বাঙ্গালা এই সুযোগের সুবিধা লইতে পারে নাই। কেন না, বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বলিতে ৩টি মাত্র কল আছে এবং সেই ৩টিতে যে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহার বার্ষিক মূল্য ৫২ লক্ষ টাকার অধিক নহে।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, বাঙ্গালার জন্ত বৎসরে ৬২'৫ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন। যদি প্রতি কলের জন্ত ৪০টি টেকো থাকে, তবে প্রতি তাঁতে দৈনিক ৫৩ গজ কাপড় প্রস্তুত করা যায়। সেই হিসাব ধরিলে ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টেকো ও ৩৯ হাজার তাঁত হইলে বাঙ্গালার আবশ্যক কাপড় সরবরাহ করা যায়। অবশ্য কিছু কাপড় হাতের তাঁতে উৎপন্ন হয়। হাতের তাঁতে কাপড়ে যেরূপ নক্সা পাড় ও কমনীয়তা সম্ভব—কলে তাহা সম্ভব নহে। সেই জন্তই হাতের তাঁত বিলুপ্ত হয় নাই। তবে টেকোর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৬০ হাজারই হইবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর কল কয়টিতে কেবল ৩ হাজার ৮ শত ৪০ খানি তাঁত ও ৬৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ২ শত ৪৮টি টেকো চলিতেছে। সুতরাং ৫ শত তাঁত ও ২০ হাজার টেকো লইয়া যদি একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে প্রভূত লাভ অনিবার্য্য।

বর্ত্তমানে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, বোম্বাইয়ে কল প্রতিষ্ঠার সময় তাহার অভাবই ছিল। এই বাঙ্গালায় পরিকল্পিত ও প্রবর্ত্তিত স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের কলগুলিকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। অথচ আজ বাঙ্গালাই বস্ত্রশিল্পে অন্যান্য প্রদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে! দিল্লীতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন কালে লর্ড কার্জ্জন যথার্থই বলিয়াছিলেন, বাষ্পীয় যান যেমন গোযানের স্থান অধিকার করিয়াছে, কলকারখানা তেমনই কুটীর শিল্পের স্থান অধিকার করিবেই। পৃথিবীর সব দেশে যাহা হইয়াছে, বাঙ্গলায় তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কাজেই বাঙ্গলায়ও চরকা ও তাঁতের দ্বারা বিদেশী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। আমরা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে যত বিলম্ব করিব, ততই দরিদ্র হইয়া পড়িব; কারণ, ততদিন বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা বাঙ্গালা হইতে বাহির হইয়া যাইবে। আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৪৪টি, ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে ৪১টি, ১৯২৪ খ্রীঃ ৪৭টি ও ১৯২৫ খ্রীঃ ৪০টি নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ইহাতেই বুঝা যায়, যখন ভারতের আর সকল প্রদেশ বস্ত্রশিল্পের দ্বারা লাভবান হইবার চেষ্টা করিয়াছে, কেবল বাঙ্গালাই তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে—বাঙ্গালাই তাহার দারিদ্র্য বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে—বাঙ্গালী ধ্বংসপথে অগ্রসর হইয়াছে।

বাঙ্গালায় কাপড়ের কাজ কিরূপে চলিবে, তাহা বিবেচনা করিলে কলের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন

হইবে। বোম্বাইয়ের কলগুলি প্রথমে প্রধানতঃ সূতা প্রস্তুত করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন দেশীয় কলের কাপড়ের তেমন আদর ছিল না—কাটতি সামান্য ছিল। এ দেশে উৎপন্ন বস্ত্রের উপর যে শুল্ক ছিল, তাহাও ১৯২৩ খৃঃঅব্দের পূর্ব্বে প্রত্যাহৃত হয় নাই। সেজন্যও বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্পকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন বঙ্গলক্ষ্মী, ঢাকেশ্বরী ও মোহিনী মিলের আদর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালী বাঙ্গালার কলে বাঙ্গালীর প্রস্তুত কাপড় পাইলে অন্য কাপড় কিনিতে চাহে না। আমদানী কাপড়ের উপর এখন শতকরা ১১৲ টাকা হিসাবে শুল্কও দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করিতেছে।

কাপড়ের কলের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে সর্ব্বপ্রধান ব্যয় তুলায়। সেকালে বঙ্গদেশে তুলা উৎপন্ন হইত। যে সূতায় ঢাকাই মসলিনের মত বস্ত্র বয়ন করা হইত, সে সূতার তুলাও বাঙ্গালার। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। সুতরাং যতদিন আবার বাঙ্গালায় তুলার চাষ বিস্তৃতভাবে না হইবে, ততদিন বাঙ্গালাকে অন্য স্থান হইতে তুলা আমদানী করিতেই হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার যে বিশেষ অসুবিধা আছে, তাহাও নহে। কারণ, বিলাতে বা জাপানে তুলা জন্মে না, বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদিগকেও প্রয়োজনানুসারে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, আফ্রিকা, মার্কিন প্রভৃতি স্থান ও দেশ হইতে তুলা কিনিতে হয়।

ব্যয়ের দিকে তুলার পর অন্যান্য বাবদে খরচ :—

(১) কয়লা বা বিদ্যুৎ

(২) কলকারখানার জন্য আবশ্যক নানা দ্রব্য

(৩) কলকব্জার সংস্কার ও সংরক্ষণ

(৪) পারিশ্রমিক

(৫) ট্যাক্স

(৬) কর্ম্মচারীদিগের বেতন

( ) বীমা

(৮) কারখানা বাড়ীর সংস্কার

(৯) বিবিধ

এতদ্ভিন্ন কেবল ম্যানেজিং এজেন্টস্ বা সেক্রেটারীকে দেয় অর্থ ধরিতে হয়। প্রস্তাবিত কলের জন্য ম্যানেজিং এজেন্টস্ মাসিক ন্যূনকল্পে এক হাজার টাকা ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর শতকরা ৩৲ টাকা কমিশন মাত্র লইয়া কাজ করিবেন। বাঙ্গালায় কোন কোন মিলের এজেন্টরা ৪৫ টাকা এবং আমেদাবাদের অধিকাংশ কলে এজেন্টরা শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকেন।

কয়লা বা বিদ্যুতের জন্য ব্যয় বাঙ্গালায় কম। বোম্বাই ও আমেদাবাদে কয়লার রেলভাড়া ও পথে নষ্ট কয়লার পরিমাণ অধিক। তাহার হিসাব এইরূপ ধ। যাইতে পারে :—

	বোম্বাইয়ে (১টন কয়লা)	বাঙ্গালায় (১টন কয়লা)
খনি হইতে কয়লার মূল্য	৫৲ টাকা	৫৲ টাকা
রেলভাড়া	১২৲ "	৩৲ "
নষ্ট কয়লার দাম	১·৭ "	·৮ "
	মোট .৮·৭ টাকা	মোট ৮·৮ "

অর্থাৎ বাঙ্গালায় কয়লার দাম বোম্বাই বা আমেদাবাদের তুলনায় অর্দ্ধেক। বোম্বাইয়ে প্রতিদিন প্রতি তাঁতের খরচ ৪৫৩ পাই ও টেকো প্রতি খরচ ৮৪০ পাই; আর মোট খরচ প্রতি তাঁতে ৫১৪ পাই বোম্বাইয়ে কয়লার খরচ দৈনিক ১৪৩·৮৬ পাই ধরিতে হয়। বাঙ্গালায় এই খরচ মাত্র ৭১·৯৩ পাই।

ক্রমশঃ

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঘ মাসের কৃষি

সব্জীবাগান

বিলাতী সব্জী এখন যাহা ক্ষেত্রে আছে তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেতে চৈতে বেগুণ, দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

লঙ্কা চাষের জন্য মাঠান ও উচ্চ জমি আবশ্যক। উন্মুক্ত ও রৌদ্রপিঠে জমিতে লঙ্কা ভাল জন্মে। চারা বসাইবার পরে যদি বৃষ্টির অভাব হয় তবে গাছে রীতিমত জল দিতে হয়। মাটি কঠিন হইয়া গেলে জমি কোপাইয়া মাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গাছে ফল দেখা গেলে গাছের গোড়ায় বিট লবণ দিলে ফল বড় এবং অধিক হয়। গাছের গোড়ায় লবণ দিবার পর বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয়। কারণ তাহা হইলে লবণ অচিরে গলিয়া গিয়া গাছের আহারোপযোগী হইয়া থাকে। বিটা প্রভৃতি লবণের লবণ লাগে। লবণের সহিত সমপরিমাণ মাটি মিশাইয়া লওয়া উচিত।

লঙ্কার আবাদে জমি শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব এক জমিতে বারংবার ইহার আবাদ করা উচিত নয়; কিন্তু যদি করিতে হয়, তবে জমিতে উত্তমরূপ সার দিতে হইবে খোয়াড় ও গোয়াল ঘরের আবর্জ্জনা লঙ্কার জমির উত্তম সার।

বেগুণগাছে চারা অবস্থায় অনেক সময় লোনা লাগিয়া থাকে। ফলতঃ সেই সকল গাছের গোড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। লোনার লক্ষণ দেখা গেলে ভাঁটির চারিদিকে আইল বাঁধিয়া উত্তমরূপে প্রচুর জল সেচন করিতে হয়। মাটী শুকাইলেই মাটির উপরিভাগে লোনা ফুটিয়া উঠে। তেঁতুলের বা ঘইলের জল দিলেও লবণ নষ্ট হইয়া থাকে। চুণের জলেও লবণ কাটিয়া যায় সত্য, কিন্তু চুণের ঝাঁঝে গাছ মরিয়া যাইতে পারে, সুতরাং চুণ ব্যবহার না করাই ভাল।

বেগুণ গাছে অনেক সময় পোকার আবির্ভাব হয়। হুকার জল বা ছাই ব্যবহারে উপকার না পাইলে 'লণ্ডন পর্পল' নামক এক প্রকার বিলাতী ঔষধ দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে। অল্প ২।৪টি গাছে পোকা ধরিলে উহা তুলিয়া আগুণে পোড়াইয়া ফেলাই ভাল।

আবার বেগুণ গাছেই এক প্রকার পোকা জন্মে। প্রথমতঃ ডিম্বাবস্থায় উহা সবুজ থাকে, পরে কীটের বর্ণ পতঙ্গাবস্থায় ফিকে হয় ও মস্তক কাল রংয়ের হইয়া থাকে। পাতার নিম্নভাগে কীট আশ্রয় লইয়া ডিম প্রসব করে। গাছের পাতা কুঞ্চিত হইলেই বুঝিতে হইবে তাহা কীটাক্রান্ত হইয়াছে।

গাছে এই পোকা দেখা গেলেই অবিলম্বে সেই অংশটি গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তীব্র হুকার জলে এই পোকা নষ্ট হয়। ক্ষীণ তেজ বা ফিকে কেরোসিন ইমল্‌সন ছড়াইয়া দিলেও এই পোকা ধ্বংস করা যায়। এই পোকা বিনাশ না করিলে উহা শীঘ্রই ক্ষেত্রটীকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

শশা, করলা, তরমুজ প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারী করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা কর্ত্তব্য ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

প্রচুর জল সেচন করা এবং মাটি খুঁসিয়া দেওয়া ভিন্ন ভুয়ে শশা বা চৈতে শশার বিশেষ কোন পাট নাই।

এক প্রকার লাল বর্ণের পতঙ্গ শশা গাছের পরম শত্রু। তবে গাছের গোড়ায় পাতায় কাঠের ছাই দিলে তথায় পোকা মাকড় আর যায় না। গাছের গোড়ায় বা তলায় ধোঁয়া দিলে কিছু দিনের জন্য উহা তাড়ান যাইতে পারে। সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যাকালে গাছের গোড়ায় এবং মাচার তলায় ঘুঁটে কিম্বা শুকা পাতার ধোঁয়া দিলে ধোঁয়া গন্ধ হয়, সেজন্য ঐ পোকা সেদিকে ধাবিত হয় না। কচি ডগা ও কচি পাতাই ইহাদিগের আক্রমণের বিষয়, কিন্তু সেগুলি ৫।৬ দিনের পুরাতন হইলে আর ভয়ের কারণ থাকে না। পাকা বা শক্ত পাতা উহারা স্পর্শ করেনা। নূতন পাতা উঠিলেই তাহাতে কাঠের ছাই ছড়াইয়া দেওয়া কীট পতঙ্গ নিবারণের অতি উত্তম উপায়।

জোনাকী পোকা তরমুজ গাছের পরম শত্রু। গাছ জন্মিলেই এই পোকা আসিয়া জুটে। প্রথমতঃ ইহারা পাতা খায়, ক্রমে তাহারা গ্রন্থী হইতে কাণ্ড পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। তীব্র তামাক বা গন্ধকের গুড়া অথবা কাঠের ছাই গোড়া ও পাতার উপর ছড়াইয়া দিলে অনেক পরিমাণে ইহারা দমন থাকে। চারাগুলি যতদিন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় থাকে ততদিন তাহাদিগকে ভয় করিতে হয়। গাছগুলি কোন রকমে ৮।৯টি পাতা বিশিষ্ট হইয়া লতাতেই আরম্ভ হইলে আর তত ভয়ের কারণ থাকে না। দিনের মধ্যে দুই তিন বার উক্ত পোকাগুলিকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেও অনেক সুবিধা হয়।

প্রতি মাদায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট সবল ও সুপুষ্ট গাছটী মাত্র রাখিয়া অপর গুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এক মাদায় একটির অধিক গাছ কোন মতে রাখা উচিত নয়।

মাদায় পুষ্করিণীর পাঁক, গোয়াল ঘরের আবর্জ্জনা ও পোড়া মাটি দিয়া বীজ পুঁতিলে গাছের বিপুল তেজ হয় ও তাহাতে বিস্তর ফল ধরে।

মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। ক্ষেতে রসা থাকিলে আদৌ জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না।

খেঁড়ো, খরমুজ, ফুটি প্রভৃতির আবাদ তরমুজের ন্যায় এবং উহার শত্রু পোকা ঐ রূপে নষ্ট করিতে হয়।

ফলের বাগান

আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের এই সময় ফুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলগাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরে ও ফুল ঝরিয়া যায় না।

আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাধিয়া দেওয়া উচিত। গোময় ছাই ও পাক মাটী আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার।

আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে তবে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতি দূরে তৃণ কাষ্ঠ আদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পায় এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকলবড় বড় গাছ পুঁতিবে সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে; এবং সেই খোঁড়া মাটীগুলি কিছুদিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটী দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সাদা মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া পোড়া মাটিদ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিয়া রাখিবে।

পুরাতন ডালের ফুল ও পেয়ারা ছোট হয় এবং তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্ম পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্রে

সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে বৃষ্টি হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে তাহাতে এই মাসে সারদিবে।

আলু ও কপির জন্ম এই সময় পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ার করিয়া রাখিবে।

এই মাস হইতে ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটীতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিয়া এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে ইহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়ে উত্তম বীজ উৎপন্ন হয়।

এই মাসের প্রথম ১৫দিন পর হলুদ ও আদার মুখী বীজের জন্ম শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিয়া শুকাতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুকনা হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়।

চীনাবাদাম, এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান

ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সব ফুটিয়াছে।

বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে এখন অষ্টার, ভার্বিনা, লর্কস্পর, পিঙ্ক, ফ্লক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুল বীজ বপন করিবে, এবং শীতকালের সব্জী যথা— গাজর, সালগম, লেটুস, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যুই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। এখন হইতে এই সকল গাছের তাদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।
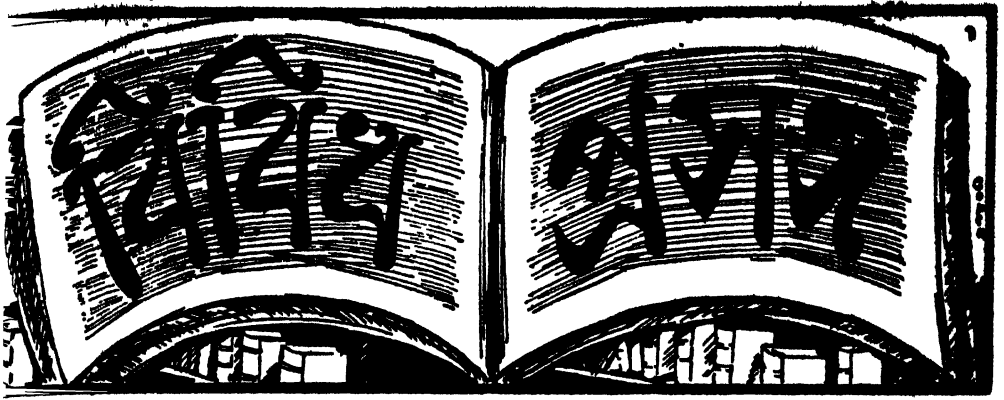
লালা লাজপত রায় স্মৃতি ভাণ্ডার

মহাত্মা গান্ধী যুক্তপ্রদেশ ভ্রমণ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লাজপত রায় স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

———

দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বিরাট দান

সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ভাইস চ্যান্সেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন মহারাজা কলেজগুলি পরিদর্শন করিয়া ভাইস চ্যান্সেলার প্রদত্ত এক উদ্যান সম্মিলনীতে যোগদান করেন। মহারাজকে সংস্কৃতে লিখিত মানপত্র দেওয়া হয়। তিনি পণ্ডিত মালব্যের হাতে এক লক্ষ টাকার একখানি চেক অর্পণ করেন। পরলোকগত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণকল্পে বর্ত্তমান মহারাজা এই অর্থ দান করিলেন।

———

বেঙ্গল ষ্টীম্ নেভিগেশন্ কোম্পানী

বেঙ্গল ষ্টীম্ নেভিগেশন্ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী আবদুল বারী চৌধুরী কোম্পানীর পক্ষ হইতে নাজিরহাট, দৌলতপুর, পটিয়া এবং অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তিনি বিপুল অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সকল স্থান হইতেই তিনি অভিনন্দন পাইয়াছেন। জনসাধারণ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। তাহারা কোম্পানীর বহু অংশ ক্রয় করে। মিঃ চৌধুরী অতঃপর অনেক হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু সহ কক্স বাজারে রওনা হইয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার চেষ্টা সফল করুন।

———

বিদ্যালয়ের দান

চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ শীল মহাশয় ও তাঁহার সহোদরগণ গড়বাটী হাই ইংলিশ স্কুলের স্থানাভাব দূর করিবার জন্য তাঁহাদের পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থ তিনটী ঘর বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র বাড়ী নির্ম্মাণকল্পে বিদ্যালয় সমিতির হস্তে ছয় হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কমিটী ধন্যবাদের সহিত এই দান গ্রহণ করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র শীল মহাশয়ের নামে একখানি প্রস্তরফলক লাগান হইবে ও তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি উপযুক্ত স্থানে রক্ষা

করা হইবে এবং হরিপদ বাবু ও তাঁহার অপর তিন ভ্রাতার মনোনীত চারিটী ছাত্রকে অবৈতনিক-ভাবে স্কুলে লওয়া হইবে।

চণ্ডীর নিকট বালিকা বলি

কিরূপে একটী বন্ধ্যা স্ত্রীলোক তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারণ করে একটি চারি বৎসর বয়স্কা বালিকাকে হত্যা করে হাইকোর্টে উহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানা গিয়াছে। আসামীর স্বামী সরকারী সাক্ষীরূপে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করে। উহাতে প্রকাশ, স্ত্রীলোকটির (আসামী) বয়স ২৫ বৎসর, তাহার ৯ বৎসর বিবাহিত জীবনের মধ্যে শুধু একবার সে সন্তান সম্ভবা হইয়াছিল, উক্ত সন্তানও মারা যায়। সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীলোকটি নানালোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে থাকে ও অনেক তাবিজ ইত্যাদি ধারণ করে, কিন্তু কোনই ফল হয় না। অবশেষে একজন ওঝার পরামর্শ অনুযায়ী স্ত্রীলোকটি চণ্ডীর নিকট চার বৎসর বয়স্কা একটি বালিকাকে বলি প্রদান করিয়া শবদেহটির উপর দাঁড়াইয়া স্নান করে; বালিকাটী খেলা করিতে ঐ বাড়ীতে সর্ব্বদাই আসিত। জলন্ধর দায়রা জজের বিচারে তাহার প্রতি ফাঁসীর আদেশ হয় কিন্তু হাইকোর্ট হইতে মৃত্যু দণ্ড আদেশের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা বলেন যে দেশে স্ত্রী শিক্ষা বা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দরকার নাই তাঁহারা কি বলেন ?

হাঙ্গর কাটায় মৃত্যু

কাঁথি থানার জগন্নাথপুর গ্রামের গোপীনাথ মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ সেদিন কাদুয়া গ্রামের নিকট বঙ্গোপসাগর তীরে জলে নামিয়া মাছ ধরিবার কালে একটা হাঙ্গরের আক্রমণে অতি সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হইয়া কাঁথি হাসপাতালে চিকিৎসার্থ আনীত হইয়াছিলেন; এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হাঙ্গরটী ব্রাহ্মণের ডান দিকের কোমর হইতে হাটু পর্য্যন্ত অংশের মাংস তুলিয়া লইয়া ও একটি হাত ভীষণভাবে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল। এই হাঙ্গরের উৎপাত দিন দিনই যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে এখন বঙ্গোপসাগরে জলে নামিবার সময় সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। গঙ্গাসাগরের মেলার সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ যদি যাত্রীদিগকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন তবে ভাল হয়।

ক্যাস সার্টিফিকেট

পোষ্ট আফিস হইতে এবৎসর অক্টোবর মাসে ৭৩৫৪০০০ টাকার ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে; ১৯২৭ অব্দে হইয়াছিল ৫৩৬১০০০ টাকার, তৎপরবর্ত্তী বৎসর হইয়াছে ৪৩৬৪০০০ টাকার; ৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই ক্যাস সার্টিফিকেটের মেয়াদ থাকে। দেশের যত টাকা সব কোম্পানীর কাগজ এবং ক্যাস্ সার্টিফিকেট কিনিতেই যদি বাহির হইয়া যায় তবে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার করে আর টাকা আসিবে কোথা হইতে ?

অষ্ট্রেলিয়ায় শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট

অষ্ট্রেলিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল। ইহাতে শ্রমিক দল জয়ী হইয়াছেন। ফলে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত শ্রমিক দলের ৪৪ জন, জাতীয় দলের ১৬ জন এবং সাধারণ দলের ৯ জন সভ্য

নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সংবাদপত্রের কার্য্যালয় হইতে বেতার বার্ত্তার সাহায্যে নির্ব্বাচনের ফল ঘোষণা করা হ", ইহাতে বহু লোক সমবেত হইয়া আনন্দধ্বনিতে দিগন্ত কাঁপাইয়া তোলে। শ্রমিক আন্দোলন জগতে নূতন অধ্যায় রচনা করিতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জীবনতরী

সম্প্রতি একখানি জীবনতরী টেমস্ নদীতে ভাসান হইয়াছে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জীবনতরী বলিয়া পরিচিত হইবে। এই মোটর বোটখানি ৬৪ ফুট লম্বা। ৩৭৫ হর্স পাওয়ার যুক্ত দুই খানি ইঞ্জিন দ্বারা ইহা চালিত হইবে; উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের মধ্যে এই জীবনতরী ঘণ্টায় ২০ মাইল অতিক্রম করিতে পারিবে। অনেক সময় বিমানপোতগুলি বিপন্ন হইয়া সাগরে পতিত হয়। সেগুলিকে রক্ষা করার জন্যই এই জীবনতরী নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ডোভারেই ইহাকে রাখা হইবে।

যাত্রা গায়ক মুকুন্দ দাসের বিরাট দান

প্রসিদ্ধ যাত্রাগায়ক শ্রীযুত মুকুন্দ দাস মহাশয়, বরিশাল সহর সংলগ্ন কাশীপুর পল্লীতে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আনন্দময়ী কালী বিগ্রহ, মন্দির এবং মহিলাশ্রমের জন্য গৃহাদি ও তৎসহ ৫০/ মণ ধান্তের জমি রেজেষ্টারীকৃত দলিল দ্বারা শঙ্কর মঠের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের ভগ্নী, মাতা সরোজিনী দেবীর হস্তে প্রদান করিলেন। এই সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক বাইশ হাজার টাকা হইবে। এতদুপলক্ষে গত ১লা অক্টোবর অপরাহ্নে উক্ত আশ্রম বাড়ীতে শ্রীযুত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বরিশাল সহর ও কাশীপুর পল্লীর জনসাধারণের একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল; উদ্বোধন সঙ্গীতান্তে শ্রীযুত মুকুন্দ দাস মহাশয় দানপত্র হস্তে স্বীয় জীবনের দীর্ঘ দিনের সঙ্কল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণন করিয়া জনসাধারণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতঃ মাতা সরোজিনীর হস্তে দানপত্র খানি প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দ দাসের নিঃস্ব অবস্থার মধ্যেও, তাঁহার সৎসঙ্কল্পের বীজ কিরূপ নিহিত ছিল তাহার ইতিহাস প্রদান করিয়া মহিলাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বিশ্বাসী মুকুন্দ বাবুর সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করেন। বি, এম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং আশ্রমাধিনায়িকা সরোজিনী দেবীর যোগ্যতায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া বরিশালের গৌরব স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করেন এবং স্বয়ং যথাসম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া মুকুন্দদাসকে প্রশংসা করেন। অতঃপর মাতা সরোজিনী দেবী এই আশ্রমের গুরু দায়ীত্ব যাঁহারা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, তাঁহাদের দায়ীত্ব স্মরণ করাইয়া বিপুল অর্থের প্রয়োজনীয়তা এবং তজ্জন্য জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

ফুটন্ত চিনির কটাহে পতন

ভূপেশ চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার একজন কংগ্রেস কর্ম্মী ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বর বোমা ষড়যন্ত্র ব্যাপারে তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় ২ বৎসর অন্তরীণ ছিলেন। ভূপেশ মুক্তি লাভের

পর হইতে ইলেক্‌ট্রিক বন্ত্রীটির কার্য্য করিতেছিলেন। পূজার প্রথম দিন ভূমেশ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে রান্নাঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো ফিট করিতেছিলেন। হঠাৎ পা পিছলাইয়া তিনি নীচে ফুটন্ত চিনির এক কটাহে পড়িয়া যান এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যায়। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চতুর্থ দিনে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইয়া যায় এবং রাত্রি প্রায় সাড়ে ৮টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। ভূমেশের পিতা শ্রীযুক্ত পরেশ চরণ চট্টোপাধ্যায় অবসর প্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ইতিপূর্ব্বে দুই পুত্র ও এক কন্যা হারাইয়াছেন এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাঁহার আর্থিক ক্ষতিও যথেষ্ট হইয়াছে। তাঁহার এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। ভগবান তাঁহাকে এই শোক সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করুন।

শিল্প-সাধনায় দেশ ভ্রমণ

প্রসিদ্ধ তরুণ শিল্পী শ্রীমান মনীষীদে'র নাম আজ সুধী সমাজে অজ্ঞাত নহে। ইঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী আজ বাঙ্গলার প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকার শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে। ইঁহার চিত্রাঙ্কনের একটী বিশিষ্ট ধারা দর্শকের মনকে আকৃষ্ট না করিয়াই পারে না; বিশেষতঃ 'খোদাই চিত্র' ও এচিং-এ ইনি যেরূপ পারদর্শীতা লাভ করিতেছেন তাহাতে অচিরে এ বিভাগে তিনি যে নূতন প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও সিংহল প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের অবস্থিত অতীত ও বর্ত্তমানকালের শিল্পাবলীর নিদর্শন গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইতেছেন। এতদিন মনীষীবাবু মাত্র বাঙ্গলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাবলীর চিত্রাঙ্কণ করিয়া দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ মাত্র উহাতেই তিনি তৃপ্ত নহেন—ভারতীয় সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্রে শিল্প চর্চ্চার কিরূপ নিদর্শন আছে এবং সেগুলি আধুনিক শিল্পে কিরূপভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্যই মনীষীবাবুর এই নূতন অভিযান। বর্ত্তমানে তিনি বোম্বাই প্রদেশ ভ্রমণ করিবেন, তথা হইতে মাদ্রাজ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ এবং প্রয়োজন হইলে জাপানে পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন। এই অভিযান সুসম্পাদিত হইতে অন্ততঃ দেড় বৎসর লাগিবে। বাঙ্গলা দেশের তরুণ শিল্প-সাধকের মনে অজানাকে জানিবার জন্য এই যে অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা—ইহা সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। মনীষী বাবুর এই শুভ সঙ্কল্প জয় মণ্ডিত হউক—ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

নর্দ্দমায় শিশু কন্যা

পুরুলিয়ার একটী নর্দ্দমার ভিতর একটি সদ্য প্রসূত শিশু কন্যা পাওয়া গিয়াছে। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শিশুটিকে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া হাসপাতালে লইয়া যান। সেখানে উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষার ফলে শিশুটি ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে।

ডাক্তারের বদান্যতা

বিনা পয়সায় চক্ষু চিকিৎসা

চক্ষুরোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ, অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন্ রায় বরদাকান্ত রায় বাহাদুর বরিশালে গিয়া বিনা পারিশ্রমিকে স্থানীয় শহর

মাত্র ২০০ শত লোকের চক্ষুতে প্রঅস্ত্রপ্রয়োগ করিয়াছেন। বরিশাল ত্যাগ করিবার কালে সহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ষ্টীমার ঘাটে তাঁহাকে বিশেষরূপে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

নিজাম রাজ্যে বাল্যবিবাহ রোধ

আর্য্য-সমাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় রায় বিশ্বেশ্বরনাথ মুথরা নামক হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্য সর্দ্দার বাল্যবিবাহ আইনের অনুরূপ একটি বিল উত্থাপন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। সভায় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের প্রবর্ত্তক রায় হরবিলাস সর্দ্দাকে তাঁহার সাহসিকতা এবং দূরদৃষ্টির জন্য অভিনন্দিত করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আইনের মধ্যে দেশের যথেষ্ট মঙ্গলের সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাতে নিজাম গবর্ণমেণ্ট হায়দ্রাবাদ রাজ্যে এইরূপ একটি আইন পাশ হইবার পক্ষে সুবিধা করিয়া দেন, তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সভায় আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

স্বামী স্ত্রীর অত্যাশ্চর্য্য মৃত্যু

যশোহর গওপাশা নিবাসী শ্রীগুরুচরণ বাউড়ির স্ত্রী চার দিনের জ্বরে মারা যায় যখন দাহকারীরা তাহার শেষকৃত্য সমাপ্ত করিয়া বাড়ীতে ফেরে তখন দেখে যে, গুরুচরণের শ্বাস উপস্থিত। ইহার পনের মিনিটের মধ্যেই তাহারও মৃত্যু হয়। তখন সকলে তাহার স্ত্রীর চিতার পার্শ্বেই তাহাকে দাহ করে। গুরুচরণ নীরোগ ছিল।

তৈলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ

"বৃটিশ কেমিষ্ট" নামক তৈলবাহী একখানি জাহাজ স্কটল্যাণ্ডের গ্রাঞ্জমাউথে নোঙ্গর করিয়াছিল। পারস্য উপসাগর হইতে ১০০০০ টন অপরিষ্কৃত তৈল (crude) লইয়া উক্ত জাহাজ তথায় গিয়াছিল। অকস্মাৎ এই জাহাজের তেলের ট্যাঙ্কের মধ্যে বিস্ফোরণ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে ভীষণ শব্দ করিয়া এই ট্যাঙ্ক প্রায় ৬০ ফুট ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের এক অংশ উড়িয়া যায়।

এই অবস্থায় ছয় জন খালাসী জলে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণরক্ষা করে। পরে ইহাদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই জনের শরীর গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়াছে। এমন ভীষণ বিস্ফোরণ হইয়াছিল যে, তাহাতে সমগ্র সহর প্রকম্পিত হইয়াছিল।

চট্টগ্রামে মোটর ডাকাতি

চট্টগ্রাম সহরের প্রায় ২৫ মাইল উত্তরে আসাম বেঙ্গল রেলের কুমিরা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাঁশবেড়িয়া গ্রাম হইতে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে প্রায় ২০।২৫ জন ডাকাত গভীর রাত্রিতে মোটর যোগে উক্ত গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুত কামিনী কুমার দত্তের বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং সদর দরজা খুলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া বলপূর্ব্বক দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ডাকাতগণ নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, তাই কেহ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে সাহস করে নাই। ডাকাতেরা বাড়ীর সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য লইয়া যায়। শুনা যায় যে স্ত্রীলোকদিগকে নানাভাবে অত্যাচার করিয়া তাহাদের অঙ্গ

হইতে অলঙ্কার কাড়িয়া লয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০০৲ হইবে। এই ব্যাপারে চট্টগ্রামে বেশ এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

সর্দ্দাবিল ইস্‌লাম বিরুদ্ধ নহে

খাজা হাসান নিজামী বলেন—"মোল্লাদের হস্ত হইতে মুক্ত হও।" তিনি আরও বলেন— দেশের পক্ষে বিশেষতঃ মুসলমানদের পক্ষে সর্দ্দাবিল খুবই হিতকর। এই বিল ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে না। বাল্য বিবাহের দরুণ, লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই আইন দ্বারা অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। অধিকন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কলহ ও বিধবাদের ক্রমবর্দ্ধিত সংখ্যাও এই আইন দ্বারা হ্রাস পাইবে। উপসংহারে তিনি বলেন—"মোল্লাগণ এবং গোঁড়া পুরোহিতগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্তই এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ধর্ম্মের নিয়ম কানুন মোটেই জানেন না।"

ভারতবাসীর পত্র প্রকাশে

"টাইমস্‌" পত্রের অসম্মতি

ইতিপূর্ব্বে "টাইমস্‌" পত্র কয়েকবার ভারতবাসীর লিখিত জরুরী পত্রাদি প্রকাশে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এবার পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর এক পত্র "টাইমসে" প্রেরিত হইয়াছিল। স্থানাভাবের দোহাই দিয়া সম্পাদক উক্ত পত্র প্রকাশ করেন নাই। পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীর দাবীর কথা ইংলণ্ডবাসীকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্তই পণ্ডিত কুঞ্জরু লণ্ডনে আসিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেকের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। "টাইমস্‌" পত্রের মারফতে অতি সংক্ষেপে বিষয়টি তিনি সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই।

ট্যাক্সির মধ্যে আত্মহত্যা

একটী সুন্দরী এবং সুবেশী ফরাসী তরুণী মার্কসায়ারে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে একটি ঠিকানা লেখা কার্ড দেখাইয়া অনেক ট্যাক্সি চালককে উক্ত ঠিকানায় লইয়া যাইতে বলে; সুন্দরী তথায় লুইস কুবার্ট নামক এক ব্যক্তির সহিত মিলিত হয় এবং তাহার সহিত উত্তেজিত ভাবে কথা বলিতে থাকে। অতঃপর উক্ত ফরাসী স্ত্রী পুরুষ দুইজনে একটী ট্যাক্সিতে উঠে এবং লণ্ডন অভিমুখে চলিতে থাকে। অকস্মাৎ গাড়ীতে গুলির শব্দ হয় এবং ট্যাক্সি থামিলে দেখা যায় যে; স্ত্রী পুরুষ দুই জনেই গুলিবিদ্ধ হইয়া মারা পড়িয়াছে। সুন্দরীর হাতে ছোট্ট একটী পিস্তল ছিল। তাহার পরিচয় কিছু জানা যায় নাই।

জলে ডুবিয়া দুইটী শিশুর মৃত্যু

বিজয়া দশমীর পরদিন ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার কালীবাড়ী পুষ্করিণীতে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। উকীল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনের তিনটি ছেলে মেয়ে স্নান করিতে যাইয়া ডুবিয়া যায়। কেহই সাঁতার জানিত না। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু বাকী দুইজনকে পাওয়া যায় না। অপরাহ্নে জাল দ্বারা ইহাদের মৃতদেহ উঠান হয়।

গৃহ পতনে ভীষণ দুর্ঘটনা

বোম্বাইয়ের ঠাকুর দ্বার রোডে অবস্থিত একখানি ৪ তল গৃহ অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হয়—ফলে পাঁচজন নিহত এবং প্রায় ২০জন আহত হইয়াছে। নিহতদিগের মধ্যে গৃহস্বামীর ৩৮ বৎসর বয়স্কা কন্যাও ছিলেন। গৃহস্বামী একজন পার্শী ভদ্র-লোক নাম মেরওয়ানজী ফ্রামজী কুমানা। তিনি এবং তাঁহার পত্নী প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ বাড়ীটার সম্মুখভাগের চারিতলই হঠাৎ তাসের বাড়ীর মত ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল এরূপ ধূলি উড়িতে থাকে যে কেহই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। বাড়ী পতনকালে একজন মুচি উহার নীচে বসিয়া জুতা সারিতেছিল; এমন সময় একজন পথিক পতন শব্দ শুনিয়া পলাইতে বলে। কিন্তু সে উঠিতে না উঠিতে ইট পাটকেল তাহার পাশে আসিয়া পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় সে সামান্য আহত হইলেও বাঁচিয়া গিয়াছে। দুইজন আগন্তুক ঐ মুহূর্ত্তে বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিল কিন্তু তাহারা দরজায় পা দিতে না দিতেই একটি কড়ি ও ইটের চাঁই তাহাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে। যদিও রাস্তায় তখন অনেকে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু ধূলার জন্য কেহই সেদিন ১৫ মিনিটের মধ্যে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ধূলি হ্রাস হইলে সকলেই বাড়ীর মধ্যে অগ্রসর হয়। ইতিমধ্যে ফায়ার ব্রিগেড ও এম্বুলেন্সের লোকও আসিয়া পড়ে। তাহাদিগের সাহায্যে রাবিসের মধ্য হইতে ৫ জন লোককে অল্প আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দেউড়ীর ভিতর হইতে আহতদের ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। বাড়ীর বাসিন্দাদিগের আত্মীয় স্বজন উদ্বেগের সহিত প্রত্যেক মৃতদেহগুলি সনাক্ত করিতেছিলেন। বাড়ীটার পশ্চিম দিকে যাহারা ছিল তাহাদের কেহই আহত হয় নাই।

প্রকাশ যে, ঐ বাড়ীটা এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহগুলি ন্যূনাধিক এক শত বৎসরের পুরাতন। বাড়ীটার উভয় পাশের গৃহ দুইটা হইতে লোক সরান হইয়াছে; কলিকাতাতেও এরূপ অনেক বাড়ী আছে যাহা কর্পোরেশন হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করার দরকার।

ধর্ষিতা বালিকার সৎপাত্রে বিবাহ

মাণিকগঞ্জের শিবালয় থানার অধীন জাফর গঞ্জ নিবাসী ডাক্তার কামিনী ঘোষ মহাশয়ের একাদশ বর্ষীয়া ভগ্নী একদা প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে প্রত্যাগমন কালে প্রতিবেশী অন্য ব্যক্তির এক মুসলমান চাকর সেখ জোনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ধর্ষিতা হয়। বালিকা রক্তাক্ত বস্ত্রে জ্ঞানহীন হইয়া প্রায় ৩ মাইল দৌড়িয়া যাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে; পরে অভিভাবকগণ অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া আসেন। দায়রার বিচারে আসামীর ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। বড়ই সুখের বিষয় যে মোকদ্দমা বিচারাধীন অবস্থায়ই বোয়ালজান নিবাসী জনৈক সহৃদয় সৎসাহসী যুবক উক্ত বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন।

মালদহে সার্ব্বজনীন টিকার ব্যবস্থা

এ বৎসর বসন্ত রোগ সংক্রামক হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার জেলাবোর্ডগুলিকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সরকার বলিতেছেন বিশেষ টিকা লওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং

সরকার এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। মালদহ জিলাবোর্ড সার্ব্বজনীন টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ফল ভাল দেখাইয়াছেন।

ওয়াটার ওয়েজ বোর্ড

বাঙ্গলায় ওয়াটার ওয়েজ বোর্ড গঠন সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের এক সমিতি হইয়াছে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ হপকিন্স এই সমিতির সভাপতি হইবেন, এরূপ প্রকাশ। যুক্ত প্রদেশের সরকারী সেঁচ বিভাগের সেক্রেটারী সার বি, ডি, ও ভালিকাকেও নাকি সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। বিশেষজ্ঞ সমিতির সভা বড়দিনের পর বসিবে।

কবিরাজের বিপদ

শ্রীযুক্ত রমনীমোহন বিদ্যাভূষণ লেহড়াগঞ্জ বাজারের কবিরাজ। ইনি রাজবাড়ী ও নাটোরে তাঁহার ঔষধালয়ের শাখা বিস্তার করিয়াছেন। মাণিকগঞ্জের আবকারী দারোগা কিছুদিন হইল তাহার লেহড়াগঞ্জ ঔষধালয়ে বিনা পাশে কিছু তাড় পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ফৌজদারীতে দিয়াছেন, মোকদ্দমা এখনও বিচাধীন।

ডুবুরীর সৌভাগ্য

পারস্য উপসাগরের মধ্যে মুক্তার সন্ধান করিয়া বেড়াইবার সময় কয়েকজন ডুবুরী কর্ত্তৃক একটী মূল্যবান মুক্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মূল্য পাঁচ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫ হাজার টাকার কম হইবে না। কেহ কেহ বলেন যে, বিগত ১০০ বৎসরের মধ্যে পারস্য উপসাগর হইতে এরূপ মূল্যবান মুক্তা আর আবিষ্কৃত হয় নাই। মুক্তা আবিষ্কারের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক ডুবুরী যখন জানিতে পারে যে, তাহার ভাগ্যে প্রচুর অর্থ আসিবে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়; শেষ পর্য্যন্ত ঐ লোকটী পাগল হইয়া গিয়াছে।

সাংবাদিকের মৃত্যু

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বেহালাস্থ ভবনে পক্ষাঘাত রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি বহু সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও কিছুকাল ষ্টেটসম্যানের রিপোর্টার ছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, ৩পুত্র ও ২কন্যা বর্ত্তমান। বঙ্গে মাতরং যখন বাহির হয় তখন ইনি তাহার প্রধান সাংবাদিক ছিলেন।

বিমানপোত সংঘর্ষ

দুইখানি সামরিক বিমানপোত ইটালী ও যুগোস্লাভিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে কুয়াসার মধ্যে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ ঘটায় মাটীতে পড়িয়া যায়। পোত দুইটীর ৪ জন আরোহী তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সমর বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন।

বিধবার শোচনীয় মৃত্যু

হুগলী সহরের তাঁতিপাড়া অঞ্চলের কোনও বিধবা ছাদের উপর বসিয়া রৌদ্র উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময় এক প্রকাণ্ড বানর আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ধাক্কা দেয়। ইহাতে তিনি পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হন। ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টই এই কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ ক্লাটার বাক গঞ্জের তার্পিণের কারখানাটি অপরের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি একটি লিমিটেড্ কোম্পানী এই কারখানার কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। অবশ্য এখনও ইহাতে সরকার পক্ষের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। জাল্লোতে যে তার্পিণের কারখানা আছে তাহারও প্রায় এই অবস্থাই দেখিতে পাই। ইহার কিছুটা সরকারী এবং বাকীটুকু বে-সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। এই দুই কারখানা হইতে যে প্রচুর লাভ হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাঞ্জাবের এবং যুক্ত প্রদেশের জঙ্গলের মধ্যে এখন ও অনেক চীর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি এখন সরকারী ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বন বিভাগের কর্ত্তারাই এই সমস্ত চীর গাছ হইতে রজন (আটা) সংগ্রহ করিয়া থাকেন। রজন সংগ্রহ করার প্রণালী অতি সহজ—অনেকটা আমাদের দেশের খেজুরের রস সংগ্রহ করার অনুরূপ। গাছের কাণ্ডের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া রাখিলে সেই গর্ত্ত দিয়া গাঢ় রস অথবা আটা বাহির হয়। এই আটা প্রকৃত পক্ষে রজন ছাড়া আর কিছুই নহে।

বৎসরের সকল সময়ে কিন্তু রজন বাহির হয় না। যে সময়ে তাহা বাহির হয়, সেই সময়কে ইংরাজীতে tapping season নাম দেওয়া হইয়াছে। সেই সময় আসিবার প্রাক্কালে গাছের কাণ্ডের মধ্যে ঠিক শিকড়ের কাছাকাছি গর্ত্ত কাটিয়া এই গর্ত্তের নীচের দিকে একটি পাত্র বসাইয়া রাখিতে হয়। তার পর মধ্যে মধ্যে গর্ত্তের মুখের ছাল আর ও বেশী করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। এই কাটা হইতে আটা বাহির হইয়া আসিয়া সংলগ্ন পাত্রের মধ্যে জমা হয়। এক বৎসরের জন্য একটি গর্ত্তই যথেষ্ট। ইহার পরবর্ত্তী বর্ষে এই গর্ত্তের উপরে আর একটি গর্ত্ত ঠিক সেই লাইনে কাটিয়া দিতে হয়। এই ভাবে গর্ত্ত কাটিতে কাটিতে শাখা প্রশাখার নিম্ন পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। অতঃপর এই লাইন পরিত্যাগ করিয়া ঠিক শিকড়ের নিকট হইতে অপর আর একটি লাইন ধরিয়া প্রতি বৎসর পর পর গর্ত্ত কাটিতে হয়। এই সমস্ত গর্ত্ত হইতেই আটা বাহির হইয়া থাকে। এই ভাবে যখন দেখা যায় যে, গাছের প্রায় সর্ব্বত্র গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে তখন সমগ্র গাছটি কাটিয়া ফেলা হয় এবং তাহার কাঠ সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগান হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গাছের আটা এবং কাঠ এই উভয় সামগ্রী হইতেই তার্পিণ তেল প্রস্তুত করা চলে।

গাছের কাণ্ডের সহিত সংলগ্ন পাত্র হইতে আটা অথবা রজন সংগ্রহ করিয়া দিনের মধ্যে

ভর্ত্তি করা হয়। পরে এই সমস্ত টিন কারখানা গুলিতে প্রেরণ করা হয়। কি প্রকারে রজন চুয়াইয়া তার্পিণ তৈয়ার করিতে হয় তাহার প্রণালী মোটামুটি ইতি পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। তার্পিন তেল বাহির করিয়া লইলেই রজনের সমস্ত অংশ নিঃশেষ হয় না। যাহা অবশিষ্ট, তাহাকেও রজন বলিয়া অভিহিত করা হয়। শিল্প বাণিজ্যে এই রজন ও একটি মূল্যবান সামগ্রী। বিশেষ ভাবে রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের জন্য ইহা একরূপ অপরিহার্য্য বলিলেই চলে।

একবার মাত্র রজন চুয়াইয়া যে তার্পিন তেল পাওয়া যায় তাহা অনেকটা অপরিষ্কৃত থাকে। তাই ইহাকে আর ও কয়েকবার চুয়াইয়া উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কৃত তার্পিন প্রস্তুত করা হয়। পরিষ্কৃত তার্পিনের মধ্যেও তারতম্য আছে। সেই জন্য গুণানুসারে ১নং, ২নং ও ৩নং তার্পিন আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় রজন হইতে চুয়াইয়া যে তার্পিন পাওয়া যায়; তাহার অধিকাংশই ১নং তার্পিনে পরিণত হয়।

১৯০০—১৯০১ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ১৬০০ গ্যালন তার্পিন প্রস্তুত হইত। ১৯১৬-১৭ সালে ইহার পরিমাণ ১২০০০০ গ্যালনে গিয়া দাঁড়ায়। ইহার পর ভারতীয় তার্পিনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সুযোগ সুবিধার তুলনায় এই পরিমাণ কিছুতেই সন্তোষ জনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

১৯২৪—২৫	... ...	২১২৩৯২ গ্যালন
১৯২৫—২৬	... ...	২১৬৫২৬ "
১৯২৬—২৭	... ...	২৮০৭৪৩ "

তার্পিন ভারতের কারখানা গুলিতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ যে পরিমাণ তার্পিন আমদানী ও রপ্তানী করিয়াছে তাহার বিবরণ গ্যালন হিসাবে নিম্নে দেওয়া হইল:—

বৎসর		আমদানী	রপ্তানী
১৯২৪-২৫	...	৩৮১৫৫	৭৬০৫৭
১৯২৫-২৬	...	৩৮৮৩৮	১১৪১৬
১৯২৬-২৭	...	৯২১৩১	১৫৩৬৬

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে ১৯২৬ ২৭ সালে আমদানীর পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়াছে। এই বৎসরে নরওয়ে ও সুইডেন হইতে কাষ্ঠ হইতে চুয়ান তার্পিন প্রচুর পরিমাণে এদেশে আমদানী হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে তার্পিন আমদানী হইয়াছিল তাহার প্রায় সমস্তই আমেরিকা সরবরাহ করিয়াছিল।

হোয়াইট স্পিরিট :—thinners অর্থাৎ ঘন রং কে তরল করিয়া দেওয়ার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে তার্পিনের পরেই "হোয়াইট্ স্পিরিট্‌কে" স্থান দিতে হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধুনা রং ও বার্ণিশের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই অনুপাতে thinners অর্থাৎ তরল কারী পদার্থের ও প্রয়োজন হইতেছে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে মোটামুটি এই পৃথিবীতে তার্পিন তেল প্রস্তুতের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছে না—ইহার পরিমাণ বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় এক অবস্থায়ই রহিয়াছে। ইহার ফলে তার্পিনের স্থলে অপরাপর তরলকারী পদার্থের প্রয়োজন হইতেছে। হোয়াইট্ স্পিরিটের ব্যবহার তাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। পেট্রোলিয়াম হইতে এই স্পিরিট প্রস্তুত হয়। ইতি পূর্ব্বে ইহাকে Turpentine Substitute বলিত। সম্প্রতি ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন সর্ব্বত্র এই সামগ্রী White Spirit নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

Turpentine Substitute—এই নাম দেখিয়া অনেকে মনে করিত যে ইহার নিজস্ব কোন গুণ নাই ?—এই সামগ্রী কেবল তার্পিনের ভেজাল রূপে ব্যবহার করারই যোগ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ধারণা একান্ত ভ্রমাত্মক। White Spirit এর নিজস্ব গুণ মোটেই কম নহে। তথাপি এই স্পিরিট সম্পর্কে সকল শ্রেণীর প্রস্তুত কারীর বিশ্বাস একরূপ নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও White Spiritকে তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। তাই অল্প পরিমাণে তার্পিন তেল মিশাইয়া White Spiritকে গন্ধ যুক্ত করা হয়। বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষে এই জিনিষকেই mineral turpentine নাম দিয়া বিক্রয় করা হয়। এরূপ নাম দেওয়ার কোন ও সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, White Spirit মোটেই তার্পিন তেল নহে—ইহার গুণাবলী তার্পিণের গুণাবলী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পেট্রোল এবং কেরোসিনের সহিত White Spiritএর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তবে পেট্রোল যত সহজে এবং যতটা শীঘ্র উড়িয়া যায়, White Spirit তত শীঘ্র উড়িয়া যায় না। কেরোসিন হইতে কিন্তু অধিকতর শীঘ্র এ spirit বাতাসে উড়িয়া যায়। ইহাকে সাধারণতঃ 15°C—20°C পর্য্যন্ত গরম করা চলে। প্রকৃত পক্ষে তরল কেরোসিন পুনরায় চুয়াইয়া কিয়ৎ পরিমাণ White spirit প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পেট্রোলিয়াম পরিষ্কৃত করিয়াই প্রস্তুত করা হয়। প্রথমতঃ তার্পিন তেলের অভাবে যাহাতে রং প্রস্তুতের কার্য্য বাধা প্রাপ্ত না হয় তজ্জন্যই এই white spirit আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শিল্পীরা ইহার গুণাবলী জানিয়া লইয়াছেন। অধুনা এই spirit প্রায় সর্ব্বত্রই রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। অধিকন্তু তার্পিনের সহিত মিশ্রিত হইলে ইহা বার্ণিশের মধ্যে ও লাগান যায়।

তার্পিন ও white spirit এর মধ্যে নানা বিষয়েই যথেষ্ট প্রভেদ আছে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে white spirit এত শীঘ্র বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় যে, তদ্বারা কাজের অনেক অসুবিধা হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই শ্রেণীর white spirit ভারতবর্ষে ব্যবহার করার অযোগ্য।

তার্পিনের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়,—white spiritএর একটি বিশেষ গুণ আছে। ইহাকে জমা করিয়া রাখিলে কোনই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। তার পর white spirit বাষ্পাকারে উড়িয়া গেলে কিছুই পড়িয়া থাকে না। ইহার মূল্য ও তার্পিন অপেক্ষা ঢের সস্তা। তবে তরল করিবার জন্য যে দ্রাবক শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে white spiritকে তার্পিন তেল হইতে নিকৃষ্ট না বলিয়া উপায় নাই। সেইজন্যই রং প্রস্তুতের পক্ষে white spirit বিশেষ উপযোগী হইলেও শক্ত আটা জাতীয় বার্ণিশের পক্ষে ইহা তেমন সুবিধা জনক নহে। তবে তার্পিন তেলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় white spirit প্রচুর পরিমাণে বার্ণিশ প্রস্তুতেও ব্যবহৃত হয়।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, কি পরিমাণে white spirit তার্পিনের সঙ্গে মিশ্রিত করা যাইতে পারে। ধরা বাঁধা হিসাবে ইহার অনুপাত নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। কারণ white spiritএর ও আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে এবং বার্ণিশ প্রস্তুতেরও অনেক প্রণালী আছে। সেই অনুসারে white spirit মিশাইবার ব্যবস্থা

করা দরকার ; তবে মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে, সমান অনুপাতে তার্পিন ও white spirit মিশ্রিত করা চলে। এক পাউণ্ড তার্পিনের সহিত এক পাউণ্ড spirit মিশাইলেও সাধারণতঃ সেই spirit বার্ণিশে ব্যবহার করার উপযোগী থাকে।

কেবল পেট্রোলিয়াম নয়, অন্যান্য অপরিস্কৃত (crude) তেল হইতেও white spirit প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর spirit আবার সকলগুলি সমান হয় না। ইহাদের গুণাবলীর মধ্যে তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। রংকে তরল করিবার ক্ষমতা সকল white spiritএর সমান থাকে না। ব্রহ্মদেশে এবং পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে সকল crude oil (অপরিস্কৃত তেল) পাওয়া যায়, তাহা হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদেয় white spirit প্রস্তুত হইতে পারে। এখানেও আবার সেই পুরাতন কথাই মনে পড়ে। ভারতবাসী শিল্প ও ব্যবসায়ীরা তো এই সুযোগে white spirit প্রস্তুতের কাজে তেমনভাবে অগ্রসর হইতেছেন না। যাহা কিছু হইতেছে তাহার সমস্তই বিদেশী মূলধনের সাহায্যে এবং বিদেশী বণিকের চেষ্টায়। ব্রহ্মদেশে যে সকল বড় বড় তেলের কোম্পানী আছে তাহারাই তথায় white spirit প্রস্তুত করিতেছেন। আর ভারতবর্ষে যে কিছু প্রস্তুত হয় তাহা রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতকারীদের দ্বারাই। পৃথকভাবে white spirit প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী করিয়া ভারতবাসীর জন্য নূতন অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা করে কে? সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর সমর্থ ব্যক্তিগণের হইবে কি? ভারতবর্ষে আজকাল যে পরিমাণ white spirit ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই ইউরোপ কিম্বা পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

অন্যান্য দ্রাবক পদার্থ :—রং ও বার্ণিশের মধ্যে দ্রাবক পদার্থরূপে প্রধানতঃ তার্পিন ও white spirit এই দুই জিনিষই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাজারে আরও কয়েকটি দ্রাবক (solvents) পদার্থের প্রচলন আছে। সেগুলিও কোন না কোন কাজে অল্প বিস্তর ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

Alcohol দ্রাবক দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। ইহা denatured spiritরূপে বার্ণিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর বার্ণিশ মোটের উপর রজন ও spirit এর সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নহে। বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া দ্রাবক পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং রজনের একটি পাতলা সর পড়ে এই শ্রেণীর বার্ণিশের মধ্যে French Polish, lacquer এবং white hard বার্ণিশই প্রধান।

Coal tar (আলকাতরা) হইতে চুয়াইয়া এক প্রকার spirit তৈয়ারী হয়। তাহা পিচের বার্ণিশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রং ও বার্ণিশে যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে তরল করিয়া দেওয়ার শক্তি এই প্রকার Coal tar spirit এর নিতান্ত কম নহে। তাই কোন কোন সময়ে রং প্রস্তুতের কার্য্যে এই পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে ইহার একটা উগ্র বিশ্রী গন্ধ আছে। তাহা সহ্য করা বড়ই কঠিন। এই জন্যই এই পদার্থটি বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা হয় না। কেবল পিচের solution প্রস্তুতের কাজেই ব্যাপকভাবে Coal tar distillate ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতীয় শিল্পীরা এই পর্য্যায়ের দ্রাবক (solvents) প্রস্তুতে তত্টা অগ্রসর নহেন। ফলে খুব অল্প পরিমাণেই এই শ্রেণীর দ্রাবক পদার্থ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ বিনা সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

[২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

BERBERIS ARISTATA—রসুত

(এস-৭৭) যুক্ত প্রদেশের দইওয়ালা (Doiwala) নামক স্থানের কোনও বড় কারবারী জানাইয়াছেন যে, যাহারা Ber beris Aristata ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সহিত পরিচিত হওয়া তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন। দেশীয় ভাষায় Berberis Aristata কে রসুত, দারহলদি, বড়কি হলুদ বলে।

CANNABIS INDIA—গাঁজা

(এস-৭৮) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত বার্মুলা (Baramulla) হইতে কোন এক ব্যক্তি জানাইয়াছেন,—যাহারা Cannabis Indica (গাঁজা)র ব্যবসা করে কিম্বা বিদেশে এই জিনিষ চালান দেয় তাহাদের সন্ধান জানিতে পারিলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন।

[৩রা অক্টোবর তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে সংগৃহীত]

BAUXITE, CHROME ORE ETE

(এস-৭৯) কলিকাতার কোনও বড় ব্যবসায়ী কার্য্য বসাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে যাহারা Bauxite, Chrome Ore এবং Tantalum Ore সরবরাহ করেন তাহাদের সন্ধান জানা আবশ্যক।

তেঁতুল—TAMARIND

(এস-৮০) উড়িষ্যার ঢেঁকাল রাজ্য হইতে কোনও ব্যবসায়ী, তেঁতুল ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

হাতীর দাঁত (IVORY TUSKS)

(এস-৮১) ন্যাস্বাসায়ার হইতে কোনও পত্রপ্রেরক,ভারতের হাতীর দাঁত (Ivory Tusks) সরবাহকারীদের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

[১৯২৯ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

COIR MATS AND MATTINGS

(এস ৮২) কলিকাতার কোনও বড় ফার্ম, নারিকেলের ছোবড়ার দ্বারা প্রস্তুত মাদুর প্রভৃতি ক্রয়কারীদের অনুসন্ধান করিয়াছেন।

PARCHMENT KUPEES OR BOTTLE

(এস ৮৩) পার্চমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত কুপি অথবা বোতল (নূতন এবং পুরাতন) যাহারা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকেন তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমেরিকার কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত সান্ ফ্রান্সিস্কো হইতে কোনও কারবারী ফার্ম পত্র দিয়াছেন।

[১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

SEPIA AND CUTTLE FISH MFMBRANES

(এস ৮৯) দক্ষিণ ভারতের কালিকট হইতে কোনও ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন যে, sepia ক্রয়কারীদের সন্ধান জানা তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

Cuttle fish মানে শামুক জাতীয় এক প্রকার মৎস্য। ইহার ছুরিকাবৎ একাধি বিশিষ্ট জিহ্বাকার কৌষিক দেহে এক প্রকার কাল রঙের পদার্থ থাকে। ইহা অনেকটা কালির মত। এই পদার্থকেই sepia বলে। কোনও কারণে উত্যক্ত হইলে Cattle fish এই মসি প্রক্ষেপ দ্বারা জল অস্বচ্ছ করিয়া আপনি লুক্কায়িত হয়।

CORUNDUM

(এস-৯০) আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত মিচিগান হইতে লিখিয়াছেন যে, যাহারা স্বভাবজ Corundum সরবরাহ করিতে পারেন তাহাদের সন্ধান জানা আবশ্যক।

[২৯ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

হাতীর দাঁত

(এস-৮৫) ভারতবর্ষ হইতে যাহারা হাতীর দাঁত রপ্তানী করেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া ন্যাস্বাসায়ার হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

[১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

APRICOT KERNELS

(এস- ৮৬) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত ডেরা ইস্মাইল খান হইতে কোনও বড় ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন—Apricot (জ্যাট পক্ব ফল বিশেষ) ফলের শাঁস ক্রয় কারীদের সহিত পরিচিত হওয়া তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

MANGANESE ORE

(এস—৮৭) অসংস্কৃত অবস্থায় ম্যাঙ্গানিজ নামক ধাতু যাহারা ক্রয় করেন তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য নাগপুর হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

হরিতকী

(এস—৮৮) কলিকাতার কোন ও বড় ফার্ম্ম হরিতকি (১নং জিঙ্গিলী) সরবরাহ কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

[১৯২৯ সালের ২১শে নবেম্বর তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

GYPSUM AND PLASTER OF PARIS

(এস—৯৭) Gypsum এবং Plaster of Paris এই জিনিষ গুলি যাহারা ক্রয় করেন তাহাদের সন্ধান জানিবার জন্য রেঙ্গুণ হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

কাঁচা চামড়া

(এস—৯৮) Palma de Mallorca (Majorca) হইতে কোনও ব্যক্তি,কাঁচা চামড়া সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

ভারতের ব্যাঙ্ক প্রসার।

[বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটির অন্যতম সদস্য ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের অবৈতনিক সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা, এম, এ ; পি-এচ,ডি মহাশয়ের সহিত লেখকের ব্যাঙ্ক বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করা হইল।—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

প্রঃ—আপনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির কখনো ঠিক সমাধান হবে না, যতদিন না এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়, আর হাজার হাজার ব্যাঙ্ক দেশটাকে ছেয়ে ফেলে। প্রথমটার তাৎপর্য্য না হয় মেনে নিলাম কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উপর আপনি এত জোর দিচ্ছেন কেন ?

উঃ—ওটাই ত দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড। ওকে আশ্রয় করেই যে দেশের কৃষি-বাণিজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠবে। দেশমাত্রেরই জীবনী-শক্তির কেন্দ্র হচ্ছে তার কৃষি এবং শিল্প। একটা দেশের লোক কি খাবে, কি পরবে তা নির্ভর করে তার

ধনদৌলতের উপর,—আর 'ধনদৌলত' কথাটা হচ্ছে দেশের কৃষি এবং বিবিধ শিল্পজাত যে পণ্য তারই নামান্তর। বিদেশী আমদানি মাল আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু সেটাও ত অমনি আসে না। তার জন্তও আমরা একেবারে সমান দাম করে আমাদের দেশী মাল রপ্তানি করে থাকি। তাহ'লে একথা নিঃসন্দেহ মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, একটা দেশের কৃষিশিল্পই সেই দেশবাসীর জীবন যাত্রার ধারা নির্দ্দেশ করে দেয়। এখন কথা হচ্ছে এই যে, বর্ত্তমান জগতে এই কৃষি শিল্প যা বল সব কিছুর অবস্থা নির্ভর করে দেশের আর্থিক বলের উপর। সে জন্তই ত হাজার হাজার ব্যাঙ্ক চাই।

প্রঃ—আপনার কথায় কেমন একটু খট্‌কা লাগ্‌ছে। আমি ত দেখুন চাষবাসের ধারও ধারি নে, আর ফ্যাক্টরী চালানো ত আমার পক্ষে স্বপ্ন দেখা বল্লেই চলে, তবু ত মনে হয় 'বেশ আছি'।

উঃ—কিন্তু তবু ওই বেশ থাকাটা দেশের কৃষি শিল্পের অবস্থা বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ নয় জেনো।

প্রঃ—সেটা না হয় বুঝলাম—আমি একটা ব্যবসা-সঙ্ঘের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আছি বলে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চাকুরী যাঁরা কচ্ছেন, তাঁদের বেলায় আপনার যুক্তি খাটে কি করে?

উঃ—কেন? সেখানেই বা গোল বাধবে কেন? গভর্ণমেণ্ট যে টাকা খরচ করে সেটাও ত ভূঁইফোড় হয়ে আসে না। সেটাও আদায় করে নিতে হয় এই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য থেকেই। গভর্ণমেণ্টের আয়ের ব্যবস্থাগুলি একটু বিশ্লেষণ করলেই তা বুঝতে আর মুস্কিল হবে না। শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে দেখ্‌বে যে দেশের সবারই খোরপোষ যোগাচ্ছে ওই কৃষি, শিল্প আর বাণিজ্য।

প্রঃ—আচ্ছা তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু কৃষি শিল্পবাণিজ্য বল্‌তে আপনি যেন প্রথম দু'টার ওপরেই একটু বেশী জোর দিচ্ছেন মনে হয়।

উঃ—বাণিজ্যটা এমনই যে পরে আসে। বাণিজ্য হবে কাকে নিয়ে? আগে কৃষি এবং শিল্প পণ্য উৎপাদন করবে তবেই না বাণিজ্য হবে?

প্রঃ—তাও বটে। কিন্তু দেশের কৃষি শিল্প তার অর্থবলের উপর নির্ভর করে একথা আপনি বলছেন কেন? এ সবের জন্ত মাটী চাই—মাল মসলা চাই—মজুর চাই। শুধু টাকার জোরেই ত কৃষিশিল্প গড়ে তোলা যায় না।

উঃ— তা ঠিক, নির্ভরশীলতার দিক্ থেকেই যাচাই করতে গেলে দেখবে যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতি সব চাইতে বেশী নির্ভর করছে ওই টাকার ওপরেই—যাকে তোমরা বল "মূলধন সমস্যা"। আমাদের দেশের মাটীর স্বাভাবিক উর্ব্বরতা অনেক স্থলেই হ্রাস পেয়েছে। এর যথেষ্ট উন্নতি করবার দরকারও হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু তার জন্ত যা কিছু ব্যবস্থা তুমি করতে যাবে, দেখবে তা এই টাকা-কড়িরই ব্যাপার। জল-সেচন বল, আর আধুনিক কৃষিযন্ত্র ব্যবহারই বল, সবই নির্ভর করছে ওই টাকাপয়সার ওপর। আর মজুর সম্বন্ধে দেখবে যে,এখন দেশের মজুর-সমস্যার চাইতেও বড় সমস্যা হচ্ছে মূলধন। মূলধনের যোগাড় হলেও কল কারখানা গ'ড়ে তুললে মজুরের অভাব থাকবে বলে মনে হয় না। তাই ত বলছিলাম যে,দেশের কৃষি কিংবা শিল্পের অবস্থা এখন নির্ভর করছে তার আর্থিক বলের ওপর।

প্রঃ—কিন্তু সে জন্ত অনেক ব্যাঙ্ক চাই কেন?

উঃ—এরাই ত সেই অর্থ-বলকে কেন্দ্রীভূত করে তাকে কার্য্যকরী করে তুলবে।

প্রঃ—কেন; এরা ত আর নূতন করে টাকা তৈরী

করে না? আপনার, আমার, আর পাঁচজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েই ত এরা কারবার করে। এ ত ঠিক হাতফেরানো গোছেরই কাজ হ'ল।

উঃ—ঠিক তা নয়, এ থেকে যে একটা বিশেষ শক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যাপারটা একটা প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছি। অল্পতোয়া নির্ঝরিণীর পৃথক শক্তি সামান্যই। কিন্তু তারই কয়েকটা মিলে যখন একটা বিস্তীর্ণ বেগবতী নদীর সৃষ্টি হয়, তখন তার একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে, শুধু বিস্তৃতির দিক্ থেকেই নয়, শক্তির দিক্ দিয়েও,—তাতে বড় বড় ষ্টীমার জাহাজ পর্য্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দেখেছ ত?

প্রঃ—নদীর বেলায় সেটা বোঝা যায় বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক কেমন করে এমনি স্বতন্ত্র শক্তি সৃষ্টি করে?

উঃ—ওই ঠিক একই ভাবে। তোমার কাছে যখন একটা টাকা থাকে, তখন তার কতখানি কিম্মৎ থাকে তুমি মনে কর? কিন্তু সেই টাকাটাই তুমি যদি ব্যাঙ্কে জমা করে দাও, আর তোমারি মত দেশের এক কোটি লোক তাই করে, তখন তারই কেরামতিতে দু'শটা চট্‌কল, কটনমিল চালানো সম্ভব হতে পারে। ব্যাঙ্ক না হলে এ শক্তি যোগাবে কে?

প্রঃ—কেন, ব্যাঙ্ক এই সব ফ্যাক্টরী মিলকে টাকা ধার দেয় বলে? তাতে ব্যাঙ্ক না থাকলেই বা কি? কোন একজন লোকেরই যদি অনেক টাকা থাকে তবে সে ত পাঁচ জনের কাছ থেকে জমা না নিয়েও ধার দিতে পারে।

উঃ—তা পারে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গোটা দেশের কৃষি-শিল্পের টাকা যোগাতে পারে এমন অনেক লোক থাকা সম্ভব নয়।

প্রঃ—কিন্তু আমাদের দেশেত অনেক মহাজন রয়েছেন, যাঁদের টাকা-লাগানোই হচ্ছে পেশা। ধার দেওয়াই যদি ব্যাঙ্কের বড় কাজ হয়, তবেত এই মহাজনদের দেখে বল্‌তে হয় যে, আমাদের দেশে বিস্তর ব্যাঙ্ক রয়েছে।

উঃ—না, এইখানে তোমার চিন্তার মধ্যে মস্ত একটা গোল রয়ে গেছে। সাবেক আমলের কথা ছেড়ে দাও, বর্ত্তমানে আমরা ব্যাঙ্কিং বলতে যা বুঝি সেটা ঠিক লগ্নী কারবারের সামিল নয় জেনো। আগে যে প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ টাকাপয়সা লেনদেন করত তাকেই বলা হ'ত ব্যাঙ্ক। এখন আর এই সাবেক পরিচয় দেওয়া চলে না। সেজন্যই ইংরেজীতে একটা নূতন শব্দ ব্যবহার হচ্ছে, তার নাম হল 'ক্রেডিট্'। ইংরাজীতে ব্যাঙ্ককে বলা হয় টাকা পয়সা লেনদেনকারী এবং ক্রেডিট্ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান। এই ক্রেডিট্ উৎপাদনই হচ্ছে আধুনিক ব্যাঙ্কিং এর বিশেষত্ব। এটা নেই বলেই মহাজনদের ঠিক ব্যাঙ্ক বলা চলে না।

প্রঃ—কিন্তু এই ক্রেডিট্ জিনিষটা কি তা তো ঠিক বোঝা গেল না।

উঃ—এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস বা আস্থা। ব্যবসা জগতে এখন এ শব্দটাকে যেমন করে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে একে টাকা পয়সারই সামিল করে নেওয়া যেতে পারে। টাকা পয়সার মত এও জিনিষপত্র কেনা বেচায় সহায়তা করে থাকে।

প্রঃ—বিশ্বাস জিনিষটা তো অদৃশ্য বস্তু বলে জানি, ওটাকে টাকাপয়সার মত ভাবি কি করে?

উঃ—হাঁ, বিশ্বাস জিনিষটা অদৃশ্য বটে, কিন্তু কেমন করে এর সহায়তায় জিনিষ কেনাবেচা চলে, সেটা একেবারে অলৌকিক ব্যাপার কিছু নয়। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই কতকগুলি নিদর্শন পত্রের সৃষ্টি হয়েছে। তারই বিনিময়ে জিনিষ

স্মাবেচা চলে। কিন্তু যেটা নিদর্শন তা নিদর্শনই; আসল জিনিষ, যার বলে দ্রব্যবিনিময় সম্ভব হচ্ছে, । কিন্তু ওই বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রঃ—কিন্তু ব্যাঙ্কের ওই নিদর্শন-পত্রগুলি লাকে নেবে কেন?

উঃ—ঠিক যে জন্ত দোকানী তোমার কাছে জিনিষ বেচে পাঁচ দশ একশ' টাকার নোট নিতে রাজী হয়; সেখানে যে ওই নোটের মধ্যে গভর্ণমেন্টের এমন প্রতিশ্রুতি লেখা আছে কান ট্রেজারীতে নিয়ে গেলেই নোটের বদলে টাকা দিয়ে দেবে। তাই না নোটগুলিকে আমরা টাকারই সমান মনে করি? কিন্তু আসলে নোটগুলি চলছে ত ঠিক বিশ্বাসের ওপর ভর করেই। এও ত একটা নিদর্শনপত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রঃ—তা'হলে এই দাঁড়াল যে ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট-উৎপাদক প্রতিষ্ঠান—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক হতে হলে তাকে নোট ছাপাতে হবে—তাই ত?

উঃ—তা' কেন? নোট ক্রেডিট্ বা বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল বটে—কিন্তু তাই বলে বিশ্বাসের যে আর কোন রকম নিদর্শন থাকতে পারে না,—এমন কথা বলা হয় নি। নোটের কথা বলেছি শুধু দৃষ্টান্ত দেবার জন্তই। যে সব ব্যাঙ্ক নোট ছাপায় তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। অধিকাংশ ব্যাঙ্কেরই বিশ্বাসমূলক কারবারের ব্যবস্থা অন্ত রকম। তাদের নিদর্শনপত্র অন্তরূপ।

প্রঃ—একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন কি?

উঃ—মনে কর আমি একটা ব্যাঙ্কের কাছে কয়েকদিনের খরচ চালাইবার জন্ত হাজার টাকা ধার চাইতে গেলাম। সে আমাকে গুনে এক হাজার টাকা দিতে পারে কিংবা তুমি যা ভাবছো, হাজার টাকার একখানা নোটও দিতে পারে, যাতে লেখা থাকবে যে, ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে দাবী করলেই ব্যাঙ্ক তার নোটের বদলে টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা ব্যবস্থা হতে পারে। ধর সেই ব্যাঙ্কই আমাকে একখানা চেকবই দিয়ে বল্লে "আপনি এই চেকবইটা নিন, জিনিষ কেনা-বেচার জন্তই ত ধার নেওয়া। তা আপনি হাজার টাকা পর্য্যন্ত যথনখুসী চেক লিখে পাওনা-দারদের দিয়ে আপনার কাজ চালিয়ে নেবেন, তারা আপনার চেক নিয়ে টাকা দাবী করতে এলেই আমরা তা দিতে বাধ্য থাকব"। এই যদি হয়, তবে নোটের বদলে চেক দিয়েও ত আমার কাজ সমানই চলতে পারে।

প্রঃ—তা বটে, কিন্তু হুণ্ডী এক হ'ল কি করে?

উঃ—হুণ্ডীর মূলেই দেখবে রয়েছে ওই বিশ্বাস। তফাৎ যা মনে হচ্ছে সেটা ওই নিদর্শন পত্রের ব্যবস্থায়। একটা নোট—আর একটা চেক। এর পর দেখবে যে, হুণ্ডী, বিল এগুলিও বিশ্বাসমূলক নিদর্শনপত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রঃ—সে কেমন করে হবে? নোট চেক দিয়ে না হয় যখন তখন জিনিষ কেনা সম্ভব হতে পারে, তাই বলে হুণ্ডী বিল দিয়ে ত আর তেমন হওয়া সম্ভব নয়।

উঃ—তোমার ওই বাইরের সামান্ত একটু প্রভেদই বেশী করে চোখে পড়ছে। একটু বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা কর, দেখবে সবগুলির মূলেই রয়েছে ওই বিশ্বাস, আর সবগুলির কাজও হচ্ছে এক, অর্থাৎ দ্রব্যবিনিময় ব্যাপারটাকে সহজ এবং সুসাধ্য করে দেওয়া। এই দ্রব্যবিনিময়ের একটা বিশেষ রূপকেই আমরা নাম দিয়ে থাকি ব্যবসা এবং বাণিজ্য—যা থেকে এই হুণ্ডী কিংবা বিলের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা এও বোঝা গেল। কিন্তু ব্যাঙ্কের আর হুণ্ডীর মধ্যে বিশ্বাসের যোগাযোগ কোথায়।

উঃ—কেন, এর আগাগোড়াই ত বিশ্বাসের ব্যাপার। ব্যবসাদার যখন ব্যাঙ্কের কাছে হুণ্ডী ভাঙাতে যায় তখন ব্যাঙ্ক টাকা দেয় কেন? তার ওপর বিশ্বাস আছে বলেই না? তা না'হলে হুণ্ডীটা যে একেবারে বুজরুকী নয় তার ভরসা কি আছে?

প্রঃ—এও বুঝলাম। কিন্তু এই ক্রেডিট উৎপাদন করার জন্য ব্যাঙ্ক এমন কি সুবিধা করে দেয়, যা অন্যথা সম্ভব হতে পারে না?

উঃ—টাকা কড়ি দিয়ে মানুষের যা সুবিধা হয়েছে, ক্রেডিটেও ঠিক তাই হচ্ছে। য়ুরোপ, আমেরিকায় আজকাল নগদ টাকার জোরে যে পরিমাণ ব্যবসা শিল্প চলছে তার অনেক বেশী চালাচ্ছে এই ক্রেডিট্। দেশের অর্থবল বাড়াবার পক্ষে এ রকম চমৎকার ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। তুমি একটু আগে বলছিলে যে, ব্যাঙ্কের কাজ হচ্ছে শুধু দেশের টাকা হাত-ফেরানো গোছের একটা কিছু। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছ যে শুধু টাকা জমা নিয়ে তাই ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের একমাত্র কাজ নয়। ব্যাঙ্ক ক্রেডিট্ দিয়ে দেশের ধনশক্তির আয়তন বাড়িয়ে দেয় ও দেশের শিল্প-বাণিজ্যে তার ব্যবহার করে তাকে কার্য্যকরী করে তোলে।

প্রঃ—তবে আর টাকা কড়ির বিশেষত্ব কি রইল,—ইচ্ছামত ক্রেডিটে লেনদেন করলেইত চলতে পারে?

উঃ—ঠিক তা নয়, ক্রেডিটে যে পরিমাণ লেনদেন চলে তার মূলে কিন্তু রয়েছে নগদ টাকা কড়ির ব্যাপার। ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে যে সব ক্রেডিট্ বা বিশ্বাসমূলক নিদর্শনপত্রের ব্যবহার দেখতে পাবে, তা যতবার হাতফের করুক, তার মধ্যে এ প্রতিশ্রুতি কিন্তু আছেই যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দাবী করলেই তার বিনিময়ে নগদ টাকা পাওয়া যাবে; তাই না এসব নিদর্শনপত্রের চল বজায় আছে।

প্রঃ—তাই যদি হয়, তবে নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ককে নগদ টাকা মজুত রাখতে হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই।

প্রঃ—তবে আর ক্রেডিট সৃষ্টি করে ব্যাঙ্ক নূতন কি সুবিধা করে দিয়েছে? যে কাজটা নগদ টাকায় চলতে পারত সেটাকে সোজাভাবে না চালিয়ে একটু বাঁকা করে চালানো হচ্ছে—অর্থাৎ কিনা নগদ টাকা ব্যবহার না করে সেটাকেই মজুত রেখে তার বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে কতকগুলি নিদর্শন-পত্র—তা সে নোটই হোক্ আর চেকই হোক্। এতে দেশের আর্থিক বল পুষ্ট হয় কি করে?

উঃ—কেমন করে পুষ্ট হয় জানো? ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ টাকা মজুত রাখে, তার অনেক বেশী পরিমাণ টাকার কাজ ক্রেডিটে চালিয়ে দেয়—একেবারে তিন চার গুণ পর্য্যন্ত।

প্রঃ—সেটা সম্ভব হয় কি করে?

উঃ—ব্যাঙ্ক তার অভিজ্ঞতার ফলে চট করে বুঝে নেয় যে কি পরিমাণ টাকা রাখলে সে তার প্রতিদিনকার নিদর্শন পত্রের দাবী মিটাতে পারবে। সেই পরিমাণ টাকা মজুত রেখেই সে কাজ চালিয়ে নেয়। এতে যে তার খুব দায়িত্ব কিংবা বিপত্তি ঘাড়ে তুলে নিতে হয়। তাও নয়, আর এক দিন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

প্রঃ—আচ্ছা এ না হয় বোঝা গেল যে ব্যাঙ্ক দেশের ধনশক্তিকে পুষ্ট করে দেয়। কিন্তু আপনি

বলছিলেন যে ব্যাঙ্ক দেশের ধনশক্তিকে কার্য্যকরী ক'রে তোলে, তার মানে কি ?

উঃ—তার মানে অতি সোজা। দেশের পাঁচ জনের কাছে যে টাকাটা অমনি পড়ে থাকে, ব্যাঙ্কে সেটা জমা দিয়ে দিলে ব্যাঙ্ক সেই টাকাই দেশের কৃষি শিল্পে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ ধার দিয়ে দেশের কৃষিশিল্পের সহায়তা করাতে পারে। এতে দেশের ধন-দৌলতের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যেতে পারে, অথচ কোন পক্ষেরই লোকসান নেই। যে টাকা জমা রাখে সেও কিছু সুদ পায়, জমা টাকা একটু বেশী সুদে ধার দেবার জন্য ব্যাঙ্কেরও কিছু লাভ থাকে। আর যারা টাকা ধার নেয় তারাও কৃষি শিল্পে খাটিয়ে সুদের দাবী মিটিয়েও উদ্বৃত্ত লাভ অর্জন করে থাকে।

প্রঃ—তবে ত দেখছি ব্যাঙ্ক দিয়ে অনেক সুবিধা হতে পারে। তাই বুঝি আপনি বলছেন যে, ব্যাঙ্ক দিয়ে দেশটাকে ছেয়ে ফেলবার দরকার হয়ে পড়েছে। কেন আমাদের দেশে কি যথেষ্ট ব্যাঙ্ক নেই ?

উঃ—যথেষ্ট কি বলছ ? একেবারে মুষ্টিমেয় বললেই বরং ঠিক বলা হয়। আমি কিছু দিন আগের কথা বলছি শোন—তাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় গোটা ভারতবর্ষে মাত্র ৫৯৬টা ব্যাঙ্কের বর্দ্দ দেখ। তখন যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কের সমষ্টি সংখ্যা ছিল ১১,৯১৬, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩০,০০০ জাপানে ৭,৪২৫, কানাডায় ৪,৮৮৩।

প্রঃ—শুধু ব্যাঙ্কের সংখ্যা দেখলেই চলবে কেন ? লোকসংখ্যার অনুপাতে এক এক দেশে কটা করে ব্যাঙ্ক আছে তাও ত যাচাই করে দেখা দরকার।

উঃ—তাতেও ভারতবর্ষের হীনাবস্থাই প্রমাণিত হবে। ওই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দেই যেখানে দশ লক্ষ লোকের জন্য যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৮৫, যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ২৫৬, জাপানে ৯২ কানাডায় ৪৪৮, সেখানে এই ভারতবর্ষে ওই প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্যই পড়ে মাত্র ২টা ব্যাঙ্ক ছিল।

প্রঃ—আচ্ছা ব্যাঙ্কের বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটা ঠিক ধারণা করে নেবার জন্য বর্গ মাইল হিসাবে বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের সংখ্যাটা হিসাব করে দেখলে হয় না ?

উঃ—বেশ তাই দেখ না, তাতেও বড় সুবিধা মনে হবে না। এই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কথাই আবার বলিতেছি। তখন ভারতবর্ষে প্রতি ২,৭০০ বর্গমাইলে মাত্র ১টা ব্যাঙ্ক ছিল, ওই সীমানার মধ্যেই তখন যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩৬২, যুক্তরাষ্ট্রে ২০, জাপানে ৮০, কানাডায় ৩৮।

প্রঃ—কিন্তু এদের মূলধনের পরিমাণ কেমন ছিল ?

উঃ—যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কগুলির মূলধনের সমষ্টির পরিমাণ ছিল ১৬৮ কোটি টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে ৯০৬ কোটি, জাপানে ২৩১ কোটি, কানাডায় ৪০½ কোটি —আর ভারতবর্ষে মাত্র ১৫ কোটি ;—অবশ্য ভারতবর্ষের বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বাদ দিয়ে।

প্রঃ—ডিপজিট জমার টাকা হয়েছিল কত ?

উঃ—যুক্তরাজ্যে হয়েছিল ৩, ১৭৫ কোটি টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে ১৫,৫৫৮ কোটি টাকা, জাপানে ১,৬৫১ কোটি (এও অবশ্য এদেশের এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির ডিপজিট বাদ দিয়ে)

প্রঃ—এ যে সবই কোটি কোটি টাকার ব্যাপার !

উঃ সেজন্যই এর তাৎপর্য্যটা ঠিক সমঝে নেওয়া কঠিন মনে হচ্ছে। তবু হিসাবটা একটু তলিয়ে দেখলেই ওর মানে একেবারে সহজ হয়ে যাবে। আচ্ছা আমিই একটু পাল্টে বল্‌ছি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে গড়পড়্‌তা হিসাবে প্রত্যেক লোক ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে ৯০০ টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে জন প্রতি জমা হয়েছিল ১,৩০৫ টাকা, জাপানে ২৭০ টাকা, কানাডায় ৭৫০ টাকা—আর ভারতবর্ষে মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রঃ—এ সবই ত আপনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কথা বল্‌লেন ?

উঃ—হাঁ, তার পর থেকে এ পর্য্যন্ত সব দেশেরই ব্যাঙ্কের সংখ্যা সামান্য কিছু বদলে গেছে ঠিক, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অবস্থা প্রায় এক রকমই র'য়ে গেছে।

প্রঃ—তাইত, ব্যাঙ্কের প্রসারে ভারতবর্ষ যে অনেকখানি পিছু হটে রয়েছে দেখছি ! এদেশে তা হলে এখন ব্যাঙ্ক প্রসারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা দরকার হ'য়ে পড়েছে।

উঃ—এটা বুঝেছ দেখে সুখী হলেম। কিন্তু এই স্থূল কথাটাই যতদিন না আর পাঁচজন বুঝতে পাচ্ছে ততদিন এ দেশের আর্থিক উন্নতি করা দুঃসাধ্যই থেকে যাবে। গভর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণের তরফ থেকে ব্যাঙ্কপ্রসারের জন্য এখনই যথাসাধ্য চেষ্টা করা দরকার। সুখের বিষয়, এজন্য সম্প্রতি কতকগুলি প্রাদেশিক ও সেই সঙ্গে একটা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে গভর্ণমেণ্ট বিস্তৃতভাবে দেশীয় ব্যাঙ্কপ্রসার সম্বন্ধে তদন্ত করবার আয়োজন করেছেন। এর ফলে একটা বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটবে এমন আশা করা যেতে পারে।
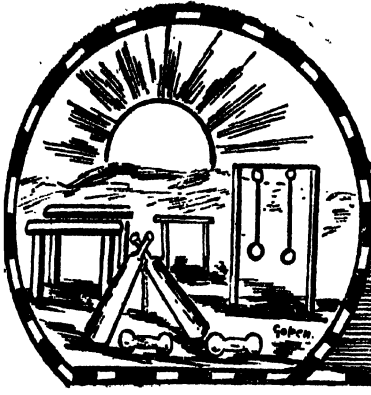
নূতন-পুরাতনে মিশানো দশটী স্বাস্থ্যোপদেশ

১। মুখ দিয়া কখনও নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রো না; শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, ব্যায়াম করা ও ক্রোধের সময় মুখ বুঁজে থেকো। রৌদ্রকে বেশী ভয় ক'রো না। প্রত্যহ সকালে মাথা রক্ষা করে' বাড়ীর ছেলেবুড়ো সকলেই আধ ঘণ্টা কাল রৌদ্র পোহাবে।

২। সাদা-সিধা খাদ্য খাবে; প্রত্যহ কিছু-না কিছু টাট্‌কা ফলমূল খাবে; কোন আহার্য্যদ্রব্য খুব বেশী সিদ্ধ ক'রো না। স্বপাক্ কিংবা নিজের জননী ও স্ত্রীর হাতের রান্না ছাড়া খাওয়া উচিত নয়। যখন খুব পরিশ্রান্ত থাক্‌বে—তখন খাদ্য স্পর্শ ক'রো না।

৩। খাওয়ার ঠিক্ শেষেই দুই এক ঢোক জল খাবে; খাওয়ার দেড় দুই ঘণ্টা পর পর পুরা এক গ্লাস ক'রে জল খাবে। রাত্রে শোয়ার পূর্ব্বে ও প্রাতে উঠেই এক গ্লাস ক'রে জল খেতে পারলে অনেক ব্যাধি দূরে রাখা যায়।

৪। খুব আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে! এতে হজমও ভালো হবে, আহার্য্যে ক্ষুধার নিবৃত্তিও হবে। নির্জ্জনে খাওয়ার অভ্যাস রাখা ভালো। রাত্রে গুরু ভোজন পরিত্যাগ কর্‌বে। মাছমাংস বেশী খেলেই শক্তিশালী হওয়া যায়—এ ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ কর্‌বে।

৫। প্রত্যহ স্নান কর্‌বে; সপ্তাহে একদিন সম্ভব হ'লে গরম জলে স্নান কর্‌বে; শীত গ্রীষ্মে সুস্থ অবস্থায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম কর্‌বে না। শীতকালে ভালো করে' তৈল মর্দ্দন কর্‌বে এবং প্রতিদিন গামছা দিয়ে গা' ডল্‌বে।

৬। প্রত্যহ কিছু কাল ব্যায়াম করবে; অন্য কোন ব্যায়াম না পারো, মুখ বুঁজে ঘাড় সোজা করে, বুক চিতিয়ে বেশ জোরে জোরে পা ফেলে অন্ততঃ মাইল দুই রাস্তা খোলা বাতাসে সকাল বিকাল হাঁট্‌বে।

৭। খেতে খেতে কখনও পড়ো না ও অন্য

কোন কায করো না। যখন যে কায করবে, তাতেই একাগ্র হয়ে' যাবে। সমস্ত নেশার জিনিষ পরিত্যাগ করবে।

৮। দশ ঘণ্টা কায করবে, আট ঘণ্টা নিদ্রা যাবে; বাদবাকী সময় স্নানাহারও আমোদপ্রমোদে ব্যয়িত করবে। সমস্ত কাযে নিয়মনিষ্ঠ হবে। রাত্রি বারোটার আগে অন্ততঃ এক ঘণ্টা সুনিদ্রা দিবে। সপ্তাহে একটা দিন নিজে বিশ্রাম নিবে এবং মাসে একটা দিন পাকস্থলীকে বিশ্রাম (অর্থাৎ উপবাস) দিবে

৯। শরীরের কোন একটি ছোটো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবহেলা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রো না; প্রত্যেকটিই তোমার অখণ্ড দেহ-মনের পক্ষে উপকারী বা অপকারী। বাড়ীর রান্নাঘরের প্রতি যেমন যত্ন করবে, পায়খানার প্রতিও তেমনি যত্ন করা চাই। প্রত্যেক অংশের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখবে এবং প্রত্যেকটির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবে। কোন অসুখ না হ'লেও বৎসরে একবার ক'রে (জন্মদিনে হ'লে ভালো হয়) নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবে এবং ডাক্তারের উপদেশ গ্রহণ করবে। ঔষধ যত কম পারো ব্যবহার করবে।

১০। সন্তোষের চেয়ে কাম্য জিনিষ আর নাই, তা অর্জ্জন করবার চেষ্টা করবে। কাজ ক'রো, ফলাফলের দিকে চেয়ো না (do but never mind)—এই নীতি জীবনে খাটিয়ে দেখো সুখী হবে। আহার বিহার ও সকল বিষয়ে সংযমী ও মধ্যপন্থী হবে।

স্বপ্নদোষ।

যদি ঘন ঘন স্বপ্নে রেতঃস্খলন না হয়, রেতঃস্খলনের ফলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহা হইলে স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে রেতঃপাত রোগ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুস্থ, সবল এবং রতিশক্তি সম্পন্ন পুরুষ যদি অধিক দিন কোনও প্রকারে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না করে, আর যদি পুংবীজাণু (Sperm) বা শুক্রোৎপাদনকারী গ্রন্থি সমূহের ক্রিয়ার বিরাম না ঘটে, তাহা হইলে ক্রমাগত শুক্র সঞ্চয় হেতু শুক্রকোষসমূহ এবং শুক্রোৎপাদক গ্রন্থি প্রভৃতি প্রপীড়িত হইয়া উঠে; সুতরাং উদ্বৃত্ত শুক্র স্খলিত হয়।

দীর্ঘ দিন অন্তর পরিমিত মাত্রায় শুক্রস্খলন স্বাভাবিক ক্রিয়া; তদ্বারা জননেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা প্রশমিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তি হেতু মানসিক স্থৈর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এ'ন কথা উঠিতে পারে,—কত ঘন ঘন রেতঃস্খলন হইলে উহা অত্যধিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? কিন্তু এ বিষয়ে কোনও পরিমাণের নির্দ্দেশ অসম্ভব, কারণ সকল লোকের ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য ও কামপ্রবৃত্তি সমান নহে; এতদ্ব্যতীত সপ্তাহে একবার স্ত্রীসম্ভোগ লিপ্ত ব্যক্তির এবং মাসে একবার মাত্র স্ত্রীসংসর্গকারী ব্যক্তির স্ব স্ব

রতিক্রিয়ার বিরামকালে স্বপ্নে রেতঃস্খলনের পরিমাণ বা মাত্রা কখনও সমান হইতে পারে না। সুতরাং স্বপ্নে রেতঃস্খলন হেতু কাহারও অপকার হইতেছে কি না,তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সযত্নে তাহার শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসিদ্ধ।

ডাঃ ভেকি (Vecki) বলিয়াছেন নিম্নলিখিত অবস্থার একত্র সংযোগে রেতঃস্খলন স্বাভাবিক বলিয়া উক্ত হইতে পারে।—প্রথম, নিদ্রিত অবস্থায় রেতস্ফলন, অর্থাৎ যে সমস্ত চৈতন্যবৃত্তি ও মননশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবে, সেই অবস্থায় রেতঃপাত ; রেতঃপাতকালে শিশ্নের দৃঢ়তা এবং সতেজ উত্থান, ও নারী সম্ভোগ বিষয়ে সুসঙ্গত ও সুখকর স্বপ্ন দর্শন, স্বপ্নদর্শনকালে ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং রেতঃস্খলনে স্বস্তি বা আরাম বোধ ; রেতঃ ক্ষয় হেতু কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি অনুভূত হইবে না বা শিরঃপীড়া উপস্থিত হইবে না। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটিলে নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃপাত অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

কার্সম্যান নিদ্রাকালে অস্বাভাবিক রেতঃ স্খলনের বা স্বপ্নদোষের নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন :—

১।—সুপ্তাবস্থায় অস্বাভাবিক রেতঃস্খলন।

(ক) শরীরের ও শুক্রের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় যে ভাবে রেতঃস্খলন হইত, তদপেক্ষা খুব ঘন ঘন রেতঃপাত। রোগী বীর্য্যক্ষরণের পর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, মন নিতান্ত নিস্তেজ বোধ করে এবং সময়ে শিরঃপীড়া প্রভৃতিতে ক্লেশ ভোগ করে।

(খ) স্বপ্নদোষের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, কেবল ঐ কারণেই উহা রোগ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক রাত্রিতেই প্রায় রেতঃস্খলন হয়, এক রাত্রিতে একাধিকবারও রেতঃপাত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এমন ঘটে, যে স্ত্রীসম্ভোগ-সুখ অনুভব করিবার অল্প পরেই, বা স্ত্রীলোকের সহিত এক শয্যায় শুইয়া থাকিবার অবস্থাতেই স্বপ্নে রেতঃস্খলন হইয়া যায়। এই স্বপ্নদোষের আনুষঙ্গিক ব্যাপার স্বাভাবিক বীর্য্য স্খলনেরই ন্যায়, কিন্তু তজ্জন্য রোগীর শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি প্রভৃতি ক-চিহ্নিত পর্য্যায়ের রোগীদিগের অপেক্ষা অধিক।

(গ) ঘন ঘন বীর্য্যপাত, কিন্তু স্বাভাবিক স্বপ্নদোষে সম্পূর্ণ লিঙ্গোত্থান, নারীসম্ভোগ বিষয়ে স্বপ্নদর্শন, ইন্দ্রিয় সুখভোগ প্রভৃতি যে সব আনুষঙ্গিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদয়ের সম্পূর্ণ অভাব। নির্গত বীর্য্য পরিমাণে অল্প এবং অত্যন্ত তরল। এই প্রকারের স্বপ্নদোষের ফলে শরীরের যে ওজঃ ক্ষয় হয় এবং নাড়ী মণ্ডলীর (nervous system) উপর যে প্রভাব বিস্তৃত হয়, তাহা আপাততঃ বিচারে বিশেষ অনিষ্ট নহে বলিয়া বোধ হইলেও ইহার পরিণাম কিন্তু ভয়াবহ।

২।—জাগ্রত অবস্থায় অস্বাভাবিক রেতঃপাত

(ক) পরিচ্ছদ অঙ্গে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণে বা যানারোহণে গমনকালে লিঙ্গে সামান্য চাপ বা সংঘর্ষন হেতু, জাগ্রত অবস্থায় বীর্য্যস্খলন।

(খ) শুধু মানসিক কারণে, কল্পনা বা চিন্তার ফলে অথবা অত্যন্ত উত্তেজনায় জাগ্রত অবস্থায় দিবাভাগে বীর্য্যস্খলন।

স্বপ্নদোষের ইহাই চরম অবস্থা।

(৫) রোগীর মল ও মূত্রত্যাগকালে বীর্য্য স্খলন। কার্সমান (Curschmann) এবং ভেকি অস্বাভাবিক রেতঃস্খলন সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার যে-যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কিরূপ বীর্য্যস্খলন যে তাঁহারা স্বাভাবিক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন, তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। তবে সাধারণতঃ যেরূপ বীর্য্যস্খলনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে ও স্পষ্ট মানসিক অবসাদ অনুভূত হয়, চিকিৎসার জন্ম তাহাকেই অস্বাভাবিক বীর্য্যস্খলন বলিয়া লইলেই কাজ চলিতে পারে। বীর্য্যপাতকালে সতেজ লিঙ্গোত্থান, সম্ভোগ-স্বপ্ন সন্দর্শন এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অভাব ঘটিলে কিংবা বীর্য্যপাতের পর শরীর বেশ সুস্থ-বোধ না হইলেই যে কাহারও রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে। ইহা দ্বারা কেবল এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে যে, নিদ্রিত অবস্থায় বীর্য্যস্খলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই। অনেকে নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃস্খলনকে পুরুষত্ব-হানিসূচক রোগ বলিয়া বিবেচনা করেন; এই ধারণা বশতঃ অনেক স্থলে রোগী রেতঃক্ষয়ের দুর্ব্বলতা, আনুষঙ্গিক স্ফূর্ত্তিহীনতা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি কুফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্ত্রসমূহের কোন বিশিষ্ট অংশের কোনরূপ ক্রিয়া-বিভ্রাট বশতঃ রেতঃস্খলন এবং তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি ঘটিতে পারে। খুব সুস্থ সবল ব্যক্তিরও নিদ্রিত অবস্থায় সম্ভোগ-স্বপ্ন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত শুক্রস্খলন হওয়া আদৌ অসাধারণ ব্যাপার নহে।

স্বপ্নে ঘন ঘন বীর্য্যপাত সম্বন্ধে এইটুকু জানিয়া রাখা যাইতে পারে যে, সকল ব্যক্তির রেতঃস্খলনের পরিমাণ বা মাত্রা সমান নহে, তদ্ভিন্ন পাত্রভেদে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় শক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে; সুতরাং যেরূপ উত্তেজনায় এক ব্যক্তির বীর্য্যপাত হয়, সেই প্রকার উত্তেজনায় অন্যের কিছুই হয় না। তদ্ভিন্ন এরূপ ঘটতে দেখা যায় যে, স্বপ্নদোষ-ঘটিত লিঙ্গোত্থান কালে Vesiculi seminalis বীর্য্যাধারের দুইটি কোষের মধ্যে একটি সঙ্কুচিত হয়, একটি পরিপূর্ণ থাকে। এইরূপ অবস্থায় স্খলিত শুক্রের পরিমাণ অতি অল্পই হইয়া থাকে এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্দ্দমনীয় উত্তেজনা আংশিকভাবে দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে পুনর্ব্বার বীর্য্যপাতের সম্ভাবনা থাকে।

এই কথাটি জানিয়া রাখা ভালো যে, কেবলমাত্র শুক্র-স্খলনের সংখ্যাধিক্যই রোগের লক্ষণ নহে। আমাদের দেশে স্বাভাবিক সুস্থ ছাত্র সম্প্রদায়ের যদি কাহারো মাসে দুইবার করিয়া স্বপ্নদোষ হয়, তজ্জন্য চিন্তিত হইবার কারণ নাই। একটা বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণার বশে স্বপ্নে বীর্য্যপাতের পর আমরা তজ্জন্য যে মনে মনে দুঃখিত ও তৎসম্বন্ধে ক্রমাগত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই, তাহার প্রভাব আমাদের শরীরের উপর বিস্তৃত হইয়া, শরীরকে যতটা খারাপ করে, বাস্তবিক উপরিউক্ত হারে বীর্য্যপাত হইলে (তৎসম্বন্ধে মনে মনে কোনো আপশোষ-জনক আলোচনা না করিলে) তজ্জন্য মূলতঃ আমাদের শরীরের কিছুই অপচয় হয় না।

তবে ঘন ঘন বীর্য্যপাত অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও বিরক্তিজনক। এজন্য খাদ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন, ব্যায়াম, মুক্তস্থানে বিচরণ, মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, শয়নের পূর্ব্বে গোপন অঙ্গসমূহ ঠাণ্ডা জলদ্বারা ধৌত-করণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর উপায়াবলম্বনে অচিরে উহার প্রতিকার করা উচিত।

যাহাদিগের ঘন ঘন শুক্রস্খলন হয়, তাহাদিগের শুক্র জলের ন্যায় অত্যন্ত তরল বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। তবে খুব অল্প লোকেরই এরূপ বীর্য্যতারল্য ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রায়ই এই সকল তরল পদার্থ—যাহাকে আমরা বীর্য্য বলিয়া ভ্রান্ত ও ভীত হই, তাহা পৌরুষ-গ্রন্থি ও কাউপার গ্রন্থি দ্বয়ের (Prostate & Cowper's glands) রসস্রাব। খুব বেশী উত্তেজনাকালে বিবাহিত ব্যক্তিগণও লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, এই পাতলা স্রাব মূত্রনালী দিয়া প্রথমেই একটু বাহির হইয়া আসে। ইহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হওয়ায় শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি করে না।

স্ত্রীসম্ভোগের পর সেই রাত্রেই সুস্থ সবল ব্যক্তিরও নিদ্রিতাবস্থায় শুক্রপাত হইতে দেখা যায়। কিন্তু রোগের কোন বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে তজ্জন্য ভীত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। দিবাভাগে ও নিদ্রিতাবস্থায় মাসে এক আধবার রেতঃপাত হইলে তজ্জন্য উদ্বেগের কোন কারণ দেখা যায় না; তবে এক্ষেত্রে দিবানিদ্রা বন্ধ রাখাই উচিত। কার্সম্যান জাগ্রত অবস্থায়,—যে বীর্য্যস্খলনের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এখন আলোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না। আমরা ভবিষ্যতে Spermatorrhœa (শুক্রমেহ) সম্বন্ধে যদি কখনও আলোচনা করি, তখন তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করিব।

পুরুষের যেরূপ শুক্র সঞ্চয় হয়, স্ত্রীলোকদিগের সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে বীর্য্যের অনুরূপ কোনরূপ উপকারী পদার্থ তাহাদিগের জননেন্দ্রিয়ে জন্মায় না। কিন্তু সময়ে সময়ে স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের রস স্খলন হওয়ায় তাহাদিগেরও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের উপশম ঘটিয়া থাকে। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটে এবং জননেন্দ্রিয়ের গ্রন্থিসমূহ হইতে রসস্রাব হেতু তৃপ্তি অনুভূত হয়।

শুক্রস্খলনের চিকিৎসা—

প্রকৃত বা অপ্রকৃত স্বপ্নদোষ বা শুক্রস্খলনের জন্য যত লোক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় বা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে ভুলিয়া বাজে পেটেন্ট ঔষধের শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তথাপি কেহ কেহ নীরবে এই রোগ-যন্ত্রনা ভোগ করে, অথবা উহার উপশম কামনায় সবজান্তা বন্ধু-বান্ধব ও 'হাতুড়িয়া' চিকিৎসকের আশ্রয় লয়। এই সকল রোগী সাধারণতঃ চিকিৎসককে দুর্ব্বলতা, কার্য্যে অনিচ্ছা, স্মরণশক্তিহীনতা, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ প্রভৃতি নানা উপসর্গের কথা বিবৃত করে; তাহাদিগের বদ্ধমূল ধারণ একমাত্র স্বপ্নদোষ বা অস্বাভাবিক রেতঃস্খলনের জন্যই তাহাদিগের শরীরের ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। অতি সাবধানে এই সকল রোগীকে সযত্নে পরীক্ষা করা ও তাহাদের পীড়ার আমূল ইতিহাস শ্রবণ করা চিকিৎসকের আবশ্যক, এবং তাহাদিগের শরীরের কোন যন্ত্র বিকল হইয়া থাকিলে আগে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে আরও একটা বিষয় বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, যে রোগীর ঐ রোগ অবমিশ্রভাবে মানসিক (purely psychological) কি না। 'নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃস্খলন রোগ নহে, শরীরের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম মাত্র. তজ্জন্য উৎকণ্ঠার কোনই কারণ নাই'—এই কথাটি বুঝাইয়া দিবার পর কত রোগী যে সুস্থ হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়; যে সকল রোগীতে স্বপ্নদোষের ফলে শারীরিক অনিষ্ট হওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিংবা যে সব ক্ষেত্রে রোগীর অত্যন্ত

ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হওয়াতে সে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত বা অবসাদগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ ক্ষেত্রে রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ রোগীর সংখ্যা খুব কম।

আমাদের দেশে প্রকৃত স্বপ্নদোষ বা নিদ্রিত অবস্থায় ঘন ঘন শুক্রস্খলনের প্রধান কারণগুলি এই:—

(ক) **অত্যন্ত হস্ত মৈথুন,**— যাহাদিগের জীবনীশক্তি প্রবল নহে, তাহারা অত্যন্ত হস্তমৈথুনে আসক্ত ও অভ্যস্ত হইলে তাহাদিগের বীর্য্যনির্গম-নালির মধ্যে অল্প প্রদাহ উপস্থিত হয়। এই প্রদাহের ফলে নিদ্রিত অবস্থায় (যখন মূত্রস্থলী ভর্ত্তি হইতে থাকে, তখন) এই স্থানসমূহ সুড়্ সুড়্ করে ও চুল্‌কায় ; কাজেই বীর্য্য-কোষসমূহের উত্তেজনা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। বীর্য্যকোষের এই উত্তেজনা বৃদ্ধিই শুক্রস্খলন রোগের প্রত্যক্ষ কারণ। আবার অন্যদিকে জিতেন্দ্রিয় বা সংযত পুরুষেরা স্ত্রীসম্ভোগ অথবা অতি পরিমিতভাবে (স্বাভাবিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া) হস্তমৈথুন দ্বারা অত্যধিক স্বপ্নদোষ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন—এরূপ ঘটনাও দেখা গিয়াছে।

(খ) **মূত্রনালীর প্রদাহ, মূত্রাধারের মুখের প্রদাহ, মুদা** (Phimosis) **মলনালীর** (rectun) **বিবিধ ব্যাধি,** (যেমন অর্শাদি), **অণ্ডকোষ ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে চর্ম্মরোগ** অনেক সময়েই স্বপ্নদোষ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মোটের উপর, মলনালীতে ক্রমির আধিক্য, মুদারোগের ফলে শিশ্নাগ্রে ক্লেদ সঞ্চয় অথবা অন্য যে কোন রোগ হেতু জননেন্দ্রিয় বা তৎসন্নিহিত স্থানের অনিয়মিত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তদ্দারা অনায়াসেই লিঙ্গোত্থান এবং রাত্রিকালে রেতঃস্খলন হইতে পারে।

(গ) **পরিপাক ক্রিয়ার বিভ্রাট** ও অন্যান্য যে সকল কারণে স্বাভাবিক সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে তদ্দারা তন্দ্রাঘোর অবস্থায় বীর্য্যপাত হইতে পারে। **কোষ্ঠবদ্ধতা** ও স্বপ্নদোষের একটি বিশিষ্ট কারণ।

(ঘ) রাত্রিকালে অত্যন্ত **কোমল শয্যায় চিৎ হইয়া শয়ন,** শয়ন ভঙ্গীর (মাথার বালিশ খুব উঁচু থাকা ও হাঁটু বা পায়ের তলায় বালিশ দেওয়ার) দোষে জননেন্দ্রিয়ে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চার, শয়নকালে **দৃঢ়ভাবে** অথবা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে **পরিচ্ছদ-ধারণেও** নিদ্রিত অবস্থায় সহজেই বীর্য্য স্খলন হইতে পারে।

(ঙ) **নারীসম্ভোগ বিষয়ে চিন্তার আধিক্য** হেতু কামোদ্রেক হওয়াতেও ঘন ঘন রেতঃস্খলন হইতে পারে। অবিবাহিত যুবকগণ এই কুচিন্তার মশলা ক্রমাগত নভেল পাঠ, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, বাইনাচ প্রভৃতির মধ্য হইতে যোগাড় করে।

রোগের প্রকৃত কারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রোগীর চিকিৎসা করা আবশ্যক। যাহাতে শরীরের ধাতু স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয় তজ্জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসার সময়ে রোগীকে অধিক তাম্রকূট বা সুরাপান ও অধিক রাত্রিতে ভোজনের অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে। রাত্রে খুব হাল্কা আহার করিতে হইবে ; অত্যন্ত ঘৃত, গরম মশলা সংযুক্ত বড় মাছ,মাংস, রাঁধা ডিম, পোলাও প্রভৃতি আহার কিছুদিন স্থগিত রাখা উচিত। ভোজনের

পরে মুক্ত বায়ুতে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া অন্ততঃ দেড় দুই ঘণ্টা পরে শয়ন করা উচিত; কিন্তু রাত্রি ১১টার পর রোগীর কখনও জাগিয়া থাকা উচিত নহে। শয়নের পূর্ব্বে চোখে, কাঁধে, কটিতে ও বগলে ঠাণ্ডা জল মর্দ্দন করা ও এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করা উচিত। অন্য অন্য যে সকল কারণে স্বপ্ন দোষ হইতে পারে বলিয়া উপরে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি যথাসাধ্য বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করা।

রাত্রিতে দুইবার নিঃশেষে মূত্রত্যাগ করা আবশ্যক; কারণ মূত্রস্থলীর স্ফীতিও স্বপ্নদোষের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মনটিকে সম্ভুদিন কার্য্যে ও সৎচিন্তায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে, এবং যেরূপ গ্রন্থপাঠ বা কথোপকথনের ফলে কামবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। রাত্রিকালে চিৎ হইয়া শয়নের অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে এবং একখানি তোয়ালে কোমরে জড়াইয়া রাখিয়া উহার শক্ত গ্রন্থিটি পশ্চাদ্ভাগে মেরুদণ্ডের উপর রাখিলে উপকার হইতে পারে; কোন কোন রোগীর এইরূপ ব্যবস্থাতেই নিদ্রিত অবস্থায় শুক্রস্খলন বন্ধ হইয়া থাকে। ওইরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, একগাছি সুতলী বা মোটা সুতার সহিত একটি কাঠিম বা কাঠের নলি মেরুদণ্ডের উপরিভাগে বাঁধিয়া রাখা যাইতে পারে। "ল্যাঙ্গট" প্রভৃতি বন্ধনীর ব্যবহার একেবারেই ত্যাগ করা উচিত; কারণ উহারা নিদ্রিত অবস্থায় বীর্য্যস্খলন বন্ধ হয় না, বরং বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। রাত্রির শেষ যামেই প্রধানতঃ স্বপ্নে রেতঃস্খলন হইয়া থাকে, সুতরাং স্বপ্নদোষাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাত্রি শেষে নিদ্রা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

উপরিউক্ত নিয়ম সকলের সহিত অল্পস্বল্প শারিরিক ব্যায়াম, সৎসঙ্গ ও সর্ব্বদা আনন্দ-ঘন চিত্ত দ্বারা শীঘ্রই রোগীর মনে আরোগ্য হওয়ার একটা সুন্দর বিশ্বাস ও অনুভূতি জন্মিয়া থাকে; এবং তাহার সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি দেখা যায়। বিবাহিত ব্যক্তির পরিমিতভাবে স্ত্রী সম্ভোগ দ্বারা অচিরে স্বপ্নদোষের প্রতিকার হইয়া থাকে।

এই রোগের প্রতীকার বিষয়ে ঔষধ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে, তবে নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইলে, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া রোগীকে ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। সাধারণতঃ বাড়ীতে সামান্য গাছগাছড়ার দ্বারা অতি কঠিন স্বপ্নদোষও আরোগ্য হইতে দেখা যায়। আফিম ½ রত্তি, কর্পূর ½ রত্তি, কবাব চিনির গুঁড়া ৷৹ অর্দ্ধ তোলা একত্রে মিশাইয়া এক ঢোক শীতল জলের সহিত শয়নের পূর্ব্বে কিছুদিন যাবৎ খাইতে হয়, এবং সকালে গাত্রোত্থান করিয়া পরিষ্কার হাতে দোহা সুস্থ গাভীর এক বলক্ ফুটানো দুধ এক পোয়া, গাঢ় মিশ্রীর জল অর্দ্ধ পোয়া ও তৎসহিত মিহি গুঁড়ানো ইসব্ গুল্ ছোট চামচের এক চামচ খানিক্ষণ ভিজাইয়া এবং সমস্তটা ভালো করিয়া ঢালা উপুড় করিয়া, খালি পেটে অবস্থায় পান করিতে হয়।

(স্বাস্থ্য সমাচার)

"একজন ডাক্তার বেশ জ্ঞানী, বহুদর্শী স্ফুট মস্তিষ্ক এবং অতি সাবধানী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা,ময়লা পোষাক-পরা বলিয়া ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হইয়া যান্।"—মিঃ উয়ের মিচেল্।

"বৈদ্য সর্ব্বদা দয়ার্দ্র চিত্ত হইবেন। তাঁহার উদার এবং সহানুভূতির মানুষ হওয়া চাই এবং রোগীর সহিত নিজেকে একাত্মাগত করিয়া দেওয়া চাই।" —স্যার এফ, ট্রেভেস্।

ইনকুবেটার বা ডিম ফোটাইবার কল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সর্ব্বাগ্রে দেখা দরকার—মেসিন্‌টি ঠিক স্থলে বসান হইল কিনা। এ কার্য্য সমাপ্ত হইলে ট্যাঙ্ক পরিপূর্ণ করিয়া, বাতি জালাইয়া উত্তাপের পরিমাণ ঠিক করিয়া ডিমগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেই সকল হাঙ্গামা মিটিয়া যায়। ট্যাঙ্কটি একবার ভর্ত্তি করিয়া লইলে তাহাতে ২১ দিন কাজ চলে। self supplying lamp এর বেলায়ও তাহাই—ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইয়া না আসা পর্য্যন্ত এই বাতি কাজ করিতে থাকে। ইহার পর দেখিতে হয় যে বাতির ফিতাটি ঠিক আছে কিনা। প্রতি দিন একবার এবিষয়ের খোঁজ লওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সঙ্গে ডিম-গুলিকে একটু নাড়াচাড়া না করিলেও চলে না। তার পর উত্তাপের মাত্রা ঠিক আছে কিনা তাহাও লক্ষ্য করা দরকার। প্রথম সপ্তাহে যে পরিমাণ উত্তাপের দরকার হয়, দ্বিতীয় সপ্তাহে তদপেক্ষা একটু বেশী এবং তৃতীয় সপ্তাহে আরও একটু বেশী উত্তাপ দিতে হয়।
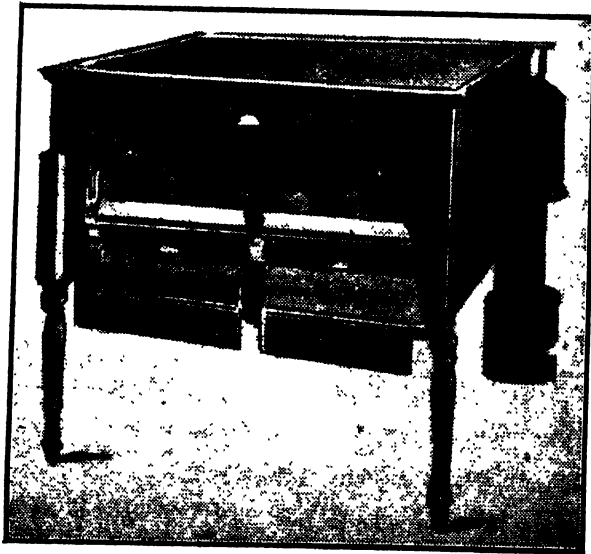
ইনকিউবেটার বা ডিম ফুটাইবার কল

মেসিন ফিট্‌ করা :—ইনকুবেটার মেসিন বসাইবার পক্ষে একটি কক্ষই উপযুক্ত স্থল। তবে অনেকগুলি ডিম ফোঁটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইলে বিশেষভাবে একটি ঘর তৈয়ারী করা প্রয়োজন। মোটের উপর ঘর বা কক্ষের মেঝেটি শুষ্ক এবং শক্ত হওয়া দরকার। সে স্থলে যাহাতে অকস্মাৎ শব্দ না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মেসিন ঘরে কোনও কারণে ঝাঁকুনি লাগিলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। নির্মল বায়ু যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তবে এই বায়ুর সঙ্গে যাহাতে জলকণা প্রবেশ না করে তজ্জন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সূর্য্যালোকেরও প্রয়োজন কম নহে; তবে যাহাতে প্রচণ্ড রৌদ্র ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য পর্দ্দা খাটাইয়া আলোক সম্পাত নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। যে ঘরে মেসিন থাকিবে সে ঘরের উত্তাপ আন্দাজ ৮৫ ডিগ্রি হইলেই চলে। ডিম ফোটাইবার পক্ষে যে উত্তাপের প্রয়োজন, তাহা ফারেন হিট ১০২ হইতে ১০৫ ডিগ্রি হইলেই যথেষ্ট।

থার্ম্মোমিটার :—থার্ম্মোমিটার সম্পর্কে গোড়ায় সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ইনকুবেটারের জন্য স্বতন্ত্র রকমের থার্ম্মোমিটারের দরকার হয়। তারপর দেখা যায় যে, থার্ম্মোমিটারটি ঠিক মত কাজ করে কি না। উপযুক্ত রকমের থার্ম্মোমিটার না হইলে এবং সেই থার্ম্মোমিটার প্রকৃত পক্ষে কার্য্যক্ষম না হইলে সমস্ত ডিমগুলি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইনকুবেটারের মধ্যে থার্ম্মোমিটার ফিট করিবার সময় দেখা দরকার যে, বাল্‌ব যেন মেটাল ফ্রেমটি স্পর্শ না করে। তারপর ডিমগুলি এমনভাবে রক্ষা করা উচিত যাহাতে একটি ডিম অতিশয় লঘু ভাবে উক্ত বাল্‌বের সংস্পর্শে আসে। Egg drawer এর উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করাই এরূপ ভাবে ডিমগুলি রাখার উদ্দেশ্য। অদল বদল করিয়া পালাক্রমে প্রত্যেকটি ডিমকে বাল্‌বের সংস্পর্শে আনিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে—সমস্ত ডিমগুলিতেই উত্তাপের পরিমাণ সমান হয় কিনা।

ইনকুবেটার ডিম স্থাপন করার পর ৭ম দিনে যদি দেখা যায় যে, অস্বাভাবিক ভাবে কোন কোন ডিমের মধ্যে উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেগুলি অকর্ম্মণ্য। সেগুলি হইতে ছানা বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্রেণীর ডিমগুলি দূরে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। কারণ এগুলিতে অনর্থক egg-drawer এর উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। থার্ম্মোমিটারে উত্তাপের মাত্রা ১০২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিবার পর বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। কারণ প্রথম সপ্তাহের পক্ষে উপযোগী উত্তাপের পরিমাণ ১০২ ডিগ্রিই যথেষ্ট। দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০২.৫ ডিগ্রি এবং তৃতীয় সপ্তাহে ১০৩ ডিগ্রি উত্তাপ দেওয়া প্রয়োজন।

আর্দ্রতা :—মুরগীর ডিম ফোটাইয়া লইবার জন্য উহাকে সামান্য পরিমাণে ভিজাইয়া লইবার প্রয়োজন। মুরগী দ্বারা যদি ডিমে তা' দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে আপনা হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রয়োজনীয় সিক্ততার কাজ হইয়া যায়। ইনকুবেটার দ্বারা ডিম ফোটাইতে হইলে অন্য উপায়ে এই জলসিক্ত আবহাওয়া সৃষ্ট করিতে হয়। এস্থলে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। যতটুকু সিক্ততার প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুরই ব্যবস্থা করা আবশ্যক—যেন ইহার একটু বেশী কিম্বা একটু কম কিছুতেই না হয়।

অনেকে মনে করেন,—ইনকুবেটারে ডিম স্থাপনের পর প্রথমতঃ আন্দাজ ১০ দিন পর্য্যন্ত খুব বেশী সিক্ততার প্রয়োজন নাই। তজ্জন্য একটু ভিজা আবহাওয়া এবং আবদ্ধ স্থান হইলেই যথেষ্ট। যাহাতে খুব বেশী পরিমাণে আলো বাতাস ঢুকিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেই এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপে ১০ দিন আন্দাজ কাটিয়া গেলে শেষের দিকে যাহাতে বেশী সিক্ততা না জন্মে তজ্জন্য দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মোটের উপর এই সিক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি এবং তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণের সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী না হইলে চলে না। ইনকুবেটার ব্যবহারে যদি কোন জটিলতা থাকে তবে এই টুকুই সেই জটিলতা—এর বেশী আর কিছুই নহে।

সিক্ততার পরিমাণ কম হইলে ডিমের জলীয় অংশ সহজেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। এবং এই সঙ্গে খোসার ভিতর মু'র ন্যায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই জিনিষের চাপে ডিমের মধ্যবর্ত্তী ছানা মরিয়া যায় অথবা উহা ঠেলিয়া সে বাহির হইতে পারে না। যদি ডিমের মধ্যবর্ত্তী ছানা এই অবস্থায় মরিয়া না যায়, তাহা হইলে ঈষদুষ্ণ জলের মধ্যে একবার খোসাকে ভিজাইয়া লইলে ছানাটি অনায়াসেই বাহির হইয়া আসিতে পারে।

পক্ষান্তরে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিজা হইলে ডিমের জলীয় অংশ সহজে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে না—খোসার ভিতরে যথেষ্ট জল জমিয়া যায় এবং সেই জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া জীবন্ত ছানাটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, সিক্ততা না হইলেও চলে না, অথচ একটু বেশী হইলেই সর্ব্বনাশ—তখন ছানাটি মরিয়া যায়। এই অবস্থায় ইনকুবেটার ব্যবহারের সময় আর্দ্রতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ইনকুবেটার মেসিনের সঙ্গে যে পুস্তক প্রদত্ত হয়, তাহাতে এ বিষয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপদেশ থাকে। সেই উপদেশ অনুসারে কাজ করিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডিম ঠাণ্ডা করা এবং নাড়াচাড়া করা :—ইনকুবেটারের সাহায্যে মুরগীর ছানা উৎপাদন করিতে হইলে ডিম ঠাণ্ডা করা এবং উপযুক্ত ভাবে সেগুলি নাড়াচাড়া করা—এই দুই কাজের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। একটু এদিক সেদিক হইলেই সমস্ত ডিম নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা করা এবং নাড়াচাড়া করার যে কাজ তাহা দৈনিক দুইবার করা দরকার। যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারিবার অসুবিধা না থাকে, তাহা হইলে দৈনিক তিনবার করিয়া নাড়াচাড়া করিলে আরও ভাল হয়।

দৈনিক দুইবার করিয়া নাড়াচাড়া করিতে হইলে প্রাতঃকালে একবার এবং রাত্রিকালে দ্বিতীয়বার একাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। যাঁহারা দৈনিক তিনবার নাড়াচাড়া করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত পন্থা অনুসরণ করা কর্ত্তব্য :—প্রাতঃকালে একবার—তারপর দিনের বেলায় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দ্বিতীয় বার এবং রাত্রিযোগে তৃতীয় বার নাড়াচাড়া ও ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন।

যে ড্রয়ারের মধ্যে ডিম স্থাপন করা হয়, তাহা অধিক সময় উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা উচিত নহে। প্রথম সপ্তাহে ১০ মিনিট এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে ২০ মিনিট আন্দাজ উহা খোলা রাখা যাইতে পারে।

কোন কোন অবস্থায় তৃতীয় সপ্তাহে এই ডিমের ড্রয়ার ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত খোলা রাখিলেও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু দেখা প্রয়োজন যে, অর্দ্ধ ঘণ্টার বেশী সময় যেন কিছুতেই উহা উন্মুক্ত না থাকে; এবং কিছুতেই যেন জলকণা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। ডিমের উত্তাপ যদি পরিমাণের অতিরিক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে বেশী সময় উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজন হয়।

নাড়া চাড়া ও ঠাণ্ডা করিবার জন্ত ইনকুবেটার হইতে ডিমের ড্রয়ারটি স্থানান্তরিত করিতে হয়। এই সময়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, ডিমের মধ্যে যেন জল কণা প্রবেশ না করে এবং বেশী মাত্রায় ঝাঁকুনি না লাগে। ধীরে ধীরে ড্রয়ারটি তুলিয়া লইয়া একটি সমতল টেবিলের উপর উহাকে স্থাপন করা আবশুক। তার পর একটুও বিলম্ব না করিয়া ডিম গুলি নাড়িয়া দিতে হয়। যে ডিমটি উপুড় হইয়া আছে তাহাকে চিৎ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তারপর যেটি ড্রয়ারের এক কোনে পড়িয়াছে, সেইটিকে মধ্যস্থলে আনিয়া স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই ভাবে আজ ডিমের যে দিকটি নীচে আছে কল্য সেই দিকটি উপরে যাইবে। মোটের উপর প্রত্যেকটি ডিমের প্রত্যেকটি অংশ পর্য্যন্ত যাহাতে সমান ভাবে উত্তাপ পায় এবং ঠাণ্ডা হয় তাহার ব্যবস্থা করা আবশুক। এই সময়ে যাহাতে বাহিরের জল কণা আসিয়া ডিম গুলিকে নষ্ট না করিয়া দেয় তৎপ্রতি যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

এক্ষণে কথা উঠিতে পারে যে মধ্যে মধ্যে ডিম গুলি ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন কি? প্রধানতঃ ডিমের খোসা গুলি ফাটাইয়া দেওয়ার জন্তই এরূপ করা হয়। ডিমে তা' দেওয়ার সময় মুরগী মাঝে মাঝে ডিম ঠাণ্ডা করিয়া থাকে। সে দিনের মধ্যে এক দুইবার অকস্মাৎ বাহির হইয়া যায় এবং তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসার সময় খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া ডিমের গায়ে লাগে। ইহাতেই ডিম ঠাণ্ডা করার কাজ হইয়া যায়। ইনকুবেটারে ডিম স্থাপন করিলে এইরূপ আকস্মিক ভাবে ডিম ঠাণ্ডা হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্তই বিশেষ করিয়া দৈনিক দুইবার কিম্বা তিন বার সেই ডিম গুলি নাড়া চাড়া দ্বারা ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়। মোটের উপর ডিমের খোসা অনেকটা কাঁচের ন্যায়। গরম কাঁচের গায়ে অকস্মাৎ জল কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিলে তাহা ফাটিয়া যায়। ডিমের বেলায় ও ঠিক সেইরূপ হয়; উত্তপ্ত ডিমের গায়ে ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহার খোসা ফাটিয়া যায়। ইহার ফলে অভ্যন্তরস্থ ছানাটি অনায়াসে বাহির হইয়া আসিতে পারে। এই ছানাটিকে বাহির করিয়া আনিবার জন্তই ডিমের আবরণটি ছিন্ন করিবার প্রয়োজন।

ডিম পরীক্ষা:—ইনকুবেটারে ডিম স্থাপন করার সাত দিন পরে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ঐ গুলি কার্য্যোপযোগী আছে কি না। সময় মত পরীক্ষা না করিলে মন্দ ডিম গুলি, ভাল ডিম গুলিকেও নষ্ট করিয়া দিতে পারে। Testing lamp অথবা Perfection Egg Tester দ্বারা ডিম পরীক্ষা করা যায়।

যদি Testing lamp দ্বারা কাজ করিতে হয় তাহা হইলে দিনের বেলায় পরীক্ষা করা চলে না। রাত্রি কালে যখন কক্ষটি সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে তখন ঐ Testing lampটি মাত্র সঙ্গে লইয়া ইনকুবেটারের কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়—অপর কোন আলো কাছে না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অন্ধকারের মধ্যে এক একটি ডিম লইয়া

Testing lampএর কাছে ধরিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়—উহা ভাল আছে কিম্বা পঁচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পঁচা ধরিবার লক্ষণ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ সেই ডিমটি সরাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

Perfect Egg Tester নামক যন্ত্র দ্বারা ডিম পরীক্ষা করিতে হইলে অন্ধকারের প্রয়োজন নাই। দিনের বেলায়ও এই যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে ডিম বাছিয়া ভাল মন্দ নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ল্যাম্প পরিষ্কার রাখা:—ইনকুবেটারের ল্যাম্পটি যাহাতে পরিষ্কার থাকে তজ্জন্য সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দৈনিক একবার করিয়া ইহার সলিতাটি ছাটিয়া দেওয়া দরকার। কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলার দরকার নাই—কেবল উহার ছাইটুকু হাতের দ্বারা টিপিয়া দিলেই চলে। মোটের উপর সলিতার মাথার যাহাতে ছাই জমিয়া না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নাড়া চাড়া দ্বারা ডিম ঠাণ্ডা করিবার সময় যখন রাত্রি কালে ডিম গুলি স্থানান্তরিত করা হয় সেই সময়ই সলিতা পরিষ্কারের উত্তম সুযোগ। অতঃপর আবার যখন ডিম গুলি ইনকুবেটারে স্থাপন করা হয় তখন নূতন করিয়া বাতি জালাইলেই চলে। তবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, প্রথমতঃ যেন আলোটি বিশেষ ভাবে চড়িয়া না যায়। থার্ম্মোমিটারে উত্তাপের মাত্রা বাড়িয়া Egg drawerটি পুনরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে ল্যাম্পটি একটু চড়াইয়া দিয়া তাহার স্বাভাবিক আকার দান করা যাইতে পারে। তবে কোন অবস্থায়ই যাহাতে উত্তাপের পরিমাণ খুব বেশী বাড়িয়া না যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আজকাল কেরোসিনের ল্যাম্পের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে বিজলীর বাতি (Electric light) ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে উপরোক্ত সমস্ত হাঙ্গামাই নিবারিত হইয়াছে। বিজলীর বাতিকে একবার ঠিক করিয়া রাখিলে (regulate) সেই বাতি হইতে প্রয়োজন অনুসারে উত্তাপ আসিতে থাকে। তবে সকল স্থলে বিজলীর বাতি পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই এখনও তেলের বাতির প্রয়োজন একেবারে শেষ হয় নাই।

ড্রাইং বক্স:—প্রত্যেক ইনকুবেটারের মধ্যে একটি করিয়া ড্রাইং বক্স আছে। সদ্যজাত ছানাগুলিকে প্রথমতঃ এই বাক্সের মধ্যে রাখা হয়। ডিম হইতে ছানা বাহির হইবামাত্রই সেগুলিকে এই ড্রাইং বক্সে স্থানান্তরিত করা দরকার। ছানা গুলি প্রথমতঃ ভিজা থাকে। ড্রাইং বক্সের উত্তাপে তাহাদের গায়ের জল কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শুকাইয়া যায়। একটি ড্রাইং বাক্সে অনেকগুলি ছানা রাখা চলে না। একটির গায়ে আর একটি ছানা যাহাতে না লাগে এবং এগুলি পৃথক পৃথক থাকিয়া যাহাতে আরামে নড়া চড়া করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

Egg drawer হইতে ছানা সরাইয়া লইবার সময় বিশেষ তাড়াতাড়ি করা উচিত নহে। কারণ একসঙ্গে অনেকগুলি সদ্যজাত ছানা সরাইয়া লইলে অপরাপর ডিমগুলি (যেগুলি হইতে তখনও ছানা বাহির হয় নাই) অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে অভ্যন্তরস্থ ছানাটি মরিয়া যায়। কাজেই বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সকল দিক লক্ষ্য করিয়া একে একে ছানাগুলি ড্রাইং বক্সে রাখা কর্ত্তব্য।

এই অবস্থায় ছানাগুলির গায়ের জলীয় পদার্থ শুকাইয়া গেলে পর আবার সেগুলিকে ড্রাইং বক্স

হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা দরকার। ফ্লানেল দিয়া ঢাকা ঝুড়ির মধ্যে সদ্যজাত মুরগীর ছানা রাখিলে অনিষ্টের কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

ভ্রান্ত ধারণাঃ—ইনকুবেটার সম্পর্কে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে প্রকৃতপক্ষে এসমস্ত ধারণা একান্ত ভিত্তিহীন। অধুনা ইনকুবেটারের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যাঁহারা মুরগীর চাষ করিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এখন ইনকুবেটার অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কেহ কেহ বলে যে, স্বাভাবিক উপায়ে মুরগীর দ্বারা তা' দিয়া যে ছানা উৎপন্ন হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—ইনকুবেটারে উৎপন্ন ছানা তেমন ভাল হয় না। প্রকৃতপক্ষে এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। হাতে কলমে পরিক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ইনকুবেটারে উৎপন্ন ছানা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুরগী জন্মিতে পারে। আসল কথা হইল—যত্ন করা। উপযুক্ত যত্ন এবং খাদ্যাদি পাইলে ইনকুবেটারে উৎপন্ন ছানা হৃষ্টপুষ্ট মোরগে পরিণত হইতে পারে।

পক্ষান্তরে ইনকুবেটার ব্যবহার বরং অনেকটা সুবিধা জনক। যে মুরগী ডিমে তা দেয় সেইটি সাধারণতঃ নোংরা হইয়া যায়। এই অবস্থায় তাহার শরীরে দুষ্ট কীট (Vermin) উৎপন্ন হয়। ডিম ফুটিয়া ছানা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল দুষ্ট পোকা তাহাদের শরীরেও প্রবেশ করে। ইহার ফলে অনেক ছানাই অকালে মরিয়া যায়। ইনকুবেটার ব্যবহার করিলে সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে,—নোংরা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থায় দুষ্ট কীট জন্মিবার আশঙ্কা নিবারিত হয়।

ডিম সংগ্রহঃ—যাহারা ইনকুবেটারে ডিম ফোটাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত ডিম সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সকল ডিম হইতে ছানা বাহির হয়

ইনকিউবেটার কল হইতে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইয়াছে

না। ডিমের মধ্যে অনেকগুলি অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ খাপরা থাকে। গোড়াতেই সেইগুলি পৃথক করা প্রয়োজন। তারপর যেগুলি অবশিষ্ট থাকে সেগুলিকে পরিমিত উত্তাপের মধ্যে রক্ষা করা আবশ্যক। অতিরিক্ত উত্তাপ কিম্বা অতিরিক্ত হিম — এই উভয় কারণেই ডিম নষ্ট হইতে পারে। তারপর বেশী দিন ডিম জমাইয়া রাখা যায় না। তাহাতে ভিতরের জীবাণুগুলি মরিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—যে মুরগী উপযুক্তভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে তাহার ডিম হইতে ছানা উৎপন্ন হয় না। যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে হয়ত দেখা যায় যে, ভিতরে বীজাণু আছে। কিন্তু ইনকুবেটারে সে ডিম স্থাপন করিলেই কয়েক দিন পরে দেখা যায় যে, ছানাটি মরিয়া গিয়াছে। এইরূপে অনেক সময় বহু সংখ্যক ডিম হইতে মরা ছানা বাহির হয়। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইনকুবেটার দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার তাহা নহে। ডিমের মধ্যে গলদ থাকে বলিয়াই ফোটাইবার সময় মরা ছানা বাহির হয়। অনেক মুরগী ডিম দেওয়ার সময় সেগুলিকে নোংরা করিয়া ফেলে। ডিমের খোসার উপর মলমূত্র ত্যাগ করে। ইহাতে ডিম অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সেই ডিম পরিষ্কার করিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা হইতে ছানা তোলা দায় হইয়া পড়ে। গোড়াতে সতর্ক হইলে এই সমস্ত অসুবিধা দূর হইতে পারে।

উপরে আমরা যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিলাম সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনকুবেটার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে সাফল্য লাভ অবশ্যম্ভাবী। এখনও যাঁহারা কল কব্জার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইতে পারেন নাই তাঁহারা যদি একবার ইনকুবেটার পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বদ্ধমূল ভ্রান্তধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইবে— একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোম্পানীর লভ্যাংশের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার চেয়ে আমানতকারি সুদের হার বাড়াইয়া লইতে পারেন; অন্য কোন প্রকার স্বার্থ গ্রহণ করিতে পারেন। মফঃস্বলে টাকার যে অভাব তাহাতে কোম্পানীর সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি পাইলেই লভ্যাংশের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে কমিয়া আসিবে। লোন অফিসগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে লোকের টাকা সংগ্রহের সুযোগ হইয়াছে বটে তাহাতে লোকের টাকা কর্জ্জ করিবার স্পৃহা বৃদ্ধি হইয়াছে একথা সর্ব্বত্র স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বে যে সমস্ত গ্রাম্য মহাজনগণ ব্যক্তিগত ভাবে টাকা দাদন করিতেন, তাহারা নানা কারণে ইচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া ঐ প্রকার লগ্নীর কার্য্য নিরাপদ নহে মনে করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। লোন অফিসগুলি সাধারণতঃ তাহাদের টাকা দিয়াই চাপিয়া থাকে। অবশ্য সহরের কথা ছাড়িয়া দিলেও মফঃস্বলের গৃহস্থের কথা বলিতে পারি যে কৃষক বা কৃষিজীবি গৃহস্থের বৎসরের মধ্যে গড়ে ৩।৪ মাসের পরিবার ও খাইবার উপায় থাকে না। তাহাদের আবার কর্জ্জ করিবার "স্পৃহা বৃদ্ধি" কি? তাহাদিগকে যে কর্জ্জ লইবার সুযোগ না দিলে, পিলে শুকাইয়া অস্তিত্ব লোপ পাইবে; আর তাহাদিগকে ভাদ্র মাসে ৫।৭ টাকা দরের পাটের বোঝা মাথায় লইয়া নিধিরাম সাহার কিম্বা ফতেচান্দ করমচান্দের পাটের গদিতে দেখা যাইবে না! রোগ ভোগ অদৃষ্টের লিখন, ঔষধের বিলের বেলায় কবিরাজের দোষ কেন? পাটের চাষ হ্রাস ও মোকর্দ্দমা করিবার স্পৃহা দমন করা পর্য্যন্ত এই বিষয়ের সমাধান করা সুদূর পরাহত।

ভবিষ্যতের পন্থা।

শ্রীযুত কুণ্ডু মহাশয়ের মতে শুধু আমানতকারীর সাবধান হইলে চলিবে কেন? কোম্পানীর পরিচালকদিগকেও ভবিষ্যতে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। আমার মনে হয় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

(১) আমদানী মূলধনের ও রিজার্ভ ফণ্ডের অনুপাতে আমানত গ্রহণ করা—

(২) রিজার্ভ ফণ্ড বৃদ্ধি করা।

(৩) আমানতকারীকে আমানতের পরিমাণ অনুসারে অংশ প্রদান করা কিম্বা সেয়ারের কোন অংশ উপযুক্ত সুদে কিম্বা অন্য কোন বিশেষ নিয়মে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আমানত লওয়া। (আমরা প্রতি অংশের ২এর ৫ অংশ আদায়ী মূলধন রূপে ও ৩এর ৫ অংশ উপযুক্ত মুনাফায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য compulsory আমানত দেওয়ার নিয়মে কর্ম্ম করিয়া বেশ ফল পাইতেছি।)

(৪) বড় বড় আমানতকারীগণের মধ্য হইতে কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিনিধি ডিরেক্টাররূপে গ্রহণ করা।

(৫) প্রত্যেক আমানতকারীকে অংশীদার না হইলেও ব্যালেন্স শীট প্রভৃতি প্রদান করা ও বার্ষিক সভায় অন্ততঃ দর্শকরূপেও সভার সমস্ত আলোচনা জানিবার ও শুনিবার অধিকার দেওয়া।

(৬) আমানতকারীর টাকার পরিমাণ অনুযায়ী সুদের হার বাড়াইয়া দেওয়া।

পক্ষান্তরে কোম্পানীর পরিচালকদিগকেও এই কার্য্যের সমক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ের অধিকার লাভের চেষ্টা করা সঙ্গত। (১) কো-অপারেটীভ্ ব্যাঙ্ক যাহাতে বিনা ষ্ট্যাম্পে দলিল লইতে ও নালিশ করিতে পারে সেই প্রকার সুযোগ পাওয়ার প্রার্থনা। (২) সার্টিফিকেট যোগে টাকা আদায় করিবার ক্ষমতা। (৩) আদালত যাহাতে ডিরেক্টার বোর্ডের বিনা অনুমতিতে সুদের হার কমাইয়া ডিক্রী দিতে না পারে অথবা কিস্তি দিতে না পারে।

(৪) প্রত্যেক জেলায় পৃথক পৃথক সমিতি গঠন করিয়া মিলিতভাবে নিজ নিজ অভাব অভিযোগ ও প্রতিকারের উপায় করা—

(৫) যেখানে অধিক লোন আফিস সেখানে মিলিতভাবে কার্য্য করা—

অতঃপর এ বিষয়ে আমাদপুর চিত্তরঞ্জন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত ভূপেন্দ্র প্রসাদ নিয়োগী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম।

বিগত ১৭ই ভাদ্র তারিখের "বঙ্গবাণীতে" মফঃস্বল ব্যাঙ্কের আমানত কারিগণের অবস্থা" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। লেখক মহাশয় লোন আফিস সমূহের কার্য্যপ্রণালীর সহিত সুপরিচিত। তথাপি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তিনি নিরপেক্ষ মত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। উক্ত প্রবন্ধে আমানত কারিগণের নিঃসহায় অবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি রঞ্জিত। যৌথ কোম্পানীগুলির পরিচালকগণের প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাও শোভন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটী যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে উহার উপর জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আস্থা জন্মিতে পারে না। বাঙ্গলার ছয় শত লোন কোম্পানীর পক্ষে কোন প্রতিনিধি কমিটীতে স্থান না পাওয়ায় এই সন্দেহই সকলের মনে দৃঢ়ীভূত হয় যে উক্ত কমিটী এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সহানুভূতিশীল বা উহাদের হিতকামী হইতে পারেন না।

সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে এই যৌথ কোম্পানী গুলির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট উপযোগীতা থাকিলেও বিশেষ সতর্কতার সহিত সমালোচনা কার্য্য পরিচালিত হওয়া সঙ্গত। এবং প্রকৃত অবস্থাই জনসাধারণের সমক্ষে প্রচারিত হওয়া উচিত। আমানতকারিগণের স্বার্থ রক্ষার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু স্বার্থরক্ষা কল্পে অসত্য কিংবা অর্দ্ধ সত্য দ্বারা অথবা কাল্পনিক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া লোকের মনে ভীতি সঞ্চার করা কখনও সমর্থন যোগ্য নহে।

আশঙ্কার কথা

প্রবন্ধ লেখক মহাশয় আমানত কারিগণের যে কয়েকটী অভাব অভিযোগ বা আশঙ্কার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মূলতঃ এই—

(১) আমানতকারিগণের অর্থে কোম্পানী লাভবান্ হন, কিন্তু যে স্থলে অংশীদারগণ শতকরা ৩২৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ড পান আমানত কারিগণকে কেবলমাত্র শতকরা ১২৲ হারে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

(২) এই সকল কোম্পানী আদায়ী মূলধনের ৩০।৪০ গুণ পর্য্যন্ত আমানত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(৩) কোম্পানীগুলির পরিচালনায় আমানত কারিগণের কোন হাত নাই। তাহারা কোম্পানীর আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে পারেন না।

(৪) রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ অত্যল্প এবং অনেকস্থলে গৃহীত মূলধনের সম্পূর্ণ টাকা আদায় করা হইয়া থাকে। এবং রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা পৃথকভাবে না খাটাইয়া কোম্পানীতেই আমানত রাখা হয়।

ডিরেক্টরগণ অনেকস্থলে পোষ্য পালন করেন এবং কতিপয় ব্যক্তি স্থান বিশেষে কোম্পানী পরিচালনা এক চেটীয়া করিয়া লইয়াছেন।

প্রথমতঃ এই সমস্ত অভিযোগ কি পরিমাণে সত্য তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অভাব অভিযোগের নিরাকরণ কল্পে যে ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার ও আলোচনা হওয়া দরকার।

আমি বিগত ৮।৯ বৎসর যাবৎ মৈমনসিংহ জেলার কয়েকটী লোন আফিস পরিচালনায় নিয়োজিত আছি। মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় প্রায় ২ শত লোন আফিস আছে। ঐ সকল কোম্পানীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছি তাহার উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের উল্লিখিত সমস্যাগুলির উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

জামালপুর মহকুমায় যে সমস্ত কোম্পানী অধুনা গঠিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা হইতে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত এবং কয়েকটী পুরাতন কোম্পানী ভিন্ন সমস্ত কোম্পানীতে অংশ গুলর মধ্যে শতকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত অনাদায়ী রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত কোম্পানী সাধারণতঃ ১৫ হাজার হইতে এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত আমানত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র পুরাতন কয়েকটী লোন আফিসে তিন লক্ষ হইতে ছয় লক্ষ পর্য্যন্ত আমানত আছে। তাহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণও দশ হাজার টাকা হইতে আশি হাজার টাকা পর্য্যন্ত।

অংশীদারই আমানতকারী।

এই সমস্ত কোম্পানীর স্থায়ী আমানতকারিগণের অনেকেই কোম্পানীর অংশীদার। কারণ কোন নূতন কোম্পানী গঠিত হইলে অংশ বিতরণ আমানতকারীগণের দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এই সমস্ত কোম্পানীতে ডিরেক্টর সভায় আমানতকারিগণের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ ঐ সমস্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ সকলেই আমানতকারী অংশীদারগণের প্রতিনিধি! এবং অনেকস্থলে ডিরেক্টারগণই কোম্পানীর আমানতকারী এই সকল কোম্পানীতে আমানতকারীগণের স্বার্থরক্ষার কোন ত্রুটি থাকা সম্ভবপর নহে।

আমানতকারীগণ অপেক্ষা কোম্পানীর অংশীদারগণ বেশী লাভবান হইয়া থাকেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা এই সমস্ত

কোম্পানীর প্রতি আদৌ প্রযোজ্য নহে। আদায়ী মূলধনের অল্পতা নিবন্ধন কম লাভেও এই সমস্ত কোম্পানীতে উচ্চ হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে। এবং ঐ সমস্ত কোম্পানীকে আমানতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া আমানতকারীগণকে এক বৎসরে যে সুদ দেওয়া থাকে তাহাও এক বৎসরের প্রদত্ত ডিভিডেণ্ডের ৪।৫ গুণ হয়। নিম্নলিখিত হিসাবগুলি কয়েকটি কোম্পানীর ১৩৩৫ সনের ব্যালেন্স সীট হইতে লওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে আমানত-কারীগণকেই কোম্পানীর স্থূল আয়ের অধিকাংশই দেওয়া হইয়া থাকে।

	এক বৎসরের প্রদত্ত সুদ	ডিভিডেণ্ডের হার শতকরা	এক বৎসরের প্রদত্ত ডিভিডেণ্ড	নিট লাভের পরিমাণ	স্থূল আয়ের পরিমাণ	একবৎসরের লাভ হইতে রক্ষিত রিজার্ভ
১।	১৩,৭৮৯।/৯	৪০	৩৭০৮৲	৬,৫৮৮।/৬	২৫,৮৫॥৶৯	২৫০০৲
২।	৪০,৪৬৩৲	৮০	৮,০০০৲	১৮,৩৫০॥৶৩	৭২,৩৫৯৸৶২	১০,০০০৲
৩।	২৪১৬১॥/০	৬০	১২০০০৲	১৯৯৯৩০,৬	৫৪,৫২২৸১	৭০০০৲
৪।	৮৯০৯৸/৬	৫০	২৭২৭॥০	৮,২৬১ ০	২০,৫৭৩॥৩	৫০০০৲
৫।	১২২৪৬৶০	৬t	৫৯৮৬॥০	১৪০০৭॥/৩	৩৩,০০৭।/৬	৬৯০০৲

আমানতকারীদের সুবিধা

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে স্থূল আয়ের শতকরা ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত আমানতের সুদ বাবদ খরচ হইয়া থাকে। অংশীদারগণ স্থূল আয়ের মাত্র শতকরা ১২৲ টাকা হইতে ২০৲ পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন। এবং নেট লাভের শতকরা ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ এবং ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত রিজার্ভ রাখা হইয়া থাকে। জামালপুর মহকুমায় রিজার্ভ যথেষ্ট পরিমাণে রাখা হইয়া থাকে এবং অল্পকাল মধ্যে উহা আদায়ী মূলধনের ৮।১০ গুণ পরিমাণ হইয়া থাকে। এবং আমানতের সুদও বৃদ্ধি হইয়া শতকরা বার্ষিক ৯৲ হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে।

রিজার্ভ ফণ্ড সম্বন্ধে একটি কথা বলা চলে এই যে, অনেক কোম্পানীতে রিজার্ভ ফণ্ড পৃথক ভাবে খাটাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। অধিকাংশ স্থলে রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা কোম্পানীতেই আমানত রাখা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষ-জনক নহে তাহা কোম্পানীর পরিচালকগণ উপলব্ধি করিতেছেন। এবং রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা ইম্পি-রিয়াল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা কিংবা অন্য কোন উপায়ে পৃথকভাবে খাটাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইতিমধ্যেই ২।১টি কোম্পানী রিজার্ভ ফণ্ড পৃথক করিয়া ফেলিয়াছেন। আশা করা যায় অচিরেই অন্যান্য কোম্পানীগুলি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুরাতন সেটের পরিচয়।

৩৩ সালের কাগজ

৩৩ সালের বার মাসের বার খানা কাগজ সম্বলিত সম্পূর্ণ বাঁধাই সেট্ একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অফিস কপি (Office Copy) ব্যতীত আর একখানিও নাই।

অতঃপর ৮ মাসের ছুটা সংখ্যা (Stray Copies) একত্র করিয়া আমরা বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহাও সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, একখানিও আর নাই।

অতঃপর আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক এই পাঁচ মাসের পর পর সংখ্যাগুলি একত্র করতঃ আমরা set করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহাও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং ৩৩ সালের সেট্ অথবা ছুটা সংখ্যার জন্ম কেহ আর পত্র লিখিবেন না, কারণ তাহা আর একখানিও নাই।

৩৪ সালের সেট্ও প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; অতি অল্প কয়েক সেট্ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

(ক) ৩৪ সালের কাগজে মোট প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা—১৮৮; তন্মধ্যে মাত্র ৭৯টী প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের আভাষ এখানে দেওয়া হইয়াছে।

(খ) ডবল ক্রাউন ৮পেজী ফর্ম্মার আকারে ৩৪ সালে মোট ১১০৪ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

(গ) এই সকল প্রবন্ধ নানা ছবি দ্বারা সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।

১৩৩৪ সালে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধরাজির মধ্যে নিম্নে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত আভাষ দেওয়া হইল।

ইহা ব্যতীত আরও বিস্তর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে যাহার বিবরণ স্থানাভাবে এখানে দিতে পারিলাম না।

১। আম্রের বিভিন্ন ব্যবসায়।

বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে গাছের তলায় যে সকল অপর্য্যাপ্ত আম বছর বছর পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়—তাহা দ্বারা কত রকমের লাভজনক ব্যবসায়ের পত্তন করা যায় এই প্রবন্ধে তাহার বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২। আমের পোকা।

পল্লী গ্রামের হাজার হাজার আম গাছে পোকা লাগিয়া আম নষ্ট করিয়া দেয়। কি করিয়া পোকার উপদ্রব হইতে আম রক্ষা করা যায় তাহার কয়েকটী অতি সহজ এবং ফলপ্রদ উপায় সাবুর গভর্ণমেণ্ট কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। আলু রক্ষার উপায়।

কেমন করিয়া আলু দীর্ঘকাল টাট্‌কা রাখা যায় তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় সমূহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে ব্যবসায়ীগণ পচনের হাত হইতে দীর্ঘকাল আলু রক্ষা করিতে পারিবেন।

৪। আঠা ও গঁদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী। (সচিত্র)

বিদেশ হইতে ভারতে প্রতি বৎসর কত লক্ষ টাকার আঠা ও গঁদ আমদানী হয় তাহার বিবরণ এবং কেমন করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট আঠা ও গঁদ প্রভৃতি প্রস্তুত করতঃ বিদেশী শোষণ বন্ধ এবং নিজেদের আয় বাড়ানো যায়—তাহার বহুল ফরমূলা দেওয়া হইয়াছে এবং চিত্রের দ্বারা বোঝানো হইয়াছে।

৫। আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান।

কয়েকটী waste product বা বাতিল দ্রব্য হইতে অর্থোপার্জ্জনের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

৬। আমার ব্যবসাদারী

এই প্রবন্ধে নানা রকমের চাতুরী এবং জুয়াচুরীর বিষয় জানিতে পারিবেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে কত রকমের দুষ্ট লোক ঘোরা ফেরা করিতেছে, সে সম্বন্ধে ব্যবসায়ী মাত্রেরই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। আমরা সকল ব্যবসায়ীকেই ইহা পড়িতে অনুরোধ করি।

৭। ইন্‌সিওরেন্স বা বীমাপদ্ধতি।

আজকাল ইন্‌সিওরেন্স বা বীমার এজেন্সি করিয়া অনেকে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এই বীমা পদ্ধতি সম্বন্ধে এ বৎসরের কাগজের অনেক সংখ্যায় নানা প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা আছে।

৮। এসেন্স প্রস্তুতের কৌশল।

এই প্রবন্ধে কয়েকটী এসেন্স প্রস্তুত করার পরীক্ষিত ফরমূলা প্রকাশ করা হইয়াছে।

৯। কমলা লেবু।

কমলা লেবুর চাষ করা সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য এবং কমলা লেবু গাছের নানারূপ রোগ এবং পোকা লাগার প্রতীকারের উপায় এই প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটী ব্যবসা ও বাণিজ্যের ১৭ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বাহির হইয়াছে।

১০। কমলা সংরক্ষণ।

কমলালেবু কেমন করিয়া দীর্ঘকাল টাট্‌কা রাখা যায় এই প্রবন্ধে তাহার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

১১। কলিকাতার চাউলের কল সমূহ।

এই প্রবন্ধে কলিকাতা এবং তাহার উপকণ্ঠে যতগুলি চাউলের কল আছে তাহার নামধামাদি প্রকাশ করা হইয়াছে। মফঃস্বলের ধান চাউলের ব্যবসায়ীরা সরাসরি ইঁহাদের সহিত কারবার করার চেষ্টা করিতে পারেন।

১২। কলম-প্রস্তুত প্রণালী (সচিত্র)

কৃষি রাজ্যে ফলের ব্যবসায় যেমন লাভজনক

এরূপ অতি অল্প ব্যবসায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কলমের গাছ ইহার প্রাণ। এই প্রবন্ধে বহু চিত্রের দ্বারা দেশবিদেশের নানা রকম কলম প্রস্তুত প্রণালী দেখান হইয়াছে।

১৩। কাঠের পালিশ, রং ও বার্ণিশের ব্যবসা।

নাম মাত্র মূলধনে কেমন করিয়া এই ব্যবসা আরম্ভ করা যায় অনেক মাস ধরিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধে তাহার বিস্তর সন্ধান আছে। বেকার যুবকগণ এই প্রবন্ধ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। এবং ইচ্ছা করিলে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারেন।

১৪। কাঠের উপর মোম পালিশের প্রণালী।

যাঁহারা পালিশের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন কিম্বা নিযুক্ত হইতে চান, তাঁহারা এই প্রবন্ধে অনেক নূতন সন্ধান পাইবেন।

১৫। কাগজের গ্লাস।

কাগজের pulp বা মণ্ড হইতে আমেরিকায় যে সকল বাসনাদি তৈয়ারী হইতেছে, তাহার এজেন্সির বিবরণ। নূতন এক ব্যবসায়ের সন্ধান পাইবেন।

১৬। কাজের কথা।

নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনায় পূর্ণ।

১৭। খনার বচন।

টীকা টীপ্পনীসহ সমগ্র খনার বচনের বাংলা অনুবাদ এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপে বাহির হইয়াছে।

১৮। খয়ের প্রস্তুতের উপায়।

বিলাত ও আমেরিকা প্রত্যাগত বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের স্থাপয়িতা মিঃ এস, এম, বসু, এম, এস্ সি এই প্রবন্ধে কি উপায়ে বিহার ও আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে Tea ও Coffee Estates প্রভৃতির ন্যায় বৃহদাকারে খয়ের চাষের প্রচলন দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে তাহার পথ দেখাইয়াছেন। তাহা ছাড়া খয়ের প্রস্তুতের নানারূপ প্রক্রিয়া এবং খয়েরের ভেজাল সম্বন্ধেও অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। পানে এবং নানারূপ রঞ্জন শিল্পে লক্ষ লক্ষ টাকার খয়ের ব্যবহৃত হইতেছে। বৃহদাকারে খয়ের গাছের চাষ এবং তাহার রস হইতে খয়ের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ।

১৯। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল।

ব্যবসাও বাণিজ্যে প্রায় প্রতি মাসেই এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কোন্ কোন্ খাদ্য দ্রব্যে সাধারণতঃ কি কি ভেজাল মিশাইয়া থাকে তাহার বিবরণ এবং কলিকাতায় যাহারা ভেজাল জিনিষ বেচার জন্য ধরা পড়িয়া সাজা পাইয়াছে তাহাদের সকল বিবরণ বাহির করা হইয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠে লোকের চোখ ফুটীবে।

২০। গো সেবা।

এই প্রবন্ধে দুগ্ধবতী গাভীর সেবা এবং দোহন সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আলোচিত হইয়াছে।

২১। গো চিকিৎসা।

গরুর যত রকমের ব্যাধি আছে তাহার লক্ষণ এবং চিকিৎসা প্রণালী এই প্রবন্ধে মাসের পর মাস ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

২২। ঘিয়ের ভেজাল বা ঘি বনাম ভেজিটেবল্ প্রোডাক্ট্।

ঘিএর নানারূপ ভেজাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত নানা তথ্য পরিপূর্ণ প্রবন্ধ।

২৩। চীনা বাদাম।

এই প্রবন্ধে চীনা বাদাম চাষের প্রণালী, ব্যবসায়, রপ্তানীর বিবরণ ইত্যাদি নানা বহু মূল্যবান সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৪। চিনির ব্যবসায়ের বিবরণ।

এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে চিনির ব্যবসায়ের সূত্র

হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমূল বিবরণ, পৃথিবীর যে যে দেশ হইতে ভারতে যে পরিমাণ চিনি বছর বছর আমদানী হয় তাহার বিবরণ এবং এদেশে চিনি উৎপাদন এবং পরিষ্কার করণের উপায় এবং ব্যবসা সম্বন্ধে যে বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে তাহার আনুপূর্ব্বিক আলোচনা বাহির হইয়াছে।

২৫। চা ব্যবসায়ের বিবরণ।

পৃথিবীর কোন্ দেশ কি পরিমাণ চা আমদানী করে তাহার আমূল বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৬। চা বাগানের অবস্থা।

এই অধ্যায়ে বাংলা দেশের অনেকগুলি পরিচিত চা বাগানের অবস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৭। ছাতা প্রস্তুত ও মেরামত প্রণালী। (সচিত্র)

বেকার যুবকদিগের নিকট এক নূতন উপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করিবে। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটীরও উপর ছাতা বিক্রীত হয়। এই ব্যবসায়ের নানা ধাপে কত লোক যে অন্ন করিয়া খাইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতি সামান্ত পুঁজি নিয়া কেমন করিয়া ছাতা তৈরী এবং মেরামতের কারখানা করা যায়। এই প্রবন্ধে ১১ খানি চিত্র সহ তাহার আমূল বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৮। ছাতার হাতল প্রস্তুতের ব্যবসায়। (সচিত্র)

এই প্রবন্ধে কয়েকটী শ্রমলাঘবকারী যন্ত্রের চিত্রাদি সহ বিশেষ বিবরণ দিয়া বর্ত্তমান ছাতার হাতল প্রস্তুতের ব্যবসায়ে—কিরূপে অল্পব্যয়ে প্রচুর লাভ করা যায় তাহা দেখান হইয়াছে। অল্প মূলধনে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার আয় ব্যয়ের Estimate ও ইহাতে আছে।

২৯। ছাতার হাতলের কারখানা সমূহের তালিকা।

চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ছাতার বাঁশের খরিদদারদিগের নাম ও ঠিকানা এই প্রবন্ধে পাইবেন।

৩০। জাম।

এই প্রবন্ধে জামের আরক বা সিরাপ দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখার উপায় আলোচনা করা হইয়াছে।

৩১। জুতার কালী।

এই প্রবন্ধে বহু রকমের জুতার কালী প্রস্তুতের পরীক্ষিত ফরমূলা সমূহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৩২। জলপাইয়ের বাগিচা।

চা, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতির স্তায় জলপাইয়ের বাগিচা পত্তনের উপায় এবং তাহার চাষের বিবরণ। উৎকৃষ্ট Toilet সাবানের উপাদান এবং সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে খাদ্য হিসাবে জলপাইয়ের এত টান্ যে পৃথিবীতে জলপাইয়ের তেলের দাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আমাদের দেশের সম্পন্ন গৃহস্থগণ একশো দুশো বিঘা জমি নিয়ে চা, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতির বাগিচার স্তায় যদি জলপাইয়ের বাগিচা করেন তবে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন। এই প্রবন্ধে জলপাইয়ের বাগিচা প্রস্তুত এবং তাহার নানারূপ ব্যবসায়ের কথা প্রকাশ করা হইয়াছে।

৩৩। ডিম রক্ষার উপায়।

মুরগী এবং হাঁসের ডিম কেমন করিয়া দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা দেশে যে চৌদ্দ প্রকার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে এই প্রবন্ধে তাহার সমুদয় সন্ধান প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জনৈক গ্রাহক লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ব্যবসা ও

বাণিজ্যে আর কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ না করিয়া যদি কেবল এই সংবাদটীই প্রকাশিত হইত তাহা হইলেও শুধু এই সংবাদ টুকুর মূল্যই একশত টাকা দিয়া লোকে আনন্দে গ্রহণ করিত।

৩৪। তুলা প্রসঙ্গ।

চরকা এবং খদ্দর বাঙ্গালাদেশে যুগান্তর আনিয়াছে। কিন্তু ইহার মূল সূত্র হইতেছে তুলা। সেই তুলার জন্ম, চাষ, সংগ্রহ, ছাটাই, বাছাই এবং ব্যবসা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ বহু মাস ব্যাপী ধারাবাহিক প্রবন্ধ।

৩৫। তৈল ডিওডোরাই জিং বা গন্ধহীনকরার প্রণালী।

নানারূপ গন্ধ তৈল প্রস্তত করার আগে Basie তেলকে গন্ধ হীন করিয়া লইতে হয়। কেমন করিয়া তাহা করিতে হয় তাহা এই প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

৩৬। দিয়াশলাইয়ের রাসায়নিক মিশ্রন প্রণালী।

বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের রাসায়নিক বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত। আজকাল অনেকে কুটীর শিল্প হিসাবে দিয়াশলাই প্রস্তুত করত অবস্থা ফিরাইয়া লইয়াছেন। তাহার মত এই প্রবন্ধে কেমন করিয়া দেশলাইয়ের কাঠির এবং বাক্সের বারুদ তৈয়ার করিতে হয়, নানা ফরমূলা সহ তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩৭। ধান ঝাড়ার উপায়।

ধান ঝাড়ার যে সকল অল্প মূল্যের হাতকল এবং পাওয়ার কল পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে এই প্রবন্ধে তাহার মূল্যাদি এবং ব্যবহার প্রণালী বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৩৮। ধোপার ব্যবসায়। (সচিত্র)

আজকাল সহর বাজারে Dyeing Cleaning বা ধোপার ব্যবসায়ের অনেক দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলিতে ধোপার ব্যবসা সম্বন্ধে আধুনিক নানারূপ যন্ত্রপাতির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে বহু লোক ধোপার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জন করিতেছেন।

৩৯। নারিকেলের চাষ।

চা, কফি, কোকো প্রভৃতির ন্যায় কেমন করিয়া বাংলার নিম্নভূমিতে বৃহদাকারে নারিকেলের আবাদ করা যায় এবং সেই নারিকেলের এষ্টেট হইতে Tea Factoryর ন্যায় ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করতঃ ঝাঁটার কাঠী, নারিকেল ছোবড়া বা Coir, কাতা, দড়ী, কাছী, হুঁকার খোল, মালার বোতাম, নানারূপ ফ্যান্সি জিনিষ, নারিকেলের তেল, খইল, মাখন ইত্যাদি নানা জিনিষের যে কি বিরাট ব্যবসায়ের পত্তন করা যায় সে সম্বন্ধে বহু মাসব্যাপী ধারাবাহিক প্রবন্ধ:—যাহা পড়িয়া বাংলা দেশের কয়েকজন বিখ্যাত জমিদার আমাদের লিখিয়াছিলেন, এই এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই আমরা প্রভূত উপকার পাইয়াছি।

৪০। নারিকেল রপ্তানীর বিবরণ।

গত ৩ বৎসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ নারিকেল এবং নারিকেলজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হইয়াছে তাহার আমূল বিবরণ এখানে পাইবেন।

৪১। নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ

এই অধ্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় নানা সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে যাহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর দৈনন্দিন জীবনে রোজ জানিবার দরকার হয়, কিন্তু কোনও সন্ধান না জানায় সর্ব্বত্র হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয়। ব্যবসা ও বাণিজ্যের ২৮ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া এই নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪২। পাট গাছের পোকা।

ধানের নীচেই পাট বাংলার কৃষকদিগের এক প্রধান সম্পত্তি। এক এক বছর পাটে সংক্রামক পোকা লাগিয়া ক্ষেত কে ক্ষেত একেবারে উজাড় হইয়া যায় এবং কৃষকগণ ধনে প্রাণে মরে। পাটের পোকা নষ্ট করার উপায় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

৪৩। পাট প্রসঙ্গ।

এই প্রবন্ধে পাটের চাষ হইতে চট্ তৈরী পর্য্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটী ধারাবাহিক প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে।

৪৪। পাটের ফট্‌কা খেলা।

পাটের ফট্‌কার কথা সকলেই শুনিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। এই প্রবন্ধে সেই পাটের জুয়া খেলার সকল গুড় রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪৫। ৩৪ সালে স্থাপিত লিমিটেড কোম্পানী সমূহের বিবরণ।

৪৬। ৩৪ সালে যে সকল কোম্পানী ফেলপড়িয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ।

৪৭। বড় বড় কণ্ট্রাক্টের খবর ও বিবরণ।

ইহা পড়িলে বছর বছর যেখানে বড় বড় কণ্ট্রাক্ট সকল দেওয়া হয়, তাহার বিবরণ পাইবেন।

৪৮। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক।

বাঙ্গালীর বুকের রক্ত দিয়া গড়া ব্যাঙ্কের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হৃদয় বিদারক কাহিনী। এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

যে সকল কথা কোথাও আলোচিত হয় নাই সেই সকল ভিতরকার কথা এই প্রবন্ধে পাইবেন এবং লিমিটেড কোম্পানী পরিচালনা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের সমুদয় ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

৪৯। বিনা মূলধনে ব্যবসায়।

যে সকল হাজার হাজার বেকার যুবক মূলধনের অভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের নিকট এই প্রবন্ধ—উপার্জ্জনের এমন অনেক নূতন পথ দেখাইয়া দিবে যাহাতে কোনও মূলধনের দরকার নাই।

৫০। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল।

বাঙ্গালীর আর একটী বুকের ধন বঙ্গলক্ষ্মী কেমন করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার বিবরণ।

৫১। বাংলার পাট ও পাটের ব্যবসায়।

ক্রমাগত পাঁচ মাস ধরিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধে—জনৈক বিশেষজ্ঞ পাটের ব্যবসায়ের নানা তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

৫২। বীমা প্রসঙ্গ।

আজকাল দেশে জীবন বীমার কাজ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বীমাকারীর স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে যাহা প্রত্যেক বীমা কারীরই জানা উচিত।

৫৩। বিদেশী বীমা কোম্পানী।

কেমন করিয়া বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহ এদেশের অর্থ শোষণ করিতেছে তাহার বিশেষ বিবরণ।

৫৪। বাংলার দুর্দ্দশা।

Bengal Canning & Condiment Factoryর Managing Director বিদেশ প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার এই প্রবন্ধে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাংলার দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বাঙ্গালী সকলেই অনেক ভাবিবার কথা পাইবেন।

৫৫। বাংলার অর্থোপার্জ্জন সমস্যা।

নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবন্ধ। সকলকেই এই প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি।

৫৬। বাঙ্গালীর ব্যবসায় পথের অন্তরায়।

কমলালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, বাঙ্গালীর ব্যবসায় পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন রহিয়াছে এই প্রবন্ধে তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৭। বাংলার দিয়াশালাই শিল্প।

এই শিল্পের উন্নতি পথে কি কি বাধা বিঘ্ন আছে এবং কিরূপে সে সকল দূর করতঃ উত্তরোত্তর আয় বাড়ানো যাইতে পারে ধারাবাহিক প্রবন্ধে নানা মূল্যবান সংবাদ সহ তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

৫৮। বাঙ্গালীর ব্যবসায় পথের অন্তরায়।

বহু গবেষণা পূর্ণ আর একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ। বাঙ্গালী আর সকল বিষয়ে ভারতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াও কেবল মাত্র ব্যবসা ক্ষেত্রে অবাঙ্গালী জাতি সমূহের নিকট কেন প্রতি পদে হারিয়া যাইতেছে তাহার কারণ এবং প্রতিকারের পন্থা এই অপূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশদ রূপে আলোচিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শত শত লোক আমাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

৫৯। বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ।

ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের কোথায় স্থান এবং কিরূপ বিজ্ঞাপন সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ সে বিষয়ে আধুনিক মতামত আলোচনা করা হইয়াছে এবং অনেক রকম নূতন নূতন বিজ্ঞাপন দেবার প্রথা প্রকাশ করা হইয়াছে।

৬০। ভারতে দিয়াশলাই শিল্পের অবস্থা।

দিয়াশালাই শিল্পে আজকাল অনেকেই আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। এই শিল্পের বর্ত্তমান সুবিধা অসুবিধা এবং ভবিষ্যতের অবস্থা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

৬১। ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের বিবরণ।

পৃথিবীর যে সকল দেশে ভারতের কাঁচা মাল রপ্তানী হয় এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকরূপ তাহার আমূল বিবরণ পাইবেন। এই সকল কাঁচা মাল আবার সেই সকল দেশে যন্ত্রের সাহায্যে পাকা মালে (Finished goods) রূপান্তরিত হইয়া এ দেশে আসে এবং বিক্রীত হয়। এই বিবরণ পড়িলে চিন্তাশীল ব্যবসায়ী বুঝিতে পারিবেন যে এই সকল জিনিষের মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ এদেশেই যন্ত্র সাহায্যে পাকা মাল (Finished goods) এ পরিণত করিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখা এবং নিজেও ধনী হবার ব্যবস্থা করা যায়।

৬২। ভারতের মালের খরিদদার।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে ভারতের Raw produce বা কাঁচা মাল ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ দেশে কি কি জিনিষ সচরাচর কাটিয়া থাকে। গত ৩ বৎসর যাবত পৃথিবীর কোন্ দেশে ভারতের মাল কত কাটিয়াছে তাহার সংবাদ এই প্রবন্ধে পাইবেন।

৬৩। ভারতে বিদেশী মালের আমদানী।

বিদেশ হইতে ভারতে যে যে জিনিষ যত টাকার আমদানী হয় তাহার আমূল বিবরণ এই প্রবন্ধে পাইবেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে এই সকল আমদানী দ্রব্যের মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ আমরা নিজেদের দেশেই তৈরী করে দেশের এবং নিজের ধনাগমের পথ করিতে পারি।

৬৪। ময়ূর ডঞ্জের বিবরণ।

ময়ূর ভঞ্জে নানারূপ ব্যবসায়ের সন্ধান এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে।

৬৫। মৎস্যের ব্যবসায়।

নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ অনেক বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ।

৬৬। মাখন প্রস্তুত প্রণালী।

কেমন করিয়া দুধ হইতে মাখন তুলিয়া বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী মাখন তৈয়ার করিতে হয় তাহার আধুনিক প্রণালী সমূহ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে।

৬৭। মুরগার ব্যাধি ও তাহার চিকিৎসা।

পাঁচ মাস ব্যাপী ধারাবাহিক প্রবন্ধে মুরগীর নানা রোগ ও তাহার চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

৬৮। মাসিক বনাম দৈনিক বিজ্ঞাপন।

মাসিক পত্রে অথবা দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া লাভজনক সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে তুলনামূলক সমা-লোচনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপন দাতাগণ এই প্রবন্ধে ভাবিবার অনেক বিষয় পাইবেন।

৬৯। মার্ব্বেল পাথরের যত্ন।

কেমন করিয়া ইহা পরিষ্কার রাখিতে হয়, দাগ তুলিতে হয় তাহার সন্ধান আছে।

৭০। যশোহরের কৃষি সম্পদ।

যশোহর জেলা হইতে যে সকল কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে (যথা খেজুর গুড়, লঙ্কা, আনারস, মানকচু, নারিকেল প্রভৃতি) তাহার আমূল বিবরণ এই প্রবন্ধে বাহির করা হইয়াছে।

যৌথ কারবার সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা।

বাংলা দেশে যৌথ কারবার গঠনের সম্বন্ধে অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আছে।

৭১। রবারের ইতিহাস (সচিত্র)

আজকাল লোকে বলে যে পৃথিবী রবারের উপর চলিতেছে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীর সমস্ত মোটর গাড়ী, যান বাহন এবং ছেলেদের খেলনাতেও পর্য্যন্ত যেরূপ বিরাট আকারে রবারের ব্যবহার হইতেছে তাহাতে পৃথিবী রবারের উপরেই চলিতেছে বলা যায়। এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপে রবারের চাষ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা প্রকাশ করা হইয়াছে।

৭২। লিমিটেড্ কোম্পানীর বিবরণ।

৩৪ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে যত লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং ফেল পড়িয়াছে সেই সমুদয় কোম্পানীর বিবরণ এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপে মাসের পর মাস প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক কোম্পানীর বিবরণ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। সকল দেওয়া হয় তাহার বিবরণ পাইবেন।

৭৩। লিমিটেড কোম্পানী সমূহের অবস্থা—

এই সকল প্রবন্ধে বাংলা দেশের সমুদয় ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানী, চা বাগান সমূহ চট্ কল, কাগজের কল এবং অন্যান্য নানাবিধ কলের অবস্থা গত তিন বৎসর যাবত কিরূপ ছিল তাহা বিশদরূপে দেখানো হইয়াছে।

৭৪। শঙ্খশিল্পের ব্যবসায় (সচিত্র)

কয়েকটী ছোট খাটো যন্ত্রের সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতি মত কিরূপে শঙ্খের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করা যায় এবং বাংলা দেশে শঙ্খ শিল্পের কিরূপে উন্নতি করা যায় সে সম্বন্ধে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক লিখিত সচিত্র প্রবন্ধ।

৭৫। শোলা ও শোলার ব্যবসায়।

বাংলা দেশের বহু জলা জায়গায় শোলা জন্মে এবং বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে উহা সংগ্রহ করা যায়। ব্যবসায় জগতে শোলা কি কি কাজে ব্যবহার হয় এবং তাহা বিক্রয়ের সন্ধানাদি সহ নানা জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ এই প্রবন্ধ বেকার যুবকদিগের পক্ষে অবশ্য পঠনীয় হওয়া উচিত।

৭৬। শিমুল ও আকন্দ।

শিমুল তুলার চাহিদা জগতে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, তাই শিমুলের বীচি হীন ১১৷০ মণ গাঁইট কখনও কখনও ৪০।৪২ টাকাতেও রপ্তানী হইতেছে। এই প্রবন্ধে শিমুল তুলার ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক সন্ধান পাইবেন।

৭৭। সিনেমা।

সিনেমা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা আলোচনা আছে।

৭৮। Cotton Waste বা সুতার ছাঁট।

পৃথিবী ব্যাপী কল কারখানা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে জগতে সুতার ছাঁটের যে কি স্থান্ পড়িয়াছে তাহা ধারণা করা যায় না। এই প্রবন্ধে তাঁতীদের তাঁত হইতে যে সুতার waste বা বাতিল সুতা বাহির হয়, তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিপূর্ণ বিস্তৃত আলোচনা বাহির হইয়াছে। ইহা পাঠে অর্থোপার্জ্জনের আর এক নূতন সন্ধান পাইবেন।

৭৯। সমবায় কনফারেন্স।

এই প্রবন্ধে সমবায় সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির করা হইয়াছে। রবিবাবুর প্রবন্ধের পরিচয় অনাবশ্যক।

এই সকল মূল্যবান প্রবন্ধ পরিপূর্ণ ৩৪ সালের সম্পূর্ণ বাঁধাই সেটের মূল্য ৪।৵০ ভিঃ পিঃ ডাকে এই সেট্ পাঠানো হয় না। কারণ কোন কারণে ভিঃ পিঃ ফেরত দিলে আমাদের প্রায় এক টাকা পোষ্টেজ দণ্ড যায়। এইজন্য নগদ অথবা মণিঅর্ডার ব্যতীত এই সকল সেট্ কোথাও পাঠানো হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মনে রাখিবেন এই সকল প্রবন্ধ এক সঙ্গে ১ বৎসরের সেট বাঁধানো হইয়া গিয়াছে, ছুটো সংখ্যা আর একখানিও পাওয়া যাইবে না।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৯ম বর্ষ } মাঘ ১৩৩৬ { ১০ম সংখ্যা

রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রধানতঃ বার্ণিশের উপাদানরূপেই রঞ্জন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ শ্রেণীর রং প্রস্তুতের কাজে রঞ্জনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু "এনামেল পেণ্ট" প্রস্তুত করিতে হইলে এই রঞ্জন ছাড়া কাজ চলে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বার্ণিশের সহিত বিভিন্ন রংএর গুড়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মিশ্রিত করিলেই এনামেল প্রস্তুত হইয়া থাকে। বার্ণিশ প্রস্তুতের জন্য সাধারণতঃ যে শ্রেণীর রঞ্জন ব্যবহৃত হয়, তাহাকে শিল্পীরা "গাম" বলিয়া অভিহিত করেন।

এই রঞ্জন আবার অনেক প্রকারের আছে। [illegible] এই রঞ্জনকেই ইংরাজীতে copal, Rosin, Dammar এবং Lac বলিয়া অভিহিত করা হয়। তেলের বার্ণিশ প্রস্তুত করিতে হইলে copal ও Rosin এর প্রয়োজন হয়; কিন্তু spirit বার্ণিশ তৈয়ারী করিতে গেলে dammar ও lac না হইলে চলে না।

Copal :—বার্ণিশ নির্ম্মাণের উপযোগী বিভিন্ন রকমের শক্ত রজন এই copal নামে পরিচিত হইয়া থাকে। উপাদান, গুণাবলী এবং উৎপত্তি স্থান বিভিন্ন হওয়ায় এই copal এরও যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন copal অতি পুরাতন পদার্থ—অনেকটা বিকৃত ধরণের জিনিষ। আবার কোন কোন copal [illegible]

টাট্কা আটা বিশেষ। এই অবস্থায় copalএর শ্রেণী বিভাগ করা বড়ই জটিল ব্যাপার। তথাপি বর্ত্তমান শিল্প জগতে নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা :—East African, West African, Kanri and Manilla, সাধারণতঃ দেখা যায় যে পূর্ব্ব আফ্রিকার copalই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত জাঞ্জিবার হইতে যে copal বিভিন্ন দেশে চালান যায়, বাজারে তাহার যথেষ্ট সুনাম আছে। পশ্চিম আফ্রিকার copalও এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এশিয়া মহাদেশে—বিশেষ ভাবে ফিলিপাইন দ্বীপে ও Straits Settlementsএ যে copal উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাকে Manilla নাম দেওয়া হইয়াছে। Kanri শ্রেণীর copal সাধারণতঃ নিউজীল্যাণ্ডে উৎপন্ন হয়। Manilla copal বার্ণিশ প্রস্তুতের পক্ষে একটি প্রধান উপাদান; তবে এই শ্রেণীর copal আফ্রিকার copalএর সমকক্ষ হইতে পারে না।

copal ভাল কি মন্দ তাহার বিচার হয়—ইহার রং হইতে এবং শুষ্ক হইলে ইহা কতদূর শক্ত হইতে পারে—সেই গুণ হইতে। Hard copal হইতে উৎকৃষ্ট রকমের বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। তারপর অন্যান্য পাতলা রংএর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করার উপযোগী যে অপেক্ষাকৃত মলিন (Pale) বার্ণিশ, তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে রংবিহীন copal একান্ত প্রয়োজন। রংদার copal দ্বারা প্রস্তুত বার্ণিশ কিন্তু অন্য রংএর সহিত মিশ্রিত করা যায় না; কারণ তাহাতে মিশ্রিত রংটি বিকৃত হইয়া যায়। মোটের উপর বার্ণিশ নির্ম্মাণের উপযোগী কোন প্রকার copalই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না। ভারতবর্ষে এত সব গাছ গাছড়া ও বনজঙ্গল এখনও রহিয়াছে। এ সমস্তের রস ও আটা হইতে copal প্রস্তুত করা বোধ হয় একান্ত অসম্ভব হইবে না। কিন্তু সেদিকে চেষ্টা তো কাহারও নাই। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের M. Sc; B. Sc; এবং D. Sc; প্রভৃতি বড় বড় উপাধিধারী রসায়ণ শাস্ত্রবিৎ বিশ্বপণ্ডিতেরা কয়েকটিমাত্র কলেজের দ্বারে মাষ্টারীর জন্য অথবা সওদাগরী আফিসে কেরাণীগিরির জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হইতেছেন; আর দেশের কৃতি সন্তান মালক্ষ্মীর বরপুত্রগণ ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীকে ধিক্কার দিতেছেন,—ব্যস্, এই পর্য্যন্তই সকলের কর্ত্তব্য শেষ! কিন্তু এই শ্রেণীর বেকারদিগকে কাজে লাগাইয়া যে নিত্য নূতন অর্থাগমের পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে—সেদিকে তো কাহারও নজর পড়িতেছে না। পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশ আজ তাহাই করিতেছে। যাহার মধ্যে যত টুকু—যে প্রকার শক্তিই থাকুক না কেন, সেই শক্তিকে সব দিক দিয়া নিঃশেষে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। যদি নিজের দেশে ইহাদের কাজের সংস্থান না হয়, তবে অপর দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জীবিকার্জ্জনের উপায় করিতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এই যুগের রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তি—কেহই কোন দেশে ঘুমাইয়া নাই। কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া দেশ—ভারতবর্ষেই সমস্ত বিপরীত নীতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

copal প্রস্তুতের কথা বলিতেছিলাম। ভারতের গাছগাছড়া হইতে এ জিনিষ উৎপাদন করা সম্ভবপর কি না—তাহার উপযুক্ত গবেষণামূলক পরীক্ষা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। অগৌণে তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইলে বিদেশী আসিয়া যখন এই শিল্পটি হস্তগত করিবে

তখন আমাদের কেবল "হা হুতাশ" করাই সার হইবে। ভারতীয় বার্ণিশ প্রস্তুতের জন্ত যে পরিমাণ copalএর প্রয়োজন হয় তাহার প্রায় সমস্তই এখন Straits Settlement হইতে আমদানী করা হয়। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা যেমন লাভজনক নহে,—তেমনি সুনামের কথাও নহে।

Rosin :- প্রকৃতপক্ষে Rosin কোনও নূতন জিনিষ নহে ; ইংরাজীতে যাহাকে Resins নাম দেওয়া হইয়াছে Rosin তাহারই একটা প্রকার বিশেষ। বিভিন্ন শ্রেণীর গাছগাছড়া হইতে যে আটা ও রস বাহির হয় তাহাকেই সাধারণতঃ Resins অথবা রজন বলা হয়। কিন্তু পাইন গাছ হইতে যে রজন পাওয়া যায় তাহাকেই কেবল Rosin বলিয়া থাকে। এই Rosinকে কেহ কেহ আবার colophony নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বার্ণিশ প্রস্তুতের উপযোগী রজনকে কোন কোন স্থলে "গাম" বলিয়া অভিহিত করা হয় বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ বলা ভুল। কারণ গাম ও রজন—এই উভয় সামগ্রী গাছ-গাছড়ার নির্য্যাস হইলেও তাহাদের গুণাবলী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিষ "গাম" নামের উপযুক্ত তাহা কখনও বার্ণিশ প্রস্তুতের কাজে লাগে না।

বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত যে রজন, মোটামুটি তাহার মধ্যে দুইটি জিনিষ থাকে। যথা :-(১) বাতাসে উড়িয়া যায় এরূপ তৈল এবং (২) যাহা সহজে শুষ্ক হয় না বা উড়িয়া যায় না এরূপ আটা। তার্পিন তেল প্রস্তুতের প্রণালী বর্ণনার সময়ে বলা হইয়াছে যে, রজন হইতে চুয়াইয়া তার্পিন তেল বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে Rosin বলা হয়। এই Rosin গলাইয়া এবং ছাঁকিয়া পিপার মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে চালান দেওয়া হয়। আসল রজন হইতে শতকরা ৭০ ভাগ হিসাবে এই Rosin পাওয়া যায়। কাজেই উৎপন্ন Rosinএর পরিমাণ নিতান্ত সামান্ত নহে। নানারূপ শিল্পকার্য্যে এই জিনিষটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রং প্রস্তুতের কাজে, সাবানের মধ্যে এবং অপরাপর অনেক কাজেই Rosin না হইলে চলে না। তারপর এই জিনিষটি অনেক স্থলে লাক্ষার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। লাক্ষার সহিত Rosin আবার ভেজাল দেওয়াও হইয়া থাকে।

বার্ণিশের কাজে লাগাইবার পূর্ব্বে অপর জিনিষ মিশাইয়া Rosinকে শক্ত করিয়া লইতে হয়। আসলে Rosin খুব নরম পদার্থ—ইহা একপ্রকার acid substance কাজেই মূল ধাতুর সহিত ইহাকে অনায়াসে মিশ্রিত করা যায়। ধাতুর সহিত মিশ্রিত Rosinকে ইংরাজিতে Rosinates বলিয়া অভিহিত করা হয়। সীসা ও দস্তার সহিত অনেক সময় Rosin মিশাইয়া তাহাকে শক্ত করিয়া লওয়া হয়। তবে অধিকাংশ স্থলেই চুণের (Lime) সঙ্গে ইহাকে মিশাল দিয়া Calcium Rosinate প্রস্তুত হইয়া থাকে। সস্তাদরের বার্ণিশের মধ্যে Calcium Rosinate থাকা অনিবার্য্য। বেশী দামী বার্ণিশের মধ্যেও যে ইহা থাকে না—এমন নয় ; তবে পরিমাণে খুব কম থাকে।

তার্পিণ তেল প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে Rosin প্রস্তুতের পরিমাণও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণ Rosin এদেশে আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। কি পরিমাণ Rosin উৎপন্ন হয় এবং কি পরিমাণ

Resin বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় তাহার বিবরণ টন হিসাবে নিয়ে দেওয়া গেল :-

বৎসর	উৎপন্ন	আমদানী
১৯২৪-২৫	৩৬০৬	১১৬৬
১৯২৫-২৬	৩৬০৫	৯৪৫
১৯২৬-২৭	৪৬৯৭	১১৫৮

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, এই রজন সম্পর্কেও ভারতবাসী পরমুখাপেক্ষী রহিয়াছে ; অথচ ইচ্ছা করিলেই এদেশবাসী প্রচুর পরিমাণে রজন উৎপাদন করিয়া বিদেশে চালান দিতে পারে। কিন্তু তাহা করে কে ? ভারতের অপর্য্যাপ্ত বনজ সম্পদ বিদেশী আসিয়া দুই হাতে লুটিয়া খাইবে—আর ভারতবাসী আমরা—শিরে হাত দিয়া অভাবের তাড়নায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব আর কি ?

Dammar—ইহা খুব নরম একপ্রকার রজন ছাড়া আর কিছুই নহে। বার্ণিশের উপাদান হিসাবে Dammar তেমন মূল্যবান অথবা একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ বলিয়া বিবেচিত হয় না। dammarএর বিশেষত্ব এই যে, এই শ্রেণীর রজন অনায়াসে তার্পিন তেলের মধ্যে গলিয়া মিশিয়া যায়। ইহাতে যে বার্ণিশ প্রস্তুত হয়, তাহা কয়েকটি বিশেষ কাজে লাগিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে কাজের উপযোগী বার্ণিশের কথা বলা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ রংবিহীন বার্ণিশ প্রস্তুত করা যায় বলিয়াই dammar ব্যবসায়ীদের নিকট আদর পাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আর কোনও বিশেষত্ব dammarএর আছে বলিয়া মনে হয় না।

এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকৃতির গাছগাছড়া আছে। সেগুলি হইতে হরেক রকমের রজন উৎপন্ন হয়। dammar Straits Settlementএই পাওয়া যায়। তবে আজকাল ব্রহ্ম দেশেও অল্প পরিমাণে এই জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে। ভারতবর্ষেও যে dammar একেবারে দুর্লভ—এমন কথা বলা যায় না। তবে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভারতীয় dammar এখনও করিয়া লইতে পারে নাই। ভারতবাসীরা তো এসব বিষয়ে একেবারে উদাসীন। বিদেশীরা আসিয়া যেদিন সমস্ত দখল করিবে—সেদিন হয়ত একান্ত অসময়ে তাহাদের চোখ ফুটিবে !

Lac :—লাক্ষা নামে পরিচিত রজন কেবল ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর কোনও দেশেই এই জিনিষ প্রস্তুত হয় না। বলিতে গেলেই এই জিনিষটি ভারতবাসীর একচেটিয়া শিল্প। অল্প বিস্তর লাক্ষা অবশ্য ইণ্ডো-চীন ও শ্যাম দেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারতীয় উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণের তুলনায় ইণ্ডো-চীন ও শ্যামের লাক্ষার পরিমাণ একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে। তারপর ইণ্ডো-চীন ও শ্যাম হইতে যে লাক্ষা রপ্তানী হয় তাহা প্রায়ই সাধারণ শ্রেণীর লাক্ষা (Stick lac) কিন্তু বাজারে যে শ্রেণীর লাক্ষার আদর ও কাটতি বেশী তাহা হচ্ছে সেল্যাক—(Shellac) একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই এই জিনিষটি উৎপাদিত হয়।

এই লাক্ষার চাষ ও সেল্যাক প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিগত কয়েক মাস ধরিয়া "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে আলোচিত হইয়াছে।

এই লাক্ষা অনেক কাজে লাগে। French polish, insulating varnishes and lacquers প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা একরূপ অপরিহার্য্য বলিতে হইবে। ইহা ছাড়া ছাড়া অন্যান্য কাজেও বিস্তর লাক্ষা ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। দৃষ্টান্ত—চুণী তৈয়ারী করা, গ্রামোফোনের রেকর্ড নির্ম্মাণ করা এবং সিলমোহর করিবার উপযোগী গালা তৈয়ার করার কথা বলা যাইতে পারে। এই সমস্ত কার্য্যেই প্রচুর পরিমাণে গালার প্রয়োজন হয় বলিয়া অধুনা এই জিনিষটির আদর ও কাটতি যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কৃত্রিম রঞ্জন প্রস্তুতের চেষ্টাও কম হয় নাই। সাধারণতঃ Phenols এবং aldehydes হইতে রঞ্জন তৈয়ারীর চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহাতে ফল নিতান্ত মন্দ হয় নাই। এই শ্রেণীর কৃত্রিম রঞ্জন কথনও কথনও বার্ণিশ প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয় বটে। তবে অধুনা কৃত্রিম রঞ্জনের ব্যবহার অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। মোটের উপর কৃত্রিম রঞ্জন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না।

(ক্রমশঃ)

হোরেস গ্রীলি

"মহাশয়, আপনিই কি ছাপাখানার মালিক ?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া মিঃ গ্রিল্ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন—বাগানের প্রবেশ দ্বারে একটি অদ্ভুত বালক দণ্ডায়মান। তাহার চেহারা যেমন কদর্য্য পোষাক পরিচ্ছদও তেমনি পরিপাটি বিহীন। মোটের উপর এসব দিকে যেন বালকের কোন লক্ষ্যই ছিল না। অনুমানে বোধ হইল—ইহার বয়স ১৫ বৎসর হইবে। তাহার অদ্ভুত ভাবভঙ্গী এবং পোষাক পরিচ্ছদ মিঃ গ্রিলের কৌতুহল উদ্রেক করিল। কোনমতে বিদ্রূপের হাসি চাপিয়া তিনি উত্তর করিলেন—

"হাঁ আমিই। তোমার কি প্রয়োজন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই উত্তরের জন্ত বিশেষ অপেক্ষা না করিয়া মিঃ গ্রিল তাহার কাজে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তাহার বাগানে আলুর বীজ বপন করিতেছিলেন।

বালকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"মহাশয়, ছাপাখানার কাজ শিখিবার জন্ত আপনার একটি বালকের প্রয়োজন আছে কি ?"

এই প্রশ্নে মিঃ গ্রিল্ বুঝিতে পারিলেন যে, বালকটি চাকরী প্রার্থী। কারণ তিনি "নর্দ্দার্ণ স্পেক্টেটার" পত্রে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান অদ্ভুত চেহারার বালক যে সে কাজের উপযুক্ত হইতে পারে তাহা তিনি ভাবিতেই পারিলেন না। তাই তাহাকে বিদায় দেওয়ার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—

হাঁ—এরূপ কতকটা ইচ্ছা আছে। তা' তুমি কি ছাপাখানার কাজ শিখিতে চাও ? সে কাজের জন্ত কিন্তু ভাল লেখাপড়া জানার দরকার হয়।"

বালক উত্তর করিল—"স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। তবে আমি নিজে

কতকটা পড়াশুনা করিয়াছি। ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী এবং অন্যান্য বিষয় প্রায় সমস্তই কিছু কিছু পড়িয়াছি।”

বালকের মুখে ইহা শুনিয়া মিঃ গ্রিসের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি বালককে প্রশ্ন করিতে সুরু করিলেন। মিঃ গ্রিন একবার স্কুল ইন্সপেক্টার হইয়াছিলেন। কি করিয়া ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয় এবং চাকরী প্রার্থী শিক্ষকগণকে জব্দ করিতে হয়—তাহার কৌশল মিঃ গ্রিসের খুব ভালরূপেই জানা ছিল। তথাপি তিনি কিছুতেই এই কদাকার বালকটিকে হটাইতে পারিলেন না। সহজ সরল প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া জটিল ও গুরুতর প্রশ্নগুলির পর্য্যন্ত একে একে সন্তোষজনক জবাব পাইয়া মিঃ গ্রিন এই বালকের প্রতি মুগ্ধ হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাপাখানার কাজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল।

এই চাকরী প্রার্থী বালকের নাম হোরেস গ্রীলি। উত্তর কালে ইনি প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট্ পদ প্রার্থী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। প্রিন্টার পদ হইতে একেবারে প্রেসিডেন্ট্ পদ প্রার্থী। ব্যাপার নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু বাস্তব জগতে এমনই সব ঘটনা ঘটিতে পারে যে গুলি মানুষের কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া যায়। তাই সেক্সপীয়র লিখিয়া গিয়াছেন—There are more things on Heaven and Earth, Horatio, which your philo sophy can not dream of—

অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন সব অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ দেখা যায়—যাহা দার্শনিকের কল্পনায়ও ধরা পড়ে না। হোরেস গ্রীলির জীবনে এরূপ একটি বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাই।

দরিদ্র পিতার সন্তান হোরেস—শৈশবে শিক্ষা লাভেরকোন সুযোগই পায় নাই বলিতে হয় সে একদা বিরাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইবে—একথা প্রথমতঃ কে ভাবিয়াছিল? কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়া গেল। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্। কিন্তু আশ্চর্য্য ইহার কিছুই নাই। হোরেসের বাল্য জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, উন্নতির মূলমন্ত্র লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটা অনন্ত সাধারণ একাগ্রতা, কঠোর অভিনিবেশ, চূড়ান্ত অধ্যবসায় তাহার মধ্যে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাই তিনি উত্তরকালে এতটা উন্নতি সাধন করিয়া মানব সমাজের বিস্ময় বিমুগ্ধ শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউ হেম্পিসিয়ার রাজ্যে ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হোরেস গ্রীলি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর গৃহস্থ ছিলেন। বাগানে ও কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করিয়া তাঁহার মাতা জীবিকার্জ্জন করিতেন; তবে তিনি একেবারে নিরক্ষর ছিলেন না। বাড়ী ফিরিয়া অবসর সময়ে পুস্তক পাঠ করিতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে গল্প বলিয়া বাড়ীর সকলকে আনন্দ দান করিতেন। তাঁহার আর একটি গুণ এই ছিল যে, শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে ও তিনি বিমর্ষ হইতেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদা হাস্যময়ী বলিলে, অত্যুক্তি করা হয় না।

জননীর এই সমস্ত গুণাবলী বিশেষভাবে অধ্যয়নের অনুরাগ সন্তানের জীবনের প্রতিফলিত হইয়াছিল। হোরেসের বয়স তিন বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। তাহাকে প্রাথমিক স্কুলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তথায় তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই পুস্তক পড়িতে

শিখিয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। চতুর্থ বৎসর বয়ক্রমের সময় হইতেই তিনি পুস্তক পড়ায় মনোনিবেশ করেন। যে সময় তিনি পুস্তক লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন—চীৎকার করিয়া কেহ না ডাকিলে বালক হোরেস পুস্তক ছাড়িয়া উঠিতেন না। দ্বিপ্রহরের সময় যখন তাঁহার পিতামাতা কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতেন তখন তিনি পুস্তক লইয়া কোনও গাছের ছায়ায় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন; তখন অপর কোন দিকেই তাহার খেয়াল থাকিত না। এমন কি, কেহ আসিয়া তাহার উপর না পড়িলে তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া উঠিতেন না।

এইরূপে তাঁহার বয়স যখন ছয় বৎসর হইল তখন দেখা গেল যে, পুস্তক পাঠের আগ্রহ তাঁহার মধ্যে অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহার পিতার বিশেষ কোন বহিপত্র ছিল না। বাইবেল জাতীয় দুই চারিখানা ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্রই বাড়ীতে ছিল। সেগুলি তিনি ইতিমধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তাহার পিতা একখানি সাপ্তাহিক কাগজ গ্রহণ করিতেন, হোরেস অতঃপর সেই কাগজের নিয়মিত পাঠক হইয়া উঠিলেন। যেদিন কাগজ আসিত সেদিন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না—কাগজবাহী পিয়ন আসিবার আন্দাজ এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই হোরেস প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। দূর হইতে পিওনকে দেখিয়া দৌড়াইয়া গিয়া তাহার হাত হইতে কাগজখানি খুলিয়া লইতেন এবং সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রত্যেকটি লাইন পাঠ করিয়া অপরকে তাহা পড়িতে দিতেন। শুধু তাহাই নয়—এই তাহাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ৭ মাইলের যতগুলি পঠিতব্য পুস্তক ছিল তৎসমস্তই হোরেস কোন না কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া অন্ততঃ একবার করিয়া পড়িয়াছিলেন। হোরেসের পড়ার বিশেষত্ব এই ছিল যে, একবার পাঠ করিলে তিনি আর কিছুই বিস্মৃত হইতেন না—প্রত্যেকটি কথা তাঁহার মনে থাকিত।

বলিতে ভুলিয়াছি যে, পুস্তক পাঠের অত্যধিক আগ্রহ হইতে একটা অকপট শ্রদ্ধার ভার পুস্তক প্রস্তুতকারী অর্থাৎ প্রিন্টারদের উপর তাঁহার দেখা দেয়। হোরেস তখন মনে মনে স্থির করেন যে, তিনি নিজে প্রিন্টারের ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। জীবনে কখনও তিনি এই আদর্শ ভুলিতে পারেন নাই।

এই সম্পর্কে হোরেসের বাল্য জীবনের একটি গল্প মনে পড়ে। হোরেস তখনও দশ বৎসর অতিক্রম করেন নাই। একদা তিনি কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে এক কর্ম্মকারের দোকানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি ঘোড়ার পায়ের তলা বাঁধানো হইতেছিল। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে হোরেস এই ব্যাপার পরিদর্শন করেন। বালকের এই অদ্ভুত কৌতুহল এবং অনন্য সাধারণ অভিনিবেশ দেখিয়া কর্ম্মকার তাঁহাকে বলে—

"হোরেস, কামারের ব্যবসায় শিখ্‌বে কি ?"

হোরেস তৎক্ষণাৎ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—

"না না, সে হয় না, আমি প্রিন্টার হব।"

এই ঘটনা হইতে তাঁহার ঐকান্তিক একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হোরেসের বাল্য জীবন সম্পর্কে আরও অনেক সত্য ঘটনা আছে—সেগুলি অনেকটা গল্পের মতই শোনায়। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তিনি স্বেচ্ছায়

বহি হাতে লইতেন ; কখনও পিতা মাতা তাঁহাকে পড়িবার জন্ত জিদ করেন নাই। স্কুলে এবং পিতার গোলা বাড়ীর কাজে যে সময় অতিবাহিত হইত, তাহার অতিরিক্ত প্রায় সকল সময়েই তিনি পুস্তক লইয়া নিবিষ্ট মনে পড়াশুনায় রত থাকিতেন। প্রাচীনকালে নাকি আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অস্ত্র পত্র জালিয়া রাত্রিতে অধ্যয়ন করিতেন। হোরেসের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি দেবদারু গাছের গোয়া-গুলি (Pine knot) দিনের বেলায় কুড়াইয়া রাখিতেন এবং সন্ধ্যার পর সেগুলি জালিয়া আলোকের মধ্যে তাঁহার সমস্ত পুঁথি পত্র লইয়া বসিতেন। এই দেবদারু গাছের এক প্রকার কাল কাল গোটা হয়, তাহাতে বিস্তর তৈল পাওয়া যায়, এইরূপে শীতকালের সুদীর্ঘ সন্ধ্যাকাল নিবিষ্ট চিত্তে পড়াশুনার কার্য্যে তাঁহার কাটিয়া যাইত। বস্তুতঃ অধ্যয়নের প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ কদাচিৎ দেখা যায়।

হোরেসের বয়স যখন ১০ বৎসর তখন তাঁহার পরিবারের বিকার উপস্থিত হয়। তাঁহার পিতা নিজের জন্ত ও অপরের জন্ত ঋণ জালে আবদ্ধ ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের পৈত্রিক বাড়ী খানি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। অতঃপর তাঁহার পিতা ওয়েষ্ট হেভেন নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দৈনিক মজুরী করিয়া তাঁহাকে অতি কষ্টে পরিবার পোষণ করিতে হইত। এইরূপ নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও হোরেসের অধ্যয়ন স্পৃহা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। তবে ইতিমধ্যে ছাপাখানার কাজ শিখিবার আগ্রহ তাঁহার আরও বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১১ বৎসর সেই সময় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া হোরেস জানিতে পারিলেন যে, এত অল্প বয়সে কোন ব্যবসায় শিক্ষা করা যায় না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সন্দেহ মিটিল না। তিনি একদিন নয় মাইল দূরবর্ত্তী সহরে গিয়া সন্ধান লইয়া আসিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে, এত অল্প বয়সে ছাপা খানায় প্রবেশ করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই তখন তিনি আরও ক্ষিপ্রতার সহিত পড়াশুনা চালাইতে মনস্থ করিলেন।

হোরেস গ্রীলি কখনও মদ্যপানে আসক্ত হন নাই। বাল্যকালে তিনি তামাক সিগারেট ইত্যাদি কোন প্রকার মাদক দ্রব্যই স্পর্শ করিতেন না। ওয়েষ্ট হেভেনের যে অঞ্চলে তাঁহার পিতার বাসস্থান ছিল, সেই অঞ্চল মদ্যপানের জন্ত প্রসিদ্ধ—তথাকার স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদাই মদ্য পানে নিমগ্ন থাকিত। নানা প্রলোভনের মধ্যেও হোরেস কিন্তু এই বদ্ অভ্যাস হইতে দূরে ছিলেন।

হোরেস সর্ব্বদাই পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিতেন বটে। কিন্তু ছাপাখানায় প্রবেশ করিবার সুযোগ অন্বেষণে কখনও তাঁহার অরুচি ছিল না। সকল সময়েই তিনি এই বিষয়ে উৎকর্ণ হইয়া ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ১৩ বৎসর তখন তিনি "নর্দার্ণ স্পেক্টেটার" পত্রে এক বিজ্ঞাপন দেখিতে পান। তৎক্ষণাৎ এই বিজ্ঞাপন পত্র সহ তিনি পিতার নিকট উপস্থিত হন। পরিবার পোষণে গলদ্ঘর্ম্ম পিতা তাঁহাকে বলেন—"হোরেস্, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, পোল্‌টিতে গিয়া খুঁজিয়া দেখ,—আমার কিন্তু সময় নাই।"

এইরূপে পিতার আদেশ পাইয়া হোরেস্ পায়ে হাঁটিয়া কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হন। অতঃপর কিরূপে তিনি মিঃ রিলের ছাপাখানার প্রধানতঃ

প্রবেশ করেন তাহার ইতিহাস পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া হোরেস তখন সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং পরদিনই মিঃ গ্রিসের ছাপাখানায় কাজ শিখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার চেহারা আদৌ ভাল ছিল না; তদুপরি বেশ ভূষার কোনও পারিপাট্য না থাকায় হোরেসের চাল চলন ও ভাবভঙ্গী ইত্যাদি সমস্তই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত। ছাপাখানায় প্রবেশ করিবা মাত্র এই সমস্ত বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অপরাপর শিক্ষার্থীরা যখন দেখিল যে, এই বালক একেবারে তন্ময় হইয়া কম্পোজের কাজ শিখিতেছে তখন তাহারা ঈর্ষাপরায়ণ না হইয়া পারিল না। এইরূপে হোরেসের প্রতি নানা প্রকার বিদ্রুপ বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল।

সাধারণ লোকের পক্ষে এই সমস্ত ঠাট্টা বিদ্রুপ সহ্য করা সম্ভবপর হইত না; কিন্তু হোরেস্ ছিলেন সর্ব্ব বিষয়েই অনন্যসাধারণ। এ সব তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না। মাত্র তিন দিনের চেষ্টায় তিনি সুন্দর রূপে টাইপ বসাইয়া দ্রুত কম্পোজ করিতে শিখিয়া ছিলেন। প্রথম দিনে সর্দ্দার কম্পোজিটার তাঁহার হাতে একটা কপি এবং Composing Stick দিয়া গেল; এই সঙ্গে এক আধটু উপদেশও দিয়াছিল। অতঃপর হোরেসকে আর কিছুই বলিতে হয় নাই।

হোরেসের একাগ্রতা দেখিয়া অন্যান্য শিক্ষার্থী বালকেরা একেবারে থ' বনিয়া গেল। তাহারা দেখিল যে, একমাস কাল চেষ্টা করিয়াও যে টুকু তাহারা শিখিতে পারে নাই, হোরেস্ সেটুকু দুই তিন দিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহাতে বালকেরা একটু ঈর্ষান্বিত না হইয়া পারিল না। তাহারা সকলে মিলিয়া হোরেস্‌কে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

কিন্তু হোরেস্ তাহাদিগকে কোন সুযোগই দিলেন না। কোনও বিষয়ে নবাগতের ন্যায় কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া আপন মনে তিনি কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন; কাজ করিবার সময়, তিনি তাঁহার অতিশয় নিকটবর্ত্তী সহকর্ম্মীর সহিত পর্য্যন্তও একটি কথাও বলিতেন না। এইরূপে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। ছাপাখানার শিক্ষার্থী বৃন্দের তাহাতে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহারা ভাবিতে লাগিল,—এত বড়ই অদ্ভুত প্রকৃতির লোক দেখিতেছি!

পরিশেষে তাহারা একটা কিছু করিতে মনস্থ করিল। ছাপাখানায় কালিমাখানো ছোট বড় অনেক রকমের রুল থাকে। একদা দিনের কাজ শেষ হইলে সর্দ্দার শিক্ষার্থীটি হোরেসের সমীপবর্ত্তী হইল। তাহাদের হাতে কালি-মাখানো একটি রুল ছিল। হোরেসের চুলগুলি লক্ষ্য করিয়া সে বলিল,—"ওহে ছাপাখানার কাজে ধূলা, বালি ও কালি ছাড়া আর কিছুই নাই। তোমার চুলগুলির রং যেরূপ সোণালী, তাহাতে তোমাকে ছাপাখানার উপযুক্ত লোক বলিয়া মনে হয় না। চুলগুলি আর একটু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের হইলে ভাল হইত।"

এই বলিয়া সে রুলটি লইয়া হোরেসের মাথায় বেশ করিয়া ঘষিয়া দিল। ইহাতে তাহার মস্তকটি কালিতে কদর্য্য হইয়া গেল। ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখিবার জন্য আফিস শুদ্ধ লোক উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু হোরেস্ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি নড়িলেনও না, কথাটিও বলিলেন না। বিনা বাক্যব্যয়ে

তিনি তখনও আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এরূপভাবে নানারূপ কথা আঁটিয়াও যখন শিক্ষা-নবীশেরা হোরেস্‌কে চটাইতে পারিল না, তখন তাহারা নিরাশ হইয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে অগ্রসর হইল।

এখানে হোরেসের পুল্‌টি সহরে প্রবাসী জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সময়ে পুল্‌টিতে কয়েকজন শিক্ষিত লোক বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন পত্রিকা সম্পাদক, একজন গ্রাম্য ডাক্তার, একজন বিচারক (Country Judge), দুই তিনজন ধর্ম্মযাজক এবং রাজনীতিতে সুপরিচিত দুই তিনজন লোক। ইহারা সকলে মিলিয়া লীসিয়াম" নামে এক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই ক্লাবে নানা বিষয়ের আলোচনা এবং তর্ক বিতর্ক হইত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এই ক্লাবের যথেষ্ট সুনাম ছিল। এমন কি চতুষ্পার্শ্বের দশমাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে পর্য্যন্ত শিক্ষিত লোকেরা আসিয়া এই ক্লাবের আলাপ আলোচনায় যোগদান করিতেন এবং সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শোনা যাইত। এই লীসিয়াম ক্লাব শীঘ্রই হোরেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অগৌণে তিনি ইহার সদস্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কারণ বিতর্ক সভায় হোরেসের বুদ্ধিমত্তা ও ভূয়োদর্শিতার পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। হোরেস্ তখনও নিতান্ত বালক। তথাপি ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্যগণ তাঁহার মতামত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। বড় বড় ঘটনাব খুঁটিনাটি বিষয় পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। এরূপ অদ্ভুত স্মৃতি শক্তি সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয় না।

হোরেসের একজন বিশেষ বন্ধু স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"হোরেসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হইল কিরূপে? সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। আমি সেদিন পুল্‌টি সহরে আলু বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম। আলু বিক্রয় শেষ করিয়া আমি এক হোটেলে আহার করিতে গেলাম; তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এক টেবিলে বসিয়া খাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমেরিকার কংগ্রেসের সদস্য, সহরের সেরিফ এবং কয়েকজন বিজ্ঞ লোক ছিলেন। আমি ইহাদের চালচলন লক্ষ্য করিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ দেখিলাম যে, সেই টেবিলে বসিয়া আর একটি কদাকার বিশ্রী পোষাক পরিহিত যুবক আহার করিতেছে। ইহাতে আমি বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। আমার মনে হইল,—এযে অদ্ভুত হোটেল দেখিতেছি! এত সব বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকের মাঝখানে এইটি আবার কে হে?

"মনে মনে যখন এই সমস্ত কথা তোলপাড় করিতেছি তখন অকস্মাৎ এক বিতর্ক উপস্থিত হইল। সদস্যটি আমেরিকার একটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই ব্যাপারে কে কে কোন পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন—তাহা লইয়া মতভেদ হইতে লাগিল, কদাকার যুবকটির কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিলনা। আপন মনে সে আহার সারিয়া লইতেছিল। কিছুতেই বিতর্কের মীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া সেরিফ সাহেব বলিলেন—"একবার হোরেসকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।"

তিনি প্রশ্ন করিলেন—"হোরেস্, তুমি কি বল ?"

"প্রশ্ন শুনিয়া আহারে নিরত কদাকার যুবকটি তখন মস্তকোত্তলন করিল। সে বলিল—না, একথা সত্য নহে।"

"কংগ্রেসের সদস্য তখন গর্জ্জিয়া টেবিল চাপ্ড়াইয়া বলিলেন—"এই দেখুন, তা' হলে আমার কথাই ঠিক।"

"কদাকার যুবকটি আবার মাথা নাড়িল। সে বলিল—"না না, মশায়, আপনার কথাও ভুল।"

"ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। কদাকার যুবকটি তখন খাওয়া বন্ধ করিয়া একে একে সেই প্রত্যেকটি কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিল—ইতিহাসের কথাগুলি যেন তাহার মুখস্থই ছিল।

"এই ব্যাপার আগাগোড়া লক্ষ্য করিয়া আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আমি ভাবিলাম কদাকার যুবকটি তো সামান্য লোক নহে। আমি তখন সংবাদ লইয়া হোরেসের পরিচয় সংগ্রহ করিলাম। পুল্টি সহরের অনেক লোকই তাঁহার বিদ্যাবত্তার প্রশংসা করিল।"

হোরেসের বিচার বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং ভুয়োদর্শিতা বিষয়ক আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ছাপাখানার কম্পোজিটার হইলেও মোটের উপর তিনি নিতান্ত নগণ্য লোক ছিলেন না।

তখনও কিন্তু হোরেস্ তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি মনোযোগী হন নাই ; একটা জামা, একটা পায়জামা পরিয়াই তিনি কাজে বাহির হইতেন। তারপর তাঁহার চেহারা ভাল ছিল না। দূর হইতে তাঁহাকে কদাকার দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা অজস্র বিদ্রূপের বান নিক্ষেপ করিত ; কিন্তু হোরেস্ তাহাতে বিচলিত হইতেন না।

(আগামী বারে সমাপ্য)

কলিকাতায় মাছের ব্যবসায়

কলিকাতার বাজারে মাছের দুর্ভিক্ষ একরূপ লাগিয়াই আছে বলিতে পারা যায়। কেবল কলিকাতা সহর নহে—বাঙ্গলার অনেক স্থলেই আজ কাল প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইতেছে না। যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাও এত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় যে, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মাছ সংগ্রহ করা আজ কাল কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে উপযুক্ত পরিমাণে মাছ খাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন,—বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ।

তারপর ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলিকাতার বাজারে টাট্কা মাছ খুব কমই পাওয়া যায়। পচা মাছ যাহারা খায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ

হওয়া অনিবার্য্য। এই পচা মাছ দ্বারা Ptomain Poisoning হইতে পারে। কলিকাতা সহরে প্রায়ই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। মাছের আমদানী হ্রাস সম্পর্কিত অভাব অভিযোগের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকারের বিশেষ কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন লোকের মুখে শোনা যায় যে, এক কালে চারি পয়সার মাছ কিনিলে এক পরিবারের লোক তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারিত না। তাহার স্থলে আজ যদি চারি টাকার মাছ ও কেহ ক্রয় করেন তথাপি তাঁহার পরিবারের স্বচ্ছন্দ মৎস্য ভোজনের সাধ মিটে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুই আনা কিম্বা চারি আনায় যে সকল মাছের সের বিক্রয় হইত তাহা আজকাল এক টাকা দেড় টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।

কেন এরূপ হইল? এদেশে কি মৎস্য উৎপাদন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল? পুরাকালের নদী নালা, খাল বিল ইত্যাদি হাজিয়া মজিয়া গেলেও এপর্য্যন্ত একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও বাঙ্গলার বিভিন্ন জলকর মহালে প্রচুর মৎস্য জন্মে। তথাপি আমাদের অভাব অভিযোগ মিটে না কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার সময় আসিয়াছে।

একথা সত্য যে, এদেশে লোক সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই অনুপাতে মৎস্য উৎপাদনের কোনই চেষ্টা হয় নাই। এখানে আমরা একমাত্র ভগবানের দয়ার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছি। অন্যান্য সভ্য দেশে মৎস্যের চাষ একটি পরম লাভ জনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে উৎকৃষ্ট রকমের মৎস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেক দেশে রাষ্ট্রের সাহায্যে বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া মৎস্য জননের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং হইতেছে। সমুদ্র হইতে মাছ মারিবার বিবিধ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত মৎস্য অল্প সময় মধ্যে বাজারে উপস্থিত করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

আমাদের এদেশে এ সমস্ত কিছুই হয় নাই। আমরা সেই মামুলী ধরণে অশিক্ষিত ধীবরগণের উপরই নির্ভর করিয়া আছি। বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়া এই সমস্ত মৎস্য ব্যবসায়ীর গায়ে লাগে নাই। তাহারা নিরক্ষর, নিরীহ, পরিশ্রমী এবং সরল বুদ্ধির লোক। জমীদারগণ কড়ায় গণ্ডায় ইহাদের নিকট হইতে জলকর মহালের খাজনা আদায় করিয়াই নিশ্চিন্ত। অতঃপর ইহারা মরুক আর বাঁচুক—তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি হউক আর নাই হউক—সে সব বিষয়ে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজনীয়তা কেহই উপলব্ধি করেন না। এই অবস্থায় কূটবুদ্ধি,অর্থলোলুপ,মহাজনেরা ইহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে এবং নিতান্ত অযৌক্তিক ভাবে লাভের অঙ্ক ভারী করিয়াও তাহাদের আশার নিবৃত্তি হইতেছে না। তাহাদের এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা "আরো চাই, আরো চাই" বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

সম্প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী ডাঃ এ, সি, রায় চৌধুরী, এ সম্পর্কে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বড়ই গুরুতর। তিনি বলেন যে, মুষ্টিমেয় বিত্তশালী লোক একত্র জুট•বাঁধিয়া কলিকাতার বাজারে মৎস্য ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহারা শত করা ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিতেছে। ফলে মৎস্য শিকারী ধীবরগণ এবং জন সাধারণ নানা দিক দিয়াই ক্ষতি গ্রস্ত হইতেছেন।

ডাঃ রায় চৌধুরীর মতে—সুন্দর বন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপাদিত হয়; উপযুক্ত প্রণালীতে এই মাছ ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইলে কলিকাতা সহরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ সরবরাহ করা যাইতে পারে এবং বর্ত্তমানে যে দরে মাছ বিক্রয় হয় তাহার এক চতুর্থাংশ দর পাইলেও ধীবরগণ যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলার মৎস্যাভাবও দূর করা সম্ভবপর হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, কলিকাতার মাছের বাজারে একাধিপত্য করিবার জন্য কতিপয় ব্যবসায়ী জুট বাধিয়া, ডায়মণ্ড হারবার হইতে খুলনা পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপকূল ভাগের অধিবাসী মৎস্য জীবিগণকে নানা কৌশলে হস্তগত করিয়াছেন। "হস্তগত" করিয়াছেন না বলিয়া "কাবু" করিয়াছেন বলিলেই ঠিক হয়। অসম্ভব পরিমাণ সুদে এবং অযৌক্তিক সর্ত্তে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। বিপদে পড়িয়া এবং একান্ত নিরুপায় সরল বুদ্ধি মৎস্যজীবিগণ ইহাদের ফাঁদে পা দিয়াছে এবং এখন নানা দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও পলাইবার পথ পাইতেছে না। ধার করা টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া দরিদ্র ধীবরেরা ক্রমেই কূটবুদ্ধি মহাজনদের কাছে বাঁধা পড়িতেছে।

ডাঃ রায় চৌধুরী দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কলিকাতার বাজারে মৎস্যের কারবারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক জড়িত আছে। যথা:—

(১) মৎস্যজীবি ধীবর—ইহারা নদী নালা, খাল বিল ও সমুদ্রের উপকূল হইতে মাছ ধরিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া আসে।

(২) কলিকাতার কতিপয় ধনী ব্যবসায়ী—ইহারা জুট বাধিয়া অতি উচ্চ সুদে এবং অসম্ভব সর্ত্তে টাকা দাদন, ধার ও আগাম দিয়া কলিকাতার মাছের বাজারে একাধিপত্য করে।

(৩) যাহারা বাজারে বসিয়া খুচরা দরে মাছ বিক্রয় করে—অর্থাৎ মাছের বাজারে যাহাদের ষ্টল আছে।

"সুন্দরবন অঞ্চল হইতে যাহারা মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকার্জ্জন করে তাহাদের অধিকাংশই ২৪ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুর এবং খুলনার অধিবাসী। সাধারণতঃ ইহারা সকলেই দরিদ্র। মাছ ধরিবার উপযোগী সাজ সরঞ্জাম (যেমন নৌকা, জাল, দড় ইত্যাদি) সংগ্রহ করিবার অর্থ সামর্থ্য ইহাদের নাই। এই প্রাথমিক মূলধনের জন্য টাকা ধার করাই ইহাদের চিরন্তন রীতি। "এই অবস্থায় দরিদ্র ধীবরেরা যখন টাকা ধার করিতে যায় তখন কূটবুদ্ধি মহাজনেরা ইহাদিগকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য অতি উচ্চ সুদে এবং নির্ম্মম সর্ত্তে টাকা ধার দেয়। তার পর কঠোর পরিশ্রম করিয়া দরিদ্র ধীবরগণ মাছ ধরিয়া রাতারাতি নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসে। এখানে মহাজনদের সকল বন্দোবস্ত ঠিক আছে। পূর্ব্বের সর্ত্ত অনুযায়ী সমস্ত মাছ তখন এই মুষ্টিমেয় লোকের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। ইহারা বাজারের ষ্টলকিপার অর্থাৎ খুচরা মাছ বিক্রয়কারীদের নিকট যদৃচ্ছাদরে মাছ নীলামে বিক্রয় করে।

"তারপর আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কূটবুদ্ধি মহাজনেরা বাজারের ষ্টল কিপারদিগকেও "কাবু" করিয়া রাখিয়াছে। সস্তায় মাছ সরবরাহ করিবে বলিয়া খুচরা বিক্রয়কারীদের সহিত এই বন্দোবস্ত হয় যে, টাকা প্রতি ছয় আনা হইতে

এক টাকা পর্য্যন্ত হারে লভ্যাংশ মহাজনদিগকে দিতে হইবে। টল কিপারগণ নিরুপায় হইয়া প্রথমতঃ এই সর্ত্তে রাজী হয়। ইহার ফলে মহাজনের ঋণ শোধ করা সকল সময়ে তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কারণ মাছের দর সকল দিন সমান থাকে। বেশী মাছ যদি আমদানী হয়, কিম্বা যদি ক্রেতার সংখ্যা কোন কারণে কম হয়—তাহা হইলে মাছের দর নিশ্চয়ই পড়িয়া যায়। এই অবস্থায় হয়ত কেবল খরচ পোষাইয়াই মাছ বিক্রয় করিতে টল কিপারগণ বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাতেও তাহারা মহাজনের প্রাপ্য হইতে রেহাই পায় না—এইরূপে মহাজনের প্রাপ্য বাকী পড়িয়া যায় এবং বাধ্য হইয়া খুচরা বিক্রয়কারীদিগকে মহাজনের বশীভূত হইয়া তাহাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হয়। যদি কোন দিন অপর কোন স্থল হইতে স্বাধীন ব্যবসায়ী কেহ উৎকৃষ্ট মাছ বাজারে আমদানী করে এবং তাহা খুব অল্প মূল্যে পাইকারী দরে বিক্রয় করিতে উদ্যত হয়—তথাপি সেই মাছ কিনিয়া খুচরা দরে বিক্রয় করা টল কিপারদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কারণ তাহারা সর্ব্বদাই মহাজনের ভ্রূকুটির ভয়ে শঙ্কিত অবস্থায় কাল কাটায়।

"এই তো গেল টল কিপারগণের দুর্দ্দশার কথা। মৎস্যজীবি ধীবরগণের অবস্থা আরও শোচনীয়। কেবল মাছ ধরিলেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। এই মাছ আপনার ব্যয়ে সহরে পৌঁছাইয়া দিতে হয়। তজ্জন্য ক্রমাগতঃ ২৪ ঘণ্টারও অধিক কাল আপ্রাণ পরিশ্রমে নৌকা বাহিয়া তাহাকে নিকটবর্ত্তী কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে (যেমন—পোর্ট ক্যানিং অথবা হাস্‌নাবাদে) আসিতে হয়। তথা হইতে রেলে চড়িয়া কলিকাতায় পৌঁছাইতেও তাহাকে কম বেগ পাইতে হয় না। কুলী খরচ, রেলের ভাড়া এবং নিজের খাওয়া দাওয়ার খরচ—এগুলি তো আছেই। তদুপরি আবার ছোট কর্ত্তা বড় কর্ত্তাদের মন যোগাইবার জন্য মাঝে মাঝে কয়েকটি মাছ বিনা মূল্যে বিতরণ না করিলেও চলে না। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেও তাহার দুর্গতির অবসান হয় না। এখানেও তাহাকে নীলামের খরচ; বরফ, কুলী ও জমা ইত্যাদির খরচ এবং "জমাদারী" ও "সেলামী'র" খরচ ইত্যাদি বিনা আপত্তিতে বহন করিতে হয়।"

এস্থলে ডাঃ রায় চৌধুরী তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"একদা একদল ধীবরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা মাছ লইয়া ক্যানিং টাউনের দিকে যাইতেছিল। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, ইহার পূর্ব্বে যখন তাহারা মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল তখন তাহারা কলিকাতায় ১০১৲ টাকা পাইয়াছিল। এই টাকা হইতে সমস্ত খরচ বাদ দিয়া তাহাদের নিকট প্রাপ্য মাত্র ৩২৲ টাকায় দাঁড়ায়। এই ৩২৲ টাকা আবার ২১ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া নিতে হইয়াছিল।

"১৪ দিনের মধ্যে সাধারণতঃ ৯।১০ দিনের বেশী কেহ মাছ ধরিতে পারে না। এক সঙ্গে মাছ ধরা এবং সেই মাছ কলিকাতায় লইয়া আসা—এই দুই কাজ করিতে হইলে এই ৯ দিনের মধ্যে ২।৩ বারের বেশী যাতায়াত করা চলে না। এখন হিসাব করিয়া দেখুন, একজন মৎস্যজীবি মাসে কত টাকা আয় করিতে পারে। সে দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে, কুমীর জাঙ্গল সাপ ও বাঘের ভয় করে না—দৈব দুর্য্যোগের মধ্যে—অবিশ্রান্ত রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে প্রাণের মায়া ছাড়িয়া মৎস্যজীবী মাছ ধরিতে বাহির হয়।

ইহা সত্ত্বেও তাহার মাসিক নেট আয় বড় জোর ১০৲ টাকার বেশী হয় না।

"পক্ষান্তরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্ত টাকা খাটাইয়া দুরন্ত মহাজনেরা শতকরা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করে। নগদ টাকা দিয়া মহাজনেরা সকালে এবং সন্ধ্যায় ধীবরগণের নিকট হইতে মাছ রাখে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই মাছ অদৃচ্ছ মূল্যে খুচরা বিক্রয়কারী ইলকিশারদের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়—ইহাতে প্রতিদিনই তাহাদের টাকা আবার হাতে ফিরিয়া একরূপ বিনা পরিশ্রমেই সমস্ত লভ্যাংশ শুষিয়া লয়।

"অন্যান্ত মাছ সম্পর্কেও এই একই কথা। রুই, কাতল প্রভৃতি বড় বড় মাছ এখন হগ্ সাহেবের বাজারে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত সের দরে বিক্রয় হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ।০ আনা সের দরে বিক্রয় করিলেও ধীবরগণের শতকরা ৪৫৲ টাকা আন্দাজ লাভ থাকিতে পারে। কিন্তু আজ কাল তাহারা ৪৫৲ টাকা দূরে থাকুক শতকরা ৩০।৩২৲ টাকা পায় কিনা সন্দেহ। পুঁটি, টেংরা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ এখন ১২ আনা পর্য্যন্ত সের দরে বিক্রয় হয়। ইহাতে শতকরা ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এই লভ্যাংশ প্রায় ষোল আনাই জুট-বাঁধা ব্যবসায়ীরা মধ্য হইতে কাড়িয়া লয়,—আসল মৎস্যজীবিরা ইহার খুব সামান্য অংশই পাইয়া থাকে। অথচ হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চারি আনা সের দরে ছোট মাছ বিক্রয় করিলেও ধীবরগণের কম পক্ষে শতকরা ৭০৲।৮০৲ টাকা লাভ থাকা উচিত। এই যে বিসদৃশ ব্যবস্থা—যাহার জন্য কেবল মৎস্যজীবী ধীবরগণ নহে, দেশবাসী জনসাধারণও নানাদিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছেন—তাহার প্রতিকার হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

অতঃপর ডাঃ রায় চৌধুরী কলিকাতায় মৎস্ত আমদানী করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"সাধারণতঃ দুইটি প্রণালী অবলম্বনে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে কলিকাতার বাজারে মাছ আমদানী করা হয়।

"প্রথমতঃ যাহারা মাছ ধরে তাহারাই স্বয়ং মাছ লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হয়। ইহাতে ৭।৮ দিন সময় লাগে। পাছে মাছ পচিয়া যায়—এই আশঙ্কায় যতক্ষণ সম্ভব মাছকে জীয়ন্ত রাখিবার জন্ত চেষ্টা করা হয়। ধীবরগণ সাধারণতঃ মাছের নাকে অথবা চোখে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া রাখে। কেহ কেহ আবার লেজের সহিত বাঁধিয়া মাছটিকে এমনই ভাবে লট্‌কাইয়া রাখে যাহাতে উহার অর্দ্ধেক দেহ জলে এবং বাকী অংশ শূন্যে থাকে। এই অবস্থায় নৌকার সহিত টানিতে টানিতে ২৪ ঘণ্টা অথবা ৪৮ ঘণ্টার পর মাছগুলি লইয়া ধীবরগণ ক্যানিং অথবা হাস্নাবাদ রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে অসীম যন্ত্রণা উপভোগ করিতে করিতে এবং অনৈসর্গিক অবস্থার সহিত লড়াই করিতে ২ বেচারা মাছের ভবলীলা সাঙ্গ হয়,—তাহারা যন্ত্রণার হাত হইতে রেহাই পায় এবং মরিয়া বাঁচে। কিন্তু ধীবরের বিশেষ কোন লাভ হয় না। এই অবস্থায় জলে থাকিয়া যে মাছ মরে তাহার ওজন কমিয়া যায়, স্বাদ নষ্ট হইয়া যায় এবং খাদ্য হিসাবে ইহার মূল্য হ্রাস পায়। অধিকন্তু জলের মধ্যে মরা মাছ অতি অল্প সময়ের মধ্যে পচিয়া যায়। তাই কলিকাতার বাজারে পচা মাছের পরিমাণই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর এই প্রণালীই

সর্ব্বত্র অবলম্বিত হওয়া উচিত। মোটর বোট দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরবন হইতে কলিকাতায় মাছ আমদানী করা যাইতে পারে। তারপর উপরে বর্ণিত মামুলী ধরণে মাছ জীয়ন্ত রাখিবার চেষ্টা না করিয়া বরফের সাহায্যে মাছ টাট্‌কা রাখিবার উপায় করাই কর্ত্তব্য। তবে এই দ্বিতীয় প্রণালী অনুসারে ধীবরের দ্বারা আমদানীর কাজ হয় না—সেই কার্য্যের জন্য অপর লোকের প্রয়োজন। ধীবর কেবল মাছ ধরিয়া—আমদানী কারীর নিকট ছাড়িয়া দিবে এবং আমদানী কারক তৎক্ষণাৎ মোটর বোট ও মোটর লরী যোগে মাছ লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিবে। ইহাতে ধীবর নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিনই মাছ ধরিতে পারিবে—মাছ লইয়া আর তাহাকে টানাহেঁচড়া করিতে হইবে না। ইহাতে লভ্যাংশ অবশ্য ধীবর ও আমদানী কারকের মধ্যেও বিভক্ত হইয়া যাইবে। তথাপি মৎস্যজীবীর লাভ নিতান্ত মন্দ হইবে মনে হয় না। মোটের উপর দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বনে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টাট্‌কা অবস্থায় সুন্দরবন হইতে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারিবে।

"আজকাল দুই এক ব্যক্তি এই প্রণালী অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পথে অন্তরায় অনেক। প্রথমতঃ কলিকাতার বাজারের জুট-বাঁধা ধনী ব্যবসায়ীবৃন্দ চির প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া কেহ যদি কলিকাতার বাজারে হাজার উৎকৃষ্ট মাছ লইয়াও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিতান্ত কম দরে পাইলেও ষ্টলকিপারগণ তাহা কেনেনা; কিনিতে পারে না। মহাজনগণের ভ্রূকুটির ভয়ে তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকে—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একবার একলক্ষী টাট্‌কা মাছ একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী হগ সাহেবের বাজারে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাছ আর বিক্রয় হইল না; নীলামকারী নীলাম ডাকিল না, ষ্টলকিপার ভয়ে ভয়ে তাঁহার মাছ কিনিল না। এই অবস্থায় তাঁহার দুর্গতির এক শেষ হইল।"

এস্থলে যে সকল অভিযোগের কথা ডাঃ রায় চৌধুরী উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বড়ই গুরুতর। এগুলি যদি সত্য হয় তবে অগৌণে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবিষয়ে প্রথমতঃ একটা ব্যাপকভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাপন।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, লোন অফিস গুলির আমানত গ্রহণের কোন সীমা নির্দ্দেশ না থাকায় বিনা বাধায় আদায়ী মূলধনের ৩০।৪০ গুণ পর্য্যন্ত আমানত রাখা হইতেছে। কিন্তু কোম্পানীতে আমানত প্রদান করা আমানতকারীগণের স্বেচ্ছাধীন। তাহারা উচ্চহারে সুদ পাইবার আশায় অথবা আমানত প্রদানে অংশ গ্রহণ করিয়া উচ্চহারে ডিভিডেণ্ড পাইবার আশায় কোম্পানীতে আমানত দিয়া থাকেন। কোম্পানীর ঐ প্রকার আমানতকারীর পক্ষে উহার আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। অংশীদার না হইলে কোম্পানীর আইনের বিধানমত তাহারা কোম্পানীর অফিসে ব্যালেন্স সীট্ পরিদর্শন করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে নকল লইতে পারেন। তাহারও কোন আবশ্যক হয় না; কারণ অধিকাংশ স্থলে ব্যালেন্স সীট কোম্পানীর বিশিষ্ট আমানতকারীগণের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। এবং আমানত প্রদান কালেও ব্যালেন্স সীট্ না দেখিয়া কিংবা কোম্পানীর বিষয় অন্য প্রকারে অবগত না থাকিলে কেহ আমানত প্রদান করেন না। সুতরাং ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না যে, আমানতকারীগণ কোম্পানীর আভ্যন্তরিক অবস্থা জানার সুযোগ হইতে বঞ্চিত।

বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে কোম্পানীগুলি দ্রুত-গতিতে প্রসার লাভ করায় আমানত সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমানত গ্রহণকারী কোম্পানীগুলির মধ্যে রীতিমত প্রতি-যোগিতা চলিতেছে ; ফলে আমানতের সুদ শঃ মাঃ ১৲ হইতে ১৷৵০ ও ২৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এমন কি অনেক সময় সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী-গুলিকে বাধ্য হইয়া শঃ মাঃ ১৷০ হইতে ১৷০ সুদে সাময়িক আমানত গ্রহণ করিতে হইতেছে। সাধা-রণতঃ অল্পকালের জন্য আমানতে সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতার ফলে অল্পকালের সুদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশী-দিনের আমানতের পরিমাণ কমিয়া অল্পদিনের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে ; সুতরাং এই-রূপ অবস্থায় আমানতকারিগণের অবস্থা আদৌ নিঃসহায় নহে পক্ষান্তরে তাঁহারা স্থল বিশেষে রীতিমত পরিচালন করিতেছেন। এবং বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তাহাদের অনেক আব্দারই কোম্পানীর পরিচালকগণের সহ্য করিতে হইতেছে, এবং এই সমস্ত কারণেই একটী ফেডারেল ব্যাঙ্ক্ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন।

লগ্নীর কারবার।

লোন অফিসগুলি কেবলমাত্র টাকা লগ্নীর কারবার করিয়া থাকেন। অনেক বিধবা মহিলাও এই কারবার দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে এখনও এই দেশে "বিধবার ব্যবসা" বলিয়া থাকেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ ব্যবসায়ে অন্যান্য ব্যবসা অপেক্ষা বিপদ অনেকটা কম। বিশেষতঃ টাকা লগ্নী অধিকাংশ স্থলে কৃষিজীবীদিগের মধ্যেই হইয়া থাকে। খাতকগণের উপযুক্তরূপ জোত জমি না থাকিলে কিংবা তাদৃরূপ অনুসন্ধান না করিয়া কোন টাকা দেওয়া হয় না। এবং অধিকাংশ স্থলেই জমি বন্ধক অথবা ব্যক্তি-গত জামীন লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে কোন কোম্পানীর খাটান টাকার ষোল আনা আদায়ের অযোগ্য ঋণ ধরিয়া লইবার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। এ কথা সত্য যে লোন আফি-সের সংখ্যাধিক্য হেতু লোকে অবাধে টাকা কর্জ্জ করিবার সুযোগ পাইতেছে। এবং প্রয়োজন ও ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করিয়া জড়িত হই-তেছে। এই বিষয়টী পরিচালকগণের দৃষ্টি বহু পূর্ব্বেই আকর্ষণ করিয়াছে এবং সংঘবদ্ধ ভাবে উহা দূরীকরণার্থ চেষ্টা চলিতেছে। কোম্পানী যখন আমানত গ্রহণ করেন তখন এক দিকে তাহার আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ এবং অপর দিকে এ সমস্ত মূল জমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আমানতকারিগণ এই সমস্ত জমা কোম্পানীর পরিচালকগণের কার্য্যকুশলতার উপর নির্ভর করি-য়াই প্রদান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত কোম্পানী ব্যাঙ্কিং কারবার করিয়া থাকেন, তাহাদের নগদ পাওনার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। ঐ সমস্ত কোম্পানীতে হঠাৎ খুব বেশী টাকা লওয়া হইলে যথেষ্ট জমা থাকা সত্ত্বেও ফেল পড়িবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু লোন অফিসের অবস্থা অন্যরূপ। লোন অফিসের দাদন কার্য্য বৎসরের সব সময়ে থাকে না। এই অঞ্চলে কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত দাদনের চাহিদা খুব বেশী থাকে। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত আদায়ের সময় এই সমস্ত কোম্পানীতে চাহিলেই দিতে হইবে এরূপ ঋণ নাই বলিলেও চলে। এই গুলিতে অল্প সময়ের জন্য ও বেশী সময়ের জন্য এই দুই প্রকার আমানত লওয়ার ব্যবস্থা আছে।

অল্প সময়ের আমানতগুলি এমনভাবে রাখা হয় যে, আদায়ের মরশুমে উহা পরিশোধ করা যাইতে পারে। এবং স্থায়ী আমানতগুলি যে সময় পাকা হয় তাহা পরিশোধের ব্যবস্থাও পূর্ব্ব হইতে রাখা হয়। সুতরাং এই সকল কোম্পানীতে হঠাৎ বেশী টাকা লওয়ার আশঙ্কা খুবই কম।

ফেল পড়িবার সম্ভাবনা রহিত

লোন অফিসগুলি যদি উপযুক্ত পরিমাণে রিজার্ভ রাখেন এবং প্রতি বৎসরের লভ্য হইতে আদায়ের অযোগ্য ঋণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখেন এবং অল্প সময়ের জন্য আমানত গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণ সততার সহিত কার্য্য করেন তাহা হইলে উহা ফেল পড়িবার সম্ভাবনা আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

উপরোক্ত কারণে ন্যাশনেল্ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া স্বত্বেও আমানতকারীগণ লোন আফিসগুলির উপর বিশ্বাস হারাইতে পারেন নাই। এবং ন্যাশনেল্ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পরও বহু লোন আফিস গঠিত হইয়া আমানত গ্রহণদ্বারাই কারবার চালাইয়া আসিতেছেন। লোন আফিস পরিচালনে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। এই সমস্ত দূরীকরণার্থ—যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাও বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই। লোনআফিসগুলি দেশের কোন উপকার করিতেছে কি না তাহা আলোচনা না করিয়াও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এইগুলিকে নিষ্পেষিত করা অপেক্ষা উহাদিগকে সঞ্জীবিত রাখাই অধিকতর মঙ্গল জনক।

সুতরাং এমন কোন বিলি ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় না যাহাদ্বারা এই কোম্পানীগুলিকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইবে। প্রবন্ধ লেখক যে কয়েকটি প্রতিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই সমস্ত কোম্পানীর ক্রমোন্নতি এবং স্বাভাবিক পরিণতির পরিপন্থী। উহা কোন ক্রমেই অনুমোদন করা চলে না।

বীমার টাকা পাইতে বিলম্ব হয় কেন ?

কোন কোন বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বহু দিন যাবৎ একটা গুরুতর অভিযোগের কথা শোনা যায়,—তাহা এই যে, বীমাকারীর পাওনা মিটাইয়া দেওয়ার সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা নানা অজুহাতে যথেষ্ট বিলম্ব করেন এবং এই বিলম্বের ফলে বীমাকারীর উত্তরাধিকারীরা বিব্রত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার তদপেক্ষা গুরুতর অভিযোগও করিয়া থাকেন—তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, টাকা দেওয়ার সময় আসিলে বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে সম্পূর্ণ দাবীটাই এড়াইয়া যাইতে পারেন তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

এই সমস্ত অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না—কোন কোন

স্থানে হয়ত গলদ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকাংশ স্থলেই বীমাকারী ও বীমা কোম্পানী এই উভয় পক্ষের দোষ ত্রুটির ফলেই এরূপ অনিবার্য্য বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন।

বীমাকারী ও বীমা কোম্পানীর মধ্যে আসল সম্পর্কটা কি—তাহাই তলাইয়া দেখা যাউক। প্রকৃতপক্ষে এই উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তির কতিপয় সর্ত্ত থাকে। সেই সমস্ত উভয় পক্ষ হইতে প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন। যদি এক পক্ষ এই চুক্তি ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে অপর পক্ষ অনায়াসেই ইহার দায়ীত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতে পারেন—কারণ কোনও এক পক্ষের গাফিলতিতে কিম্বা স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যে যদি কোনও সর্ত্ত ভঙ্গ হয়, তাহা হইলেই চুক্তির যে আইনগত বন্ধন তাহা শিথিল হইয়া পরে। এই অবস্থায় অপর পক্ষ সেই চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহার দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যেসব ক্ষেত্রে গোল বাধে সেই সমস্ত স্থলেই এরূপ খুটিনাটি সর্ত্তপূরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ ব্যাপার তেমন কিছুই নহে—গোড়াতেই একটু সতর্ক হইলে ভবিষ্যতের জঞ্জাল আর থাকে না। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই বীমার আইন কানুন সম্পর্কে আদৌ অভিজ্ঞ নহেন—তাহারা সমস্ত বিষয় না জানিয়াই বীমা করিয়া থাকেন। এজেন্টগণই নানাভাবে প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে বীমা করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক এজেন্টই এসময়ে বীমা সম্পর্কিত আইনের খুটিনাটি কথাগুলি বীমাকারীকে বুঝাইয়া দেন না; এবং অনেকেই হয়ত তাহা জানেনও না। সময় থাকিতে সমস্ত কথা বিশ্লেষণ করিয়া বলিলে বীমাকারী নিশ্চয়ই গোড়ায় সাবধান হইতে পারেন। এবিষয়ে এজেন্টদিগের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

অনভিজ্ঞ বীমাকারীরা অনেক সময় মনে করেন যে, সকল কথা সরলভাবে খুলিয়া বলিলে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তাদের প্রস্তাব গ্রহণ নাও করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা একান্ত ভুল ধারণা। গোড়াতে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেলে ভবিষ্যতে আর গোল বাধে না—বা বাধিবার সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সময় দেখা যায়—যাহারা জীবনান্ত বীমা করেন, তাঁহারা পরিষ্কার ভাবে বীমার টাকা কে পাইবে তাহার বন্দোবস্ত গোড়াতে করেন না। ইহার ফলে টাকা দেওয়ার বিভ্রাট উপস্থিত হয়। উত্তরাধিকারী একদিকে টাকার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন অপর দিকে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণও নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা করিতে ব্যগ্র হন। উভয় পক্ষের এই বিরুদ্ধ চেষ্টার ফলে কোন কোন স্থলে আদালতের আশ্রয় লইতে হয়। বলা বাহুল্য যে, আদালতের ব্যয় ভার এবং বিলম্বের কথা তো (The Laws delay and litigation expenses) অধুনা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য জেলা জজের প্রদত্ত Succession Certificate সংগ্রহ করিতে না পারিলে কোনও বীমা কোম্পানী বীমার টাকা আইনতঃ কাহাকেও দিতে পারেন না। এই দলিল অর্থাৎ Succesion Certificate সংগ্রহ করিতে হইলে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যয়ভার বহন

করাও বীমাকারীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। বীমা করিবার সময় যদি পরিষ্কারভাবে বীমার টাকার উত্তরাধীকারী কে হইবে তাহা বীমাকারী কোম্পানীর নিকট উল্লেখ করিয়া যান, তাহা হইলে এরূপ গোলযোগ নিবারিত হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নির্দ্দেশ করা এজেণ্টগণের এবং বীমাকোম্পানীদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

প্রত্যেক বীমাকোম্পানীতে Assignment form আছে। বীমার টাকা ভবিষ্যতে কে পাইবে তাহা বীমাকারী ইচ্ছা করিলে বীমা করার সময়েই এই Assignment formএ উল্লেখ করতঃ কোম্পানীর আফিসে record করাইয়া রাখিতে পারেন। তাহা হইলে Policy mature হইলে অর্থাৎ বীমার টাকা দেবার সময় হইলে বীমাকারকের উত্তরাধিকারীকেই বিব্রত হইতে হয় না এবং বীমাকোম্পানীও নিঃসন্দেহে এবং নিরুদ্বেগে যাহার নামে Policy assign করা আছে তাহাকেই টাকা দিয়া দিতে পারেন। কেবল সেই ব্যক্তিই যে ইনি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্ত উত্তরাধিকারীকে কোনও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইয়া সনাক্ত বা identify করিলেই সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

পাছে বীমা কোম্পানী তাহার প্রস্তাব গ্রহণ না করেন এই আশঙ্কায় অনেক বীমাকারী সময় সময় সত্য কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ইহাতে শেষপর্য্যন্ত ক্ষতির যথেষ্ট কারণ আছে। এস্থলে মাদ্রাজের একটি মামলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল। তাহা হইতে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, বীমাকারীর অসত্য উক্তির ফলে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত দাবীই বাতিল হইয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বিজলীর আদালতে এই মামলার বিচার হইয়াছিল। সংক্ষেপে মামলার বিবরণ এই যে, মাদ্রাজের অধিবাসী মথুস্বামী আয়ার ১৯২৫ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে Empire of India Life Assurance কোম্পানীতে ৫০০০৲ টাকার একটী জীবনবীমা করিয়াছিলেন। ইনি যথারীতি প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করিয়া ১৯২৬ সালের ১২ জুন তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে মথুস্বামী তাহার পলিসিটি লক্ষ্মী আমল নামক এক জন মহিলাকে দান করিয়া যান। মৃত্যুর পর এই লক্ষ্মী আমল বীমার ৫০০০৲ আদায় করাইবার উদ্দেশ্যে Empire of India Life Assurance কোম্পানীর নামে এই মামলা উপস্থিত করেন।

জবাব দিতে গিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ সকল কথাই স্বীকার করিয়া লন এবং বলেন যে, বীমাকারী মথুস্বামী আয়ার এক বিষয়ে চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন। তাহা এই যে, বীমার প্রস্তাব করার সময় কোম্পানীর নিকট যে ফরম্ (form) পূরণ করিয়া পাঠান, তাহাতে যে সকল প্রশ্ন ছিল তাহার উত্তর তিনি যথাযথ দেন নাই ; উত্তরগুলির মধ্যে কয়েকটী অসত্য বলিয়া ধরা পড়িয়াছে—এই ফরমের চুক্তির মধ্যে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে, উত্তর যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে প্রিমিয়ামের টাকা যথারীতি কিস্তি কিস্তি শোধ করা থাকিলেই পরে সমস্ত দাবী দাওয়া বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতে পারে। মথুস্বামী এই সর্ত্তে রাজী হইয়াই কোম্পানীর নিযুক্ত ডাক্তারের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন এবং ফরমগুলি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, তিনি সত্য কথা বলেন নাই। এই অবস্থায় মথুস্বামী চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন। সুতরাং

বীমার টাকা পাইবার কোন দাবী দাওয়া তাহার পক্ষ হইতে করা চলে না।

যথারীতি সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া বিচারপতি মিঃ বিজলী দেখিতে পান, বীমাকারী মথুস্বামী সত্যসত্যই এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া সত্য কথা বলিবেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন।

তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এইরূপ:—ইতিপূর্ব্বে এই কোম্পানীতে কিম্বা অপর কোন কোম্পানীতে বীমা করিবার প্রস্তাব আপনি করিয়াছিলেন কি? ইহার উত্তরে মথুস্বামী বলেন—"না।"

প্রকৃত পক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তিনি ন্যাশ্‌নাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে বীমা করিবার জন্য একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। একথা স্বীকার করিলে তাহার পক্ষে বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ হইত না। কিন্তু অস্বীকার করিয়াই তিনি যত গোল সৃষ্টি করিলেন। চুক্তি অনুযায়ী সত্য কথা না বলিয়া মিথ্যা বলিয়া তিনি চুক্তি ভঙ্গের কারণ ঘটাইলেন।

তাহাকে আর একটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল—তাহা এই যে, কোন্ কোন্ সময়ে এবং কি কি রোগের জন্য আপনি ডাক্তারের পরামর্শ লইয়াছেন? ইহার উত্তরে মথুস্বামী বলেন,—"না, কোনও রোগের জন্য ডাক্তার ডাকি নাই; কিন্তু প্রমাণ লইয়া দেখা গেল যে, বীমা করিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি ডায়েবিটিস রোগের চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। এ স্থলেও মিথ্যা উক্তি দ্বারা তিনি চুক্তিভঙ্গ করিলেন।

এখন কথা উঠিতে পারে এই যে মথুস্বামী হয়ত নিজে তাহার ডায়েবিটিস রোগের কথা জানিতেন না এবং না জানিয়াই তিনি সরল বিশ্বাসে মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও কি মথুস্বামীকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য দায়ী করিতে হইবে? বিচারপতি মিঃ বিজ্‌লী বলিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে তাহার পলিসি নিশ্চয়ই বাতিল হইয়া যাইবে। ইহাতে দেখা যায় যে, অল্পের জন্য লক্ষ্মী আম্মালের ৫০০০৲ টাকা মাঠে মারা গেল। বীমা করিবার সময় যদি মথুস্বামী সত্য কথা বলিতেন তাহা হইলে বড়জোর তাহাকে বেশী প্রিমিয়াম দিয়া বীমা করিতে হইত—এর বেশী আর কোনই ক্ষতির কারণ দাঁড়াইত না। কিন্তু সত্য গোপন করার জন্যে শেষ পর্য্যন্ত তাহার লাভে মূলে সমস্তই মারা গেল। অতএব বীমাকারীদের পক্ষে গোড়ায় সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বীমা সংগ্রহকারীর সাফল্য

ইতিপূর্ব্বে আমরা বীমা সংগ্রহকারী বা ইনসীওরেন্স এজেন্টের আবশ্যকীয় গুণাবলীর কথা আলোচনা করিয়াছি। এই ব্যবসায় নিতান্ত সহজ ব্যবসায় নহে। একার্য্যে যতটা বিচক্ষণতা, সহিষ্ণুতা ও অমায়িকতার দরকার হয় আর কোথাও তাহার প্রয়োজন হয় না। যাহারা বীমা সংগ্রহের কাজে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে ধীরভাবে প্রস্তুত একান্ত প্রয়োজন। তাহা না করিয়া কেবল বীমা কোম্পানীর খাতাপত্র লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরতে আরম্ভ করিলেই কাজ হয় না। এস্থলে আমরা একজন বিশিষ্ট এজেন্টের কার্য্যাবলীর কথা আলোচনা করিব। ইনি একাদিক্রমে ১০১ দিনে ১০১টি বীমা সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি আমেরিকায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোন এজেন্টই এরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

এই বিখ্যাত বীমা সংগ্রহকারীর নাম চার্লস্ মুরে। ইনি জাতিতে স্কট্। সম্প্রতি আমেরিকার হেনরী কোর্ডের টাউনে ইনি বাস করেন। তথায় বহুসংখ্যক বীমা সংগ্রহকারী আছেন। কে কত বেশী বীমা সংগ্রহ করিতে পারেন - এই বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। এবারের প্রতিযোগিতায় চার্লস মুরে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়—ইতিপূর্ব্বে আর যাহারা প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহাদিগকেও চার্লস মুরে হারাইয়া দিয়াছে। ১০১ দিনের মধ্যে ১০১টি বীমা এপর্য্যন্ত কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—চার্লস্ মুরেই সম্ভবপর বলিয়া প্রমাণিত করিলেন। ১০২ দিবসে তাহার চেষ্টা কিন্তু সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই—সেদিন তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কি করিয়া তিনি ১০১ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত এক একটি বীমা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন? চেষ্টা তো সকল এজেন্ট করেন! কিন্তু অপর কাহারও দ্বারা এতটা সম্ভবপর হয় নাই; অথচ চার্লস্ মুরের চেষ্টায় হইল কি করিয়া?

তাঁহার চেষ্টার মধ্যে বাস্তবিকই একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি গতানুগতিক ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। প্রথমেই, তিনি বীমাকারী বন্ধুবান্ধব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তাতে প্রায় ১৫০টি নাম ছিল।

ইহাদের নিকট প্রথমেই তিনি পত্র প্রেরণ করেন। বন্ধুবান্ধবকে এই বলিয়া তিনি অনুরোধ করেন যে, যাহারা বীমা করিতে পারে এমন কতিপয় লোকের নাম প্রস্তাব করিয়া তাহাকে সাহায্য করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হইবেন।

ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। অনেকেই তাঁহার পত্রের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন না; চার্লস মুরে অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি নিরাশ

না হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলেন।

পরিচিত ব্যাক্তকে দেখিতে পাইয়া ইহারা একটু সঙ্কুচিত হইলেন। চোখের উপর একান্ত কবুল জবাব দিতে পারিলেন না। দায় এড়াইবার জন্ত প্রায় সকলেই দুই চারিটি নাম প্রস্তাব করিয়া চার্লস্ মুরেকে বিদায় দিলেন ! ইহাতেও ভবিষ্যৎ বীমাকারীর নামের সংখ্যা খুব বেশী হইল না।

চার্লস মুরে কিন্তু হতাশ হইলেন না। তাঁহার মাথায় নানা প্রকার যুক্তি খেলিতে লাগিল এবং তদনুসারে কাজ করিয়া দেখিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। পূর্ব্বরাত্রে বাড়ী বসিয়া বসিয়া তিনি পর দিনের জন্ত প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিতেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলেই যৎকিঞ্চিৎ স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া অপর লোকের পূর্ব্বেই কাজে বাহির হইতেন। দৈনিক তিনি ৮ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টার কম কিছুতেই পরিশ্রম করিতেন না। রাত্রি কাল বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত দিনের কাজের খতিয়ান করিতেন এবং পর দিনের জন্ত কার্য্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তবে শয্যাগ্রহণ করিতেন। রবিবার দিনে এবং অন্যান্ত ছুটির দিনে অবশ্য চার্লস কাজে বাহির হইতেন না।

মোটের উপর সর্ব্বদাই তিনি মনে মনে বীমা বিক্রয়ের কথা চিন্তা করিতেন। একদা অতি প্রত্যুষে আন্দাজ ছয়টার সময় তিনি তাঁহার গোয়ালার নিকট ২০০ পাউণ্ডের একটি পলিসি বিক্রয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি স্নানাগারে ছিলেন। তখনও তাঁহার দেহে ভিজা কাপড় ছিল। এমন সময় চার্লসের মনে হইল যে, হয়ত তাঁহার গোয়ালা একটি বীমা করিতে পারে। একথা মনে উদিত হইবা মাত্র চার্লস স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং গোয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে মুগ্ধ হইয়া গোয়ালা তৎক্ষণাৎ ২০০ পাউণ্ডের একটি বীমা ক্রয় করিল।

কাজ করিয়া চার্লস মুরের অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে। এখন তিনি বলেন যে, যে কোনও ব্যক্তির নিকট জীবন বীমা বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে। একদা কোনও শিল্পীর সহিত দেখা করিবার জন্ত তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক টাইপিষ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। সেই শিল্পী আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই চার্লস্ উক্ত টাইপিষ্টের নিকট হইতে একটি বীমা সংগ্রহ করিয়া ফেলেন। তাঁহার কথা বার্ত্তার এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যে কোন ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার মত গ্রহণ করাইতে পারেন।

অনেক সময় চার্লস্ স্বয়ং কোন প্রস্তাব না করিয়া কেবল অপরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিয়াও কাজ আদায় করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি হয়ত তাহার দুঃখ দুর্দ্দশার কথা এবং পারিবারিক কষ্টের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, চার্লস্ তখন ঐকান্তিক সহানুভূতির সহিত তাহার কথা শুনিতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়া বক্তাকে আরও উৎসাহিত করে। মানুষের এমনই স্বভাব যে, আন্তরিক সহানুভূতির সন্ধান পাইলে সে আত্মবিস্মৃত হয় এবং প্রাণ খুলিয়া সকল দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করে। কবিরা বলিয়াছেন,—Sorrows shared are sorrows lassened—অর্থাৎ অংশীদার পাইলে দুঃখের ভার লঘু হইয়া আসে। চার্লস মুরে তাই অপরের দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার ভাব দেখাইয়া সমধিকভাবে তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন এবং কথা শেষ হইলে সুযোগ বুঝিয়া এমনইভাবে তাহার নিজের বক্তব্য উপস্থিত করেন

যে উহা কিছুতেই প্রত্যাখ্যাত হয় না, হইতে পারে না। এইখানে চার্লসের বিশেষত্ব।

তাঁহার আর একটি নীতি এই যে, বেশী সময় কাহারও বাড়ীতে থাকিয়া তিনি তাহার বিরক্তি উৎপাদন করেন না। যখনই তিনি বুঝিতে পান যে, তাঁহার কথাবার্ত্তা শ্রোতার ভাল লাগিতেছে না তখনই তিনি বিদায় গ্রহণ করেন এবং পরবর্ত্তী সুযোগে আবার তাহার নিকট হাজির হন। একসঙ্গে বেশী ক্ষণ করিয়া বকিলে ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। চার্লস্ মুরে একথা সর্ব্বদাই মনে রাখেন।

চার্লস্ মুরে সর্ব্ব প্রথমে রেল ষ্টেশনে টিকিট বিক্রয় করিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মনে হয় যে, একার্য্যে তাঁহার সুবিধা হইবে না। তাই তিনি নানাবিধ পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি ক্রয় করিয়া পারদর্শী বিক্রেতা (Salesman) হইবার কৌশলগুলি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার ধারণা হইল যে বীমার এজেণ্ট হইলে জীবনে তিনি উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। অতঃপর তিনি দুই বৎসর ধরিয়া বীমা সম্পর্কিত নানাবিষয় অধ্যয়ন করেন। যখন তিনি দেখিলেন যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে তখন তিনি টিকেট বিক্রয়ের কাজে ইস্তফা প্রদান করেন এবং এক বীমা কোম্পানীর অধীনে এজেন্সী আরম্ভ করেন। গোড়া হইতে প্রস্তুত হইয়া কাজে হাত দিয়াছেন বলিয়াই বালকের পক্ষে এতটা উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা ক জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্ত সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্ত বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

[১৯২৯ সালের ২৮শে নবেম্বর তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

CASEIN GLUE

(S 99) Casein Glue যাঁহারা ক্রয় করেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

COSTUS (Kuth) ROOT

(S-100) কলিকাতার কোনও বড় ফার্ম্ম costus (kuth) root সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

COTTON QUILT

(S-101) তুলা দ্বারা প্রস্তুত লেপ (cotton quilt) যাঁহারা পাইকারী দরে বিদেশে চালান দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য দক্ষিণ ভারতের কোকনদ (cocanada) হইতে কোনও ফার্ম্ম পত্র লিখিয়াছেন।

SOAP STONE

(s-102) যাঁহারা গাদা হিসাবে soap stone ক্রয় করিতে চাহেন তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য বোম্বাইয়ের কোনও ফার্ম্ম পত্র দিয়াছেন।

CALCAREOUS SPAR and FLOUR-SPAR

(s-103) ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা Calcareous spar and flour spar বিদেশে সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য জার্ম্মানীর হামবুর্গ (Humburg) হইতে কোনও ফার্ম্ম পত্র লিখিয়াছেন।

[১৯২৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

কালী ও কালীর গুঁড়া

(s-104) মাদ্রাজের কোনও ফার্ম্ম পত্র লিখিয়া কালী ও কালীর গুঁড়া ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

চুনা (Lime)

(s 105) মধ্য প্রদেশের রায়পুর হইতে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি চুনা ক্রয়কারীর সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

SOAP STONE

(s-106) soap stone যাঁহারা ক্রয় করেন তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতার কোনও ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

(s—107) আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত মিচিগান (michigan) হইতে কোনও ফার্ম্ম স্বাভাবিক "corundum সংবরাহকারীদের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

[১৯২৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

SOAPSTONE POWDER

(s 108) যাহারা soap stone powder সরবরাহ করেন, তাহাদের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিয়া কলিকাতার কোনও বড় কারবারী পত্র দিয়াছেন।

SARSA PARILLA

(s-109) বৃটিশের অধিকার ভুক্ত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত জ্যামেকা হইতে কোনও বড় ফার্ম্মের কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা ভারতবর্ষে sarsaparilla (Smilax Omata) আমদানী করেন তাহাদের সন্ধান পাইলে বিশেষ বাধিত হইবেন।

[১৯২৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়ান্ ট্রেড্ জার্ণাল্ হইতে গৃহীত]

ACONITUM CHASMANTHUM, HYOSCYAMUS NIGAR, ETC.

(s-110) নয়া দিল্লীর কোন ও বড় ফার্ম্ম নিম্নলিখিত জিনিষগুলির ক্রেতার সন্ধান করিতেছেন :— Aconitum Chasmanthum (Vernacular—Mohri, Banbal-Nag) Aconitum Heterophyllum (Vernacular —Atis, Atcicha) Hyoscyamus Niger (Vernacular—Kurasani-Ajowan, Iskiras) Picrorrhiza kurrca (Vernacular—Katuki, Katukarohini) Yaraxacum officinale (Varnacular—Dudal, Kanphul) Vabriana wallichii (Vernacular-Tagar, Bala-tagra)

LIQUORICE ROOT and SALAP

(s-111) পেশোয়ার হইতে কোনও ব্যক্তি নিম্নলিখিত জিনিষগুলির ক্রেতার সন্ধান চাহিয়াছেন :— Liquorice Root (Clycyrr·

hiza Vernacular—জষ্টিমধু, Mithilakdi) Salap (Orchis Mascula, Allium Macleanig Vernacular—Salabmisri)

THYMOL CRYSTAL

(s-112) ভারতবর্ষে যে সকল ব্যবসায়ী Thymol crystal প্রস্তুত করেন তাহাদের সন্ধান চাহিয়া কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

WOLFRAM ORE, SCHEELITE and BERYL

(s 113) যাহারা Wolfram ore, Scheelite and Beryl সরবরাহ করেন তাহাদের সন্ধান চাহিয়া বোম্বাইয়ের কোনও ফার্ম পত্র দিয়াছেন।

[১৯২৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

তুলা দ্বারা প্রস্তুত লেপ

(s-114) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত কোকনদ হইতে কোনও বড় কারবারী জানাইয়াছেন—যাহারা বিদেশে চালান দেওয়ার উপযুক্ত লেপ তুলা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া পাইকারী দরে বিক্রয় করেন তাহাদের সহিত পরিচিত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

চুণ

(s-115) মধ্য প্রদেশের রায়পুর (Raipur) হইতে কোনও ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন যে, যাহারা চুণ ক্রয় করেন তাঁহাদের সন্ধান পাইলে তিনি উপকৃত হইবেন।

[১৯৩০ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

GUM ARABIC ETC

(s-116) কলিকাতার কোনও বড় ফার্ম, Gum Arabic, Gum Tragacanth and Gum Karaya প্রভৃতি সরবরাহকারীদের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

MANGANESE ORE

(s-117) উচ্চ শ্রেণীর Manganese ore ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়া কলিকাতার কোনও বড় ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

AQUAMARINAS

(s-118) ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা অপরিষ্কৃত Acqumarinas বিদেশে চালান দেন তাহাদের সন্ধান জানিতে জার্ম্মানীর হামবুর্গ হইতে কোনও ফার্ম্মের কর্ত্তৃপক্ষ পত্র দিয়াছেন।

মফঃস্বল এজেন্সি :—

শ্রীহট্ট জেলার মুন্সী বাজার হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে তিনি কয়েকটি ভাল জিনিষের এজেন্সী পাইলে তাহা মুন্সীবাজার অঞ্চলে চালাইতে পারেন। যাঁহাদের ভাল এজেন্টের দরকার তাঁহারা ইঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

পোঃ মুন্সীবাজার,
জেলা শ্রীহট্ট।

চট্টগ্রাম হইতে একজন আমাদের কাছে পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি প্রচুর পরিমাণে অশোকের ছাল এবং মানুষের চুল সরবরাহ করিতে পারেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে হইবে।

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য
C/o শ্রীযুত কালীকুমার অধিকারী।
পোঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
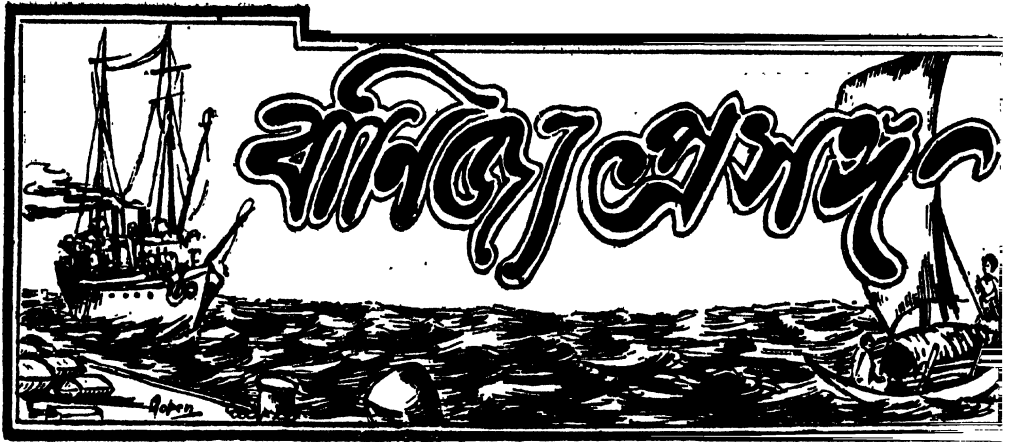
বিদেশী পণ্য আমদানীর পরিমাণ

১৯২৬-২৭ এবং ১৯২৭-২৮ সাল

বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলেও কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, বিদেশী মাল আমদানীর পরিমাণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। বেশী দূরে গিয়া লাভ নাই; ১৯২৭-২৮ সালেই এই ভারতবর্ষে মোটামুটি ২৫০ কোটী টাকার বিদেশী পণ্য আমদানী হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৮ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে—অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১৯ কোটী টাকার বিদেশী মাল বেশী আমদানী হইয়াছে। নিম্নে প্রধান প্রধান বিদেশী পণ্য আমদানীর বিবরণ প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে পাঠকবৃন্দ মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন যে, প্রতি বৎসরই ভারতের বাজারে বিদেশী মালের কাটতি কত বাড়িতেছে :—

জিনিষের নাম	২৯২৬-২৭ কত হাজার টাকা	১৯২৭-২৮ কত হাজার টাকা
তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য (Cotton and Cotton goods)	৭০০৮১৩	৭১১৯০১৬
পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত ধাতু (Metal and ores)	২৩৮৬১২	২৮৪১৭১
কলকব্জা ও মিলের সরঞ্জাম (Machinery and millwork)	১৩৬৩:৪	১৫৯৩৭৫
চিনি (Sugar)	৯১৮৭৮	১১ ৮৬৮
বিভিন্নপ্রকারের তেল (Oils)	৯১৮৭৮	১১০৮৬৮

মোটরকার ইত্যাদি যান বাহন (Vehicdes)	৬১৯৯৯	৭৬৯৩৭
খাদ্যদ্রব্যাদি ও মুদীখানার দ্রব্যাদি (Provisions and oilman's stores)	৫৭৭৬৪	৬৪০৬০
পশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি (Woolraw and manufactures)	৪৪৬৩৬	৫৩৬৮২
লোহা লক্কড় (Hardwares)	৫০৬৬২	৫২৪৩৩
সিল্ক ও সিল্কের দ্রব্য (silk raw and manufactures)	৪৫৯৭১	৫০৫৭৮
রেলের গাড়ী, লোহা ইত্যাদি (Railway plant and Rolling stock)	৩২৫১৯	৪৭৬৮৭
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি (Instru ments, opparatus and appliances)	৪০১১৯	৪৪৬৫২
মদ্যাদি (Liquors)	৩৫২৮৬	৩৬১৯৯
কাগজ ও পিস্‌বোর্ড (Paper and pasteboard)	৩০৮২০	৩০১৬২
সিগারেট প্রভৃতি তামাক (Tobacco)	২৫৬১১	২৯১৩২
রবার (Rubber)	২১০৯৬	২৭১৬৭
বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য (Chemicals)	২৪৪৩৫	২৬৪৯৫
বিভিন্ন প্রকারের রং (dyes)	২১৩২৩	২৬৪৫৫
মসলা (Spices)	৩২৯১৫	২৫৭৮৫
কাচ ও কাচের দ্রব্য (Glass and glassware	২৫২৮৮	২৪৮৪১
চাউল, ডাল, ময়দা ইত্যাদি (Grain pulse and flour)	৯,৬৯	২৩০৭০
ফলমূল ও শাকসব্জী (Fruit and vegetables)	১৬১৭৬	২০১৯৪
ঔষধ (Drugs and medicines)	১৯০০২	১৯৮২৮
নুন (Salt)	১২৬২০	১৭৪৮৪
পোষাক পরিচ্ছদ (Apparel)	১৭৭৮৭	১৬৪৪৫
সাবান (Soap)	১৫২৪১	১৬১৩৭
রং ও রং প্রস্তুতের উপযোগী দ্রব্য (Paints and painters, materials)	১৪৪২৩	১৫৪৭৯
মণি মুক্তাদি (Precious stones and pearls, unset)	১০৬৯৯	১৩৪৪৫
ঘরবাড়ী তৈয়ারী করার সরঞ্জাম (Building and Engineering materials	১২৩৯১	১২৮৮০
টুপি লেস ইত্যাদি সাজ সজ্জা মূলক পোষাক (Haber dashery and millinery)	১১৩৫০	১২৬২৫
মনোহারী দ্রব্য (Stationery)	৮১৯৬	৯১৬৭
কলকব্জার আচ্ছাদন (Belting for machinery)	৮১২৯	৮৭৩০

দেশলাই (Matches)	৬৫৬০	৩৯৩৭
কাঠ (Wood and timber)	৭৩;৯	৮১৪৬
মাটি ও চীনামাটির আসবাব পত্র (Earth enware and porcelain)	৮২৮২	৮০৭১
চা-এর বাক্স (Tea chests)	৬২৮৫	৭১৮০
অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদ ইত্যাদি (Arms, anumnition and military stores)	৬৮৮৭	৭০৬৫
চা (Tea)	৬৬০২	৬৯০০
জুতা (Boots and shoes)	৫৭১৩	৬৬৯৯
খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম (Toys and reqnisiter for games)	৬২১১	৬৩৮২
বিভিন্ন প্রকারের কয়লা (Coal and coke)	৩৫৬৯	৬২৪৯
ছাতা ও ছাতার সরঞ্জাম (Umbrellas and fittings)	৫২৫৭	৬২৩৫
প্রসাধন সামগ্রী (Toilet requisiter)	৫৭০২	৬২৩৫
পুস্তক ও ছাপার জিনিষ (Books printed etc)	৫৬৬০	৬১৯৮
সার (Manures)	৩৫৪০	৪৭০৫
কাগজ প্রস্তুতের উপাদান (Paper making materials)	৩৪৯৯	৪০২৮
গম ও রজন (Gums and Resins)	৩০৫৩	৩৯৩৩
সুতার নলী (Bobbins)	৩৪৭৬	৩৮৯৯
ছুরি কাঁচি ইত্যাদি (Cuttery)	৪১৩৮	৩৮৫০
জীবন্ত প্রাণী (Animal living)	৪১৮৫	৩৮৪৩
কাঁচা শণ ও শণের দ্রব্য (Flax ran and manufactures)	৩১৪৯	৩৭০৯
মাছ (Fish, including canned fish)	৩৮৬৬	৩৬৯৮
চেয়ার টেবিল ইত্যাদি গৃহসজ্জার আসবাবপত্র (Furniture and cabinet ware)	২৯৩৮	৩০৬২
ঘড়ী, হাতঘড়ী ও তাহার অংশ (Clocks and watches and parts)	২৫৬৬	২৭২২
চর্ব্বি ইত্যাদি (Tallow and stearine	৩১৬৪	২৬২৫
পাট ও পাটের দ্রব্য (Jute and jute goods)	৪০৫৭	২৪১১
গহনাপত্র সোনা ও রূপার পাত্র (Jewellery also plate of gold and silver)	৫৮৫২	১৭২৪
অন্যান্য জিনিষ (all other articles)	১১৮৩৭৫	১৫০২৮৬
মোট—	২৩১২২০৮	২৪৯৮৪৬৬

কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯২৯ সালের নবেম্বর মাসে কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের তুলনায় একটু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমদানীর পরিমাণ ৮.৫১ কোটী হইতে ৭.৮৪ কোটীতে পরিণত হয় এবং রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৩.০২ কোটী হইতে ১৩.৫৪ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯২৮ সালের নবেম্বর মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়—আমদানীর পরিমাণ ৯৮ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানীর পরিমাণ ১৮৫ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—তুলাজাত দ্রব্য—১৭১ লক্ষ, চিনি—৭৮ লক্ষ, লোহা ও ইস্পাত—৭২ লক্ষ, কল কব্জা ও মিলের সরঞ্জাম ইত্যাদি—৫৬ লক্ষ, ডাল, ময়দা, আটা ইত্যাদি—৩১ লক্ষ টাকা, অপরাপর ধাতু—২৫ লক্ষ, সুপারি—২৫ লক্ষ. তেল ও খনিজদ্রব্য—১৯ লক্ষ, খাদ্যদ্রব্যাদি এবং মুদীখানার জিনিষ -১৯ লক্ষ, লোহালক্কড়—১৮ লক্ষ, তামাক—১৬ লক্ষ, ইলেট্রিকের কলকব্জা—১৫ লক্ষ, কাগজ ও পেষ্টবোর্ড—১৪ লক্ষ।

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, তুলাজাত দ্রব্যের আমদানীর অবস্থা শোচনীয়। সূতা ও তুলার পাঁজ ইত্যাদি আমদানীর পরিমাণ ১৩৪৭০০০ পাউণ্ড হইতে ১২৩৬০০০ পাউণ্ডে নামিয়া আসিয়াছে। ইহার মূল্য ও ১৯ লক্ষ হইতে ১৪ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রধান প্রধান রপ্তানী দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :— পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি—৪৩৬ লক্ষ, কাঁচা পাট ৪৩০ লক্ষ, চা—২২২ লক্ষ, লঙ্কা—৬৩ লক্ষ, চামড়া—৪২ লক্ষ, ডাল, ময়দা, চাউল ইত্যাদি—২৮ লক্ষ; অসংস্কৃত লোহা ২০ লক্ষ, মেঙ্গানিস্ ওর—৯ লক্ষ।

কাঁচা পাট রপ্তানী

১৯২৯ সালের নবেম্বর মাসে বাঙ্গলা দেশ হইতে ১৬০০৮২ গাইট আন্দাজ কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতার বন্দর হইতে ১২৭৭৮৭ গাইট এবং চট্টগ্রামের বন্দর হইতে ৩২২৯৫ গাইট পাট জাহাজে উঠিয়াছে।

ভারতের মাল রপ্তানী

১৯২৭-২৮ সালের বিবরণ

ভারতবর্ষ হইতেকোন জিনিষ কি পরিমাণে রপ্তানী হয় তাহার একটি পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাতে দেখা যায়,—কাঁচা মালই বেশী পরিমাণে রপ্তানী হয়। এস্থলে কেবল মূল্যের পরিমাণই প্রদত্ত হইয়াছে—মালের পরিমাণ দেওয়া হয় নাই। তাহা দেওয়া থাকিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইতেন যে, অন্যান্য দেশের মালের তুলনায় আমাদের মাল কত সস্তাদরে বিদেশে প্রেরিত হয়। এস্থলে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—তাহা এই যে নিত্য প্রয়োজনীয়

অনেক জিনিষ, যে গুলির অভাব প্রায়ই অনুভব করিতে হয়, সেগুলিও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। পৃথিবীর আর কোন দেশেই বোধ হয় এরূপভাবে অধিবাসীবৃন্দের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া অপরের ভোগ বিলা-সিতার সাহায্য করা হয় না ;—এরূপ সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড কেবল ভারতের ন্যায় পরাধীন দেশেই সম্ভবে। ১৯২৬-২৭ সালে এবং ১৯২৭-২৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে কত টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

জিনিসের নাম	১৯২৬-২৭ সাল	১৯২৭-২৮ সাল
পাট :—		
(ক) কাঁচা পাট	২৬৭৮০৪০০০৲	৩০৬৬৬০০০০৲
(খ) পাটের দ্রব্য	৫৩১৮০৯০০০৲	৫৩৫৬৪৩০০০৲
তুলা :—		
(ক) কাঁচা ও পুরাতন	৫৯১৪১৯০০০৲	৪৮১৫৫৩০০০৲
(খ) তুলা জাত দ্রব্য	১০৭৪৮৫০০০৲	৮৭৭২৩০০০৲
চাউল, ডাল, ময়দা —	৩৯২৪৯০০০০৲	৪২৯২০৩০০০৲
চা—	২৯০৩৭৭০০০৲	৩২৪৮৪৯০০০৲
বীজ—	১৯০৮৭৭০০০৲	২৬৬৯৩০০০০৲
চামড়া	৭৩৭৬৯০০০৲	৯০৭২৭০০০৲
বিভিন্ন সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ধাতু	৭২০৮৬০০০৲	৮৯৭০৮০০০৲
পাকা ও কাঁচা চামড়া—	৭১৭৯৭০০০৲	৮৮০৯৪০০০৲
লঙ্কা—	৫৪৭২৪০০০৲	৬৯৮৮৬০০০৲
পশম ও পশমের দ্রব্যাদি—	৪৬৮২৮০০০৲	৫৩৩৩৮০০০৲
খোল—	২৫২৭৬০০০৲	৩১৪১৯০০০৲
রবার কাঁচা	২৬০১৪০০০৲	২৫৭০৯০০০
মম(Paraffin wax	১৮৪৬০০০০৲	২৪২৪৬০০০৲
মসলা—	১৫৫৯৭০০০৲	২৩৯৯৬০০০৲
কফি—	১৩২৬৩০০০৲	২৩১৯২০০০৲
আফম—	২১১৮৫০০০৲	১৯৯০৯০০৲
কাঠ —	১৬২০৪০০০৲	১৬৫৭৩০০০৲
রং করা ও টেন করার সামগ্রী (Dying and tanning substances	১১৭৭২০০০৲	১৬০৭০০০০৲
গবাদি পশুর খাদ্য	১০৬২৫০০০	১৩৬৭৪০০০৲
সার—	১২৫৪০০০০৲	১২৮০১০০০৲
নারিকেলের ছোব্ড়া (coir)—	৯৯৮৫০০০৲	১১৩৭৫০০০৲
তামাক—	১০৪১৫০০০৲	১০৬১৩০০০৲
ফল ও তরি তরকারী	৮১৮৮০০০৲	১০৫৪২০০০৲
মীকা (Mica)	১০৮৩১০০০৲	৯২৮৪০০০৲
মাছ—	৭৫৩৮০০০৲	৮৭১৩০০০৲
কাঁচা শণ (Hemp)	৮২৭৬০০০৲	৮০৮৩০০০৲
বিভিন্ন প্রকার কয়লা	৮১৩৩ ০০০৲	৭৬৪৩০০০৲
তেল —	৯৫৭১০০০৲	৭০৯৮০০০৲
মুদীর দোকানের জিনিষ	৬০৯৫০০০৲	৬১২১০০০৲
জীবন্ত প্রাণী—	৩৮৩২০০০৲	৪৬৮৭০০০৲
কাঁচা সিল্ক ও সিল্কের দ্রব্যাদি —	৩৫০৮০০০৲	৪২৬৯০০ ৲
ঔষধপত্র—	৩৭১০০০০৲	৩৪৫৩০০০৲
বুরুশ ওঝাড়নীর জন্য লোম ইত্যাদি—	২৫৩৪০০০৲	২৯৬৩০০০৲
পোষাক—	২২৩০০০০৲	২৩৮২০০০৲
দড়ি, কাছি ইত্যাদি	১৮৪৪০০০৲	১৮৫২০০০৲
কাঁটা জাতীয় সামগ্রী	১৩৫৬০০০৲	১৬১৮০০০৲
মোমবাতি (Candle)	১২১২০০০৲	১২৫৫৯০০৲
সুরা (Saltpetre)	১২১২০০০৲	১২১৩০০০৲
চর্ব্বি মোম ইত্যাদি (Tallow, stearine and wax)	১৪০০০০০৲	১১১৫০০০৲
শিং ক্ষুর ইত্যাদি Horns, tips etc	৭৯১০০০৲	৯১৮০০০৲
চিনি—	৫৭৮০০০৲	৭৮১০০০৲
অন্যান্য জিনিষ	৪৮২৩৯০০০	৫৪৬৮৮০০০৲
মোট	৩০১৪৩৫৮০০০৲	৩১৯১৫৩৫০০০৲
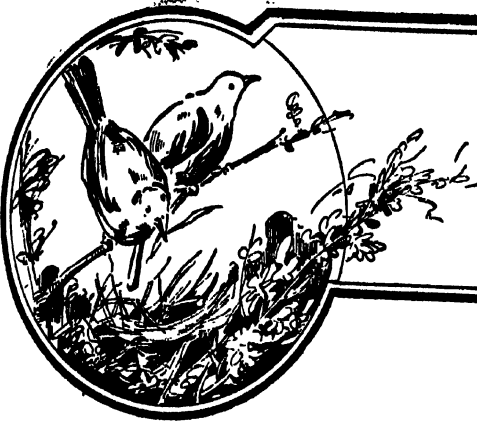
পেঁপের চাষ

পেঁপের চাষ একটি উত্তম লাভজক ব্যবসায়

পেঁপে সাধারণতঃ সবরকম জমি ও আবহাওয়াতেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহা একটী উপাদেয় ফল। ঔষধীয় গুণের জন্যেও ইহা খুব আদৃত হয়। ইহা অন্যান্য ফলবান বৃক্ষের ন্যায় রোপণ করা হয় না, কেবলমাত্র খানাবাড়ীর চারিদিকে এখনে সেখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পেঁপে গাছ যত্নের সহিত লাগাইলে ইহা অল্পকাল মধ্যে ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ হইতে অনেক বেশী দিন ফল দিয়া থাকে। বিশেষতঃ যখন বাজারে অন্যান্য ফলের অভাব হয়, তখনও পেঁপে পাওয়া যায়।

জমি

পেঁপে নানা রকম জমিতে উৎপন্ন হইতে পারে। পুরান পলি পড়া ভারী আঁঠাল জমি হইতে নদী তীরবর্ত্তী বালুকাময় জমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে; তবে ভালরূপে জলনিকাশিত সারবান জমিতে ইহা সবচেয়ে ভালরূপ বর্দ্ধিত হয়। পাহাড়ে কঙ্কর জমি পেঁপে চাষের বিশেষ উপযোগী; তবে ৪,০০০ ফিটের উপরে ইহা ভালরূপ জন্মে না, কারণ সামান্য তুষার পড়িলেই এই গাছ আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত মরিয়া যায়। বর্ষাকালে যে সব আঁঠাল জমি অনেক দিন জলে আর্দ্র থাকে, তাহাতে পেঁপে গাছ খর্ব্বাকৃতি হইয়া যায় এবং অবশেষে উহার গোড়া পচিয়া যায়। যে জমিতে সার নাই বা যাহা অনুর্ব্বরা, তাহাতেও পেঁপে গাছ বাড়িতে পারে না। অপর পক্ষে, অনাবাদী জমি আবাদ হইলে তাহাতে পেঁপে গাছ বেশ ভাল হয় ভালরূপে জল নিষ্কাশিত সারবান জমিতেই পেঁপে রোয়া প্রশস্ত এবং তাহাতে ৩।৪ বৎসর ভাল ফল উৎপন্ন হয়।

সার প্রয়োগ

পেঁপে গাছ সার প্রয়োগে বেশ বর্দ্ধিত হয়। এজন্য পচা গোবরের সার প্রতি একরে ২০০ হইতে ২৫০ মণ হিসাবে জমি তৈয়ার করিবার সময়

দিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রতি একরে ৩ হইতে ৬ মণ চুণ জমিতে ছিটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাহাড়ে গোবর সার বড় দুষ্প্রাপ্য, এজন্য সেখানে পচা পাতা অল্প চুণ মিশ্রিত করিয়া জমিতে দিলে ভাল হয়। তাহা ছাড়া জঙ্গল পোড়াইয়া যে ছাই হয় তাহাও জমিতে দেওয়া যাইতে পারে।

চারা উৎপাদন

সাধারণতঃ বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টি-পাতের সঙ্গে সঙ্গে বীজ বোনা যাইতে পারে। বীজ তলাতে ভাল করিয়া গোবর সার দেওয়া আবশ্যক এবং যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে উহাতে জল দিতে হইবে। সাধারণতঃ পেঁপের বীজ ১০—১৫ দিন পরে অঙ্কুরিত হয়; বীজগুলিকে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে রোয়া ভাল, তাহা হইলে চারা গাছগুলি বীজ তলাতেই ভালরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সে গুলি রোপণ করার সুবিধা হয়। সাধারণতঃ বীজগুলি বাড়ীর কোন এক কোণে ঠাসাঠাসি করিয়া বপন করা হয়; ফলে চারা গাছগুলি বড় দুর্ব্বল হইয়া উৎপন্ন হয় এবং এরূপ দুর্ব্বল চারাগাছ রোপণ করিলে অনেক সময় বাঁচে না। ফালা কাটিয়া এবং জোড় কলম করিয়াও পেঁপে উৎপন্ন করা যায়, কিন্তু তাহা ব্যবসা হিসাবে সম্ভব নয়।

অন্যান্য ফলবান গাছের ন্যায় পেঁপের চারাগাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হইলে খাঁটী ফল উৎপন্ন করে না। কেবলমাত্র কয়েকটী গাছ খাঁটী উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সে জন্য বীজ নির্ব্বাচনে বিশেষ কোন ফল হয় না। তথাপি ভাল ফল হইতে পুষ্ট বীজগুলিই নির্ব্বাচন করিয়া রোপণ করা ভাল এবং যে ফলগুলি প্রথম পাকে সেগুলি হইতেই বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

যদি ছোট এক টুকরা অপ্রশস্ত জায়গায় বীজগুলি বপন করা হয়, তাহা হইলে যখন চারা-গাছগুলি ৬ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয় তখন অপর একটী অপেক্ষাকৃত বড় বীজ তলায় সেগুলি উঠাইয়া রোয়া উচিত। ইহাতে চারাগাছগুলি সবল হইয়া উঠে এবং তখন রোপণ করিলে ভাল গাছ হয়। দ্বিতীয় বীজতলা তৈয়ার করিবার সময়ও ভালরূপ গোবর সার, ছাই এবং একটু চুণা দিতে হইবে। এই বীজতলাতে চারাগাছগুলি এক ফুট হইতে দেড় ফুট ব্যবধানে লাগাইতে হইবে এবং এখানে চারাগাছগুলি অনেক দিন রাখা যাইতে পারে।

চারা রোপণ

পেঁপের চারা রোপণ করিতে হইলে জমিতে গভীর কর্ষণ ও আচ্ড়া দেওয়া ভাল। জমিতে কোনরূপ উলুবন হইতে দেওয়া উচিত নয় এবং তজ্জন্য বৎসরে ৩.৪ বার আচড়া দেওয়া দরকার।

পেঁপের চারা ৮ হইতে ১০ ফুট অন্তর রোয়া যায়। জমি তৈয়ার হইলেই দড়ি দিয়া মাপিয়া আবশ্যকানুযায়ী দূরত্ব বাঁশের কঞ্চি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে এবং এক ফুট গভীর এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে। এই গর্ত্তগুলি পচা গোবর, সার মাটী ও চুণা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রায় ১৫ দিন কি ১মাস পূর্ব্বে ভরিয়া রাখিতে হইবে। বর্ষার শেষাশেষি অর্থাৎ আগষ্ট মাসে চারা রোপণ করা ভাল।

বীজতলা হইতে চারাগাছগুলিকে সযত্নে যথেষ্ট মাটী সহিত তুলিয়া একটা টুক্রীতে ভরিয়া বাগানে নিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তগুলির

মধ্যস্থানে রোপণ করিতে হইবে যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে জল দিতে হইবে। পেঁপের চারা খুব নরম এবং উহার পাতার ডাটগুলি সহজে ভাঙ্গিয়া যায়; তজ্জন্য সেগুলিকে সাবধানে নাড়া চাড়া করা ভাল। পাহাড়ের গায়ে বা ঢালু জমিতে রোপণ করিতে হইলে ধাপ কাটিয়া বা প্রতি চারা গাছের জন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বেদী করা উচিত; কারণ তাহা না করিলে ভারী বৃষ্টিতে জমি ধুইয়া যাওয়ায় গাছগুলির শিকড় বাহির হইয়া পড়ে এবং গাছগুলি তখন খাড়া হইয়া থাকিতে পারে না।

পেঁপে গাছ বাড়ীর আশে পাশে রোপণ করিলে বেশ সুন্দর দেখায়; ইহার একটি মাত্র কাণ্ডে সবুজ বর্ণ লম্বা ডাটাযুক্ত বড় বড় পাতাগুলি বর্দ্ধিত হওয়ায় ইহা একটী ছাতার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এজন্য রাস্তার পাশে সারিতে রোপণ করিলে ইহা গোলাবাড়ীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে সন্দেহ নাই।

পেঁপের ফুল

সাধারণ ফলের গাছ হইতে পেঁপে গাছের ফুলে একটী বিশিষ্ট বিভিন্নতা আছে। যখন চারা গাছগুলি ৪।৫ ফুট লম্বা হয় তখনই উহাতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ ৬ হইতে ৮ মাসের চারায় ফুল ধরিয়া থাকে। ফুল ধরার কোন ঠিক সময় নাই। তবে সাধারণতঃ মার্চ্চ ও এপ্রিল মাস হইতে ফুল ধরিতে থাকে। ফল পরিপক্ক হইতে ৩।৪ মাস সময় লাগে; কিন্তু সারহীন জমিতে রোপণ করিলে কেবল যে ফলের গাছ খর্ব্ব হইয়া উঠে এমন নয়, উহাতে অনেক দেরীতে ফুল ধরে; ফুল ধরার সময় অনেক লম্বা হওয়ায় প্রথম পরিপক্ক ফল হইতে শেষ ফলটী পর্য্যন্ত ৮—১০ মাস সময় লাগে।

পেঁপে ফুলের পুং রেণু ও স্ত্রী আধার সাধারণতঃ এক গাছে থাকে না। কোন কোন গাছে লম্বা ডাটযুক্ত পেঁপে ফুল উৎপন্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে, সে গুলিই পুং গাছ। অপর কতকগুলি গাছে স্ত্রী আধার যুক্ত ফুল হয় এবং একটী বা অধিক ফুল পেঁপে গাছের কাণ্ডে প্রতি পাতার ডাটের কোণে উৎপন্ন হয়; এগুলিই স্ত্রী গাছ। সাধারণতঃ মধু মক্ষিকা দ্বারা বা বাতাসে পুং গাছ হইতে রেণু স্ত্রী আধারে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা জননক্রিয়া সাধিত হয়। ভাল ফল পাইতে হইলে প্রত্যেক ২০টী গাছে একটী পুং গাছ রাখা উচিত। এখানে ইহাও বলা যায় যে, কোন কোন পুং গাছে পুং রেণু ও স্ত্রী আধার একই ফুলে উৎপন্ন হইয়া ফুলের ঝাড়ের নিম্নে ছোট ছোট ফল উৎপন্ন করে। সে ফলগুলি একেবারে অকর্ম্মণ্য।

ফুল বাহির হওয়ার পূর্ব্বে পেঁপে গাছ মর্দ্দা কি মাদী তাহা চিনা যায় না। সেজন্য সর্ব্বদাই গাছ রোপণ করার পরে কতকগুলি গাছ মর্দ্দা হয় বলিয়া কয়েকটী চারা রাখিয়া বাকি গুলিকে কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন চারা লাগাইতে হয়। এজন্য বীজ তলায় কতকগুলি চারা রাখিয়া দিতে হইবে।

গাছের যত্ন

বাগানে গাছগুলি ভালরূপ বাড়িতে থাকিলে সে গুলিকে বাঁশের ঠেকা দিয়া দেওয়া ব্যতীত অন্যান্য কোন বিশেষ যত্ন নিবার আবশ্যক হয় না; কারণ ঝড়ে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ে বলিয়া বাঁশের ঠেকা দেওয়া দরকার; তাহা ছাড়া গাছগুলির চতুর্দ্দিকে কোদালী দিয়া মাটী দিতে হইবে। ইহাতে গাছের গোড়া শক্ত হয় এবং আর বাতাসে হেলাইতে পারে না।

সময় সময় ফলগুলি রৌদ্রে পুড়িয়া যায় এবং সেজন্য যে পাতাগুলি শুকাইয়া যায় সে গুলি ফেলিয়া দেওয়ার কোন দরকার নাই; কারণ এতে ফলগুলি আংশিকভাবে ছায়া পাইয়া থাকে। কাঁচা পেঁপের পাতা কখনও কাটা উচিত নয়; এমন কি চারা রোপণ করার সময়ও নয়। একবার পাতাগুলি কাটিয়া ফেলিলে কিংবা গরু ছাগলে খাইয়া ফেলিলে, গাছগুলি আর সতেজ হইয়া উঠে না।

গাছগুলিকে লম্বা হইতে দেওয়া ভাল নয়; তাহা হইলে ফল পাড়িতে অসুবিধা হয়, তদ্ব্যতীত, গাছ উঁচু হইলে ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। সে জন্য যখন গাছগুলি বাগানে বাড়িতে থাকে, তখন উহাদের মাথা কাটিয়া দিলে গাছগুলি তত উঁচু হয় না এবং উহাতে ডাল পালা হওয়ায় বেশী ফল ধরে।

ফল পাতলা করা

গাছ ভালরূপ উৎপন্ন হইলে উহাতে খুব পেঁপে ধরে। অনেক সময় দেখা যায় যে ফলগুলি খুব ঘন হইয়া উৎপন্ন হয়; এজন্য সে গুলিকে পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার;তাহা না হইলে সব ফলগুলি পুষ্ট হইতে পারে না এবং উহাদের আকৃতি নানা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ ফলগুলিকে বাজারে বিক্রী করা যায় না। এতদ্ব্যতীত গাছের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ফলগুলিও ছোট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য পাতলা করিয়া না দিলে ফল পাওয়া যায় না।

সারির মধ্যবর্ত্তী শস্য

পেঁপে গাছ ১০ ফুট অন্তরে লাগাইলে সারির মধ্যবর্ত্তী স্থলে অন্যান্য শস্য উৎপন্ন করা যায়। সে খানে আনারস লাগাইলে বেশ হয়। নানা রকমের শাক-সব্জি, যথা—বেগুন, মরিচ, কুমড়া, তরমুজ, রাঙ্গাআলু প্রভৃতিও লাগান যায়। এতদ্ব্যতীত হলুদ, আদা, এরারুট, চিনা বাদাম ইত্যাদি মূল্যবান শস্য লাভজনক ভাবে উৎপন্ন করা যায়। এরূপ ভাবে সারির মধ্যে শাক-সব্জি লাগাইলে কেবল যে ঘাস দমন থাকে, এমন নয়, ইহাতে জমিও ভালরূপে চাষ করা থাকে।

ফল সংগ্রহ ও মোড়াই

পেঁপে ফল গাছে পাকিতে দেওয়া উচিত নয়। যখন পেঁপেগুলি "পাক ধরে" তখনই গাছ হইতে পাড়িয়া ঘরে পাকান উচিত। দূরস্থানে পেঁপে পাঠান বড় সহজ নয়; কিন্তু যদি ভাল ভাবে সংগ্রহ ও মোড়াই করা যায়, তাহা হইলে উহা কলিকাতার বাজারে অনায়াসে চালান করা যায়।

পেঁপের বাকল অতি পাতলা। সে জন্য এ ফল হাতে ধরিয়া পাড়িতে হইবে এবং কখনও খালী মাটীতে রাখিবে না। ফলগুলিকে কাঠের বাক্স বা তার-বাঁধা ডবল বাক্সের টুক্রীতে ভরিয়া চালান দেওয়া যায়। বাক্স বা টুক্রীর ওজন ৩৮ সের হইতে ১ মণের বেশী হওয়া ভাল নয়।

ব্যবসা হিসাবে পেঁপে উৎপন্ন করার একটী অন্তরায় এই যে ফলগুলি এক সময়ে পাকে না। আর যে ফলগুলি পরে পাকে, সেগুলি সাধারণতঃ ছোট ছোট হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য বেশী দাম পাওয়া যায় না। স্থানীয় বাজারে পেঁপে খুব বেশী দামে বিক্রয় হইয়া থাকে এবং ইহা কলিকাতাতেও চালান দেওয়া যায়। সুতরাং পেঁপের চাষে যে লাভবান হওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

পেঁপেইন

শক্ত মাংস সিদ্ধ করিতে হইলে কয়েক টুক্রা কাঁচা পেঁপে উহাতে দিয়া সিদ্ধ করিবার প্রথা

এদেশে অতি প্রাচীন। যে পদার্থ দ্বারা এই মাংস সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা পেঁপেইন নামক একটী দীপনীয় শক্তি। যে পেঁপেইন বাজারে বিক্রয় হয় তাহা কাঁচা পেঁপে হইতে সংগৃহীত দুধের মত রস এবং তাহা শুকাইয়া পেঁপেইন তৈয়ারী করা হয়। রীতিমত পেঁপের বাগান করিলে এই পেঁপেইনের ব্যবসা সহজে করা যাইতে পারে।

পেঁপের শত্রু

সাধারণতঃ পেঁপে গাছ পোকা ও ছাতারোগ হইতে এক প্রকার মুক্ত। পাকা পেঁপেগুলিকে কাকে নষ্ট করিয়া থাকে। কখন কখন বানরে পেঁপের ফুল, ফল ও আগা খাইয়া ফেলে এজন্য পেঁপে বাগানে পাহারা দিতে হইবে।

ব্যবহার

পেঁপে নানা রকমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১। টাট্‌কা ফল। পাকা পেঁপে সব সময়ে খাওয়া যায়। ইহা সহজে হজম হয় এবং অন্য খাদ্য দ্রব্য হজম করিবার সহায়তা করে।

২। পেঁপের মোরব্বা—পাকা পেঁপের দ্বারা বেশ ভাল মোরব্বা তৈয়ার করা যায়। এক পাউণ্ড পেঁপেতে প্রায় ১॥ পাউণ্ড চিনি দিয়া উহাতে ২টা পাকা নেবুর রস দিয়া (যাতে টক্ স্বাদ হয়) জ্বাল দিলে উহা ঘন হইয়া মোরব্বা হইয়া থাকে।

৩। চিনির সিরাপে পেঁপে রাখা। পাকা (অথচ শক্ত) পেঁপে লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া শতকরা ৩০ ভাগ হইতে ৫০ ভাগ চিনির সিরাপে টিনের ডিবা বা কাঁচের বৈয়াম ভরিয়া রাখা যায়। কাঁচা পেঁপে ও সামান্য একটু নেবুর রস সহিত শতকরা ৩ ভাগ লবণ জলে ডিবা বা বৈয়ামে ভরিয়া রাখা যায়। পরে ইহা দ্বারা তরকারী প্রস্তুত করা যাইতে পারে; উভয় কাজেই বৈয়াম বা ডিবা গুলিকে ১৫—২০ মিনিট জ্বাল দিতে হইবে।

৪। তরকারী।—কাঁচা পেঁপে তরকারী রূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা অজীর্ণ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আমেরিকার কৃষি

[অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্-সি]

আমেরিকা এক রকম কৃষি-প্রধান দেশ। এক সময় ওদেশে চাষ করিয়া অনেকে বিশিষ্ট ধনী হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে মানবের খাদ্যাদি বদ্‌লাইয়া যাওয়াতে এবং বোধহয় আহার করিবার ক্ষমতা কমিয়া যাওয়াতে এক্ষণে কৃষিজাত দ্রব্য প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে কৃষকগণের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক কৃষিজাত দ্রব্যের অন্য ব্যবহার আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শস্যে কেবলমাত্র বীজ হইতে মানবের খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং পাতা শিকড় ডাঁটা প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যক্ত হয়। উক্ত দেশের মধ্যে বৎসরে মোটামুটী ১৩০০০০০০০০ মণ শস্যবীজ উৎপন্ন হয় এবং ২৬০০০০০০০০ মণ খড় ফেলিয়া দেওয়া বা পুড়াইয়া ফেলা হয়। এই পরিত্যক্ত দ্রব্যও বহুরূপ ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে।

শস্যবীজে বহু বিশিষ্ট রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ আছে যথা সেলুলোজ, ষ্টার্চ, শর্করা প্রোটিন্ ও তৈল। এগুলি শিল্প বাণিজ্যে বহুপ্রকারে ব্যবহার করা যায়। শস্যবীজের শাঁস হইতে রন্ধনোপযোগী তৈল ও রবারানুকল্প প্যারাগল প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা গো মহিষাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। গড়ে ১০ পালি শস্য হইতে ।৹ অর্দ্ধসের তৈল পাওয়া যায়।

শস্যের ডাঁটা হইতে প্রায় উহার এক তৃতীয়াংশ অতি উৎকৃষ্ট সেলুলোজ প্রস্তুত করা যায়। ইহা হইতে উত্তম কৃত্রিম রেশম, চলচ্চিত্রের ফিল্ম্ ডামভিল ও ইলিনয়স্ সহরে বহুপরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে।

শস্যের শীষের সমস্তটাই ফেলিয়া দেওয়া হইত, এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে উহাকে বন্ধ পাত্রে খুব গরম করিলে উহা হইতে এক প্রকার চট্-চটে পদার্থ নিক্রান্ত হয়। তাহার দ্বারা বহু দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়,—যথা কলের গানের রেকর্ড, ধুম পানের নল, Loud speaker ইত্যাদি। ইহা কার্ব্বলিক এসিডের ন্যায় সংক্রামকদোষ-শোধক; অতএব ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারে, মূল্যবান বৃক্ষের ক্ষত পরিষ্কারাদি কার্য্যে ইহা বড় উপকারক। কারণ ইহা কাষ্ঠের ভিতর অতি সহজে প্রবেশ করে। চুরুটের সুগন্ধিরূপে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে বহু দ্রব্য গুলিয়া যায় এবং ইহা অতি সহজে পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে অথচ বিশেষ বিষাক্ত নয়; এজন্য রঙের দ্রাবকরূপে, বার্ণিশাদির ব্যবসায়ে এবং চর্ম্ম সংস্কার কার্য্যে খুব ব্যবহৃত হইতে পারে। ১ পালি শস্য হইতে ।৶০ ছটাক এই দ্রাবক প্রস্তুত করা যায়। এই কার্য্যের জন্য আমেরিকার দুইটী কারখানাতে প্রতি দিন ২৮০০০০ পালি শস্য ব্যবহার হয়। এই দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে —প্রোটিনাদ্য খাদ্যোপাদান প্রায় সমস্তই থাকিয়া যায়। এই চট-চটে দ্রব্যটীর সংস্পর্শ মক্ষিকা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য মক্ষিকা-নিবারকরূপে ইহা আজ কাল বেশ ব্যবহৃত হইতেছে।

বীজ শাঁসের ভিতর এলবুমেন-জাতীয় পদার্থ আছে, তাহাতে ষ্টার্চ আছে। ইহা হইতে ধোপার কলপ এবং শর্করা প্রস্তুত করা যায়। এক পালি শস্য হইতে ।১৷৵ এক সের তিন পোয়া কলপ হইতে পারে।

শস্যের আবাদে এই ডাঁটা ও শীষ সমস্ত উৎপন্ন ফসলের প্রায় তিন চতুর্থাংশ।

শস্যবীজের বহিরাবরণ হইতে ফাইটিন (phytin) পাওয়া যায়। ইহা স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ভাল ঔষধ। ইহাতে প্রোটিনও প্রচুর আছে, এক পালি শস্য হইতে প্রায় ৷৵ তিন পোয়া প্রোটিন পাওয়া যায়।

মিসৌরী অন্তর্গত সেণ্ট জোসেফ সহরে একটী কারখানা হইয়াছে, সেথায় গমের খড় হইতে তড়িৎঅপরিচালক (insulating) তক্তা প্রস্তুত হইতেছে।

তুলার বিচি বিষাক্ত, এজন্য উহা অতি সযত্নে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে উহা হইতে বিষের উপাদান বাদ দিয়া উত্তম গো-মহিষাদির খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে কৃষক প্রতি বস্তায় প্রায় ৪০৲ টাকা তুলার দাম বেশী পাইতেছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই সূত্রে দেশের মধ্যে ৪৫ কোটী টাকা উঠিয়াছিল। রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে ইহা হইতে এক প্রকার এসিড প্রস্তুত করা যায়, উহা বেশ সস্তায় বিক্রী হওয়া সম্ভব।

কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত করোনা নগরে একটী কারখানা হইয়াছে। সেখানে পরিত্যক্ত নেবু হইতে, নেবুর তৈল, সাইট্রিক এসিড্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। পরিত্যক্ত আঙ্গুর হইতে প্রচুর পরিমাণে সস্তায় মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

পূর্ব্বে কৃষক কেবল মাত্র মানব উদর-পূরণের ব্যবস্থা করিত, এক্ষণে বড় বড় কারখানার উপাদান প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গণের বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে আমেরিকার কৃষক আবার ধনসম্পদে বিভূষিত হইবে সন্দেহ নাই।

———

গৃহ শিল্প

বিলাস সভ্যতার অঙ্গীভূত। খাদ্য ও পরিধেয় হ'লেই আমাদের জীবন রক্ষা হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী হলেই তাহা বিলাসীতায় পরিণত হয়। চাউল, ডাল্না ভাত খে'লে এবং ধুতি চাদর হলেই গৃহস্থ লোকের মোটামোটী একরকম দিন কেটে যায়, কিন্তু লোকের মন এতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি; মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই অভাব সৃষ্টি করা। আজ সে একমুষ্টি অন্নের জন্ত লালায়িত; সে যদি বিনা কষ্টে সেই একমুষ্টি অন্নের সংস্থান কর্ত্তে পারে, তা হলে অন্নের উপর দু'টা ভাল তরকারির জন্ত আকাঙ্ক্ষা হয়; সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হলে তার মন এতেও নিশ্চিন্ততা লাভ কর্ত্তে পারেনা। কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব, পোলাও খাবার জন্ত ইচ্ছা হয়।

ভেবে দেখ্লে বুঝ্তে পারা যায় যে, আকাঙ্ক্ষাই বিলাসের জননী। সাধারণতঃ মানুষ মাত্রেরই মনে অভাব বোধ এবং তার পরিপূরনের চেষ্টা আছে, কাজেই তারা সবাই বিলাস প্রিয়। লোকের আকাঙ্ক্ষা যতই বাড়্তেছে, দেশ মধ্যে বিলাসসাধনেরও তত অনুষ্ঠান হচ্ছে; বিলাস অর্থ সঞ্চয়ের সব চেয়ে বড় শত্রু। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার বৃদ্ধি। সভ্য ভব্য ব'লে দশজনের কাছে পরিচিত হ'তে হলে, সঞ্চয়ের শত্রু হ'লেও লোক-লজ্জায় পড়ে বিলাসিতার আশ্রয় নিতে হয়। আজকাল আমাদিগের দেশের গৃহলক্ষ্মীগণের মধ্যে সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করার অভ্যাস হয়েছে। সে বিষয়ে বিলাসিতার উপকরণ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি; এতদনুযায়ী কাজ কলে' অনেক টাকা বেঁচে যাবে।

বিবিধ শিল্প দ্রব্যাদির মধ্যে কালি, সাবান ও ছোট ছোট শিল্প প্রচলন বিষয়ে দেশের ভবিষ্যত বেশ আশা জনক। তবে প্রথম প্রথম এ সব ব্যবসার ফলাফল পরীক্ষা ক'র্ত্তে ছোটখাট প্রতিষ্ঠানগুলিকে খুবই বেগ পেতে হয়। এই কারণেই এ সব ব্যবসা সহসা তেমন

বেড়ে উঠ্‌তে পারেনা। সাধারণতঃ পুঁজি পাতি অল্পই হউক আর বেশীই হউক, যদি লোকে একবার বুঝ্‌তে পারে যে, এ ব্যবসায়ে টাকা দিলে এত পরিমাণ লাভ হ'তে পারে, তাহ'লে পুঁজি এবং উদ্যমের অভাব হবেনা।

এদেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কতদূর হবে, এ কথা বলা বড় শক্ত। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমাদের এসব ব্যবসায়ে নামা কর্ত্তব্য নয়। বাস্তবিক, ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের দিক্‌দিয়ে মিল নেই। অধুনা ইংলণ্ড (England) ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সব দেশই রক্ষণশীল হয়েছে। এমন কি ইংলণ্ডেও শিল্প বাণিজ্যের আইন-কানুন বজায় রেখে ব্যবসায় রক্ষার সমস্ত নিয়ম মেনে চল্‌ছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনাধীনে এসব বিষয়ে কতকটা ভিন্ন পথে চল্‌ছে। পাশ্চাত্য দেশের আবহাওয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির খুবই অনুকূলে বল্‌তে হবে। সে সব দেশের সওদাগরেরা খারাপ সময়েও তাদের লাগানো টাকার উপর একটা আস্থা ও বিশ্বাস রেখে দেয়। কিন্তু এ দেশে সাধারণতঃ টাকা কেউ ঘর থেকে বা'র কর্ত্তেই চায়না, আর কর্লে'ও একটুখানি লোকসানের সম্ভাবনা দেখ্‌লেই পিছিয়ে যায়।

আর একটা কারণেও পাশ্চাত্য দেশের শিল্প-বাণিজ্য বাড়বার সুবিধা পায়। সেখানে শিক্ষিত ও কর্ম্মপটু মজুরের কখনও অভাব হয়না। মজুর সমস্যাই এ দেশের শিল্প বাণিজ্য বেড়ে উঠার একটা বিষম বিঘ্ন। শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে এদেশে কোনও বিশেষ উন্নতি কর্ত্তে হলে ভিত্তি আগে পাকা করা আবশ্যক। বাঙ্গালী ব্যবসায় ক্ষেত্রে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীর ব্যবসায় আজও বাঙ্গালীর করায়ত্ত হয়নি।

আজ আমি শিল্প প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি এই প্রথানুযায়ী শিল্প কাজ আরম্ভ কর্ত্তে পারলে দেশের অনেক অর্থ বেঁচে যাবে। এবং শিল্পী আপন আপন পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে যে সক্ষম হবেন তা আমি নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

উইণ্ডসর সোপ।

চর্ব্বি /৪॥ সের, অয়েল অব অলিভ বা জলপাইয়ের তেল অর্দ্ধ /॥০ সের, অল্প caustic সোডার সহিত মিশ্রিত করে সাবানের মত প্রস্তুত কর্ত্তে হয়। পরে সামান্য আম্বার গ্রীন্ দিয়ে রং করে অয়েল অব ল্যাভেণ্ডার, অয়েল অব সিনেমন, অয়েল অব বার্গামট সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত কর্লেই অতি মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট উইণ্ডসার সোপ তৈয়ারী হবে।

কার্ব্বলিক সোপ।

বার সোপ /২॥ আড়াই সের, চর্ব্বি /৵ অর্দ্ধ পোয়া, অয়েল অব ল্যাভেণ্ডার ২ দুই ড্রাম, অয়েল অব রুডস্ ৩ তিন ড্রাম, কার্ব্বলিক এ্যাসিড ১ এক ড্রাম। সাবান তরল অবস্থায় থাক্‌তে কার্ব্বলিক এ্যাসিড মিশ্রিত ক'র্ব্বে।

কাপড় কাচিবার সোপ।

সাজিমাটি ।২ বার সের, নারিকেল তৈল /৩ তিন সের। একত্রে মৃদু অগ্নি উত্তাপে গলাইয়া বেশ ঘন হলে নামাইয়া অল্প গুড়া সোডা মিশ্রিত করে নিবে। তৎপর তাকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ ছাঁচে ঢাল্‌বে, তাহলেই সাবান প্রস্তুত হবে।

হানি সোপ।

নারিকেল তৈল /৪॥ পাউণ্ড, ফটকিরি তিন তোলা, ও জল প্রয়োজন মত। নারিকেল তৈল, সাজিমাটী ও চুন একটী মাটীর খোলায় করে অগ্নিতে দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে হবে। পরে উত্তমরূপে গলিয়া গেলে তাতে ফটকিরি গুড়া ও প্রয়োজন মত জল দিয়ে নাড়তে থাকবে এবং ভাল করে সিদ্ধ হলে পাত্রের উপরিস্থিত জল সাবধানে ফেলে দিলেই নীচে জমান সাবান থাকে। পরে ইচ্ছানুযায়ী ছাঁচে ঢেলে ও প্রত্যেক সাবানে ৩।৪ ফোঁটা গোলাপী আতর মিশ্রিত করে নিবে।

নানাবিধ কালি প্রস্তুত প্রণালী।

ইংরাজি কাল কালি

মাজুফল চূর্ণ /১ এক সের, গদ এক পোয়া, হীরাকস /। এক পোয়া, বকম কাঠ /। এক পোয়া, জল আধ মণ।

মাজুফল ও বকম কাঠ একঘণ্টা পর্য্যন্ত জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ কর্ত্তে হবে। উহা সিদ্ধ হলে তাতে গঁদ দিতে হবে। এবং সকলের শেষে হীরাকসের গুড়া দিলেই কাল কালি প্রস্তুত হবে।

লাল কালি

ক্রিম দানা আধ ছটাক, গরম জল আধসের, লাইকার এমোনিয়া আধ ছটাক। গরমজলে ক্রিমদানা ভিজাইয়া রেখে উহা শীতল হ'লে, তখন আধপোয়া জলে লাইকার এমোনিয়া মিশাইয়া দিবেন। একসপ্তাহ পরে উহা ছেকে নিলে উত্তম লালকালি প্রস্তুত হবে।

লাল-কালি (অন্য প্রকার)

বকম কাঠ চূর্ণ	...	/। এক পোয়া।
ক্রিম অব টাটার	...	/০ ছটাক।
ফিটকিরি	...	/০ ছটাক।
আরবী গঁদ	...	/০ ছটাক।
রেকটি ফায়েড স্পিরিট		/০ ছটাক।
ক্রিমদানা		/০ ছটাক।

বকম কাঠ, ফিটকিরি ও ক্রিম অব টার্টার /২॥ আড়াইসের জলে সিদ্ধ করে পাঁচ পোয়া থাকতে নামাইয়া আরবী গঁদ চূর্ণ মিশাইবে, তারপর ক্রিমদানা চূর্ণ স্পিরিটে গরম করে ছেকে একত্র মিশ্রিত করে নিবেন।

নীল কালি

সালউবিল প্রসিয়ান ব্লু...৬ ভাগ।
এ্যাসিড অক্জ্যালিক ... ১ এক ভাগ।

একত্র অল্প জলে দ্রব করতঃ পরিমাণ মত জল মিশ্রিত কর্বেন। বিশুদ্ধ সালউবিল প্রসিয়ান ব্লু কিংবা নীলবড়ি জলে দ্রব করতঃ সামান্য গঁদের জল দিলে, নীলকালি প্রস্তুত হবে।

এসেন্স প্রস্তুত প্রণালী।

এসেন্স কামিনী

স্পিরিট অব অ্যাম্বার গ্রেণ ৩ তিন ড্রাম, স্পিরিট অব টিঞ্চার, অরিস অব কেসিয়া, স্পিরিট অব রোজ, স্পিরিট অব জেসামিন সবই ৩ ড্রাম। উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত কর্লে কামিনী নামক অতি সুন্দর এসেন্স প্রস্তুত হয়।

এসেন্স অব রোজ

গোলাপী আতর অর্দ্ধ তোলা, রেকটিফাইড্ স্পিরিট অর্দ্ধ পোয়া, একত্র মিশ্রিত কর্লে এসেন্স অব রোজ তৈরী হয়।

মহারাজ এসেন্স

স্পিরিট বার্গামট ১ এক আউন্স, স্পিরিট সিটরন ৪ চারি ড্রাম, স্পিরিট ক্লোভস্ ৫ পাচ ড্রাম, স্পিরিট জিরেনিয়ম ১৸০ পৌণে দুই আউন্স, রেক্টিফাইড্ স্পিরিট ১৸০ কোয়ার্টার। উপরোক্ত দ্রব্যসকল উত্তমরূপে মিশ্রিত করে ১৭।১৮ দিন আবৃত করে রাখবার পর ব্যবহার কর্ত্তে হয়।

পমেটাম।

ভেড়ার চর্ব্বি ৬ ড্রাম, এসেন্স বার্গামেট ৪৫ ফোঁটা, অয়েল অব রোজমেরী ২৪ ফোঁটা, লিমন এসেন্স ৪৫ ফোঁটা, অয়েল অব ক্লোভস্ ১৫ ফোঁটা, ভেড়ার ও শুকরের চর্ব্বি অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া অন্যান্য দ্রব্য সকল মিশ্রিত করে নিলে অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধযুক্ত পমেটম প্রস্তুত হয়।

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার

স্পিরিট ১ পাউণ্ড, ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার অয়েল ১ একভরি, গোলাপ জল ৩ তিন ভরি, একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করে ৩ ঘণ্টা পরে ছেঁকে নিলেই উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার প্রস্তুত হবে।

অডিকোলন

অয়েল অব বার্গামট ১ এক আউন্স, ঐ লিমন অর্দ্ধ আউন্স, ঐ অরেঞ্জ সিকি আউন্স, ঐ রোজমেরী সিকি আউন্স, ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার অয়েল অর্দ্ধ আউন্স, নিরোলী ১ ড্রাম, রেক্টিফাইড্ স্পিরিট ২ পাউণ্ড, উপরোক্ত দ্রব্য সকল একত্রে মিশ্রিত কর্লে উত্তম অডিকোলন তৈরী হবে।

গোলাপ জল

ম্যাগনিসিয়া এক ছটাক, অটো ডিরোজ এক ড্রাম, ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটার ১ এক গেলন, প্রথমে অটোডিরোজ ও ম্যাগ্নেসিয়া এক সঙ্গে মিশ্রিত করে ডিষ্টিল্ড ওয়াটার মিশাইয়া নিয়া পরে শোষক কাগজ দিয়ে ছেঁকে নিবে।

উৎকৃষ্ট টুথ পাউডার।

চা খড়ির গুঁড়া অর্দ্ধ পাউণ্ড, কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নেসিয়া ২ দুই ড্রাম, রোজ পিঙ্ক অর্দ্ধ আউন্স, সালফেট অব কুইনাইন ১২ গ্রেণ। এইগুলি পেষণ করে একত্র মিশ্রিত কর্লেই উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হয়।

চুলের কলপ।

ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ১।। দেড় আউন্স, সলফেট অব পটাশ ১০ দশ তোলা, একত্র মিশ্রিত করে চুলে লাগাইলে চুলবেশ কাল হয়।

(২) মুদ্রাশঙ্খ দুই ছটাক, টাটকাশঙ্খ চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, চা খড়ি ১ এক ছটাক, এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত কর্ব্বে। এই চূর্ণ একটু নিয়ে গরমজলে গুলে ন্যাকড়া করে চুলে মেখে রাখবে। দুই ঘণ্টা পরে মস্তক ধুয়ে ফেললেই চুল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হবে। সাবধান, এই দ্রব্য খুব বিষাক্ত, ব্যবহার করিবার সময় যাতে হাতে বা মুখে না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখ্‌বেন। নতুবা অনিষ্ট হইবে।

লোমনাশক ঔষধ।

সোডা ২ দুই ভাগ, এরারুট ১০ দশ ভাগ, শঙ্খ চূর্ণ ১০ দশ ভাগ, এই কয়টী দ্রব্য উত্তমরূপে একত্র মিশাইয়া রেখে দিবে। ব্যবহারকালে জলের সহিত মিশাইয়া চুলের উপর মেখে দিবে। দুই তিন মিনিট পরে ন্যাকড়া দিয়ে মুছলে চুল উঠে যাবে।

(২) উৎকৃষ্ট এরারুট ৮ আট ভাগ, ফেরিসল ফায়েড ২ দুই ভাগ একত্র মিশ্রিত করে কাদার মত করে লোমযুক্ত স্থানে মেখে ৫।৭ মিনিট পরে জল দিয়ে ধু'য়ে ফেললে সমস্ত লোম উঠে যাবে।

এরারুট বিস্কুট প্রস্তুত প্রণালী

এরারুট তিন পোয়া, ভাল মাখন ৩ তিন ছটাক, পরিষ্কার চিনি ৩ তিন ছটাক। উপরোক্ত দ্রব্য সকল ভিনিগারে উত্তমরূপে মেখে পয়সা বা আধুলির আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেছি পাকাইয়া আগুণে ভাজ্‌তে হয়।

জুতার কালী।

জুতা ক্রুসের কালি

ভুঁতে এক কাঁচ্চা, কোত্‌রা গুড় ১ ছটাক, ভিনিগার অর্দ্ধ ছটাক, আইভরি ব্ল্যাক দেড় ছটাক, সুইট অয়েল এক কাঁচ্চা, জল দেড় পোয়া। প্রথমে সুইট অয়েল, কোত্‌রা গুড় এবং আইভরি ব্ল্যাক মিশাইয়া বেশ করে পেষণ করে কাইয়ের মত হলে ঐ কাইবৎ পদার্থে ভুঁতে, ভিনিগার এবং জল ক্রমে মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখ্‌লে উত্তম জুতার কালি তৈরী হয়।

জুতায় মাখাইবার কালি

মাজুফল ১ এক ড্রাম, শিরীষ ১ এক আউন্স, বকম কাঠ ৪ চারি আউন্স, নরম সোপ অর্দ্ধড্রাম, স্পিরিট রেক্‌টিফায়েড্‌ ১২ আউন্স। স্পিরিটে উক্ত দ্রব্য সকল ৬।৭ দিন ভিজিয়ে রাখ্‌বেন। বকম কাঠ আগে ভিজিয়ে, পরে অন্যান্য দ্রব্য-গুলি ভিজিয়ে দিবেন, পরে উহা কাপড় দিয়ে ছেকে নিবেন।

জুতা পরিষ্কারের কালি

১। হরিতকী, বহেড়া ও আমলা সমানভাগে নিয়ে বেশ সূক্ষ্ম চূর্ণ করে ছেঁকে নিবেন। তারপর তাতে সামান্য হীরাকস ভিজিয়ে ভিনিগারে ভিজালে সুন্দর জুতার কালি প্রস্তুত হয়।

২। ভুষা, হরিতকী, বহেড়া, আমলা ও মাজুফল একত্র অতি সূক্ষ্ম গুঁড়া করে স্যালিসিটিক্ এসিডের সঙ্গে মিশ্রিত কর্লে অত্যুৎকৃষ্ট জুতার কালি তৈরী হয়।

৩। গ্যালিক্ এ্যাসিড্‌ ভিনিগার ২।৪ ফোঁটা ও হীরাকস একত্র কর্লে জুতার কালি প্রস্তুত হয়।

সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত প্রণালী।

রিফাইন কর্ব্বার নিয়ম।

উৎকৃষ্ট নারিকেল অথবা তিল তেল জাল দিয়ে পরে হাড় পোড়া কয়লার উপর ঢেলে দিয়ে ২৪ ঘণ্টা রাখ্‌লে উহার স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। পরে সামান্য গরম করে ফ্লানেল বা ব্লটিং কাগজের ঠোঙ্গা করে ৪।৫ বার ছেঁকে নিলেই তেল বিশুদ্ধ হয়। এ্যালকানি-রুট তেলের মধ্যে ১৩।১৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখ্‌লে

তেল ঘোর গোলাপী বর্ণযুক্ত হয়। যদি শীঘ্র শীঘ্র রং কর্ত্তে হয়,তবে পরিমাণমত এ্যালক্যানিরুট মিশ্রিত করে অনবরত নাড়্লে একঘণ্টা দেড় ঘণ্টার মধ্যেই উক্ত বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

রং কর্ব্বার নিয়ম।

উল্লিখিত মত রিফাইন করা তৈল /৪ সের, এ্যালকানিরুট অর্দ্ধ আউন্স। উক্ত প্রণালীতে তৈলকে সুন্দর গোলাপী বর্ণ করে নিম্নলিখিত যে প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য বা তৈল মিশ্রিত কর্ব্বে। তৈল ও সেইরূপ গন্ধ বিশিষ্ট হবে।

মিশ্রনকারী সুগন্ধ দ্রব্যের নাম।

১। অটোভিয়োজ মিশাইলে সুন্দর গোলাপী গন্ধ বিশিষ্ট হবে।
২। অয়েল অব বার্গামেট্...বাতাবী লেবুর গন্ধ।
৩। „ গ্রাস ... উগ্রগন্ধ তৃণের মত গন্ধ।
৪। অয়েল লিমন ... কাগজীলেবুর গন্ধ।
৫। „ সিট্রন ... কমলালেবুর গন্ধ।
৬। „ ভার্ব্বিনী ঘাসের গন্ধ।
৭। „ নিরোলী ... কমলালেবুর গন্ধ।
৮। „ সিনেমন ... দারুচিনির গন্ধ।
৯। „ কারুই ... জীরের গন্ধ।
১০। „ ক্লোভস্ ... লবঙ্গের গন্ধ।
১১। „ এনিসাই ... মৌরীর গন্ধ।
১২। „ কেজুপটী ... বড় এলাচের গন্ধ।
১৩। „ স্যাণ্ডাল ... চন্দনের গন্ধ।

স্পিরিট অব ক্যান্থারাইডিন্, অয়েল অব পর্টুগাল, গ্লিসারিন ও অয়েল অব বেলা মিশ্রিত কর্লে সকলপ্রকার মস্তিষ্কের পীড়া দূর হয় ও কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয় ও বৃদ্ধি করে।

গোলাপী ফুলের তৈল।

অলিভ অয়েল দেড় ছটাক, অফুটন্ত গোলাপের পাপড়ি দেড় পোয়া, ফুলের পাপড়িগুলি অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করে যখন দেখ্বে যে উত্তমরূপ সুগন্ধযুক্ত হয়েছে, তখনই ছেঁকে নিবে। পরে লাল রং কর্ব্বার ইচ্ছা হলে পরিমাণ মত এ্যালকানিরুট দিবে।

ম্যাকেসার তৈল।

বাদাম তৈল এক পোয়া, এ্যালকানিরুট এক তোলা, অয়েল অব্ রোজমেরী ২০ বিশ ফোঁটা, গোলাপী আতর ৫ পাঁচ ফোঁটা, জায়ফলের তৈল ৫ পাঁচ ফোঁটা, মৃগনাভির আরক ৫ পাঁচ ফোঁটা, মিশ্রিত কর্লেই উৎকৃষ্ট ম্যাকেসার তৈল প্রস্তুত হয়। এতে টীঞ্চার অব ক্যান্থারাইডিন মিশ্রিত কর্লে মস্তিষ্কের পীড়া দূর হয়।

নারিকেল তৈল ১ বোতল, অটোভিয়োজ ৫ পাঁচ ফোঁটা, ভার্ব্বেনা অয়েল ১ এক ড্রাম, চন্দন তৈল এক ১ ড্রাম, এবং নিরোলী ১ এক ড্রাম। উত্তমরূপে মিশ্রিত কর্লে যে তেল হয়, তার গন্ধ বড়ই রমনীয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।

পাঁউরুটী প্রস্তুত প্রণালী

ময়দা বা সুজি /। এক পোয়া, সোডাবাইকার্ব্ব ২ দুই আনা, টার্টারিক এ্যাসিড ২০ বিশ গ্রেণ, জল আড়াই ছটাক। ময়দা বা সুজি সোডাবাই-কার্ব্বের সহিত টার্টারিক এ্যাসিড বেশ করে গুড়া

করে মিশ্রিত কর্ব্বে। পরে জল মিশিয়ে খুব ঠেসে খুব গরম তন্দুরের (oven) মধ্যে লোহার হাতা বা তাওয়ায় করে সেঁকিয়া নিলে উত্তমরূপে পাঁউরুটী তৈরী হয়।

আবির বা ফাগ

ম্যাজেণ্টার রং ২॥ আড়াই তোলা, এরারুট ২॥ সের। পরিমিত জলের সহিত একত্র মিশ্রিত করে রৌদ্রে শুষ্ক করে নিলেই আবির বা ফাগ তৈরী হয়।

তরল আলতা

গ্লিসারিন ২ দুই আউন্স, খুন খারাপী রং অর্দ্ধ আউন্স, এমোনিয়া (গুড়া) অর্দ্ধ আউন্স, এমোনিয়ার জল অর্দ্ধ সের, রেকটি ফাইড স্পিরিট অর্দ্ধ ছটাক, ল্যাভেণ্ডার ২॥০ আউন্স আউন্স। গ্লিসারিন ও এমোনিয়ার জলের সহিত এমোনিয়ার গুড়া মিশাইয়া যখন দেখবে উহা সুন্দররূপে একত্র মিশ্রিত হয়েছে, তখন খুনখারাপী রং দিয়ে স্পিরিট মিশ্রিত কর্ব্বে। তারপর ল্যাভেণ্ডার মিশাইলেই সুবাসিত তরল আলতা তৈরী হয়।

ফলের সিরাপ

জল অর্দ্ধ গ্যালন, চিনি (দানাদার) ২॥০ আড়াই পাউণ্ড একত্রে জলে চড়াবে। যখন দেখবে বেশ ফুটতে আরম্ভ করেছে, তখন গাদ কেটে ফেলে দিবে। রস বেশী ঘন না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখবে। নামাইয়া ঠাণ্ডা হলে ইজ্জামবারী-লিমন, অরেঞ্জ, রোজ, পাইনাপেল ইত্যাদি যেরূপ এসেন্স বা আরক মিশ্রিত কর্লে সিরাপও তদ্রূপ গন্ধ বিশিষ্ট হবে।

লেমনেড পাউডার

সাদা চিনি ১ এক পাউণ্ড, সোডাবাইকার্ব্ব ৪ চারি আউন্স, সাইটিক বাটার্টারিক এসিড ৬ ছয় আউন্স, এসেন্স অব লিমন ১॥০ দেড় আউন্স, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত কর্লে লেমনেড পাউডার তৈরী হয়। ইহা কাঁচের ছিপিযুক্ত শিশিতে উত্তমরূপে আবদ্ধ করে রাখা উচিত। এক গ্লাস জলে এক চামচ এই গুড়া দিলে অতি উপাদেয় লেমনেড তৈরী হয়।

ইংলিসকারি পাউডার

সর্ষিবা ২ দুই আউন্স, মরিচ ১৩ আউন্স, তেজপাতা অর্দ্ধ ঐ, জীরা ঐ, লঙ্কা অর্দ্ধ ঐ, সিলারী বীজ অর্দ্ধ ঐ, হরিদ্রা অর্দ্ধ ঐ, ধনিয়া ১ এক পাউণ্ড, উপরোক্ত দ্রব্য সকল একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করে একটী পাত্রে প্রায় মাসাবধি কাল ঢেকে রাখতে হয়। তদনন্তর শিশি পূর্ণ কর্ব্বে।

মোমবাতি।

চর্ব্বি ৩ তিন পাউণ্ড সোরা ২ দুই ছটাক, ফটকিরি ২ দুই ছটাক। প্রথমে সোরা ও ফটকিরি এক পাঁইট জলের সহিত মৃদু উত্তাপে গলাইবে। শেষে উহাতে উল্লিখিত চর্ব্বি মিশ্রিত কর্ব্বে। যে পর্য্যন্ত ঐ চর্ব্বি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নাড়তে থাকবে। কিন্তু অগ্নির তাপে চর্ব্বি যাতে পুড়ে না যায় সেজন্য বিশেষরূপ সাবধান হবে। সকল দ্রব্য

উত্তমরূপে মিশ্রিত হলে ইচ্ছানুসারে ছাঁচে ফেলে নিবে, তাহলেই উত্তম বাতি তৈরী হবে।

গালাবাতি

চাঁচ গালা ৪ চারি আউন্স, টার্পিন ২।০ সোয়া দুই আউন্স, আমেরিকান চাম্পিলিয়ান রং ১॥ আউন্স; বালসামপেরু ৩ তিন ড্রাম। উপরোক্ত দ্রব্য সকল কিঞ্চিৎ তার্পিন তৈল দিয়ে মিশিয়ে দ্রবীভূত করে ছাঁচে বা হাতে ইচ্ছানুযায়ী আকারে তৈরী কর্ত্তে হয়।

নানারূপ শিল্প দ্রব্যাদির মধ্যে সাবান, সুগন্ধি তৈল, কালি জুতা ক্রুসের কালি, এসেন্স, টুথ্ পাউডার, বিস্কুট, সিরাপ, এইরূপ ছোট ছোট শিল্পের এদেশে ভবিষ্যত উন্নতির আশা বেশ আছে। তাই আজ আমি কয়েকটী ছোট ছোট শিল্প প্রস্তুত প্রণালীর কথা বল্লাম। সামান্য উদরান্নের জন্য পরপদানত ও পরমুখাপেক্ষী না হয়ে যদি স্বগৃহে বসে ছোট ছোট শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, তবে মাসিক আয় চাকরীর অপেক্ষা অনেক বেশী হবে। গৃহস্থের পক্ষে ইহা উপেক্ষার বিষয় নয়।•

শ্রীসুবোধ কুমার নন্দী মজুমদার
তেলিয়া পাড়া চা বাগান,
ইটাখোলা, পোঃ
(শ্রীহট্ট)

• এই প্রবন্ধের লিখিত ফরমুলাদির সম্বন্ধে আমরা নিজে কিছুই জানিনা। কোনও কথা জানিতে হইলে প্রবন্ধ লেখকের নিকট সরাসরি পত্র লিখিবেন। এইজন্য তাঁহার ঠিকানাও এইখানে দিলাম। সম্পাদক।

ভারতের আর্থিক দৈন্য ও তাহার প্রতীকার।

বিগত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে বাঙ্গলার জাতীয় বণিক সমিতির (Bengal National Chamber of Commerce) বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী বৃন্দকে লইয়া এই সমিতি গঠিত; বিদেশীরা এই সমিতির সদস্য নহেন। তাঁহাদের জন্য আর একটী স্বতন্ত্র বণিক সমিতি আছে। বলা বাহুল্য, স্বদেশী ও বিদেশী বণিকের স্বার্থ এক নহে; তাই উপরোক্ত দুই বণিক সমিতির পক্ষ হইতে যে সমস্ত মতামত প্রচার করা হয় তাহা সকল সময়ে একরূপ হয় না।

জাতীয় বণিক সমিতি বলিতেছেন যে, ১৯২৯ সালে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। এই সমিতির বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নলিনী বাবু হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স সোসাইটীর ম্যানেজার এবং বাঙ্গলার কংগ্রেসী মহলের অন্যতম প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি স্বীয় অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতার গুণে তিনি আজ ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত। এমন কি বিদেশী ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত তাঁহার বিচক্ষণতার প্রশংসা না করিয়া পারেন না। এই অবস্থায় দেশের আর্থিক দৈন্য সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধান যোগ্য। ১৯২৯ সালে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা তিনি অল্প কয়েকটি কথায় বর্ণনা করিয়াছেন।

নলিনীবাবুর মতে আলোচ্য বৎসরে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা—"gloomy all round"—অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়েই নৈরাশ্য জনক। ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত কোন না কোন বিষয়ে যাঁহাদের যোগ আছে তাঁহারাই একথা সমর্থন করিবেন। কেন না, ভুক্তভোগীরা ইহার মর্ম্ম পদে পদে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। বিশেষ করিয়া money market (অর্থের বাজার) যেরূপ tight হইয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ীদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিতেছে না। অনেক ব্যবসায়ী বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না; ইহার ফলে বহু সংখ্যক কাজ কারবার অকালে শুকাইয়া মরিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

বাঙ্গলার জাতীয় বণিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার বলিয়াছেন—"১৯২৯ সালে রেঙ্গুণী চাউলের কারবার একরূপ স্থির হইয়াই ছিল · উঠেও নাই, পড়েও নাই। কিন্তু বাঙ্গলার চা-এর কারবার আরও পিছাইয়া গিয়াছে। চা-শুল্ক সম্পর্কে তদন্ত করি-

বার জন্য মিঃ হার্ডিকে নিয়োগ করা হইয়াছিল। এই তদন্তের ফলাফল এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। তারপর কাপড়ের কলের মালিক গণের সহিত Commerce member—অর্থাৎ ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের আলোচনা হইয়াছিল। তাহার ফলও আমাদের অজ্ঞাত। প্রতিকারের বিশেষ কোন আশা নাই; তবে যদিই বা কিছু হয় তাহাও অতিরিক্ত বিলম্বের জন্য দেশীয় ব্যবসায়ের সাহায্য করিতে পারিবে না।

বাঙ্গলার পাট ও চট শিল্প (jute mill industry। এ পর্য্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্প্রতি ইহার ও দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। পাটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া এতদিন অনেকেই গর্ব্ব করিতেন। কিন্তু এখন ইহার ভবিষ্যতের চিন্তায় সকলেই চঞ্চল হইয়াছেন। পাটের বাজারের এই অবনতির ফলে এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

অন্যান্য শিল্পের মধ্যে অসংস্কৃত ঢালাই করা লোহা একটি প্রধান শিল্প ছিল। জাপান আমাদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে এই মাল ক্রয় করিত। কিন্তু সে আবার নন্‌কো ওপারেশন সুরু করিয়াছে। ফলে অসংস্কৃত লোহার কারবারে ও মন্দা পড়িয়াছে। অকস্মাৎ জাপান এরূপ নন্‌-কো-ওপারেশন কেন করিল তাহা ভাল বোঝা যাইতেছে না। ইতিমধ্যে জাপানী সুতার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্যই কি জাপান আমাদের নিকট হইতে লোহা ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে?"

১৯২৯ সালের ব্যবসা বাণিজ্যের দুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়াছেন—পাট, হোসিয়ান, চামড়া, তেলের বীজ প্রভৃতির রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। তবে তুলা রপ্তানীর পরিমাণ দৃশ্যতঃ কম হয় নাই। কিন্তু ইহাতেও তুলার চাষীদের ভাগে লভ্যাংশ খুব কমই পড়িয়াছে। চা এর দর একটু পড়িয়াছে বটে; কিন্তু প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হওয়ায় গড়ে প্রতি পাউণ্ডের দর ১৯২৮ সাল অপেক্ষা কম হইয়াছে।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ভারতের শিল্প বাণিজ্যের এই অবনতির কারণ কি এবং ইহার জন্য দায়ী কে? প্রতি বৎসর ভারতবাসীর দুঃখ দৈন্য যে বাড়িয়াই চলিয়াছে—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? সরকার পক্ষ হয়ত বলিবেন—"আমরা তো চেষ্টার ত্রুটি করি না; কিন্তু কি করিব? সকল দেশেই এই অবস্থা! সকলেরই ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা পড়িয়াছে—Internatianal conditisn (আন্তর্জ্জাতিক অবস্থাই) এই!" নলিনীবাবু ইহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ১৯২৯ সালে সকল দেশের ব্যবসা বাণিজ্যেব অবস্থা মন্দ ছিল না। আলোচ্য বর্ষে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র এবং কানাডা কয়েকটি শিল্পে এবং বাণিজ্যের কোন কোন বিভাগে উল্লেখযোগ্য (Record) উন্নতি সাধন করিয়াছে। অবশ্য ১৯২৯ সালের শেষ দিকে একটু অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তারপর শিল্প ও বাণিজ্য এই উভয় দিক দিয়াই ফ্রান্সের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। জার্ম্মানীর দারুণ অর্থ সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও মোটের উপর তাহার শিল্প বাণিজ্যের অবনতি হয় নাই। ইংলণ্ডের প্রাচীন শিল্পগুলির দুরবস্থা হইলেও নূতন শিল্পগুলি যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান্‌ হইয়াছে। ধীরভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, আন্তর্জ্জাতিক শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জটিলতা সত্ত্বেও মোটের উপর পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯২৯ সালে নিতান্ত মন্দ চলে নাই।

কেবল ভারতবর্ষেই ইহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইতেছে। কেবল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নহে—সরকারের আর্থিক অবস্থাও কাহিল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

ভারত সরকার তথা ভারতবাসী জন সাধারণের এই দারুণ আর্থিক অবনতির কারণ কি? ইহার জন্ত আন্তর্জ্জাতিক অবস্থাই কি প্রধানতঃ দায়ী? সরকারপক্ষ যাহাই বলুন না কেন,—মোটের উপর এই ব্যাধির মূল ভারতবর্ষেই রহিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং অতঃপর প্রতিকারের যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা কেবল আমাদের মনের কথা নয়—বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাত্রই এ মন্তব্য সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন—

The rot in our economic conditions is due entirely to the unsound, unscientific and unsatisfactory policy of the government in regard to currency, credit, finance and exchange.

অর্থাৎ সরকার পক্ষ মুদ্রা প্রচলন, ঋণ-গ্রহণ, ব্যয় বরাদ্দ এবং মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কে যে অযৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলেই আমাদের আর্থিক দুর্গতির অবসান হইতেছে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রতি গবর্ণমেন্টের যে একটা অবশ্য কর্ত্তব্য আছে তাহাও কর্ত্তৃপক্ষ সম্যক উপলব্ধি করেন না। যাঁহাদের তত্ত্বাবধানে গবর্ণমেন্টের অর্থ নীতি পরিচালিত হইতেছে তাঁহারা হয়তঃ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভাল করিয়া বোঝেন না—অথবা বুঝিয়াও তাঁহারা স্বেচ্ছায় এমন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহাকে যুক্তিসঙ্গত অর্থ-নীতির দিক হইতে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বলা বাহুল্য যে, গবর্ণমেন্টের মুদ্রানীতি পদে পদে দেশের আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দৃষ্টান্তস্থলে নলিনী বাবু, এক টাকার মূল্য আইন করিয়া ১৮ পেনী নির্দ্দিষ্ট করার কথা আলোচনা করিয়াছেন।

পাঠকবর্গ—বোধহয় অবগত আছেন যে, মুদ্রা বিনিময়ের হার কত হওয়া উচিত—এ বিষয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবল বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এক টাকার মূল্য ১৬ পেনী করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। অপর পক্ষ বলিয়াছিলেন যে, ১৮ পেনী নির্দ্ধারিত হইলেই ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গল হইবে। তখন বাঙলার জাতীয় বণিক সমিতিও (Bengal National chamber of commerce) ১৮ পেনীর পক্ষে মত দিয়াছিলেন। ১৮ পেনীর পক্ষপাতী যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, টাকার মূল্য যত বেশী হয় ততই ভারতবাসীর লাভ; কারণ তাহা হইলে বিদেশের বাজার হইতে এক টাকা দিয়া ভারতবাসী বেশী জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবে।

বাহিরের দিক হইতে বিচার করিলে ১৮ পেনী হার ভারতের পক্ষে লাভজনক বলিয়াই মনে হয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, স্বর্ণমান হিসাবে ভারতের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আনন্দিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। বিগত দুই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে, এই ১৮ পেনী মুদ্রা বিনিময়ের হারই ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের 'কাল' হইয়াছে। ভারত চন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে—

"গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিস্তার বিস্তায়।"

টাকার মূল্য বেশী হইয়াই ভারতের আর্থিক দৈন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে আজকাল প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই দারুণ প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়া থাকিতে হইলে সুলভ মূল্যে মাল সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। টাকার মূল্য ১৮ পেনী নির্দ্ধারিত হওয়ায় বিদেশীর নিকট ভারতের মালের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রস্তুত যে পরিমাণ মাল বিদেশীরা ১৬ পেনী মূল্যে পাইত এখন তাহার জন্ত ১৮ পেনীর প্রয়োজন হয়। ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির এই সুযোগ অন্তান্ত দেশের প্রতিযোগীরা আসিয়া সস্তায় মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে যে সমস্ত স্থলে ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় মালের একচেটিয়া রাজত্ব ছিল তথায় এখন অন্তান্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতীয় মাল আর তথায় বিক্রয় হইতেছে না।

শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"যাভা ও সুমাত্রার চা আসিয়া ভারতীয় চা-কে বিতাড়িত করিতেছে. রেঙ্গুনী চাউলের পরিবর্ত্তে অধুনা শ্যাম ও ইণ্ডো-চিনের চাউলের কাটতি হইতেছে। ভারতীয় তুলার দর যদি কোন প্রকারে আমেরিকার তুলার সমান হয় তাহা হইলে ইহার কিছুটা কাটতি হয়। তারপর পাট। এই পাট সম্পর্কে ভারতের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। কারণ পৃথিবীর আর কোন দেশেই এপর্য্যন্ত পাট উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু আজকাল এই পাট উৎপাদনকারী চাষীরা যে দর পাইতেছে তাহার পরিমাণও যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।" প্রথমতঃ ব্যবসায় বুদ্ধিতে ভারতবাসী এখনও অন্তান্ত জাতির সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তারপর টাকার মূল্য ১৮ পেনী নির্দ্ধারিত হওয়ায় ভারতীয় পণ্যের দাম কমাইবার উপায় নাই। তৃতীয়তঃ অন্তান্ত দেশের ন্তায় ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের পশ্চাতে তেমন শক্তিশালী সরকারী সমর্থন নাই। এতগুলি অসুবিধা যাঁহাদের রহিয়াছে তাঁহারা আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে কতক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে? ফলে হইয়াছেও তাহাই। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য কোথায় উন্নতির দিকে যাইবে,—না একেবারে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে; এমন কি অধঃপাতে গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীহট্টে কুটীর শিল্পের উন্নতি সাধনের চেষ্টা।

সম্পাদক ব্যবসা ও বাণিজ্য

কলিকাতা।

মহাশয়—

আমরা শ্রীহট্ট জিলার কুটীর শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছি। এ বিষয়ে একখানা অনুষ্ঠান পত্র এতৎসঙ্গে পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের সুবিখ্যাত পত্রিকায় ইহা প্রকাশ করিবেন এবং এ বিষয়ে আমাদিগকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া বাধিত করিবেন।

২। বাঙ্গলা দেশের ও ভারতের কোথায় কি শিল্প শিক্ষার সুবিধা আছে তাহার একখানা লিষ্ট আপনাদের পত্রিকায় ছাপাইলে ভাল হয়।

বিনীত—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

সম্পাদক

ব্যবসা বাণিজ্যের আমার ব্যক্তিগত গ্রাহক নং ৪১৭৩।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে কুলাউড়ায় রিলিফ কমিটি সমূহের যে অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীহট্ট জিলার কৃষি এবং শিল্পের স্থায়ী উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বন্যার আক্রমণে ফসল নষ্ট হইয়া যে অভাব অনটন হয়, তাহার কথঞ্চিৎ উপশম করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটী গঠিত হয়। উক্ত কমিটি শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থার অনুসন্ধান করিতেছে।

সহর এবং বিশেষ ভাবে গ্রামবাসী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান ক্রমে সঙ্গীয় প্রশ্নাবলীর উত্তরে নিজ অথবা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শিল্পের অবস্থা কমিটিকে জানান তবে কমিটী বিশেষ উপকৃত হইবেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র স্যান্যাল মহাশয়ের নামে উত্তর পাঠাইতে হইবে। Sylhet Home Industries Association নামে কুটির শিল্পের উন্নতিকল্পে একটি স্থায়ী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। শিল্পীগণকে পরামর্শ দান ও অবস্থা বিশেষে অর্থ সাহায্য দ্বারা শিল্পের উন্নতি সাধন এ সমিতির উদ্দেশ্য।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সান্যাল, সেক্রেটারী,

Sylhet Home Industries Association, Syhlet

প্রশ্নাবলী

অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১ মাসের মধ্যে অত্র ফারম পূর্ণ করিয়া পাঠাইবেন। প্রত্যেক প্রকার শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক কাগজে লিখিবেন।

থানা—

সার্কেল নম্বর—

পরগণা—

গ্রাম—

ডাকঘর—

সাধারণ অনুসন্ধান

১। উপরের লিখিত স্থানে কোন প্রকার কুটীর শিল্পের উৎপাদন হয় কি ?

২। কি কি শিল্প উৎপাদন হয় তাহার নাম লিখিবেন।

৩। পূর্ব্বে ঐ শিল্পের কি অবস্থা ছিল ?

৪। বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

৫। অবনতি হইলে কি কারণে হইয়াছে ?

৬। উন্নতি হইলে কি কারণে ও কি ভাবে হইয়াছে ?

৭। কতজন লোক ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছে ? (পুরুষ ও স্ত্রী) শিল্প হইতে তাহাদের দৈনিক বা মাসিক বা বাৎসরিক আয় জনপ্রতি গড়ে কত ?

৮। তাহাদের ভরণ পোষণের জন্ত কোন সংস্থান আছে কি ?

৯। ঐ শিল্পীরা কোথা হইতে কি ভাবে মূলধন যোগাড় করে ?

১০। টাকা কর্জ্জ আনিলে সুদ কত ?

১১। শিল্পনিপুণ শিল্পীগণ দ্বারা কার্য্য পরিচালিত হইতেছে কি না ? তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য বাড়াইবার কোন উপায় অবলম্বন করা হইতে পারে কি না এবং তাহারা ঐ কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিতে ইচ্ছুক আছেন কি না ?

১২। দাদন দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিলে কাহারা কি ভাবে দাদন দেয় ?

১৩। কি সুদে দাদন দেওয়া হয় ? কি কি সর্ত্তে দাদন দেওয়া হয় ? এইরূপ সর্ত্ত থাকে কি না যে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে প্রস্তুত মাল দাদনকারির নিকট বিক্রয় করিতে হইবে ? না করিলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে। যে দরে মূল্য স্থির হয় তাহা বাজার দর অপেক্ষা অনেক অল্প কি না ? টাকা প্রতি কয় আনা কম ? এই সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য হইয়া শিল্পীগণ জিনিষের প্রকৃত মূল্য হইতে বঞ্চিত হয় কি না ? এবং ঐ সকল মহাজনগণের হাত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হইলে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। অথবা তাহার কাটতি (disposal) আরও কোনও প্রকারে হইতে পারে কি না ? যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে মূল্যের তারতম্য ঘটে কি না ?

১৪। বর্ত্তমান শিল্পীরা ঐ শিল্পের উন্নতি-সাধন করিতে ইচ্ছুক আছেন কি না ?

১৫। তাহারা কি ভাবে (ক) মূলধন (খ) কাচা মাল সংগ্রহ এবং (গ) জিনিষ বিক্রয় করার জন্ত সুযোগ ও সুবিধা পায় এবং ঐ কাচা মাল বাজার দর অপেক্ষা টাকা প্রতি কত আনা কম কি উচ্চ মূল্যে সংগ্রহ করা হয়।

১৬। এক সঙ্গে বহু টাকাতে কাচামাল (whole sale) ক্রয় করিয়া যদি বিনা লাভে সরবরাহ করা হয় তবে শিল্পীগণ লাভবান হইবে কি না এবং শিল্পের উন্নতি হইবে কি না ?

১৭। তাহাদের প্রস্তুত জিনিষ কি ভাবে কোথায় বিক্রি হয় ? মধ্যবর্ত্তীরা টাকা প্রতি কয় আনা মুনফা রাখে ?

১৮। দক্ষ এবং দুরবস্থাপন্ন কয়জন শিল্পির নাম বিশেষ বিবরণ সহ লিখিবেন।

লুপ্ত শিল্প

১৯। কোনও প্রকার শিল্প যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এবং বর্ত্তমানে লুপ্ত আছে তাহার নাম দিবেন ?

২০। কি কারণে কত বৎসর যাবৎ লুপ্ত হইয়াছে ?

২১। বর্ত্তমানে লুপ্ত শিল্প উদ্ধার করিবার কোন উপায় থাকিলে তাহাও লিখিবেন ?

আনুসঙ্গিক শিল্প

২২। কৃষকেরা বৎসরে কোন কোন সময়ে একান্ত অবসর থাকে কি না ?

২৩। ঐ অবসর সময় তাহারা কোন প্রকার শিল্পের কার্য্য গ্রহণ করে কি না ?

২৪। যদি গ্রহণ করে তবে কি প্রকার শিল্প কার্য্য গ্রহণ করে এবং তাহাতে কি ভাবে আয় হয় ?

২৫। মূলধন প্রাপ্ত কাচা মাল (raw materials) এবং অভিজ্ঞদিগের উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিলে তাহারা আরও উৎসাহিত হইয়া কার্য্য করিবে কি ?

২৬। যদি অবসর সময় তাহারা কোন প্রকার শিল্প কার্য্য না করে তবে উৎসাহ দিলে কোন প্রকার শিল্প গ্রহণ করিবে কি না ?

নূতন শিল্প

২৭। যে কোন নূতন শিল্প কার্য্যে যে কোন লোককে নিযুক্ত করা যায় কি না ? এই সময় কোন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন সম্ভবপর কি না ?

২৮। যদি সম্ভবপর হয়, কি কি শিল্পের প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে ও কি উপায়ে করা যাইতে পারে ?

২৯। নূতন শিল্প প্রবর্ত্তনের জন্য কোন সাহায্য করার প্রয়োজন আছে কি না ? যদি থাকে কিরূপ সাহায্য করার প্রয়োজন ?

মধ্যবিত্ত শ্রেণী (বেকার সমস্যা)

৩০। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার দিগকে কোনও শিল্প কার্য্যে লাগান যাইতে পারা যায় কি না ? এবং পারিলে কি কাজে লাগান যাইতে পারে ? এবং তজ্জন্য ইহাদিগকে কিরূপ সাহায্য করা প্রয়োজন ?

হাতিয়ার

৩১। কি প্রকার হাতিয়ার শিল্পিরা বর্ত্তমানে ব্যবহার করিয়া থাকে ? উন্নত প্রণালীর হাতীয়ার ব্যবহার করা যাইতে পারে কি ? উহাতে তাহাদের সময় ও পরিশ্রম লাঘব হইতে পারে কি না ? যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া শিল্পিগণ লাভবান হইবে কি না ? উন্নত প্রণালীর হাতিয়ার পাইতে হইলে কোন কোন শিল্পীর হয়ত মূলধনের প্রয়োজন হইতে পারে। তাহা কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে ? উন্নত প্রণালীর হাতিয়ারের জন্য কত অধিক মূল ধনের আবশ্যক এবং ঐ হাতিয়ার দ্বারা কত অধিক আয় হইতে পারে ?

শ্রীহট্ট জিলায় নিম্নলিখিত কুটীর শিল্পের প্রচলন বিশেষ ভাবে হইতে পারে।

(১) চর্ম্মশিল্প

(২) (ক) নারিকেলের ছোবলাধারা নানা রকম জিনিষ তৈয়ার

(খ) পাট দ্বারা দড়ি ও ছালা প্রস্তুত

(৩) লাক্ষার চাষ ও গালা প্রস্তুত

(৪) শঙ্খ শিল্প

(৫) বোতাম তৈয়ারী

(৬) সাবান প্রস্তুত

(৭) (ক) ধান ভানার ছোট ছোট কল ও ষাঁতা স্থাপন

(খ) ঘানী এবং অন্যান্য প্রেস

(৮) ছাতার বাঁট তৈয়ার

(৯) তামা, কাঁশা ও পিতলের বাসন তৈয়ার, পিতলের মোহর তৈয়ার

(১০) (ক) হুকা ও নরিচা তৈয়ার

(খ) হুকার ভলসী

(১১) সুতা কাটাও কাপড় বুনা

(১২) মাটির বাসন তৈয়ার

(১৩) (ক) ভার্ণিশ

(খ) কাঠের কাজ খেলনা, কুরাণী ও গাছা

(১৪) পাটী, চাটী, ধাড়া ও কুশাসন তৈয়ার

(১৫) (ক) পোকার চাষ

(খ) পোকা হইতে সুতা কাটা

(গ) রেশম ও এণ্ডীর কাপড় তৈয়ার

(১৬) শৃঙ্গ দ্বারা নানারকম জিনিষ তৈয়ার

(১৭) কম্বল, সতরঞ্জি, পরি ও বালাপোষ তৈয়ার

(১৮) দর্জ্জির কাজ

(১৯) টিনের জিনিষ পত্রাদি তৈয়ার

(২০) মাছ ধরিবার জাল তৈয়ার

(২১) নানাপ্রকার দেশী রংএর কাজ ও ছাপের কাজ।

(২২) লোহার কাজ (দা, ছুরী, কাঁচি, ক্ষুর, কোদাল ও বঁটি ইত্যাদি তৈয়ার)

(২৩) বাঁশের ও বেতের কাজ

(২৪) তালা চাবি প্রস্তুত

(২৫) গালাদ্বারা খেলনা ও চুড়ী প্রস্তুত

(২৬) কাঁচা শুক্না মৎস্যের ব্যবসা, মাছের তৈল, মাছের সার

(২৭) মোজা, গেঞ্জী ও কম্ফোর্টার তৈয়ার সুতা ও উল দ্বারা)

(২৮) পাখা প্রস্তুত

(২৯) পশু, পক্ষী ও মৌমাছি পালন

(৩০) দুগ্ধ দ্বারা নানাবিধ জিনিষ তৈয়ার আচার চাটনী ইত্যাদি তৈয়ার

(৩১) শ্লেট ও শ্লেট পেন্সিল, শিল পাটা ইত্যাদি তৈয়ার

(৩২) কলমের হেণ্ডেল ও নিব তৈয়ার।

(৩৩) হাতীর দাঁতের কাজ

(৩৪) দেশলাই তৈয়ার

(৩৫) রবার ষ্ট্যাম্প

(৩৬) লাঠি তৈয়ার

(৩৭) সটী, বার্লি ও এরারুট তৈয়ার

(৩৮) পুটি দ্বারা বেগ, পাটী তৈয়ার।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৯ম বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৩৬ { ১১শ সংখ্যা

ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসা

প্রধানতঃ জান্তব, উদ্ভিজ এবং খনিজ পদার্থ হইতেই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রয়োজন অনুসারে এই সমস্ত সামগ্রী বিভিন্ন দেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—ঔষধ প্রস্তুতের উপযোগী বিভিন্ন জন্তু, উদ্ভিদ এবং ধাতু প্রভৃতি ভারতবর্ষে যেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় পৃথিবীর আর কোথাও তেমনটি দেখা যায় না। একটু অনুসন্ধান করিলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

ভারতের বনজ ও খনিজ সম্পদ, বলিতে গেলে, পৃথিবীর সকল জাতিরই ঈর্ষার বস্তু। ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই বিভিন্ন সামগ্রী এদেশে একত্র করিতে পারা যায়। পৃথিবীর আর কোন দেশেই তেমনটি সম্ভবপর হয় না। তথাপি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা শিল্প, বাণিজ্যে, ব্যবসায়ে—সর্ব্বত্র—সর্ব্ব বিষয়ে ভারত-বাসীকে ছাড়াইয়া নিয়াছেন। বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইলে যে পরিমাণ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং দূরদর্শিতার প্রয়োজন তাহা ভারতবাসীর নাই। একমাত্র এই কারণেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচুর্য্যশালী ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা দেশের অধিবাসী হইয়াও ভারতবাসী আজ দুনিয়ার হাটে কাঙাল,—অপরাপর সভ্য জাতির সহিত একসঙ্গে চলিবার শক্তি তাহার নাই, সে আজ বলিতে গেলে অথর্ব্ব, শক্তিহীন এবং সর্ব্ব বিষয়ে পর মুখা-পেক্ষী। তাঁত, কাপড়, ঔষধ পত্র এবং কল কারখানা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই আমরা বিদেশীর

উপর নির্ভর করি—বিদেশ হইতে বিভিন্ন জিনিষ আমদানী না হইলে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয়। এই যে শোচনীয় পর মুখাপেক্ষিতা—ইহার পরিণতি কোথায়, কে বলিতে পারে ?

অধুনা এদেশের সর্ব্বত্র বিদেশী চিকিৎসার বহুল প্রচলন হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসার আশ্রয় না লইলে আমাদের রোগ সারে না—এরূপ একটা ধারণা অনেক লোকের মনে প্রবল হইয়াছে। ইহার ফলে কবিরাজী চিকিৎসার প্রসার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আজকাল সহরে ও পল্লীতে পাঁচ জন ডাক্তার যেখানে পাওয়া যায় সেখানে হয়ত এক জনও কবিরাজ পাওয়া যায় না। মোটের উপর বিদেশী চিকিৎসাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এসময়ে স্বদেশী চিকিৎসা ভাল, কি বিদেশী চিকিৎসা ভাল,- ডাক্তারী ঔষধে শীঘ্র কাজ করে, না কবিরাজী ঔষধে বেশী কাজ করে—সে তর্ক করিতে চাইনা। এক এক যুগের এক একটি নিজস্ব ভাব ও নিজস্ব অনুভূতি আছে। তাহা অস্বীকার করিয়া কেবল স্বদেশী প্রিয়তা জাহির করিতে গেলে তর্কজালই বাড়িয়া চলে, কাজ কিছুই হয় না। অনেক স্বদেশী প্রিয় মনস্বী ব্যক্তির মুখে মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়, "ঐ ডাক্তারীর মোহ কাটাইয়া কবিরাজী চিকিৎসার প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।" কিন্তু কাজের বেলায় দেখি যে medical collоge, campbell, carmichel medical school ইত্যাদি ডাক্তারী কলেজ গুলিতে ছাত্রদিগের স্থান সংকুলান হয় না এবং তজ্জন্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার ছেলে ভর্ত্তি হইতে না পারিয়া Arts college এ নাম লেখা- ইতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক বছরে চিকিৎসাপ্রার্থী বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং ডাক্তারী শিক্ষা এবং পেটেন্ট ঔষধের কাট্‌তি বছর বছর বাড়িয়া চলিয়াছে।

আজকাল আমাদের দেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, যোগ্য, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। তার পর ক্রমেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা খুবই শুভ লক্ষণ। এখনও আমাদের দেশে চিকিৎসকের অভাব দূরীভূত হয় নাই। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, যে পরিমাণ ডাক্তারের প্রয়োজন তাহার এক চতুর্থাংশ ডাক্তারও এদেশে নাই। ইহা সত্ত্বেও আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, গৌহাটী প্রভৃতি সহরে বহুসংখ্যক চিকিৎসক উপার্জ্জনের অভাবে একরূপ বেকার বসিয়া আছেন। অনেক ছাত্র ডাক্তারী পরীক্ষায় সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ কি ? আসল কথা হইল এই যে, ভারতবাসীরা চিকিৎসার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারে না। যদি বা কোন প্রকারে ডাক্তার বাবুর ভিজিটের টাকার সংস্থান হয়, ঔষধের বিলের টাকা সকলে সংগ্রহ করিতে পারে না। এই অবস্থায় অনেক লোক, অচিকিৎসায় এবং কুচিকিৎসায় মারা পড়ে।

দুই একটি বাদে প্রায় সমস্ত ডাক্তারী ঔষধই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। তজ্জন্য প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। অথচ মজার কথা এই যে, বিদেশীরা অধিকাংশ স্থলেই ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন ঔষধের উপাদান সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করেন এবং সেই

সমস্ত ঔষধ পুনরায় এদেশে চালান দিয়া চতুর্গুণ লাভবান হন।

সমস্ত না হইলেও অধিকাংশ ঔষধের উপাদান ভারতবর্ষে অতিশয় সহজলভ্য। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে যদি ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুতের কারবার ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে নানা দিক দিয়াই উপকার হইতে পারে। প্রথমতঃ উপাদান গুলি সহজ লভ্য বলিয়া অতি অল্প ব্যয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ঔষধ এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে— সে গুলি সস্তা দরে বাজারে বিক্রয় করিলেও বেশ দু' পয়সা উপার্জন হইবে, একটা নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে এবং বহু সংখ্যক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের কাজের সংস্থান হইবে।

সুখের বিষয় এই যে, এই ব্যবসায়ের প্রতি কয়েকজন ব্যক্তির দৃষ্টি পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে যেমন ক্যাল্‌কেমিক্যাল্, বটকৃষ্ণ পাল, ডাঃ বসুর লেবরেটরী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের প্রস্তুত বিভিন্ন ডাক্তারী ঔষধ ইতিমধ্যেই বাজারে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া সন্তোষজনক ফল পাইতেছেন। যেমন ক্যালকেমিকেলের জবাকুসুম তৈল, অশ্বান, বাসকের সিরাপ, নিমের নির্যাস, গুলঞ্চের নির্যাস প্রভৃতি অধুনা সর্বজন পরিচিত ঔষধ বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ আরও বহু সংখ্যক ঔষধ যাহা এখন বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া কাজে লাগান হয়—তৎসমস্তই আমাদের এদেশে অতি অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে ঔষধের মূল্য নিশ্চয়ই হ্রাস হইবে এবং গরীব লোকও অনায়াসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ইহার ফলে যে চিকিৎসা ব্যবসার প্রসার বাড়িবে—তাহা বলাই বাহুল্য।

পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া যে সকল ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও ছাত্র প্রভৃতি উপার্জনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না—তাঁহাদের সম্মুখে এই একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এদেশে এখনও ব্যাপকভাবে ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসা গড়িয়া উঠে নাই। এদিকে মনোনিবেশ করিলে তাঁহারা কেবল নিজেদের নয়, দেশেরও উপকার করিতে সমর্থ হইবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুতের উপযোগী খনিজ, বনজ ও জান্তব পদার্থের অভাব এদেশে নাই। এস্থলে কয়েকটি বিদেশী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উপাদানের কথা বিবৃত করিয়া আমাদের উক্তি সমর্থন করিতেছি :—

অষ্টিলেগো :—এইটি একটি বিচূর্ণ (Trituration) জনার বা ভুট্টাজাতীয় শস্য বৃক্ষের গাত্রে যে সাদা খড়ির মত পদার্থ থাকে তাহা হইতে এই বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

আইওডিয়াম :—সাধারণতঃ আমরা ইহাকে আইওডিন বলি। সমুদ্রজাত উদ্ভিদ বিশেষের ভস্মাবশেষ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

আর্সেনিকাম এল্‌বাম :—কেহ কেহ ইহাকে হোয়াইট আর্সেনিক নামে অভিহিত করেন। মোটের উপর ইহা সেঁকোবিষ বা শিমুলক্ষার ছাড়া অপর কিছুই নহে। ইহার গুঁড়া ৯৬ গ্রেণ, ২০ আউন্স পরিস্রুত জলের মধ্যে গুলিয়া কাঁচপাত্রে রাখিয়া মৃদু উত্তাপের মধ্যে জ্বাল দিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর্সেনিক গলিয়া না যায় ততক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দেওয়ার সময় বাষ্পাকারে যে জল উড়িয়া যাইবে সেই পরিমাণ পরিস্রুত জল মিশাইতে হয়। আর্সেনিক গলিয়া গেলে আর জল মিশাইবার প্রয়োজন

থাকে না। তখন কেবল জাল দিলেই চলে। যখন ১৫ আউন্স আন্দাজ থাকিবে তখন নামাইয়া শীতল হইলে রেক্‌টিফাইড্‌ স্পীরিট (Rectified Spirit) মিশাইয়া এক পাইন্ট আন্দাজ করিয়া লইবে। ইহাতেই ২× বা ১ম ক্রমের আর্সেনিকম্‌ এল্‌বাম নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে।

ইউপ্যাটোরিয়ম পারফোলিয়েটম :—ইহার অপর নাম বোনসেট। আমাদের দেশে যে উদ্ভিদ হাড়জোড়া বৃক্ষ নামে পরিচিত তাহা হইতেই এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই গাছের পাতা দ্বারা পটি বাঁধিয়া দিলে ভাঙ্গা হাড় অনায়াসেই জোড়া লাগিয়া যায়। এখনও পল্লীগ্রামের প্রাচীন লোকেরা এই পাতা ব্যবহার করিয়া সময় সময় চমৎকার ফল দেখাইয়া থাকেন। কুসুমিত অবস্থায় টাট্‌কা হাড়জোড়া গাছ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে প্রক স্পীরিটের সাহায্যে যে মাদার টিংচার তৈয়ারী হয়, তাহাই ইউপ্যাটোরিয়ম পারফোলিয়েটম।

ইণ্ডিগো :—নীল গাছ হইতে প্রস্তুত বিচূর্ণ।

ইলাটেরিয়াম :—তিত্‌লাউ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। তিত লাউ পাকিবার পূর্ব্বে ফল হইতে যে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় তাহাই ইলাটেরিয়াম।

ইস্‌কিউলাস হিপোকষ্টিনাম :—উত্তর ভারত ও উত্তর আমেরিকায় উৎপন্ন এক প্রকার ফলের সুপক্ক কাঁচা আঁটির শাঁস হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

একালিফা ইণ্ডিকা :—মুক্তাঝুরী। ভারতবর্ষে জাত লতা বিশেষ। ইহার পাতা হইতে যে টিংচার প্রস্তুত হয় তাহাই একালিফা ইণ্ডিকা।

এগারিকাস মসকেরিয়াস :—ব্যেঙের ছাতা, ইহা প্রায় সকল দেশেই জন্মে। আমাদের দেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অকস্মাৎ এক রাত্রির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সেঁতসেঁতে জায়গায় উহা প্রচুর পরিমাণে গজাইয়া উঠে। মোটের উপর ইহা এক জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই নহে। সরস অবস্থায় ইহা হইতে টিংচার এবং বিশুষ্ক অবস্থায় বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এণ্টিমনিয়াম্‌ ক্রুডম্‌ :—এক প্রকার খনিজ পদার্থ, ইহাকেই সুর্ম্মা বলে। ইহার সহিত তাম্র, সীসা, লোহা, হরিতাল প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। সুতরাং ঔষধ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ইহাকে সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

এপিস মেলিফিকা :—মধু মক্ষিকা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। একটি চওড়া কাচের ছিপি বিশিষ্ট বোতলের ছিপি খুলিয়া তাহার গলায় একখানি কাপড় বাঁধিয়া কাপড়ের অপর অংশ দ্বারা সাবধান পূর্ব্বক সমস্ত মৌচাকখানি আবৃত করিবে। এই অবস্থায় কোনও কিছু দ্বারা মৌচাকে আঘাত করিলে মৌমাছি গুলি বোতলের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অতঃপর সাবধানে বোতলের মধ্যে কয়েক ফোটা ক্লোরোফরম ফেলিয়া দিলে মাছিগুলি অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। তখন স্ত্রী জাতীয় মৌমাছিগুলি বাছিয়া লইতে হইবে। অতঃপর উহার হুলের অংশটি কাটিয়া লইয়া খলে ফেলিয়া অল্প পরিমাণে স্পীরিট দ্বারা মণ্ড প্রস্তুত করিবে এবং ওজন করিয়া উহার ১০ গুণ ডাইলিউট এল-কোহল মিশ্রিত করিয়া বোতলে পুরিয়া দুই দিন পরে উহা বাহির করিয়া ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে তাহারই নাম এপিস্‌ মেলিফিকা।

এপোমর্ফিয়া :—আফিম হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

এপোসাইনম ক্যানেবিনাম্ :-সিদ্ধি বা গাঁজা জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ। কানাডা ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে উৎপন্ন হয়। মূল হইতে যে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম এপোসাইনম ক্যানেবিনাম।

এমোনিয়াম কার্ব্বনিকাম :—ইহার নাম এমন কার্ব্ব। নিশাদল ও খড়ি সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয়।

এরাম ট্রিফাইলাম :—ওল জাতীয় বৃক্ষের টাট্‌কা সরস মূলের রস হইতে এক ভাগের সহিত নয় ভাগ সুগার অব মিল্ক যোগ করিয়া এই বিচুর্ণ জাতীয় ঔষধটি প্রস্তুত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

ভারতের আর্থিক দৈন্য ও তাহার প্রতীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক টাকার মূল্য ১৮ পেনী নির্দ্ধারিত হওয়ায় কেবল যে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কাহিল হইয়াছে তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থাও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে গেলে সরকারপক্ষ এবার "স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতে" উদ্যত হইয়াছেন। কারণ যে পরিমাণ নগদ টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট থাকা উচিত তাহার অর্দ্ধেকও এখন আছে কিনা সন্দেহ। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার বলিয়াছেন—

"with all the emphasis I can command I want to point out to the Government, and the public that the position is one of extreme and emminent danger ; and perhaps no one realises this more clearly than the Finance Member himself to whom my sympathies go out, even though perhaps unsought—অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা যে বিশেষ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে এবিষয়ে আমি জোরের সহিত গবর্ণমেণ্ট তথা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই অবস্থার গুরুত্ব বোধহয় রাজস্ব সচিব মহাশয়ই সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করিতেছেন। গুরুতর সমস্যায় পতিত রাজস্ব সচিব মহাশয়ের প্রতি অযাচিতভাবে আমি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।"

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের অর্থবল যে হ্রাস পাইয়াছে তাহার পরিচয় নানা দিক দিয়াই পাওয়া যাইতেছে। এমন কি সরকারী ঋণের জন্ত পর্য্যাপ্ত যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাইতেছে না। বরাবর যে পরিমাণ সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাহাতে সরকারী প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ সংগ্রহ হয় না দেখিয়া বার বার কর্ত্তৃপক্ষ সুদের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাতে মোটের উপর ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় নাই। সরকার পক্ষের অর্থ সঙ্কট ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সুদের হার না বাড়াইলে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায় না এবং তাহা বাড়াইলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচলিত সিকিউরিটি (securities) গুলির মূল্য হ্রাস পায়। ইহাতে অর্থের বাজারে গোলযোগ উপস্থিত হয়—সরকারী তহবিলে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা আসে না। এই অবস্থায় অর্থাভাব হওয়া অনিবার্য্য। ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব এখন এই সমস্যারই পড়িয়াছেন। অধিকাংশ ভারতীয় ব্যবসায়ীই মনে করেন যে, টাকার মূল্য ১৮ পেনী নির্দ্ধারিত না হইলে, আজ ভারতের এরূপ শোচনীয় আর্থিক অবনতি ঘটিত না। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই ১৬ পেনী বনাম ১৮ পেনীর সমস্যা লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, তখন কেহ কেহ ১৮ পেনীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে অনেকেই তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি কোন কোন ষেতাঙ্গ বণিক-সমিতি, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী এবং বিশিষ্ট কারবারী পর্য্যন্ত বলিতেছেন যে, টাকার মূল্য ১৬ পেনী নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত ছিল।

সরকার পক্ষের আর্থিক অবনতি সম্পর্কে নলিনী বাবু আরও কয়েকটী উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডে এবং ভারতে ঋণ সংগ্রহ করিতে গিয়া ভারতসরকার শতকরা ৬৮ হারে পর্য্যন্ত সুদ দিয়াছেন। এই হার দেশীয় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হার হইতে এক এবং ১৷০ পর্য্যন্ত বেশী। বলা বাহুল্য, উচ্চ হারে সুদ দেওয়ায় এক দিক দিয়া সরকার পক্ষ স্বয়ং যেরূপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন অপর দিক দিয়া দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহেরও সেইরূপ ক্ষতি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প বাণিজ্যের জন্ত যে অর্থাভাব—তাহা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উচ্চহারে সুদ পাইলে সাধারণ লোক, দেশীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিবে কেন? টাকা নিরাপদে রাখার পক্ষে দেশের গবর্ণমেণ্ট যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থল, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা সত্বেও কিন্তু সরকারী প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। হইবে কোথা হইতে? দেশে টাকা থাকিলে তো লোক টাকা দিবে!

এ দেশের নৃপতিগণ আজকাল বিদেশ ভ্রমণে উন্মত্ত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর বিদেশে গিয়া ইঁহারা কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিতেছেন। যে সমস্ত বিদেশী বণিক এদেশে ব্যবসা করেন, তাঁহারা আর লভ্যাংশের টাকা এদেশে খাটাইতে ইচ্ছা করেন না—অনেকেই তাহা স্বদেশে প্রেরণ করিতেছেন। যে সমস্ত বিদেশী বণিক ভারতীয় securities কিনিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাঁহারা এখন সেগুলি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাগরপারে চালান দিতেছেন। এই অবস্থায় ভারতের অর্থবল হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য। দেশের অর্থবল হ্রাস পাইলে সরকারী ধনভাণ্ডারও রিক্ত হয়—ইহা তো ধনবিজ্ঞানের অতি সহজ কথা।

তাই ভারত সরকারের অর্থাভাব আর কিছুতেই ঘুচিতেছে না। শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়াছেন—অল্প সময়ের কড়ারে গৃহীত (short term debt) সরকারী ঋণের পরিমাণ ৩৭ কোটী টাকার কম হইবে না। এই টাকা পরিশোধের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হিসাবে সরকার পক্ষের জমার পরিমাণ বোধহয় ৮॥০ কোটী টাকা হইবে। কিন্তু ঋণ পরিশোধের সময় আসিলে এই ৩৭ কোটী টাকা যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতেই হইবে। তখন হয়তঃ সরকার পক্ষ আবার ঋণ করিতে উদ্যত হইবেন। এইরূপে ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে; অথচ সরকারের আর্থিক অবস্থা কখনও উন্নত হইবে না। এই অবস্থায় যাহাতে স্থায়ীভাবে একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় তাহা করা সকলেরই উচিত।

সরকার পক্ষ অবশ্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমতঃ ব্যয় সংকোচের কথা উঠিয়াছে এবং নানা দিক দিয়া এক আধটু চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে যাহার ক্ষত তাহার পক্ষে ব্যাপক চিকিৎসারই প্রয়োজন—এখানে একটু, সেখানে একটু করিয়া বসিয়া থাকিলে এরূপ ক্ষেত্রে ফল লাভের কোনই আশা নাই। তারপর কমিটি ও কমিশনের বাতিক ভারত সরকারের এখনও হ্রাস পায় নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করা হয়; ইহাদের মন্তব্য বড় বড় পুস্তকে ছাপা হয় এবং অতঃপর সেগুলি সরকারী গুদামে পড়িয়া থাকিয়া পোকার খাদ্য ও বাসস্থলে পরিণত হয়। এর বেশী আর কিছু হইয়াছে বলিয়া এপর্য্যন্ত বিশেষ কোন নজির পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের সময়ে সরকার পক্ষ আবার যাহাতে সেই ভুল না করেন তজ্জন্য নলিনী বাবু সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রতিকারের একটি সুচিন্তিত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন "রোগ নির্ণয় হইয়াছে; এখন উপযুক্ত ব্যবস্থারই একমাত্র প্রয়োজন। তাড়া তাড়া নোট চালাইয়া currencyর পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিলে কোনই ফল হইবে না, ইহাতে বরং সরকারের অতি আদরের বস্তু মুদ্রা বিনিময়ের হার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অকালে মারা পড়িবে। যে সমস্ত বিষয়ে সরকারের স্বার্থ রহিয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য করভার বৃদ্ধি করা একমাত্র মহম্মদ তোগলকের ন্যায় শাসন কর্ত্তার পক্ষেই সম্ভবপর।

"এবিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখার পরে আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে এবং দীর্ঘ সময়ের কড়ারে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিলে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে। লণ্ডন হইতে অল্প সুদে এত বেশী অর্থ সংগৃহীত হইবে না। আমেরিকার নিকট হইতে এইরূপ দীর্ঘ সময়ের কড়ারে (long term debt) অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। এই অর্থ দ্বারা ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব আপাততঃ তাঁহার আর্থিক অনটনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে সংগঠন মূলক অথচ শিল্প বাণিজ্যের স্থায়ী উন্নতি মূলক পন্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। ইহার ফলে ভবিষ্যতে আবার অর্থাভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। দূরীভূত হইবে, আপাততঃ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ক্রয় করিবার ক্ষমতা (purchasing power)

বৃদ্ধি পাইবে। বলা বাহুল্য, ইহাতে ইংলণ্ড এবং ভারত—এই উভয় দেশই লাভবান্ হইবে।

"শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তি দ্বারাই এ কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে। চারি দিক দিয়া যাহাতে নূতন শিল্প বাণিজ্য, কল কারখানা এবং কলা শিল্প গড়িয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান যে সকল শিল্প বাণিজ্য প্রচলিত আছে সেগুলিকে পুনর্গঠন দ্বারা শক্তিশালী করিতে হইবে এবং নিত্য নূতন শিল্প বাণিজ্যের পন্থা সুগম করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশের অভাব অভিযোগ এবং রুচির দিকে লক্ষ্য না রাখিলে চলিবে না—এই সমস্তের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতে হইবে।

"Land mortgage bank, Agricultural bank or Rafeissen bank প্রভৃতি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশে এই কৃষির উন্নতির উপর দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। যাহাতে উৎপন্ন শস্যের মূল্য এবং পরিমাণ উভয়ই বর্দ্ধিত হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। অধুনা এদেশের প্রচুর মাল বিদেশে রপ্তানী হয় বটে; কিন্তু অন্যান্য দেশের মালের তুলনায় ভারতের মাল অত্যল্প দরে বিক্রয় হয়। ইহাতে কৃষক তাহার ন্যায্য প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাহাতে ভারতের মাল সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতের বাণিজ্য দূত (Trade Agents) নিয়োগ করা আবশ্যক। এই বাণিজ্য দূত বিদেশে থাকিয়া ভারতীয় পণ্য জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিবেন এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাজের সুবিধা করিয়া দিবেন।

এই প্রসঙ্গে নলিনী বাবু আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে দিল্লীর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অন্তর্গত স্থায়ী আয় ব্যয় বিষয়ক কমিটি (standing Finance committee) এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বিদেশের বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্রে থাকিয়া কাজ করিবার জন্য ভারতের পক্ষ হইতে ছয়জন ট্রেড্ কমিশনার নিযুক্ত করা হইবে। অধিকন্তু এবিষয়ে উৎসাহী ভারতবাসীকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে—যাহাতে অতঃপর ভারতবাসীর দ্বারাই উপরোক্ত ট্রেড কমিশনারের পদগুলি পূর্ণ হইতে পারে। এরূপ প্রস্তাব খুবই সমীচীন সন্দেহ নাই। তবে কথা এই যে, কাহাকে এই ট্রেড্ কমিশনারের পদে নিয়োগ করিলে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের যথার্থ হিতসাধন হইতে পারে? সরকার পক্ষ তাহাদের নির্ব্বাচিত বড় বড় আই, সি, এস কর্ম্মচারীদিগকে এই সমস্ত পদ প্রদান করিবার পক্ষপাতী। এখানেই যত গলদ! তাঁহারা যতই অভিজ্ঞ হউন না কেন, ভারতীয় ব্যবসায়ীর আশা আকাঙ্ক্ষা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। কেননা তাঁহারা যে আসলে অভারতীয়! এই অবস্থায় যদি শ্বেতাঙ্গ ট্রেড কমিশনার ভারতের পক্ষ হইতে নানা দেশে প্রেরণ করা হয় তাহা হইলে কেবল লোক দেখানো প্রচেষ্টাই হইবে—ভারতীয় বাণিজ্যের প্রকৃত উপকার সাধন হইবে না। ভারতীয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন কাজ করিয়া এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যাঁহারা প্রকৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতে যদি কেহ কেহ এই ট্রেড্ কমিশনারের পদ গ্রহণ করেন তাহা হইলেই কাজের মত কাজ হইতে পারে। দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তারপর রাজকীয় কৃষি কমিশনের (Royal commission or Agriculture) মন্তব্য অনুসারে একটি Imperial council of Agricultural Research প্রতিষ্ঠা করার কথাও নলিনী বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের মত এরূপ বৈচিত্র্যময় একটা মহাদেশ সদৃশ বিরাট দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য কেবল কৃষি, কিম্বা কেবল শিল্প, কিম্বা কেবল বাণিজ্যই যথেষ্ট নয়—এই তিনটীর সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্ট এবং যথোচিত প্রসার প্রতিপত্তি দ্বারা ভারতীয় আর্থিক উন্নতির সূত্রপাত হইতে পারে। এ বিষয়ে অবহিত হওয়া সরকার পক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাটের ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানের জন্যও যত্নবান্ হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে নলিনী বাবু central cotton committeeর অনুকরণে একটি central jute committee গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বাস্তবিক আরও বহুদিন পূর্ব্বেই এরূপ একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কারণ এই পাটের ব্যবসায় সম্পর্কে গলদ নিতান্ত অল্প নহে। বলিতে গেলে পাট বাঙ্গলার একচেটিয়া সম্পত্তি। পৃথিবীর আর কোন দেশে তো পাট হয়ই না—এমন কি আসাম ও বিহারের সামান্য কিছু স্থল বাদ দিলে ভারতের আর কোথাও পাটের চাষ হয় না। এবিষয়ে চেষ্টা যে হয় নাই—তাহা নহে; কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশেও পাট উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই। আজকাল অবশ্য পাটের অনুকল্পরূপে চালাইবার জন্য Brotex (ব্রোটেক্স) নামক আর এক প্রকার গুল্মের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা যে পাটের সমকক্ষ হইবে এরূপ মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। মোটের উপর এখনও পাট বাঙ্গলার একচেটিয়া সম্পত্তি রহিয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশে নানা কাজে এই পাটের প্রয়োজন হয়—বলিতে গেলে পাট আজকাল একটি অপরিহার্য্য সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। এই অবস্থায় পৃথিবীর বাজারে একমাত্র পাট বিক্রয় করিয়াই বাঙ্গলা দেশ অপর্য্যাপ্ত সম্পদশালী হইবার কথা ছিল—অন্ততঃ অনেক বিদেশী বণিকের মনে এখনও এরূপ ধারণা আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখিতে পাই? বাঙ্গলার পাট চাষীর দুর্গতির সীমা নাই। সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অকাতরে রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া সারাদিন পাটক্ষেতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু যখন পাট বিক্রয়ের সময় আসে তখন তাহার উৎপাদনের ব্যয়ই যে মূল্যরূপে আদায় করিতে পারে না—কড়ি দিয়া কিন খাওয়াই তাহার পক্ষে সার হয়। বাঙ্গলার কৃষক তাই আজ দারুণ অভাবগ্রস্ত। তাহার উদরে অন্ন নাই—পরিধানে বস্ত্র নাই—রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা হয় না—ছেলে পিলের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না—বৎসরের পর বৎসর তাহার ঋণভার বাড়িয়াই চলে। এই যে শোচনীয় অবস্থা—ইহার প্রতিকারে মনোযোগী হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

স্বদেশে শিল্পের উন্নতির জন্য আর একটি কার্য্য অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক সুসভ্য দেশই এই প্রণালী অবলম্বনে তাহার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছে। বিশেষ করিয়া যে সকল দেশের

আর্থিক অবস্থা কাহিল তাহাদের পক্ষে—এই প্রণালী অবলম্বন করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। আমরা সংরক্ষণ নীতির কথাই বলিতে ছিলাম। বাঙ্গলার জাতীয় বণিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ও এবিষয়ে জোর দিয়াছেন। উচ্চহারে বাণিজ্য শুল্ক বসাইয়া বিদেশী পণ্যের আমদানী বন্ধ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে স্বদেশী মালের কাটতি হইবে। অধিকন্তু এমন কতিপয় প্রয়োজনীয় শিল্প আছে—যেগুলিতে সরকারী সাহায্য (Subsiely) দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা অত্যাবশ্যক।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত উন্নতি বিধায়ক কার্য্যের জন্য পদে পদে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকার পক্ষের মুখস্থ করা উত্তর—"কি করিব ?—অর্থাভাব"—এই কথা শুনিতে শুনিতে আমরা হয়রান হইয়াছি। অর্থাভাব তো লাগিয়াই আছে। কোন্ কালে ইহা দূর হইবে এবং সরকার পক্ষ দেশের উন্নতি মূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন—তাহা কেবল সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জানেন। মোটের উপর, এরূপ সময় কাটাইবার ফন্দী পরিত্যাগ করিয়া এখন আসল কাজে হস্তক্ষেপ করিবার সময় আসিয়াছে। অর্থাভাবের দোহাই পাড়িয়া পৃথিবীর কোন দেশই আজ বাঁচিয়া নাই—সকলেই যেমন করিয়া হউক অর্থের সংস্থান করিয়াছে এবং করিতেছে। ভারতবর্ষকেও তাহাই করিতে হইবে। নলিনী বাবু আমেরিকার নিকট হইতে অল্প সুদে এবং দীর্ঘ দিনের কড়ারে প্রচুর অর্থ ধার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র হইতে ১৯২৭-২৮ সালে কানাডা ২২৫০০০০০০০ ডলার ধার করিয়াছে, ১৯২৫-২৬ সালে অষ্ট্রেলিয়া ১৫০০০০০০০ ডলার ধার করিয়াছে এবং অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশ ও ইহাতে দ্বিধা বোধ করে নাই। যদি তাহাই হয় তবে ভারতের বেলায় আপত্তি কি ? বর্ত্তমান ভারত সচিব মিঃ উয়েজউড বেন বলিয়াছেন যে কার্য্যতঃ ভারতবাসীকে উপনিবেশিক অধিকার (Dominion status) দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বৃটিশের অধীন অন্যান্য উপনিবেশ যাহা করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহা করিবে না কেন ? উচ্চহারে সুদ দিয়া লণ্ডন হইতে অর্থ সংগ্রহ না করিয়া নিউইয়র্ক হইতে যদি লাভজনক হারে অর্থের সংস্থান হয় তবে সর্ব্বতোভাবে তাহাই করা কর্ত্তব্য।

রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পিগমেণ্টস্

Pigments প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সূক্ষ্ম গুড়া ছাড়া আর কিছুই নহে। রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের উপাদান রূপে অনেক প্রকার পিগমেণ্টস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি খনিজ পদার্থ, যে গুলি স্বাভাবিক অবস্থায়ই সংগৃহীত হয়। কিন্তু অপর কতক গুলি আবার কৃত্রিম—সেগুলিকে বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই শ্রেণীর বিভিন্ন পিগমেণ্টের গুণাবলীর মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। কাজেই রং প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে সকল পিগ্‌মেণ্টের মূল্য সমান হইতে পারে না।

এমন এক প্রকার পিগ্‌মেণ্টস্ আছে যে গুলির নিজস্ব কোন রং নাই—এগুলিকে অপর পদার্থের সহিত ইচ্ছামত মিশ্রিত করা চলে। তাহাতে সেই পদার্থের গুণাবলীর কোনই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। ঔজ্জ্বল্য (opacity) বলিয়া কোন গুণ এই শ্রেণীর পিগ্‌মেণ্টের নাই। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Inert পিগ্‌মেণ্ট —অর্থাৎ নিজস্ব শক্তিবিহীন সূক্ষ্ম গুড়া বলিয়া অভিহিত করা হয়। Barytes (বেরিটস্) নামক অতীব গুরুভার মৃত্তিকাকে এই পর্য্যায় ভুক্ত করা যাইতে পারে।

Barytes :—নিজস্ব রং বিহীন পিগ্‌মেণ্ট সমূহের মধ্যে Barytes (বরিটস্) ই সর্ব্ব প্রধান। রং প্রস্তুতের উপাদানরূপে এই পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোটের উপর উহা একটি খনিজ দ্রব্য। প্রায়ই অপরিষ্কৃত সীসায় এই Barytes মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। ভারতের নানা স্থানে পাহাড়ের মধ্যে এই Barytes এর স্তর পড়ে। তন্মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশের কোডাপ্পা ও কার্ণুল এবং রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যে এই সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া রাঁচিতে অল্প বিস্তর এই খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হইতেছে। বাঙ্গালার অতি নিকটে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পাহাড়ে সম্প্রতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে Barytes (বেরিটস্) আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথায় শ্রমিকের মজুরীও খুব সস্তা; তাই অনেক ব্যবসায়ী আজকাল বেশী লাভের আশায় ময়ূরভঞ্জ হইতে Barytes সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রং প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণে এই Barytes এর প্রয়োজন হয়। ভারতের নানা স্থানে যে পরিমাণ Barytes উৎপাদিত হয় তাহা দ্বারা এদেশের কাজ তো চলেই অধিকন্তু প্রচুর Barytes আবার বিদেশে ও রপ্তানী হয়। আমাদের দেশ হইতে Barytes

সংগ্রহ করিয়া তাহারই সাহায্যে রং তৈয়ার করিয়া বিদেশীরা সেই রং উচ্চ দরে ভারতের বাজারে বিক্রয় করেন। ভারতবাসী আজও এমন পশ্চাৎপদ রহিয়াছে যে, নিজের ঘরে সকল সামগ্রী বিদ্যমান থাকিতেও সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিষ, এই রং ও বার্ণিশের বেলায়ও নিজের চাহিদা নিজে মিটাইতে পারে না—ইহার জন্য তাহাকে বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইতে হয়—এতদপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের উপযোগী কাঁচা মাল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ এদেশে পাওয়া যায় এবং এদেশে মজুরীর হার যেরূপ আশাতীত সস্তা তাহাতে একটু চেষ্টা করিলেই লক্ষ লক্ষ টাকার রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। কিন্তু তাহা হইতেছে কৈ? তাহার পরিবর্ত্তে বরং দেখিতেছি ক্রমেই বিদেশী রং আমদানীর পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছে।

বলিতে গেলে এই Barytes হইতেছে রং প্রস্তুতের প্রধান উপাদান। অবশ্য তিষির তেলও কম প্রয়োজনের নহে—তাহার কথা বিস্তৃত ভাবে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। Barytes এর প্রধান গুণ এই যে, ইহা অতি সহজে গুড়া করিতে পারা যায়। সেগুলিকে ইচ্ছানুরূপ সূক্ষ্ম গুড়াতে পরিণত করিতে হইলে যথেষ্ট শ্রমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু Barytes এর বেলায় ততটা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। মূল্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে, এই সামগ্রীটি অপেক্ষাকৃত সস্তা। তারপর অপরাপর রং বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত ইহাকে যেমন ইচ্ছা মিশ্রিত করা যায়। তাহাতে সেই জিনিষের রং মোটেই মলিন হয় না। অপরাপর পিগ্‌মেন্টস্ তেলের সহিত মিটাইতে গেলে যে পরিমাণ তেল তাহারা শুষিয়া লয়, Barytes তদপেক্ষা খুব কম তেলই শোষণ করে—মোটের উপর শতকরা ৮ ভাগ তেল হইলেই এই Barytes অনায়াসে গুলিয়া লওয়া চলে। তবে White lead ও red lead এর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কেননা এই দুইটি পিগ্‌-মেন্টের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা নাম মাত্র তেল শোষন করে। এই দুইটি বাদে অপরাপর সকল পিগমেন্টই Barytes অপেক্ষা বেশী তেল শোষণ করিয়া থাকে। Barytes এর গুণ সম্পর্কে সর্ব্বশেষ কথা এই যে, এই জিনিষটি ওজনে অত্যন্ত ভারী। রং আবার সাধারণতঃ বাজারে ওজন দরেই বিক্রয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় Barytes মিশ্রিত রং সস্তা দরে বিক্রয় করিলেও ওজনের দিকে বেশী হয় বলিয়া বেশ দু'পয়সা লাভ হইতে পারে। অল্প মূল্যের রং প্রস্তুতকারীদের পক্ষে এই Barytes একরূপ অপরিহার্য্য। এমন কি রং প্রস্তুতের প্রধান উপাদান বলিয়া ইহাকে অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দৃষ্টান্তস্থলে অল্প মূল্যের লাল রং এর কথা বলা যাইতে পারে। শতকরা পাঁচ ভাগ red Oxide এবং ৯৫ ভাগ Barytes দ্বারা এই রং প্রস্তুত হয়। ইচ্ছা করিলে red oxide এর মাত্রা আরও কম দেওয়া চলে। সস্তা দরের কাল রং প্রস্তুতের বেলায় শতকরা একভাগ মাত্র কাল রং দিয়া বাকী ৯৯ ভাগ Barytes দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সাদা রং প্রস্তুতের কাজেও প্রচুর পরিমাণে Barytes ব্যবহৃত হয় বটে; তবে এত অধিক মাত্রায় তাহা প্রয়োগ করা চলেনা। কারণ Baytes খুব বেশী হইলে সাদা রং এর যে ঔজ্জ্বল্য তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এস্থলে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে গুলিকে আমরা সস্তা দরের রং বলি সেগুলি প্রকৃত পক্ষে খুব বেশী কাজ দেয়

না। কারণ বেশী দামের উৎকৃষ্ট রং যতটা spreads হইয়া অনেক যায়গা জুড়িয়া বসে অল্প দরের Barytes মিশ্রিত রং ততটা জায়গা জুড়িতে পারে না—ফলে সস্তা রং পরিমাণে বেশী খরচ হয়।

ইহা সত্বেও Barytes যে সস্তা রং প্রস্তুতের পক্ষে অপরিহার্য্য একথা অস্বীকার করা যায় না। মোটের উপর বিচক্ষণতার সহিত এই পদার্থ অন্যান্য মূল্যবান পিগমেণ্টের সহিত মিশ্রিত করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। এমন কতকগুলি মূল্যবান পিগমেণ্টস্ আছে—যেগুলির দর অত্যন্ত বেশী। সেই পিগমেণ্টস্ গুলির সহিত Barytes মিশ্রিত না করিলে সাধারণের পক্ষে সেই সমস্ত রং ব্যবহার করা একরূপ অসম্ভব হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরিমাণ মত অন্যান্য পিগমেণ্টের সহিত Barytes মিশ্রিত করিলে সেই পিগমেণ্টের নিজস্ব গুণের কোনই তারতম্য হয় না—প্রকৃত পক্ষে এইটিই হইল Barytes এর সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিশেষত্ব। অনেকে আবার অধিক লাভের আশায় এই সুযোগের অপব্যয় করে। তাহারা প্রায়ই মূল্যবান পিগ্‌মেণ্টের সহিত Barytes ভেজাল দিয়া থাকে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাদা সীসার পিগ্‌মেণ্টের (white lead) সহিত প্রচুর পরিমাণে Barytes মিশ্রিত রহিয়াছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে অবশ্য তাহা ধরা পড়ে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের বিশ্লেষণের ফলে এইসমস্ত ভেজাল প্রায়ই ধরা পড়িয়া থাকে। ইহাতে কেহ কেহ Barytes কে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, এই অদ্ভুত পদার্থটি বাজারে প্রচলিত হওয়ায় মূল্যবান রং এ ভেজালের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সে যাহাই হউক,রংপ্রস্তুতের উপাদান স্বরূপ Barytes এর মূল্য যে কিছুতেই কম নহে—একথা সমস্ত রং প্রস্তুতকারীই স্বীকার করেন।

পরীক্ষার ফলে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অল্পমাত্রায় Barytes মিশ্রিত করিলে কোন কোন পিগমেণ্টের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পায়। আসল কথা হইল যে, বিচক্ষণতার সহিত এই পদার্থটিকে ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই সস্তা দরের রং প্রস্তুতের কাজে ইহা পরম সহায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথম যখন Barytes এর ব্যবহার আরম্ভ হইল তখন সমস্ত Barytes ই বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী করা হইত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, ভারতবর্ষের পাহাড়ে ও খনিতে এজিনিষের অভাব নাই। এদেশের সস্তা মজুরের দ্বারা যদি Barytes সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রী হইতে স্বদেশী সামগ্রী ঢের সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে। তাই ধীরে ধীরে ভারতের নানা স্থান হইতে Barytes সংগ্রহ করা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাতে ও এদেশের চাহিদা মিটিল না। আজও প্রচুর পরিমাণে বিদেশী Barytes ভারতের বাজারে আমদানী হইতেছে। ১৯১৩-১৪ সাল হইতে ১৯২৬-২৭ সাল পর্য্যন্ত কোন্ বৎসরে কি পরিমাণ Barytes ভারতে আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

বৎসর	কত হন্দর	কত টাকা
১৯১৩-১৪	৪৯৮৬	১৭৮৮০৲
১৯১৪-১৫	৮৯৬	৩০৭৫৲
১৯১৫-১৬	১০০৮	৫৪৭৫৲
১৯১৬-১৭	২১৮	২২৫০৲
১৯১৭-১৮	৮৯২	১১৭৬০৲

১৯১৮-১৯	......	....
১৯১৯ ২০	......	....
১৯২০-২১	৪৭২২	৬৪০৯০৲
১৯২১-২২	৯১৭	৭৬১০৲
১৯২২-২৩	২০৭৭	১০৬২৪৲
১৯২৩ ২৪	৮৭৮০	৩৯৬৮২৲
১৯২৪-২৫	৭০৭৮	২৮৬৯২৲
১৯২৫-২৬	২১৮২৮	৯১২৫৫৲
১৯২৬-২৭	৩২৩২৮	১১৭৮০৭৲

ইহাতে দেখা যায় যে, মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতে Barytes আমদানীর পরিমাণ একটু কমিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৬ সাল হইতে তাহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২৩ সালে ভারতের নানা স্থান হইতে ৩২০৬০ হন্দর পরিমিত Barytes উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বৎসর বিদেশ হইতেও প্রায় তত হন্দর Barytes আসিয়াছিল। ১৯২৬-২৭ সালের হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায়—১১৭৮০৭৲ টাকা মূল্যে প্রায় ৩২৩২৮ হন্দর বিলাতী Barytes ভারতবাসী ক্রয় করিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, বর্ত্তমানে যে পরিমাণ Barytes এদেশে সংগৃহীত হইতেছে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ মাল উৎপন্ন করিতে পারিলে এদেশের চাহিদা নিবৃত্তি হইতে পারে। এ বিষয়ে আত্মনির্ভর শীল হওয়া ভারতের পক্ষে যে মোটেই অসম্ভব নহে একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বরং ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণ Barytes বিদেশে প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু তাহা করে কে?

ভারতের খনিজ সম্পদ

অপরাপর সম্পদের ন্যায় ভারতের খনিজ সম্পদ ও নিতান্ত সামান্য নহে! কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের তো তুলনাই নাই—এই দুই শ্রেণীর সম্পদ লইয়া ভারতের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে এমন শক্তি বোধ হয় কোন দেশেরই নাই। তবে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে কি না—তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

এদেশের ভূগর্ভে আরও কত কি বস্তু নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? এ পর্য্যন্ত যত সব প্রয়োজনীয় ধাতু ও তৈলাদি ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কিন্তু উপযুক্ত ভাবে খনির গর্ভ হইতে সে গুলি উত্তোলন করিয়া পৃথিবীর নানা দেশে বিক্রয় করিবার সুচারু ব্যবস্থা হয় নাই। তাই প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে খনিজ সামগ্রী উৎ-

পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই দিক দিয়া ভারতবাসীর আর্থিক লাভ খুব বেশী হইতেছে না।

পৃথিবীর নানা দেশে এখন বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে এবার তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। তথাকার বেকার লোকদিগের কাজের সংস্থান করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট গলদ্ ঘর্ম্ম হইতেছেন এবং লণ্ডনের বড় বড় ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত এবিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় নূতন করিয়া শিল্প বাণিজ্যের প্রসার, রেলপথ বিস্তার, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, বিশেষ ভাবে খনিজ সম্পদ সংগ্রহের বন্দোবস্ত হইতেছে। যত দিকে ও যত প্রকারে সম্ভব বৃটেনের শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া এই দারুণ বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। আর আমাদের এদেশে হইতেছে কি? দেশের যাঁরা বড়লোক, বিত্তশালী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি তাঁহারা একান্ত নির্ব্বিকার। খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে মোটরে চড়িয়া বিদেশী সিগারেট ফুঁকিয়াই তাঁহারা দিন কাটাইতেছেন। আর গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন,—Back to village—গ্রামে ফিরিয়া যাও; চাষ বাস কর; ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ; কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেই ভারতের সকল দুঃখের অবসান হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে; গোটা জাতির পেট কেবল কৃষি কার্য্য দ্বারা ভরিতে পারে না; অন্ততঃ অর্থনীতির দিক হইতে একথা কিছুতেই বলা চলে না। এদেশের বর্ত্তমান অভিযোগ, অশান্তি এবং সমস্ত সমস্যা দূর করিতে হইলে চাই—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সুব্যবস্থা ও প্রসার প্রতিপত্তি। তাহা না করিয়া কেবল পূর্ব্ব পুরুষের ভিটেমাটি কামড়াইয়া মান্ধাতার আমলের লাঙ্গলের খুঁটি ধরিয়া বসিয়া থাকিলে ভারতবাসীর অনাহার এবং অর্দ্ধাহার কখনও ঘুচিবে না,—ঘুচিতে পারে না।

খনিজ সম্পদের কথা বলিতে ছিলাম। ভারতে ভূগর্ভে—কত কি সম্পদ আছে তাহা খুঁজিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি এখনও ভারতবাসীর হয় নাই। বিদেশীরা আসিয়াই যাহা কিছু হউক আবিষ্কার করিতেছেন এবং বিদেশীর মূল ধনে চালিত কারবারের মারফতেই ভারতের প্রায় সমস্ত খনি সম্পদ সংগৃহীত হইতেছে। ইহাতে ভারতবাসীর পক্ষে লাভ না হইয়া বরং ক্ষতি হইতেছে। আজ কাল অনেক ভারতবাসী দেশ বিদেশের বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়িয়া ভূতত্ত্ব ও খানিতত্ত্ব সম্পর্কে বড় বড় উপাধি লইয়া বাহির হইতেছেন। ধনী ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করিলে ইহাদের দ্বারা নূতন নূতন খনি এবং নূতন নূতন ধাতব পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে পারেন। ইহাতে একদিকে যেমন বহু সংখ্যক বেকারের কাজের সংস্থান হইতে পারে অপর দিকে তেমনি দেশের সম্পদ বৃদ্ধিও হইতে পারে।

ভারত সরকারের অধীনে অবশ্য একটি ভূতত্ত্ব বিষয়ক বিভাগ আছে। সেই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ১৯২৮ সালের জন্য যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে অনেক উল্লেখ যোগ্য তথ্য রহিয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, উপযুক্ত আয়োজনের অভাবে ভারতের বিভিন্ন খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসী তদ্দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হইতেছে না।

Geological Survey of India বিভাগের ডাইরেক্টরের রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত যে পাঁচ বৎসর গিয়াছে—গড়ে সেই পাঁচ বৎসরের প্রতি বৎসরে ভারত

বর্ষ হইতে ২৪৬১৫৭২৭ পাউণ্ড মূল্যের খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ৩৬০০০০০ পাউণ্ড অধিক মূল্যের খনিজ দ্রব্য সেবারে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে উৎপাদিত হয়। বিশেষজ্ঞ সরকারী কর্ম্মচারীরা বলেন যে, ১৯২৪ সালে পরিমাণের দিক দিয়া খুব বেশী খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় নাই; তবে বিদেশীর নিকট একটু উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল এবং মুদ্রা বিনিময়ের হার সেবারে ভারতের অনুকূল ছিল বলিয়াই আয়ের পরিমাণও বাড়িয়াছিল। ইহার পর হইতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের আয় ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। উৎপন্ন মালের পরিমাণ কম হইতেছে—একথা অবশ্য বলা যায় না। কেন না, কোন কোন খনিজ দ্রব্য পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হইতেছে; কিন্তু সেগুলি উপযুক্ত মূল্যে বিভিন্ন দেশে বিক্রয় হইতেছে না; কিম্বা হইলেও মুদ্রা বিনিময়ের হার প্রতিকূল রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে আশানুরূপ আয় হইতেছে না। ১৯২৮ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯২৭ সালের সহিত তুলনায় আয়ের পরিমাণ ৯০০০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে পেট্রোলের কথা বলা যাইতে পারে। পেট্রোল যে পরিমাণের দিক দিয়া কম উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে—কিন্তু বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হওয়ায় ইহার দর খুব নামিয়া গিয়াছিল। এই জন্যই ১৯২৮ সালে ভারতের খনিজ দ্রব্যের আয় এত কম হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে ১৯২৭ সালে এবং ১৯২৮ সালে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ মূল্যের উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

খনিজ দ্রব্যের নাম	১৯২৭ সালের মূল্য কত পাউণ্ড	১৯২৮ সালের মূল্য কত পাউণ্ড
কয়লা	৭০৭৯৮৫২	৬৬০৪১০৬
পেট্রোল	৪৪২১৪৬৮	৪০১৪২০৭
ম্যাঙ্গনিস—(manganese)	২৮৪৪২৩৭	২৩২১২০১
সীসা (পরিষ্কৃত এবং অপরিষ্কৃত)	১৬৪১৩৯৫	১৬৪২০৩৬
স্বর্ণ	১৬২৬৯১৩	১৫৮৮২৫২
রৌপ্য	৭০৮৮৪৬	৮৯২৪৬০
লবণ	৮৪৯২৬৫	৭৪৫৮৯৯
অভ্র	৬৯১৩৪১	৬৯৮১৬০
দস্তা (অপরিষ্কৃত)	৫২২৭৩৭	৫৫৩০৫১
লোহা (অপরিষ্কৃত)	৩৮০৭০৫	৪১৩০৫৮
তামা (অপরিষ্কৃত)	৩৪৪২৯৯	৩৯৯১৫০
টিন (অপরিষ্কৃত)	৪৯৩৮৬৪	৩৩৮৮৯৫
সোরা	১১৩৬৩২	৭৪৬২৯
ক্রোমাইট্ (Chromite)	৬৫৭৪৩	৫৭১৩৯
জেডাইট্ (jadite)	২২৫৭০	৪৪৪৬৮
ইলমেনাইট (Illmanite)	৩৩৪৪৬	৪১৫৫৭
নিকেল	১৩১৭৬	৩৯৯২২
Clays	১৯৮১৯	৩১৬২৫
Atimoniai Lead	৯৯৩০	২৩৬৫৮
Tungsten ore	৪২৫৩৭	২২৫৫৪
পদ্মরাগমণি ও নীলোৎপল মণি প্রভৃতি	২০৮৮৩	১৩২৪৭

Magnisite	১৭১১৫	১১৯৬৯
Gypsum	৬৭০২	১০৯১৯
Steatite	৭৮১৬	৯৭০৬
Buxite	২১০০	৭০৩৪
Zircon	৮১২৯	৪২৬৭
(Ochre) গিরিমাটি	২০৫১	৩৯৫৩
হীরা	৩৬৫৪	৩৮৭৫
Fuller's earth সাজী মাটী	১৬৮৭	১৮৫২
Asbestos	১০১১	১৬২২
Barytes	৭৫৮	১৪৬৩
Monazite	৩৮১০	১২৪২
Apatite	৭৫০	১০৮১
Amber	২০২৮	৮৯৭
Antimony ore	৭৮৪	৭৬৯
ফটকিরি	১৭২৮	৪১২
Corundum	৫৯৮	২০৭
Garnet	৩৩	৯৯
সোডা	৩৪	৪৪
সোহাগা	১	২

উপরোক্ত তালিকায় কয়েকটি প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্যের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও নানাপ্রকার খনিজ দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে। তবে সেগুলি দ্বারা এখনও ভারতবাসীর আয়ের পথ হয় নাই। অধুনা আবিষ্কৃত কয়েকটি খনিজ দ্রব্য পরীক্ষাস্থলে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাতে যদি ভাল ফল পাওয়া যায় তবে ভবিষ্যতে ভারতের খনিজ দ্রব্যের আয় আরও বৰ্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেদিকে ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষ লক্ষ্য নাই। গোড়া হইতে সাবধান না হইলে অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায় এই নবাবিষ্কৃত খনিজ দ্রব্যের বাণিজ্য ও বৈদেশিকরা আসিয়া হস্তগত করিয়া বসিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, ভারতের ভূগর্ভে বিশেষ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে এখনও অনেক মূল্যবান খনিজ দ্রব্য অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এগুলি আবিষ্কৃত হইলে বর্ত্তমান সভ্যতার গতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। প্রকাশ যে, এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কতিপয় উদ্যমশীল বিদেশী আসিয়া গবেষণা কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসীরা এরূপ কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

১৯২৮ সালের সরকারী রিপোর্টে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তন্মধ্যে কয়েকটির বিষয় নিয়ে আলোচনা করা গেল।

এদেশে যাহারা খনি হইতে বিভিন্ন সামগ্রী উত্তোলন করেন কিম্বা খনি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন তাঁহাদের পক্ষে লাইসেন্স লওয়ার প্রয়োজন হয়। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কেহই এ সমস্ত কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়,—ক্রমেই এরূপ লাইসেন্সের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ১৯২৭ সালে ৭১৪ খানা লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৮ সালে ৪৯৭ জনের অধিক প্রার্থী পাওয়া যায় নাই। এই ৪৯৭ খানা লাইসেন্সের মধ্যে আবার দুই প্রকারের লাইসেন্স আছে। যথা :—খনির সন্ধান করিবার অনুমতি (Pros-pecting licenses) ৩৯৬ খানা এবং খনির বন্দোবস্ত (Mining leases) বিষয় অনুমতি ১০১ খানা। ইহাতেই দেখা যায় যে, ভূতত্ত্ব

সম্পর্কে গবেষণা করিবার আগ্রহ এদেশবাসীর মধ্যে নাই বলিলেও চলে। ইতিপূর্ব্বে বিদেশীরা আসিয়া ভারতের বড় বড় খনি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। আজও তাহারাই অধিকাংশ খনির কাজ চালাইয়া অপর্য্যাপ্তরূপে লাভবান হইতেছেন। চক্ষের উপর এ সমস্ত লক্ষ্য করিয়াও ভারতবাসীর সম্যক চৈতন্ত লাভ হইতেছে না। এমন কি, ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডাইরেক্টার সার এডুইন প্যাস্কো এম-এ; এস্ সি-ডি (ক্যান্টাব); ডি-এস্-সি (লণ্ডন); এফ-জি-এস; এফ-এ-এস-বি মহোদয় পর্য্যন্ত দুঃখের সহিত একথার উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ইদানীং যে সমস্ত ধাতু আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাদের কোনও বাঙ্গলা প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? নবাবিষ্কৃত খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে প্রায় অধিকাংশই বিদেশীর চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং বিদেশীরাই সেগুলির নামকরণ করিয়াছেন। কাজেই ইংরাজী নাম ছাড়া আমাদের দেশী নাম এগুলির হয় নাই। ইহাও আমাদের নিশ্চেষ্টতার অন্যতম নিদর্শন। সেই মান্ধাতার আমলে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ গুটিকতক ধাতু আবিষ্কার করিয়া সেগুলি কাজে লাগাইবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার পর আর ভারতবাসীর চেষ্টায় বিশেষ মূল্যবান কোন খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; হইলে নিশ্চয়ই সে ধাতুর একটা দেশীয় নাম খুঁজিয়া পাওয়া যাইত।

ANTIMONY ORE

Antimony নামক এক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। ইহা অনেকটা সীসার মত। নামটু নামক স্থানে বার্ম্মা কর্পোরেশন লিমিটেড্ নামক কোম্পানীর একটি কারখানা আছে। এই কারখানায় অপরিস্কৃত ধাতব পদার্থের মধ্য হইতে সীসা সংগ্রহ করা হয়। এই সঙ্গে antimony এবং antimonial lead প্রভৃতি ধাতুও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ধাতুর অধিকাংশই আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে প্রেরণ করা হয়। ১৯২৭ সালে ব্রহ্ম দেশের খনি হইতে ১৩৩০৬৫৲ টাকা মূল্যের ৫০৩ টন antimonial lead উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে ইহার পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩১৭০১১৲ টাকা মূল্যের ১২৪১ টন মাল পাওয়া গিয়াছে।

তামার খনি

সিংভূম জেলায় মোসাবনি নামক স্থানে একটি তামার খনি আছে। ১৯২৬ সালে ইহার কাজ বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর বর্ত্তমান যুগের উপযোগী কল কব্জা ইত্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা হয়। ইতিপূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন লিমিটেড" নামক একটি কোম্পানীর হস্তে এই খনির কার্য্যভার ছিল। ১৯২৭ সালের প্রথম ভাগ হইতে লণ্ডনের "এংলো ওরিয়েণ্টাল জেনারেল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড" নামক কোম্পানী ইহার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এই বিদেশী কোম্পানীর চেষ্টায় ৩৫০০০০ পাউণ্ড আন্দাজ মূলধন সংগৃহীত হয়। এই টাকা দ্বারা নূতন করিয়া ঘাটশিলায় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং ১৯২৮ সাল হইতে আবার তথায় তামা সংগৃহীত হইতেছে। ১৯২৮ সালে এই খনি হইতে ৭২২২০০ টাকা মূল্যের ৯৮০৫৫ টন আন্দাজ তামা উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বার্মা কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানীর চেষ্টায় ব্রহ্মদেশের নামটু খনি হইতেও অপরিষ্কৃত অবস্থায় কিছু তামা উৎপন্ন হইয়াছে। এই জিনিষটি পরিষ্কার করিবার জন্য প্রায়ই জার্ম্মাণীর হামবার্গে চালান দেওয়া হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশের নেলোর জেলায়ও তামার খনি আছে। আলোচ্য বর্ষে তথা হইতে বেশী পরিমাণে তামা উৎপন্ন হয় নাই। মহীশূর রাজ্য হইতে অপরিষ্কৃত অবস্থায় পাঁচ টন আন্দাজ তামা ১৯২৮ সালে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতের হীরা

ভারতবর্ষে কয়েকটি হীরার খনিও আছে। ১৯২৭ সালে মধ্য ভারত Central India হইতে ৪৪৯৪৩ টাকা মূল্যের হীরা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে মোটের উপর বিভিন্ন খনি হইতে ৫৯৯২২৲ টাকার হীরা পাওয়া গিয়াছে। তবে পান্না রাজ্যের হিসাবটি পাওয়া যায় নাই। ইহাতে মনে হয় যে, ১৯২৮ সালে আরও কিছু বেশী পরিমাণ হীরা উৎপন্ন হইয়াছে।

সোণার ভারত

তারপর সোণার কথা। এককালে এই ভারতবর্ষ সোনার জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিল। বিদেশী বণিকগণের ধারণা ছিল যে, ভারতের সর্ব্বত্র সোণা পড়িয়া আছে। এক হিসাবে তাহাই ছিল। ভারতের ভূগর্ভে খনিতে প্রচুর সোণা ছিল, নৃপতিদের কোষাগারে সোণার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল, বড় বড় নগরী ও রাজ প্রাসাদ-গুলি স্বর্ণমণ্ডিত ছিল এবং সর্ব্বোপরি ভারতের বনে জঙ্গলে এবং শস্যক্ষেত্রে সোণা ফলিত। আজকাল অবশ্য সেই অপরূপ ঐশ্বর্য্য ভারতবর্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে; কিন্তু তবুও যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহার পরিমাণ একান্ত উপেক্ষনীয় নহে।

মান্দ্রাজের অনন্তপুর জেলায় একটি স্বর্ণের খনি আছে। ইহার কাজ ১৯২৭ সাল হইতে বন্ধ রাখা হইয়াছে। তবে কোলার অঞ্চলে এখনও পাঁচটি খনিতে কাজ চলিতেছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত খনি হইতে সোণা উৎপন্ন হইতেছে। ইহার ফলে খনির গর্ত্তগুলি অত্যন্ত গভীর হইয়া গিয়াছে। চ্যাম্পিয়ন রিপ এবং ওরগাঁও খনির গর্ত্ত যথাক্রমে ৬৭৩২ ফুট এবং ৬৫৭৩ ফুট গভীর হইয়াছে। এত নিম্নে যাহাতে আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে তজ্জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নানাপ্রকার কল কব্জা বসানো হইয়াছে। ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে কোলার অঞ্চলের খনির কাজে ১৮৯৩৯ জন লোক নিযুক্ত ছিল।

(ক্রমশঃ)

হোরেস গ্রীলি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতিমধ্যে হোরেস প্রিণ্টারের কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ছাপাখানার পরিচালক কখনও তাঁহার কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজিয়া পান নাই। হোরেস গ্রীলি কায়মন প্রাণে যখন ছাপাখানার নানা বিভাগের কাজে আত্মনিয়োগ করিতেন, তখন পৃথিবীর অপর কোন বিষয়ের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। তবে অবসর সময়ে তিনি সর্ব্বদাই নানাবিধ পুস্তক এবং সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়া কাটাইতেন—ইহাতে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

হোরেসের বয়স যখন ২০ বৎসর তখন মিঃ ব্লিসের ছাপাখানা বন্ধ হইয়া যায়। তাই বাধ্য হইয়া তিনি অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হন। পুল্‌টি সহরে হোরেস্ এক বোর্ডিং হাউসে বাস করিতেন। তথাকার মালিক তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বিদায় কালে স্বয়ং বোর্ডিং এর মালিক এবং তাঁহার পত্নী পরম শুভেচ্ছার সহিত হোরেসকে কিছু কিছু উপহার দিয়াছিলেন।

কাজের সন্ধানে বহির্গত হইয়া তিনি প্রায় ছয় সাত মাইল পায়ে হাঁটিয়া জেমস টাউনে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার চাকুরী জুটিয়া ছিল বটে; কিন্তু কিছু দিন কাজ করিয়াও যখন তিনি বেতন আদায় করিতে পারিলেন না তখন বাধ্য হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। লোধি নামক স্থানেও তিনি কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানেও বিশেষ কোন সুবিধা হইল না দেখিয়া হোরেস আরও ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী ইরি সহরে উপনীত হন। সেখানে প্রথমতঃ তাঁহাকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। হোরেসের বাহ্যিক আচরণ ও চেহারা দেখিয়া ছাপাখানার মালিকগণ মনে করেন যে, হোরেস একজন পলাতক শিক্ষা নবীশ। এই ভাবিয়া প্রথমতঃ তাহারা হোরেসকে চাকুরী দিতে অসম্মত হন। কিন্তু বিচারপতি ষ্টারিট ইহাকে কাজ দিয়া পরীক্ষা করেন এবং দেখিতে পান যে, হোরেস সত্য সত্যই কাজের লোক। তাই তিনি "ইরি গেজেটের" কাজে ইহাকে নিযুক্ত করেন। সেখানে হোরেস প্রায় সাত মাস কাল চাকুরী করিয়াছিলেন। এই সাত মাসের মধ্যে তাহার ব্যক্তিগত খরচ হইয়াছিল মাত্র ছয় ডলার বা ১৮ টাকা। এতদ্ভিন্ন উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থই তিনি স্বীয় পিতার নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলেন। তবে বিপদে আপদে দরকার হইবে বলিয়া আরও ১৫ ডলার তিনি রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হোরেসের বেশ ভূষার প্রতি লক্ষ্য নাই দেখিয়া একদা বিচারপতি ষ্টারিট তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। উত্তরে হোরেস বলিয়াছিলেন,—"দেখুন আমার পিতা

বড়ই দরিদ্র। তিনি বড় কষ্টে কাল যাপন করিতেছেন। তাঁহাকে সাহায্য করায় চাইতে বড় আনন্দ আমার নাই।"

ইরিক সহরে তিনি বেশী দিন চাকুরী করেন নাই। ৬।৭ মাসের মধ্যেই হোরেস নিউ ইয়র্ক যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। আমেরিকার সর্ব্ব প্রধান সহর এই নিউইয়র্ক। তথায় আপনার বলিতে হোরেসের কেহই ছিল না। এই অবস্থায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হোরেস সর্ব্ব প্রথম নিউ ইয়র্ক নগরীতে উপস্থিত হন। নগদ ১০ ডলার ও জিনিষ পত্রের মূল্যাদি বাবৎ ৭৫ সেণ্ট* এই পর্য্যন্তই তাঁহার সম্বল ছিল। দুই তিন দিন তিনি এক হোটেলে অবস্থান করিয়া চাকুরীর সন্ধানে "জার্ণাল অব কমার্স" কার্য্যালয়ে গমন করেন। তথাকার কর্ম্ম কর্ত্তা ডেভিড হেল, হোরেসের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া স্থির করেন যে, এই যুবক এক জন পলাতক শিক্ষা নবীশ। এই ভাবিয়া তিনি হোরেসকে বিদায় দেন এবং পুনরায় তাহার শিক্ষা দাতার নিকট ফিরিয়া যাইতে বলেন। সহায় সম্বল হীন অবস্থায় এরূপ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইলে অপর লোক নিশ্চয়ই ভগ্ন মনোরথ হইত; কিন্তু হোরেস দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি কিছুতেই হাল ছাড়িলেন না—অন্তত্র চাকুরীর চেষ্টায় বহির্গত হইলেন।

দুই দিন পরে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, চেথাম ষ্ট্রীটের ওয়েষ্টের ছাপাখানায় লোকের দরকার আছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ ছাপাখানার প্রধান কম্পোজিটার তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তথায় একটা শক্ত কাজ পড়িয়াছিল। কয়েক জন কম্পোজিটার ইতিপূর্ব্বে সে কাজে দক্ষতা দেখাইতে না পারিয়া বিদায় হইয়াছে। তাই অপর লোক খোঁজা হইতেছিল। একান্ত কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া প্রধান কম্পোজিটার হোরেসকে সেই কাজে পরীক্ষা স্থলে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পরে এই কদাকার যুবকের কাজ দেখিয়া তিনি বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। এক দিন কম্পোজ করিবার পর হোরেস যখন প্রুপ পাঠাইলেন তখন দেখা গেল,—তিনি অপরাপর কম্পোজিটার হইতে অনেক বেশী কাজ করিয়াছেন এবং ভুলও খুব কম হইয়াছে। হোরেসের অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মপটুতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন তাহাকে স্থায়ীভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। সেখানে তিনি সকলেরই প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন বটে; তবে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। প্রাতে ৬টার সময় হোরেস কাজে বাহির হইতেন এবং রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে ফিরিতে পারিতেন না। এই আফিস ছাড়িয়া হোরেস আরও কয়েকটি আফিসে চাকুরী করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু আজীবন চাকুরীতে কাটাইয়া দেওয়ার মতলব তাঁহার কখনও ছিল না। নিউ ইয়র্কে আসিয়া তিনি মোটের উপর ১৪ মাস আন্দাজ বিভিন্ন ছাপাখানায় কাজ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিজস্ব কারবারে প্রবৃত্ত হন।

এক কালের কপর্দ্দকহীন নিঃস্ব যুবক কি করিয়া সামান্ত বেতনের চাকুরী দ্বারা পিতা মাতাকে সাহায্য করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করিয়া কারবারে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল—তাহা সকলের পক্ষেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেকেই হয়ত ইহাকে "আকাশ কুসুম" বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কেহ হয়ত বলিবেন যে, অন্ততঃ আমাদের দেশে এতটা সম্ভবপর হয় না; কিন্তু সত্য যাহা তাহা সকল দেশে, সকল কালেই, সমান ভাবে

* ১০০ সেণ্ট = ১ ডলার; ১ ডলার = ৩৲ টাকা।

সম্ভবপর হইয়া থাকে। হোরেসের জীবনের অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের এই কলিকাতা নগরীতেই বহু সংখ্যক রহিয়াছে। লোটা কম্বল সার করিয়া মাড়োয়ারীরা এদেশে আসিয়া ক্রোড়পতি হইয়াছে—একথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যেও অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ আছেন—যাঁহারা নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থা হইতে একমাত্র নিজের চেষ্টার বলে বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন।

হোরেস যখন কারবার খুলিবার সন্ধানে ছিলেন তখন ডাঃ সেপার্ড নামক একজন প্রবীন সাংবাদিক এক সেণ্ট মূল্যের কাগজ বাহির করিবার চেষ্টায় ছিলেন। হোরেসের অন্যতম বন্ধু এবং "স্পিরিট অব দি টাইমস্" পত্রের প্রধান কম্পোজিটার ষ্টরি এই সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এই কাগজ ছাপিবার ভার লইয়া ষ্টরি ও হোরেস—এই দুই জনে মিলিয়া এক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মূলধন ছিল মাত্র ১৫০ ডলার। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে "মর্ণিং পোষ্ট" নামে এই কাগজ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইহা বন্ধ হইয়া যায় এবং ছাপাখানার মালিক দুই বন্ধু প্রায় ৬০ ডলার ক্ষতি গ্রস্ত হন। কারবারের সূত্রপাতেই এরূপ ক্ষতি—অন্যের পক্ষে নিরুৎসাহের কারণ হইত। কিন্তু হোরেস দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি কাগজের আশা ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য ছাপার কাজে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ইহার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ক্ষতির ধাক্কা সামলাইয়া লন এবং তাঁহার কারবার পুনরায় লাভজনক হইয়া উঠে।

এইরূপে সাত মাস কাল না যাইতেই আর এক দুর্ঘটনা ঘটে। হোরেসের বন্ধু ও কারবারের অংশীদার ষ্টরি প্রমোদ ভ্রমণে গিয়া নৌকা ডুবিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। এই বন্ধু বিচ্ছেদে হোরেস বিশেষ কাতর হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ের দিক হইতে তিনি ইচ্ছা করিলে তখন অনেক কিছুই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা কখনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ কারবারের হিসাব পত্র ঠিক করিয়া তাঁহার বন্ধুর প্রাপ্য অর্দ্ধাংশের টাকা ষ্টরির মাতাকে দিয়া আসেন এবং ষ্টরির এক শ্যালককে অংশীদাররূপে গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে আর এক জন তৃতীয় ব্যক্তিকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিবার কথা হয়। ইহার ফলে মূলধনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া তিন হাজার ডলারে পরিণত হয়।

ছাপাখানা অনেক বড় হইয়াছে দেখিয়া এবং অংশীদারগণের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনের ক্ষমতা আছে মনে করিয়া হোরেস পুনরায় একখানি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেন। অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে এই পত্রিকা সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নাম দেওয়া হয়—"নিউ ইয়র্কার।" এই কাগজ প্রায় ৮।৯ বৎসর চলিয়াছিল এবং ইহার গ্রাহক সংখ্যা ৪৫০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; তথাপি হোরেস বিশেষভাবে লাভবান হইতে পারেন নাই। তবে বরাবরই তাঁহার একটা ধারণা ছিল যে, তিনি এই ব্যবসায়েই উন্নতির মুখ দেখিতে পাইবেন। এই আশায় বুক বাঁধিয়া হোরেস গ্রীলি দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। অধিকন্তু তিনি সর্ব্বদাই নিতান্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। "নিউইয়র্কার" চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি "জেফার সোনিয়ান"

নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পূর্ণ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া "ডেলি হুইগ" পত্রের প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি তিনি প্রত্যহ লিখিয়া দিতেন। ১৮৪০ সালে যখন আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয় তখন হোরেস "লগ কেবিন" নাম দিয়া আর একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। প্রথম দিনেই ২০০০০ সংখ্যা কাগজ বিক্রয় হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইহার গ্রাহক সংখ্যা ৯০০০০ জনের কম ছিল না।

এইরূপে একাধিক কাগজের উন্নতির চেষ্টায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া হোরেস গ্রীলি পরিশেষে "ট্রিবিউন" পত্র প্রকাশ করেন। তখনও তাঁহার আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল হইয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় পত্রিকা খানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে যাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অধ্যবসায় ও শ্রম শক্তিরই জয় হইয়াছে। এই কাগজের জন্য হোরেস কঠোর পরিশ্রম করিতেন—এমন কি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। ফলে এই "ট্রিবিউন" একখানি শক্তিশালী সংবাদ পত্রে পরিণত হয়। তবে বিপদ কখনও হোরেসের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। ১৮৪৫ সালে নিউইয়র্কের "ট্রিবিউন" কার্য্যালয় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ইহাতে প্রায় ১৮০০০ ডলার ক্ষতি হইয়াছিল। আফিস খানি অবশ্য বীমা করা ছিল। তাহাতে হোরেস মাত্র ১০০০০ ডলার পাইয়াছিলেন। তথাপি কাগজ এক দিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই। হোরেসের অক্লান্ত চেষ্টায় "ট্রিবিউন" প্রত্যহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আমেরিকা বাসী তাঁহাকে বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

এই "ট্রিবিউন কার্য্যালয় উত্তরকালে একটি প্রকাণ্ড ছাপাখানায় পরিণত হইয়াছে। ইহার ন্যায় বিশাল ছাপাখানা বোধ হয় নিউইয়র্কেও খুব বেশী নাই। কিরূপ সামান্য অবস্থা হইতে এই বিশাল প্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মনে করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইহাকে বিপুল অধ্যবসায় ও অক্লান্ত কর্ম্ম প্রচেষ্টার জয়স্তম্ভ ছাড়া আর কি বলিব?

এইরূপে হোরেসের দিন ফিরিল। তিনি এখন নিউইয়র্কের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ১৮৪৮ সালে হোরেস সর্ব্ব প্রথম আমেরিকান কংগ্রেস—অর্থাৎ আমেরিকার পার্লামেন্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইতিমধ্যে ট্রীবিউনের অবস্থা আরও উন্নত হইয়াছিল। ইহার বার্ষিক আয় তখন ৬০০০ পাউণ্ডের কম হইত না।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিঙ্কনের নাম আজ সর্ব্বত্র পরিচিত। এক সময়ে এই হোরেস তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এব্রাহামের নীতিগুলি বিশেষ করিয়া সমর্থন করিতেন। এব্রাহাম লিঙ্কন যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে দণ্ডায়মান হন তখন হোরেস গ্রীলি তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকারে সমর্থন করিয়াছিলেন। শেষজীবনে হোরেস আমেরিকার রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপুল প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বলিয়া মনোনীত করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সামান্য মজুরের ছেলে হইয়াও হোরেস গ্রীলি স্বীয় অধ্যবসায় ও দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের বলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। জীবনে যাঁহারা উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন—এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা তাঁহাদের সম্মুখে রাখা কর্ত্তব্য।

(সমাপ্ত)

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয় কর্তৃত্ব

ভারতের নদীপথে এবং উপকূল ভাগে যাত্রী ও মাল বহনের কার্য্যে নিযুক্ত জাহাজের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই সমস্ত জাহাজের মালিক এবং পরিচালকগণ প্রায় সকলেই বিদেশী। ভারতবাসীর অর্থে নির্ম্মিত এবং ভারতীয় কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত জাহাজ যে মোটেই নাই—এ কথা বলা যায় না। তবে স্বদেশী জাহাজের সংখ্যা এতই অল্প যে সে গুলিকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিলেও চলে।

ভারতের নদীপথে এবং উপকূলভাগে এই যে জাহাজ পরিচালনের ব্যবসা—ইহা বড়ই লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসায়ে কোটী কোটী টাকার বিদেশী মূলধন খাটিতেছে এবং প্রতি বৎসর তাহা হইতে কোটী কোটী টাকা আয় হইতেছে। বলা বাহুল্য, তৎসমস্তই বিদেশী বণিকেরা অর্জ্জন করিতেছেন। ইহাতে বিচলিত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাই বার বার জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু বিদেশীর অসম প্রতিযোগিতা পদে পদে এ বিষয়ে ভারতবাসীকে বাধা দিতেছে।

জাহাজ পরিচালনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত বিদেশী কোম্পানী গুলির অর্থবল অপ্রমেয়। তারপর ইহাদের সঙ্ঘবলও নানা দিক দিয়াই আদর্শ স্থানীয়। এই সমস্তের সহিত টেক্কা দেওয়া এ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

এবার তাই সরকার পক্ষের সাহায্যে আইন করিয়া বিদেশীদিগকে 'কাবু' করিবার আয়োজন হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য লইয়া মিঃ হাজী, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার "উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ বিল" এবং মিঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী তাঁহার Inland Navigation Amendment Bill উপস্থিত করিয়াছেন। এস্থলে আমরা মিঃ হাজীর বিল সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিব।

মোটের উপর ভারতের উপকূল ভাগে অবস্থিত বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে মাল ও যাত্রী বহনের কার্য্যে নিযুক্ত বিদেশী জাহাজগুলিকে বিতাড়িত করাই মিঃ হাজীর বিলের উদ্দেশ্য। তাঁহার মতে উপকূলভাগে মাল বহনের এক চেটিয়া অধিকার ভারতীয় কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত জাহাজ গুলিকে দিলে অল্প দিনের মধ্যেই একটি ভারতীয় নৌবহর গড়িয়া উঠিবে; এই ব্যবসায়ে যে অর্থাগম হইবে তাহাতে ভারতের আর্থিক অবনতির প্রতিকার হইবে এবং সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে। এসমস্ত উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা ভারতবাসী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

সে কালের বুড়োরা বলেন—আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর লইয়া দরকার কি? তাঁহাদের মতে এসমস্তই অনধিকার চর্চ্চা—ইহাতে সর্ব্ব সাধারণের কোন স্বার্থ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার তাহা নহে। অনুধাবন

করিলে দেখা যায়—এই জাহাজী ব্যবসায়ের সহিত দীন দরিদ্র ভারতবাসীরও কিছু না কিছু স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে নুনের কথা বলা যাইতে পারে। এই নুন আমাদের পক্ষে একটি অপরিহার্য্য সামগ্রী। যাহার আর কিছু জোটে না—সে ব্যক্তিও নুন দিয়া চারটি ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ব্যবসায়ে ভারতীয় কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়াই আজ নুনের দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমাদের এই দেশেই প্রচুর নুন উৎপন্ন হইতে পারে। এবং সেই নুন প্রচুর পরিমাণে নাম মাত্র মূল্যেও বিক্রয় করা যাইতে পারে। কিন্তু জাহাজের ভাড়াই আমাদের 'কাল' হইয়াছে। বোম্বাই হইতে বাঙ্গালা দেশে নুন আমদানী করিতে যে পরিমাণ ভাড়া লাগে প্রায় সেই পরিমাণ ভাড়াতেই লিভারপুলের নুন কলিকাতায় পৌঁছিতে পারে। বিদেশীর কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত জাহাজ কোম্পানীগুলি জোট করিয়া বসিয়া আছে—তাহারা কিছুতেই ভাড়া কমাইয়া ভারতীয় নুনের দাম কমাইবার সাহায্য করিবে না। ফলে দরিদ্র ভারতবাসী উপযুক্ত মাত্রায় নুন পর্য্যন্ত খাইতে পারিতেছে না। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের কথা আর কি বলিব।

কয়লা সম্পর্কেও ওই একই কথা। এদেশের খনিতে কয়লার অভাব নাই। খনিতে প্রচুর কয়লা জমা হইয়া রহিয়াছে। ইহা সত্বেও বিদেশী কয়লা আসিয়া ভারতের বাজারে আধিপত্য করিতেছে। ইহাকেই বলে—"উপোস করে দিন কাটাচ্ছি—থাকুক্ মোদের ক্ষেতে ধান।" বাঙ্গলা দেশ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত কয়লা পাঠাইতে হইলে যে ভাড়া লাগে তাহার অনেক কমে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা বোম্বাইয়ের বন্দরে আসিতে পারে। তাই দেশীয় কয়লা বিদেশী কয়লার সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয়না। ফলে ভারতের কয়লা খনিতে খনিতে জমা হইতেছে, ভারতীয় খনি পরিচালকগণ ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন এবং ভারতের দৈন্যভার প্রতি বৎসরই বর্দ্ধিত হইতেছে।

আসল কথা এই যে, মহা যুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা প্রচুর মূলধন খরচ করিয়া বহু সংখ্যক জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। যুদ্ধের সময় রসদ এবং রণ সম্ভার বহনের কার্য্যে এই সমস্ত জাহাজ ব্যাপৃত ছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে যথেষ্ট কাজের অভাবে এগুলি বেকার হইয়া পড়িল। তাই বিভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে এগুলিকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। এসময়ে যদি ভারতীয় উপকূল হইতে বিদেশী জাহাজ বহিষ্কৃত হয় তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীবৃন্দ যে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন—একথা বলাই বাহুল্য। তাই তাহারা নানা উপায়ে এদেশে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইতি মধ্যেই মিঃ হাজীর বিলের বিরুদ্ধে নানা কথা উত্থাপিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এরূপ আইন প্রণয়ন করা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক, এতদ্বারা বর্ণ বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এবং অপরের ন্যায় অধিকার হরণ করা হইবে। ইহাদের মতে উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ করিবার অধিকার মোটেই ভারতবাসীর নাই। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, উপকূল সংরক্ষণ করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার অধিকার ভারতের নিশ্চয়ই আছে। মিঃ হাজীর বিলে যে দাবী উত্থাপিত করা হইয়াছে—তাহা নূতন কিছুই নহে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এরূপ

ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে অবলম্বিত হইয়াছে। এবং এখনও এরূপ সংরক্ষণ মূলক আইন নানা দেশে প্রচলিত আছে। অষ্ট্রেলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি উপনিবেশ। তথায় অনুরূপ আইন করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া ইতি মধ্যেই একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অপরের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। স্বয়ং বৃটিশ সরকারের কথাই ধরা যাউক। আজ সমুদ্র পথে বৃটিশের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। বৃটিশ বাহিনীর সম্মুখীন হয়—এমন ক্ষমতা এখন পৃথিবীর আর কোন রাষ্ট্রেরই নাই। এই অমিতবল বৃটিশ নৌবহর সৃষ্ট হইল কিরূপে? বৃটিশ বাহিনীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—এক সময়ে ইংরাজও এরূপ সংরক্ষণী আইনের আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত আইন প্রায় দুই শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। অধুনা তাঁহা দের প্রয়োজন নাই বলিয়াই বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সেই সমস্ত আইন রহিত করিয়া সমুদ্র বক্ষে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জয় গান করিতে-ছেন। ইতিহাসে ইহার আরও অনেক নজির আছে। মোটের উপর কোনও দেশ যদি তাহার শিল্প বাণিজ্যকে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকাইয়া রাখিবার জন্য এবং শক্তিশালী করিবার জন্য সং-রক্ষণী আইনের আশ্রয় লয় তবে তাহাকে কিছু-তেই নিন্দা করা যায় না—কারণ এরূপ বিধান বর্ত্তমান জগতের সভ্যতাসম্মত একটি নীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

তার পর আন্তর্জ্জাতিক আইন ঘাটিয়াও দেখা গিয়াছে। তাহাতে এমন কোন কথাই নাই যাহা দ্বারা উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইনবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইংলণ্ডের আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা দুই দুই বার মিঃ হাজীর বিলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এরূপ আইন প্রণয়নের স্বাধ্য অধিকার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আছে। তথাপি সম্ভব অসম্ভবের কথা বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

যাহা হইবার নহে—যাহা করিতে পারিব না—করিবার শক্তি সামর্থ্য আমাদের নাই—তাহাই করিয়া বসিব বলিয়া বৃথা হুম্‌কী দেখাইয়া লাভ কি? কথায় বলে—"বাধা ঝাপিতে হাজার টাকার মাল।" বাক্স পেটেরা যতক্ষণ বন্ধ থাকে ততক্ষণই লোকে ভাবে যে, না জানি ইহার মধ্যে কত টাকার সম্পত্তিই জমা আছে। একবার তাহার ডালা খুলিয়া দিলে সমস্ত গুমর বেফাঁস হইয়া যায়। অনর্থক তাহা বেফাঁস করিয়া লাভ কি? ভারতীয় কংগ্রেস এবার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে কি লাভ হইয়াছে? সকল গুমর ফাঁক হইয়াছে বৈ তো নয়! যত দিন পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিব বলিয়া জগত সমক্ষে প্রচার করা হইতেছিল তত দিনই বরং ভাল ছিল। কারণ তখন সকলেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিত। কিন্তু এখন কি হইয়াছে? ভারতবাসী যে অকর্ম্মণ্য আদর্শবাদী তাহাই বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা চাই বলিয়াই তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, দুই চারিজন জেলে গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় যেখানে পদে পদে শক্তি সামর্থ্যের অভাব সেখানে বড় বড় বুলি আওড়াইয়া বাতুলতা প্রকাশের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে—আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। মিঃ হাজীর বিলের মধ্যেও এরূপ অসার আস্ফালন দেখিতে পাই।

মিঃ হাজী বলিতেছেন যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিদেশী জাহাজগুলিকে এ দেশের উপকূল হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি,—ইহা কি সম্ভবপর? কম পক্ষে তিন শত প্রকাণ্ড জাহাজ ভারতের উপকূল ভাগে থাকিয়া মাল ও যাত্রী বহন করিতেছে। এ গুলিকে বিতাড়িত করিলে ভারতের পণ্য এবং যাত্রী বহন কে করিবে? উত্তরে হয়তঃ কেহ কেহ বলিবেন যে বিদেশীর স্থলে স্বদেশী নৌবহর গড়িয়া উঠিবে।

স্বীকার করি—তাহা হইতে পারে। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা সম্ভবপর কি? ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারিবেন কি? আমরা কিন্তু কোনই ভরসা পাইতেছি না। বহু বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা দেশে তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাজ কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে মনে হয়,—পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনের অনুরূপ জাহাজ নির্ম্মাণ করা কিম্বা সংগ্রহ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

এক একখানি জাহাজের দাম অন্যূন ২০ লক্ষ টাকার কম নহে। এরূপ জাহাজ এখন ভারতবাসীর কর্তৃত্বাধীনে ৫।৭ খানার বেশী বোধ হয় নাই। অবশিষ্ট ২৯৫ খানা জাহাজ তো আমাদের নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু এত জাহাজের সংস্থান কে করিবে? ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক অর্থ সংগ্রহ হইবে কি? ২০ লক্ষ টাকা মূলধনের লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিয়া ১০ বৎসরের মধ্যেও পাঁচ লক্ষ উঠান যায় না—যাঁহারা এ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহারাই আমাদের কথা সমর্থন করিবেন। এই অবস্থায় কোটী কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতের প্রয়োজনের উপযোগী জাহাজ করা কিম্বা ভাড়া করা—কোনটাই সম্ভবপর হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুতরাং অযথা বহ্বাস্ফোটের প্রয়োজন কি?

তার পর আর একটি কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলাম যে, জাহাজ নির্ম্মাণ কিম্বা ভাড়া করিবার উপযোগী অর্থ এদেশ হইতে সংগৃহীত হইবে। যদি তাহাই হয় তবে জাহাজী ব্যবসায়ে এতগুলি টাকা খাটানো লাভজনক হইবে কি? ভারতবর্ষে আরও অনেক লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা আছে। এমন অনেক একচেটিয়া শিল্প ভারতের আছে—যেগুলি উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। জাহাজী ব্যবসা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া সেদিকে মূলধন নিয়োগ করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে কি? যাঁহারা এখন উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা এ সমস্ত সুবিধা অসুবিধার কথা তলাইয়া দেখিয়াছেন কি?

এই অবস্থায় আমাদের মনে হয়, উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ এবং বিদেশী জাহাজগুলিকে বিতাড়ন করিবার পূর্ব্বে যাহাতে প্রয়োজনের উপযোগী স্বদেশী জাহাজের বন্দোবস্ত হয় তাহারই উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সংরক্ষনী আইন করিবার অধিকার তো আমাদের আছেই; যখন দেখিব যে আমাদের জাহাজ অনায়াসেই আমাদের কাজ চালাইতে সক্ষম হইয়াছে তখন এরূপ আইন প্রণয়ণ করিলেই হইবে। ইহার পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি করিয়া খাতাপত্রে আইন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। এতদ্বারা আমাদের মর্য্যাদা বাড়িবে না; বরং জগতের চক্ষে আমরা হাস্যাস্পদ হইব মাত্র।

ধান

আমাদের ব্রিটিশ ভারতে ১৯১০ সালে বিঘা প্রতি ৭ মন ১৫ সের ধান হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে হইয়াছে—বিঘা প্রতি মাত্র ৫ মন ৩৮ সের। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে আমাদের দেশের জমির উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যাইতেছে। জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফসল ও বেশী পাওয়া যাইবে।

ধান আমাদের বাংলার প্রধান শস্য। ধানের চাষ দেশে যত বেশী হয়, ততই দেশের মঙ্গল। ধান চাষের পক্ষে উষ্ণ জল বায়ু, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও কোমল মৃত্তিকা আবশ্যক। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ধান চাষের জমি আমাদের দেশে প্রচুর আছে। বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে ধানের চাষ হয় তাহা অপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে চাষ করিতে পারিলে ফসল বেশী হইবে। ধান্যক্ষেত্রে আবশ্যকানুযায়ী জল সেচন ও অপসারিত করিবার উপায় থাকা আবশ্যক। ধান গাছকে পোকা হইতে রক্ষা করিবার উপায় থাকা আবশ্যক। আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে আশু ধান রোপণ করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি কর্ষণ করিতে হয়। আষাঢ় মাসে যদি জমিতে জল থাকে তবে হেমন্তে যে ধান পাকে এই মাসে তাহা বপন করিতে হয়।

এই মাসে কয়েক প্রকার ধান পাকিয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে হেমন্তপক্ক ধান বপন করিতে হয়। এই মাসে বা আষাঢ় মাসে কয়েক প্রকার ধান পাকিয়া থাকে।

ভাদ্রমাসে আশু ধান পাকিয়া থাকে।

আশ্বিন মাসে রবি ফসলের জন্য জমি কর্ষণ করিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়। এই মাসে বর্ষা শেষ হইলে রবি ফসল বপন করা হয়।

কার্ত্তিক মাসে লহমন ভোগ, কালা কার্ত্তিকে প্রভৃতি ধান পাকে। এই মাসেই হৈমন্তিক ধানে ফুল ও বীজ হইয়া থাকে।

অগ্রহায়ন মাসে ধান কাটা, গোলাজাত করা এবং জমিতে জল সেচন করিতে হয়।

পৌষমাসে ধান কাটা এবং উহা খামারে সাজাইয়া রাখা হয়। পৌষমাসে ধান ঝাড়ার কার্য্যও হয়।

এই স্থানে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কৃষকগণ যে প্রণালীতে ধান ঝাড়ে, তাহা অপেক্ষা ঝাড়াই কল দ্বারা ধান ঝাড়া আমি শ্রেয়ঃ মনে করি। এই কলে দৈনিক ৫০।৬০ মন যে কোন শস্য ঝাড়া যায়। ধান হইতে তুষ কূড়া এবং ডাল হইতে খোসা প্রভৃতি পৃথক করিতে ইহা একটী উৎকৃষ্ট যন্ত্র। ঝাড়ানী বা কুলার দরকার হয় না। এক একটী কল বহুকালস্থায়ী। কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে স্থানীয় কামারই এই কল ঠিক করিতে পারিবে। যে কোন বালক ইহার কার্য্য প্রণালী দেখিলেই কল চালাইতে সক্ষম হইবে। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" অফিসে পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানা যায়।

চীনাধান্য এই পৌষ মাসেই বপন করা হয়।

মাঘমাসে রবি ফসল ক্ষেত্রে জল সেচন করা হয়। এই মাসেও ধান ঝাড়া হয়।

ফাল্গুন মাসে রবি ফসল পাকিতে আরম্ভ করে। আশানুরূপ বৃষ্টি হইলে এই মাসে আশু ধান বুনিতে হয়।

চৈত্র মাসে রবি ফসল যেগুলি পূর্ব্বে পাকেনা তাহা পাকিয়া যায়।

পাট

পাট আমাদের দেশে আবশ্যকের অতিরিক্ত জন্মানো অধিক হওয়া উচিত নহে। পৃথিবীর আর কোথাও পাট হয় না। কেবল বাংলা দেশ, আসাম ও বিহারে পাট জন্মে। সমস্ত দেশের পাটের চাহিদা এই ৩টী প্রদেশ পূরণ করে। এজন্য এই সব স্থানে অত্যধিক পরিমাণে পাটের চাষ হইতেছে। কিন্তু দর বেশী পাওয়া যাইতেছেনা। গড়ে আমরা পাটের মন ৭।৮ টাকা হিসাবে পাই। বিদেশীরা আমাদের দেশের পাটের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় ১০০ শত চট কল আমাদের দেশেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পাট না হইলে চটকল সমূহ চলিবে কিরূপে? আমাদের দেশের পাট দিয়ে চট কল প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিদেশীরা গড়ে শতকরা ২০০ টাকা পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ট দিতেছে আর আমাদের দেশীয় কৃষকেরা রৌদ্র বৃষ্টিতে ক্ষেতে কাজ করে গড়ে মন প্রতি মাত্র ৭।৮ টাকা পাইতেছে।

তারপর এই পাট আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া বিস্তার ও কলেরার প্রধান সহায়, কৃষকেরা নালি ডোবা, খাল এমন কি পুষ্করিণীতে পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখে। এই সব স্থানে মশক ডিম্ব প্রসব করে। ইহা আমাদের স্বাস্থ্যের কত প্রতিকূল তাহাতো সহজেই বোঝা যায়। আমাদের দেশী কৃষকেরা পাটের চাষ করিয়া বিদেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিতেছে। আমাদের দেশের কোন উপকার হইতেছে না বরং অনিষ্টই হইতেছে।

এই জন্যই দেশে অল্প পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে দর বেশী পাওয়া যাইবারই সম্ভাবনা।

বেগুন

বেগুন চাষে লাভ প্রচুর। আজ কাল ৩।৪ টাকা মণ দরে বাজারে বেগুন বিক্রি হয়।

বেগুন চাষের জন্য পাতলা জমি সুবিধাজনক। প্রথমতঃ জমির মাটি কোদাল দিয়া ওলট পালট করিয়া দিতে হয়।

অন্যস্থানে বেগুনের চারা করাইয়া যে স্থানে চাষ করিবেন সে স্থানে চারা রোপণ করিবেন। চারার অন্তত ৩।৪ টি পাতা হইলেই অন্যত্র নিয়া

রোপন করিতে হইবে। ২হাত অন্তর চারা রোপন করিতে হয়। চারা রোপন করিয়া চারার গোড়ায় অল্প পরিমাণে জল দিতে হইবে। রোপনের প্রথম দিন চারা ঢাকিয়া রাখা উচিত। বিঘা প্রতি দেড় হাজার চারা লাগে। চারা রোপনের ৩ মাস পর হইতে ফসল পাওয়া যায়।

শ্রীসুবোধ কুমার নন্দী মজুমদার
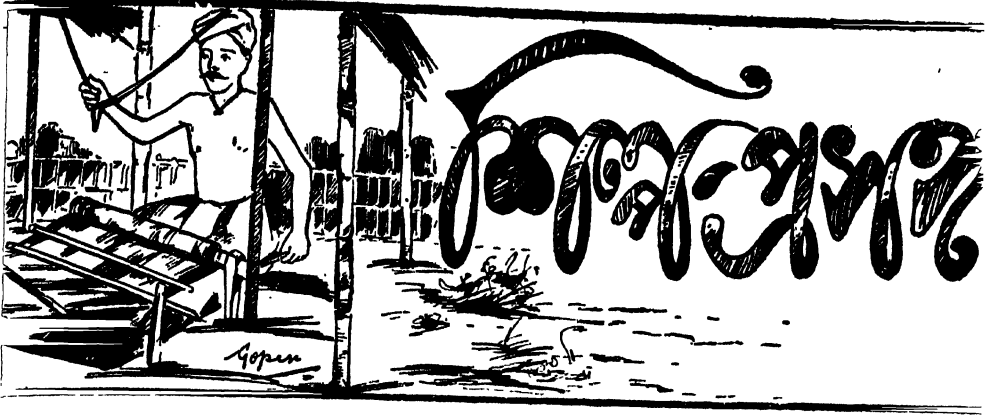
উপার্জ্জনের নানাপথ

অনেকেই আক্ষেপ করিয়া বলেন "মশায়, ক্রমেই জীবণ যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল জিনিষ না হইলে চলিত আজকাল সেগুলি ব্যবহার না করিলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। দিনের পর দিন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষের সংখ্যা কেবল বৃদ্ধিই পাইতেছে। এ অবস্থায় আমাদের আর বাঁচিবার উপায় কি?"

বস্তুতঃ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মনুষ্যের প্রয়োজনীয় জিনিষের সংখ্যা তাহার সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রয়োজন যেমন বাড়িয়াছে উপার্জ্জনের পথ ও তেমনি প্রশস্ত হইতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা যে সমস্ত পথের সন্ধান করি না, নিত্য প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জিনিষের কথা ভাবি না এবং কত উপায়ে যে অর্থোর্জ্জন করা যাইতে পারে তাহা মোটেই চিন্তা করি না।

একদা কোনও স্বাবলম্বী অথচ ধনী ব্যবসায়ীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি মোটেই নিরাশাবাদী (Pessimistic.) নহেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সর্ব্বদাই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—"আরে মশায়, টাকা ত পথে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—কুড়াইয়া লইবার লোকের অভাব।" প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার এরূপই বলিয়া মনে হয়।

এই কলিকাতা সহরে অর্থ উপার্জ্জনের কত ফন্দি রহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না বিদেশীর সন্ধানী দৃষ্টিতে এগুলি ধরা পড়ে। তাই তাঁহারা সাত সমুদ্র তের নদীর পর পার হইতে আসিয়া জাহাজ ভর্ত্তি করিয়া টাকা লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। ইহাদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শী, পাঞ্জাবী

প্রভৃতিও রাজারহাজে বাঙ্গালায় আসে না—প্রথমাবস্থায় তাহাদের লোটা কম্বলই একমাত্র সম্বল থাকে। তথাপি স্বীয় অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতার গুণে ইহারা ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই বড় বাজারের, বড় দালানে, বড় দোকান পাতিয়া বসে। একেবারে নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিয়াই ইহারা ঐশ্বর্য্যের সৌধশিখরে আরোহণ করে। আমরা কিন্তু সে কথা ভুলিয়া যাই—খুটি নাটি জিনিষের প্রতি নজর দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। তাই আজ বাঙ্গালী জীবণ সংগ্রামে পদে পদে পরাজিত হইতেছে।

আজ আমরা কয়েকটি সামান্য কাজের কথা উল্লেখ করিতেছি। অনেকে হয়ত এগুলিকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু এসমস্ত আবর্জ্জনা হইতেই প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হইতেছে। অনেক বাঙ্গালী যুবক কাজের অভাবে বেগার বসিয়া হা হুতাশ করিতেছেন। আমরা বিশেষ ভাবে এবিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—এক—

পুরাতন টাইপ রাইটার বিক্রয়।

আজকাল টাইপ রাইটারের চাহিদা যথেষ্ট বাড়িয়াছে। প্রায় প্রত্যেক আফিসেই—এমন কি অনেক গৃহে বাড়ীতে পর্য্যন্ত—টাইপ রাইটার ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের সকলের পক্ষে নূতন টাইপ রাইটার রাখা সম্ভবপর হয় না তাই অনেকেই কার্য্যক্রমে পুরাতন টাইপ রাইটার খুঁজিয়া থাকেন; কারণ অল্প মূল্যের মেসিনের দ্বারাও কাজ করিতে পারা যায়। এই অবস্থায় পুরাতন টাইপ রাইটার বিক্রয় করা—বিশেষতঃ কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় সহরে—আজকাল খুবই সহজ ব্যাপার।

তবে কার্য্যক্রমে পুরাতন টাইপ রাইটার বেশী পাওয়া যায় না—যতক্ষণ একটা মেসিন দ্বারা কাজ পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহা কেহই সহজে ছাড়িয়া দেয় না। কিন্তু যখন ইহা দ্বারা টাইপ করা অসম্ভব হইয়া উঠে তখনই উহা বিক্রয় করিতে অনেকেই উদ্যত হয়। এরূপ টাইপ রাইটার যথেষ্ট আছে। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেই ভুরি ভুরি পুরাতন টাইপ রাইটারের সন্ধান পাওয়া যায়।

একজন মিস্ত্রী দ্বারা সেগুলি পরীক্ষা করাইয়া মেসিনের অবস্থানুসারে দাম দিয়া তাহা ক্রয় করিতে পারা যায়। যাঁহারা স্বয়ং মিস্ত্রীর কাজ জানেন তাঁহাদের পক্ষে তো কোন কথাই নাই। আর যাঁহারা নিজে একাজ জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে দৈনিক ১৲ মজুরী দিয়া একটি মিস্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন।

এইরূপ পুরাতন মেসিন সংগ্রহ করিয়া তাহা মেরামত করিতে বিশেষ কোন খরচ লাগে না, অথচ মেসিনটি নূতনের ন্যায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং কার্য্যক্ষম করিতে পারা যায়। মেরামতের জন্য কালো এনামেল রং এবং একটু কেরোসিন তেলের বেশী আর বিশেষ কিছুই প্রয়োজন হয় না।

এরূপভাবে মেরামত করা মেসিন বিক্রয়ের জন্য বিশেষ কোনই বেগ পাইতে হয় না। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেই বহুসংখ্যক ক্রেতা পাওয়া যায়। বিক্রয়ের দ্বারা বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। তবে প্রথমতঃ খুব বেশী লাভ না করাই ভাল। এই ব্যবসায়ে ২০০ টাকার বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং যাঁহারা টাইপ

রাইটার মেসিনের কাজ জানেন তাঁহারা ইহাতে অপ্রত্যাশিত লাভবান হইতে পারেন।

—দুই—

পুরাতন লোহার জিনিষ নূতন করা

লোহার জিনিষের উপর মরিচা ধরিয়া গেলে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। অনেকে তখন এই সমস্ত মরিচা-ধরা লোহা লক্কড় নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেন। কলিকাতার ঠন্‌ঠনিয়া, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, মানিকতলার বাজার এবং চোরা বাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ লোহার জিনিষ স্তূপীকৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া মরিচা পরিষ্কার করিয়া ঠিক নূতনের মত ঝক্ ঝকে তক্ তকে করিতে পারা যায়। এরূপ পরিষ্কৃত লোহা লক্কড় যথেষ্ট মূল্যে বাজারে বিক্রয় হয়। অনেকে এই কারবার করিয়া প্রচুর অর্থার্জ্জন করিয়াছেন।

Chloride of tin দ্বারা এরূপ মরিচা-ধরা লোহা লক্কড় পরিষ্কার করিতে পারা যায়। Chloride of tin এর মধ্যে মরিচা ধরা জিনিষ কিছু সময় ডুবাইয়া রাখিতে হয়। মরিচা যত বেশীই হউক না কেন ১২ ঘণ্টার বেশী সময় তাহা ডুবাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। পাত্‌লা মরিচা হইলে অল্প সময়েই তাহা উঠিয়া যায়। মোটের উপর কিছু সময় Chloride of tin এর মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া অতঃপর জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইলেই পরিষ্কার লোহার জিনিষ উৎপন্ন হয়।

তারপর bolts, nuts and screw প্রভৃতির উপর ঠিক রূপার ন্যায় রং করিতে পারা যায়। নানাবিধ কারখানায় এই শ্রেণীর কলাই করা মালের চাহিদা খুব বেশী। মরিচা ধরা bolts, nuts and screw প্রভৃতি প্রথমতঃ Chloride of tin এর মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া জলে ধুইয়া লইতে হয়। তারপর এই জিনিষকে Ammoniaতে ডুবাইয়া লইয়া খুব তাড়াতাড়ি শুকাইয়া লওয়া প্রয়োজন। গরম বাতাসের সাহায্যে শুকাইতে পারা যায়। উনুনের উপর দিয়াও শুকাইতে পারা যায় বটে; তবে লোহাগুলি আগুন হইতে যাহাতে দূরে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এরূপ করিলেই পুরাতন লোহা লক্কড় ঠিক কৃত্রিম রূপার (Dull silver) ন্যায় চাক্‌চিক্যশালী হইয়া উঠিবে। রেলওয়ে এবং গবর্ণমেণ্ট কারখানায় এরূপ মাল যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা হয়।

Chloride of tin সর্ব্বত্র বিক্রয় হইয়া থাকে। তারপর এই জিনিষ নিজেও তৈয়ার করা যায়। টিন মিস্ত্রীর কারখানার নিকটে ছোট বড় টিনের টুক্‌রা যথেষ্ট পরিমাণে পড়িয়া থাকে। বর্ত্তমানে এগুলি নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় হয়। এই রদী মাল সচরাচর জার্ম্মানীতে প্রেরিত হইয়া থাকে। তথায় তাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই টুক্‌রা হইতে আবার টিন প্রস্তুত করিয়া থাকে।

এই টিনের টুক্‌রা গুলি কাঠের ভাটি অথবা পোর্সিলেনের পাত্রের মধ্যে রাখিয়া hydro chloric acid দ্বারা ভিজাইয়া দিতে হয়। অতঃপর ২৪ ঘণ্টা কাল এই পাত্রটিকে ঢাকিয়া রাখা দরকার। এই সময়ের মধ্যে টিনের অংশ গলিয়া গিয়া Chloride of tin উৎপন্ন হইবে। এবং কিছু কিছু টুক্‌রা পড়িয়া থাকিবে। এই টুক্‌রা গুলি ফেলিয়া যে তরল পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই Chloride of tin; ইহা দ্বারাই মরিচা-

ধরা জিনিষ পত্র অনায়াসে পরিষ্কার করা যায়। যাহারা বিরাট ভাবে মরিচা পরিষ্কারের কাজ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে স্বহস্তে Chloride of tin প্রস্তুত করাই ভাল। কারণ তাহাতে লভ্যাংশ আরও বৃদ্ধি পাইবে। বাজার হইতে Chloride of tin খরিদ করিলেও লভ্যাংশ নিতান্ত কম হয় না। এই ব্যবসায়ে নাম মাত্র মূলধনের প্রয়োজন হয়। যে কোন ব্যক্তি এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে লাভবান্ হইবেন—সন্দেহ নাই।

—তিন—

হোলির সময়ের রং প্রস্তুত করা

সম্মুখে হোলী এবং দোলের উৎসব আসিতেছে। মার্চ্চ মাসে সাধারণতঃ দোলযাত্রা উৎসব আরম্ভ হয়। এই সময় রং খেলিবার প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেকে অনেক রকম রং কিনিয়া যথেষ্ট পয়সা খরচ করেন; এই সুযোগে নানা প্রকার রং প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত রং প্রস্তুত করা বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে। এমন এক প্রকার রং আছে যে গুলি কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করা মাত্র গাঢ় লাল, নীল অথবা সবুজ রং ধারণ করে; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহা উড়িয়া যায়—কাপড়ের উপর তাহার কোন চিহ্নই থাকে না। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর রংকে Magic colour বলে। ভদ্র মহলে এই রংএর আদর খুব বেশী। কলিকাতার ন্যায় বড় বড় সহরে এমন কি পল্লীগ্রামেও আজকাল এই শ্রেণীর রং যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয়। অথচ ইহা প্রস্তুত করিতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না।

Phenolpthalin এবং ammonia নামক দুইটি রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা এই শ্রেণীর লাল রং প্রস্তুত হইতে পারে। ঔষধের দোকান হইতে কিছু Phenolpthalin ক্রয় করিয়া আনিয়া এক বোতল জলের মধ্যে এক চামচ আন্দাজ ঢালিয়া দিতে হয়। অতঃপর খুব Strong ammonia কয়েক ফোটা ইহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। ইহাতে বোতলের জল লাল হইয়া যাইবে। যদি খুব গাঢ় লাল করিতে হয় তবে আরও একটু Phenolpthalin মিশ্রিত করা প্রয়োজন। এই রূপে দুইটি জিনিষ মিশ্রিত করিয়া তাড়াতাড়ি বোতলের মুখে কর্ক আঁটিয়া দিতে হয়—যেন ammonia বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যাইতে না পারে। এই Solution কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করিলে প্রথমতঃ গাঢ় লাল রং ধারণ করিবে; কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া এই রক্তিমাভা কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হইবে।

—চারি—

কেরোসিন তেলের নূতন ব্যবহার

বাজারে অনেক রকম কেরোসিন তেল পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে কেরোসিন—যেমন কবরা ব্রাণ্ড কেরোসিন—তাহাকেও নানা কাজে লাগাইতে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে কয়েক ফোটা Oil Citronella দ্বারা ইহার দুর্গন্ধ দূর করিতে হয়। অতঃপর এই তেলকে বোতলে পুরিয়া একটি নূতন জিনিষ রূপে চালানো যায়। Amyl Acctate দ্বারাও কেরোসিনের দুর্গন্ধ দূর করা যাইতে পারে।

এই জিনিষ নিম্ন লিখিত কাজে ব্যবহার করা যায় :—

(ক) ময়লা কাপড় পরিষ্কার করা :— এক বাল্‌তি জলের মধ্যে ময়লা কাপড় এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এই জলে এক চামচা উপরোক্ত জিনিষ (ইহাকে যে কোন একটা নাম দিয়া বাজারে চালান যাইতে পারে।) মিশাইয়া দিতে হয়। পর দিন অতি অল্প আয়াসে খুব কম সাবান অথবা সোডা দ্বারা এই কাপড় পরিষ্কার করা যায়।

(খ) অপরিস্কৃত ধাতুর দ্রব্য পরিষ্কার করা :—উপরোক্ত জিনিষের মধ্যে এক টুকরা নেকড়া ভিজাইয়া লইয়া সেই নেকড়া দ্বারা ধাতু নির্ম্মিত জিনিষটি ঘসিলে অতি সহজে তাহার ময়লা উঠিয়া যায় এবং তাহার চাকচিক্য বিকাশ হয়।

নিত্য প্রয়োজনীয় বাসন এবং রন্ধনের আসবাব পত্রাদি ইহার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম রূপে পরিষ্কৃত হইতে পারে।

কাজের কথা

শিল্প-প্রসঙ্গ

বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় কৃষিকর্ম্ম এবং ব্যবসা বাণিজ্য।

আমরা আমাদের ব্যবহারের জন্য কালী কিনিয়া থাকি খুচরা কিনিতে হইলে পয়সায় ৩।৪ বড়ির অধিক কালী পাওয়া যায় না। কিন্তু মাত্র ৩।৪ পয়সা ব্যয়ে পাইন্ট কালী প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। পাঠশালায় পড়িবার কালীন আমরা এই কালী প্রস্তুত করিতাম। আমরা হরিতকী বহড়া আমলকী ও টৈরী দ্বারা কালী প্রস্তুত করিতাম। প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া হইল। উপরোক্ত দ্রব্য গুলি সহ কয়েক খণ্ড পুরাতন লোহা ৩ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে অগ্নিতে জাল দিলে উত্তম কালী প্রস্তুত হয়। এই কালী দ্বারা লিখিলে কাগজ নষ্ট হইলেও লেখা অস্পষ্ট হয় না। এই কালীতে অল্প মাত্র হীরাকস দিলে কালী আরও গাঢ় হয়।

অনেকের নস্য লইবার অভ্যাস আছে। এই নস্য নিজেই প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

প্রথমে তামাক পাতা মিহি করিয়া গুড়া করিতে হয়। পরে কোন সুগন্ধি দ্রব্যে ভিজাইয়া শুষ্ক করিতে হয়। প্রথমে ২।৩ বার চালুনীতে চালিয়া লইতে হইবে।

এই নস্য প্রস্তুত করিয়া ইহার ব্যবসায় ও করা যাইতে পারে। এই ব্যবসায় করিলে খুব লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

সুবাসিত নারিকেল তৈল প্রস্তুত করিয়াও ইহার ব্যবসায় করা যাইতে পারে। একসের নারিকেল তৈলে গোলাপী আতর ৮০ ফোটা মিশ্রিত করিলে সুবাসিত নারিকেল তৈল প্রস্তুত হইবে।

এইরূপে চামেলী, তিল বা বাদাম তৈলকেও সুবাসিত করা যায়।

কাপড় কাচা সাবানও অল্প পরিশ্রমে প্রস্তুত করা যায়।

সাজিমাটি ১২ সের, নারিকেল তৈল ৩ সের একত্রে মৃদু অগ্নির উত্তাপে জাল দিয়া ঘন হইলে নামাইয়া অল্প সোডার গুড়া মিশ্রিত করিতে হয়। ইচ্ছানুসারে যে কোন ছাঁচে ঢালিয়া নিলে হয়।

আমার মনে হয় কোন যুবক যদি এই কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন তবে তিনি মাসিক ন্যূনপক্ষে ৪০।৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

পরের দাসত্ব করে শতমুদ্রা পাওয়ার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা করে ৪০।৫০৲ টাকা রোজগার করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

শ্রীসুধীর কুমার নন্দী মজুমদার

মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের অবস্থা

(১)

আজকাল বাঙ্গলার মফঃস্বলে ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি এদেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ উপযুক্ত ব্যাঙ্ক না থাকিলে বর্ত্তমান যুগের ব্যবসা বাণিজ্য কিছুতেই চলিতে পারে না। বলিতে গেলে ব্যাঙ্কই বড় বড় কারবারের মেরুদণ্ড। বিপদে আপদে এই ব্যাঙ্কই অর্থ সাহায্য করিয়া বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যকে বাঁচাইয়া রাখে।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বাঙ্গলার মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস গুলির দ্বারা প্রকৃত ব্যাঙ্কের কার্য্য সব সময়ে সম্পন্ন হয় না এবং দেশের শিল্প বাণিজ্যের সহায়তা কদাচিৎ হয়। অন্ততঃ স্বীকার করিতে হইবেই যে, অধিকাংশ মফঃস্বল ব্যাঙ্কেরই প্রধান কাজ গহনা অথবা জমিদারী বন্ধক রাখিয়া টাকা দাদন করা। এই অভিযোগ গুলিকে হয়তঃ বাঙ্গলার মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ ক্ষুব্ধ হইবেন। কিন্তু ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এখন সকল দিক ধীরভাবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি দৈনিক কাগজ গুলিতে মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক সম্পর্কে কতিপয় গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম কথা এই যে, অধিকাংশ মফঃস্বল ব্যাঙ্কেরই আর্থিক সচ্ছলতার অভাব। ইহার অর্থ এই নয় যে এই সমস্ত ব্যাঙ্ক নিতান্ত অভাবগ্রস্ত। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের সম্পত্তি কম নহে। ইহাদের

কর্তৃত্বাধীনে যে সকল বিষয় সম্পত্তি আছে তাহার হিসাব লইলে অবশ্য নিরাশ হইবার কোনই কারণ থাকে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নহে।

আসলে ব্যাঙ্ক ব্যবসা হইল—নগদ টাকার ব্যবসা। এই ব্যবসায়ে যে যত বেশী নগদ টাকা আদান প্রদান করিতে পারিবেন তাঁহারই কৃতিত্বের পরিমাণ তত বেশী। তাগিদ আসিবা মাত্র যে ব্যাঙ্ক হাজার হাজার—এমন কি, লক্ষ লক্ষ টাকা মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহির করিয়া দিতে পারে তাহারই সুনাম (credit) রক্ষা হয়। এই মাপ কাঠি সম্মুখে রাখিয়া বাঙ্গলার মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, এইরূপ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অর্থ সামর্থ্য খুব বেশী সংখ্যক মফঃস্বল ব্যাঙ্কের নাই।

আমরা পূর্ব্ব বঙ্গের কোনও বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের কথা জানি। সেই ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্বাধীন স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি সম্পত্তি) খুব বেশী। হিসাব করিলে এই সকল সম্পত্তির পরিমাণ বোধহয় ব্যাঙ্কের মূলধন এবং আমানতী টাকার অপেক্ষা ২০ গুণেরও বেশী হইবে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কের অবস্থা কাহিল—কিম্বা দেউলিয়াগ্রস্থ এমন কথা কে বলিতে পারে, অথচ মেয়াদ মাফিক আমানত কারীরা যদি টাকা উঠাইতে আসে তবে তাহাদের পক্ষে সেই টাকা চাহিবামাত্র ফেরৎ দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

ঐ ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ এখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ তাঁহাদের হাতে প্রচুর নগদ টাকা নাই; যথেষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ ফাণ্ড নাই এবং এসময়ে প্রচুর পরিমাণে আমানতী টাকা পাইবারও উপায় নাই। দেশের অবস্থা সকল বৎসর সমান থাকে না। দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, অজন্মা হয় এবং তাহার ফলে নিদারুণ অর্থাভাব হয়। এরূপ অনৈসর্গিক অবস্থা উৎপন্ন হইলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের অবস্থাও গুরুতর হইয়া পড়ে। কারণ একদিক দিয়া যেমন আমানতের টাকা প্রচুর পরিমাণে আসে না অপর দিক দিয়া তেমনি পুরাতন আমানত কারীরা টাকা তুলিয়া লইবার জন্ম ব্যগ্র হয়। আবার দাদন দেওয়া টাকা বা সুদও আদায় হয় না। এই যে টাকার চাহিদা—তাহা যথা সময়ে মিটাইতে না পারিলে ব্যাঙ্কের সুনাম নষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, এই সুনাম (credit) একবার নষ্ট হইলে ব্যাঙ্ক পরিচালনা একরূপ দুষ্কর হইয়া উঠে। পরিচালকবর্গ তখন ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অবস্থায় পতিত হন।

এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ম তখন আপ্রাণ চেষ্টা চলিতে থাকে। কোন মতে মান বাঁচাইবার জন্ম বিপন্ন ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তারা অত্যুচ্চ হারে সুদ দিয়া টাকা ধার করিতেও ইতস্ততঃ করেন না। সাধারণতঃ শতকরা পাঁচ টাকা হইতে ছয় টাকা সুদে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা টাকা ধার করেন; নিতান্ত নিরুপায় হইলে শতকরা ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক পরিচালকেরা তাহারও উপরে গিয়াছেন। আমরা জানি যে, চাহিদা মিটাইতে না পারিয়া একান্ত বিপন্ন হইয়া মফঃস্বলের কোনও বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ শতকরা ১২৲ টাকা সুদ দিয়া পর্য্যন্ত আমানত গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এত উচ্চ সুদে টাকা ধার করিয়া তাহারা আবার লাভ করিবেন কিরূপে? অথচ উপায় নাই; ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও টাকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ইহাতে অবশ্য সাময়িক

ভাবে মুখ রক্ষা হইতে পারে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের অবস্থা কাহিল হইবেই হইবে।

প্রচুর সম্পত্তি হাতে থাকিতেও মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলি অর্থাভাবে পড়েন কেন—তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই সম্পর্কে অনেকে অনেক অভিযোগের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি অভিযোগ এই হইল যে, মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলি আজকাল প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় করেন না। তাঁহারা যেভাবে টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা করেন তাহা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকূল নহে। ইংরাজীতে যাহাকে quick debt and slow assets বলে—মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলি তাহাতেই বিব্রত হইয়াছেন। কথাটা আর একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সমস্ত ব্যাঙ্কের অধীনে প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি আছে। ইহার অধিকাংশই জমিদারী। বাঙ্গলা দেশের জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারাই জানেন যে, জমিদারী করা সহজ ব্যাপার নহে। বাঙ্গালীর প্রিয় কবি রামপ্রসাদ সাধে বলেন নাই—"চাইনা মা তোর জমিদারী আমায় করে দাও ভিখারী।" অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে জমিদারী করা সাধের জিনিষ নহে। প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া নিজের ঠাট্ বজায় রাখা এবং সরকারী রাজস্ব প্রদান করা কঠিন ব্যাপার।

প্রসঙ্গ ক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা মনে পড়িল। অনেকে বলেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করিয়া বাঙ্গলার জমিদারগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক দিক। ইহার আর একটি দিকও আছে। বলিতে গেলে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বাঙ্গলার বিশিষ্ট বনিয়াদী জমিদারগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। অনেকেই এখনও ঋণের দায়ে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার কারণ কি ?

সরকারী রাজস্ব যথা সময়ে প্রদান করিতে হয়। অথচ প্রজার নিকট হইতে প্রতিবৎসর যথা সময়ে খাজনা আদায় হয় না। আইন করিয়া সরকার পক্ষ তাহার কাজের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। যখন কোম্পানীর হাতে জমিদারী পরিচালনার ভার ছিল তখন ইংরাজেরা ইহার গলদ ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, কোম্পানীর অবস্থা তখন কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। অংশীদারগণের নিকট হইতে পাওনা মিটাইবার জন্য ঘন ঘন তাগিদ আসিতেছিল অথচ কোম্পানীর হাতে নগদ টাকা বলিতে কিছুই ছিল না। এই অবস্থায় বাধ্য হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়া খাজনা আদায়ের হাঙ্গামা হইতে অব্যাহতি পাইয়া ছিলেন। প্রধানতঃ ঐ কারণেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার ফলে কোম্পানী অনেক হাঙ্গামা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। জমিদারগণের নিকট হইতে রীতিমত প্রতি বৎসর খাজনা আদায় হয় ; না হইলে সম্পত্তি নীলাম করিয়া তাঁহারা প্রাপ্য আদায় করিয়া লন। কিন্তু বেচারী জমিদারগণ তাহা পারেন না। দেশে দুর্ভিক্ষ ও অজন্মা প্রভৃতি হইলে প্রজারা খাজনা দিতে পারে না—সরকারপক্ষকে তখনও যথারীতি রাজস্ব প্রদান করিতে জমিদারগণ বাধ্য। তারপর দেশের অবস্থা যখন ভাল থাকে তখনও সমস্ত

প্রজা যথারীতি খাজনা প্রদান করে না। ইহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার জন্য মামলা মোকদ্দমা করিতে হয়। তাহাতে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়—তথাপি টাকা হাতে আসে না। এই অবস্থায় বিপন্ন জমিদার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করেন এবং সেই অর্থ দ্বারাই সরকারী রাজস্ব মিটাইয়া দেন।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়—মফঃস্বলের ব্যাঙ্কসমূহ এই শ্রেণীর জমিদারী সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা প্রদান করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, পাঁচ হাজার নগদ টাকা দিয়া ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি বন্ধক রাখা খুবই লাভজনক ব্যাপার। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সকল স্থলে সম্ভবপর হয় না।

জমিদারের অবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহারা নগদ টাকা দিয়া সম্পত্তি ফিরাইয়া লইতে পারেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া আরও কিছু টাকা দিয়া ব্যাঙ্কগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। ব্যাঙ্ক পরিচালকেরা তখন জমিদার হইয়া বসেন। প্রথমতঃ ইহারা মনে করেন যে, সুশৃঙ্খলার সহিত জমিদারী চালাইয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হইবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের লাভ হওয়া দূরে থাকুক—নগদ টাকার অভাব আরও প্রবল হইয়া উঠে। তাই আমরা আজকাল দেখিতেছি—মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সমূহের মধ্যে অনেকগুলিই নগদ টাকার অভাবে জড়সড়; জমিদারগণের যে অবস্থা, মফঃস্বল ব্যাঙ্কেরও সেই অবস্থা হইয়াছে! যথার্থ ব্যাঙ্ক ব্যবসা না করিয়া জমি বন্ধক রাখার ব্যবসা করাই এই দুর্দ্দশার কারণ। তাই কেহ কেহ অভিযোগ করিয়াছেন যে মফঃস্বলে অধিকাংশ ব্যাঙ্ক এখন প্রকৃতপক্ষে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land mortgage Bank) হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

[১৯৩০ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

CRUDE ASBESTOS

(S—119) যাহারা Crude Asbestos and Asbestos Powder ক্রয় করেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বাঙ্গালোর হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

ধুনা

(S—120) দক্ষিণ ভারতের ভিজিয়ানাগ্রামের (Vizianagram) কোনও ফার্ম ধুনা ক্রয়কারীদের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

MANGANESE DIOXIDE

(S—121) মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বাঙ্গালোরের কোনও ফার্ম, Manganese Dioxide ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়া পত্র দিয়াছেন।

S·P.—৬

OX-GALL (গোরচনা)

(S - 122) পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত শিয়ালকোটের কোন বড় কারবারী, ox-gall অর্থাৎ গোরচনা ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

YELLOW OCHRE

(S - 123) লণ্ডনের কোনও ফার্ম উৎকৃষ্ট yellow ochre সরবরাহকারীদের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

[১৯৩০ সালের ১৬ জানুয়ারী তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

CORUNDUM

(S—124) corundum ক্রয়কারীর সন্ধান চাহিয়া মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

PEEPUL SEEDS

(S—125) আসামের ধরমতুল (Dharamtul) হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র লিখিয়া peepul seeds রপ্তানীকারী ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহিয়াছেন। peepulকে দেশীয় ভাষায়, পিপুল, বলে।

ZEDOARY ROOT

(S—126) Zedoary Root অর্থাৎ শটী ক্রয়কারীদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য রংপুর (বাঙ্গলা) হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

[১৯৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারী ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

ANTIMONY ORE Etc.

(S—127) নিম্নলিখিত জিনিষগুলি যাঁহারা সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া করাচীর কোনও কারবারী পত্র দিয়াছেন। যথা:— Antimony ore, Arsenic ore, Lead ore, Bismuth ore, Chrome ore, Iron ore, Copper ore, Manganese ore, Silver ore, Zinc ore, Tungsten ore এবং Uranium ore.

আলকুশী

(S—128) যাহারা বিদেশে আলকুশী (cowhage) চালান দেওয়ার ব্যবসা করেন তাহাদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতার কোনও বড় ফার্ম্ম পত্র দিয়াছেন।

MAHUA MEAL

(S—129) কানপুরের কোনও ফার্ম্ম লিখিয়াছেন যে, মহুয়া খোল (Mahua meal) যাঁহারা ক্রয় করেন তাঁহাদের সন্ধান জানিতে পারিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

PINE JAR

(S—130) Pine Jar ক্রয়কারীদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতার কোনও ফার্ম্ম উৎসুক হইয়াছেন।

[১৯৩০ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

COPPER PYRITES and CALCITE

(S—131) যাঁহারা Copper Pyrites and calcite ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া গয়া হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

THYMOL CRYSTALS

(S—132) ভারতবর্ষে যে সকল শিল্পী Thymol Crystals প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতার কোনও ফার্ম্ম পত্র দিয়াছেন।

(S—133) নিম্নলিখিত জিনিষগুলি যাঁহারা সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পত্র লিখিয়াছেন। যথা:— Welfram ore, Scheelite and Beryl.

বিশ্বাসী কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী অংশী চাই।

মহাশয়

আপনি এই line এ বহুদিবস আছেন। আমার কোন রকম অল্প মূলধনের ব্যবসা করিবার ইচ্ছা আছে। যদি আপনার হাতে ভদ্রবংশীয় পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী লোক থাকে এবং যদি ঐ রকম কয়েকজন লোকের খবর দিতেন তাহা হইলে বাধিত হইব এবং তাহাদিগকে অংশীদার করিয়া লইতে পারি।

আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রের পাঠক-দিগের মধ্যে অনেকে হয় ত অনেক রকম ব্যবসা জানেন; কিন্তু মূলধনের অভাবে তাঁহারা কিছু কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। ঐরূপ বিশ্বাসী পরিশ্রমী ও ভদ্র বংশীয় লোক যদি আপনার নিজের জানা থাকে, আমাকে recommend করিলে তাহাদিগের সহিত আমি কোন কার্য্যে নামিতে পারি। যে কোন লাভের ব্যবসা জানা থাকিলে চলিতে পারে। প্রথমে অল্প মূলধনে নামিয়া ক্রমে ক্রমে লাভ দেখিলে টাকা দিব।

(১) মফঃস্বল হইতে মাল কিনিয়া কলিকাতায় বিক্রি করা, অথবা কলিকাতা হইতে মাল কিনিয়া মফঃস্বলে বিক্রয় করা

(২) order supply কার্য্য

(৩) দ্রব্য প্রস্তুত করা manufacturing industry ইত্যাদি যে কোন ব্যবসা তাহাদের জানা আছে এরূপ লোক যদি থাকে, তবে আমাকে জানাইবেন।

ইচ্ছা করিলে এই পত্র ভাল করিয়া লিখিয়া আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রে ছাপাইতে পারেন।

Box no 101
c|o Manager,
Byabosha-o-Banijya office
Calcutta

কাঁচামালের খরিদ্দার

"ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।
মহাশয়

আপনার পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ নিম্ন লিখিত দ্রব্য বেশী পরিমাণে এখানে পাঠাইতে পারেন অথবা কেহ যদি ক্রয় করেন তাহা হইলে আমাকে পত্র লিখিলে বাধিত হইব :—

সিমুল তুলা, মোম, আমসত্ত্ব, অনন্তমূল, সিমুল মূল ইত্যাদি ঔষধের গাছ গাছড়া, পোস্তদানা, তেঁতুল, হরীতকী, মউয়া, মৃগনাভি, হিং, ভীমসেন কর্পূর, শীলাযতু, গোরোচনা, মধু ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবসায়ের দ্রব্য।*

শ্রীজীবন কৃষ্ণ ঘোষ।
৮।এ মারহাটা ডিচ্ লেন।
বাগবাজার, কলিকাতা।

---

* আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকেই মাঝে মাঝে মূলধনের বিষয়ে অথবা কোনও ধনী (capitalist) সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। এইরূপ কেহ যদি পত্র লেখকের প্রস্তাব মত কাজ করিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করতঃ আমাদিগের নিকট পত্র লিখিলে তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব। বলা বাহুল্য তাঁহাদের পত্র পাঠাইবার—পোষ্টেজ খামে লাগাইয়া দিবেন। সম্পাদক।

বীমার ব্যবসায়ে ভারতবাসী

বর্ত্তমান যুগে বীমার ব্যবসায় একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। নানা দেশের ব্যবসায়ীরা এই কারবার করিয়া প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। এই কারবারের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথম কথা এই যে, দৃশ্যতঃ লাভের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া মনে না হইলেও কার্য্যতঃ লাভের অংশ ক্রমবর্দ্ধমান—অর্থাৎ বীমার কারবারের লাভ একবার আরম্ভ হইলে তাহা ক্রমে বাড়িতেই থাকে; কোন অপ্রত্যাশিত দৈব দুর্য্যোগ বা বিপদ উপস্থিত না হইলে কারবারের ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা থাকে না। অন্যান্য ব্যবসায়ে এরূপ নিশ্চিত লাভের সম্ভাবনা কম।

দ্বিতীয়তঃ বীমার ব্যবসায় দ্বারা দেশের অপরাপর শিল্প বাণিজ্যকে সাহায্য করা যায়—ইহাতে দেশ অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হয়। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজকাল বীমার ব্যবসায়ের এতটা প্রসার হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বীমা ও ব্যাঙ্ক—এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই দেশের শিল্প বাণিজ্যকে প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাইয়া থাকে। আজকাল ব্যবসায়ের বাজারে দারুণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উন্নতিশীল জাতিরা পৃথিবীর বড় বড় বাজার গুলি হস্তগত করিবার জন্য বিপুল উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সময়ে বিরাট ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিলে অল্প মূল

ধনে কারবার করিয়া বিশেষ লাভবান হওয়া এক রূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। এই অবস্থায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু এত টাকা আসিবে কোথা হইতে? কাহারও বাড়ীতে টাকার গাছ নাই অথবা কুবেরের ভাণ্ডার নাই; তারপর আজ কাল আর কেহ মাটির নীচে টাকা পুতিয়াও রাখেন না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে দেশের যাহা কিছু বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় তৎসমস্তই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক অথবা বীমা কোম্পানীর হাতে গিয়া পৌঁছে। এই অবস্থায় কারবারের প্রয়োজনীয় মূলধন কেবল এই দুই প্রতিষ্ঠানই জোগাইতে পারে।

আজকাল যাঁহারা বাণিজ্য দ্বারা সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহারাও এরূপ ভাবেই ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসীর সে সুবিধা কোথায়? ভারতবাসীর নিজস্ব বীমার কারবার কতটি আছে? পদে পদে আমাদের দেশে মূলধনের অভাব হয় কেন? অথচ দেখিতে পাই যে, এ দেশেরই টাকা দ্বারা কারবার চালাইয়া বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা চক্ষের উপর ক্রোড়পতি হইয়া উঠিতেছেন। কেন এমন হয়? ব্যবসা বাণিজ্যে ভারতবাসী—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী আজ সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে কেন? এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

ভারতবর্ষে অবশ্য আজকাল বীমা কোম্পানীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই বিদেশী কোম্পানী। এই সমস্ত বিদেশী কোম্পানী দ্বারা আমাদের লাভ তো হয় না—বরং পদে পদে বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রতি বৎসর এই ভারতবর্ষ হইতে ৫০ কোটী টাকা প্রিমিয়াম বাবতে বিদেশী ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়। এই সমস্ত টাকা স্বদেশে লইয়া গিয়া বিদেশীরা স্ব স্ব ব্যবসা বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন করেন। এদেশীয় শিল্প বাণিজ্য এই টাকা দ্বারা কোন সাহায্যই পায় না। ফলে দেশীয় ব্যবসায়ে মূলধনের অভাব একরূপ chronic বা মজ্জাগত হইয়াই উঠিয়াছে। এরূপ ভাবে দেশের যাহা কিছু সঞ্চয় তৎসমস্তই যদি বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর পকেটস্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের জন্য টাকার অভাব হইবে না তো কি?

বীমার ব্যবসায়ে ভারতবাসীর স্থান কোথায় —তাহা একটু তলাইয়া দেখা যাউক। প্রকৃত পক্ষে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কোন বীমার কারবার ছিল না—১৮৭০ সালের পর হইতেই ভারতবর্ষে বীমার কারবার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যেও ভারতীয় বীমার কারবার কিন্তু আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। মোটের উপর ৬৬টি বীমার আফিস দেশীয় লোকের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০টি অগ্নি বীমা ও সামুদ্রিক বীমার আফিস আছে। অন্যান্য সভ্য দেশের সহিত তুলনায় ইহা কত অকিঞ্চিৎকর তাহা নিম্ন লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে:—

দেশের নাম	বীমার কারবারের মূলধনের পরিমাণ		
ভারতবর্ষ—	১৪	কোটী	টাকা
কানাডা—	৪৫০	"	"
জাপান—	৬০০	"	"
বৃটেন—	১৬০০	"	"
আমেরিকা—	৪৫০০	"	"

এই তো গেল বীমার কারবারের মূলধনের হিসাব। এখন কেবল জীবন বীমার পরিমাণ কোন দেশের কত তাহাই দেখা যাউক :—

যুক্তরাষ্ট্র—	২৭০০০	কোটী	টাকা
বৃটেন—	৩৩০০	"	"
কানাডা—	১৫০০	"	"
জাপান—	১০০০	"	"
জার্ম্মানী—	৭০০	"	"
হল্যাণ্ড—	৪০০	"	"
অষ্ট্রেলিয়া—	৬০০	"	"
ফ্রান্স—	৪০০	"	"
সুইজারল্যাণ্ড—	২০০	"	"
ইটালী—	১৫০	"	"
নরওয়ে—	১৫০	"	"
ডেনমার্ক—	১৫০	"	"
ব্রেজিল, আর্জেণ্টিনা, পেরু, চিলি প্রভৃতি—	১৫০	"	"
ভারতবর্ষ—	৬৩	"	"

ইহাতেই দেখা যায় যে, কি কারবারের মূলধনের দিক হইতে কি জীবন বীমার পরিমাণের দিক হইতে—ভারতবর্ষের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। সামান্ত হল্যাণ্ড—আমাদের একটি জেলা অপেক্ষাও আয়তনে ক্ষুদ্র। ইহার সহিত তুলনায় ভারতবর্ষকে একটা মহা মহাদেশ বলিলেই হয়। তথাপি হল্যাণ্ডের জীবন বীমার পরিমাণ ৪০০ কোটী এবং ভারতের জীবন বীমার পরিমাণ মাত্র ৬৩ কোটী টাকা। এই যে আকাশ পাতাল প্রভেদ এই প্রভেদই আমাদিগকে অাহারমের পথে লইয়া যাইতেছে।

তারপর মাথা পিছু জীবন বীমার হার কোন দেশে কিরূপ তাহার হিসাব দেখুন :—

আমেরিকা—	২০০০০	টাকা
কানাডা—	১৫০০	"
ইংলণ্ড—	৮০০	"
জাপান—	৪০০	"
ভারতবর্ষ—	২	"

এতদপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? বীমার ব্যবসায়ে ভারতবাসীর এই যে শোচনীয় দুরবস্থা তাহার আশু প্রতীকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বীমা আপিশ সমূহের কর্ম্ম কর্ত্তাদিগকে আমরা এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে বলি। এদেশে বীমার ক্ষেত্র যে কী বিরাট এবং ব্যাপক ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে এবং প্রচার ও প্রপাগণ্ডার (publicity and propagnda) সাহায্যে এই বিরাট ক্ষেত্রই হইতে যে কি অফুরন্ত বীমার কাজ সংগ্রহ করা যায় সেই কথা তাঁহাদিগকে আমরা একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি।

দেশী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য

হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের বিবরণী

বিগত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারতে প্রধানতঃ বাঙ্গলাদেশে যে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল তাহার স্পন্দন অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে। আর্থিক উন্নতি ব্যতীত যে রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভব নয় একথা দেশ বাসীগণ তখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিল। তাহারই ফলে নানা স্থানে কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

মানুষ যখন দৈবের ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া পড়ে, তখন তাহার পক্ষে ভবিষ্যতের ব্যাপার সংস্থান করা সুকঠিন। কখন যমরাজের দূত আপন কার্য্যে পার্শ্বে উপস্থিত হইবে এই চিন্তাই তাহার মনকে সর্ব্বদা ব্যাকুল রাখে। নিজের অকস্মাৎ মৃত্যুতে স্ত্রী পুত্র কন্যার অনসন—ইহার ব্যবস্থা কি? এই সমস্যা সমাধানের জন্যই জীবন বীমা। দৈবের কঠোরাঘাত সঞ্চয়ীর পরিবারেও সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া যায়, তবে এক বৎসর পরে মৃত্যু হইলে, থাকিত মাত্র ১২০০৲ টাকা, কিন্তু এইরূপ সঞ্চয়কারীর মৃত্যুতে বীমা কোম্পানী দিতে পারেন ৫০,০০০ টাকা! মানুষের ভবিষ্যত প্রথম হইতেই এরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না করিতে পারিলে তাহার স্নেহের শক্তি হৃদয়ের ক্ষেত্র কম্পিত্র হয়। এই সব বিষয় চিন্তা করিয়াই কতিপয় দেশ হিতৈষী ব্যক্তি ১৯০৭ সালে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি স্থাপন করেন।

২২ বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থান যে বিরূপ আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার গত ১৯২৮-২৯ সালের রিপোর্ট পাঠ করিলে সম্যক বোঝা যায়। এই বৎসর ১ কোটি ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা মূল্যের ৫২৮৪ খানা বীমাপত্র বা পলিসি প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মোট জীবনবীমার পরিমাণ ৩,৮৭,৫৭,৪৮৩৲ টাকা। আলোচ্য বর্ষে আদায়ী প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১৭,৫৫,৯১২৲ এবং সুদ ৪,৬০,৬৭০৲ সমস্ত খরচ বাদে বীমা তহবিলে যোগ হইয়াছে ৫,৪৬,২৫১৲। এখন মোট বীমা তহবিলের পরিমাণ ৮২,৩২,১০৩৲ টাকা। সোসাইটির সমস্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা।

গত বাৎসরিক সভায় ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণ কৃষ্ণ আচার্য্য যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে অনেকগুলি চিন্তনীয় বিষয় আছে। হিন্দুস্থানের দাদন প্রণালী বা Investment Policyর মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কলিকাতার দক্ষিণাংশে অনেক জমি ক্রয় করিয়া

সোসাইটি তাহার উন্নতি সাধণ করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সোসাইটির সাহায্যে অনেক মধ্যবিত্ত ব্যক্তি স্বগৃহ নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন। হিন্দুস্থানের দাদন প্রণালী দ্বারা অনেক শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও উপকৃত হইয়াছে। অন্যদিকে সোসাইটিও উচ্চহারে সুদ পাইয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছে। গত পঞ্চ বার্ষিক ভালুয়েসনে সাড়ে নয় লক্ষ টাকার উপর উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তাহার ফলে সোসাইটি মেয়াদী বীমায় (Endowment Assurance) হাজারে প্রতিবৎসর কুড়িটাকা ও আজীবন বীমায় (whole life assurance) হাজারে প্রতিবৎসর পনের টাকা লভ্যাংশ বা বোনাস্ দিতে সমর্থ হইয়াছে।

আর একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় যে, হিন্দুস্থান অতি কম খরচে কাজ চালাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট একচুয়েরী (Govt. Actuary) তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, মাত্র ৬টী দেশী কোম্পানী নির্দ্ধারিত ব্যয় হইতে কম খরচায় কার্য্য করিতেছেন; তন্মধ্যে হিন্দুস্থান অন্যতম।

হিন্দুস্থানের পলিসি বা বীমাপত্রের নিয়মাবলী অতি সুন্দর। সোসাইটি স্ত্রীলোকের বীমাও গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান স্ত্রী স্বাধীনতার দিনে স্ত্রীলোকদিগকেও নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিতে হইতেছে। হিন্দুস্থান তাঁহাদের জীবন বীমার ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীজাতীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

ভারতের প্রতি নগরে নগরে আজ হিন্দুস্থানের কাজ হইতেছে। সুদূর ব্রহ্মদেশ, সিংহল দ্বীপ, ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকাতেও কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়দ্বয়কে তাঁহাদের কর্ম্মদক্ষতার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা গাহিতাম
"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীন দুঃখিনী মা আমাদের, এর বেশী যে সাধ্য নাই।"

কিন্তু বীমা বিষয়ে মা এখন আর নিতান্ত দীন দুঃখিনী নহেন। হিন্দুস্থান এখন গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারে যে বীমা ব্যবসায়ে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশী প্রতিষ্ঠান হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

এই বার গত ৩০শে এপ্রিল ২৮ সালের ব্যালান্সসীটের সহিত বর্ত্তমান বৎসরের ব্যালান্সসীটের কয়েকটী বিষয় তুলনা করিয়া দেখাইতে চাই

সাল	প্রস্তাবিত পলিসির value বা মূল্য	গৃহীত পলিসী সমূহের value বা মূল্য	পলিসির সংখ্যা
১৯২৮	৮৩,৭৮,০০০	৬৯,৪৫,০০০	৩৭৮৬
১৮২৯	১,৩৮,১৭২৫০	১,০১,৩০,৭৫০	৫২৮৪

গত দুই বৎসরের দাবীর পরিমাণ।

	মোট দাবীর পরিমাণ	মৃত্যু জনিত দাবী	পলিসী mature হবার দরুণ দাবী
১৯২৮ সাল	৬,৩২,৪০৪	৬,৩১,০০৩	২,৯৮,৫৯৯
১৯২৯ সাল	৫,৫৩,০৫৩	৯,০২,৫৩৯	৩,৪৯,৪৭৮

২৯ সালের প্রিমিয়ামের মোট আয়—১৭, ৫৫, ৯১২ ।৴৹ আনা—হিন্দুস্থানের পর পর এই রূপ উন্নতি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমরা বহুবার বলিয়াছি বাঙ্গালীর ন্যায় স্বজাতি নিন্দুক এবং আত্মঘাতী লোক ভারতের আর কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ এবং আক্রোশের ফলে তাহারা তাহাদের জাতীয় অনুষ্ঠান গুলির ধ্বংস সাধন করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রমাণ এই যে হিন্দুস্থানের অবস্থা আজ আশা তীত ভাবে উন্নত হইলেও তাহার কাজের পরিমাণ বাঙ্গলার বাহির হইতেই বেশী আসে, বাঙ্গলায় বেশী হয় না; অথচ বাংলা দেশে তদনুপাতে তাহার কাজের সংখ্যাও পরিমাণ ঢের বেশী হওয়া উচিত ছিল।

এ সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী এজেন্টগণ সচরাচর বীমা কারীদিগের চোখে যে ধূলা দিয়া থাকে আজ সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি। হিন্দু স্থানের সৃষ্টি হইতে আমরা এই কোম্পানীর অংশী দার এবং নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে আমরা ইহার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে গভীর আশা পোষণ করিয়া আসিয়াছি। স্বদেশী যুগে একদিকে যেমন বঙ্গলক্ষ্মী ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের আশাও আকাঙ্খাকে মূর্ত্তি দিয়াছিল, তেমনি বীমা জগতে ন্যাশন্যাল এবং হিন্দুস্থান যখন জন্মগ্রহণ করিল তখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বুকের রক্ত দিয়া তাহাদিগকে পালন ও পোষণ করিয়াছিল। গভীর দুঃখও পরিতাপের বিষয় এই যে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর বুকের রক্ত দিয়া গড়া পাকা বাঙ্গালীর অমর কীর্ত্তি এই ন্যাশন্যাল ধীরে ধীরে বোম্বাইয়ের লোকদিগের করতলগত হইয়া পড়িয়াছে; কারণ এই কোম্পানীর অধিকাংশ সেয়ার বাঙ্গালীদের হাত হইতে অবাঙ্গালীগণ কিনিয়া নিয়াছে। কেবল স্বদেশী যুগের বাঙ্গালীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান একমাত্র বাঙ্গালীদেরই প্রতিষ্ঠান রূপে দণ্ডায়মান আছে।

যাক, যে কথা বলিতেছিলাম, এজেন্টরা সাধারণতঃ বীমাকারীদিগকে ধাপ্‌পা দেয় (bluffing) যে হিন্দুস্থান বহুকাল পূর্ব্বে Combined Policy নামক যে scheme করিয়াছিল তাহার ফলে তাহাদের প্রায় এক কোটী টাকার দেনা আছে। যদিও এই Combined পলিসি বহুকাল হইল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আর এই পলিসি ইসু করা হয়না, তথাপি যে ক্রোড় টাকা আন্দাজ দেনা বা liability হিন্দুস্থানের ঘাড়ে চাপিয়া গিয়াছে তাহা জগদ্দল পাথরের মত হিন্দুস্থানের বুকে বসিয়াছে, সুতরাং বীমাকারী সাবধান!

আমরা প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি যে combined policy বাবদ হিন্দুস্থানের দেনার পরিমাণ ক্রোড় টাকা না হইলেও তাহার কাছাকাছি ছিল সন্দেহ নাই। **কিন্তু যাহা পূর্ব্বে ছিল এক্ষণে তাহা নাই, এই সত্য কথাটা এজেন্টগণ জনসাধারণের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে, এইটাই মজার কথা।**

এই দেনার পরিমাণ ঠিক কত ছিল তাহার অঙ্ক এখন আমাদের সম্মুখে নাই। কিন্তু Mr. L. E. Clinton, Actuary কর্ত্তৃক প্রকাশিত হিন্দুস্থানের গত ভ্যালুয়েসনের রিপোর্টে প্রকাশিত এই combined পলিসী বাবদ দেনার অঙ্কের পরিমাণাদি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে।

তাহা হইতে দেখাইব যে সাধারণতঃ এজেন্টগণ বীমাকারীদিগকে যে bluff বা ধাপ্পা দেয় তাহা শুধু মিথ্যা নহে, একেবারে অসাধুতা পূর্ণ dishonesty.

পরলোকগত ধুরন্ধর অম্বিকাউকীল মহাশয় প্রমুখ ডিরেক্টরদিগের কৃত এই combined পলিসির ভুল যখন বীমাবিশারদ actuary গণ ধরিয়া দিলেন তখনই এই scheme বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং সেই হইতে এই বিভাগের বীমার দেনা একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিবার চেষ্টা ও ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

এই দেনা ১৯১৭ সালের পূর্ব্বে কি পরিমাণ মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার অঙ্ক আমাদের নিকট নাই। কিন্তু পাঁচ বৎসর অন্তর কোম্পানীর যে valuation হইয়াছে তাহার অঙ্ক আমাদের সম্মুখে আছে। অর্থাৎ ১৯১৭, ১৯২২ এবং ১৯২৭ সালের valuation এর অঙ্কগুলি আমাদের কাছে আছে। তাহা এইখানে দেওয়া হইল।

Combined পলিসী বাবদ হিন্দুস্থানের দেনার পরিমাণ গত দশ বৎসরে যেরূপ হারে কমিয়া আসিয়াছে তাহার বিবরণ।

তারিখ ৩০শে এপ্রেল	যতগুলি পলিসি মজুত ছিল	এই পলিসির জন্য হিন্দুস্থানের দেনার পরিমাণ
১৯১৭ সাল	৮১৯ খানি	৩৬,৯৭,৫৯৫ টাকা
ঐ ১৯২২ সাল	৬২৬ খানি	৬,৬০,১০০ টাকা
ঐ ১৯২৭ সাল	৪১৮ খানি	৪,১৮,২০০ টাকা

অর্থাৎ সাবেক আমোলের ডিরেক্টরদের ভ্রমবশতঃ একটা নূতন স্কীমের জন্য হিন্দুস্থানের ক্রোড় টাকা দেনা (দুর্নামকারীদের কথায় বলিলাম) হইয়া থাকিলেও Actuaryর রিপোর্ট হইতে প্রকাশ যে সেই দেনার টাকা মুছিয়া যাইতে যাইতে উহা ১৯২৭ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে কমিয়া ৪, ১৮, ২০০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে গত ২২ সালের ভ্যালুয়েশনে এই পলিশির জন্য হিন্দুস্থানের deficit ছিল ৩,৫৮, ৫৬৪ টাকা; কিন্তু গত ২৭ সালের ভ্যালুয়েশনে এই deficit কমিয়া এখন মোট ২,৭৮, ২১৩ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই deficit সম্বন্ধে Actuaryর নিজের উক্তি উদ্ধার করতঃ আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন:—The resources of the Shareholders appear to be adequate to meet the liabilities as they will arrise. An annual payment of 45, 000 during the next eight years should suffice for the purpose.

অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সেয়ার হোল্ডারদের যে সম্পত্তি আছে তাহা এই deficit মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। বছরে ৪৫০০০ টাকা করিয়া দিয়া গেলেই আট বছরের মধ্যে এই combined পলিসিকৃত দেনা নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে। যাহাদের বুদ্ধি চাতুর্য্যে এবং কর্ম্মকুশলতায় combined পলিসি জনিত দেনার পরিমাণ ক্রোড় টাকা হইতে ২৭ সালে কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে অথচ সে জন্য কোথায়ও কোনও রকম "হৈ, হৈ, রৈ, রৈ," বা "গেল গেল" করিতে হয় নাই, তাহারা যে অবলীলা ক্রমে এই দেনার সামান্য অবশিষ্ট টাকাগুলি দিয়া দিবার সঙ্গতি ও সামর্থ্য রাখে তাহা হিন্দুস্থানের অতি বড় শত্রুকেও আজ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণ fact is stranger than fiction অর্থাৎ নভেলের কাহিনীর চেয়েও সত্য বেশী বিস্ময়কর।

আশা করি বাঙ্গালী বীমাকারীগণ আমাদিগের এই উক্তি ধীর ভাবে বিচার করিয়া যাচাইয়া বাজাইয়া নিবেন।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ

এদেশের কৃষিকার্য্য প্রণালীর বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ করার জন্য এত বড় একটা রয়াল কমিশন বসিয়া গেল এবং তাহার নির্দ্ধারণ ও পরামর্শানুযায়ী স্থায়ী কমিটিও গঠিত হইল, যাহার মারফতে প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হইতে শুরু হইয়াছে, অথচ আমরা এসব দেখিয়াও যেন দেখিতেছি না, শুনিয়াও যেন শুনিতেছি না। জনমতের চাপে পড়িয়া গভর্ণমেণ্ট যখন কোনও কমিশন বসান, তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে জনমতকে ঠাণ্ডা করার জন্যই গভর্ণমেণ্ট কমিশন বসাইলেন। পরে সেই কমিশন যে সকল নির্দ্ধারণ বা পরামর্শ দেন, তাহা সরকারী দপ্তরখানার তাকেই তোলা থাকে এবং বহু বৎসরের ধুলি সমাচ্ছন্ন রিপোর্ট গুলি পরিশেষে কীট বিশেষের খাদ্যে পরিণত হয়। এরূপ বহু কমিশনের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে—যাহার রিপোর্ট সরকারী দপ্তরে বস্তাবন্দী হইয়া পড়িয়া আছে—সে সব রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার কোনও কাজ আরম্ভ করেন নাই।

কিন্তু সরকার নিজে যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোনও কমিশন বসান, তখন সেই কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবামাত্র তদনুযায়ী কাজ করার জন্য তাড়া হুড়ো লাগিয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন Sadler Commission বসিল অমনি সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিভারসিটির আমূল সংস্কার আরম্ভ হইল। আরও কৃষি সম্বন্ধে যেমনই রয়াল কমিশন বসিল, অমনি রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই Agricultural research এর জন্য স্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়া গেল এবং তজ্জন্য বজেটেও কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়া গেল। চোখের সম্মুখে এই যে সব ওলট্ পালট্ হইতেছে, আমরা তাহার খবর রাখিলেও এই সকল সুবিধা এবং সন্ধানের কি কোনও সদ্ব্যবহার করিতেছি? আজ এই সকল কথা ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে।

* * *

কৃষি কাজটা যাহাদের হাতে ব্যাপক ভাবে পড়িয়া আছে তাহাদিগকে আমরা ভদ্র ভাষায় চাষী বলি। কিন্তু বৈঠকখানায় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে যখন গল্প গুজব করি, তখন এই চাষীদের প্রতি আমাদের মনোভাবটা নিতান্ত নগ্ন ভাবে বাহির হইয়া পড়ে। সেটা নিছক অবজ্ঞা এবং অনুকম্পার ভাব। তখন আমরা তাদের বলি "ব্যাটা ছেলে চাষা" "নাংলা চাষা," "নীরেট চাষা" এমনি আরও কত কিছু। কথাটা মিছে নয়। আমাদের দেশে চাষের কাজ যাদের হাতে ন্যস্ত আছে, তারা সত্য সত্যই নীরেট এবং নিরক্ষর। বাপদাদার আমল হইতে তাহারা যে প্রণালীতে চাষবাস করিয়া আসিতেছে তাই তারা জানে এবং বোঝে, নূতন কোনও চাষের প্রণালী, সারের কথা, বীজের নির্ব্বাচন কিম্বা মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণের কথা বলিলে তারা হা

করিয়া অবাক হইয়া থাকে এবং বোকেনা বলিয়াই কৃষি সংক্রান্ত সকল রকম সংস্কারের প্রস্তাবকেই অবিশ্বাস এবং সন্দেহের চোখে দেখে। অথচ মজা এই যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ বাস করার ফলে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার চাষীরা এক একর জমিতে যে পরিমাণ শস্য ফলাইয়া থাকে আমরা তাহার সিকিও ফলাইতে পারি না। তারা পেয়ারাকে বীচি শূন্য করিয়াছে, আনারসের আকার কাঁঠালের মত করিয়াছে,তাহার মধ্যে ভুষ্‌ড়ী নাই এবং খোসা চোখ্‌হীন করিয়া আনিয়াছে; একই গাছে আলু ও টম্যাটো ফলাইতেছে; এমনি করিয়া সমস্ত কৃষি কাজটাকে প্রতি নিয়ত বিজ্ঞান ও রসায়নের সাহায্যে একটা যাদু বিদ্যায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে।

* * *

আমাদের দেশেও ঠিক এই রূপ হইত—যদি এদেশের কৃষকেরাও পাশ্চাত্য দেশীয় কৃষকদের মত লেখাপড়া জানিত এবং কৃষি বিজ্ঞান ও কৃষি রসায়নের মূল সূত্র গুলি যদি তাদের জানা থাকিত। কিন্তু এই খানেই যে গোড়ায় গলদ। এদেশের চাষ বাস এবং কৃষি কাজ যাদের হাতে, তারা যে একেবারে নিরক্ষর; বিজ্ঞান এবং রসায়নের যে তারা কোনও ধার ধারে না, সুতরাং আজ ৩০ বৎসর যাবত উন্নত প্রণালীতে কৃষি কাজ করার জন্য যে চীৎকার, গোল গোল ও আর্তনাদ করা হইতেছে, তাহা যাহাদের কাণে পৌঁছিবার জন্য করা হইতেছে তাহারা একেবারে জন্মবধির এবং কুসংস্কারের তুলা দ্বারা কানের গহ্বর একেবারে বুঁজাইয়া দিয়াছে। সুতরাং এই অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী আন্দোলনের ফলেও বাংলার কৃষক কুল যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে।

* * *

কৃষি বিজ্ঞান, কৃষি রসায়ন এবং উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ বাস করার জন্য যে সকল পুস্তক এবং পুস্তিকা বাহির হয় তাহার পাঠক যাঁহারা, তাঁহারা জীবনে কখনও এক ছটাক জমি চাষ করেন না। তাঁহারা এ দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোক; চাকুরী, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী অথবা ব্যবসা তাঁহাদের পেশা; হলকর্ষণ বা চাষবাস তাঁহারা কখনও করেন নাই, সুতরাং এই সকল ব্যাপারে academie interest বা পুঁথিগত আলোচনা ভিন্ন অন্য কোনও real interest বা স্থায়ী স্বার্থ তাঁহাদের নাই। ফলে এই সকল literatrue বা পুস্তিকার ব্যবহার প্রকৃত চাষীরা করে না, করিতে পারে না এবং জানেও না; আর যাহারা করিতে পারে তাহারা নিজেরা চাষী নহে, সুতরাং এই সকল বিষয়ে academic interest লওয়া ছাড়া হাতে কলমে করিয়া দেখার তাহাদের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুবিধা বা অবসর নাই। এই সকল শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কাহারও কাহারও হয়ত খাসে কিছু জমি আছে; কিন্তু তাহার চাষবাস বর্গাদারেরাই করে এবং যাহা ফসল হয়, তাহা যথাসময়ে বর্গাদারের কাছ থেকে আদায় করিয়া নেওয়া ছাড়া আর কিছু করনীয় আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। প্রধানতঃ এই দুই কারণেই এদেশে আজিও পর্য্যন্ত বিজ্ঞান এবং রসায়ণের সাহায্যে ব্যাপকভাবে কোথাও কৃষিকার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

* * * *

কিন্তু সময় আসিয়াছে যখন ব্যাপকভাবে এবং বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে চাষবাস না করিলে আমাদের হাত হইতে কৃষিকার্য্যও বিদেশীয় হাতে চলিয়া যাইবে। চা'বাগান গুলির শতকরা প্রায় আশী ভাগই বিদেশীয়দিগের করায়ত্ত,নীল, তামাক,

ইক্ষুর বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলি বিদেশীরা হস্তগত করিয়াছে; কেবল small holding বা টুক্‌রা জমিগুলি চাষীদের হাতে আছে। রয়াল কমিশন ভারতবর্ষের কৃষি ব্যাপারে যে যুগান্তর আনয়ন করার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার সুযোগ এবং সুবিধার সদ্ব্যবহার করার জন্য ইতিমধ্যেই ইউ-রোপীয় Planter এবং Farmer দিগের মধ্যে যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকটী ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ফার্ম্ম ইতিমধ্যেই কলিকাতায় নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আম-দানী করতঃ তাহার demonstration অর্থাৎ কল চালনা প্রণালী প্রদর্শন এবং পুস্তিকাদি বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পাতি আমদানী কারকদিগের মধ্যে

1. Marshall & Sons
2. Martin & Co.
৩। The Russa Engineering works
৪। Vernal & Co.
৫। B. D. Berry & Co.

শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। আমাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলেই ইহারা সমুদয় যন্ত্রপাতির সচিত্র ক্যাটালগ মূল্য তালিকাদি সব পাঠাইয়া দেন, এবং কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের যন্ত্রাদি চালাইয়া তাহার কার্য্যকারিতা বুঝাইয়া দেন।

* * * *

বর্ত্তমান যুগে যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়া চাষবাস করিতে যাওয়া আর খালি হাতে লড়াই করিতে যাওয়া ঠিক একই কথা। আগে জনমজুরের মজুরী ছিল দৈনিক ৶৹,।৹ আনা; এখন তাহা বাড়িতে বাড়িতে ৮৹।৸৶৹ আনায় দাড়াইয়াছে এবং স্থল বিশেষে ১৲ টাকা ১।৹ দেও ক্ষেত খামারে কাজ করার লোক পাওয়া যায় না। ইহার কারণও আছে।

প্রথমতঃ খাদ্যদ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি থেকে আরম্ভ করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিষেরই দাম চ'ড়ে গেছে। সুতরাং আগে ৩।৪ আনা মজুরীতে যে দরিদ্র মজুরের সংসার চলে যেত, এখন তা'তে পেটের ভাতই জোগাড় হয় না। এই জন্য মজুরী দিন দিন বেড়েই চলেছে। এরূপ অবস্থায় বার আনা, চৌদ্দ আনা মজুরী দিয়ে জমি চাষবাস ক'রে কিছু লাভ করা ভদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃত কৃষিজীবি যারা, তারা হাতে হেতেড়ে কাজ, করে ব'লে জমি চাষ করা বা মজুরী বাবদ তা'দের কিছুই খরচ হয় না, সুতরাং তাদের চাষে সোণা ফলে। আর ভদ্রলোক যখন কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন, তখন হলচালনা থেকে আরম্ভ ক'রে জমি নিংড়ানো আগাছা মারা, জল দেওয়া প্রভৃতি যাবতীয় কাজ তাঁকে কুলীমজুর দিয়ে করাতে হয়, তাই চাষের খরচও যেমন বেড়ে যায় কাজও তেমনি ineffi-cient বা খারাপে হয়। ফলে ফসলও ভাল হয় না, তার দামও বাজারে অপরের চেয়ে কম মেলে; এবং ফসল উঠাইবার পড়তাও সাধারণ কৃষক-দিগের চেয়ে অনেক বেশী প'ড়ে যায়।

* * * *

এই সকল কারণে সকল সভ্য দেশে যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ বাস করার প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর বাজারে আপনাদের ক্ষেত্রজাত দ্রব্যাদির একচেটীয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হ'য়েছে, এবং এই সকল দেশের কৃষকেরা (farmers) যথেষ্ট ধনশালী হ'য়ে উঠেছে। আজ অষ্ট্রেলিয়ার গম এসে ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে; আকারে, স্বাদে এবং সস্তায় অষ্ট্রেলিয়ার গম ভার-

তীয় গমকে পরাস্ত ক'রেছে ব'লেই আজ অষ্ট্রেলিয়ার গম ভারতের বাজার দখল ক'রে নিচ্ছে। হাজার, দুইহাজার একর জমি নিয়ে সেখানকার কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্যে লিপ্ত হয় ব'লেই আজ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কৃষক নিজেরাও যেমন ধনশালী হয়েছে, পৃথিবীর বাজারও তেমনি দখল ক'রে নিচ্ছে।

* • • •

পৃথিবীর সর্ব্বত্র কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় লোকে দলে দলে বেশী মজুরীর লোভে কলে কাজ কর্ত্তে যায়; সুতরাং জমি চাষবাস করার জন্যে মজুর মেলা দিন দিন দুর্ঘট হ'য়ে উঠছে। যাদের পাওয়া যায় তাদের মজুরীও খুব বেশী, কারণ লোকের জোগান চেয়ে চাহিদা একদিকে যেমন বেশী, অপরদিকে তেমনি আবার সব জিনিষই মহার্ঘ্য হ'য়ে পড়ায় ইহারা মজুরীও বেশী চায়। একশত বিঘা জমি জল দিয়া ভিজাইতে হ'লে কিম্বা ইহার জল সেঁচিয়া ফেলিতে হ'লে যে পরিমাণ মজুরের দরকার, প্রথমতঃ সে পরিমাণ মজুর মেলানই কঠিন; দ্বিতীয়তঃ মিলিলেও, তাদের মজুরী বাবদ যে খরচ পড়ে, তাতে লাভ করা দুরূহ। অথচ সেই জমির কোণে একটা কুয়া খুঁড়ে তাতে পাম্প লাগিয়ে অয়েল ইঞ্জিনের সাহায্যে চালালে অতি সামান্য খরচায় দুদিনেই সমস্ত জমির উপর ছয় ইঞ্চি জল জমাইয়া লওয়া যায়। এইরূপ হল চালানো থেকে আরম্ভ ক'রে মাটীকাটা, জমিতে জল সেচ দেওয়া, শস্য বোনা, আঁচড়া দেওয়া, শস্য কাটা, শস্য মাড়া, ধান ভানা, চাল ছাটাই, গম পেষা, ডাল ভাঙ্গা, মাকাই ছাড়ানো ইত্যাদি যাবতীয় কাজ বর্ত্তমান যুগে ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কেবলমাত্র যন্ত্রের দ্বারাই দুই চারিজন লোকের সাহায্যে অতি সুচারুরূপে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হচ্ছে।

• • • •

এই সকল যন্ত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের পাওয়া যায়। অয়েল ইঞ্জিন একঘোড়া থেকে আরম্ভ করে উর্দ্ধে একশত বা ততোধিক অশ্বশক্তি যুক্ত পাওয়া যায়। হাজার হাজার বিঘা জমি একত্রে চাষবাস করার জন্য যেমন বিরাট আকারের অতিকায় যন্ত্রপাতি আছে, তেমনি Small holding বা ক্ষুদ্র জোতে দশবিঘা জমির উপযোগী অতি অল্প মূল্যের ছোট ছোট বহু যন্ত্রপাতিও আছে। ভদ্রঘরের ছেলেরা জনমজুরের সাহায্য ব্যতিরেকে এই সব ছোট কলের সাহায্যে আপন আপন জমি চাষবাস কোরতে পারেন। আমাদের নামোল্লেখ করতঃ নিম্নলিখিত স্থানে আপনাপন জোতের পরিমাণ এবং যে যে যন্ত্রের আবশ্যক তাহা লিখিয়া পাঠাইলে এই সকল কার্য্য সচিত্র বিবরণ পত্র, কার্য্য প্রণালী এবং মূল্যাদির বিবরণ পাঠাইয়া থাকেন।

1. Marshall & Sons Clive Street.
2. Martin & Co Clive Street.
3. B. D. Berry & Co Clive Street.
4. A. N. Hussunally & Co
   28 Strand Road,
5. Gopaldas & Co Ltd.

আশা করি দেশের শিক্ষিত যুবকগণ এ বিষয়ে অনুসন্ধানাদি লইয়া ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

সমালোচনা

যশোহরে আর একটী চিরুণীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমান কিরণ চন্দ্র দত্ত আমাদের পরম স্নেহভাজন। তিনি বি, এল পাশ করিয়া যশোহরে Bar Join করিয়া ছিলেন অর্থাৎ সেখানকার উকীল গোষ্ঠীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন; কিন্তু ওকালতীতে তাঁহার মন বসিল না; তাই তিনি জার্ম্মাণী হইতে up-to-date machineries আনাইয়া প্রথম শ্রেণীর চিরুণীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই কারখানার প্রস্তুত কয়েকখানি চিরুণী আমরা উপহার পাইয়াছি। দামে কারুকার্য্যে এবং finish এর দিক দিয়া এই চিরুণী পৃথিবীর যে কোনও চিরুণীর সহিত টক্কর দিতে পারে। যাঁহারা সস্তায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশী চিরুণীর এজেন্সি লইতে চান তাঁহারা Jessore combs & celluloid works এর পরিচালক শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত বি, এল, বসন্ত কুটীর, যশোহর—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে নমুনা এবং এজেন্সী rates আদি সব পাইবেন।

• • • •

ইহাদের কারখানার সমুদয় কল কব্জা একেবারে নূতন এবং up-to-date যোল রকমের ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন মত চিরুণী তৈয়ারী হয়; এবং প্রত্যহ এক হাজার চিরুণী এখন তৈয়ারী হইতেছে। ক্রেতাগণ ইচ্ছা করিলে আপন আপন ডিজাইন মত চিরুণীর অর্ডার দিতে পারেন। ইহারা যে কোনও আকারের, যে কোনও ডিজাইনের চিরুণীতে যে কোনও মটো (Motto) খোদাই করিয়া দিতে পারেন। সাধারণ চিরুণী ছাড়া imitation pearl ও Ivoryর চিরুণীও অর্ডার মত সরবরাহ করা হয় এবং মেয়েদের মাথার clip এবং ছেলেদের চশমার সাঁতারুদের goggles ও ইঁহারা তৈরী করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিতেছি।

বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের সুবিধা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বোম্বাইয়ে কলগুলি সহরের মধ্যে অবস্থিত থাকায় তাহাদের স্থানীয় টেক্সের পরিমাণও অধিক হয়। কিন্তু অন্যান্য ব্যয় উভয় প্রদেশে সমান ধরিলেও বাঙ্গালায় বস্ত্রোৎপাদনের ব্যয় মোট শতকরা ১০৲ টাকা কম হইবে। আর বোম্বাই হইতে কলিকাতায় কাপড় আনিতে যে ভাড়া পড়ে তাহাও লাগিবে না।

আমরা দেখিতে পাই, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেদাবাদের ৫০টি কাপড়ের কলে নিম্নলিখিতরূপ লাভের অংশ বণ্টন করা হইয়াছে :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে	শতকরা ৬০ টাকা
১৯২২ „	„ „ ৩১ „
১৯২৩ „	„ „ ১২॥০ টাকা

(এই বৎসর আমেদাবাদের কলে ধর্ম্মঘট হয়)

১৯২৪ „	„ „ ১২॥০ টাকা
১৯২৫ „	„ „ ১৪॥০ „

অর্থাৎ ৫ বৎসর আমেদাবাদের কলের অংশীদারেরা গড়ে শতকরা ২৬ টাকা হিসাবে লাভ পাইয়াছেন।

এই কয়বৎসরে বাঙ্গালী কাপড়ের কলের অংশীদারেরা নিম্নলিখিতরূপ লাভ পাইয়াছেন :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে	শতকরা ৩৫ টাকা
[illegible]	„ „ ৩০ „
[illegible]	„ „ ২০ „
১৯২৪ খৃষ্টাব্দে	শতকরা ১০ টাকা
১৯২৫ „	„ ১০ „

শেষ ২ বৎসর যে লাভের হার কম হইয়াছিল, তাহার কারণ মিলের পরিচালকরা বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া মিলের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের কলগুলির হিসাব-নিকাশে দেখা যায়—১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৪২টি কল সমন্বিত ৩৫টি কোম্পানী শতকরা ৪০ টাকা হিসাবে, ১৪টি কল সমন্বিত ১০টি কোম্পানী শতকরা ১ শত টাকা হিসাবে ও ৬২টি কল শতকরা ২ শত টাকা হিসাবে লাভের অংশ বণ্টন করিয়াছেন।

এই সময় বোম্বাইয়ে শ্রমিক-চাঞ্চল্যে কলের ক্ষতি হয়—সময় সময় কল বন্ধ রাখিতে হয়। তথাপি ৫৫টি কলের গড় হিসাবে অংশীদাররা শতকরা ১৫ টাকার অধিক লাভ পাইয়াছেন। শেষ ২ বৎসর যে সকল কারণে বোম্বাইয়ের কলে লাভ কম হইয়াছিল, নিম্নে সে সকলের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি

(২) চড়া হিসাবে স্থানীয় টেক্স প্রদান

(৩) কয়লার ও জলের মূল্যবৃদ্ধি

(৪) আমেদাবাদ প্রভৃতি তুলার চাষের স্থানের নিকটবর্ত্তী কলের প্রতিযোগিতা

(৫) জাপানের অসম প্রতিযোগিতা

(৮) যে সময় পণ্যের মূল্য হ্রাস হইতেছিল, সেই সময় টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স হওয়া

(৭) অন্যায়রূপে মূলধন বৃদ্ধি

এখনও বোম্বাইয়ে শ্রমিক-চাঞ্চল্যের অবসান হয় নাই, সুতরাং পরবর্ত্তী কালের লাভের হিসাব দেখিয়া বস্ত্র শিল্পের প্রকৃত অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থা বিচার করিলে তাহা সঙ্গত হইবে না।

সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত টারিফ বোর্ড বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির অবস্থা বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন—সকল ব্যবসায়ই উন্নতি ও অবনতির জোয়ার ভাঁটা দেখান যায়, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের অবিরত অবস্থাও স্থায়ী নহে এবং শীঘ্রই তাহার অবসান হইবে। বোর্ড মত প্রকাশ করেন, বস্ত্রশিল্পের অবস্থা যে কেবল বোম্বাইয়েই অবনতিজ্ঞাপক তাহার কারণ, বোম্বাইয়ে শ্রমিক-চাঞ্চল্য অন্যান্য কেন্দ্র অপেক্ষা তীব্র হইয়াছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেদাবাদের কলগুলির অবস্থা মন্দ ছিল না এবং ৫০টি কলের গড় ধরিলে বৎসরে সাড়ে ১২ টাকা হইতে সাড়ে ১৪ টাকা হিসাবে লাভও বণ্টন করা হইয়াছে।

একদিকে এই মত, আর একদিকে ম্যাঞ্চেষ্টার বণিক সমিতির সভাপতি স্যার আর্ণেষ্ট টমসনের স্পষ্ট উক্তি। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের ও জাপানের কলগুলির প্রতিযোগিতাই বিলাতের কাপড়ের কলসমূহকে বিশেষ ভাবে ভোগ করিতে হইয়াছে। বিলাতের বস্ত্রশিল্পের যে সব সুবিধা নাই, এই দুই দেশের শিল্পে সে সব সুবিধা আছে। পণ্যের উপকরণ তুলা তাহাদিগের নিকটে; তাহাদিগের দেশের শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিক অল্প; তাহাদিগের উৎপন্ন মালের ক্রেতারা নিকটে অবস্থিত। তাহাদিগের এই সব সুবিধা বিলাতের পক্ষে প্রতিযোগিতায় সাফল্য-লাভে অন্তরায় হয়; আবার জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হইতে লোক স্বল্পমূল্যের পণ্যের পক্ষপাতী হইয়াছে।

এ দেশে উৎপন্ন পণ্য এই দেশেই বিক্রীত হওয়ায় যে কত সুবিধা হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ক্রেতারা কিরূপ মালের আদর করিবে, তাহা জানিতে বিলম্ব হয় না। আর মাল দূর হইতে আনিবার ব্যয়ও থাকে না। কেবল বিলাত কেন, জাপান—এমন কি বোম্বাই ও আমেদাবাদকেও বাঙ্গলায় মাল পাঠাইয়া বিক্রয় করিতে হয়। বাঙ্গলায় কলে উৎপন্ন বস্ত্র সহজেই সে সকলের স্থান অধিকার করিতে পারে।

এই সকল বিবেচনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বাঙ্গলায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিলে কাপড়ের মূল্য হ্রাস হয় এবং অংশীদাররা বিশেষরূপ লাভবান হইতে পারেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বাঙ্গলায় যখন তুলা উৎপন্ন হয় না, তখন বাঙ্গলায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাতে লাভ হইবে না! এ কথা ভিত্তিহীন। কারণ, বিলাতে বা জাপানেও তুলা উৎপন্ন হয় না। সে সকল দেশের কলের জন্য ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে তুলা লইয়া যাইতে হয়। অথচ সে সব দেশের কলেও লাভ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, কাপড়ের কলের কাজ সহজে শিক্ষা করা যায় না এবং বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সে কাজে শিক্ষিত লোক নাই। এই উক্তিও তুল্যরূপে ভিত্তিহীন। বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর বিশ্বাস আছে; যে বাঙ্গালা জ্ঞানে বিজ্ঞানে নূতন আলোক বিস্তার করিয়াছে, সেই বাঙ্গালায় যে কাপড়ের কলের কাজ শিখিবার উপযুক্ত লোক মিলে না, ইহা বিশ্বাস্য নহে। বাঙ্গালীরা বঙ্গলক্ষ্মী ও মোহিনী মিল পরিচালনা করিতেছেন। আমেদাবাদের কোন কোন কলেও বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার আছেন। কেশোরাম কটন মিলের এঞ্জিনিয়ার ও সহকারী ম্যানেজার বাঙ্গালী।

বাঙ্গালায় কাপড়ের কলে যে প্রভূত লাভ অনিবার্য্য, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। এ কথা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, ব্যবসাবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া পরিচালিত করিলে বাঙ্গলার কাপড়ের

কলে বোম্বাইয়ের ও আমেদাবাদের কল অপেক্ষা অধিক লাভ অবশ্যম্ভাবী। তাহার কারণ:—

(১) বাঙ্গলার আদ্রতা বোম্বাই ও আমেদাবাদে নাই। সেইজন্য বোম্বাইয়ে ও আমেদাবাদে বৎসরের অনেক সময় কলের ঘরে বাতাসে কৃত্রিম উপায়ে আদ্রতা সঞ্চার করিতে হয়। বাঙ্গলার জলবায়ু বয়ন শিল্পের পক্ষে অধিকতর সুবিধামত।

(২) বাঙ্গলায় কয়লা রেলভাড়ার অল্পতা হেতু বোম্বাই ও আমেদাবাদ অপেক্ষা সুলভ। সেইজন্য বাঙ্গলায় কলে কয়লার বাবদে খরচ কমিয়া যায়।

(৩) বাঙ্গলার বস্ত্র বাঙ্গলাতেই বিক্রয় হইয়া যাইবে। বোম্বাই বা আমেদাবাদ হইতে যে কাপড় বিক্রয়ের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়, রেলভাড়ায় তাহার বিক্রেয় মূল্য বাড়িয়া যায়।

(৪) আমেদাবাদ কলের জন্য বোম্বাই হইতে এবং বোম্বাইয়ের কলের জন্য তুলার উৎপাদন স্থান হইতে তুলা আমদানী করিতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই রেলভাড়া পড়ে। বাঙ্গলা সে বিষয়ে আমেদাবাদ বা বোম্বাই অপেক্ষা অসুবিধা ভোগ করে না।

(৫) শিল্প কমিশনে স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গলার শ্রমিক আমেদাবাদের ও বোম্বাইয়ের শ্রমিক অপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতায় শ্রমিকের মজুরী অল্প।

দেশের রাজনীতিক উন্নতি ও অর্থনীতিক উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে অগ্রসর হয়। দেশ যদি দারিদ্রের পঙ্কে পতিত থাকে, তবে রাজনীতিক অধিকার কে সম্ভোগ করিবে? আজ বাঙ্গলার যে দুর্দ্দশা, তাহার মূল কারণ দারিদ্র্য। শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সে দুর্দ্দশা দূর করা সম্ভব হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, বঙ্গদেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিলে কলের অংশীদাররা যেমন লাভবান হইবেন,—সমগ্র দেশ তেমনই লাভবান হইবে। দেশের সাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে কাপড় পাইবে এবং অনেক টাকা দেশেই রক্ষিত হইবে। সেই অর্থে দেশে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গলার উল্লেখযোগ্য অর্থনীতিক উন্নতি হয় নাই। যদি আমরা বর্ত্তমান সময়েও সুযোগ ত্যাগ করি, তবে আমাদিগকে আবার হতাশ হইয়া দীর্ঘকালের জন্য দুঃখভোগ করিতে হইবে। যাহারা লজ্জা নিবারণের জন্য পরমুখাপেক্ষী—তাহারা কিরূপে স্বরাজ লাভের আশা করিতে পারে? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে অগ্রণী হইয়া দেশের বস্ত্র সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার ফলে কেবল যে বঙ্গদেশেই বঙ্গদেশের জন্য আবশ্যক বস্ত্র উৎপাদন করা যাইবে, তাহা নহে; পরন্তু বাঙ্গলায় আবার তুলার চাস হইবে এবং তাহাতে কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে।

বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা কিরূপ জটিল হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভদ্রঘরে অন্নাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ লোককে ব্যথিত করিতেছে। দেশের শিক্ষিত যুবকদিগের মুখ বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অভাবের ফলে অসন্তোষ উদ্ভূত হইয়া সমগ্র সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছে; দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিতেছে।

আজ বঙ্গদেশে যত শত শিক্ষিত যুবক চাকরীর অভাবে—অন্নার্জ্জনের পথ না পাইয়া অমূল্য মানব জীবন অসার ও ভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতেছে, সে ভার ত্যাগ করিতেও অগ্রসর হইতেছে। আমাদিগের পক্ষে সেনা বিভাগের দুর্গদ্বার রুদ্ধ, আমাদিগের নৌবহর নাই, সরকারী চাকরীর সংখ্যা অল্প। কেবল আমরা আমাদিগের চেষ্টায় শিল্প ব্যবসার পথে অগ্রসর হইতে পারি। সে পথ আমরা কেন ত্যাগ করিব? কেন আমাদিগের লজ্জা নিবারণের ভার অন্য দেশের

এর পরেই আরম্ভ হয় সব চেয়ে শক্ত কাজ। পোকাগুলি ক্রমে গাছের কচি পাতা খেয়ে পুষ্টিলাভ করিতে থাকে, আর সাঁওতালেরা দিনরাত তীর ধনুক নিয়ে তাদের রক্ষা করবার জন্ত বন আগলে বসে থাকে। পাছে কোন পক্ষী এসে পোকাগুলিকে নষ্ট করে, তাই তাদের এই সতর্ক দৃষ্টি। এসময়ে তাদের খুব শুদ্ধ ও সংযতভাবে থাকতে হয়, স্নান-আহারে পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে হয়, স্ত্রীসহবাস করতে পায় না। যদি কোন কারণে কেহ অশুচি হয়ে যায়, তখনই পোকার কল্যাণের জন্ত তারা বিধি-মত ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী পূজা-অর্চ্চনা করে। নইলে তাদের বিশ্বাস, পোকাগুলি তাদের অনাচারে দেবতার অভিশাপে হয় মরে যাবে, নয় গুটি বাঁধবে না। এমনি করে দিনের পর দিন বাঙ্গলার সাঁওতাল, কোল, মাহাতো ভুইঞা প্রভৃতি শিক্ষা ও সংস্কার-বর্জ্জিত। তথাকথিত ছোট জাতের দল ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত চারি মাস ভদ্রলোকের ভদ্র পোষা-কের জন্ত পোকা চরাতে গিয়ে নিবিড় বন-মধ্যে কঠোর সংযমসাধনা করে।

পোকাগুলি যখন বেশ বড় হয়, গায়ের রং তখন সবুজ হ'য়ে ওঠে মাঝে মাঝে সোনালী ডোরাও দেখা দেয়। গুটি বাঁধবার পূর্ব্বে পোকার সারা গায়ে একটি সোনালী আভা ফুটে ওঠে। এই সময়ে পোকাগুলি চিরদিনের তরে মলমূত্র ত্যাগ ক'রে স্থির হ'য়ে যেন ধ্যানে বসে। ধ্যান ভাঙ্গলে সে আর বেঁচে থাকবার কোনই সার্থকতা দেখে না। জীবনের প্রতি বুঝি বা তার একটা বিতৃষ্ণা জন্মে যায়; তাই গাছের পাতায় পাতায় সুতা জড়িয়ে মশারির মত একটি জাল রচনা করে। তারপর সেই মশারির ভিতর গাছের চিকণ ডালের সঙ্গে আবার সুতো জড়িয়ে একটি শক্ত খোটা তৈরী করে। মুখের নাল হ'তে যতই সুতো বেরিয়ে আসে, ততই সে যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। আকারও তার ক্রমে ছোট হ'য়ে আসে। বাইরের আলো বাতাস তখন আর তার খোটেই সহ্য হয় না, পৃথিবীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করবার জন্ত সে মরিয়া হ'য়ে উঠে। তাই অনবরত বোঁ বোঁ ক'রে চারিদিক ঘুরে নাল দিয়ে সুতো ছাড়তে থাকে। অবশেষে নিজেকে কেন্দ্র ক'রে নাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিঃশেষে প্রাণশক্তিকে উজাড় ক'রে দিয়ে সে সেই কঠিন আবরণের মধ্যেই চিরদিনের তরে আত্মগোপন করে, এই হ'ল গুটি পোকার জীবনের অদ্ভুত ইতিহাস।

সাঁওতালেরা গুটিগুলি সংগ্রহ ক'রে উত্তাপ দিয়ে ভেতরকার পোকাগুলি মেরে ফেলে তারপর, সেগুলি বাজারে বিক্রি করে। তাঁতীরা গুটিগুলি কিনে নেয়, আর তাদের বাড়ীর মেয়েরা সেগুলিকে জলে সাজিমাটি, কলার ক্ষার, কি সোডা দিয়ে সিদ্ধ করে সুতো কাটবার জন্ত নরম করে নেয়। এই সুতো কাটবার প্রণালী বড় চমৎকার। চরকায় এর সুতো হয়না। দশ বারোটা গুটী পাশাপাশি রেখে প্রথমতঃ আঙ্গুলের ঈষৎ চাপ দিয়ে গুটির উপর থেকে কিছু উঠিয়ে ফেলতে হয়। পরে অভ্যাস বশে প্রত্যেক গুট থেকে একটী অতি সুক্ষ্ম খেই ধরা পড়ে। এমনি ধারা চার পাঁচটা খেই একত্র করে লাটাইতে পাক দিয়ে তবে তসরের সুতো তৈরী হয়। পাক দিতে দিতে কোন গুটির খেই যদি ছিড়ে হারিয়ে যায়, তবে আবার সেই গুটির উপর আঙ্গুলের ঈষৎ চাপ দিয়ে কিছু উঠিয়ে ফেলতে খেই ধরতে হয়। যে ন্যাথাগুলি আঙ্গুলের চাপ দিয়ে উঠিয়ে রাখা হয়, তাই দিয়েই "কেটে" কাপড় তৈরী হয়। তসরের সুতা আজকাল বাজারে সাধারণতঃ ১৬৲ টাকা সের দরে বিক্রি হয়। যে ন্যাথাগুলি উঠিয়ে রাখা হয়, তার আবার ভাল মন্দ দুই শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর ন্যাথা দিয়ে কোনরূপে চরকাতে সুতো "কেটে" কাপড় তৈরী করা যায়। তাই তার বাজার দর ১২০৲ টাকা মণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যাথাকে কোনই কাজে লাগাতে পারে না—অর্থাৎ আমাদের দেশের

ব্যবসায়ীরা। তাই তারা সে গুলিকে বস্তা বন্দি করে নিয়ে গিয়ে সাহেবদের দরজায় ফেলে। সাহেবেরা দয়া করে কখনও বা ১০৲ টাকা কখনও বা ১৫৲ টাকা মণে কিনে নেয়। কিন্তু সাহেবের কলে সেগুলি যখন সভ্য হয়ে সুতোর আকারে তৈরী হয়ে আসে, তখন সেগুলি বিকায় ১৫৲ টাকা করে সের। অর্থাৎ সাহেবেরা কৃপা করে যা ১০৲ মণে কিনে নেয়, সেগুলি আবার অনুগ্রহ করে ৬০০৲ মণ বিক্রি করে; আর সেগুলি কিনে আমাদের দেশের-ব্যবসায়ীরা।

এই গেল মোটামুটি তসর-গুটি ও সুতার কথা। এখন, যারা আজ পর্য্যন্ত এই তসরকে আগ্‌লে বসে আছে, তাদের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই দেখা যাক্। বাংলায় সাধারণতঃ মেদিনীপুর বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হুগলীতেই তসরের কাজ হয়। কিন্তু এ সকল স্থানে যে-তাঁতীরা শুধু তসরের কাজই করে, তাদের আর দিন চলে না। সারাদিন তাঁতের পিছনে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যা উপায় হয়, তা দিয়ে মোটেই মজুরি পোষায় না। তসরের তাঁতী মাসে ১৫৲ টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে না। এর কারণ নকল রেশমের আমদানী বাজারে "আল-পাকার সাড়ি" এই সর্ব্বনেশে নকল রেশমের নমুনা। নকল রেশমের বাহিরের চাকচিক্য দেখে লোকে আজ খাটী তসরের আদর ভুলতে বসেছে। তাঁতীরাও বাধ্য হয়ে বাজারের অনুসারে তাঁতের সানায় নকল রেশমের টানা পরাতে সুরু করেছে। কিন্তু সর্ব্বনাশ যে কোথায় কেমন করে হচ্ছে, তা আর কেউ তলিয়ে দেখছে না। খাটী তসরের চেয়ে নকল তসরের দাম হয়ত একখানায় এক টাকা কম। কিন্তু টেকসই হিসাবে আসলের সঙ্গে নকলের রাতদিন তফাৎ। খাটী একখানা আটদশ বছর যায়; নকল দু'বছরেই শেষ হয়। তবু ও আজ মানুষের মন আসলের কদর ভুলে নকলের দিকে ঝুঁকেছে। নকল রেশম যে, শুধু আসল রেশমেরই ক্ষতি করেছে, তা নয়; মিহি সুতারও যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। কলিকাতা সহরে মিহি সুতার যে দশবারোখানা দোকান আছে, আজ তাদের অবস্থাও ক্রমেই খারাপ হ'য়ে আসছে।

নকল রেশমের উপর-শুল্ক কমিয়ে দিয়ে হাজার হাজার তসর ও গরদ-শিল্পীকে প্রতিদিন যে ভাবে অন্নহীন করা হচ্ছে, সে কথা মনে হ'লে আতঙ্কে শিউরে উঠিতে হয়। বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, মেদিনী-পুর প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে তসর-তাঁতীদের দুর্দ্দশা দেখলে চোখ দুটী জলে ভ'রে যায়। তাঁতীর ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে;—তাঁত আর চলে না ছেলেমেয়েদের মুখে আহার জোটে না। অভাবের পীড়নে তাঁতীরা আজ তাঁত গুটিয়ে অন্য পথ দেখতে সুরু করেছে। কিন্তু পথ ত কোথাও নাই। তাই, কেউ আজ চাকুরীর সন্ধানে ছুটেছে, কেউবা গৃহপরি-বারের শান্তি নষ্ট ক'রে জুটমিলে আত্মবিক্রয় করছে। দেড়শ' বছর পূর্ব্বে "মারাবসনের" অত্যাচারে বাংলার তাঁতীর যে সর্ব্বনাশ সাধিত হয়েছিল, আজ আবার তারই পুনরভিনয় আরম্ভ হয়েছে।

"স্বদেশীবাজার"

তুলসী গাছের গুণ

তুলসীগাছ আমাদের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই আছে। হিন্দু বিধবাগণ তুলসীকে দেবতা জ্ঞানে স্নানান্তে পূজা করিয়া থাকেন। তুলসী অনেক রোগের মহৌষধ। তুলসী গাছ বাড়ীতে প্রচুর পরিমানে থাকলে ম্যালেরিয়ার আক্রমন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সর্দ্দিকাসী

তুলসী পাতার রস মধুসহ সেবন করিলে সর্দ্দিকাসি সারিয়া যায়।

শিশুর হাপং কফ

উষ্ণ তুলসী পাতার রস আধ পোয়া পরিমাণ, পিপুলচূর্ণ ১ রতি পরিমাণ, পরিস্কার করা মিশাইল অথবা ৩ পরিমাণ ৩ ঘণ্টা অন্তর ৫।৬ বার সেবন করিলে শিশুর হাপংকফ আরোগ্য হয়।

আমাশয়

এক টুকরা তুলসীর মূল ২।৪ টা গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়া

তুলসী পাতার রস সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়।

কালা জ্বর

২।৩ দিন অন্তর জ্বর উঠিলে ৩০ টি কৃষ্ণ তুলসীর পাতা ও কিছু গুড় একত্রে সেবন করিলে আর জ্বর হইবে না।

সর্ব্বপ্রকার জ্বর

তুলসী পাতার রস ও সিউলি পাতার রস আধা ছটাক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গা

মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে হইলে তুলসী পাতার রস ও গোল মরিচের চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিতে হয়।

নূতন বিসর্প শোথে

তুলসীর মাটী জলে গুলিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

পরে তুলসী পাতার উপকারীতা সম্বন্ধে আরও বলিব।

"কুটীর শিল্প"

বাঙ্গালা দেশের দুরবস্থার চিত্র প্রতিদিন গৃহে গৃহে ভীষণ আকারে ছেয়ে ফেলিতেছে। মৃত্যুর করাল গ্রাসে অচিরে যে সব জাতি আত্ম সমর্পণ করিতে দ্রুত পাদ বিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। তা আর কাহাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না, ক্ষেত্রে শস্য নেই, অঙ্গে বস্ত্র নেই, শরীরে বল নেই, রোগে চিকিৎসা নেই, উদরে অন্ন নেই, এমন কঠিন সমস্যার দিনে অতি আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে, সে দিকে কারো লক্ষ্য নেই

আমাদের গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখতে পাই যে, বয়ন শিল্প, বাঁশ, বেতের নানাবিধ শিল্প কাষ্ঠ শিল্প, লৌহ শিল্প, প্রভৃতি বহু জিনিষ নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশের অনেক শিল্প ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছে কাজেই এই কুটীর শিল্পের উন্নতির দিকে মন দিলে যে বহু শিল্পীর অন্ন সংস্থানের উপায় হবে ও দেশে ধনাগমের নূতন পথ সৃষ্টি হবে, এতে আর কোন সন্দেহ নাই। সকল কুটীর শিল্পের উন্নতি এক সময়ে করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই দুই একটি বিশিষ্ট শিল্পের উন্নতির জন্য প্রথমে হাত দেওয়া প্রয়োজন। মাটীর বাসন ও কাঁসার থালা বাটী প্রভৃতি গৃহস্থালী দ্রব্য তৈরীর ব্যবস্থা প্রথমতঃ কর্ত্তে হবে। এর জন্য কয়েক জন যুবক মিলে, একটি কুটীর শিল্প সমিতি স্থাপন কর্ত্তে হবে আসাম বা বাংলা প্রদেশের মধ্যে যেখানে কয়েক জন কুম্ভকার একত্র বাস করছে, সেখানে একটা সমবায় সমিতি স্থাপন করে, তার সাহায্যে অথবা কুটীর শিল্প সমিতির তত্ত্বাবধানে মাটীর বাসন নির্ম্মাণ শিল্পকে উন্নতি করা প্রয়োজন। ইহা বিক্রীর জন্য বিন্দু মাত্র চেষ্টা কর্ত্তে হবে না। বাজারে জিনিষ উপস্থিত করিলেই ক্রেতারা কিনবে বলে আশা করা যায়। এর জন্য এক জন বা দুই জন কুম্ভকার যুবককে উপযুক্ত মৃৎ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ঢাকা জেলা হতে ভাল একজন মৃৎ শিল্পী এনে তাঁকে বিভিন্ন কুম্ভকার পল্লীতে কিছুদিন রেখে মৃৎ পাত্র তৈরীর উন্নতি করা—কুটীর শিল্প সমিতির কর্ত্তব্য এতে বহু শিল্পী এক সঙ্গে বিশিষ্ট শিল্প শিক্ষার সুযোগ পাবে। এই নিয়মানুসারে শিক্ষার বিস্তার সহজেই

[illegible]

শ্রীমতীর [illegible] লক্ষ্মী মজুমদার

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৯ম বর্ষ } চৈত্র ১৩৩৬ { ১২শ সংখ্যা

মোটর বোট চালানোর ব্যবসায়

আজকাল দেশের সর্ব্বত্র মোটর বাস ও ট্যাক্সি ইত্যাদির প্রচলন হইয়াছে। মফঃস্বলের নানা সহরে পর্য্যন্ত মোটর বাস আমদানী হইয়াছে। এই সমস্ত যান বাহনের ব্যবসায় করিয়া অনেকেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া অপর ব্যক্তিগণ মোটর বাসের ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। কলিকাতায় এবং বাংলা দেশে অনেক বড় বড় জেলায় তাই দেখিতে পাই—মোটর বাসের ছড়াছড়ি হইয়াছে।

আমাদের দেশের অধিবাসীদের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা আছে—পরশ্রীকাতরতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপর ব্যক্তি কোন কিছু করিয়া খাইতেছে দেখিলেই আমরা সেই ব্যবসায়ের উপর অতিরিক্ত নজর দিয়া থাকি। তাহা ছাড়া দেশের লোকের অনুসন্ধিৎসা এবং খরদৃষ্টি (Observation) এত কম যে নিজের মাথা ঘামাইয়া কেহ উপার্জ্জনের কোন নূতন পন্থা বাহির করিতে চাহে না অথবা পারে না। যেই তাঁহারা দেখে যে কতক গুলি লোক কোনও একটা নূতন রাস্তা ধরিয়া বেশ করিয়া খাইতেছে, অমনি গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় তাহারা সকলেই সেই লাইনে ঝুঁকিয়া পড়ে; ফলে অত্যল্পকালের মধ্যেই অনাবশ্যক এবং অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য সকলেরই লোকসান হইতে আরম্ভ হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে চা-এর দোকান, রেষ্টুরেণ্ট এবং কাপড় কাচার ডাইং ক্লিনিং ইত্যাদির কথা বলা যাইতে পারে। এই কলিকাতা সহরে এখন অসংখ্য ডাইং ক্লিনিং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে দোকানগুলি যথেষ্ট

পরিমাণে কাজ পাইতেছে না। কারণ ডাইং ক্লিনিং এর সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপরের অনুকরণ করিবার প্রকৃতি হইতেই উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ এই ব্যবসায় নিশ্চয়ই লাভজনক ছিল; কিন্তু আজকাল আর সেই অবস্থা নাই। ইহার জন্য দায়ী কে?—দায়ী প্রধানতঃ আমরাই; আমাদের অন্ধ অনুকরণের স্পৃহাই ডাইং ক্লিনিং এর দুর্গতি আনয়ন করিয়াছে।

যদি নূতন করিয়া কিছু করিবার আগ্রহ এবং চেষ্টা আমাদের থাকিত, তাহা হইলে ডাইং ক্লিনিং এর অন্ধ অনুকরণ না করিয়া ইহার রকমফের করিয়া অন্য কিছু নিশ্চয়ই করা যাইত। মোটর বাস সার্ভিস সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই খাটে। বড় বড় সহরে এখন মোটর বাস ও ট্যাক্সি চালনার ব্যবসায় অনেকটা মন্দা হইয়া আসিয়াছে। যে ভাবে এই সমস্তের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে মোটর বাসের ব্যবসায় আর তেমন লাভ জনক থাকিবে না। সুতরাং এখন হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মোটর বাস ও ট্যাক্সির আসল অংশই হইল—মোটর ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন যেমন খুসী যান বাহনের মধ্যে বসাইয়া তাহাকে স্থল ভাগের উপর চালান যায়। জলযান ও এই মোটর ইঞ্জিন দ্বারা অনায়াসে চালিত হইতে পারে। আমাদের মনে হয় এখন হইতে মোটর বাস ও ট্যাক্সি প্রভৃতি স্থলযানের মধ্যে মোটর ইঞ্জিন ব্যবহার করার ঝোঁক একটু কমাইয়া তাহা জলযানের মধ্য ব্যবহার করার বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তাহাতে লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বাঙ্গলা দেশের ও আসামের নদ নদী এবং খাল-বিল বহুল অঞ্চলে এরূপ মোটর বোট চালানোর ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ খুবই সমুজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। বিশেষ ভাবে সহরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে এরূপ মোটর বোট সার্ভিস খুলিলে যাত্রীর কোনই অভাব হইবে না।

এই সম্পর্কে শ্রীহট্টের অন্যতম জমিদার এবং কংগ্রেস দলের নায়ক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র বাবু একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি স্বয়ং মোটর বোটের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—আমি বিগত ৮ মাস ধরিয়া ৫০×১০ ফুটের একখানা এবং দুই বৎসর ধরিয়া ৫৫×৬ ফুটের আর এক খানা মোটর বোট চালনা করিয়াছি। তাহাতে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি—এই ব্যবসায় বিচক্ষণতার সহিত পরিচালনা করিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে।

এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার:—

(১) যাত্রীর সংখ্যা কিরূপ হইবে।

(২) ইঞ্জিন কিরূপ হইবে, ঘণ্টায় কত মাইল পথ অতিক্রম করিবে এবং ইঞ্জিন চালাইতে কি পরিমাণ ব্যয় লাগিবে।

(৩) উপযুক্ত ড্রাইভার পাওয়া যাইবে কি না, তাহার কল কব্জার জ্ঞান আছে কি না, এবং থাকিলে যন্ত্র বিকল হইলে মেরামৎ করিতে পারিবে কিনা এবং না পারিলে মেরামতের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) নদীতে জল গভীর কত? অর্থাৎ বোটের কি পরিমাণ অংশ জলে ডুবিয়া থাকে—অর্থাৎ বোটের Draft কতটুকু?

(৫) প্রথমতঃ কতটাকা ব্যয় লাগিবে।

(৬) কোথায় এবং কাহাদের দ্বারা মোটর বোট তৈয়ার করান হইবে।

(৭) সরকারী অনুমতি অর্থাৎ লাইসেন্সে কত খরচ পড়িবে।

কলিকাতার ন্যায় বড় বড় সহরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মোটর বোট পরিচালনার বন্দোবস্ত করিলে যাত্রীর অভাব হইবে না। তবে অনেক সময় সহর তলীতে বাস, ট্রেণ প্রভৃতির বন্দোবস্ত থাকে। এই শ্রেণীর যানবাহনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে মোটর বোটের ভাড়া একটু কম করিতে হয়। মাইল প্রতি সাধারণতঃ এক পয়সা ভাড়া করিলেই বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থলে ৫০।৬০ জন যাত্রীর অভাব হইবে না।

মফঃস্বল সহরের নিকট এমন অনেক স্থল আছে যেখানে ভাল পথ ঘাট নাই। ইহার ফলে ট্যাক্সি, বাস, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি আদৌ চলাচল করিতে পারে না। ঐ সমস্ত স্থলে প্রায়ই দেশীয় নৌকা চলাচল করিতে দেখা যায়। মফঃস্বলের লোক নানা কারণে বাধ্য হইয়া সহরে আসিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট সময় ক্ষেপ করিতে হয়। এই সমস্ত স্থলে মোটর বোট সার্ভিস খুলিলে জনসাধারণের কাজের বিশেষ সুবিধা হইবে। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা সহরে পৌছিতে পারিবে। ইহাতে যদি বেশী ভাড়া লাগে তথাপি যাত্রীরা তাহা দিতে কাতর হইবে না। নদী নালা বহুল বাঙ্গালা দেশে এরূপ স্থানের অভাব নাই। কেবল খুঁজিয়া নিতে পারিলেই হইল। তবে পূর্ব্ব হইতে হিসাব করিয়া স্থানীয় অনুসন্ধান বিশেষ সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করতঃ যাত্রীর আনুমানিক সংখ্যা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

এস্থলে আর একটি কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। সহর তলীতে সাধারণতঃ ৩০ মাইল পর্য্যন্ত মোটর বোট সার্ভিস চালান হইয়া থাকে। অবস্থা বুঝিয়া ৬০।৭০ মাইল পর্য্যন্ত এই সার্ভিস বিস্তৃত করা যাইতে পারে। কারণ মোটর বোট প্রতিদিন ৬০।৭০ মাইল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে। তবে এরূপ দীর্ঘ পথ হইলে প্রায়ই জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সমস্ত নদী নালা দিয়া জাহাজ চলাচলের সুযোগ আছে তৎসমস্ত পথই জাহাজ কোম্পানী দখল করিয়া বসিয়াছেন। তাহা হইলেও মোটর বোটের যাত্রীর অভাব হইবে না। তবে ভাড়া জাহাজের অনুপাতে নির্ণয় করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে জাহাজ কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা করা দেশীয় ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ প্রচুর অর্থশালী জাহাজ কোম্পানী নিজের ক্ষতি করিয়াও অনেক সময় ভাড়ার হার খুব কম করিয়া দিতেন। এরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া টিকিয়া থাকা দেশীয় কোম্পানীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। অধুনা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক আইন পাশ হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, জাহাজের ভাড়া সর্ব্বাপেক্ষা কত কম এবং সর্ব্বাপেক্ষা কত বেশী হইবে —তাহা সরকার পক্ষ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। অতঃপর এই দুই সংখ্যার মধ্যে থাকিয়া বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানী তাহাদের ইচ্ছানুসারে ভাড়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

এই তো গেল—জাহাজের পাশা পাশি মোটর বোট সার্ভিস চালাইবার কথা। তারপর এমন অনেক জল পথ আছে যেখানে জাহাজ চলিতে পারে না; কিন্তু মোটর বোট চলিতে

রে। নদীতে বেশী জল এবং যাত্রীর সংখ্যা বেশী না হইলে জাহাজ কোম্পানী সাধারণতঃ জাহাজ চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারে না। মোটর বোটের সেই অসুবিধা নাই। অল্প জলের উপর দিয়াই এবং অল্প সংখ্যক যাত্রী পাইলেই মোটর বোট চলাচল করিতে পারে। যে সব স্থলে অপর কোন প্রকার যান বাহনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয় না তৎসমস্ত স্থলে মোটর বোটের ভাড়া যেমন খুসী নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। তবে মাইল প্রতি এক পয়সা কিম্বা দেড় পয়সার বেশী না হইলেই ভাল। গোড়াতে বেশী লাভ করিতে গেলে হয়ত আবার যাত্রীর অভাবে কারবার ফেল পড়িতে পারে।

ঢাকা ও কলিকাতাতে যে সমস্ত মোটর বোট প্রস্তুত হয় তাহাতে এমন এক প্রকার ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, যে গুলিকে প্রথমতঃ পেট্রোল দিয়া ষ্টার্ট (start) করিতে হয় এবং পরে কেরোসিন দিয়া চালাইতে হয়।

যাত্রীবাহী মোটর বোটের গতি বেগ ঘণ্টায় ৯ হইতে ১০ মাইলের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। ঘণ্টায় ৯ মাইল অপেক্ষা কম করিলে যাত্রীরা হয়ত সন্তুষ্ট হইবে না। কারণ যাহারা প্রতিদিন যাতায়াত করে (daily passenger) তাহারা যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করিতে চায়। ইচ্ছা করিলে অবশ্য ঘণ্টায় ১০ মাইল অপেক্ষা বেশী বেগেও মোটর বোট চালাইতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট খরচ পড়ে। অনর্থক বেশী খরচ করিলে শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া যায় না।

উপরে যে প্রকার পেট্রোল-কেরোসিন চালিত ইঞ্জিনের কথা বলা হইল তাহা দ্বারা এক খানি ৩০+৭ ফুট বোটকে ঘণ্টায় ৯ মাইল হইতে ১০ মাইল পর্য্যন্ত বেগে চালাইতে পারা যায়। ইহাতে ৩০ জন যাত্রী লওয়া চলে।

কোন্ ইঞ্জিনের জন্য কি পরিমাণ লুব্রিকেটিং অয়েল এবং পেট্রোল কেরোসিনের প্রয়োজন হয় তাহা সচিত্র ক্যাটালগ দেখিয়া স্থির করিতে হয়। আজকাল বাজারে আবার বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিন আমদানী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলই যে ভাল এবং কার্য্যক্ষম—এমন কথা বলা যায় না। অভিজ্ঞতা না থাকিলে প্রথমতঃ ইঞ্জিন বাছিয়া লওয়া বড়ই বিপজ্জনক। খুব সস্তা মাল ক্রয় করা উচিত নহে। তার পর দর বেশী হইলেই যে, জিনিষ ভাল হইবে—একথাও বলা যায় না। যাহারা মোটর বোটের বডি নির্ম্মাণ করেন তাহাদের উপর উপযুক্ত ইঞ্জিন বাছিয়া লওয়ার ভার দেওয়া যাইতে পারে। তবে ইহাতে একটু অসুবিধা আছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, মোটর বোট নির্ম্মাণকারীরা কোন না কোন বিদেশী ইঞ্জিন সরবরাহকারীর এজেন্ট। এই অবস্থায় তাহারা নিজেদের এজেন্সির মাল চালাইবার জন্য জিদ করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ পূর্ণবেগে কখনও ইঞ্জিন চালান হয় না এই অবস্থায় পেট্রোল ও কেরোসিনের নিয়মিত বরাদ্দ হইতে ½ ভাগ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। তবে পেট্রোল সম্পর্কে একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়। ক্যাটালগে লিখিত থাকে যে, ৫ হইতে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত পেট্রোল জ্বালাইয়া তাহার পর কেরোসিন দিলেই চলিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। প্রায় ৩০ মিনিট কাল পেট্রোল না জ্বালাইলে vaporiser যথেষ্ট উত্তপ্ত হয় না। এই অবস্থায় কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিলে কোন কোন সময়ে আগুন নিভিয়া যায়। এবং পুনরায় ষ্টার্ট দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

রাস্তায় চলিবার সময় পথে পথে মোটর বোট থামাইয়া যাত্রী গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়ে পেট্রোল জ্বালাইলেই সুবিধা। কারণ তাহাতে আগুন একেবারে নিভিয়া যায় না এবং পুনরায় ষ্টার্ট দিতে হয় না। কেরোসিন জ্বালাইলে থামাইবার সময় আগুন নিভিয়া যায়; তখন আবার পেট্রোল দিয়া ষ্টার্ট করিতে হয়। মোটের উপর ইহাতে বিশেষ লাভ থাকে না এবং সময় একটু বেশী লাগে।

মোটের উপর ইঞ্জিন দ্বারা যতটুকু কাজ পাইবার কথা লিখিত থাকে তদপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ কম করিয়া ধরাই ভাল। কেহ কেহ বলেন যে, ৪০ অশ্বশক্তির (Horse power) ইঞ্জিন না হইলে চলে না। বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থলে এরূপ ইঞ্জিনের প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ সেখানে যাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মফঃস্বলে যাত্রীর সংখ্যা তত বেশী হইবে না। এই অবস্থায় ৪০ অশ্ব শক্তির ইঞ্জিন ক্রয় করিলে অনর্থক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে।

৫০ জন যাত্রী বহনের উপযোগী কিম্বা তদপেক্ষা একটু বড় মোটর বোটের পক্ষে ক্রুড্ অয়েল দ্বারা চালিত full Diesal ইঞ্জিন হইলেই ভাল। Semi diesal ইঞ্জিনের দামও প্রায় সমান। কিন্তু নানা কারণে তাহা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কেরোসিন দ্বারা চালিত ইঞ্জিন অপেক্ষা ইহার দাম প্রায় তিন গুণ বেশী। তবে কেরোসিনের ইঞ্জিনের জন্য যে পরিমাণ তেলের প্রয়োজন হয়, তাহার এক তৃতীয়াংশ নিকৃষ্ট শ্রেণীর তেল হইলেই Diesal ইঞ্জিন চলে। সুতরাং দাম তিন গুণ বেশী হইল বলিয়া ক্ষোভের কোনই কারণ নাই।

মোটর বোটের ইঞ্জিন কিন্তু মাঝে মাঝে বিগড়াইয়া যায়। তজ্জন্য মালিকদের প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। Internal combustion engine নাড়াচাড়া করা অনেকটা জটিল কাজ। Steam engineএর কাজ তদপেক্ষা সহজ সাধ্য।

Heavy duty typeএর ইঞ্জিনের ঘূর্ণন অর্থাৎ Revolution প্রতি মিনিটে ৪০০ হইতে ৫০০ বার পর্য্যন্ত হয়। High speed engine এর ঘূর্ণন প্রতি মিনিটে ৭০০ হইতে ১০০০ বার পর্য্যন্ত হয়। এই উভয়ের তুলনায় Heavy duty engine বেশী দিন স্থায়ী হয়। কারণ ঘূর্ণন বেশী হইলে ক্ষয় বেশী এবং কম হইলে ক্ষয় কম হয়। বেশী ক্ষয় হইলে ইঞ্জিন বেশী দিন টিকে না। উপযুক্ত যত্ন লইলে High speed engine অন্ততঃ ২০ হাজার ঘণ্টা ক্রমাগত কাজ দিতে পারে। Heavy duty টাইপের ইঞ্জিন আরও বেশী সময় কাজ দেয়। অভিজ্ঞ Mechanic না হইলে ইঞ্জিনের যত্ন হয় না এবং দরকার হইলে কলকব্জার মেরামত করা চলে না।

সরকারী সার্টিফিকেট লইয়া যে সকল Mechanic আসে তাহারা প্রায়ই অল্প—লেখা পড়া তাহারা জানে না। কলকব্জা সম্পর্কে তাহাদের স্পষ্ট ধারণা কিছুই থাকে না।

মোটর বোট যাহারা চালাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে স্বয়ং কলকব্জার বিষয় অভিজ্ঞ করা খুবই ভাল। তাহা না হইলে একজন অভিজ্ঞ Mechanicএর বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথম প্রথম যাহারা একাজে অগ্রসর হইবেন তাহাদের পক্ষে নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। ইঞ্জিন ত বিগড়াইবেই—ইহা তো একরূপ জানা কথা। এ সময়ে উপযুক্ত Mechanic পাওয়া না গেলে দুই এক দিনের জন্য সার্ভিস বন্ধ রাখিতেই হইবে। ইহাতে

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলে চলিবে না। প্রথমতঃ এ সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করিয়াই চলিতে হইবে।

যাঁহারা অল্প বিস্তর শিক্ষিত তাঁহারা মোটর বোটের ড্রাইভারের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অনায়াসেই মোটর বোট চালনা শিখিতে পারেন। অতঃপর তাঁহারা পরীক্ষা দিয়া সরকারী লাইসেন্স লইতে পারেন। সরকারী আইন অনুসারে দুই বৎসর শিক্ষানবিশী না করিলে কাহাকেও লাইসেন্স দেওয়া হয় না। এই নিয়ম একটু পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কারণ ভদ্রলোক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকেরা আরও কম সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ ড্রাইভার হইতে পারেন, তাহাদিগকে অযথা দুই বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। একজন সুদক্ষ মোটর বাস ড্রাইভার ইচ্ছা করিলে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই দক্ষতার সহিত মোটর বোট চালনা আয়ত্ত করিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে সে মোটর বোট ইঞ্জিনের কলকব্জার জ্ঞান ও সঞ্চয় করিতে পারে।

তারপর Draftএর কথা। মোটর বোটের কি পরিমাণ অংশ জলে ডুবিয়া থাকিবে—তাহা তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ মফঃস্বলের খাল নালা প্রায়ই অগভীর। হেমন্তকালে এগুলির জল অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। নদীর অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। কারণ আজকাল বাঙ্গলা ও আসামের অনেক নদীতে চর পড়িয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলি ভরাট হইয়া যাইতেছে; এই অবস্থায় Draft যত কম হয় ততই ভাল। বেশী হইলে সকল নদী নালা দিয়া হেমন্তকালে মোটর বোট চালানো সম্ভবপর হইবে না—অগভীর জলের মধ্যে বোটের তলা চরায় আটকাইয়া যাইবে।

সাধারণতঃ Draftএর পরিমাণ ৩ ফুটের বেশী হওয়া উচিত নহে। বোট আকারে ছোট হইলে Draft যেমন খুসী করিতে পারা যায়। কিন্তু ৫০ জন অথবা তদপেক্ষা বেশী যাত্রী বহনকারী Heavy duty অথবা Diesal ইঞ্জিন-যুক্ত বোট হইলে Draft তিন ফুটের কম করা যায় না। যাত্রীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল ইঞ্জিনের ভারেও বোটের অধিকাংশ জলে ডুবিয়া থাকে।

একটির পরিবর্ত্তে ছোট ছোট দুইটি ইঞ্জিন বসাইলে Draft কম হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ইঞ্জিন চালাইবার খরচ বাড়িয়া যায়। Draft কম করিবার জন্য paddle wheels লাগান যাইতে পারে। কলিকাতায় এরূপ মোটর বোট নির্ম্মিত হইয়েছে।

মোটর বোটের খোল অর্থাৎ Body ষ্টীলের দ্বারা নির্ম্মাণ করিলে খরচ বেশী পড়ে। কাঠ দ্বারা করিলে ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। যে জলের উপর দিয়া বোট চলাচল করিবে সেই জল যদি লবণাক্ত না হয় তাহা হইলে ষ্টীলের খোল অনেক দিন স্থায়ী হইবে। প্রতি চারি বৎসর অন্তর এক একবার করিয়া ইহার গায়ে রং মাখাইলেই তাহা কার্য্যক্ষম থাকিবে। পক্ষান্তরে কাঠের খোল হইতে ঘন ঘন তাহার গায়ে caulking দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

কাহার নিকট হইতে মোটর বোট তৈয়ারী করা উচিত—একথাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ছোট কার্ম্মের নিকট অর্ডার দিলে দাম একটু সস্তা হতে পারে। কিন্তু কাজ বোধ হয় তেমন সুবিধাজনক হইবে না। যথেষ্ট পরিমাণ সাজ সরঞ্জাম ইহাদের নিকট থাকে না। তাই ছোট ছোট কার্ম্মগুলি সহজেই কাজ করিয়া দিতে পারে না। বড়

বড় কার্মের নিকট অর্ডার দিলে চার্জ একটু বেশী পড়ে বটে; কিন্তু জিনিষটি ঠিক সময়ে পাওয়া যায় এবং ভালও হয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া মোটর বোটের অর্ডার দেওয়া কর্ত্তব্য।

লাইসেন্স সম্পর্কে নানা প্রকার কড়াকড়ি নিয়ম আছে। ইহাতে অনেক সময় কাজের অসুবিধা ঘটে। সহরতলীতে যে মোটর বোট থাকে তাহার জন্ত ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কারণ সন্ধ্যার সময় বোট ছাড়িয়া ৮৷১০টার মধ্যে যাত্রীদিগকে তাহাদের গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে যাত্রীদের সুবিধা হয় না এবং ফলে সার্ভিস লাভজনক হইতে পারে না।

কোনও বড় কার্মের নিকট অর্ডার দিলে মোটর বোটে ইলেকট্রিক লাইট ফিট করিয়া দিতে তাঁহারা ১৫০০৲ টাকা আন্দাজ চার্জ করেন। ছোট কার্ম মাত্র ৫০০৲ টাকায় তাহা করিয়া দেন। কিন্তু অল্প ব্যয়ের কাজ অনেক সময় সন্তোষ জনক হয় না এবং লাইসেন্স দেওয়ার সময় সরকারী কর্ম্মচারীরা এরূপ আলোর ব্যবস্থা সন্তোষ জনক বলিয়া মনে করেন না। ইহাতে অসুবিধা ঘটে। গোড়াতেই এই সমস্ত কথা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। মোটের উপর সকল দিক চিন্তা করিয়া কাজ করিলে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নাই। মোটর বোট চালানোর ব্যবসায়ের প্রতি এ সময়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং ধনী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতের খনিজ সম্পদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

লোহার খনি

ভারতের খনিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে পরিমাণ লোহা এদেশে মজুদ আছে, তাহা আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের লোহার চারি ভাগের তিন ভাগ অপেক্ষা কম হইবে না। সরকার পক্ষ মনে করেন—অদূর ভবিষ্যতে লোহা উৎপন্নকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ একটি প্রধান স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। তবে এখনও ভারতের উৎপন্ন লোহার পরিমাণ সন্তোষজনক নহে। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র হইতে ৬০০০০০০০০ টন এবং ফ্রান্স হইতে ৪০০০০০০০০ টন পরিমিত লোহা উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সহিত তুলনায় ১৯২৮সালে

ভারতের উৎপন্ন লোহের পরিমাণ একটু বর্দ্ধিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু তাহা ২০৯২৪৬ টনের বেশী হয় নাই। কোন্ খনি হইতে কি পরিমাণ লোহা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

কেওঝোর—	১৪১৩৬১ টন
ময়ুর ভঞ্জ—	৬৮৩৪৯৩ টন
সিংভূম—	১১৩১১৪৬ টন
(ক) নাওমুণ্ডী—	৪১৫৭৬১ টন
(খ) পানসিরা, অজিতা ও ম্যাক্লিনান—	৩৮০৬০৫ টন
(গ) গোরা—	৩২৯৭৩০ টন
(ঘ) অন্যান্য—	১৩৬৫০ টন

লোহার খনির কাজ যাঁহারা করেন তাঁহাদের মধ্যে জামসেদপুরের টাটা কোম্পানী একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বলিতে গেলে—এইটিই একমাত্র স্বদেশী কোম্পানী—যাঁহারা লোহা লক্কড়ের কাজ করিয়া দেশে বিদেশে সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীর পরিচালিত খনি হইতে উৎপন্ন লোহার পরিমাণ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯২৭ সালে এই কোম্পানীর চেষ্টায় প্রায় ৬২৪০২৮ টন লোহা এবং ৪১৪৭০৮ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ইহারা কিন্তু ৫১০৮৮৪ টন লোহা এবং ২৮৯৮৬৫ টন ইস্পাতের বেশী মাল উৎপন্ন করিতে পারেন নাই।

খনি হইতে সাধারণতঃ যে লোহা পাওয়া যায়, তাহার সহিত অপরাপর খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এই অসংস্কৃত লোহাকে গলাইয়া চালাই করিয়া লইতে হয়। ১৯২৮ সালে মধ্য প্রদেশের বাবা হাসের স্বদেশী কোম্পানীর পরিচালিত ১৯০টি কলে (furnace) অপরিষ্কৃত লোহা গলাইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে কিন্তু ২০৫টি কল (furnace) এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য বৎসরে কোথায় কতটি কল কাজ করিতেছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

বিলাসপুর জেলায়—	১০২
মাণ্ডলা—	৫৪
দ্রুগ—	১৬
রায়পুর—	১৪
সাগর—	৩
জব্বলপুর—	১
	১৯০

১৯২৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৪২৮৬২৫ টন পরিমিত চালাই করা লোহা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। এই সমস্ত রপ্তানী মালের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগই জাপানে প্রেরিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে প্রতি টন লোহা প্রায় ৪৭৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

সীসা, দস্তা ও রূপা

সীসা, দস্তা ও রূপা প্রভৃতি একত্র মিশ্রিত অবস্থায় ব্রহ্মদেশের বলড্উইন মাইন হইতে উৎপন্ন হয়। আলোচ্য বর্ষে ঐ খনি হইতে ৪৪২৫০৩ টন আন্দাজ সীসা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৭ সালে হইয়াছিল ৪৪৯৮১৭ টন। ১৯২৮ সালে এ স্থলে যে রূপা পাওয়া গিয়াছে তাদের মূল্য ১১৯২৬০৫৫৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই খনি হইতে ১৩৬৭১৯৬৲ টাকার রূপা উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ খনিতে বৎসরের শেষে ৩০০০০০ টন আন্দাজ

মিশ্রিত ধাতু জমা ছিল ; তাহাতে সীসা, দস্তা, তামা এবং রূপাও আছে। উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে এই মালের হিসাব ধরা হয় নাই।

ম্যাঙ্গানিজ

ম্যাঙ্গানিস্ সম্প্রতি একটি প্রয়োজনীয় ধাতু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রধানতঃ ভারতবর্ষ জর্জ্জিয়া (রুশিয়া সহ), ব্রাজিল এবং আফ্রিকার স্বর্ণ উপকূল (gold coast) হইতে এই ধাতু উৎপন্ন হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ প্রদেশের পোষ্টমাস্বার্গ নামক স্থানে আর একটি ম্যাঙ্গানিসের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ যে, তথায় প্রচুর ম্যাঙ্গানিস পাওয়া যাইবে। তবে ইহার সহিত aluminous compound মিশ্রিত আছে। তাহা সর্ব্বাগ্রে পৃথক করিয়া লইতে হইবে—অন্যথা এই ম্যাঙ্গানিস কোন কাজে লাগিবে না।

ভারতের নানাস্থানে এই ধাতুর খনি আছে। বিগত ২০ বৎসর যাবৎ ভারতে উৎপন্ন ম্যাঙ্গনিস বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইতেছে। কিছু দিন যাবৎ জর্জ্জিয়া (রুশিয়া সহ) এবিষয়ে ভারতের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আজকাল বলিতে গেলে, রুশিয়াই ম্যাঙ্গানিসের বাজারে প্রভুত্ব করিতেছে। তবে রুশিয়ায় উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিস তেমন কার্য্যকরী নহে। খনি হইতে ইহা অপরিষ্কৃত অবস্থায় উত্তোলিত হয়। অতঃপর নানা প্রকার কল কারখানার সাহায্যে ইহাকে পরিষ্কার করিয়া কাজে লাগাইতে হয়।

প্রধানতঃ ভারতের চারিটি স্থান হইতে ম্যাঙ্গানিস উৎপন্ন হয়। যথা: - কলাঘাট, নাগপুর, সান্দুর রাজ্য এবং ভাণ্ডারা। ইহা ছাড়াও ভারতের নানা স্থানে অল্প বিস্তর ম্যাঙ্গানিস উৎপন্ন হয়। ১৯২৭ সালের তুলনায় ১৯২৮ সালে উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিসের পরিমাণ একটু হ্রাস পাইয়াছে। মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন খনি হইতে আলোচ্যবর্ষে আশানুরূপ মাল উৎপন্ন হয় নাই। বোম্বাইয়ের সকল স্থলেই উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিসের পরিমাণ কম হইয়াছে। তবে বিহার উড়িষ্যার কিওঞ্জোর ও সিংভূম জেলায় একটু বেশী মাত্রায় ম্যাঙ্গানিস উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্য ভারতের ঝাবুয়া রাজ্যে (Jhabua state) ১৯২৪ সাল হইতে ম্যাঙ্গানিস উৎপাদিত হইতেছে। ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত তথায় উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৮ সালে অকস্মাৎ তাহা হ্রাস পাইয়াছে। মাদ্রাজের ভিজগাপট্টম ও বেলারিতে উৎপন্নের পরিমাণ একটু কম হইলেও সান্দুর রাজ্যে উৎপন্নের পরিমাণ প্রায় ১৬০০ টন বর্দ্ধিত হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যের চিতল ড্রাগ ও তামকুর খনিতে উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও সিমোগা জেলায় তাহা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯২২ সালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ম্যাঙ্গানিস ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহার পরিমাণ ছিল ৮৬২৭৭৭ টন। ১৯২৮ সালে কিন্তু ৯৬৭৭ টনের বেশী ম্যাঙ্গানিস বিদেশে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিস বিদেশে প্রেরিত হইলেও ভারতের কল কারখানায় ইহার কিছু না কিছু ব্যয়িত হইয়া থাকে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাজে ম্যাঙ্গানিসের প্রয়োজন হয়। টাটা কোম্পানী প্রমুখ তিন চারিটি ভারতীয় কোম্পানী তাহাদের কাজে কিয়ৎ পরিমাণে ম্যাঙ্গানিস ব্যবহার করিয়া থাকেন ১৯২৮ সালে ভারতের নানাস্থানে ৬৯৮৭২ টন পরিমিত ম্যাঙ্গানিস ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববর্তী বৎসরে কিন্তু ৩৯০৬৫ টনের বেশী ম্যাঙ্গানিস ভারতের কাজে লাগে নাই।

ভারতের ম্যাঙ্গানিস বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, জার্ম্মাণী, জাপান, নিদারল্যাণ্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯২৮ সালে ফ্রান্সই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ম্যাঙ্গানিস ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়াছে। অন্যান্য বৎসর বৃটেনই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। ১৯২৭ সালে আমেরিকা ৯৭৫০০ টন ম্যাঙ্গানিস ভারতের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিল। ১৯২৮ সালে ৭৬০০০ টনের বেশী সে ক্রয় করে নাই।

অভ্র সম্পর্কে কেলেঙ্কারী

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে অভ্র উত্তোলিত হয়। এই মালের প্রায় সমস্তই আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র এবং গ্রেট বৃটেনে রপ্তানী হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে (১৯২৮ সালে) ২৪১০৪৯৯ টাকা মূল্যের ৪৫১১২ হন্দর পরিমিত অভ্র বিভিন্ন খনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ২৪৫২০৫৫৲ টাকা মূল্যের ২৪৬১৪ হন্দর অভ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

এই অভ্র সম্পর্কে একটি গুরুতর অভিযোগের কথা কয়েক বৎসর যাবৎ শোনা যাইতেছে। অথচ এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতীকারের কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না। খনির কর্ম্ম কর্ত্তাদের প্রদত্ত হিসাব যে পরিমাণ অভ্র উত্তোলিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়,—তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ পরিমিত অভ্র কার্য্যতঃ বিদেশে রপ্তানী হয়। ইহার ফলে খনির যাঁহারা মালিক—যাঁহারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া অভ্র উত্তোলন করেন—তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

১৯২৮ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, যে পরিমাণ অভ্র খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে, অন্ততঃ পক্ষে তাহার দ্বিগুণ পরিমিত মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। অর্থাৎ খনির পরিচালকগণ তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য লভ্যাংশের অর্দ্ধেক হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহা বড়ই গুরুতর কথা। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে অভ্র চুরি যায় বলিয়াই এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ যদি এইটুকু বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না কেন? যাহারা চুরি করে অথবা চুরির সহায়তা করে তাহাদের দণ্ড বিধান কি একেবারেই অসম্ভব? মোটের উপর ব্যাপারটি ভাল বোঝা যাইতেছে না। ১৯২৮ সালে এই অভ্র সম্পর্কে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল উপস্থিত করা হইয়াছিল। অনেক বাদ বিতর্কের পর উহা পরিত্যক্ত হয়। সম্প্রতি আর একটি বিল এবিষয়ে উপস্থিত করা হইয়াছে। মোটের উপর অভ্র সম্পর্কিত এই কেলেঙ্কারী যাহাতে বন্ধ হয় তাহার একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত অভ্র উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ২৫০১ ভাগ এবং ৪৪০৬ ভাগ যথাক্রমে আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেনে ১৯২৮ সালে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর জার্ম্মাণীতে গিয়াছিল শতকরা ১৩০০ ভাগ। ১৯২৭ সালে প্রতি হন্দর অভ্র ১১৯৫ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৮ সালে ইহার দর হন্দর প্রতি ৯৮৫ টাকার বেশী উঠে নাই।

খনিজ তৈল

ভারতের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পেট্রোলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ১৯২৩ সালে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে ১৫১৫০০০০০ টন আন্দাজ পেট্রোল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার শতকরা

৫·৭৯ ভাগ ভারতবর্ষ জোগাইয়া ছিল। ১৯২৭ সালে সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্নের পরিমাণ আন্দাজ ১৭১০০০০০০ টনে গিয়া দাঁড়ায়। তন্মধ্যে একা ভারতবর্ষই শতকরা ০·৭২ ভাগ উৎপাদন করিয়া ছিল। ১৯২৮ সালে উৎপন্ন পেট্রোলের পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে—মোটের উপর ১৮০০০০০০০ টন পেট্রোল উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ শতকরা ০·৬৮৫ ভাগের কম পেট্রোল উৎপাদন করে নাই।

সাধারণতঃ রুশিয়া, পারস্য, রুমানিয়া, কলম্বিয়া, ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ, পেরু, আর্জ্জেন্টাইন, ভারতবর্ষ, কালিফর্ণিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে পেট্রোল উৎপন্ন হয়। ১৯২৮ সালের তুলনা মূলক তালিকায় এই সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ ১১শ স্থান অধিকার করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আমেরিকা সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্নের শতকরা ৬৭ ভাগ পেট্রোল জোগাইয়াছে।

১৯২৮ সালে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে ৩০৫৯৪৩৭১১ গ্যালন পেট্রোল উৎপাদিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সহিত তুলনায় উৎপন্নের পরিমাণ ২৫০০০০০০ গ্যালন বাড়িয়াছে। কিন্তু পেট্রোলের বাজারে দারুণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইয়াছে। মূল্যের দিক দিয়া ১৯২৮ সালে ১৪৩৭২৮৯ টাকা আন্দাজ কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত পেট্রোলের খনি আছে, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মদেশের ইনাজিনাং (yonang-ynung) খনিই সর্ব্ব প্রধান। বহু দিন যাবৎ এই খনির কাজ চলিতেছে। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্ম দেশের অধিবাসীরা সহস্তে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তেল উৎপাদন করিত। ঐরূপ কয়েকটী গর্ত্ত এখনও বিদ্যমান আছে এবং সেগুলি হইতে এখনও রীতি মত তেল উঠিতেছে।

ক্রমেই এই ইনাংজিনাং খনির উৎপন্ন তেলের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। অতঃপর ব্রহ্মদেশের সিঙ্গু (singu) খনি ইহার স্থান অধিকার করিবে বলিয়া মনে হয়। এই খনির অধিকাংশ কাজই "বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর" কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। অবশ্য আরও কয়েকটী তেলের কোম্পানী ব্রহ্মদেশে কাজ চালাইতেছেন। তাহাদের মধ্যে "বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীই" সর্ব্ব প্রধান।

১৯২৮ সালে ব্রহ্ম দেশের খনিগুলিতে ১১ বার অগ্নি কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই—কেহই মারা যায় নাই। ঐ বৎসর ১২৫টি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে ৫ টী দুর্ঘটনা মারাত্মক হইয়াছিল। ব্রহ্ম দেশে আরও কয়েকটী তেলের খনি আছে। তাহাদের মধ্যে মিনবু (Minbu) খনির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটী স্থানে পরীক্ষা চলিতেছে।

ব্রহ্মদেশের পরই আসামের পেট্রোলের খনি প্রসিদ্ধ। ১৯২৮ সালে আসামের ডিগবয় তেলের খনি হইতে ৬০০০০০০ গ্যালন তেল অধিক উৎপন্ন হইয়াছে বটে। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে দর হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া এই খনির কর্ত্তৃপক্ষ ২২২৫০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। বদরপুরে আর একটি খনিতে কিছু দিন যাবৎ কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে তথায় ৮২০০০০ গ্যালন তেল অধিক উৎপন্ন হইলেও মূল্যের দিক দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ লাভবান্ হইতে পারেন নাই। এই খনির কার্য্য ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে।

কল কজা ইত্যাদি বসানো হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ স্থল হইতে প্রচুর তেল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মূল্যবান্ প্রস্তর

ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন খনি হইতে পদ্মরাগ মণি, নীলোৎপল মণিপ্রমুখ মূল্যবান এবং বিচিত্র বর্ণের প্রস্তর উৎপন্ন হয়। ১৯২৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান্ প্রস্তর সংগৃহীত হইয়াছে। অতঃপর উৎপন্ন মালের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বার্ম্মা রুবি মাইন লিমিটেড নামক একটী বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই কার্য্য পরিচালনা করিতেন। লাভ হইতেছে না দেখিয়া ১৯২৬ সালে এই কোম্পানী কারবার গুটাইবার আয়োজন করেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এই বৎসর ১৯২৫ সাল অপেক্ষা দেড় লক্ষ টাকার প্রস্তর বেশী উৎপন্ন হয়। ১৯২৬ সালে মাইন হইতে কয়েকটী চমৎকার নীলোৎপল মণি (sapphires) আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর হইতে আবার উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে।

খনিজ লবণ

ভারতের নানা স্থান হইতে নুন উৎপন্ন হয়। সাগরের লবণাক্ত জল সিদ্ধ করিয়া যে নুন হয় তাহার কথা বলিতেছি না। এদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলেও এক প্রকার নুন পাওয়া যায়। যাহাকে আমরা সৈন্ধব লবণ বলি। ১৯২৮ সালে এই নুনের উৎপন্নের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। মোটের উপর এই বৎসরে ১৬৫১৬ টনের বেশী নুন উৎপন্ন হয় নাই।

সোরা (SALT PETRE)

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, আজকাল ভারতে উৎপন্ন সোরার (salt petre) হিসাব পাওয়া যায় না। তবে বিদেশে যে মাল রপ্তানী হয় তাহা হইতে মোটামুটি একটা হিসাব ধরা যাইতে পারে। এদেশে সার রূপে মাত্র কয়েক শত টন সোরা ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট সমস্ত মালই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯২৮ সালে ১০০০০৩৪ টাকা মূল্যের ৮৯৫১০ টন সোরা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

টিন (TIN)

ভারতবর্ষে টিনের খনিও আছে। এই সমস্ত খনির মধ্যে মধ্যদেশের খনিই প্রধান। ১৯২১ সালে ঐ সমস্ত খনি হইতে ৬৬১৭৭৭৩ টাকা মূল্যের ৩৪৯৫ টন টিন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে ইহার পরিমাণ আরও ৭১৫ টন হ্রাস পাইয়াছে। মোটের উপর আলোচ্য বর্ষে ৪৫৪১২০১৲ টাকা মূল্যের ২৭৮০ টনের বেশী টিন পাওয়া যায় নাই।

ভারতের নানা কাজে প্রচুর পরিমাণ টিনের প্রয়োজন। দেশের টিন দ্বারা তৎসমস্ত কাজ সম্পন্ন হয় না। তাই বিদেশ হইতে টীন এবং টিনের জিনিষ আমদানী করিতে হয়। ১৯২৮ সালে ৯২২২৬১৯৲ টাকা মূল্যের ৫৮৩১৬ টন টিন ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং টিন হইতে নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ৩৯৬৯৭৲ টাকার আমদানী হইয়াছে। আমদানী টিনের (টীনের দ্রব্য নহে) শতকরা ৯৬ ভাগ মালই Stait settlement হইতে আসিয়া থাকে।

উপসংহার

এস্থলে মোটামুটি কয়েকটি পরিচিত ধাতুর কথা উল্লেখ করা হইল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার খনিজ দ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হয়। সেগুলির সম্পর্কেও আমাদের জানিবার অনেক কথা আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদেশের ব্যবসায়ীরা এদেশে আসিয়া সেই সমস্তের সন্ধান করিতেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেগুলি রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন—আর আমরা (অর্থাৎ ভারতের শতকরা ৯৮ জন) এ সমস্তের কোন খবরই রাখিতেছি না। এ অবস্থায় আমাদের দুঃখ দুর্গতি আর ঘুচিবে কিরূপে ?

ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এরাম ম্যাকিউলেটাম :—কচু জাতীয় গাছ। ফুল বিকাশের পূর্ব্বে ডাইলিউট এলকোহল যোগে এই ঔষধ তৈয়ারী করা হয়।

এরেনিয়া ডায়েডেমা :—মাকড়সা। ইহার সমস্ত দেহ থেঁতলাইয়া প্রত্যেক মাকড়সায় ১০০ ফোটা হিসাবে প্রুফ স্পিরিট দিয়া ১০।১২ দিন রাখিতে হয়। পরে ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এলিয়াম সেপা :—পেঁয়াজ। এক ভাগে ১৯ ভাগ প্রুফ স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া যে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় তাহারই নাম এলিয়াম সেপা।

এলিয়ম সেটাইভাম :—রসুন। এক ভাগে ১৯ ভাগ প্রুফ স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া যে মাদার প্রস্তুত হয় তাহাকেই এলিয়ম সেটাইভাম বলে।

এলুমেন :—ফটকিরি। এক ভাগ ফটকিরি ১৯ ভাগ পরিশ্রুত জলে দ্রব করিয়া যে টিংচার প্রস্তুত হয় তাহারই নাম এলুমেন।

এলোজ :—মুসব্বর। এক ভাগে ৯ ভাগ প্রুফ স্পিরিট দিয়া যে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় তাহার নাম এলোজ।

এসাফিটিডা :—হিং হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাব প্রদেশে, পারস্য ও আফগানিস্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার মূলের নির্য্যাসকে হিং বলে।

এসপারাগস্ অফিসিনেলিস :—শতমূলী। ইহার নূতন অঙ্কুর হইতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

এসিডাম নাইট্রিকাম :—শঙ্খ দ্রাবক সহ যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

এসিডাম সলফিউরিকাম :—ইহার অপর নাম সলফিউরিক এসিড। অগ্নি দগ্ধ গন্ধক হইতে যে বাষ্প উদ্গত হয়, ঐ বাষ্প জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়। ঐ দ্রাবক ৩০ ফোটা লইয়া তাহাতে অল্পে অল্পে পরিস্রুত জল এরূপ ভাবে মিশ্রিত করিতে হইবে যেন ঠাণ্ডা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ওজনে এক আউন্স হয়।

ওপিয়াম :—আফিং। শ্বেত পোস্তর ঢেঁড়ির আঠা। তুরস্ক মিশর ও ভারতবর্ষে ইহা উৎপন্ন হয়। এক ভাগ আফিং এবং ১৯ ভাগ ফ্রেক স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ওলিয়াণ্ডার :—করবীপাতা। দক্ষিণ ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে এই উদ্ভিদ জন্মে। কচি পাতা কিম্বা শুষ্ক পাতা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ককিউলাস ইণ্ডিকাস :—কাকমারি। মালবার উপকূলে এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই ফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহাকে তিক্ত বিষ বলে। এই ফল হইতে প্রস্তুত মাদার টিংচার রেক্টিফাইড স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করিলেই ককিউলাস ইণ্ডিকাস উৎপন্ন হয়।

কলোসিন্থিস :—ইন্দ্রবারুণী বা রাখালসসা। বীজ ও খোসা বাদ দিয়া স্নেহ পদার্থ হইলে যে টিংচার প্রস্তুত হয় তাহারই নাম কলোসিন্থিস।

কল্কেরিয়া :—চাটকা পোড়ান চুণের চূর্ণ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

কার্ব্বো :—চিমনির কালি হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস :—উদ্ভিদের অঙ্গার। আবৃত পাত্রে কাঠ দগ্ধ করিয়া যে অঙ্গার প্রস্তুত হয় তাহার বিচূর্ণকেই কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস বলা হয়।

কুপ্রাম :-মোটের উপর তাম্র হইতে বিচূর্ণের আকারে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা :—গাঁজা। ইহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই জন্মে। এক ভাগ গাঁজার নির্য্যাসের সহিত ১৯ ভাগ রেকটিফাইড স্পিরিট মিশাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্যাপসিকাম : লঙ্কা। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা জাত লঙ্কা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্যাম্ফার :—কর্পূর হইতে এই ঔষধ তৈয়ারী হয়। চীন, জাপান, সুমাত্রা, বর্ণিও প্রভৃতি দেশে কর্পূরের গাছ জন্মে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিকা :—ঝিনুকের চূর্ণ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রোটন টিগ্লিয়াম :—জয়পাল বা বনক ফল। ইহার বীজের তৈল হইতে অথবা বীজ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রোটেলাস হরিডাস :—গোখরো জাতীয় সর্পের বিষ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

গসিপিয়াম হার্ব্বেসিয়াম :—ভারতবর্ষের কার্পাস গাছের মূল ও শিকড়ের ছাল হইতে এই ঔষধ তৈয়ারী হয়।

চায়না :—পেরু এবং দার্জ্জিলিঙে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার বল্কল হইতে যে টিঞ্চার প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম চায়না।

টেরেন্টুলা হিউবেন্সিস :—জীবিত অবস্থায় মাকড়সাকে একটি বোতলের মধ্যে পুরিয়া তাহাকে রাগাইলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া বোতলের গায়ে এক প্রকার বিষ ঢালিয়া দেয়। সেই বিষ হইতে এলকোহল যোগে টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহারই নাম টেরেন্টুলা।

ভলিচস প্রুরিএন্স :—আলকুশি ফুলের গাত্রস্থিত শূয়া হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

থেরিডিয়ান :—কমলা লেবুর গাছে এক প্রকার মাকড়সা বাস করে। উহাদিগকে থেৎলাইয়া প্রতি মাকড়সায় ৫০ ফোটা প্রুফ স্পিরিট সহ যে টিংচার প্রস্তুত হয় তাহারই নাম থেরিডিয়ান।

নক্সভমিকা :—কুঁচিলা। ভারত সাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জে এবং সিংহল দেশে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার বীজ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

নক্স মস্কেটা :—জায়ফল। ফুল হইতে জৈত্রি ও ফল হইতে জায়ফল উৎপন্ন হয়। ইহার ফুল ও ফল উভয় হইতেই নক্স মস্কেটা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নিকোটিনাম :—তামাক হইতে প্রস্তুত এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ।

পডো ফাইলাম :—এই নামীয় বৃক্ষের আঠা অর্থাৎ ধুনাবৎ পদার্থ হইতে বিচুর্ণাকারে এই ঔষধ পাওয়া যায়।

পেপসিন :—শূকরের পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

বেলেডোনা :—ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় এবং সাঁওতাল পরগণার সর্ব্বত্র এই বৃক্ষ জন্মে। টাট্কা বৃক্ষ হইতে যে টিংচার জন্মে তাহার নাম বেলেডোনা।

বোরাক্স :—সোহাগা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস :—ভারতবর্ষে জাত আরসুলা বা তেলা পোকা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। পোকাগুলিকে চূর্ণ করিয়া যে টিংচার উৎপন্ন হয়, তাহাকেই উপরোক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে।

ভিরেট্রাম :—শ্বেতকট্কী। পার্ব্বত্য প্রদেশ জাত বৃক্ষের মূল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মস্কাস :—মৃগনাভী বা কস্তুরী হইতে ঔষধ তৈয়ারী হয়। চীন, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক সময় পার্ব্বত্য জাতীয় লোকেরা ভারতের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া অতি সস্তা দরে মৃগনাভী বিক্রয় করিয়া যায়।

রিউম :—রেউচিনি হইতে এই ঔষধ পাওয়া যায়। চীন, তিব্বত ও তাতার দেশে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার শুষ্ক মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়; তাহারই নাম রিউম।

রিসিনাস কমিউনিস :—এরণ্ড বৃক্ষের পাতা ও বীজ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই গাছের বীজ হইতেই ক্যাষ্টর অয়েল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ষ্ট্রামোনিয়াম :—ধুতুরা গাছের ফল, ফুল ও বীজ সহ সমগ্র গাছ হইতে যে টিংচার প্রস্তুত হয়, তাহাকেই ষ্ট্রামোনিয়াম বলে।

ষ্ট্রীকনিয়া :—নক্সভমিকার নির্য্যাসের সারবস্তু।

সলফার :—গন্ধকের ফুলকে পরিশ্রুত জলে ধৌত করিয়া বাতাসে শুকাইয়া যে বিচুর্ণ প্রস্তুত হয় তাহারই নাম সলফার।

সিপিয়া :—সমুদ্র জীবস্থ পেঁয়াজের শুষ্ক কষ

হইতে যে মৃদ অরিষ্ট প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম সিলা।

হাইড্রোকোটাইল এসিয়াটিকা :—ভারতবর্ষ জাত থানকুনী বা থানকুঁড়ির চারা গাছ হইতে যে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয় তাহারই নাম হাইড্রোকোট.ইল এসিয়াটিকা।

হিপার সলফার :—ঝিনুকের উপর ও নীচের ছাল বাদ দিয়া ভিতরের পদার্থ এবং গন্ধক সম-ভাবে লইয়া মাটির মুচির মধ্যে ঘুঁটের পোড়ে পোড়াইলে হিপার সালফার প্রস্তুত হয়।

এরূপ আরও অসংখ্য ঔষধ আছে—যে গুলির উপাদান প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হইতেই সং-গৃহীত হয়। আমেরিকা, জার্মাণী ও গ্রেট বৃটেনের ঔষধ প্রস্তুতকারীরা সাত সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করিয়া এদেশে আসিয়া হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধের উপযোগী বনজ, খনিজ এবং কৃষিজ দ্রব্যাদি লইয়া যান এবং স্বদেশে বসিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া পুনরায় এদেশে চালান দেন। ভারতের লোক প্রতি বৎসর সেই ঔষধ ক্রয় করিয়াই কোটী কোটী টাকা বিদেশীর পকেটে ঢালিয়া দেয়। অথচ মজার কথা এই যে, অনেক ঔষধ অনায়াসে আমাদের দেশেই প্রস্তুত হইবার সম্পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের উপযোগী বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সহিত পরিচিত ভারতীয় ডাক্তারের সংখ্যা আজকাল নিতান্ত অল্প নহে। ইহারা যদি ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসায়ে অগ্রসর হন তাহা হইলে আর একটি নূতন ভারতীয় শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল তাহাই নয়;—অধিকন্তু এমন অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধ এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে যাহা অপরাপর দেশে এপর্য্যন্ত প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় নাই। বেঙ্গল কেমিক্যাল, ডাঃ বসুর লেবরেটারী, প্রভৃতির কার্য্য হইতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত।

গো-জাতির অবনতি ও তাহার প্রতিকার

(মহাত্মা গান্ধী)

দুই বৎসর আগে আমি বাঙ্গালোরে অসুখে ভুগিতেছিলাম তখন ভারত সরকারের গো-পালন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী (Imperial Dairy Expert) মিঃ উইলিয়াম স্মিথ একটি বিবরণের সংক্ষিপ্তসার আমাকে প্রদান করেন। এই বিবরণটী তিনি পুনরায় কৃষি কমিটির (Agricultural Committee) নিকট দাখিল করিয়াছিলেন। তাহা হইতে আমি নিম্নলিখিত মূল্যবান্ তথ্য সম্বলিত অংশটুকু এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যাঁহারা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যগ্র, তাঁহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি আমি এবিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি :—

"আমার মনে হয়, এরূপ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে যথাসম্ভব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন :—

(১) গো-পালন ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা।

(২) বর্ত্তমান অবস্থার কারণ এবং

(৩) ইহার প্রতিকারের উপায় সমূহ।

"(১) সম্পর্কে আমি এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রায় সাড়ে ষোল বৎসর যাবৎ আমি বখন সময়েই পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ মাদ্রাজ, সিন্ধু ও বোম্বাই প্রদেশের গোপালনের ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমার ভারতে আগমনের পর হইতে এই ১৬ বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাব ছাড়া আর সকল প্রদেশেই গো-জাতির অবনতি হইয়াছে। আমার মনে হয়, মূল্য যাহাই হউক না কেন,—আজকাল আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট বলদ ও গাভী বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না। একথা একেবারে সুনিশ্চিত যে, সিন্ধু জেলাকে বাদ দিলে আর কোথাও তেমন দুগ্ধবতী গাভী আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যেমনটি নাকি ১৬ বৎসর আগে এদেশে পাওয়া যাইত। যদি তাহাই হয়, তবে এসময়ে যখন পৃথিবীর অপরাপর সকল দেশেই উৎকৃষ্ট গো পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন ভারতীয় গো-জাতির অবনতির কারণ খুঁজিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অজ্ঞতাই আসল কারণ। ইহা ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে—যেমন সেচ বিভাগের দ্বারা খাল কর্ত্তন বন বিভাগের দ্বারা জঙ্গলী ভূমি রিজার্ভ করিয়া রাখা এবং তাহার ফলে গো-চারণের জমির পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি। * * *

তার পর আবার ভ্রান্ত ধারণাও এ সমস্তের সঙ্গে জুটিয়াছে। কেহ কেহ মনে করে যে, বেশী পরিমাণে দুগ্ধবতী গাভী পালন করিলে কৃষি-কার্য্যের উপযুক্ত বলদ সেই গরু হইতে জন্মে না। এই জন্ত তাহারা এমন সব ষাঁড় দ্বারা গাভীর গর্ভ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, যে সব ষাঁড় আসলে অত্যল্প দুগ্ধবতী গাভীর সন্তান। Breeding bull সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থার ফলেই ভারতের গো-জাতির এতটা অবনতি হইয়াছে। আমার মনে হয়, অন্যান্ত কারণ অপেক্ষা এই কারণটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিকর। ইহাতে বলিতে গেলে উৎকৃষ্ট গো-পালন ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করা হয়।

ভারতীয় গরুর মধ্যে অনেক প্রকারের গরু আছে। কতকগুলি বেশী দুগ্ধবতী এবং কতকগুলি তাহার বিপরীত। তারপর যত্নের অভাব বশতঃ বেশী দুগ্ধবতী জাতীয় গাভীও আবার খুব কম দুধ দেয়—এমন কি তাহার বাছুর পর্য্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণে দুধ খাইতে পায় না। ইহার ফলে বাছুর ভাল হয় না, এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় গরুর বাছুর হইলেও শীঘ্র শীঘ্র সেইটি বড় হয় না।

"অতীত কালে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধির চেষ্টা না করিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। কারণ গোচারণের প্রচুর ভূমি ছিল—তথায় গাভীগুলি আপন মনে চরিয়া বেড়াইত এবং তাহাদের খাদ্যের কোনই অভাব হইত না। কিন্তু আজকাল সেই সমস্ত গো-চারণের ভূমিতে তুলা, তাল, গম, যব ইত্যাদির চাষ হইতেছে। কাজেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ গো-চারণ ভূমির অভাব ঘটিয়াছে। ইহার প্রতিকারের ভার দেশের সাধারণ কৃষককেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কথা এই যে, লাভজনক না হইলে দেশের সাধারণ লোক গো-পালন করিবে কেন? সুতরাং এমন গরু পুষিতে হইবে যাহা হইতে পরিবারের খাদ্যের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে দুধ ও ঘি পাওয়া যায় এবং যে বাছুর হয় সেইটি বড় হইলে বলিষ্ঠ বলদ হইতে পারে। আজকাল দেখা যায় যে, কৃষকেরা এমন তিন চারিটি গাভী পালন করে,যেগুলির দুধ তাহাদের বাছুরের পক্ষেই যথেষ্ট নহে। এই অবস্থায় বাধ্য হইয়া কৃষকেরা পরিবারের লোকের খাদ্যের জন্ত দুধ ও ঘি পাইবার আশায় এক একটি করিয়া মহিষ পুষিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদি গাভী হইতে একদিকে প্রচুর দুধ পাওয়া যায় এবং অপর দিকে কার্য্যক্ষম বলিষ্ঠ বলদ জন্মায় তাহা হইলে এরূপভাবে মহিষ পালনের কোনই প্রয়োজন থাকে না। একথা নিশ্চিত যে. উৎকৃষ্ট বলদ জন্মাইতে হইলে গাভী প্রচুর দুগ্ধবতী হওয়া প্রয়োজন। আমরা শুনিতে পাই যে, প্রচুর পরিমাণে গরুর খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করিলেই গো-পালন সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না; এতদ্বারা কেবল গাড়ীর আগে ঘোড়া জুড়িয়া দেওয়াই (Putting the cart before the horse) সার হইবে। আমরা চাই—সংখ্যায় অল্প হইলেও কার্য্যক্ষম কতিপয় গরু। কেবল দুধ দিয়া বাছুর পুষিতে পারে এরূপ গরু পৃথিবীর কোন দেশেই পুষিয়া লাভ হয় না। মোটের উপর কেহই এরূপ গাভী পালন করিতে পারে না।

মহিষের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়াই ভারতে গরুর খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। গাভী প্রচুর দুধ দেয় না বলিয়া মাদী মহিষ পালন করা হয় এবং অতঃপর যে মহিষ জন্মে,

সেইটিও সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এই মহিষ দ্বারা ভারতের অনেক স্থানেই বিশেষ কোন কাজ হয় না। এই অবস্থায় অকর্ম্মণ্য গাভী (যাহা হইতে প্রচুর দুধ পাওয়া যায় না) এবং অকর্ম্মণ্য মহিষ (যে গুলিকে বিশেষ কোন কাজে লাগান যায় না) সমস্ত পশুর খাদ্য নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং ভারতের গরুর খাদ্যের অভাব দূর হয় না।

"এই সমস্যার সমাধানের জন্য, প্রচুর দুগ্ধবতী এবং বলিষ্ঠ বলদ উৎপাদনকারী গাভী পালকের আবশ্যক। চাষ বাসের জন্য যে প্রকারের বলদেরই প্রয়োজন হউক না কেন, সেই বলদের মাতা প্রচুর দুগ্ধবতী হওয়া প্রয়োজন এবং প্রজনন কারী ষাঁড় যাহাতে বলিষ্ঠ এবং আকারে বড় হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

"এদেশে নিতান্ত কম গরুর প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত গাভী পোষণ করা হইতেছে তাহা হইতে এদেশের প্রয়োজনের উপযুক্ত সংখ্যক বলদ উৎপন্ন হইতে পারে—এমন কি, আরও অল্প সংখ্যক গাভী দ্বারাও সেকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তবে সেই গাভীগুলি দুই দিক দিয়া উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। যথা:—দুগ্ধদানকারী এবং বলিষ্ঠ বলদ উৎপাদনকারী এই দুই কাজের উপযুক্ত গাভী ব্যতীত অপর কোন প্রকার গাভী পালনের জন্য যে প্রচার কার্য্য—তাহার দ্বারা একটা অর্থ নৈতিক ভ্রম (a great Economic evil) চিরস্থায়ী করা হইবে মাত্র। ইহা ছাড়া অপর কোন প্রণালীতেই গাভী পালন লাভজনক হইতে পারে না।

"ইহাই যদি ভারতের গো-জাতির অবনতির কারণ হয় তাহা হইলে প্রতিকারের জন্য সর্ব্বাগ্রে গো-পালন সম্পর্কিত শিক্ষার (Dairy education) প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই আজ কাল দুগ্ধবতী গাভী পালনের ব্যবস্থা কৃষি বিভাগের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই আজ ভারতের কৃষক এবং জন সাধারণের জন্য Dairy education এর এত প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কেবল গো-জাতির উন্নতির দিক হইতে নয়,—সর্ব্ব সাধারণের উন্নতি ও স্বাস্থ্যের দিক হইতেও এই শিক্ষা এখন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সহরে দুগ্ধ সরবরাহের যে ব্যবস্থা এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ন্যায় কদর্য্য এবং ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, উভয় কার্য্যের উপযোগী গাভী না হইলে আর এখন চলে না। এদেশে গরুর মাংসের প্রয়োজন নাই—দেশের লোক গো মাংস চায় না। তবে খাদ্যের জন্য দুধ ও ঘি এবং চাষ বাসের জন্য বলিষ্ঠ বলদ একান্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যতের গাভী হইতে যাহাতে এই দুই কাজ নিষ্পন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।

এই বিবরণীর মধ্যে বিস্তৃত ভাবে কোন কথা আলোচনা করা হয় নাই—আমি কেবল মূলনীতির কথাই বলিয়াছি। কারণ অর্থনীতির দিক হইতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আমাদের কর্ম্মপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমরা কোন কাজই করিতে পারিব না। এই অবস্থায় সুচিন্তিত গোপালন প্রণালীতে অবশ্যই প্রচুর দুগ্ধবতী এবং বলিষ্ঠ বলদ প্রজননকারী গাভী পুষিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ এই দুই দিক অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—একটি ছাড়া অপরটি হইবার উপায় নাই।"

ইহা একটি গুরুতর সমস্যা। গো জাতির এই যে অবনতি—তাহা আমরা ভারতবাসীর অবনতির মধ্যেই প্রতীক্ষা করিতেছি। পাঠক-

বর্গ লক্ষ্য করিবেন যে, মিঃ স্মিথ কথার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। যে গাভী বেশী দুধ দেয় তাহার পক্ষে উপযুক্ত, কার্য্যক্ষম ও বলিষ্ঠ বলদ প্রসব করা মোটেই অসম্ভব নহে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা হইতে মিঃ স্মিথ যে অভিমত দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—প্রচুর দুধ দেওয়া এবং বলিষ্ঠ বাছুর প্রসব করার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। যে গাভী প্রচুর দুধ দেয় সেই গাভীই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৎস প্রসব করিতে পারে।

মিঃ স্মিথের দ্বিতীয় কথা এই যে, মহিষ ব্যক্তি বিশেষের উপকার করে বটে; কিন্তু সে গাভীর সর্ব্বনাশ করে এবং ফলে কৃষিকার্য্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়। যাহারা গো-পালন করে। তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারাই এই ব্যাপারে সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে। অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্ট যেরূপ সাধারণের হিতার্থে এই সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এদেশে যদি তাহা হইত, তবে কোন কথাই ছিল না। সরকারের সাহায্য পাইলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই সমস্যার প্রতিকার হইতে পারিত। সে যাহাই হউক, ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায়ও গো-জাতির ক্রমিক অবনতি অন্ততঃ নিবারিত হইতে পারে। এদেশে গো-পালন আজকাল অর্থ নীতির দিক হইতে লাভজনক না হইয়া ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিতেছে। এই যে দুরবস্থা—ইহার প্রতিকারের জন্য ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টাও বিশেষ প্রয়োজন। *

* "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।

মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের অবস্থা

(২)

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের কথা আলোচনা করিয়াছি। এই সম্পর্কে আরও অনেক বলিবার আছে। ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির কর্ত্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময়েও আমরা মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি।

একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বর্ত্তমান যুগে ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস প্রভৃতি একরূপ অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠান হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান না থাকিলে বিংশ শতাব্দীর

সভ্যতার ঠাট্ বজায় রাখিয়া চলাই অসম্ভব। ব্যবসা ও শিল্পাদির কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যেও আজকাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজন দেখা যায়। এই অবস্থায় কলিকাতা ও মফঃস্বলে এদেশবাসীর কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস প্রভৃতির সংখ্যা যত বেশী হয় ততই আমাদের মঙ্গল। সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই।

তবে এই সম্পর্কে কেহ কেহ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে ১০।১২টি ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অথচ হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ঐস্থানে দুই তিনটি প্রতিষ্ঠানই যথেষ্ট। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজে হাত দিতে হয়। তাহা না করিলে পরিণামে অনুতাপ করাই সার হয়। পল্লীগ্রামে কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মফঃস্বল সহরে কাজ কারবার খুব বেশী নাই। সেখানে যদি বহু সংখ্যক ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস গঠন করা যায় তাহা হইলে কাজ মিলিবে কোথেকে? এই অবস্থায় অন্যায় প্রতিযোগিতা সুরু হইবে,—কে কত বেশী সুদে টাকা আমানত রাখিবেন—তাহা লইয়া হুড়াহুড়ি পড়িবে এবং পরিণামে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কারণ উপযুক্ত সুদের বেশী সুদ দিয়া আমানতদারদিগকে প্রলোভন দেখান খুব সহজ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যথাসময়ে তাহাদের পাওনা মিটান সহজ নহে। কেন নহে তাহা একটু বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি।

স্থায়ী আমানত পাইবার জন্ত সাধারণতঃ এই সকল ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানী আমানতকারী দিগকে উচ্চহারে সুদের লোভ দেখাইয়া থাকেন; ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে ইহা লইয়া কোন কোন স্থানে নীলামের মত হয়। আমানতকারীরাও এ সুযোগ দেখিয়া দালালদের মারফতে কষাকষি করিয়া যেখানে বেশী সুদ আদায় করিতে পারে, সেইখানেই শেষে আমানত রাখে। এবার Banking Enquiry Committeeর সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া লোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলিয়াছেন যে তাঁহারা ২৪% হইতে ৩০% হিসাবেও আমানতকারী-দিগকে সুদ দিয়া ডিপজিট লইয়াছেন এবং ৪৮% হইতে ৬৫% হিসাবে সেই টাকা দাদন করিয়াছেন। ৩০৲ টাকা সুদে, টাকা আমানত নিলে তাহা ৬০৲ টাকার কমে খাটানো যায় না; খাটাইলে সব খরচ খরচা বাদে তেমন লাভ করা যায় না; অথচ কোনও লোক এত উচ্চহারে সুদ দিয়া ভাল সিকিউরিটি বন্ধক রাখিবে না। কর্ত্তৃপক্ষগণকে তখন বাধ্য হইয়া টাকা খাটাইবার জন্ত যেখানে সেখানে খারাপ সিকিউরিটির উপর বেশী সুদে টাকা দাদন করিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহার আশু বিপদ এই যে পর বৎসর দুর্ভিক্ষ অজন্মা বা কাজ কারবারের অবস্থা খারাপ হইলে এই দাদনী টাকা বা তাহার সুদ আদায় হয় না সুতরাং আমানতকারীদিগকে উচ্চহারে সুদের টাকা সহ টাকা ফিরাইয়া দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং যে কোনও হারে সুদ দিয়া টাকা আমানত নিতেই হইবে। এই যে নীতি ইহা সকল ব্যাঙ্কিং নীতির মূল সূত্রের বিরোধী; কারণ বেশী সুদে টাকা আমানত নিলে বেশী সুদেই সে টাকা খাটাইতে হইবে; এবং বেশী সুদ দিয়া কোনও খাতকই ভাল সিকিউরিটী বন্ধক দিতে আসিবে না। কারণ ভাল সিকিউরিটী থাকিলে সে অনায়াসে যে কোনও মহাজনের

নিকট হইতেও কম সুদে টাকা পাইতে পারে।

সাধারণতঃ ৫ হইতে ৭৲ টাকা শত করা সুদে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে টাকা জমা লওয়া হয়। এইস্থলে যদি ১২।১৪৲ টাকাও সুদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাহা হইলেও ব্যাপার গুরুতর না হইয়া যায় কোথায়?

আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, মফঃস্বলের কোন কোন স্থলে এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। ইহাতে কেবল কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্ক নয়—সমগ্র ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই ব্যবসা অতি বিচক্ষণ ব্যবসা—ইহাতে যথেষ্ট বিজ্ঞাবুদ্ধি ও সততার প্রয়োজন হয়। একবার সুনাম নষ্ট হইলে তাহা পুনরুদ্ধার করিবার উপায় আর থাকে না। কাজেই বিশেষ সততার সহিত এবং অক্ষরে অক্ষরে যুক্তি পালন করিয়া এই ব্যবসায় পরিচালন করিতে হয়। মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলিতে সকল সময়ে উপরোক্ত নীতি প্রতিপালিত হয় কিনা সন্দেহ। যাহাতে দোষ ত্রুটির প্রতিকার হয় এবং উন্নততর প্রণালীতে এদেশের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলি পরিচালিত হয়—তাহাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। এবিষয়ে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের হিতকামী বলিয়াই আমরা আজ নির্ভীকভাবে ইহাদের দোষ ত্রুটির কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কারণ দুষ্ট ক্ষতসমূহ বিচক্ষণ সার্জ্জনের ছুরিতে কাটিয়া না ফেলিলে যেমন ক্ষত কেবল বাড়িতেই থাকে—আরোগ্য হইবার লক্ষণটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না, তেমনি ব্যাঙ্ক, বীমা ও লোন আফিস প্রভৃতির গলদ নির্ম্মমভাবে দূরীভূত না করিলে তাহা কেবল বাড়িতেই থাকে এবং পরিণামে এতদ্বারা সমগ্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। এসমস্ত ব্যাপারে গোড়ায় সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সম্প্রতি কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্রে মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের কথা আলোচিত হইতেছে। ইহাতে ক্ষোভের কোনই কারণ নাই। তবে দেখিতে হইবে যে, এই সমস্ত সমালোচনা যেন ধ্বংসকর না হইয়া সংগঠন—মূলক (Constructive not destructive) হয়। এস্থলে আমরা কয়েকটি অভিযোগের কথা উল্লেখ করিতেছি :—

(১) আদায়ী মূলধন খুব সামান্য থাকে।

(২) রিজার্ভ ফণ্ড খুব কম থাকে এবং তাহাও কাজের সময় পাওয়া যায় না।

(৩) আদায়ী মূলধনের উপর খুব উচ্চহারে লভ্যাংশ (Very high rate of dividend) দেওয়া হয়।

(৪) উদ্বৃত্ত নগদ টাকা (cash balance) নাম মাত্র থাকে।

এই সমস্ত অভিযোগের কথা আমরা একে একে আলোচনা করিব। আর একটি অভিযোগের কথা পূর্ব্ববর্তী প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—তাহা এই যে, Quick debt and slow assets—অর্থাৎ মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলি কেবল জমি ও বাড়ী ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়াই টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে যে সম্পত্তির কর্তৃত্ব আসে, তাহা হইতে প্রয়োজন অনুসারে নগদ টাকা পাওয়া যায় না। মোটের উপর, ব্যাঙ্কগুলি তখন জমিদার হইয়া বসেন। ফলে আর্থিক সচ্ছলতা-হীন বাঙ্গালী জমিদারের ন্যায় ব্যাঙ্কেরও দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত ইতি

মধ্যেই কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের কয়েকটি বিশ্বস্ত এবং বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক অধুনা নগদ টাকার অভাবে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের অবস্থা মোটের উপর মন্দ নহে; কারণ Slow assets—অর্থাৎ জমি বাড়ী প্রভৃতি সম্পত্তির হিসাব ধরিলে এই সমস্ত ব্যাঙ্কের অবস্থা খুবই উন্নত বলিয়া মনে হয়। সম্পত্তি থাকা সত্বেও এই যে দুরবস্থা—তাহার প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আর একটী অভিযোগ এই যে, আদায়ী মূলধনের পরিমাণ খুব কম থাকে। হয়ত এক লক্ষ টাকার মূলধন লইয়া এক একটি ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস রেজিষ্টারী করা হয়; কিন্তু তার পর আর এত টাকা আদায় হয় না। মফঃস্বলের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস ২৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকার বেশী মূলধন আদায় করিতে পারে না। অতঃপর ইহারা আমানতের টাকা লইয়া পরের ধনে পোদ্দারি করিতে সুরু করে। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, আদায়ী মূল ধন (paid-up capital) অপেক্ষা ৩০ গুণ হইতে ১০০ গুণ পর্য্যন্ত বেশী আমানত গ্রহণ করা হয়। ইহাতে নানা দিক দিয়াই অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ আমানতের টাকা স্থায়ী টাকা নহে। সময় হইলে এগুলি ফিরাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন। কাজেই দুর প্রসারী কোন কারবারে এই আমানতী টাকা খাটানো যায় না। অতি লোভে পড়িয়া খাটাইতে গেলে বিপদ হয়; আমানতদারেরা যখন দাবী উপস্থিত করে তখন টাকা প্রত্যর্পণ করিতে পারা যায় না। ইহাতে ব্যাঙ্কের সুনাম নষ্ট হয়।

তার পর রিজার্ভ ফণ্ড সম্পর্কে ও অভিযোগ আছে। কোন ব্যবসায়েরই চিরকাল সমান যায় না। সর্ব্বত্রই উঠ্‌তি এবং পড়্‌তির সম্ভাবনা আছে। এরূপ সন্ধিক্ষণে যাহাতে বিপদে পড়িতে না হয় তজ্জন্য গোড়া হইতে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। মফঃস্বল ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণতঃ আমানতী টাকা দ্বারাই ব্যাঙ্কের কাজ চলে। কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ এবং অজন্মা ইত্যাদি হইলে আমানতী টাকা আসে না এবং পুরাতন আমানতদারেরা তাহাদের টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হয়। এরূপ সময়ে যথেষ্ট রিজার্ভ ফণ্ড থাকিলে কোনই দুর্ভাবনায় পড়িতে হয় না।

মফঃস্বলের অনেক ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের তাহা নাই। একেবারে যে নাই এমন নহে—তবে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ ফণ্ডে নাই—ইহাই হইল অভিযোগ। তার পর যাহা কিছু থাকে তাহাও অল্প সময়ের মধ্যে হস্তগত করা যায় না। কারণ তাহা এমন সব দাদনে আবদ্ধ থাকে যাহা ইচ্ছামত নগদ টাকায় (liquid money) পরিণত করা যায় না। সেইজন্য বড় বড় ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ড সাধারণতঃ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে ন্যাস্ত থাকে। চাহিবা মাত্র এই সমস্ত টাকা পাওয়া যায়। যে সমস্ত সিকিউরিটীর উপর চাহিবা মাত্র টাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকে তাহাতেই রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা invest করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই টাকার উপর বেশী কিছু লভ্যাংশ প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে।

আদায়ী মূলধনের (fided diposit) উপর খুব বেশী হারে সুদ দেওয়া হয় বলিয়াও কেহ কেহ অভিযোগ করিয়াছেন। অনেক স্থলে এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তবে সর্ব্বত্র এই অভিযোগ চলে না। অনেক ব্যাঙ্কের প্রচুর

লাভ হয়—একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা মনে রাখিয়া এরূপ লাভের টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে বেশী পরিমাণে জমা রাখা কর্ত্তব্য। অন্যান্য ব্যাঙ্ক যে হারে লভ্যাংশ দেয় সেই হারে আদায়ী মূলধনের উপর লভ্যাংশ দিলেই চলে। অনেকে বলিতে পারেন যে, তাহাতে নূতন অংশী দার জুটে না। নূতন অংশীদার জুটাইবার জন্যই প্রচুর পরিমাণ লভ্যাংশের লোভ দেখাইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এরূপ নীতি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অনুকূল নহে; যাঁহারা এরূপ ব্যবসা বোঝেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই রিজার্ভ ফণ্ডের কথাও চিন্তা করেন। এই অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম হারে লভ্যাংশ দিয়া রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা মজুদ করিয়া রাখিলে বোধ হয় তাঁহারা নিরাশ হইবেন না। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমাদের আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সর্ব্বোপরি উদ্বৃত্ত নগদ টাকার অভাবের কথা। প্রবাদ আছে—"অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।" মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের অবস্থাও অনেকটা তাহাই হইয়াছে। আমানতী টাকা হাতে আসিলেই তাঁহারা নানা দিকে তাহা খাটাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলেন, ইহার ফলে সময় সময় ইহাদের দারুণ অর্থাভাব উপস্থিত হয়।

ব্যাঙ্ক ব্যবসা হইল মোটের উপর নগদ টাকার ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট নগদ টাকা (Liquid cash) হাতে রাখা চাই। তাহা না থাকিলে এই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বই নষ্ট হইয়া যায়। এদিকে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস যদি জমি ও বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার না দেয় তবে তাঁহারা টাকা খাটাইবেন কিসে? এবং উহা সুদে টাকা খাটাইতে না পারিলে তাঁহারা লাভবান হইবেন কি রূপে?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জমি এবং বাড়ী ছাড়াও অন্যান্য অনেক জিনিষ বন্ধক রাখা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে পাট, তুলা, ধান ইত্যাদির কথা বলা যাইতে পারে। এই সমস্ত জিনিষ বন্ধক রাখিয়া টাকা দিলে দেশের চাষীদের যেমন উপকার হইবে ব্যাঙ্কের আর্থিক সচ্ছলতাও তেমনি বজায় থাকিবে।

পাট উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক চাষী পেটের দায়ে, কেহ বা পাট জমা রাখিবার জায়গার অভাবে তৎক্ষণাৎ নামমাত্র দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস প্রভৃতি খুব কম খরচে একটি গুদাম প্রস্তুত করিতে পারেন এবং সেই গুদামে পাট, তুলা ও ধান প্রভৃতি জমা রাখিয়া চাষীকে টাকা দিতে পারেন। বৎসর না যাইতেই এই টাকা হাতে ফিরিয়া আসিবে। কারণ পাটের দর যখন বাড়িবে তখন চাষীরা তাহা বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের টাকা যেমন শোধ করিবে, তেমনি নিজেও দু'পয়সা পাইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ইহাতে ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানের কাজ একটু বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমরা বলি যে জমিদারী হাতে আসিলে যে পরিমাণ ঝঞ্ঝাট পোয়াইতে হয়, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম হাঙ্গামা। তাহাছাড়া এইরূপ investment-এ এক বৎসরের মধ্যেই নগদ টাকা হাতে ফিরিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

পক্ষান্তরে জমিদারীতে টাকা ফেলিলে কয় বৎসর পরে যে নগদ টাকা হাতে আসিবে—তাহার কোনই স্থিরতা থাকে না। আসামের দিকে অনেক চা-বাগান আছে। এই সমস্ত বাগানের চা-এর ফসল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া

চলিতে পারে। তবে খুব সতর্ক হইয়া কাজ করা প্রয়োজন—যেন শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতির কোন সম্ভাবনা না থাকে। এইরূপ স্থলে চা-বিক্রয়ের উপযুক্ত সময় আসিলেই তাহা বিক্রয় হইয়া যাইবে এবং ব্যাঙ্কের হাতে টাকা ফিরিয়া আসিবে। যে সব স্থলে এরূপ ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সমস্ত স্থলে (বিশেষ করিয়া মফঃস্বলে) ব্যাঙ্কের স্থলে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land mortgage bank) প্রতিষ্ঠা করাই কর্ত্তব্য। কারণ তখন আর নগদ টাকার তাগিদের কোনই ভয় থাকে না। জানিয়া শুনিয়াই লোকে জমি বাড়ী প্রভৃতি Slow assets এর উপর তাহাদের টাকা খাটাইয়া লাভের প্রত্যাশা করে।

মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের পরিচালক বৃন্দকে, আমরা এ সমস্ত কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কলার চাষ

কলার চাষ প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই করা যায়। তবে দো-আঁশ মাটিতে যেরূপ সুপুষ্ট ও সুরসাল কলা জন্মায়, বালি বা কড়া এঁটেল মাটিতে সেরূপ হয় না।

চাঁপা, মদনা, মনুয়া, কাঁঠালী প্রভৃতি সাধারণ কলাগাছ বৎসরের যে কোনও সময়েই রোপণ করা চলিতে পারে। "মাঘে কলা, ফাগুনে নলা" এই সাধারণ প্রবচন অনুসারে মাঘ মাস সর্ব্বপ্রকার কলাগাছ রোপণের পক্ষে প্রশস্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, মাঘ, ফাগুন, চৈত্র, এই তিন মাস কাবুলী, কানাই বাঁশী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কলা গাছ রোপণের পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। ইহারা রসাল মাটি ব্যতীত ভাল জন্মায় না এবং শুষ্ক মাটিতে ইহাদিগের তেউড় রোপণ করিলে তাহাদের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে ষোল আনা। এই জন্য ইহাদিগকে বর্ষাকালে রোপণ করা সুবিধা জনক। একটী খনার বচন আছে—

বলে' গেছে রাবণে,
কলা পোঁত' গে শ্রাবণে।
আবার,—বলে' গেছে রাবণে,
কলা পুঁতো না শ্রাবণে।

এই বিপরীতার্থক বচনও অনেকের নিকটে শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে দুইটি কথাই ঠিক। শ্রাবণ মাসে এদেশে খুব বেশী বৃষ্টি হইয়া

থাকে। সেইজন্য সাধারণ কলাগাছ এই সময়ে রোপণ করিলে উহাতে কেঁচো লাগিয়া সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কানাই, বাঁশী প্রভৃতি ভাল কলার গাছ বর্ষার পরে রোপণ করিলে উহারা শুকাইয়া মরিয়া যায়, এবং এই সকল গাছ সহজে কেঁচো দ্বারা আক্রান্ত হয় না বলিয়া ইহাদিগকে শ্রাবণ মাসে রোপণ করাই প্রশস্ত।

কলার পরিচয়

বাঙ্গালীর নিকটে কাঁচকলা, চাঁপা, কাঁটালী, মর্ত্তমান প্রভৃতি কলার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে কানাই বাঁশী, পিন্যাং, প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কলাগুলির সহিত অনেকেই পরিচিত নহেন বলিয়া ইহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

১। কাবুলী কলার গাছ সাড়ে তিন হাতের বেশী উচ্চ হয় না। কিন্তু, কলার কাঁদি হয় চাঁপা কলার ন্যায় খুব বড়। কলাগুলিও বেশ বড় ও সুস্বাদু, তবে মর্ত্তমান কলার ন্যায় মোলায়েম নয়।

২। কানাই, বাঁশী কলার গাছগুলি সাধারণ চাঁপা কলার গাছের ন্যায় হইয়া থাকে। প্রত্যেকটী কলা এক ফুট দীর্ঘ ও ওজনে দেড় পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পাকা কলার ভিতরে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা কলা। ইহার কাঁচা কলা সিদ্ধ করিলে গলিয়া ঠিক মাখনের ন্যায় হয়; পাকা অবস্থাতে ইহার কোন রং নাই, কিন্তু স্বাদ অতুলনীয়।

৩। বীচ জবা বা রামকলার গাছগুলি দেখিতে লাল। কলাগুলিও কাঁচা অবস্থায় মেটে লাল রং-এর হয়; পাকিলে সিন্দুরের ন্যায় উজ্জ্বল লাল বর্ণে মোহিত করে। এই কলাগাছের খোড় খুবই নরম বলিয়া কলাগুলি গাছে রক্ষা করা কঠিন, সামান্য বাতাসে অথবা কাঁদির নিজের ভারেই গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কলাগুলি মোটা বীচে কলার ন্যায় বেশ বড় ও মোটা হয়। স্বাদে গন্ধে ও বর্ণে ইহা সকল প্রকার কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৪। ঢাকাই মর্ত্তমান কলার গাছ বৎসরের যে কোনও সময়ে রোপণ করা যাইতে পারে। ইহার কলা অতীব সুস্বাদু; কিন্তু দেখিতে বিশ্রী। পাকিলেও বিশেষ রং হয়না বলিয়া বাজারে উহার তেমন আদর নাই। এই কলা পাকিলেই বোঁটা হইতে খসিয়া পড়ে।

৫। মর্ত্তমান কলাকে দেশভেদে কোথাও অমৃতপম, কোথাও সবরী, কোথাও বা মালভোগ বলিয়া থাকে। ইহার অমৃতপম স্বাদের জন্যই ইহা বিখ্যাত। কিন্তু এই কলা আবাদের প্রধান অসুবিধা, একই স্থলে দুই বৎসরের অধিক কাল ইহা ভাল জন্মায় না। ঝাড় পুরাতন হইলেই পাকা কলার ভিতরে সুড়কীর ন্যায় শক্ত শক্ত গুটী হইতে দেখা যায়।

৬। পিন্যাং কলাকেই সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গে অগ্নীশ্বর বলিয়া থাকে ইহার গাছের প্রত্যেক পাতার গোড়া হইতে কাণ্ড পর্য্যন্ত ডেগোর শির দুইটী টকটকে লাল রংএর হয় এবং তেউড়ের মুখদেশ বা এঁটেটী বেশ সমান ভাবে গোল হইয়া থাকে। প্রত্যেক কাঁদিতে ৫।৬ ছড়ার বেশী কলা হয় না। ইহা অমৃতপম জাতীয় কলা,—স্বাদে অমৃতপমের অপেক্ষাও ভাল।—সাধারণতঃ সকল প্রকার কলার ভিতরে বীজ হউক বা না'ই হউক, বীজ থাকিবার জন্য তিনটি সূত্রবৎ লম্বা ও শক্ত শির থাকে। কিন্তু পিন্যাং কলার ইহার পরিবর্ত্তে ঐ তিন স্থানে মিষ্ট ও সুগন্ধি ঘি-এর ন্যায় রং বিশিষ্ট এক প্রকার গাঢ়

রস থাকে যাহা কলা খাইবার সময়ে মনে হয়, যেন চুষিলেই বাহির হইয়া মুখ পরিপূর্ণ করিবে। অধিকন্তু প্রথম শ্রেণীর যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহা পূর্ণভাবে বিদ্যমান।

কলাবাগান

কলাবাগান করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট জমিখানিতে কলার তেউড় রোপণের কয়েক দিন পূর্ব্বে দুই একবার চাষ দিয়া তাহার ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। তৎপরে প্রতি ৮ হাত অন্তর ২ হাত গভীর একটী গর্ত্তের ভিতরে একটি করিয়া কলার চারা (তেউড়) রোপণ করিতে হইবে। দক্ষিণ বঙ্গের কৃষিজীবিগণের মতে কলার তেউড় খুব ছোট (৫।৭ পাতাবিশিষ্ট অবস্থায় রোপণ করাই সুবিধাজনক। ইহাতে অবশ্য সমস্ত কলাগাছেই সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু এই ছোট "ট্যাক কাটা তেউড় বৃদ্ধি পাইয়া তাহা হইতে ঝাড় প্রস্তুত হইতে যে সময় লয়, তাহা উত্তর বঙ্গীয়গণ বৃথা নষ্ট করিতে সম্মত নহে। তাহারা যুবা তেউড় রোপণ করিবার পক্ষপাতী। ইহাতে রোপিত তেউড়টির ফল ভাল হয় না বটে, কিন্তু অল্প সময়ের ভিতরে এই তেউড় হইতে নূতন নূতন তেউড় বাহির হইয়া সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ২৷৷০ হস্ত হইতে ৩৷৷০ হস্ত পরিমাণ লম্বা চারা (১২ পাতা হইতে ২০ পাতাবিশিষ্ট) রোপণ করিতে পারিলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

তেউড়গুলি ঝাড় হইতে খোন্তা দ্বারা উত্তোলন করিয়া কোনও ছায়াযুক্ত স্থানে ২।৩ দিন রাখিবার পরে উহাদের মূলদেশের শিকড়গুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে পত্রগুলির অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিয়া উহাদিগকে যথাস্থানে রোপণ করিতে হইবে। পুরাতন এঁটে অথবা শিকড় সমেত চারা রোপণ করিলে উহারা পচিয়া যাইয়া গাছগুলিকে মারিয়া ফেলিতে পারে, এবং রোপিত তেউড়ের নূতন শিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হয় বলিয়া তেউড়গুলি দুর্ব্বলতাপ্রযুক্তও মারা যাইতে পারে।

মাটীর চাষ

তেউড়গুলি রোপণ করিবার সময়ে উহাদের গোড়ার মাটি বেশ করিয়া ঠাসিয়া দিতে হইবে। তৎপরে যতদিন না প্রত্যেক তেউড় হইতে নূতন পাতা বাহির হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ২।৪ দিন অন্তর অন্তর একবার করিয়া খোন্তার উল্টা দিক দিয়া ঐ মাটি ঠাসিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। রোপিত তেউড় তাহার নূতন শিকড় বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বল থাকে ও ক্রমশঃ শুকাইয়া সরু হইতে থাকে বলিয়া রোপণের সময়ে ইহাদের গোড়ায় মাটি খুব করিয়া চাপিয়া দিলেও ২।৪ দিনের ভিতরেই উহার গোড়ায় ফাঁক হইয়া ভবিষ্যতে জল জমিবার স্থান প্রস্তুত হইয়া থাকে। চারার গোড়ায় জল জমিলে উহার এঁটে পচিয়া মারা যাইতে পারে বলিয়া উহার গোড়া এইরূপ ভাবে মাঝে মাঝে ঠাসিয়া দিবার আবশ্যক।

বর্ষা অন্তে আশ্বিন হইতে মাঘ মাসের ভিতরে সমস্ত কলাবাগান একবার কোপাইয়া দিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু মাটি দিতে হইবে।

কলাগাছের পাতা কাটিলে কর্ত্তিত পাতার ডেগোর ভিতরের sponge এর ন্যায় শাঁস গাছের ভিতরে পর্য্যন্ত শুকাইয়া অথবা পচিয়া যায়। ফলে, গাছ দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে বলিয়া, উহাতে কাঁদি পড়ে খুবই ছোট এবং কলাগুলি হয় ততোধিক ক্ষুদ্র। এইজন্ত কলার পাতা কাটা

কোন ক্রমেই উচিত নহে। নেহাৎ প্রয়োজন হইলে ২।১খানি পাতার অর্দ্ধাংশ ডেগোর সহিত রাখিয়া অবশিষ্টাংশ কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কলাগাছ রোপণের দেড় বৎসরের ভিতরে ফল পাওয়া যায়। রোপণের বৎসরে ক্ষেত্র বেশ ফাঁকা থাকে বলিয়া সেই বৎসর অন্য যে কোনও একটী ফসলও আবাদ করিয়া লওয়া চলিতে পারে।

ফল ধরিবার সময় হইতে কলাবাগান পরিষ্কার রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বাগানে জঙ্গল থাকিলে কলার খোসার উপরে কাল খস্‌খসে এক প্রকার দাগ দেখা দেয়। ফলে কলাগুলি দেখিতে যেমন কদর্য্য হয়, খাইতেও তেমনি আশানুরূপ স্বাদবিশিষ্ট হয় না।

মোচা হইতে সমস্ত কলা বাহির হইবার পরে কলার ফুল যখন ঝরিয়া পড়িতে থাকে, তখন মোচাগুলি কাঁদি হইতে কোনও প্রকারে ভাঙ্গিয়া অথবা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যথাসময়ে মোচাগুলি কাটিয়া না ফেলিয়া গাছে রাখিয়া দিলে কলাগুলি পুষ্ট হইতে বিলম্ব হয় ও আকারেও অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া থাকে। মোচা কাটিয়া দুই মাস পরে কাঁচকলা এবং ৪ মাস পরে পাকা কলা খাদ্যোপযোগী হয় তবে শীতকাল হইলে ৫।৬ মাস সময় লাগিয়া থাকে। শীত ঋতুতে উত্তর দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে। উত্তর দিকস্থ বায়ু শীতল বলিয়া প্রায় আরও সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। অনেকে আবার গাছের গোড়ায় একটী বাঁশ পুঁতিয়া তাহার সঙ্গে গাছটীকে দাড় দিয়া বেশ করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখে—কলার গাছ কতকগুলি আঁশের সমষ্টি, সুতরাং উহা সহজে ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই। কলার কাঁদির ভারে গাছের ভিতরের থোড় ভাঙ্গিয়া থাকে। কলার কাঁদি না বাঁধিয়া কেবল মাত্র গাছ বাঁধিয়া রাখিলে থোড় ভাঙ্গিবার কোনও প্রতীকার হয় না, বৃথা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হয় মাত্র। কিন্তু, প্রত্যেক কলন্ত গাছের গোড়ায় একটী বাঁশ পুঁতিয়া সেই বাঁশের সহিত কলার কাঁদির যে স্থান হইতে ছড়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থান হইতে উর্দ্ধে অর্দ্ধ হস্তের ভিতরে দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া যদি ঝুলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই সেই কাঁদি আর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে না। মদনা ও ঢাকাই মর্ত্তমান কলার থোড়ের উর্দ্ধাংশ গাছের ভিতরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত শক্ত থাকে বলিয়া বাঁশ বাঁধিয়া না দিলেও সহজে ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

এক বিঘা কলার আবাদে প্রতি বৎসর একশত হইতে দেড়শত টাকা লাভ থাকিতে পারে।

(স্বদেশী বাজার)

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক; কেনেনা বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1, Council House Street,
Calcutta.

[১৯৩০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

CASTOR OILCAKE

(S—134) Castor Oilcake—অর্থাৎ রেড়ীর খোল খরিদ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের সন্ধান চাহিয়া কাণপুর হইতে কোনও ফার্ম পত্র দিয়াছেন।

CRYSTAL GLASS

(S—135) বাঙ্গালোর হইতে পত্র লিখিয়া কোনও ব্যবসায়ী, সাদা ও হলদে রঙের Crystal glass ক্রয়কারীর সন্ধান চাহিয়াছেন।

ঘৃত

(S—136) ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা ঘৃত ক্রয় করিতে চাহেন তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত টুনী (Tuni) হইতে কোনও বড় ফার্ম পত্র লিখিয়াছেন।

মধু

(S—137) ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা মধু ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত টুনী (Tuni) হইতে এক ভদ্রলোক পত্র দিয়াছেন।

NEEM OILCAKE

(S—138) কাণপুর হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র লিখিয়া Neem Oilcake—অর্থাৎ নিমের খোল ক্রয়কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন।

PADLOCKS, BADGES etc.

(S—139) তালা, ব্যাজ্ ইত্যাদি—

যাঁহারা ক্রয় করিতে চাহেন তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আলীগড় হইতে কোনও বড় কার্ম পত্র দিয়াছেন।

POTATO FLOUR

(S—140) Potato Flour অর্থাৎ আলু হইতে প্রস্তুত ময়দা ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়া মাদ্রাজের অন্তর্গত টুনী (Tuni) হইতে কোন কার্ম এক পত্র লিখিয়াছেন।

[১৯৩০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল হইতে গৃহীত]

MAHUA MEAL

(S—141) Mahua Oilcake অর্থাৎ মহুয়া খোল যাঁহারা ক্রয় করেন, তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া কাণপুরের কোনও কার্ম পত্র দিয়াছেন।

পক্ষী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু

(S—142) আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশের অন্তর্গত লস এঞ্জেলস (Las Angeles) হইতে এক ব্যবসায়ী পক্ষী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু বিদেশে রপ্তানী কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

হরিণের শিং

(Deer Horns) যাঁহারা বিদেশে রপ্তানী করেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া জাপানের ওশাকা (Osaka) হইতে কোনও কার্ম পত্র দিয়াছেন।

[১৯৩০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ট্রেড্ জার্ণাল হইতে গৃহীত]

FIRE CLAY

(S—144) Fire clay ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়া কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

ICELAND SPAR

(L—145) যাহারা Iceland Spar (Crystalline Calcite) ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতা হইতে কোনও ভদ্রলোক পত্র দিয়াছেন।

ROSHA GRASS OIL

(S--146) পাঞ্জাবের কোনও সরকারী কর্মচারী Rosha Grass Oil ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়া পত্র দিয়াছেন।

টেন করা চামড়া

(S--147) নিম্নলিখিত টেন করা পাকা চামড়া যাহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর (Raipur) হইতে কোনও কার্ম পত্র দিয়াছেন। যথা :—

টেন করা (পাকা) গোসাপের চামড়া, টেন করা বেজীর চামড়া, টেন করা বাঁদরের চামড়া।

ডিম সংরক্ষণের উপায়

মুরগীর ডিম ও হাঁসের ডিম আজ কাল নানা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এক এক স্থলে এই ডিম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু সেখানে হয়ত তেমন খরিদ্দার পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় সেখান হইতে ডিম সংগ্রহ করিয়া অন্যত্র চালান দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহার প্রধান অন্তরায় এই যে ডিম বেশী দিন টিকে না—পচিয়া যায়।

শীতের দিনে বরং অধিক সময় এই ডিম টাট্‌কা থাকে—সহজে পচিয়া যায় না। কিন্তু গরমের দিনে অল্প সময়েই ডিম পচিয়া যায়। সুতরাং দূর দেশে হইা পাঠান যায় না—কারণ পটি মধ্যে এই ডিম ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা পদে পদে বিদ্যমান। আবার একটি ডিম যদি পচিয়া যায়—তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অপর ডিম গুলিও পচিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় ডিম চালান দিয়া লাভ করা দূরের কথা—মূলধন রক্ষা করাই দায় হইয়া উঠে।

তার পর ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শীতকালে মুরগী ও হাঁস বেশী ডিম দেয় না। গরমের সময়েই এই ডিম বেশী হয়। এ গুলি যদি যত্ন করিয়া জমাইয়া রাখা যায় তবে শীতকালে যখন বাজারে ডিমের টান্ খুব বেশী এবং দামও চড়া তখন অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় করা যায়। গরমের দিনে সহজেই ডিম পচিয়া যায় বলিয়া সকল স্থলে ভবিষ্যতের জন্ত জমাইয়া রাখা সম্ভবপর কিম্বা লাভ জনক হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে হাঁস ও মুরগীর ডিম দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর—এমন কি দুই বৎসর পর্য্যন্ত বেশ টাট্‌কা রাখা যায়।

ডিমের ব্যবসার পক্ষে এই কয়টী বিষয় চিন্তনীয়।

১। পশু পক্ষী জীব জন্তু শীতকালে সাধারণতঃ যৌন বিহার কিম্বা যৌন সঙ্গম করে না। বসন্তের প্রারম্ভ হইতে সমগ্র গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরৎ কাল ইহাদের বিহারের সময় সুতরাং এই সময়েই হাঁসও মুরগীর ডিম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শুধু যে ডিম এ সময় বেশী উৎপন্ন হয় তাহা নহে, পরন্তু একদিকে ডিম যেমন বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় অপর দিকে তেমনি আবার অত্যধিক গরমের জন্য লোকে এ সময় সাধারণতঃ ডিম মাংসাদি আহার করে না। সুতরাং ডিম এ সময় খুব সস্তায় পাওয়া যায়।

অপর দিকে শীতকালে ডিম উৎপন্ন হয় কম, অথচ শীতকালেই লোকে মাংস, ডিম, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খায়। সুতরাং ডিমের চাহিদা এবং দামও খুব বাড়িয়া যায়। ব্যবসায়ীর পক্ষে এই দুইটী অবস্থাই খুব অনুকুল। গরমের সময় বাজারে যখন সস্তা থাকে তখন ডিম কিনিয়া শীত কাল পর্য্যন্ত ইহা তাজা রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল ডিম টাট্‌কা রাখিবার জন্ত বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করা হইতেছে।

নিয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রণালীর কথা বর্ণনা করা হইল। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের দেশেও অনায়াসে ডিম রক্ষা করা যাইতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে ডিম পরীক্ষা করার একটি নূতন প্রণালীর কথাও বর্ণিত হইল। ইহা অতি সহজ প্রণালী। এই প্রণালী দ্বারা কোন্ ডিম কত দিনের পুরাতন তাহা বলিয়া দিতে পারা যায়।

ডিম যত পুরাতন হইবে ওজন তাহার ততই হ্রাস পাইবে। আমরা সাধারণতঃ যে নুন দিয়া রান্না করি, সেই নুন ২ আউন্স বা এক ছটাক পরিমিত লইয়া এক পাইন্ট বা দেড় পোয়া জলের মধ্যে গুলিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর ডিমকে এই জলে ফেলিয়া কোন্‌টি কতদিনের আগের—তাহা প্রমাণ করা যায়। পূর্ব্ব রাত্রের টাট্‌কা ডিম হইলে উক্ত জলে ফেলিবা মাত্র উহা তলাইয়া যাইবে এবং পাত্রের নিম্নে গিয়া ঠেকিবে। যদি এক দিনের পুরাতন হয়, তবে উহা জলের মধ্যে ডুবিবে বটে; কিন্তু পাত্রের তলদেশ পর্য্যন্ত পৌছাইবে না। যদি তিন দিনের পুরাতন হয় তাহা হইলে সেই ডিম জলের মধ্যে সাঁতার কাটিতে থাকিবে—অর্থাৎ ইহার সামান্য অংশটুকু জলের উপর ভাসিবে—অবশিষ্ট ভাগ সমস্তই জলে ডুবিয়া থাকিবে। আর তিন দিনের বেশী পুরাতন ডিম হইলে তাহা এই জলের উপর সম্পূর্ণরূপে ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরিবে। যত বেশী দিনের পুরাতন ডিম হইবে তত বেশী অংশ ইহার জলের উপর ভাসিয়া থাকিবে।

এখন গ্রীষ্মকাল। এই সময়ে যথেষ্ট ডিম পাওয়া যায়। এই ডিম শীতকালের জন্য রাখিতে হইলে নিম্ন লিখিত প্রণালী ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। :—

(১) এক ছটাক পরিমিত Gum arabic দেড় পোয়া ঠাণ্ডা জলের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া যে solution হইবে তাহার মধ্যে ডিম ভিজাইয়া লইয়া তাহা শুকাইয়া লওয়া প্রয়োজন। অতঃপর পরিষ্কার ছাইয়ের গুঁড়ার মধ্যে এই ডিমকে প্যাক্ করিয়া রাখা দরকার।

(২) নিম্নলিখিত জিনিষ একত্র করিয়া যে solution হয় তাহাকে কেহ কেহ packing liquid বলেন। :—

জল দিয়া গলান	
সাধারণ চুণ —	1 lb.
সাধারণ নুন	2 বা 3 lbs
cream of tartar—	½ lbs

এই সমস্ত জিনিষ একত্র করিয়া যে solution হইবে তাহার সহিত জল মিশাইতে হইবে। solutionটি খুব বেশী তরল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যাহাতে ডিমগুলি ইহাতে ভাসিতে পারে সেরূপ তরল করা দরকার। এই solution এর মধ্যে ডিম ফেলিয়া রাখিলে অনেক দিন টাট্‌কা থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা দুই বৎসর পর্য্যন্ত ডিম টাট্‌কা রাখা যায়।

(৩) একটি বড় পিপার মধ্যে ঠাণ্ডা জল রাখিতে হয়। পিপার অর্দ্ধাংশ জলে পূর্ণ হইবে এবং অপর অর্দ্ধাংশ প্রথমতঃ খালি থাকিবে। এই ঠাণ্ডা জলের সহিত জলে গলিত চুণ ও নুন মিশাইতে হইবে। দেখিতে হইবে যেন প্রতি এক বাল্‌তি পরিমাণ জলের জন্য এক পোয়া চুণ এবং এক পোয়া নুন মিশ্রিত হয়। কোন কোন ব্যবসায়ী নুন ব্যবহার করেন না। আবার কেহ কেহ আধ পিপা জলের মধ্যে দুই ছটাক niter

ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপে যে সংমিশ্রন উৎপন্ন হয় তাহাকে ইংরাজীতে pickle বলে।

এই pickle এর মধ্যে টাট্‌কা ডিম ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ডিমের এক দিক অপেক্ষাকৃত সরু থাকে। সেই দিকটা ক্রমে ক্রমে জলের নীচে পাত্রের তলদেশে গিয়া বসিয়া পড়ে। এইরূপে কতক গুলি ডিম ছাড়িয়া দিলে পর জল ফাঁপিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এই জল অর্থাৎ pickle যখন পিপার কানায় কানায় উঠিবে তখন বুঝিতে হইবে যে, এই পিপার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ডিম দেওয়া হইয়াছে—আর দেওয়া চলে না। এই অবস্থায় ডিম গুলি ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিলে তাহা কয়েক মাস পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকে।

দীর্ঘ দিন এই অবস্থায় রাখিলে ডিমের খোসা গুলি নরম হইয়া যায়—তাহা তখন সহজেই ভঙ্গপ্রবণ হয়। অধিকন্তু ডিমের ভিতরের অংশ কিয়ৎ পরিমাণে নোনা হইয়া যায়। ইহার প্রতিকার করে ডিম গুলিকে pickle এর মধ্যে ফেলিবার পূর্ব্বে lard বা চর্ব্বির দ্বারা একবার প্রলেপ দিয়া লইলে ভাল হয়। এরূপভাবে প্রলিপ্ত ডিমের খোসা আর সহজে নরম হয় না এবং ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। খুব ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিলে উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বনে ডিমকে ছয় মাস পর্য্যন্ত বেশ টাট্‌কা রাখা যায়।

(৪) প্রথমতঃ টাট্‌কা ডিম বাছিয়া লইতে হয়। অতঃপর ছোট ছোট বেতের ঝুঁড়ির মধ্যে ১০।১২ টি করিয়া ডিম সাজাইয়া রাখিতে হয়। আর এক পাত্রের মধ্যে চিনি সহ জল সিদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; সাধারণতঃ তিন সের জলের মধ্যে আড়াই সের Brown sugar দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই গরম জলের মধ্যে ডিমগুলিকে পাঁচ সেকেণ্ড সময় ডুবাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লওয়া প্রয়োজন। যাহাতে উহা শীঘ্র শুষ্ক হইতে পারে তজ্জন্য ট্রে'র উপর সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে।

গরম জলের মধ্যে পাঁচ সেকেণ্ড রাখার ফলে ডিমের খোসার (shell) ভিতরের দিকে খুব পাতলা অথচ শক্ত চামড়ার একটি আবরণ (Thin skin of hard albumen) উৎপন্ন হয়। অধিকন্তু চিনি দ্বারা ডিমের খোসার সমস্ত ছিদ্রাংশ (pores) রুদ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় ডিম গুলি ঠাণ্ডা করিয়া ছাই ও ভুসির মধ্যে প্যাক্ করিয়া রাখিলে ছয় মাস কাল তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে। এক ভাগ ছাই এবং দুই ভাগ ভুসি খুব ভাল করিয়া গুড়া করিয়া প্যাকিং এর জন্য এক সংমিশ্রণ তৈয়ারী করিতে হয়। ইহার মধ্যে ডিমের সরু দিকটা নীচে দিয়া সাবধানে প্যাক্ করিতে হয়।

(৫) ফরাসী দেশের কোন কোন বিশেষজ্ঞ নিম্নলিখিত প্রণালী পছন্দ করেন।

একখানি porcelain dish এর মধ্যে দুই ছটাক beeswax লইয়া আগুনের সামান্য উত্তাপ দিয়া গলাইয়া লওয়া প্রয়োজন। অতঃপর ইহাকে এক পোয়া পরিমিত olive oil এর মধ্যে ফেলিয়া খুব ভাল করিয়া নাড়াচাড়া দিয়া একটী সংমিশ্রণ তৈয়ার করিতে হইবে; অতঃপর এই solution একটু ঠাণ্ডা হইলে এক একটী করিয়া তাজা ও টাটকা ডিম তাহার মধ্যে ডুবাইয়া লওয়া দরকার। ইহাতে ডিমের খোসার উপরে একটি প্রলেপ লাগিবে, এবং তাহাতে কৃত্রিম আবরণ উৎপন্ন হইবে। তেলের অংশ ডিমের খোসার মধ্যে ভিজিয়া যাইবে এবং মমের অংশ দ্বারা খোসার ছিদ্রগুলি বন্ধ হইবে। ইহার পরও যদি বেশী

মাত্রায় মোম ও তেলের সংমিশ্রণ ডিমের গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে সাধারণ কাপড়ের নেক্‌ড়া দ্বারা তাহা মুছিয়া ফেলা দরকার।

এইরূপ প্রলেপ দেওয়া ডিম গুলি ছাইয়ের গুঁড়ার মধ্যে সাবধানে প্যাক্ করিয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিলে তাহা বহু দিন পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকে। ফরাসী বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা দুই বৎসর পর্য্যন্ত ডিম গুলিকে টাট্‌কা রাখা যাইতে পারে। ইহাতে ডিমের স্বাদের ও কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

(৬) উপরে মোম ও olive oil এর যে সংমিশ্রণের কথা বর্ণিত হইল তাহা অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাধ্য। ইহার স্থলে এক প্রকার paraffine ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে paraffine সামান্য উত্তাপেই গলিয়া তরল হয়, যাহা গন্ধহীন, স্বাদহীন এবং সস্তা—তাহাই এই কাজের উপযুক্ত। এইরূপ paraffine এর প্রলেপযুক্ত ডিমকে lime pickle এর মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা কয়েক মাস পর্য্যন্ত বেশ টাটকা থাকে। ছাইয়ের গুঁড়ার মধ্যে এরূপ প্রলেপযুক্ত ডিমকে প্যাক্ করিয়া শীতল জায়গায় রাখিয়া দিলে তাহা এক বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করা যায়।

(৭) কেহ কেহ বলেন যে, শুষ্ক লবণের মধ্যে ডিমকে প্যাক্ করিয়া রাখিলেও বহু দিন পর্য্যন্ত তাহা টাট্‌কা থাকে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই প্রণালী দ্বারা বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নাই। কেবল ভুসির মধ্যে ডিম প্যাক্ করিয়া রাখিলে যে অবস্থা হয় কেবল চুনের মধ্যে রাখিলেও প্রায় সেই অবস্থা হইয়া থাকে। বরং আর্দ্র আবহাওয়াযুক্ত স্থানে চুন দিয়া প্যাক্ করা ডিম রাখিয়া দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৮) এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করিবার জন্য যখন ডিম প্যাক্ করিতে হয়, তখন নিম্নলিখিত মিশ্রণ ব্যবহার করা যাইতে পারে :—

৮ ভাগ ভুসি

১ ভাগ quick lime বা শুষ্ক চুণ

একত্র মিশ্রিত করিয়া খুব ভাল গুড়া তৈয়ারী করিতে হয়। এই গুঁড়ার দ্বারা ডিম প্যাক্ করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠান যাইতে পারে।

(৯) ডিমের খোসা non-porous অর্থাৎ ছিদ্রহীন করিবার জন্য আজকাল জার্ম্মানীতে water glass—silicate of soda—ব্যবহৃত হইতেছে। water গ্লাস হইতে প্রথমতঃ এক প্রকার পরিষ্কার syrupy solution তৈয়ার করা হয়। অতঃপর এই solution ডিমের খোসার গায়ে মাখাইয়া দিতে হয়। ইহাতে ডিমের গায়ে এক প্রকার thin, hard এবং glassy সর লাগিবে। উপরোক্ত solution আজকাল gum, waxe ও oil এর পরিবর্ত্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এরূপভাবে প্রলিপ্ত ডিম, ছাইয়ের গুঁড়া অথবা ছাই ও ভুসির সংমিশ্রণের মধ্যে প্যাক্ করিয়া রাখিলে দীর্ঘ দিন টাট্‌কা থাকিবে।

(১০) ছাইয়ের মধ্যে ডিম প্যাক্ করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া তাহা পরীক্ষা করা দরকার। ডিম যদি ভাল না হয় এবং পরিষ্কার ও শুষ্ক না হয়, তাহা হইলে বিশেষ যত্ন করিলেও তাহাকে বেশী দিন টাট্‌কা রাখা যায় না—বাওয়া হইয়া যায়। যে ডিমের খোসা ফাটিয়া গিয়াছে সেরূপ ডিম যদি ভাল ডিমের সঙ্গে প্যাক্ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ভাল ডিম গুলিও বিনষ্ট হয়। প্যাক করিবার সময় সর্ব্বদা ডিমের সরু দিকটা নীচের দিকে রাখিবার

ব্যবস্থা করা দরকার। ছাই অথবা অন্য কোন প্রকার গুঁড়ার মধ্যে যদি ডিম প্যাক্ করা যায়, তাহা হইলে যাহাতে একটী ডিমের খোসা আর একটি ডিমের খোসার গায়ে না লাগে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দুই ডিমের মধ্যবর্ত্তী ফাঁকা স্থানটী গুঁড়া দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বাবস্থায় ঠাণ্ডা জায়গায় ডিম রক্ষা করা প্রয়োজন। যে স্থানে ডিম রাখা যাইবে সে স্থানের উত্তাপের পরিমাণ যাহাতে ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত না হয় তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চা-এর বাজারের অবস্থা

কিছু দিন যাবৎ পৃথিবীর নানা দেশের চা-এর বাজারের অবস্থা মন্দা হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে চা ব্যবসায়ী এবং চা উৎপাদনকারী মহলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে চায়ের কৃষি বিশেষ লাভ জনক হইয়াছিল। তাই বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হইয়া প্রচুর পরিমাণ মূলধন চা উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত নানা প্রকার চাষ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ফলে ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে, চাহিদার অতিরিক্ত পরিমাণে চা প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কিছু কিছু করিয়া চা জমা হইতেছিল। এই জমার পরিমাণ এখন এত অধিক হইয়াছে যে, চা এর বাজারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকেই চিন্তিত হইয়াছেন। আপাততঃ উৎপাদন হ্রাস করা যায় কি না—তৎসম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের চা এর বাজারের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় —উত্তর ভারতের চা উৎপাদনকারীরা একটু শঙ্কিত হইয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের চা আসিয়া যাহাতে লণ্ডনের বাজার দখল করিতে না পারে তজ্জন্য ইহারা ১৯২৯ সালে একটু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে marketing order regulation অনুসারে বিলাতে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। সেই কমিটির নিকট বলা হয় যে,

লণ্ডনের বাজারে যাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে উৎপন্ন চা আসিয়া প্রতিযোগিতা করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আলোচনার পর কমিটি মন্তব্য করেন যে, এরূপ সংরক্ষণ মূলক কোন ব্যবস্থা করা সঙ্গত নহে।

অতঃপর ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে বিলাতের কর্তৃপক্ষ চা-এর উপর যে সকল শুল্ক ছিল তৎসমস্তই রহিত করিয়াছেন। ইহাতে চা-ব্যবসায়ী বৃটিশ বণিকগণ একটু বিপদে পড়িয়াছেন। মোটের উপর যে পরিমাণ চা উৎপন্ন হইতেছে কাটতি সে পরিমাণ হইতেছে না।

কেন এরূপ হইল ? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। একটি বিশিষ্ট চা-কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বলেন,—চা-এর উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার ব্যবহার তেমন ভাবে বাড়িতেছে না। আজ কাল অনেক যুবক চা পানের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিতেছেন। ইহারা নাকি চা-এর পরিবর্ত্তে অপর কিছু পান করিতে ভাল বাসেন। এই অভিযোগ কতটা সত্য —তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমাদের বাঙ্গলা দেশে চা-এর ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতা সহরের চা এর দোকান এবং তৈয়ারী চা বিক্রয়কারী—রেষ্টুরা-ন্টের ছড়াছড়ি দেখিলে মনে করিতে পারি না যে, এদেশে চা এর কাট্‌তি বাড়িতেছে না। আজ কাল পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত চা-এর প্রচলন হইয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও কোন কোন ব্যবসায়ী বলিতেছেন যে, বিলাতের বাজারে আর চা-এর কাট্‌তি বাড়িবে বলিয়া আশা হয় না। কাজেই বিলাতে কোন রূপ চেষ্টা না করিয়া ভারতে এবং আমেরি-কায় চা-এর কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। ইহারা মনে করেন যে, ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। এদেশের লোক সংখ্যা একটি মহা দেশের লোক সংখ্যা অপেক্ষা কম নহে। এই সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে চা-এর প্রচলন হইলে এই ভারতবর্ষেই কোটী কোটী টাকার চা বিক্রয় হইবে।

ভারতবর্ষে চা এর প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য কেহ কেহ প্রবল ভাবে প্রচার কার্য্যের (propag anda) পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাদের মতে আপা-ততঃ চা এর ব্যবসায়ে নূতন মূলধন নিয়োগ না করিয়া প্রচার কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ করা উচিত। এরূপ প্রচার কার্য্য যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে Indian tea Cess committeeর report এবং সাফল্যই তাহার জলন্ত প্রমাণ। ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ আমেরিকা; আমেরিকায় এখন প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ টাকার চা বিক্রয় হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে তথায় চা-এর কাটতি এবরূপ ছিল না বলিলেই চলে। অধুনা মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে মদ্য পান নিবারণের জোর আন্দোলন চলিতেছে। ইহার ফলে মদ্য পান বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অনেকে এখন কফি ছাড়িয়া চা ধরিয়াছে। এই সুযোগে চা ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে বিরাট ভাবে প্রোপা-গাণ্ডা করা হইতেছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকায় চা-এর জন্য যে একটি বিরাট বাজার সৃষ্টি হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কিন্তু যেমন তেমন চা-এর কাটতি বোধ হয় বাড়িবে না। কারণ আমেরিকাবাসীরা সক-লেই শিক্ষিত। নিকৃষ্ট শ্রেণীর চা-পান করিতে তাঁহারা রাজী হইবেন না। ইতি পূর্ব্বে রুশি-য়ায় প্রচুর চা বিক্রয় হইত। তন্মধ্যে ।৵০ আনা ৸৵০ আনা দামের মূল্যের নিকৃষ্ট চা-ই বেশী ছিল। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়ায় ১৮০০০০০০০

পাউণ্ড চা-এর কাটতি হইত। এখন তথায় ৫৪০০০০০০ পাউণ্ডের বেশী চা বিক্রয় হয় না।

রুশিয়ায় চা-এর কাটতি হ্রাস সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন। ইহার মূলে রাজনৈতিক কারণ ও থাকিতে পারে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাই বিশেষ অবহিত হইয়াছেন। রুশিয়ার ন্যায় প্রকাণ্ড দেশের ব্যবসা বাণিজ্য হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্য যাহাতে বঞ্চিত না হয় তাহার উপায় করিবার জন্ত সোভিয়েটের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার ফলে হয়ত আবার রুশিয়ার চা-এর কাটতি বাড়িবে। তবে রুশিয়াও এখন শিক্ষিত হইতেছে। তাহারাও এখন উৎকৃষ্ট চা-ই বেশী পছন্দ করে। এই অবস্থায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর চা-এর চাহিদা ভবিষ্যতে আরও কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। তবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা সম্পর্কে বিশেষ ভাবনায় কারণ বর্ত্তমানে যে সমস্ত চা উদ্বৃত্ত হইয়াছে—তাহার অধিকাংশই বোধ হয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর চা। কাজেই যাহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা-উৎপন্ন হয় তৎপ্রতি যত্নবান হওয়া চা ব্যবসায়ীদের কর্ত্তব্য।

বিগত ১৯২৬ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত কোন দেশ হইতে কি পরিমাণ চা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ পাউণ্ড হিসাবে দেওয়া হইল :—

বৎসর	উত্তর ভারত	দক্ষিণ ভারত	সিংহল	জাভা	সুমাত্রা
১৯২৬	৩১১০০০০০০	৪৪০০০০০০	২১৬০০০০০০	১১৯০০০০০০	১৭০০০০০০
১৯২৭	৩৩৩০০০০০০	৪৭০০০০০০	২২৭০০০০০০	১২৭০০০০০০	১৭০০০০০০
১৯২৮	৩২৭০০০০০০	৪৮০০০০০০	৪৮০০০০০০	১৩৪০০০০০০	১৯০০০০০০
১৯২৯	৩৭০০০০০০০	৫১০০০০০০	২৪৩০০০০০০	১৩৬০০০০০০	২০০০০০০০

এই তালিকার মধ্যে চীন দেশের হিসাব দেওয়া হয় নাই। তথায় প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু চা-এর প্রচলন তেমন বাড়িতেছে না। ১৯২৯ সালের শেষ দিকে লণ্ডনের চা-এর বাজারের অবস্থা সম্পর্কে Tropical life" নামক পত্রিকা লিখিয়াছেন—"১৯২৮ সালের শেষ দিকে দেখা গেল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অবিক্রীত চা প্রায় ৩০০০০০০০ পাউণ্ড জমা রহিয়াছে। তার পর ১৯২৯ সালে আমরা ভারতবর্ষ হইতে ২০০০০০০০ পাউণ্ড, সিংহল ১৬০০০০০০ পাউণ্ড এবং জাভা হইতে ৭০০০০০০ পাউণ্ড অতিরিক্ত চা আমদানী করিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে আরও প্রচুর পরিমাণ চা-আমদানী হইবার কথা আছে। খুব কম করিয়া হিসাব ধরিলেও ১৯২৯ সালের শেষে ৪০০০০০০০ পাউণ্ড পরিমিত চা উদ্বৃত্ত থাকিবে। * * * এই অবস্থায় আগামী বৎসরে ৪০০০০০০০ পাউণ্ড হইতে ৪৫০০০০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চা কম উৎপাদন না করিলে বাজারের সাধারণ অবস্থা ফিরিয়া আসিবে না।"

ইহাতে মনে হয় যে, চা-উৎপাদনকারী ও চা-ব্যবসায়ীদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। আবার অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, যাহাতে নানা দেশে চা-এর প্রচলন বৃদ্ধি পায়

তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। মোটের উপর, উভয় দিকেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

আজকাল নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে চা-এর চাষ করা হইতেছে। প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাতেই খুব বেশী করিয়া চা-এর কুঁড়ি গজাইতেছে। সে গুলি আবার বিশেষ বিবেচনা করিয়া সংগ্রহ করা হইতেছে না। যাহাতে বেশী চা-উৎপন্ন হয় তজ্জন্য অনেক বাগানের পরিচালক কুঁড়ির সঙ্গে বড় বড় পাতা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাতে খুব উৎকৃষ্ট রকমের চা উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না। ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। দেখিতে হইবে—পরিমাণে কম হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাপি চা-এর প্রকার যেন উৎকৃষ্ট হয়। অধিকন্তু প্রচার কার্য্যের সহায়ে চা-এর প্রচলন যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার উপায় করাও কর্ত্তব্য।

শিকার সংরক্ষণের উপায় ও Taxidermistএর ব্যবসা

আমাদের দেশে এখনও শিকারীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইহারা জঙ্গলে জঙ্গলে বন্য পশু শিকার করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। সাধারণতঃ শিকারীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমোদ উপভোগের জন্যই মধ্যে মধ্যে শিকার যাত্রা করিয়া থাকেন। আর এক দল শিকারী আছে যাহারা বনে বনে হিংস্র জন্তু শিকার করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের একটানা কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য অনুভব করিবার একটা প্রয়োজন আছে। তাহা না করিলে জীবন একরূপ দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। শিকার করিয়া এরূপ বৈচিত্র অনুভব করা যায়। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, হরিণ, বন্য মহিষ, গণ্ডার এবং জলের কুমীর প্রভৃতি শিকার করিতে পারিলে মনে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। আজকাল অনেক শিকারী আবার বড় বড় হিংস্র জন্তু শিকার করিয়া পদস্থ রাজ কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত করে এবং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ পুরস্কার ও পাইয়া থাকে।

অতঃপর সাধারণ শিকারীরা নাম মাত্র মূল্যে শিকারের সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দেয়। সৌখীন্ বড় লোকেরা তাহাও করেন না। শিকারের পর কয়েক দিন মৃত পশুকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া যখন ইহা পচিতে আরম্ভ করে তখনই ইহাকে অপসারিত করিয়া দেয়। অনেক সময় গভীর জঙ্গল হইতে আর ইহাকে জনপদ পর্য্যন্তই আনা হয় না—শিকারের জন্য নির্ম্মিত শিবিরের পাশেই ইহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ইহার ফলে শিকার হইতে আর্থিক লাভ হয় না এবং শিকারের আনন্দ স্থায়ীও হইতে পারে না। ইচ্ছা করিলে কিন্তু এই উভয়েরই সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ ইত্যাদির মৃতদেহ ফেলিয়া দেওয়ার সামগ্রী নহে। এগুলির হাড়, চামড়া লোম এবং শিং ইত্যাদি মূল্যবান্ জিনিষ। এই সমস্ত জিনিষকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিতে পারিলে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে।

তার পর আজকাল আবার মৃত পশুর চর্ম্ম, শিং, মস্তক ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিবার 'রেওয়াজ' দেখা দিয়াছে। এমন এক শ্রেণীর শিল্পী আছেন, যাঁহারা এই কার্য্য দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইহাদিগকে Taxidermist বলে। ইহারা মৃত পশুর চর্ম্ম, লোম, শিং এবং মস্তক ইত্যাদি ছাড়াইয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিশ্রুত করিয়া নানরূপ মাল মসলার সাহা

আবার তাহাদিগকে তাহাদের নিজের স্বাভাবিক আকার দিয়া গড়িয়া তুলেন এবং তাহা এমন জীবন্ত এবং life like হয় যে, দূর হইতে দেখিলে ইহাকে জীবন্ত পশু বলিয়া ভ্রম হয়।

অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে দেখা যায়—হরিণ, ব্যাঘ্র, সিংহ ইত্যাদির দেহের এক অংশ কিম্বা সমগ্র দেহটাই শুষ্ক করিয়া উপরোক্ত প্রণালীতে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। বিদেশ হইতে আগত শিল্পী দ্বারাই সাধারণতঃ এ সমস্ত কাজ করান হয়। কলিকাতায় Cathbertson Harper, perrot, perreria প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত Taxidermist এর দোকান আছে। ইহাদের কারখানায় সাধারণ কর্মচারীরা ভারতবাসী হইলেও আসল শিল্পীরা প্রায়ই বিদেশী। একথা সত্য যে প্রথমতঃ বিদেশীরাই এবিষয়ে পথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু অধুনা পাঞ্জাব হইতে আগত কয়েকটি মুসলমান দোকান Taxidermist এর কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এখনও ইহাদের সংখ্যা বেশী হয় নাই। ইহারা সাধারণতঃ শিকারীদের নিকট হইতে বন্য পশুর ছাল, শিং, মস্তক ইত্যাদি সস্তায় ক্রয় করিয়া রাখে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা শুষ্ক করিয়া পুনরায় জীবন্ত পশুর প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। বিদেশী দোকানদারেরা যে মূল্যে এই সামগ্রী বিক্রয় করেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে দেশীয় শিল্পীরা বিক্রয় করিতে পারেন।

শিক্ষিত ভদ্র যুবকেরা অনায়াসেই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। চিত্রাঙ্কন এবং প্রতিকৃতি-গঠন সম্পর্কে যাঁহাদের হাত আছে তাঁহারা ছয় মাসের মধ্যেই Taxidermist এর কাজ শিখিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের মনে হয়—এদেশের শিল্পীরা যদি বিশেষভাবে মনোযোগী হন, তাহা হইলে এই শিল্পের আরও উন্নতি সাধিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের শিকারীদের অবহেলা ও অজ্ঞতা বশতঃ অনেক মূল্যবান পশুর মৃতদেহ অযথা নষ্ট হয়। যাহাতে শিকারের সামগ্রী উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিয়া তাহা হইতে লাভবান হওয়া এবং শিকারের আনন্দ স্থায়ী করা যায়—তাহা সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ গভীর জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় পশু শিকার করা হয়। তথা হইতে Taxidermistএর নিকট এগুলিকে লইয়া আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। এই সময়ের মধ্যে তাহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাই অনেক শিকারী তাড়াতাড়ি শিকারের দেহ হইতে ছাল ছাড়াইয়া লয় এবং চুণ ও নুন মাখাইয়া তাহাকে তাজা রাখিবার বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে সকল সময়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। চামড়া পচিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। Taixidermist তখন এই চামড়া দ্বারা বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন না।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অনেক সময় অপরিপক্ক লোকের দ্বারা ছাল ছাড়ান হয়। সে যেমন ইচ্ছা ইহাকে কাটিয়া ও ছিঁড়িয়া ছাল ছাড়াইয়া লয়। ইহার ফলে উক্ত চামড়া Taxidermistএর কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে। অনেক মূল্যবান পশুর মৃতদেহ এইভাবে অযথা নষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্তের প্রতিকার কল্পে শিকারীদের অবহিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। একটু অভিনিবেশ সহকারে যদি তাহারা কয়েকটি বিষয় জানিয়া রাখেন, তাহা হইলেই শিকারের সামগ্রী দ্বারা তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারেন।

সম্প্রতি আমাদের মফঃস্বলস্থ জনৈক গ্রাহক দুইটী বেশ বড় Royal Bengal

Tiger এর চামড়া আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। উহার একটী ১১ ফুট কয়েক ইঞ্চি এবং আর একটী ৯½ ফুট লম্বা। বলা বাহুল্য এরূপ বড় এবং সুন্দর চামড়া সচরাচর পাওয়া যায় না। কিন্তু চামড়া দুইটীরই এমন করিয়া সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে যে তাহা Taxidermist দের নিকট একেবারে মূল্যহীন। দুইটী বাঘেরই পায়ের থাবা বা claws একেবারে হাটুর কাছ হইতে কাটিয়া ফেলিয়াছে। সম্ভবতঃ যাহারা চামড়া ছাড়াইয়াছিল তাহারা বাঘের নখের লোভে থাবা চারিটাই একেবারে কাটিয়া লই-য়াছে। তার পর বাঘের নাকের দুই পাশে যে লম্বা লম্বা রোঁয়া বা চুল থাকে, ইংরাজীতে যাহাকে whiskers বলে তাহার একটীও নাই। অথচ এই whiskers না থাকিলে বাঘের মুখের সকল শোভাই এবং reality নষ্ট হইয়া যায়; তাই Taxidermistরা Whiskers না থাকিলে চামড়া নিতে চায় না এবং যদিও নেয় তবে দাম অনেক কম দেয়। এই whiskers না থাকার মধ্যে অনেক মজার ব্যাপার আছে। সাধারণ পাঠকের কৌতূহলের জন্য এবং চামড়া সংগ্রহকারী-দিগের অবগতির জন্য আমরা এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম।

whiskersগুলি বাঘের স্পর্শবোধের এক প্রধান অঙ্গ। অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে বাঘ এবং বাঘের মাস্‌তুতো ভাই বিড়াল (বিড়াল এবং বাঘ আকৃতি প্রকৃতিতে ঠিক একই রকম বলিয়া লোকে বিড়ালকে রহস্য করিয়া বাঘের মাস্‌তুতো ভাই বলিয়া থাকে) কোনও জিনিষের ঘ্রাণ লইবার সময় যেমন নাক দিয়া শোঁকে, তেমনি whiskers দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। বাঘ, বিড়াল, কুকুর, বেজী প্রভৃতি মাংসভুক জানোয়ারের নিকট whisker এর তাই এত অধিক মূল্য, whiskers না থাকিলে ইহাদের স্পর্শ বোধের প্রধানতম অঙ্গই নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহারা একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া মানুষের মুখের শোভা যেমন গোঁফ, ইহা-দের মুখের শোভাও তেমনি whiskers বা গোঁফ। এখন বাঘের মুখের এই whiskers কেন লোপাট হইয়া যায় তাহার কথা বলি।

সাধারণ লোকের ধারণা এই যে বাঘের মুখের গোঁফে সাংঘাতিক বিষ আছে। এই ধারণা হবার মূলে যে একেবারেই কোন কারণ নেই এ কথা বলা যায় না। বাঘ প্রায়ই পচা মাংসাদি খাইয়া থাকে এবং ক্রমাগত এই সকল পচা মাংসের সংস্পর্শ লাগায় ইহাদের গোঁফ সদাই বীজাণু পূর্ণ এবং বিষাক্ত থাকে। সুতরাং এই গোঁফ যদি কোনও সুস্থ ব্যক্তির ক্ষতের সংস্পর্শে আসে বা রক্তের সহিত সংস্পর্শ লাগে তবে সেই ক্ষত বিষাক্ত হইয়া মারাত্মক হইতে পারে। তাহা ছাড়া বাঘের গোঁফে যে বিষ আছে এ ধারণা প্রচারিত হইবার আর একটী কারণ আছে। বাঘ যখন স্রোতের জল পান করে তখন জলের গতির দিকে মুখ রাখিয়াই পান করে, যাহাতে তাহার মুখের ভিতর গোঁফ ঢুকিতে না পারে সে জন্য সে বিধি-মতে চেষ্টা করে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বাঘের গোঁফে বিষ আছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। গোঁফে কোনও রকমের বিষ নাই; কিন্তু পচা মাংসের সংস্পর্শে লাগিয়া লাগিয়া উহাতে সর্ব্বদাই বীজাণু থাকে। যদি গোঁফগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া sterilize বা বীজাণু শূন্য করা যায়, তবে সেই গোঁফ সর্ব্বপ্রকার দোষমুক্ত হয় এবং তখন তাহা নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যাইতে

পারে। অনেকের ধারণা—যেমন সাপের দাঁতে বিষ আছে ; ফলতঃ সাপের কোনও দাঁতে কোনও বিষ নাই। কেবল উপরের পাটীর দুইটী দাঁতের গোড়ায় যে থলি আছে, সেই থলির মধ্যে বিষ থাকে। এই দাঁত দুইটী hollow বা ফাঁপা ; বিষের থলির সহিত এই ফাঁপা দাঁতের এরূপ ভাবে সংযোগ আছে যে, সাপ রাগিয়া ছোবল্ মারিলে বিষের থলিতে যাইয়া চাপ পড়ে এবং সেই চাপের ফলে থলির ভিতর হইতে খানিকটা বিষ ফিন্‌কি দিয়া জোরে বাহির হইয়া পড়ে এবং ক্ষতের মুখে পড়ায় রক্তের সহিত যাইয়া মিলিত হয়। শুধু ছোবল্ মারিলেও হয় না। ভাল করিয়া বিষ ঢালিতে হইলে কামড়াইয়া সাপ তৎক্ষণাৎ মাথা বাঁকাইবার বিশেষ চেষ্টা করে। এইরূপ মাথা বেঁকাইতে পারিলে ক্ষতের মুখে থলির সমস্ত বিষটাই সে ঢালিয়া দিতে পারে। এইরূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তি দেখিতে দেখিতেই ঢলিয়া পড়ে। সাপে কামড়াইলে মানুষ মরে দেখিয়া সাধারণ লোক ধরিয়া নিয়াছে যে সাপের দাঁতেই বিষ আছে। ফলতঃ সাপের দাঁতে বিষ নাই ; যদি বিষ থাকিত, তবে সাপ আপনার খাতাদি খাবার সময় নিজের বিষেই নিজে মরিয়া যাইত। তেমনি বাঘের গোঁফে কোনও বিষ নাই ; কেবল পচা মাংসের সংস্পর্শে থাকায় উহার স্পর্শ বিষাক্ত হইতে পারে। ইহা দেখিয়াই লোকে ধরিয়া নিয়াছে যে বাঘের গোঁফে বিষ আছে ; সুতরাং বাঘ মারা পড়িলে যাহারা চালাক তাহারা সস্তায় বিষ সংগ্রহ করিবার প্রলোভন এড়াইতে পারে না। ইহারা অন্যের অলক্ষ্যে দুই চারি গাছা করিয়া গোঁফ ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া লয় ; এবং এইরূপে দুইএকজন করিয়া নিতে নিতে বাঘের মুখ প্রায়ই গোঁফ্ শূন্য হইয়া পড়ে। ইহারা আপন আপন শত্রু মারিবার আশাতেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপে গোঁফ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় কারণ শিকারীদের নিজের অন্ধ বিশ্বাস। বনে জঙ্গলে অশিক্ষিত শিকারীর সংখ্যা কম নহে ফলতঃ যে সকল চামড়া কলিকাতার ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয়ের জন্য পাঠান হয়, তাহার প্রায় ষোল আনাই এই সকল অশিক্ষিত শিকারীর নিকট হইতেই সংগৃহীত হয়। ইহাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে বাঘের গোঁফে কোনও একটা বিশেষ যাদু বা মোহিনী শক্তি আছে যাহার ফলে জঙ্গলের অপদেবতারা তাহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা বাঘ, সিংহাদি শিকার করিবামাত্র তাহার গোঁফ কাটিয়া লয় এবং মাদুলী, তাবিজ প্রভৃতির মধ্যে রাখিয়া উহা ধারণ করে। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই মাদুলীকে তাবিজ করিয়া গভীর জঙ্গলে গেলেও বাঘ, ভালুক বা অন্য কোনও বন্য জন্তু তাহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ফলে ইহা যে একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা, তাহা প্রতি বৎসর এই সকল মাদুলী ও তাবিজ ধারক বহু শিকারীর বাঘের হাতে জঙ্গলে অপমৃত্যু হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

যাঁহারা এই সকল বন্য জন্তুর চামড়া সংগ্রহের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের উচিত এই সকল কথা শিকারী এবং তাহাদের অনুচরদের বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলা। যে কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করিলে এই সকল চামড়া খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে আমরা এইখানে তাহা উল্লেখ করিতেছি :—

১। মুখের গোঁফ কখনও কাটিবেনা বা কোনও রূপে নষ্ট হইতে দিবে না।

২। বাঘের মুখ, নাক ইত্যাদি কাহাকেও নষ্ট করিতে দিবে না।

৩। বাঘের থাবা, নখ ইত্যাদি কিছুই কাটিয়া ফেলিবে না বা কাহাকেও বাঘের নখ নিতে দিবে না। প্রত্যেক থাবায় যে পাঁচটী করিয়া নখ থাকে সে নখগুলি কেহ যেন কাটিয়া না লয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। বাঘের নখ না থাকিলে চামড়ার দাম কমিয়া যায়। Taxidermistরা যখন বাঘ গড়ায়, তখন এই নখ না থাকিলে তাহাদিগকে আলাদা তাহা কিনিতে হয়। সব সময় যেমন বাঘের নখ পাওয়া দুর্ঘট তেমনি এক একটী নখ কিনিতে ২।৩ টাকা দাম লাগে।

৪। চামড়া ছাড়াইবার পর বাঘের মাথা সকলেই ফেলিয়া দেয়। কিন্তু উহা কদাচ ফেলিয়া দিবে না। বাঘের মূর্ত্তি গড়াইবার সময় আসল মাথা না থাকিলে Taxidermist দিগকে size করিয়া চামড়ার অনুরূপ মাথা গড়াইতে হয়। কিন্তু আসল মাথা পাইলে তাহাদের এজন্ত আর অনর্থক খাটিতে হয় না। তাহা ছাড়া মাথা থাকিলে বাঘের আসল দুই পাটী দাঁতও পাওয়া যায়। দাঁত না বসাইতে পারিলে বাঘের মূর্ত্তিই গড়া যায় না এবং দাঁতহীন বাঘের মুখের কোন মূল্যই থাকে না। এই জন্ম Taxidermistরা বাঘের মাথার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করে।

৫। বাঘের চামড়া ছাড়াইবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে যেন কোথাও ছুরীর দ্বারা কাটিয়া না যায়। এইরূপ কাটিয়া গেলে সেই চামড়ার কোনও মূল্য থাকে না।

৬। চামড়া ছাড়াইয়াই তাহার কাঁচা পিঠে নুন ও ফটকিরি ছিটাইয়া দিবে। ইহার পরিমাণ এক গুণ ফটকিরি এবং দুই গুণ নুন এই হিসাবে দিতে হইবে। এইরূপ হিসাব মত /১।/২ সের আন্দাজ নুনও ফটকিরি মাখাইয়া পরে এই চামড়া শুকাইয়া লইতে হইবে। ছায়ায় শুকানো ভাল; নুন ও ফটকিরি গুলিয়া তাহাতে চামড়াটী ৫।৬ দিন ডুবাইয়া রাখিলে আর সে চামড়ার কোন অনিষ্ট হইবে না। এইরূপে রক্ষিত চামড়া কলিকাতায় পাঠাইলে তাহা দীর্ঘ কালেও নষ্ট হয় না এবং বাজার মন্দা থাকিলে (যেমন এ বৎসর হইয়াছে) চামড়া বিক্রয় না করিয়া ভাল দরের জন্ত অপেক্ষা করা যায়।

৭। চামড়া ছাড়াইবার সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে যে কোথায়ও যেন মাংস থাকিয়া না যায়। অথচ মাংস তুলিবার চেষ্টায় আবার ছুরীর আঘাতে চামড়া কাটিয়া না যায়।

৮। পূর্ব্বের পরিমাণ মত অন্ততঃ ২।৩ বার চামড়াটীর কাঁচা পিঠে নুন ও ফট্‌কিরীর গুড়া মাখাইয়া ছায়ায় শুকাইয়া নিতে হয়।

৯। এই বার কাঁচা চামড়ার গায়ে নখ অথবা ভোঁতা ছুরী (Blunt Knife) দ্বারা ঘসিলে কাগজের মত অনেক পাতলা পাতলা চামড়া উঠিয়া আসে। গুপারীর পাতার খোলের দিকে কাগজের মত পাতলা যে খোসা আছে, এও ঠিক সেই রকমের পাতলা চামড়া। যতক্ষণ এই চামড়া উঠিতে থাকিবে ততক্ষণ ধরিয়া তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ফলতঃ যে যত বার এবং যতক্ষণ ধরিয়া ধৈর্য্যের সহিত এই চামড়া উঠাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে, চামড়া তাহার তত উচ্চ দামে বিক্রয় হইবে। এই পাতলা চামড়া বা জেলী দীর্ঘ দিন চামড়া অবিকৃত রাখার পথে সর্ব্ব প্রধান অন্তরায়। এই জেলী যদি চামড়ার গায়ে লাগিয়া থাকে তবে তাহা চামড়ার সমস্ত রোমের মূল একেবারে শিথিল করিয়া দেয়; সুতরাং রোঁয়া শীঘ্র শীঘ্র পড়িয়া যাইয়া চামড়াকে

একেবারে শ্রীহীন করিয়া ফেলে। এই জন্ম চামড়া ছাড়াইয়া লইয়াই তাহাতে নুন ও ফটকিরির গুঁড়া মাখাইয়া শুকাইয়া এই জেলী বা পাতলা চামড়া তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। প্রয়োজনানুসারে ২।৩ বার এই মিশ্রণ মাখাইয়া চামড়া শুখাইয়া লইয়া পাতলা জেলী গুলি তুলিয়া ফেলিবে।

১০। অতঃপর—একনাদা জলে পূর্ব্বের পরিমাণ মত নুন ও ফটকিরি গুলিয়া তাহার জলে চামড়াটী ডুবাইয়া রাখিবে। এই জলে পূর্ব্বের পরিমাণ অপেক্ষা নুন ও ফটকিরীর পরিমাণ বেশী কম হইলে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নাই। চামড়া জলের মধ্যে যাহাতে ডুবিয়া থাকে এই জন্ম উহার উপর একখানি ইট বা পাথর চাপা দিয়া রাখিতে হয়। ৪।৫ দিন এই জলে ডুবাইয়া রাখিয়া পরে চামড়াটী ছায়ায় শুখাইয়া লইলে এই চামড়া দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

এইরূপ নিয়মে চামড়া ছাড়াইয়া pickle করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলে দীর্ঘ দিন সে চামড়া অবিকৃত থাকে, তাহার কোনও অনিষ্ট হয় না। বাজার যদি মন্দা থাকে (যেমন এ বছর হইয়াছে) তাহা হইলে তাড়াতাড়ি যে কোনও দরে চামড়া না বেচিয়া ভাল দর পাইবার জন্ম নিঃসন্দেহে অপেক্ষা করা যায়, কারণ চামড়া নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

অতঃপর আগামী মাস হইতে আমরা শিকারীর জ্ঞাতব্য বিষয় এবং Taxidermistএর কারবারের বিষয় সম্যকরূপে আলোচনা করিব। ইহাতে বেকার যুবকেরা আর একটি উপার্জ্জনের পথের সন্ধান পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

১। আমরা বৈশাখ সংখ্যা ভিঃ পিঃ করতঃ ৩৭ সালের বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে চাহি।

২। এ বৎসর যাঁহাদের গ্রাহক থাকার ইচ্ছা নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তাহা জানাইবেন।

৩। যাঁহাদের গ্রাহক থাকার ইচ্ছা আছে অথচ বৈশাখ মাসে টাকা দেবার সুবিধা নাই তাঁহারা আশ্বিন মাসের পূর্ব্বে যে কোনও সময় টাকা দিতে পারেন। কোন্ মাসের কাগজ ভিঃ পিঃ করিলে তাঁহাদের সুবিধা হয় তাহা জানাইলে বৈশাখে ভিঃ পিঃ না করিয়া সেই মাসে ভিঃ পিঃ করিতে পারি।

৪। যাঁহারা কোনও সংবাদ না দিবেন তাঁহারা ৩৭ সালেও গ্রাহক থাকিবেন বলিয়া আমরা বুঝিব এবং তদনুযায়ী বৈশাখ সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ করিব।

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, অকারণ—কেহ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

বিলাতের ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটী বিরাট জুয়াচুরীর কাহিনী

কিছু দিন হইল—বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত মামলা মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ বি, কে, লাহিড়ী আর ও কয়েক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সর্ব্বশেষ মামলায় তিনি জাল হিসাব পত্র উপস্থিত করার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অভিযোগের উত্তরে আদালতের নিকট মিঃ বি, কে, লাহিড়ী যে বর্ণনা উপস্থিত করেন তাহাতে তিনি বলেন—মোটের উপর কোন মন্দ অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই একথা বিশ্বাস করিতেন যে, অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে না পারিলে এবং চিরকাল অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ভারতের মুক্তি আসিতে পারে না। তাই তিনি দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রমুখ কয়েকটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি স্বয়ং সংস্পৃষ্ট ছিলেন এবং অপরাপর অনেক স্বদেশী কারবারকে অর্থ সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই; ফলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

বর্ণনার উপসংহারে মিঃ বি, কে, লাহিড়ী বলেন—"আমি আজ পথের ভিখারী। আমার স্ত্রী পুত্র পরিবারের আজ কোনই সহায় সম্বল নাই।"

এই সমস্ত কথা বলিয়াও মিঃ বি, কে, লাহিড়ী তাহার অক্ষমতা ও অকৃতকার্য্যতার জন্য দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় আছে—"failure, however noble, must have its reward"

মিঃ লাহিড়ীর এই বর্ণনার সহিত বিলাতের মিঃ ক্লারেন্স হ্যান্ট্রির বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। Clearance Hantryর পতন উপলক্ষে বিলাতের ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই Hantry এক জন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। সামান্য কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াই তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। অর্থ সামর্থ্য সামান্য থাকিলেও তাঁহার ধারণা কিন্তু সর্ব্বদাই খুব বড় ছিল। বুদ্ধি বিবেচনা এবং বিচক্ষণতায় তিনি বিশিষ্ট অর্থনীতিজ্ঞগণের সমকক্ষ ছিলেন। তাই অল্প দিনের মধ্যে তিনি বিলাতের ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। দেখিতে দেখিতে ব্যবসায় সম্পর্কে তাঁহার কয়েক জন বড় বড় সঙ্গীও জোটিল। ইহাদের সাহায্যে ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিবার একটা বড় রকমের কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হয়।

নানা কারণে বিলাতের ইস্পাত শিল্পের দুর্দ্দশা

উপস্থিত হইয়াছে। Hatryএর পক্ষ হইতে আদালতের নিকট তাহার কৌশুলী যে বিবরণ উপস্থিত করেন তাহাতে দেখা যায়—এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য Hatry তাহার বন্ধুগণকে লইয়া অগ্রসর হন।

বিগত ১৯২০ সাল হইতে বিলাতের united Steel Companiesগুলি লভ্যাংশ বিতরণ করা বন্ধ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে ইহারা যথেষ্ট টাকা ধার করিয়াছে। এই সমস্ত টাকা যথারীতি পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। ফলে বিলাতের ইস্পাত শিল্পের দুর্দশার এক শেষ হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার করিয়া ইস্পাত শিল্পকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে এক দিকে যেমন স্বদেশের উপকার হইবে—অপর দিকে তেমনি নিজেরও আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। এই মনে করিয়া Hatry ইস্পাত শিল্পের পুনরুদ্ধারে হস্তক্ষেপ করেন। মিঃ Hatry তখন বলিয়াছিলেন—"কোম্পানীর সমস্ত মূলধন আমি ক্রয় করিব, ব্যাঙ্কের নিকট যে ধার আছে তাহা পরিশোধ করিব এবং কারবার চালাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে (working Capital) তাহার ব্যবস্থা করিব।"

Hatry আরও প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, পুরাতন কোম্পানীর অংশীদারগণ তাঁহাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন। কারণ প্রথমতঃ তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্বতন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য দিবেন। তখন তাহারা সেই অর্থই পুনরায় নূতন কোম্পানীতে নিয়োগ করিবেন। বস্তুতঃ Hatry অনেক লাভজনক সর্ত্ত রাখিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার আশা ফলবতী হইল না—পুরাতন অংশীদারগণ যখন অনেক দিন পরে তাহাদের প্রাপ্য অর্থ হস্তগত করিলেন তখন তাহারা মনে করিলেন যে, ইস্পাত শিল্পের পুনরুন্নতি অসম্ভব। Hatry যতই চেষ্টা করুন না কেন বর্ত্তমান সময়ে ইহার অবস্থা ফিরিবার আশা নাই। তাই তাহারা নূতন কোম্পানীর দিকে সুনজর দিলেন না।

Hatry কিন্তু ইহাতেও দমিলেন না। তিনি অংশীদারগণের প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দিলেন। প্রথমেই তাহাকে এক সঙ্গে ৪০০০০০০ পাউণ্ড অর্থ নিজের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিতে হইল। অতঃপর তিনি পুরাতন অংশীদারগণের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

এই অবস্থায় তিনি কেবল তাঁহার নিজের সম্পদের এবং বন্ধু-বান্ধবের সম্পদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। পুরাতন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কের নিকট যে টাকা ধার করিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ করিবার সময় আসিল এবং নূতন কোম্পানীর কাজ চালাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইল। তার পর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইস্পাত শিল্পের কারবার হাতে লইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যাপারে Hatry জড়িত ছিলেন, সেই সমস্তের জন্য ও কিছু টাকা বাকী পড়িয়াছিল। এক সঙ্গে এই সমস্ত অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় Hatry ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

অতিকষ্টে তিনি নূতন কারবারের জন্য ৪৮০০০০০ পাউণ্ড অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৫০০০০০ পাউণ্ড আদায় জরুরী ঋণ পরিশোধ এবং পুরাতন কোম্পানীর অংশ ক্রয়ের জন্য ব্যয় হইয়া গেল। তখন নিরুপায় হইয়া Hatry অপর দিকে অর্থ সংগ্রহের জন্য বহির্গত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্যবসায়ী মহলে Hatry বেশ সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই তিনি

কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটি এবং ট্রাষ্ট প্রভৃতির জন্ত অতি অল্প পরিমাণ কমিশন লইয়া ঋণ সংগ্রহ করিয়া দিবার কাজ লইলেন। এখানেই তাঁহার অধঃপতন আরম্ভ হইল।

প্রথমতঃ Hatry এবং তাঁহার সহকর্মীগণ প্রাণপণে উপরোক্ত মিউনিসিপ্যালিটির Security বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই টাকা গুলি প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ সকল টাকা দেওয়া হইল না। তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু ইস্পাত শিল্পের পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় করা হইল। কিন্তু ইহাতে ও Hartyর অভাব মিটিল না। চারিদিক হইতে তাগিদের উপর তাগিদ আসিতে লাগিল। মামলার শুনানীর সময় আসামী পক্ষের কৌসুলী বলিয়াছেন—এই ব্যাপারে Gialdini নামক আর এক ব্যক্তি Hatryর সহকারী ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের Security জাল করিবার সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বে তিনি মরিয়া হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তাগিদ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"এ সময়ে যদি অর্থের সংস্থান না হয় তবে আর আমাদের মান বাঁচিবে না। আমি আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না। এই অবস্থায় গুলি করিয়া আত্মহত্যা করাই একমাত্র উপায় দেখিতেছি।"

সে যাহাই হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত জাল Security বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করার প্রস্তাবে Hatry সায় দিলেন।

Wake field এর কৃত্রিম stock বিক্রয় করিয়া Equitable Trust Company হইতে প্রথমেই ২০০০০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করা হইল। তার পর লয়েড ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রকৃত (gennine) Swindon scrip দিয়া ২০০০০০ পাউণ্ড, জাল gloucester scrip দিয়া ২৮০০০ পাউণ্ড এবং জাল Wake field scrip দিয়া ২০০০০ পাউণ্ড গ্রহণ করা হইল। Barchay's Bank এর কথা মামলায় সময় বলা হয় নাই। কিন্তু Hatry এর ব্যাপারে উক্ত ব্যাঙ্কের ৭৩০০০০ পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া চেয়ারম্যান তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কারবারে নিয়োগ করা হইতেছিল। Hatry মনে করিয়াছিলেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার কারবার লাভজনক হইয়া উঠিবে এবং আপাততঃ জাল করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি সমস্ত অর্থই পরিশোধ করিয়া দিবেন। কিন্তু জাল জুয়াচ্চুরি বেশী দিন ঢাকা থাকে না। ক্রমে ক্রমে তাহা ধরা পড়িয়া গেল। Hatry ধরা পড়িলেন। এত সব বড় বড় কারবারের সহিত তাঁহার যোগ ছিল যে, ইংলণ্ডের ব্যবসায়ের বাজারে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তিনি নিজকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে Old Baibyর আদালতে হাজির হইয়া Hatry তাঁহার অপরাধ স্বীকার করিলেন। লঘু দণ্ডের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

বিচারের ফলে তাহার প্রতি ১৪ বৎসর Penal Servitude অর্থাৎ কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাহার সহকর্মী আরও দুই ব্যক্তিকে পাঁচ ও সাত বৎসর করিয়া কারাদণ্ড প্রদান করেন। এই ঘটনার পর লণ্ডনের বাজারে Security বিক্রয় সম্পর্কে নানা প্রকার কল্পনা জল্পনা চলিতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ব্যাপার আর না ঘটে তজ্জন্য কড়াকড়ি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব চলিতেছে। এইরূপ প্রকাণ্ড জাল ও ষড়যন্ত্রের মামলা লণ্ডনে খুব বেশী হয় নাই। যাঁহারা বলেন যে ইউরোপীয়গণ একেবারে সাধু আর এ দেশী লোক ঠগ, তাঁহাদিগকে এই ব্যাপারটী ভাল করিয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয় এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের ৪২৭২ নং পুরাতন গ্রাহক। আপনার পত্রিকা পাঠে উৎসাহিত হইয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এখন অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত দোকান গুলির বিস্তারিত বিবরণ জানাইলে বাধিত হইব।

১। কলিকাতায় কোন্ দোকানে সুবিধাদরে বাই-সাইকেল পাওয়া যায়, তাহার নাম ও ঠিকানা।

২। কলিকাতায় কুঠার, ক্ষুর, চাঁচ বাটালি ইত্যাদি লোহার জিনিষ কাহার নিকট পাওয়া যায়।

৩। কাগজ, খাতা, একসারসাইজ বুক, ষ্টেশনারী প্রভৃতি উত্তম জিনিষ কোথায় পাওয়া যায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক নাম ও ঠিকানা জানাইবেন। ইতি—

শ্রীমাণিক চন্দ্র হাজরিকা।

১নং পত্রের উত্তর

আমরা যে কয়েকটী দোকান খুব ভাল এবং বিশ্বাসী বলিয়া জানি, তাহার নাম ঠিকানা দিলাম :—

সাইকেলের দোকান :—

১। মেসার্স ঘোষ এণ্ড সন্স—৬নং হ্যারিসন রোড।

২। Nundy Brothers—84 Dharmatala Street,

৩। Standard Cycle Coy.—59 Harrison Road and 12 Esplanade East

৪। Messrs. M. L. Shaw Ld.—5 1 Dharamtala Street.

৫। Mullick Brothers—182 Dharamtala Street.

যন্ত্রপাতির দোকান :—

১। Gopal Chandra Das & Co. Ld, 86|2 A Clive Street.

২। A. N. Hussannally & Co. 28 Strand Road.

ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি :—

১। Indian Pioneer Coy Ltd. 1 Shama Charan Dey Street.

২। C. M. Soor & Co. 105 Radha Bazar Street. Calcutta.

২নং পত্র

মহাশয়,

আমি বিশ্বস্ত 'ব্যাঘ্র চর্ম্মের' ক্রেতার সন্ধান চাই। আমি বর্ত্তমানে কয়েকটা চামড়া সংগ্রহ করিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ঐরূপ একটী firmএর ঠিকানা জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। আশা করি আপনি কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সঠিক সংবাদ দানে উপকৃত করিবেন। নিবেদন ইতি —

Yours Faithfully
Md. Golam Mowla
67, Teomall Quarters
Po. Lalmonirhat
Dt. Rungpur

২নং পত্রের উত্তর

যাহারা Taxidermists তাহারাই বেশী দামে বাঘের চামড়া কেনে। এ সকল চামড়া ঘরে বসিয়া—চিঠির দ্বারা বেচা চলে না। হয় নিজে কলিকাতা আসিতে হয়, নচেৎ কোনও বিশ্বাসী লোকদ্বারা কলিকাতার Taxidermistদের দোকানে দোকানে চামড়া দেখাইয়া তবে দাম দর ঠিক করিতে হয়। মফঃস্বল হইতে সাধারণতঃ শিকারীগণ যে সকল চামড়া বেচিতে পাঠায়, তাহার অধিকাংশই Taxidermistদের ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায় প্রেরিত হয়; সুতরাং বাজার মন্দা থাকিলে (যেমন এবার হইয়াছে) মাল বেচা কঠিন হয় এবং বেচিতে পারিলেও যৎসামান্য মূল্য পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ এই মাসের কাগজে বাহির করা হইয়াছে। তাহাতে সব জানিতে পারিবেন। Cuthbertson, Harper & Co. কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিশ্বাসী Taxidermist

---

৩নং পত্র

নিবেদন,

আপনাদের "ব্যবসা বাণিজ্য"র মারফতে অনেক প্রকার Companyর সংবাদ দেখিয়া থাকি, সেই জন্য নিম্নলিখিত ২টী কোম্পানীর অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করি; পত্রাদির দ্বারাও উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের কোন সাড়াশব্দ পাইতেছি না। আপনার জানা থাকিলে দয়া করিয়া লিখিলে এখন নিশ্চিন্ত থাকিব।

প্রথম—The Ganges rice Mills Ld, Head Office—28 Pollock Street. Cal.

18-12-19 তাং প্রথম Callএর টাকা দিয়াছি, 8 4 21 তাং টাকা শোধ করিয়াছি। ২য়টী—The Kalol Cotton Mills Co. Ld.)
Incorporated in Baroda State.

1st Call দিয়াছি—19-7-20
agents—Mohan Lal Amehata Bros.
Regd. Office—Kalol (N Gujrat)

আশা করি সত্বর উত্তর দানে বাধিত করিবেন। নিবেদন—ইতি।

ভবদীয়—
শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
পোঃ করাটীয়া
ময়মনসিং

৩নং পত্রের উত্তর

ইহাদের সম্বন্ধে জানিতে হইলে Registrar of Joint Stock Companies এর আপিসে Searching fee দিয়া প্রথমে Last Balance Sheet, Shareholdersদের List ইত্যাদি দেখিতে হয় এবং তখন প্রয়োজনানুযায়ী কাগজাদির নকল লইয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে হয়। হয় আপনি নিজে কিম্বা কলিকাতায় কোনও আত্মীয় বন্ধুর দ্বারা এই খোঁজ নিতে পারেন, নচেৎ খরচাদি পাঠাইলে আমরা করিয়া দিতে পারি।

৪নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন বিষয়টি সত্বর জানাইলে বাধিত হইব। সরিষা বীজ হইতে তৈল বাহির করিবার কোন হস্ত চালিত যন্ত্র আছে কি? থাকিলে তাহার মূল্য, প্রাপ্তিস্থান এবং বিস্তৃত বিবরণ, যত সত্বর সম্ভব জানাইয়া সুখী করিবেন।

বিনীত নিং
শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস।

৪নং পত্রের উত্তর

সরিষার তেলের হস্তপরিচালিত কোনও কল আজিও পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে Messrs K. L. Mukherjee & Co কে উৎসাহিত করিয়া আমরা হস্তচালিত সরিষার কল তৈয়ারী করাইয়া ছিলাম; কিন্তু তাহা চালাইতে এত বেশী জোর লাগে যে কুলীরা ২ ঘণ্টা একাদিক্রমে কল ঘুরাইতে পারে না। এই জন্য সে কল উঠিয়া গেল। তাহার পর আর কাহাকেও এ পর্য্যন্ত হস্তচালিত সরিষার তেলের কল বাজারে বাহির করিতে দেখি নাই।

৫নং পত্র

মহাশয়,

আমি ৩৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যা পত্রিকায় সাবান প্রস্তুতের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি। আমি আবশ্যক মত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া উহা প্রস্তুত করিয়াছি এবং তাহাতে বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছি।

আমি যাহা সাবান প্রস্তুত করিয়াছি তাহা পরীক্ষায় জানা গেল যে খুব ভাল জিনিষ হইয়াছে, তবে খরচা একটু বেশী হইয়াছে। আমার এই অনুরোধ যে, আমাকে এ বিষয়ে আপনাদের একটু সাহায্য করিতে হইবে, যাহাতে কলিকাতায় অন্ততঃ মাসিক বিশ, পচিশ মণ সাবান বিক্রয় করিতে পারি আপনাকে সে বিষয়ে আমার একটা

সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেই হইবে ; তজ্জন্য আপনাদের যদি কিছু পাইবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি এবং প্রত্যেক গ্রাহক মাত্রকেই আপনারা এরূপ বিষয়ে যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া তাহাদের মাল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন তাহা আপনাদের মহত্ত্বতার পরিচয়। যদিও জিনিষ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমি উহার আকার পিণ্ডাকার না রাখিয়া কোন একটা বিশেষ আকার করিয়াছি। অর্দ্ধপোয়া সাবানে ৫খানি কাপড় বেশ ফর্সা হইবে ; আমি ব্যবহার করিয়া ৫খানি কাপড় ভালরূপ ফর্সা করিয়াছি ; সুতরাং এরূপ জিনিষ কিরূপ দরে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন এবং আপনাদিগকেও বা কিরূপ নিয়মে কত দিতে হইবে এবং sample প্রয়োজন হইলে তাহা কতটা পরিমাণ পাঠাইব দয়া করিয়া পত্র পাট মাত্র আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। আমি স্যাম্পল যে জিনিষ দেব সমস্ত জিনিষই ঠিক সেইরূপই হইবে। আমি কেবল আপনার নিকট এই সাহায্য চাই যে আমাকে মাসিক বিক্রয়ের একটী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাধিত করিবেন। এবং চিরদিনই আপনার প্রত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিবেন।

মহুয়া উভাস কোথায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায় তাহাও দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র পারিয়াল
গ্রাহক নং ৩০৯৬
চালুয়াড়ি
সাইঘর পোঃ
জেলা ২৪ পরগণা।

৫নং পত্রের উত্তর

আমাদের কাগজে প্রকাশিত ফরমুলা অবলম্বন করতঃ আপনি উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। মাল কাটাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আপনি অনুরোধ করিয়াছেন ; কিন্তু ইহা আমাদের লাইন নয়, তাহা ছাড়া পত্রিকা সম্পাদন করিতে আমাদিগকে সব সময় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। দেশ বিদেশে নানারূপ ব্যবসায়ের সন্ধান এবং এই সকল প্রবন্ধ সঙ্কলনাদি করিবার জন্য দিবা রাত্রি আমাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় ; সুতরাং গ্রাহকদিগের মাল কাটাইবার জন্য যে সময়, চেষ্টা ও পরিশ্রমের দরকার তাহা করিবার আমাদের অবসর কোথায় ? এই জন্যই আমরা বেকার যুবকদিগকে এই সকল মাল কাটাইবার জন্য ক্যানভ্যাসিং করিতে বহুবার পরামর্শ দিয়াছি। ফলতঃ দেশের মধ্যে যত বেশী পরিমাণে এইরূপ Commercial Canvaserএর সৃষ্টি হইবে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ততই প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমরা আপনার পত্র এইখানে ছাপাইয়া দিলাম এবং যদি কোনও উদ্যোগী যুবক আপনার সাবান কাটাইবার চেষ্টা করেন এই জন্য আপনার নাম ঠিকানাও ছাপাইয়া দিলাম।

কলিকাতায় যে সকল তেলের কল আছে তাহার তালিকা ঠিকানাসহ পুরাতন ব্যবসাও বাণিজ্যে বাহির হইয়াছে। সেই সকল তেলের কলের মালিকদিগের মধ্যে কয়েক জনের নিকট দাম দরের জন্য অনুসন্ধান করুন।

৬নং পত্র

মহাশয়,

কলিকাতার বাজারে বা অন্যত্র শেয়াল কাঁটার বীজের ক্রেতা আছে কিনা কৃপা পূর্ব্বক সংবাদ দিলে সুখী হইব। আমরা যথেষ্ট পরিমাণে উক্ত বীজ সরবরাহ করিতে পারি ইহা ছাড়া অশ্বগন্ধাও সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি। ক্রেতা থাকিলে তাঁহার ঠিকানা, এবং কি মূল্যে ক্রয় করিতে পারেন পত্রোত্তরে জানাইলে উপকৃত হইব। উত্তর প্রাপ্তির জন্য রিপ্লাই কার্ড দিলাম। ইতি—

বিনীত

এম, শর্ম্মা এণ্ড কোং

Bhadrapur

Birbhum

৬নং পত্রের উত্তর

অশ্বগন্ধা যে সকল Chemist ও কবিরাজেরা প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটী respectable firms এর নাম ও ঠিকানা নিয়ে দিলাম। আপনারা ইঁহাদের সহিত পত্র ব্যবহার করুন। কিন্তু ব্যবসা করিতে হইলে পত্র ব্যবহারে কিছুই হয় না। মফঃস্বলের নানা স্থান হইতে পাইকারগণ এই সকল দ্রব্য ইহাদিগকে সদাই সরবরাহ করিয়া থাকেন। আপনারা যদি যথার্থ এই কারবার করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে এক বোঝা জিনিষ নিয়া এখানে আসিয়া এই সকল firm এর কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিয়া দর দাম ঠিক করুন। যদি আপনাদের জিনিষ ও দরদামে ইঁহারা সুবিধা বোধ করেন তবে নিশ্চয়ই অর্ডার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

১। Bengal Chemical & Pharma Ceutical Works Ld.
Manicktala main Road, Calcutta.

২। C. K. Sen & Co. Ld.
29, Kolutola Street, Calcutta.

৩। Smith Stanistrut & Co. Ld.
Chowringhee, Calcutta.

৪। Mahamohopadhaya
Kaviraj Gananath Sen
Kalpataru Bhavan
Central Avenue, Calcutta.

আপনি শেয়াল কাঁটার, বীজ সরবরাহ করিতে চাহিয়াছেন। কি পরিমাণ সরবরাহ করিতে পারেন তাহা জানাইবেন। শেয়াল কাঁটার বীজের তেলে খোস্ পাচড়ার উপকার হয় বলিয়া জানি। তাহা ছাড়া এই তেল আর কি কাজে লাগে তাহা যদি আপনাদের জানা থাকে তবে জানাইবেন। নচেৎ আমাদের নিকট যদি /১ এক সের পরিমাণ তেল পাঠাইয়া দেন তবে আমরা উহা কোনও Industrial chemist দ্বারা analyse করিয়া এই তেল কি কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা বাহির করিয়া দেখিতে পারি। ফলতঃ এই তেলের ব্যবহার না জানিতে পারা পর্য্যন্ত তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা অসম্ভব।

৭নং পত্র

সবিনয় নিবেদন

আমি আপনাদের ১৩৩৪ সনের পুরাতন সেটের পত্রিকার এবং ব্যবসায়ীর তালিকা নিয়া থাকি।

১। মোটর গাড়ী ও সাইকেলের পুরাণো টায়ার এবং টিউব কলিকাতার বাজারে বা অন্য কোন স্থানে বিক্রয় হইতে পারে কি না, এবং দর আনুমানিক কিরূপ এবং কি হিসাবে বিক্রয় হইতে পারে, তাহা যদি দয়া করিয়া আমায় জানান তবে বিশেষ উপকৃত হইব। যদি আপনার জানা থাকে তবে কোম্পানীর নাম এবং তার ঠিকানা জানাইলে বাধিত হইব।

২। পুরান শিশার (Tea lead) কলিকাতায় খরিদদার কে এবং দর কি ?

শ্রীগৌর কিশোর কুণ্ডু

৭নং পত্রের উত্তর

মোটর গাড়ীর পুরাতন টায়ার হইতে কলিকাতার জুতার ব্যবসায়ীগণ জুতার সোল্ তৈয়ার করতঃ বিক্রয় করিতেছে। এইরূপ জুতা খুব সস্তা বলিয়া কলিকাতায় সর্ব্বত্র যথেষ্ট বিক্রয় হয়। যাহারা crepe soleএর জুতা বেশী দামী বলিয়া কিনিতে পারে না, তাহারা এই জুতা কিনিয়া থাকে। সুতরাং ফেরীওয়ালারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া যাহাদের Motor car আছে তাহাদের নিকট হইতে পুরাতন Tyre খরিদ করিয়া এই সকল জুতার কারখানায় কিছু বেশী দামে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল পুরাতন Tyre এর সেই জন্য কোনও ধরা বাঁধা দর নাই। যে সকল টায়ারের অবস্থা ভাল আছে ফেরীওয়ালারা তাহা একটু বেশী দামে কেনে। Motor carএর মালিকদিগের অবস্থা, বিক্রয় করার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা এবং সর্ব্বোপরি মনোভাবের উপর এই সব পুরাণো টায়ারের দর নির্ভর করে। এরূপ অবস্থায় মাল মফঃস্বলে রাখিয়া কলিকাতা পত্র ব্যবহার দ্বারা বেচা অসম্ভব। হয় নিজে আসিয়া কিম্বা কলিকাতায় কোনও বন্ধু থাকিলে তাহার নিকট মাল পাঠাইয়া দিয়া তবে মাল বেচার ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে এ কথা ঠিক যে, যে পরিমাণ মাল ই হউক না কেন এখানে পাঠাইলেই তাহা বিক্রয় হইয়া যাইবে। কলিকাতায় আপনার যদি এরূপ কোন বিশ্বস্ত লোক না থাকে তবে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে আমরা ফেরীওয়ালাদের উহার inspection দিয়া বেচার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। প্রথমে একটা ছোট Consignment পাঠাইয়া দিয়া দেখিতে পারেন, যদি বোঝেন যে তাহাতে কিছু লাভ হইয়াছে তবে বড় Consignment পরে পাঠাইবেন। তাহা ছাড়া আপনার নাম ও ঠিকানা পত্রিকায় উঠাইয়া দিলাম; যদি কেহ এই কারবার করিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে আপনার সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

Cycle tyreএর এরূপ কোনও ব্যবহার করার উপায় নাই বলিয়া উহার মূল্য যৎসামান্য। রবারের কারখানায় পুনরায় গলাইয়া উহার ব্যবহার চলে; কিন্তু এই রবারের কার্য্যকারীতা আসল রবারের রসের তুলনায়—অতি নিকৃষ্ট। সেই জন্য এইরূপ—টায়ারের দামও সামান্য পাওয়া যায়।

পুরাতন শিশার পাতেরও এই সকল ফেরীওয়ালা খরিদ্দার। ইহারা এই শিশার পাত গলাইয়া যে রাং হয় তাহা ঝালাইকরেদের কাছে বেচে। ইহাও দু'দশ মণ পাঠাইয়া দেখিতে পারেন, লাভ যদি বোঝেন তবে পরে বেশী পাঠাইবেন।

ঔষধ ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

ঔষধের ব্যবসায়ে কয়েকজন বাঙ্গালী কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। আমি আজ দুইটী প্রসিদ্ধ ঔষধালয়ের স্থাপয়িতাদের সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি।—

প্রতিষ্ঠাতার নাম ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের মথুরা মোহন চক্রবর্ত্তী। মথুরাবাবুর বাড়ী বিক্রমপুর। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। পদ্মায় পৈত্রিক ভিটা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ঢাকায় আসিয়া বাড়ী করেন। মথুর বাবুরা তিন ভাই; বড় শ্রীললিত মোহন চক্রবর্ত্তী, মধ্যম শ্রীমথুরা মোহন চক্রবর্ত্তী, কনিষ্ঠ শ্রী লালমোহন চক্রবর্ত্তী।

মথুর বাবু বি, এ, পাশ করিয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার খরচ কুলাইত না বলিয়া টিউশনিও করিতেন। বড় ভাই ললিত বাবু সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিতেন। কনিষ্ঠ ভাই লাল মোহনবাবু স্কুলে পড়িতেন। সংসারের যাবতীয় খরচাদি মথুরবাবু আনন্দের সহিত বহন করিতেন।

মথুর বাবু বিশেষ চরিত্রবানও সত্যবাদী। তিনি ছাত্রদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ছাত্ররাও তাঁহাকে ভক্তি করিত। এক গরীব ছাত্র অর্থাভাবে চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়ায় মথুর বাবুর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি যথাযোগ্য উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিয়া পীড়িত ছাত্রকে সেবন করান। ইহাতে ছাত্র আরোগ্য হইয়াছিল।

চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিয়া মথুর বাবু দেখিলেন যে, চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিতে যে খরচ হয় তাহা অপেক্ষা ৫ গুণ মূল্যে চিকিৎসকেরা উহা বিক্রয় করেন। এই অন্যায় দূর করিতে তিনি দৃঢ় সংকল্প হন, এবং চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিয়া কম মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। তখন বাজারে মথুর বাবুর নাম হইয়া গেল ও চ্যবন প্রাশের খুব কাট্‌তি হইতে লাগিল।

ইহার পর মথুর বাবু কবিরাজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এবং মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক কবিরাজকে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

ঔষধের বহুল প্রচার হওয়ায় ১৯০১ সালে ঢাকা শক্তি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রমে ক্রমে মথুরবাবুর অধ্যবসায় গুণে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের ২৭টী শাখা ঔষধালয় আছে।

মথুরবাবুর চ্যবণ প্রাশ, ছাগলাদ্য ঘৃত, মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ লোক সমাজে আদর পাইয়াছে।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

৭০।৭২ বৎসর পূর্ব্বে ৺বটকৃষ্ণ পাল সামান্য একটী ঔষধের দোকান খুলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টাও অধ্যবসায়ের ফলে বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর ঔষধাবলীর কাট্‌তি হইতে থাকে; তারপর তাঁহার পুত্র ৺ভূতনাথ পাল ঔষধ প্রস্তুতের জন্য শাখা গড়িয়া তোলেন। স্যার হরিশঙ্কর পাল পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক কারখানাগুলি দেখিয়া আসিয়া সেইরূপভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই কোম্পানী দেশী ও বিলাতী ঔষধ দুই'ই বিক্রয় করেন।

১৯১১ খৃঃ বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ভারতীয় বেলেডোনা, পডোফাইলাম প্রভৃতি ঔষধ বাজারে বাহির করেন। বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর রসায়ন কারখানায় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য একটী বিভাগ আছে। এই কোং নিম্ন লিখিত পেটেণ্ট ঔষধ বাহির করিয়াছেন। (১) ক্লোরোডাইন (২) এডওয়ার্ডস্ টনিক (৩) ভাইব্রো অশোক (৪) যমানি জলসার (৫) কাল মেঘের তরল সার (৬) সাইটোজেন (৭) টাইফোজেন। (৮) গোল্ড সার্সাপ্যারিলা (৯) জেলিনা এন্টেসেপ্টিক (১০) জেলিনা লেক্ সেটিভ।

শ্রীসুধীর কুমার নন্দী মজুমদার।

কিস্তি হিসাবে মোজা বোনা কল।

Harrison এবং Foster এই দুই মেকারের মোজা বোনা কল ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার মধ্যে Fosterএর কলই আবার হাতে চালাইবার জন্য অনেক বেশী পছন্দ করে। এই জন্য সম্প্রতি আমরা এক চালান Fosterএর মোজা বোনা কল আমদানী করিয়াছি; এবং কলিকাতার একটী বিখ্যাত Hosiery Factoryর সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়াছি যে তাঁহারা আমাদিগের প্রেরিত খরিদ্দারদিগকে বিনামূল্যে এবং বিনাপারিশ্রমিকে কল চালাইবার সমুদয় প্রক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। এক সপ্তাহ, এক পক্ষ, এক মাস বা তাহারও বেশী যতদিন লাগে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শিক্ষার্থী কল চালাইবার এবং মোজা বুনিবার সকল রকম প্রক্রিয়া ভাল করিয়া আয়ত্ব করিতে না পারেন, ততদিন এই Factoryতে শিক্ষার্থী বিনামূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কল চালনা শিক্ষা করিতে পারিবেন।

২। আমরা Fosterএর তিন রকমের মোজা বোনা কল আমদানী করিয়াছি।

(ক) সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মেসিনে ৫ হইতে ৭ ইঞ্চি Sizeএর মোজা বোনা যায়।

(খ) মাঝারি মেসিনে ৭ হইতে ৯ ইঞ্চি Size এর মোজা বোনা যায়।

(গ) বড় মেসিনে ৯ হইতে ১১ ইঞ্চি Sizeএর মোজা বোনা যায়।

S. P.—৮

ছোট মেসিনের দাম প্যাকিং সমেত—		১২০৲
মাঝারি মেসিনের দাম—	ঐ	১৪০৲
বড় মেসিনের দাম—	ঐ	১৩০৲
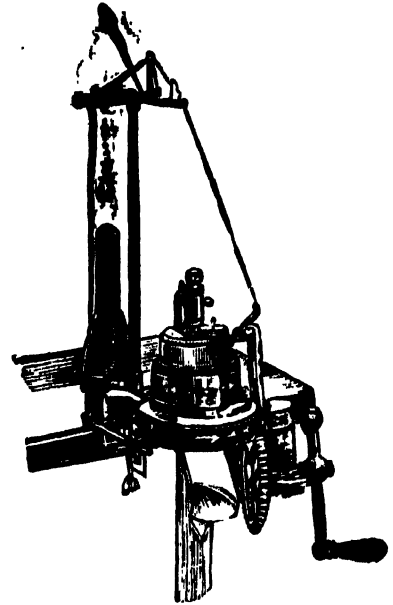
মোজা বোনা কল।

৩। অর্ডারের সহিত অর্দ্ধেক মূল্য অগ্রিম দিতে হয়। বাকি অর্দ্ধেক টাকা বারমাসের সমান কিস্তিতে ভাগ করতঃ মাসে মাসে উসুল করিতে হয়। অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া বাকী অর্দ্ধেক টাকার ১২ মাসের কিস্তীবন্দী রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলে আমরা তৎক্ষণাৎ কলের ডেলিভারী দেই এবং সঙ্গে সঙ্গে Factoryতে ভর্ত্তি করিয়া দেই। পরে ভাল করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ক্রেতা কল নিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া যাইতে পারেন এবং

কিস্তী অনুযায়ী মাসে মাসে টাকা শোধ করিলে ১২ মাস পরে কল তাঁহার হইয়া যাইবে।

৪। কলিকাতা সহরের মধ্যে যদি কোনও স্ত্রীলোক কল খরিদ করেন তবে Factory হইতে কারিগর গিয়া তাঁহার বাড়ীতে শিখাইয়া আসিতে পারেন ; এজন্য কোনও পারিশ্রমিক চাওয়া হইবে হইবে না ; কেবল তাঁহার যাতায়াতের ট্রাম বা বাস ভাড়া দিতে হইবে।

৫। মফঃস্বলে যদি কেহ একসঙ্গে ৫টী কল খরিদ করেন, তবে Factory হইতে কারিগর যাইয়া তাঁহাকে বা তাঁহার খরিদ্দারদিগকে একত্র ক্লাশ করিয়া কল চালনা শিখাইয়া দিয়া আসিতে পারেন। এজন্য কোনও পারিশ্রমিক লাগিবে না কেবল কারীগরের যাতায়াত খরচ এবং আহার দিলেই চলিবে।

মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকেরা অবসর সময় নাটক নভেল পাঠে সময়, স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিতেছেন। ইহার বিষময় ফল যে কি ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার প্রমাণ আমরা ঘরে ঘরে দেখিতে পাইতেছি। ইংরাজিতে একটা কথা আছে Idle Brain is the Devil's Workshop অর্থাৎ আলস্যের জীবন ক্রমে শয়তানের আড্ডায় পরিণত হয়। এইজন্য আমরা মনে করি যে Foster এর এই মোজা বোনা কল ব্যবহার আমাদের মেয়েদের অবসর সময় বেশ ভালভাবেই কাটিবে। একদিকে তাঁহাদের সময়ের যেমন সদ্ব্যবহার হইবে অপর দিকে তেমনি বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মোজা নিজ হাতে বুনিয়া দেওয়ায় নিজেরও তৃপ্তি হইবে এবং বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই আনন্দ হইবে। শুধু কি তাই ?

বেশী মোজা বুনিতে পারিলে তাহা পাড়া প্রতিবেশীর নিকট বিক্রয় করতঃ অভাবের সংসারে কিছু সাহায্যও করিতে পারিবেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ এক সময়ে সব টাকা দিতে পারেন না, বলিয়াই এই সকল মোজার কল কিনিতে পারেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য একদিকে Foster এর কল যেমন আমরা বাজারের সকল কল অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিতেছি, তেমনি আবার মাত্র অর্দ্ধেক দাম জমা করিলে বাকী অর্দ্ধেক টাকা ১২ মাসের সমান কিস্তিবন্দী করিয়া নিয়া কলের ডেলিভারি দিতে স্বীকৃত হইয়াছি।
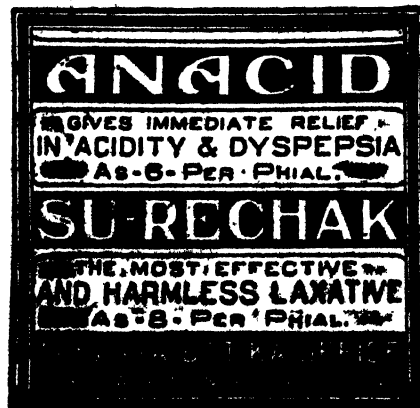
Wind Mill বা হাওয়া কল।

ষ্টীম ইঞ্জিন, অয়েল ইঞ্জিন, মোটর, ডাইনামো ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে, পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্র Wind mill বা হাওয়ার কল প্রচলিত ছিল। এই হাওয়ার কলে সুবিধা এই যে ইহা চালাইবার জন্য কোন Motive Power বা যন্ত্রশক্তির প্রয়োজন হয় না, সুতরাং কোন কল চালাইতে গেলে যে recurring expense বা পৌনঃপুনিক খরচের দরকার হয়, হাওয়ার কলে সে দিক দিয়া এক পয়সাও খরচা নাই। ধরুণ, একটা চাউলের কল বা আটার কল বা তেলের ঘানি চালাইতে গেলে আপনাকে হয় ষ্টীম এঞ্জিন, না হয় অয়েল এঞ্জিন, আর না হয় ইলেক্ট্রিকের দ্বারা চালাইতে হইবে। ষ্টীম্ এঞ্জিনের জন্য কয়লার খরচ আছে। অয়েল এঞ্জিনের জন্য তেলের বা পেট্রোলের খরচ আছে এবং ইলেক্ট্রিকের জন্য কারেণ্ট খরচা আছে। কল যতক্ষণ চলিবে ততক্ষণই এই সকল বাবদে খরচা হইতে থাকিবে। ইহাকেই recurring expense বা পৌনঃপুনিক খরচ কহে।

Wind millএর বেলায় আর এসকল কোনও হাঙ্গামা নাই। ইহা চালাইবার জন্য কয়লাও লাগে না, তেলও লাগে না, কিম্বা Electric Currentও লাগে না। সুতরাং Wind mill যদি বছরের ৩৬৫ দিন দিবারাত্র চলে তথাপি এই সকল বাবদে তাহার জন্য কোনও খরচ নাই। কারণ ইহাকে চালাইবার শক্তি হ'চ্ছে ভগবান দত্ত বাতাস। আলো, জল ও বাতাস বিধাতার দান, সুতরাং ইহার জন্য আর পয়সা খরচ করার দরকার হয় না। অবশ্য শক্তিশালী মানুষ বিধাতার এই সকল দানও করায়ত্ব করিয়া নিয়া অপরের নিকট হইতে জল বাতাস ও আলো বেচিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে।

একটু জোরে বাতাস বহিলেই সেই বাতাসের গতি বা velocityতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহার জোরেই Wind mill বা হাওয়ার কল চলিতে থাকে। বাতাসের গতি যতদ্রুত হয় Wind millও তত প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকে। এই Wind mill এর সহিত যখন Pulley জুড়িয়া দিয়া তাহার শক্তিদ্বারা ধানভানা, আটাভাঙ্গা, ঘানী ঘোরানো, জল পাম্প করা ইত্যাদি যে কোনও কাজ করা যায়। ইহাতে সুবিধা এই যে কল চালাইবার জন্য কোনও খরচ নাই। কেবল যন্ত্রগুলিকে কার্য্যক্ষম রাখার জন্য oiling cleaning করিতে হয়। এজন্য একটীন lubricating oil রাখিয়া দিলে বহুদিন যাবত তাহার দ্বারা oiling cleaning এর কাজ চলে।

ইহার অসুবিধা যাহা তাহাও বর্ণনা করিতেছি।

১। বাতাস যদি বেশ জোরে না বয় তবে কল চলে না। বাতাসের velocity বা গতি এমন হওয়া দরকার যাহার জোরে Wind mill বা হাওয়া কলটী চলিতে পারে। এই জন্য Wind mill এর অর্ডার দিবার আগে যেখানে Wind

mill বসানো হইবে সেখানকার হাওয়ার গতির একটা mean velocity বাহির করিতে হয়। mean velocity ব্যাপারটা কি তাহা বলিতেছি। দিন রাত্রের মধ্যে যে সময়টায় সাধারণতঃ খুব জোরে হাওয়া বয় তাহার গতি এবং যে সময় হাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা মৃদুগতিতে বয় তাহার গতি দেখিয়া উভয় গতির সমষ্টিকে ২ দিয়া ভাগ করিলে Mean velocity বাহির হয়। এইরূপে বাতাসের Mean velocity নির্দ্ধারিত হইলে Wind mill প্রস্তুতকারকেরা সেখানে কি আকারের Wind mill চলিতে পারে তাহা স্থির করিয়া নেন। বাতাসের গতি যদি খুব বেশী থাকে, তবে বৃহদাকারের Wind mill চলিতে পারে ; আর বাতাসের গতি যদি কম থাকে তবে Wind mille আকারে ছোট করিতে হইবে ; তাহার দ্বারা তখন হয়ত পাম্প করা, জল সেঁচা ইত্যাদি কম জোরের কাজ ছাড়া যে সকল কল চালাইতে বেশী শক্তির প্রয়োজন তাহা করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং প্রথম ব্যাপার হইতেছে যে, আপনি কি উদ্দেশ্যে Wind mill বসাইতে চান তাহা দেখার দরকার ; তারপর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সকল কল চালাইবেন, তাহার Motive Power যোগাইবার মত শক্তি সেখানকার বাতাসে আছে কিনা। যদি থাকে, তবেত কোন কথাই নাই, কিন্তু যদি না থাকে তবে সেখানে Wind mill বসানো চলিবে না। সুতরাং Wind Mill বসানোর প্রথম বাধা এইখানে। ইহা যেখানে সেখানে বসানো যায় না। প্রথমতঃ বাতাসে বেশ জোর থাকা চাই ; দ্বিতীয়তঃ বাতাসের জোরের গতি বুঝিয়া তদনুযায়ী Wind mill করিতে হয়। সুতরাং Wind mill চলিতে পারিলেও হয়ত তাহা এত ছোট আকারের হইতে পারে যাহার দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না ; অর্থাৎ বড় বড় চাউলের কলাদি চলিতে পারিবে না।

২। দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে Wind miil সব সময়ে চলে না। ইহার চালক হ'চ্ছে বাতাস। এই বাতাস যখন জোরে চলে তখন Wind mill ও চলে। কিন্তু বাতাসের গতি যেই পড়িয়া যায় Wind mill ও তখনই automatically বা আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়।
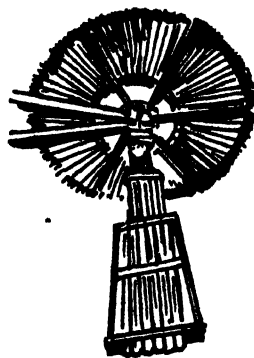
WIND MILL বা হাওয়া কল

এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য মানুষও উপায় বাহির করিয়াছে। যাহারা irrigation purpose বা জল তোলার জন্য wind mill বসায় তাহারা wind millএর মাথায় বা পাশে এক একটা Overhead Tank বা কতকগুলি Tank বসাইয়াছে। wind mill যখন চলে তখন এই Tank গুলি জলে ভরিয়া যায়। যেমন আমাদের টালার Overhead Tankগুলি ভরিয়া যাবার পরেও যদি বাতাসের জোরে কল চলিতে থাকে এবং জল উঠিতে থাকে তখন Tank ছাপাইয়া এই যে Surplus water পড়িতে থাকে তাহা নালা কাটিয়া ক্ষেত খামারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহা

হইলে দেখা যাইতেছে যে বাতাসের অভাবে wind mill সব সময় না চলিতে পারিলেও যখন চলে তখন ভাণ্ডার ভরিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা যায় এবং যখন বাতাসের অভাবে কল চালাইবার আর কোন উপায় থাকে না তখন এই সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতেই কাজ সারা যায়।

৩। আর এক অসুবিধা বা ভয় এই যে বাতাসের গতি বাড়িতে বাড়িতে যদি প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝায় পরিণত হয় তবে বাতাসের সেই দুর্জ্জয় গতির জোরে Wind mill এত দ্রুত চলিতে থাকে যে তাহার পাখা গুলি আর দেখা যায় না। এত জোরে চলিলে লোহার যন্ত্রপাতি সব ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেই জন্ত ঝড় ঝঞ্ঝার সময় Wind mill শিকল দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

সুবিধার কথা

ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার কথাগুলি এইবার বলি।

১। কল চালাইতে সিকি পয়সা খরচ নাই; কেবল যন্ত্রগুলিতে যথারীতি oiling, cleaning করা চাই।

২। কল চালাইবার জন্ত কোনও ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্, বা Expertএর দরকার নাই। কল fit করিয়া বসাইবার পর আর কাহারও সাহায্যের বা পরিদর্শনের (Supervision) দরকার নাই। বাতাস জোরে বহিলেই কল automatically বা আপনা হইতেই চলে। আবার বাতাস বন্ধ হইলে আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়।

৩। যতক্ষণ বাতাস জোরে চলিবে ততক্ষণ কলও জোরে চলিবে সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে সব কাজ সেরে নিয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়।

৪। সাধারণতঃ ক্ষেত খামারে জল দিবার জন্য যখন Wind mill ব্যবহার হয় তখন আবশ্যক মত Tank আদি জলে ভরিয়া রাখিয়া Surplus বা উদ্বৃত্ত জল নালা কাটীয়া ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া যায়। Wind millএর সম্বন্ধে মোটামুটি এখানে বর্ণনা করিলাম। বাংলা দেশে বসন্ত এবং গ্রীষ্ম কাল চাষবাসের পক্ষে অতি কঠিন সময়। এখন মাটী শুকাইয়া, কাটীয়া চৌচির হইয়া যায়। জলের অভাবে গাছ পালা শস্ত খামার সব শুকাইয়া যায়। এখন নানা কারণে লোকের জলের দরকার। জল উঠাইবার জন্ত বা সেঁচ দিবার জন্ত ছোট বড় অনেক রকম পাম্প (Pumping machine) পাওয়া যায়; কিন্তু এই pump চালাইবার জন্য motive power বসাইবার দরকার এবং তাহার জন্য হয় Steam, না হয় oil আর না হয় Electric Engine কেনার দরকার; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, Enginer মিস্ত্রী, মেকানিক্ ইত্যাদির হাঙ্গামাত আছেই তাহার ওপর আবার Recurring Expenseএর ভাবনা আছে। এই সকল Pros & Cons বা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া অতি বড় উৎসাহী বাঙ্গালীও শেষে হতাশ হইয়া সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই সকল অল্প পুঁজি ও স্বল্প সামর্থ্য-ওয়ালা লোকদিগকে আমরা Wind mill বা হওয়ার কল বসাইতে পরামর্শ দিতেছি।

বসন্তের সুরু হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষার মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই দিন রাত্রির মধ্যে এক না এক সময় সময় অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যে ও প্রবল বেগে হাওয়া বহিয়া থাকে। একটী Wind mill বসাইয়া এই হাওয়াটুকুর যদি আমরা সদ্ব্যবহার করি তবে তাহার দ্বারা আমাদের ক্ষেত খামারে জল সেঁচ করা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ ছোট খাটো কলও চালাইতে পারি।

Wind millএর এই বিবরণ পাঠ করিয়া যদি কাহারও Wind mill কেনার ইচ্ছা হয় তবে আমাদিগকে লিখিলে আমরা কল আনাইয়া একেবারে fit করিয়া দিয়া আসিতে পারি।

পত্রিকা প্রকাশ

পত্রিকা প্রকাশক হইলে লাভ হইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিজ্ঞাপনের জন্য টাকা খরচ করিতে হইবে। এক হাজার টাকা মূলধনে এই ব্যবসায় করা যায়। এই ব্যবসায়ের লাভের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিবার জন্য আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া গেল।

আপনি যদি ১৬ পৃষ্ঠার একটী মাসিক পত্রিকা ১০০০ মুদ্রিত করেন, তবে ছাপাই খরচ ২০৲ কাগজের মূল্য ১২৲ (৬৲ রিমের কাগজ। ১ রিম কাগজে ৮ পৃষ্ঠার এক হাজার বই ছাপা হয়।) অন্যান্য খরচ ৮৲ ছবি ব্লকের দাম ও মুদ্রণ খরচ ন্যূনপক্ষে ২০৲ (একরঙা ছবির দর) মোট ৬০৲ প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা হিসাবে ১০০০ কপির মূল্য ১২৫৲ খরচ ৬০৲ লাভ ৬৫৲ টাকা। অবশ্য সকল পত্রিকা বিক্রয় হয় না। কাজেই লাভ আরও কম হইবে, কিন্তু বিজ্ঞাপন বাবদ আবার টাকা পাওয়া যাইবে। যদি পত্রিকা সুপরিচালিত হয় তবে লাভ হইবে নিশ্চয়ই।

পত্রিকার গ্রাহক জুটাইতে হইলে পারিশ্রমিক দিয়া ও বিখ্যাত লেখক লেখিকাগণের লেখা পত্রিকায় প্রতিমাসে প্রকাশিত করিতে হয়।

দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় লাভ প্রায় ঐরূপ। পত্রিকা প্রকাশের জন্য একটী নিজস্ব প্রেস রাখিতে হয়। তাহাতে সময়মত ও সুচারুরূপে কাজ হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ও গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য উচ্চ কমিশনে এজেন্ট ও ক্যানভাসার নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক।

দপ্তরীর ব্যবসায়

দপ্তরীর ব্যবসায় লাভজনক; কিন্তু যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য মূলধন বেশী লাগে। বাঁধাই-এর কাজ ছাড়া ছোট খাট কাজ যেমন একসার সাইজ বুক প্রস্তুত করিলে বেশ লাভ হয়। যে একসার সাইজ বুক বাজারে প্রত্যেকটা ৴১০ পয়সা দরে বিক্রয় হয়, তাহা প্রত্যেকটা প্রস্তুত করিতে ৻১০ পয়সার অধিক খরচ পড়ে না। খাম প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিলেও লাভ হয়।

কাটা কাপড়ের ব্যবসায়

কাটা কাপড়ের ব্যবসায় খুব লাভজনক। খরিদ্দারের রুচি অনুযায়ী অল্প সময় মধ্যে পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিলে ২।৩ বৎসরের মধ্যেই কারবার কাঁপিয়া উঠিবে। এই ব্যবসায় ৫০০৲ টাকা মূলধনেও আরম্ভ করা যায়। যাঁহারা এই কার্য্য আরম্ভ করিবেন তাঁহাদের এই কাজে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। প্রয়োজন হইলে নিজেই কাজ করিবেন।

লোন আফিস

পল্লীগ্রাম সমূহে টাকার সুদ মাসিক শতকরা ১৷০ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। গ্রাম্য-লোন আফিস প্রতিষ্ঠিত করিলে নিশ্চয়ই লাভ হইবে। শতকরা মাসিক ১৲ সুদে টাকা কর্জ্জ দিলে যথেষ্ট লাভ করা যায়।

চা'র ব্যবসায়

কয়েকজন যুবক চাবাগান হইতে আট দশ আনা পাউণ্ড দরে চা ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহা এক পাউণ্ড চা'র উপযুক্ত টিনে ভরিয়া উত্তম মুদ্রিত লেবেল দিয়া ১৷০ পাউণ্ড দরে বাজারে বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হইতে পারে। টিন বেশী পরিমাণে ক্রয় করিলে দর বেশী পড়িবে না। লেবেল সচিত্র করিতে হইবে। লক্ষ লেবেল ছাপাইলে খরচ অনেক কম পড়িবে। অর্দ্ধ পাউণ্ড, সিকি পাউণ্ড চাপূর্ণ টিনও বিক্রয় করা উচিত।

হোটেল

হোটেল পরিচালনও একটী লাভজনক ব্যবসায়। খাদ্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে করা উচিত। ভাল খাদ্য না দিলে ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে না। যদি সুচারুরূপে সততার সহিত কাজ করেন তবে বোর্ডার ও আহারার্থী আপনার হোটেলেই আসিবে। ৫০০৲ টাকা মূলধনে এই ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়।

সোডার কল

এই ব্যবসায় ২০০।৩০০৲ টাকা মূলধনে আরম্ভ করা যায়। ভাল ভাবে চালাইতে পারিলে মাসে ৫০।৬০৲ আয় হইবে সন্দেহ নাই। এই ব্যবসায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এই পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়াছে। সোডার কল "ব্যবসা ও বাণিজ্য" অফিসে পাওয়া যায়।

চা'র দোকান

চা'র দোকান ২৫৲ মূলধনেও আরম্ভ করা যায়। শতকরা ৭৫৲ টাকা এই ব্যবসায়ে লাভ হয়। এই ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে পানের খিলি, সরবত, চুরুট প্রভৃতি বিক্রি করিলে বেশী লাভ হইবে। চা'র দোকান ভাল ভাবে চালাইতে পারিলে অবশ্যই লাভ হইবে।

সন্দেশের দোকান

এই ব্যবসায়ও খুব লাভ জনক। ২০০৲ ৩০০৲ টাকা মূলধনে এই ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়। শতকরা ৫০৲ লাভ হয়। এই ব্যবসায় সততা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে পরিচালন করিতে পারিলে খুব লাভ হইবে সন্দেহ নাই। বাসি জিনিষ বিক্রয় করা উচিত নয়। বাসি জিনিষ ফেলিয়া দেওয়া উচিত। অর্থের লোভে বিক্রয় করিলে বাজারে দুর্নাম হইবে ও জিনিষের কাটতি কমিয়া যাইবে।

মুদীর দোকান

মুদীর দোকান সততার সহিত চালাইতে পারিলে খুব লাভ হয়। প্রায় মুদীর দোকান সমূহ অতিরিক্ত লাভ করে বলিয়া অল্প সময় মধ্যে কাঁপিয়া উঠে বটে; কিন্তু ইহার পরিণাম খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। অন্য কেহ দোকান করিয়া যদি পূর্ব্ব দোকান অপেক্ষা কম দরে জিনিষ দেয়, তবে পূর্ব্বের দোকান ফেল হইয়া যায়। মুদীর দোকানে টাকা প্রতি ৵০ আনার অধিক লাভ করা উচিত নয়। এই ব্যবসায় ১০০৲ টাকা মূলধনেই আরম্ভ করা যায়।

মনোহারী দোকান

মনোহারী দোকান ১০০৲ টাকা মূলধনেই আরম্ভ করা যায়। টাকা প্রতি ৵০ আনা হিসাবে লাভ করিলে দোকান বেশ চলিবে। অধিক পরিমাণে জিনিষ কিনিতে পারিলে ভাল কমিশন পাওয়া যায়। কাজেই লাভ হইবে।

কাপড়ের দোকান

কাপড়ের দোকানও ১০০৲ টাকা মূলধনে আরম্ভ করা যায় বটে কিন্তু অধিক মূলধনে করিতে পারিলে লাভ বেশী হইবে। টাকা প্রতি ৵০ আনা লাভ করা উচিত। আমাদের দেশের সাহা সম্প্রদায় এই ব্যবসায় করিয়া ধনী হইয়াছেন। এই ব্যবসায় মাড়োয়ারীদের প্রায় একচেটিয়া। এই ব্যবসায় ভাল ভাবে করিতে পারিলে খুব লাভ হইবার সম্ভাবনা।

[illegible] মজুমদার।

(ক্রমশঃ)